শাহজাদা দারাশুকো

প্রথম খণ্ড

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ—১৯৬৫

প্রকাশক ঃ

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮ এ, টেমার লেন

কলকাতা-৯

মুদ্রাকর ঃ

বিভাস রায়

গৌরী প্রিন্টার্স

৬৫, বিধান সরণী

কলকাতা-৬

শান্তা বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্যাণীয়াসু

হে মহান দিশারী

এমন উপন্যাস আগে কখনো লিখিনি। ভেবেছি। সাহসে কুলোয়নি। তীরে দাঁড়িয়ে ভয় পেয়েছি। এত বিরাট। এত জটিল। মানুষের মন। ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে। দেশের ধর্ম। দেশের মানুষ।

একদম অথৈ সাগর।

সাপ্তাহিক 'বর্তমান'-এর শ্রীমান অশোক বসু বলতে গেলে আমায় ধাক্কা মেরে এই জলে ফেলে দেন। তাঁর সঙ্গে উসকানি ছিল শ্রীমতী অনুভা করের।

ডুবে মরে যাওয়ার ভয়ে সাঁতার কেটেছি। ভেসে থাকার জন্যে। তীরে পৌঁছতে পেরেছি কিনা পাঠক বলবেন। আমায় অথৈ জলে ফেলে দেওয়ার জন্যে আমি অশোকের কাছে আজ ঋণী। ঋণী অনুভার কাছে।

সময়ে সময়ে তথ্য যুগিয়ে ভরসা দিয়ে সাহায্য করেছেন শ্রীমতী সাহানা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী ছন্দবাণী মুখোপাধ্যায়।

মাঝেমধ্যে শ্রীমতী নন্দিনী গঙ্গোপাধ্যায় ইতিহাসের তথ্যের রাস্তা আমায় দেখিয়ে দিয়েছেন। দিয়েছেন শ্রীমতী হৈমন্তী গঙ্গোপাধ্যায়ও। বিশেষ করে লোর-চন্দ্রাণীর কথা।

কালিকারঞ্জন কানুনগো, অমিয়কুমার মজুমদার, ক্ষিতিমোহন সেন, রাজ্যেশ্বর মিত্র, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, গৌতম ভদ্র, শেখর চট্টোপাধ্যায় এবং যদুনাথ সরকার পড়তে পড়তে পথ খুঁজেছি। আবুল ফজলও আমার দিশারী। দিশারী ট্যাভারনিয়ার এবং বার্নিয়ের।

গোড়ার দিকে আওরঙ্গজেবকে বুঝতে শ্রীমতী শান্তা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক পড়ে তবে আমার চোখের সামনে নির্যাসটুকু তুলে ধরেছেন।

গল্পকার, ঔপন্যাসিক, পরোপকারী কিন্নর রায় আগাগোড়া পড়ে ছাপতে দিয়েছেন। বানান, বাড়তি কথা—সবদিকেই তাঁর নজর। কি বলে তাঁর ঋণের কথা স্মরণ করি

শাহজাদা দারাশুকো হিন্দুস্থানে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মচিন্তায় মিলন-বিন্দুটি খুঁজতে গিয়ে সময়ের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে যান। তাই তিনি হিন্দুস্থানের ইতিহাসে একটি কালো গোলাপ। ব্যথা, সৌন্দর্য, কালের ইতিহাসের সঙ্গে এই গোলাপ জড়িয়ে গেছে। হিন্দুস্থান যুগে যুগে তাঁকে বার বার আবিষ্কার করবে। আমি এই ইতিহাস-পুরুষে যাবার রাস্তায় একজন ভবঘুরে মুসাফির মাত্র। আমি তাঁর সালিক। আধুনিক হিন্দুস্থানে তিনি রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরুরও দিশারী।

হিন্দুস্থানের ভাবী বাদশা শাহজাদা মহম্মদ দারাশুকো খাঁটি মুসলমান হিসেবে ইসলামে বিশ্বাসী হয়েও বারবার বলেছেন, সত্য কোন ধর্মের একচেটিয়া নয়। ঈশ্বরে যাওয়ার রাস্তাও অনেক। মানবধর্মী দারাশুকোই প্রথম নানান্ ধর্মের তুল্যমূল্য বিচারে নেমে মানুষের ধর্মটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। বিশ্বমনীষার সামনে এসেছে উপনিষদ তাঁরই চেষ্টায়।

প্রেমিক দারা ধার্মিক দারা হাত ধরাধরি করে চলেছেন। মানবীপ্রেমে তাঁর ঈশ্বরানুভূতি একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু চতুর জগতে কূটকৌশলের অভাবে যোদ্ধা দারা সুবিধা করে উঠতে পারেন নি। তিনি অলৌকিকে ঘোর বিশ্বাসী ছিলেন। মুখের লাগাম ছিল না বলে ওমরাহদের প্রায় সবাইকে চটিয়ে বসেছিলেন। যে রাজপুতদের তিনি একসময় বাঁচিয়েছেন—তাঁরাই তাঁকে প্রবল উৎসাহে তাড়া করে আওরঙ্গজেবের হাতে তুলে দিয়েছেন। ধর্মান্ধ ক্ষমতালোভীর ধর্মদ্রোহের মিথ্যা বদনাম দিয়ে তাঁকে ঘাতকের কাছে ঠেলে দিয়েছেন।

হিন্দুস্থানের ইতিহাসে বিষাদ মাখানো এমন কালো গোলাপ আর নেই। ব্ল্যাক প্রিন্স মানুষের ভাল চেয়েছিলেন। মানুষের ধর্ম খুঁজে বেড়িয়েছিলেন। তাঁর মত ইতিহাসে উপেক্ষিত আর কে আছেন!

ইতিহাসের সন তারিখ, যুদ্ধ, অভিষেকের ফাঁকে ফাঁকে যেসব জায়গায় মহাকালের না-বলা অন্ধকার পড়ে আছে—সেখানে মাথা খুঁড়লেও আজ আর জানার উপায় নেই শাহজাদী, উজিরে আজম থেকে শুরু করে সামান্য গানেওয়ালী, ভিখারি, কয়েদী, কবি কীভাবে ভাবতেন, নিয়তিকে নসিব বলে মেনে নিতেন। আমি সেইসব ভাবনা, সম্পর্ককে ফের জাগিয়ে তুলেছি মাত্র।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আস্‌সালাতো খয়রুম মিনন্‌ নওম্‌—

ওদিক, সুর একই সঙ্গে ভোর রাতের বাতাস কেটে কেটে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। এখন রাতের শেষ দিকে আর সেই শীত নেই। ফাল্গুন মাস শুরু হয় হয়। আজানের সুরের ভেতর শেরগির হাতিদের কেউ কেউ দিন শুরুর আগেই প্রথম গরম নাদ ফেলতে শুরু করেছে। তারই মৃদু চেনা শব্দ কানে আসছিল কাছেরই পিলখানা থেকে।

আবার—

আস্‌সালাতো খয়রুম্‌...

ঘুমিয়ে থাকার চেয়ে নামাজ অনেক ভালো—

একথাই ভাবতে ভাবতে আবছা অন্ধকারের ভেতর একজন মানুষ ভাঁজ হয়ে বিছানায় উঠে বসলো। ততক্ষণে আজানীর পরিষ্কার গলার স্বর শেষ রাতের পাখিদের গলায় মিশে গেল।

লা এলাহা ইল্লালাহ্‌
মহম্মদুর রসুলুল্লা
হাই আলে আসসালা
হাই আল্লেল ফলা

উঠে বসা মানুষটিও স্পষ্টই যেন টের পেল—

আল্লার কোনো শরিক নেই।

একথা ভাবতে ভাবতে ছায়া মানুষটির মনের ভেতরটা এই ভাবনাতেই ভরে উঠলো ঃ মহম্মদকে আল্লাই পাঠিয়েছেন

হাই আলে আসসালা
নামাজের জন্যে এসো
হাই আল্লেল ফলা
তাড়াতাড়ি এসো
আল্লাহু আকবর
আল্লাই সর্বশ্রেষ্ঠ
আবার—
আস্‌সালাতো খয়রুম মিনন্‌ নওম্‌—

এবার দোতলা ডুরাসানা-মঞ্জেল তাঁবুর সামনেকার আকাশে অন্ধকার ফিকে হয়ে আলোর রং একেবারে ডিমের কুসুম। সেখানে আজমির পাহাড়ের মুণ্ডু একটু একটু করে জেগে উঠছিল। মানুষটি লম্বা চওড়া। ওদিকে তাকিয়ে সে মাথা নোয়ালো। ওপরেই মৈনুদ্দিন চিস্তির সমাধি। ওদিক থেকেই উড়ে এসে এক ঝাঁক হীরামন পাখি নফরখানা, ফরাসখানার ওপর দিয়ে আবদারখানার দিকে চলে গেল। লালগলা এই সবুজ পাখিদের মানুষটি চেনে।

ডুরাসানা-মঞ্জেল তাঁবুর দোতলায় দাঁড়ানো মানুষটিকে এবার কিছু স্পষ্ট দেখা গেল। তার গায়ে রেশমের জাম্বাদকর। কোমরে কওতল তলোয়ার। মানুষটি ওপরের দিকে তাকালো। আকাশপ্রদীপ তখনো নেভেনি। বহু উঁচুতে অভ্রের লণ্ঠন তখনো জ্বলছিল। অথচ দিন আর খানিক বাদেই শুরু হয়ে যাবে।

আজানের সুরের সঙ্গে সে বিড়বিড় করে বলে উঠলো: আমি সেলিম জাহাঙ্গীর—আমার আব্বা হুজুর শাহেনশা হিন্দুস্থানের বাদশা জালালুদ্দিন আকবর। তিনি গান বুঝতেন। সুর বুঝতেন। তাঁর জ্বলালশাহি সুর এই আজানের কথাই মনে করিয়ে দেয়—

ঠিক এইসময় আজমির পাহাড় টপকে একটা লাল বল সামনের বিরাট অন্ধকারে পড়তেই দশদিগন্ত যেন আলোয় জ্বলে উঠলো। আসলে আজমির থেকে পুষ্কর যাবার পথে আন্নাসাগরের জলে সূর্যের আলো পড়ে চারদিক ঝিকমিক করে উঠতেই এক চমকে দিন শুরু হয়ে গেল। ওই আঁধারই রাতের সঙ্গে মিশে থাকা—ঢেউ তোলা আন্নাসাগর। লম্বায় এক মঞ্জিল। চওড়াও না হোক কম করেও দুই মঞ্জিল। কতটা গভীর কেউ জানে না। মাঝে মাঝে কুমির ভেসে ওঠে। তীরে দাঁড়িয়ে আজমির দেখা যায়।

এখন বাদশা জাহাঙ্গীরের সারাটা গুলালবার দেখা যাচ্ছে। তাঁবুর পর তাঁবু। দশ খুঁটির ওপর খাড়া চৌবীন তাঁবু। শাহেনশা বাদশার নিজের ডুরাসানা-মঞ্জেল তাঁবুই দোতলা। নয় খুঁটির ওপর এই তাঁবুর দোতলায় শাহেনশা জাহাঙ্গীর নামাজ আদায় করেন। সূর্য উঠলে সেদিকে মাথা নুইয়ে জমিন বোস্ করেন। নিচের তলায় থাকেন বেগমরা। এছাড়াও দেখা যাচ্ছে নানান তাঁবু—খাট গা, সরাপর্দা, সামিয়ানা। কোনোটায় ফরাসখানা। কোনোটায় নফরখানা। কোনোটায় আবার কাশ্মীরী শরাব খাওয়ার আবদারখানা।

সূর্যের দিকে মাথা নুইয়ে বাদশা জাহাঙ্গীর জমিন বোস্ করলেন। তখনো তাঁর ঘরের ভেতর আগেনগারে গুগ্‌গুল পুড়ছিল নিভু আঁচে। সেই সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল সুগন্ধী গোকুলা ফুলের সুবাস। বেলে পাথরের থালায় গত রাতের সেঁউতি, চামেলী, কেতকীরা শুকিয়ে এলেও গন্ধের কোনো অভাব নেই।

জাহাঙ্গীরের মনে পড়ে গেল—হিন্দুস্থান এক আজীব দেশ। এখানে এত রকমের ফুল! সব ফুলগাছের একটি করে পাতা নিয়ে ওজন করলে মোট ছয় মণে গিয়ে দাঁড়াবে। তাজ্জব!

এইবার বাদশার ছাউনি পুরোটা দেখা যাচ্ছে। যেন বা একটি চলন্ত জনপদ এইমাত্র জেগে উঠেছে। তা মনে হবেই বা না কেন!

এখন ১০২৪ হিজরির মহরম মাস। বাদশার তোপখানার মীর আতিশ-ফিরঙ্গি রডরিগোর কাছে এটা ১৬১৫ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি। শাহী দরবারে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ 'ভামিনী-বিলাস' শেষ করতে চান বৈশাখী পূর্ণিমার আগে। মাঝে হাতে মোটে চৈত্র মাসটা। তার মানে এখন ফাল্গুন। কাল রাতে

চাঁদের আলোয় চন্দ্রকান্ত পাথর বসানো ছিল। তাতে শুষে নেওয়া রাতের শিশির জমা হচ্ছিল লাল পাথুরে বাটিতে। শাহী শরবত হবে।

আন্নাসাগরের তীর জুড়ে যতদূর দেখা যায় মানুষ আর মানুষ। দুই সারি তাঁবুর মাঝখানের গলির মাথায় এক বন্দে চারজন করে ঘোড়সওয়ারের উদ্ধত মাথা। আর সেই সঙ্গে টগবগাবগ্। এর চেয়ে হাতির চলাচলে শব্দটা অনেক কম। কিন্তু দাপট অনেক বেশি। মঞ্জোলা হাতির দল সার বেঁধে আন্নাসাগরে চান করতে চলেছে। সঙ্গে মাহুত। মেঠ আর ভৈ। হাতির সামনের পায়ের সঙ্গে আড়াআড়ি করে পেছনের পা শেকলে বাঁধা। মাথায় ঝালর। উটের কাতার সামলাতে ব্যস্ত সারবানের দল।

বাদশার তাঁবুর পর তাঁবু দিয়ে গড়ে ওঠা এই চলন্ত শহর হুকুমের ইশারায় যারা খাটায়—যারা গোটায়—সেই সব তুর্কী আর তাতার মজুর, ফরাস, মুটে মিলেই প্রায় হাজার তিনেক। শ'খানেক ভিস্তি সবসময় জল তুলছে আন্নাসাগর থেকে—আর তা টেনে এনে ঢেলে দিচ্ছে নর্দমা, নালায়। সে সব সাফসুতরো রাখতেই শ' দুই মেথরের হিমসিম দশা। এর ওপর রয়েছে গুচ্ছের দর্জি। চামার। কামারও বাদ নেই।

আলা হজরত জাহাঙ্গীর বাদশার নজর টাঙ্গন ঘোড়ার ওপর। সুবে বাংলার উত্তরের দিকে কোচবিহারে পাহাড়ী ভুটানি ঘোড়ার সঙ্গে তুর্কী ঘোড়ার মাখামাখিতে এই টাঙ্গন ঘোড়ার জন্ম। এরা খাটিয়ে—চেহারাটাও দেখার মতো। ইরাকি, ইরানি, তাজি, বাদাকশান, তুর্কী, জংলা ঘোড়ার দঙ্গলে এদের দেখলেই চেনা যাবে। বাদশার হুকুমে ওদের নাল-রেকাব সবই আলাদা। যে পুরুষ মানুষ ঘোড়ায় চড়তে জানে না—সে পুরুষমানুষই নয়। এই হলো গিয়ে আগ্রা-দিল্লি-আজমির, লাহোরের চাল। কেননা, অশ্ব যস্য জয়স্তস্য!

কোনো মানী মনসবদার হয়তো চলেছেন। তার আগে আগে ঘোড়সওয়াররা লাঠি ঘুরিয়ে 'দূর পাশ' বলতে বলতে রাস্তা খালি করে দিয়ে এগোচ্ছে। নহবতখানা থেকে এইমাত্র আলক-দুন্দুভি, ভেরী-পণব-বিষাণ দিগন্ত কাঁপিয়ে বেজে উঠলো। দামামা, নাগরা, ঢোল, সানাই, শিঙ্গাও থেমে নেই। মাঝে মাঝে ছোট দামামা বাংলা দগরের আওয়াজ। সেই সঙ্গে বাঁশি।

বর্ম আঁটা যোদ্ধা দেখতে উৎসুক মানুষের জোয়ার। এখন আগ্রার অর্ধেকেরও সমান নয় বাগদাদ বা ইস্পাহান। সেই আগ্রার মাথার মণি খোদ জাহাঙ্গীর যে এদানী আন্নাসাগরের তীরে তাঁবু ফেলে আছেন, তা এখানেই তো এখন জগৎ। দিনের শুরুতেই যে মেলা জমে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

তুর্কী, পাঠান, রাজপুত, ইরাকিদের নিয়েই মনসবদারদের বাহিনী। শাহী ফৌজেরও বড় ভাগ রাজপুত, মানে রাঠোর, শিশোদিয়া, কচ্ছিদের নিয়েই গড়ে উঠেছে। কিন্তু শাহেনশা আকবরের সময় থেকেই সিংহাসনের সবচেয়ে বড় তাগদ—জমিনদারি ফৌজ। হিন্দুস্থানে ছড়ানো হাজার হাজার জমিনদারের তাঁবে গড়ে ওঠা এই ফৌজে লস্করের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। প্রায় চল্লিশ লাখের

মতো। মফস্বলের গেরস্থ বাড়ির ছেলেদের নিয়েই এই ফৌজ। সেরকম কিছু লস্করও গাঁ থেকে এসে আন্নাসাগরের তীরে খোদ বাদশার তাবিনে মোতায়েন হয়েছে।

ওরা অনেকেই মোগলাই ঠাঁই দেখেনি। তাই গাঁয়ের দেহাতী সেপাইয়ের জংলী বে-তমিজি, বেকুব চাহুনি, সব জায়গায় বেপরোয়া নাক গলিয়ে ধমক খেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা দশা আমুদে নাগরিকদের হাসির খোরাক জুগিয়ে চলেছে।

ধড়িবাজরা দাঁও মারার মতলবে বেরিয়ে পড়েছে। রাস্তার দু'ধারে গাছ-তলায়, মোটা ময়লা চাঁদিনার ছায়ায় ঠক জোচ্চররা বসে গেছে। যেখানে মানুষ সেখানেই হৈ-হুল্লোড়। তামাশা, ঠকবাজি, বাজিকরের বাঁশ পেটানো হাপু খেলার ডুগডুগি। বেদে ঝাঁপি খুলে বাঁশিতে ফুঁ দিলো। দড়ি-বাঁধা মোগলাই পোশাকে মিঁয়া-বিবির নকলে বাঁদরের আশনাই। তরমুজ খরমুজার ফালি—গরম গরম বাসি শিককাবাব, রুপোলি তবকমোড়া হালুয়াইর পচা মিঠাই, দহি-বড়ার কাঠের থালায় মানুষে-মাছিতে লড়াই, হজমি সোঁউ-কা-পানির মটকা, তেলেভাজা কচুরির ঝুড়ি, পান, শরবত আর বারোয়ারি হুকা চিলমচির কড়া ধোঁয়ায় সকালটাই জমজমাট।

কাছেই তালপাতার বড় ছাতা নয়তো টাটের নিচে তিলক কাটা যোশীর পঞ্জিকা, রাশিচক্র, পাশা। তারই পাশে সাদা পাগড়িওয়ালা নজুমীরের দাড়ি, দোয়া, তাবিজ, আর ইউনানি ছক। ঠিক উল্টোদিকে ফাল্গুনের চড়া কিন্তু আরামী রোদে অথর্ব এক ফিরঙ্গি বসে। তার সামনে সামুদ্রিক মানচিত্র আর কম্পাস। তারই দৌলতে মানুষজনের ভাগ্য গুণে বলার ফিকির। যা আসে! দুই দাম কিংবা একটি টাকা।

কোথাও বা ভণ্ড ফকির-দরবেশের বত্রিশ তালি ময়লা খিরকা জোব্বা গায়ে আল্লার নামে খয়রাতের চিৎকার জুড়েছে। রাস্তার আসরে বুড়ি নাচওয়ালির নীল সবুজ ঘাগরার পেশম সোনালি আঙ্গিয়া কুর্তি বাসন্তী রঙের ওড়নায় জরির ঝলমল বাহার, চোখে সুরমা দাঁতে মিশি, গায়ে গিল্টির গয়না, হাবভাবের মিছে চেষ্টা, ফাটা গলা, পা-জেব-ঘুংঘুরুর আওয়াজ—তবু খদ্দের সমঝদারের খামতি নেই।

পরকাল ভেবে ভেবে একাকার হিন্দু সেপাই চড়া রোদে মেলার ভিড়ে পথের শেষ সম্বল খুঁজতে খুঁজতে কুমোরের মাটির পুতুলের ঝাঁকার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। কিষণজি সীতারামজি হনুমানজির ওপর দাম কষাকষি চলছে। হরেক রকমের মালার দোকানে ভিড়। মালা ছাড়া মুক্তি নেই। কেউ গলায়—কেউ হাতে মালা ঝুলিয়ে ভাবনাশূন্য মনে আনন্দসাগরে ভাসতে ভাসতে বাদশা দর্শনে চলেছে।

ভোরের নামাজ আদায় করে শাহেনশা জাহাঙ্গীর উঠে দাঁড়ালেন। এখন তিনি দর্শন ঝরোকার সামনে যাবেন। হিন্দুস্থানের বাদশাকে নিত্যদিন—যেখানেই থাকুন—দিনের শুরুতে একবার তাঁকে এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়াতেই হবে—যেখানে তাঁকে সবাই দেখতে পাবে। দেখে নিশ্চিন্ত হবে।

স্বস্তি পাবে। বুঝতে পারবে—হিন্দুস্থান থেমে নেই। না—বাদশা আছেন। শুধু তাই নয়—দেশের মানুষ তাঁকে দেখে মানত করে। কারও ছেলের খুব অসুখ। সে এসে খানিকটা জল বাদশার নামে ধরবে। যত কাজই থাকুক—সব ফেলে বাদশা সেই জলের দিকে ওপর থেকে একবার তাকাবেন। জলের ওপর নিজের নিঃশ্বাস ফেলবেন। সে জল ঘরে নিয়ে গিয়ে রুগীকে খাওয়ানো হবে। আজ অবশ্য তেমন কেউ আসেনি। আন্নাসাগরের তীর ঘেঁষে ধুলোর ছটা আকাশ ধরে অনেকটা উঠেছে। এক ঝাঁক ঘোড়সওয়ারের টগবগানো ঘোড়ার ক্ষুরে ক্ষুরে এই ধুলোর জাল। তাতে পরিষ্কার রোদ পড়ে এক রঙ্গিলা ছবি। বাদশা সবই পরিষ্কার দেখতে পান। তাঁর শরীর ভোগে লালচে—হাত দু'খানি শক্তসমর্থ। বয়স এই ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ। দূরের আকাশে তাকিয়ে সেলিম জাহাঙ্গীরের কপালে ভাঁজ পড়লো। মেবার থেকে এখনো তো কোনো খবর এলো না। বাবা খুর্রমের কাছ থেকে তো কোনো কাসীদ এসে পৌঁছলো না।

ঠিক এইসময় ডুরাসানা-মঞ্জেলের সামনের মাটিতে একজন কাসীদ ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ালো। এরা হিন্দুস্থানের কোণায় কোণায় ছড়িয়ে আছে। সবার আগে ছুটতে ছুটতে এসে খবরাখবর দেয়। নজর রাখে। আগাম এসে সব জানায়। কাসীদরা বাদশার খাস তাবিনের গোয়েন্দাও বটে। ডান হাত এগিয়ে দিয়ে তার ওপর মাথা রেখে কাসীদ কোমর থেকে মাথা অব্দি তার শরীর নোয়ালো। এভাবে শাহী কুর্নিশ করে লোকটি তসলিম জানালো। শেষে বললো, মথুরার তিন মঞ্জিল দক্ষিণে মাঠ-চাষীরা কর দেবে না বলে একজোট হয়েছে। ফৌজদার রজব খাঁর তিনজন ঘোড়সওয়ারকে কোতল করেছে। ফৌজদারের ধানুকী পায়দল সেপাইরা এঁটে উঠতে পারছে না।

কথা শেষ হলে কাসীদ আবার কুর্নিশ করে চলে গেল। খবরটা দরবারি আখবরাতের জন্যে জমা হলো। সারাদিন ধরে এভাবে সারা হিন্দুস্থানের খবর এসে জমা হয়। সন্ধেবেলা বাদশা উজিরদের সঙ্গে দরবারে বসে সব শোনেন। কিন্তু মেবার থেকে তো কোনো খবর এলো না এখনো। বছর বারো আগে তখনকার শাহজাদা সেলিম জাহাঙ্গীরকে বাদশা আকবরের হুকুমে মেবারের মাথা তুলে ওঠা রাণা অমর সিংহকে ঠাণ্ডা করতে যেতে হয়েছিল। সে স্মৃতি খুব সুখের নয় বাদশা জাহাঙ্গীরের। আরাবল্লির পাহাড়ী ইঁদুর রাণা অমর সিংহ তাকে কাবু করে ফেলেছিল। কোনোরকমে মান বাঁচিয়ে সেলিম পালিয়ে এসেছিলেন। তখন তিনি দশ হাজারী মনসবদার। এলাহাবাদের সুবেদার। হিন্দুস্থানের ভাবী বাদশা। তখন তার ওয়ালিদ-ই খোদ আকবর বাদশাই বিছানা নিয়েছেন। হিন্দুস্থানের আকাশে মেঘ। উজিরদের অনেকেই সেলিমকে সিংহাসনে চান না। মানসিংহ তো পরিষ্কার জানিয়েই দিয়েছেন—সিংহাসনে তিনি সেলিমের জায়গায় তাঁর বড় ছেলে খসরুকেই দেখতে চান।

সেসব দিনের মেঘ কবেই কেটে গেছে। জাহাঙ্গীরের বাদশাহী দশ বছরে পা দিয়েছে। ঢাকা থেকে কাবুল অব্দি তাঁর ফরমান চলে এখন। কিন্তু হায়!

রাজপুতানার সামান্য রাজ্য মেবার সেই কবে আকবার বাদশার আমলে বাগী হয়েছিল—মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল রাণা উদয় সিংহ—তার ছেলে রাণা প্রতাপ জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েও যুদ্ধ চালাতে লাগলো—এখন তার ছেলে অমর সিংহও সেই একই পথে চলেছে। ওদের ঠাণ্ডা না করে বাদশা জাহাঙ্গীরের শান্তি নেই —স্বস্তি নেই! মনে হয় বাদশাহী মুকুটে কোত্থেকে একটা বাদুলে পোকা এসে বসে আছে। এ জন্যেই তিনি আজ তিন বছর হলো আন্নাসাগরের তীরে এই ছাউনি ফেলে বসে আছেন। শাহজাদা বাবা খুর্রমের হাতে বিরাট মোগল লস্করের দল পাঠিয়েছেন উদয়পুরে। হুকুম আছে—চিতোর দুর্গ গুঁড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু এখনো কোনো খবর আসছে না কেন? এবারও কি মেবারের রাণাদের কাছে মোগল সূর্যের আলো পৌঁছিতে পারবে না?

পূবে ঢাকা—পশ্চিমে কাবুল, উত্তরে কাশ্মীর, দক্ষিণে বিজাপুর গোলকুণ্ডা—কোথাও ফরগনার চাঘতাই বংশের সমসের কেউ আটকাতে পারেনি। আমার রক্তে যেমন আছেন তৈমুর—তেমনই আছেন চেঙ্গিস। আমি রাণা অমর সিংহকে কাবু করতে না পেরে এলাহাবাদে ফিরে গিয়েছিলাম। বাবা খুর্রমও কি ফিরে আসবে? বাদশার কপাল আবার কুঁচকে উঠলো।

জীবনটা এমনিতে আনন্দেরই লাগে বাদশা জাহাঙ্গীরের। বিরাট এই হিন্দুস্থানে তাঁরই ইচ্ছা শেষ ইচ্ছা। আব্বা হুজুর বাদশা আকবর বেঁচে থাকতেই আমি সিংহাসনের দিকে তাকাই। সেজন্যে আমাকে তিনি চরম শাস্তি দিতে পারতেন। দেননি। বরং তাঁরই ইচ্ছাতে আমি আজ দশ বছর হলো হিন্দুস্থানের বাদশা। আমার বাতাসে কস্তুরী জাফরানের গন্ধ। আমার আকাশে সব সময় নানা রঙের ঘুড়ি ওড়ে।

দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস গরম হয়ে উঠেছে। রাঠোরি আর কচ্ছি, রাজপুতদের দেশ এই আজমির। এখানকার মাঠে মাঠে এখন পেকে ওঠা বাজরার শিষ কেটে তোলার অপেক্ষায়। তাই বাদশা জাহাঙ্গীর এখান থেকেই শাহজাদা খুর্রমকে সাবধান করে দিয়েছেন—মেবার অভিযান করতে গিয়ে শাহজাদা যেন ফসলের মাঠে ছাউনি না ফেলেন। যদি একান্তই ফেলতে হয় তো—সে মাঠের চাষীকে যেন সরকারি খাজাঞ্চীখানা থেকে আশরফি আর রুপেয়ায় তার লোকসান পুষিয়ে দেওয়া হয়। এ নিয়ম বেঁধে দিয়ে গেছেন আলা হজরত বাদশা জালাউদ্দিন আকবর। সে নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন জাহাঙ্গীর। এই আন্নাসাগরের তীরে বসেই বাদশা জাহাঙ্গীর শাহজাদা খুর্রমকে মেবার অভিযানে পাঠিয়ে খুঁটিনাটি হুকুম থেকে পরামর্শ—সবই দিয়ে চলেছেন।

ছেলের যাতে জয় হয় সে জন্যে তিনি আজমিরে খাজা সাহেবের বরকতে দোয়া করেছেন। দোয়া করতে বসে কী খেয়াল হওয়ায় নিজের দুই কানও ফুঁড়িয়েছেন। খাজা সাহেবের সাক্ষাৎ চেলা এখন হিন্দুস্থানের বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীর। তার ফোঁড়ানো কানে শাহী কুণ্ডল। বাদশার মন পাওয়ার জন্যে নিত্যদিন যেসব আমীর ওমরাহ দরবারে আসেন—তাঁরাও কেউ কেউ কান

ফুঁড়িয়েছেন। বাদশার দেখাদেখি তাঁদেরও কানে কানে এখন কুণ্ডল উঠেছে।

ওয়াকেনবীশ এসে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে বাদশাকে কুর্নিশ করলো। তসলিম জানালো। বাদশা তার চোখে তাকালেন। তার মানে—কাল রাতে শুয়ে পড়ার পর থেকে এই সকাল অব্দি হিন্দুস্থানের নানান জায়গা থেকে যেসব খবর নিয়ে এসেছেন কাসীদ গোয়েন্দা আর কবুতরের দল—তা এখনি বাদশাকে ওয়াকিফহাল করা হোক। আব্বা হুজুর যে কত কি জানতেন! এ ব্যবস্থারও চল হয়েছে আকবর বাদশার সময় থেকে। খবর আসে। জমা হয়। দরবারি আখবরাতে সারাদিনের খবর সাজিয়ে সন্ধেবেলা বাদশাকে শোনানোই ওয়াকেনবীশী কানুন।

ওয়াকেনবীশ যে দুটো খবর জানালো—তা খুবই চিন্তায় ফেলার মতো—জরুরিও বটে। খবর শুনে তখন তখনই বাদশাকে হুকুমও জারি করতে হয়। এমনই খবর যে জন্যে বাদশা দরবারি হুকুমনামা বের করানোর জন্যে সময় দিতে পারেন না। দিতে গেলে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

বিহার ছাড়িয়ে মোগল পতাকা এখন বাংলায় এগোচ্ছে। কোচ এলাকা পেরিয়ে কামরূপেও মোগলবাহিনী ঢুকে পড়েছে।

পয়লা খবরঃ ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে চাষী পাইকরা খাজনা দিচ্ছে না। খুন্তাঘাট থেকে পাইকরা কামরূপ অব্দি ছড়িয়ে পড়েছে। সরকারি ইজারাদাররা গিয়ে কোন থৈ পাচ্ছে না। রায়তরা বিষ খাইয়ে কয়েকজন ডিহিদারকে মেরে ফেলেছে।

খতে কবুলাৎ গেরেফতে অন পরগনাৎ রা ব মুসতাজিরন সোপরদ্।—বলতে বলতে বাদশা জানতে চাইলেন, মুস্তাজির ইজারাদারদের কথা বলো—

আলা হজরত কয়েকজন মুস্তাজিরও খুন হয়েছে।

বাদশার কপালে আবার কয়েকটা ভাঁজ পড়লো। হিন্দুস্থান এত বড়—তার সব জায়গায় তিনি একই সঙ্গে হাজির থাকতে পারেন না। সে-কাজ পারেন শুধু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্। আর পারতো আমার আওলাদরা। শাহজাদা খুর্রমের মতো অন্যদেরও যদি অভিযানে পাঠাতে পারতাম! তারা যেন আমারই হয়ে আমাকে ফতেজং করাতো। যেমন কিনা আব্বা হুজুর তাঁর হয়ে আমাকে পাঠিয়েছিলেন মেবারে। যদিও সেখানে সেবারে আমি জং ফতে না করেই ইলাহাবাদে ফিরে গিয়েছিলাম। আব্বা হুজুর আমাদের ওপর খুব আশা রাখতেন। আমরা তিন শাহজাদা—আমি, মুরাদ, দানিয়েল—তাঁর আশা মেটাতে পারিনি। তিনি থাকতেই মুরাদ চলে গেল। চলে গেল দানিয়েল। আল্লায় মেহেরবান—থেকে গেছি আমি। আজ আমি হিন্দুস্থানের বাদশা।

বাদশার চোখ এখন আন্নাসাগরের জলের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওয়াকেনবীশ তার মুখে তাকিয়ে। বাদশার মুখের কথাই হুকুম। বাদশার মুখের কথাই ইতিহাস। বাদশা বলবেন—আর সঙ্গে সঙ্গে তা লেখা হয়ে যাবে। তা-ই নিয়ম।

জাহাঙ্গীর নিজেকে এখন আকবরের জায়গায় বসিয়ে ভাবছিলেন—আমার তো চার আওলাদ—চার শাহজাদা। খসরু, পরভেজ, খুররম, শারিয়ার। খুররমকে পাঠিয়েছি মেবারে। খসরুকে পাঠাতে পারতাম বাংলা মুলুকে—খুন্তাঘাটে পাইক রায়তদের বেয়াদপি গুঁড়িয়ে দিতে। কিন্তু তা হবার নয় ইনসাআল্লার ইচ্ছায়।

সে জন্যে আমিই দায়ী। আমিই দায়ী।

ওয়াকেনবীশ দেখলো, বাদশা ডান হাত মুঠো করে নিজেরই কপালে দু'দুবার ঠেকালেন। চোখ কুঁচকে এসেছে। ডান গালে চোখের জলের ফোঁটা।

ওয়াকেনবীশ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। সে কখনো বাদশার চোখে জল দেখেনি। বাদশার চোখে জলের কথা কখনো শোনেওনি সে। সে নিজে হিন্দুস্থানের নিত্যদিনের নিত্যসাক্ষী। রোজকার হাজারো সন্দেশের দরবারি আখবরাৎ লিখে লিখে সে নিজেও কখন খানিকটা ইতিহাস হয়ে পড়েছে। আসলে সব মানুষই বোধহয় ইতিহাস। সে ইতিহাস যখন মজিয়ে ফেলার মতো করে লেখা হয়—তখন তা হয়ে দাঁড়ায় কহানী।

যদি খসরু সিংহাসনের দিকে না তাকাতো। সে-জন্যে অন্ধ করে দিতে যদি তার চোখে আকন্দর আঠা লাগানোর হুকুম না দিতাম। যদি খসরু অন্ধ হয়ে না যেতো। হায় আল্লা! আমার বড় আওলাদ খসরু—তাগড়া, আলিশান জোয়ান—শাহজাদা খসরু আমারই হুকুমে আজ অন্ধ, বন্দী। আমিই দায়ী। হেকিম আবদুল হাজি সিরাজী তো বলেছে, দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছে শাহজাদা। খসরু যদি দৃষ্টি ফিরে পায় তো ওকেও অভিযানে পাঠানো যাবে। একটু একটু করে ও আবার দুনিয়ার আলো দেখুক। এই খুন্তাঘাটেই ওকে পাঠাতে পারতাম। বিসমিল্লাহ রহমানে রহিম। খসরু ফের এই দুনিয়া দেখতে পাচ্ছে। যদি সবটা দেখতে পায় একদিন—তাহলে হেকিম আবদুল হাজি সিরাজীকে দিল্লির কাছে বিলোচপুর জায়গীর ইনাম দেবো।

পরভেজ অপদার্থ। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না। আর শারিয়ার! সে তো এখন বালক মাত্র। যে-বছর আমি বাদশা হলাম সে বছর শারিয়ার দুনিয়ার নূর দেখতে পেল। তাই ভরসা একমাত্র খুররম। কিন্তু সেই খুররমের চোখে তাকাতেই আজকাল ভরসা হয় না বাদশা জাহাঙ্গীরের। সবসময় সে চোখে যেন কিসের খেলা চলছে।

অথচ এই খুররমকে মেবারে পাঠিয়ে তারই ফতে জং দোয়া করে কয়েক মাস আগে ওই আজমিরে খাজা সাহেবের বরকতে খিচড়ি চড়ানো হলো। কিস্সা-কাহানীর গপ্সপের মতোই এক জোড়া ডেগ্ এলো আগ্রা থেকে। এক একটা ডেগে চাপানো হলো সওয়া শো মণ করে সেরা দেওয়ান প্রসাদ চাল আর নাখদ ডাল। খাজা সাহেবের মকবারার উঠোনে উনুন ধরালেন হিন্দুস্থানের বাদশা বেগম খোদ নূরজাহান। সে ছবি শুধু আমি দেখেছি। রান্না হয়ে গেলে মইয়ে চড়ে প্রথম থালা খিচড়ি আমি নামাই। সেদিন খুররমের ফতেজং দোয়া করে হাজার পাঁচেক কাঙালকে খাওয়ানো হয়েছিল।

অথচ সেই খুর্রম ? হাত নাড়লেন বাদশা।

ওয়াকেনবীশ গড়গড় করে বলতে লাগলো, এইসব পাইক জমিনদার সেনাদলে ভালো ধনুকবাজ শেখ ইব্রাহিম ভালো করে খেয়াল রাখেননি। মনসবদার আলমাবেগ খুন হয়েছেন। রাঙামাটি অব্দি এখন পাইকদের কব্জায়। পাণ্ডা হলো পাইক সর্দার সনাতন। সে ধমধমা দুর্গ থেকে লড়াই চালাচ্ছে। যাতে দুর্গে খাবার না যেতে পারে—সে জন্যে মির্জা নাথন আশ-পাশের গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন—আলা হজরত।

দম নেবার জন্যে ওয়াকেনবীশ থামলো।

দুসরা খবরঃ আসামের জঙ্গলে মোগল তোপখানার ভারি ভারি কামান বয়ে নিয়ে যেতে হাতির খুব দরকার। খুন্তাঘাটের কাছাকাছি বকির খান পাইকদের নিয়ে হাতি ধরছিলেন। কয়েকটা হাতি বন্দীও হয়। পাইকদের গাফিলতিতে কিছু হাতি পালিয়ে যায়। কিছু হাতিখেদা সর্দারকে বকির খান ফাঁসি দিলেন। বাকি লোকদের কোড়া মারা হলো। বকির খান হুকুম দিলেন —হয় পালিয়ে যাওয়া হাতিদের ধরে নিয়ে এসো—হর খিলি হাজার রুপয়ে— নয়তো হাতি পিছু হাজার রুপেয়া করে দাও।

পাইকরা গোটা এলাকার আম জনতাকে খেপিয়ে তুললো। রাতে হামলা হলো! বকির খানকে জ্যান্ত ধরা হলো—বকির রা জিনদে গেরেফতে— দু'টুকরো করে কাটা হলো। পাইক হামলায় মোগল সেপাইদের মেরে ফেলা হলো। বাকিরা হলো বন্দী। বাদশার হাতিগুলো বাজেয়াপ্ত করা হলো। হাতিখেদা এক পাইক সর্দার নিজেকে রাজা বলে ঢেঁড়া পিটিয়ে দিলো— ইয়েকি আজ সরদারনে খিলগির রা ব রাজগি বরদাশতে—

ওয়াকেনবীশের আর পড়া হলো না। দোতলা এই তাঁবুর ঘরের পর্দার পেছন থেকে দু'জন খিদমতগার ছুটে এলো। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বাদশা গদিতে বসে পড়েছেন। এই দুই খিদমতগারের ভেতর এক গোলাম ওয়াকে-নবীশের খুবই চেনা। লোকটা তার বাড়িতে চুরি করতে এসে বমাল ধরা পড়ে। কানুন মোতাবেক লোকটাকে ওয়াকেনবীশ গোলাম হিসাবে পায়। ইচ্ছে করলে ওকে বাজারে বেচে কয়েক মোহর পেতেও পারতো ওয়াকেনবীশ। মোহরের দর পড়ে গেছে আকবর বাদশা চলে যাওয়ার পর। এখন নয় রুপেয়ায় এক মোহর। গোলামটা খুব বাধ্যক। ওয়াকেনবীশ ওকে বাদশার খিদমতগারে ভর্তি করে দেয়। ফতেজং-এর বন্দীরা, চোর, খুনীরাই হিন্দুস্থানে গোলাম হয়। গোলাম হয় ওদের ছেলেরা। আর অভাবে পড়ে অনেকে গোলাম হয়। তা লোকটা এখন বাদশার সামনে সোনার কৌটো খুলে দুই গুলি আফিম বের করে দিলো। দিলো রাতের শিশির জমানো শরবত। খেয়ে বাদশা সুস্থির হতে না হতে অন্য গোলাম রেকাবি ভর্তি খোবানী এগিয়ে ধরলো। একখানা মুখে দিয়ে বাদশা এবার চোখ খুললেন। স্থির দৃষ্টি।

ওয়াকেনবীশ বাদশার হাল হকিকতের খবর রাখে। সে এবার সোজা হয়ে বসলো। গোলাম দুজন বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। এরাই রাজধানীর

বাইরে বাদশার সুবা সফরের সময় পাহারাদারি করে। জিনিসপত্তর জায়গারটা জায়গায় গুছিয়ে রাখে। বাদশার কখন কি দরকার তা জানে। একটা আঙুর পড়ে গেলেও তুলে রাখে। ফেলবার হলে ফেলবেন বাদশা।

আহেদী কোন লেফাফা ?

বাদশার এ কথায় ওয়াকেনবীশ একখানা চিঠি মেলে ধরলো। যেসব জানবাজ লড়াকু বয়স কম বলে মনসব পাওয়ার উপযুক্ত হয়নি—তারাই আহেদী। মোগল বাহিনীর এরাই মাখন। সেরকম এক আহেদী—বকির খানের ডান হাত—লিখছে—

কুতে আন্দিশে—সমাজবিরোধীদের শায়েস্তা করতে আমি ওদের গাঁয়ে হামলা করলাম। ওরা খাজনা দেয়নি। মোগল রক্তপাত করেছে। ওরা আমার আসার কথা শুনেই জমায়েত হয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়লো। আমাদের জন্যে ওৎ পেতে অপেক্ষা করতে থাকলো। এই খবর পেয়ে দীন দুনিয়ার মালিক শাহেনশা আপনার এই সামান্য গোলাম সব জায়গা থেকে জঙ্গল কাটানোর লোক আনিয়ে জঙ্গল কাটাতে শুরু করলো। জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা এইসব কুতে আন্দিশে বীর সেপাইদের ঘেরাওয়ে আটকে পড়ে—তোফানগু আন্দাজিওয়া তীরবাজি—বন্দুক তীর দুইই চালাতে লাগলো। তবু শেষ অব্দি ওরা হতাশ হয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলো। জঙ্গে আজিম—প্রচণ্ড লড়াই শুরু হলো। আমাদের দেড়শো জন শহিদ হয়েছে। ওরা প্রায় হাজার জন নিহত হয়ে জাহান্নমে গেল। ঘোড়সওয়ারদের নিয়ে এবার গাঁয়ে ঢুকলাম। ওরা বাচ্চা কাচ্চা সমেত বাড়ির মেয়েদের নিয়ে জঙ্গলে পালিয়েছিল। ঘোড়সওয়াররা গাঁয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিলো। মেয়ে ও শিশুদের কয়েদ করা হলো।

ব্যস কর।

ওয়াকেনবীশ থামলো। দেখলো বাদশা চোখ বুজে ফেলেছেন।

জাহাঙ্গীর তখন ভাবছিলেন—মানুষ বিদ্রোহ করে কেন? কি জন্যে? একশো বছর হয়ে গেল—লোদীরা আগ্রা দুর্গ বানিয়েছিল। এই এলাকায় বিদ্রোহ শায়েস্তা করতেই আগ্রা দুর্গ বানানো হয়। আব্বা হুজুর আকবর বাদশা একদিন কথায় কথায় একথা বলেছিলেন।

তাহলে কি সারা হিন্দুস্থানে জায়গায় জায়গায় আগ্রা দুর্গের মতো একটা করে দুর্গ বানাতে হবে। কেননা, রায়তীদের হামলা, খাজনা-বন্ধ তো সেই কবে থেকেই লেগে আছে। তা করতে হলে তো শাহী আশরফিখানা ফতুর হয়ে যাবে। শাহী খরচের জন্যে হিন্দুস্থানের সব জমিনের বিঘা পিছু দশ সের করে ধান, গম পাওয়া যায়। তাতে কি ওই দুর্গ-বিলাস চলতে পারে! এতকাল মুঘল শাসনের কড়াকড়ি তো ছিল মোটে চার সুবায়—দিল্লি, আগ্রা, লাহোর আর মুলতানে।

মানুষ বিদ্রোহ করে কেন? কামরান, আসকারি—দুই ভাইই তাঁদের ভাই বাদশা হুমায়ুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। আমি নিজেই আব্বা

হুজুরের রাজধানীর দিকে সেপাই লস্কর নিয়ে এগিয়েছিলাম। খসরু আমার সিংহাসনের দিকে ফিরে চেয়েছিল। খুর্রমের চোখে কী আছে জানি না।

আবার চোখ খুলে গেল বাদশার। লেখো—

ওয়াকেনবীশ হুকুমনামা লিখতে বসলো। এক্ষুনি এ-হুকুম আন্নাসাগরের তীর থেকে ব্রহ্মপুত্রের তীরে চলে যাবে।

বাদশা জাহাঙ্গীরের চোখে পলক পড়ছে না। তিনি তাঁর মুখ দিয়ে কালের শিলালিপি বলে যাচ্ছেন—

সেরা কিছু আহেদী নিয়ে চড়াও হও। উচিত শাস্তি দাও। কোতল ওয়া বনদ্ ওয়া তরাজ—খতম কর, কয়েদ কর, লুঠ কর। দুর্গ গুঁড়িয়ে দাও। মেয়ে ও শিশুদের গোলাম বানাও। জয়ী সেপাইরা লুঠের মাল যেন আগ্রায় নিয়ে আসে।

বাদশা উঠে দাঁড়ালেন। এবার তাঁর দৌলতখানায় যাবার সময় হয়েছে। হুকুম জারি করে তবিয়ৎ যেন এতক্ষণে ধাতে এলো।

এলাহাবাদের সুবেদার থাকতে থাকতেই শাহজাদা সেলিম জাহাঙ্গীর মদে মেতে ওঠেন। মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহের ছেলে অমর সিংহের হাতে নাস্তানাবুদ হয়ে সেই যে এলাহাবাদের ডেরায় তিনি ঢুকলেন—হিন্দুস্থানের বাদশা হবার জন্যে আকবর বাদশার ডাক না পাওয়া অব্দি তিনি মদে চুরচুর হয়ে থাকতেন। সেই সঙ্গে আহেলা নাচনেওয়ালীর দল লেগেই থাকতো। এই সময়েই তিনি তার মনসবীর ভাঁড়ার খান-ই-সামান রুকাবট খাঁয়ের হাতে তুলে দেন। এই খান-ই-সামান রুকাবট আসলে বল্ক-এর মানুষ। চীন থেকে আনা আফিমের কারবার ছিল তার বল্কে। মোগল সেনাদলের জন্যে বদকশান থেকে ঘোড়া আমদানির সময় রুকাবট ঘোড়ার দলের সঙ্গে চোরাই পথে সেই আফিম হিন্দুস্থানে আমদানি করতো। ওপর ওপর রুকাবট সুবেদার সেলিমের খান-ই-সামান। ভেতরে ভেতরে তার ফেঁপে ওঠা আফিমের কারবার। সে-ই শাহজাদা সেলিমকে এলাহাবাদে থাকতে আফিম ধরিয়েছিল। মদ, মেয়েমানুষ, আফিম আর ফুর্তিতে আর কিছুদিন মেতে থাকলে সেলিমের দশা তার দুই ভাই মুরাদ আর দানিয়েলের মতোই হতো। ভাগ্যিস আলা হজরত আকবর বাদশা তাকে বাদশাহীতে বসানোর জন্যে আগ্রায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। নয়তো ·····

রুকাবট খাঁয়ের হাতের গুণে শাহজাদা সেলিমের সকাল বেলাতেই আফিমের অভ্যেস হয়ে যায়। নাস্তা করার আগেই। বলা যায় খালি পেটে। পিত্তরক্ষার জন্যে সঙ্গে কিছু আঙুর নয়তো খোবানী। ব্যস্। এতেই আরাম। এতেই মৌতাত। শাহী শরীরের ভেতরটা তখন যেন কী কুরে কুরে খায়। এরই নাম আরাম।

সেই মৌতাতের ঝোঁকেই হিন্দুস্থানের বাদশা দৌলতখানায় এসে ঢুকলেন! তখনো তার মাথার ভেতর শাহী হাতিকে চাঙ্গা করার মতো কীলক ধাঁচে একটা জিজ্ঞাসাই খোঁচা দিচ্ছিল—মানুষ বিদ্রোহ করে কেন? মানুষ হামলা করে

কেন? চড়াও হয় কেন? বাধ্য থাকে না কেন? কেন জানবাজ, তীরবাজ, তোফানগ্‌বাজ হয়ে ওঠে? কুতে অগ্নিদশে হয়ে ওঠে কেন? বাধিয়ে বসে জঙ্গে আজিম!

অথচ দীন দুনিয়ার মালিক রহমানে রহিম এই দুনিয়ার বাতাসে কস্তুরী জাফরানের গন্ধ মিশিয়ে রেখেছেন। মিশিয়ে রেখেছেন অগুরু চন্দনের সুবাস। ছাতি ভরে বাতাস টানো। ছিনা সাফা হোক। এক পেয়ালা সিরাজী আর শাদা ফুল ময়দায় এক টুকরো রুটি। আর কি চাই? সেলিম জাহাঙ্গীরের মাথার ভেতর আফিমের অদৃশ্য ঘোড়াটার ক্ষুরে ক্ষুরে এমন অনেক জিজ্ঞাসা, ছিঁড়ে যাওয়া টুকরো টুকরো ভাবনা ছড়িয়ে দিয়ে খোদ বাদশাকে বাস্তব আর অলীকের মিশে যাওয়া এক সীমানায় নিয়ে যাচ্ছিল।

ঠিক এই সময় 'জাঁহাপনা সলামৎ'! বলে কুর্নিশ করতে করতে মহাবত খাঁ এসে হাজির। ঠিক এই সময়ে আগ্রা ছেড়ে মহাবত খাঁর মতো বিশ্বাসী, দিলখোলা জাঁহাবাজ জংদার মানুষের একেবারে আগ্নাসাগরে ছুটে আসা ভালো লাগলো না জাহাঙ্গীরের। তিনি উসখুস করে উঠলেও সে ভাব যতটা পারা যায় চেপে রেখে চোখ তুলে তাকালেন। তার মানে কী ব্যাপার?

মহাবত হুকুম পেলে ইবলিশকেও এক হাত না দেখিয়ে ছাড়বার পাত্র নন। আব্বা হুজুর তখন বাদশা। সুবেদার সেলিম দিল্লির সিংহাসনের দিকে এগিয়েছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গী ছিলেন এই মহাবত খাঁ। উচিত কথা বলার বেপরোয়া হিম্মত রাখেন। গোঁয়ার, দুর্মুখ হলেও কাজের লোক। নিমকহারামী ধাতে নেই। বাদশার সামনে জমিন বোসু করে উঠে দাঁড়ালো মহাবত খাঁ।

আলা হজরত। একটা দাগমুণ্ডী ভেড়ার দাম সাড়ে ছে রুপেয়া। এক মণ সুখদোষ চাল একশো দাম। বারো দামে এক মণ গম মিলেছে। সেপাইদের কী খাওয়াবো? ঘোড়াই বা কী খাবে! মোহরের দর যে পড়ে যাচ্ছে--

জাহাঙ্গীর বাদশা ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন।

মহাবত খাঁ ভয় জানেন না। বললেন, আকবর বাদশা সব মোহরই গোল করে কাটাই করার হুকুম জারি করেন। সেই মতোই আগ্রায় কাবুলে এতদিন মোহর কাটাই হচ্ছিল। আপনি ফের চৌকো করে কাটাই করতে হুকুম দিলেন। আর মোহরের দর চড়চড় করে পড়ে গেল!

বাদশার মৌতাত একথায় কেটে গেল। ইঙ্গিতটা তিনি বুঝতে পেরেছেন। চাঘতাই মুঘল বাদশা বংশে এই প্রথম কোনো জেনানার নামে মোহর কাটাই হয়ে হিন্দুস্থানের বাজারে এসেছে। সেই জেনানার নাম নূরজাহান। বাদশাহের বেগম। সেলিম জাহাঙ্গীর আর নূরজাহানের নাম একত্রে নতুন মোহরে খোদাই হয়ে বাজারে এসেছে। আগের মোহরের থেকে ফারাক রাখতেই এসব মোহর আবার চৌকো করে কাটাই করতে হুকুম দিয়েছেন খোদ জাহাঙ্গীর।

মহাবত খাঁ বললেন, বাংলা মুলুকে হাওড়ার ঘুসুড়ি থেকে আরমানি ব্যাপারীরা লাসা গিয়েছিল কাপড় নিয়ে। দর পায়নি বিশেষ। ওখান থেকে ওরা সিংকিয়াং—পাঁচশো মঞ্জিল, রাস্তা উজিয়ে গিয়ে দেখে—হিন্দুস্থানের

মোহরের দর আরও পড়ে গেছে।

কেন? আমি তো দর বেঁধে দিয়েছি। নয় রুপেয়ায় এক মোহর।

আপনার হুকুম জাঁহাপনা হিন্দুস্থানে চলে। কিন্তু বাইরের ব্যাপারীরা শুনবে কেন? তারা তো বাজার দেখে দর দেবে! মনসবীতে ফি পুর্ণিমায় আপনি যে তঙ্কা দিচ্ছেন তাতে মাহুত, মেঠ, সহিস, ভিস্তি, সরবানদের মাইনে মিটিয়ে দিয়ে এই চড়া বাজারে তুর্কী ঘোড়ার চিরুনি, নাল, গামছা কী দিয়ে কিনবো! কী দিয়ে কিনবো এক কাতার উটের জন্যে যব গম—কী দিয়ে কিনবো মঙোলা হাতিদের ঘি, চিনি!

বাদশা বুঝলেন, মহাবত খাঁর ইঙ্গিতটা কোথায়। আব্বা হুজুর আকবর বাদশার মুরুব্বি, সেনাপতি—দুই-ই ছিলেন বইরাম খাঁ। বিশ্বাসী। আব্বা হুজুরের ভালো চাইতেন। তাকে সামলাতে আব্বা হুজুর শেষমেষ বিধান দেন—আপনার শেষ জীবনটা মক্কায় গিয়ে কাটান। মহাবতের মক্কা যাবার বয়স হয়নি। ওকে কাজেও লাগে। কোথায় পাঠানো যায় তাই ভেবে পেলেন না জাহাঙ্গীর।

ঠিক এই সময়টায় দুর্মুখ মহাবত খাঁ বলে বসলো, আলা হজরত! জেনানার আঁচলে দিন রাত ঝুলে থাকলে বাদশাহী ছারেখার হওয়া কিছু তাজ্জব ব্যাপার নয়।

একসঙ্গে অনেক কথা এসে গিয়েছিল জাহাঙ্গীরের মুখে। মহাবত মহা চটিতং। কারণও আছে। মসনদে বসার তিন বছরের মাথায় জাহাঙ্গীরের জীবনে নুরজাহান আসেন। তারও চার বছর বাদে নুরজাহান হয়ে দাঁড়ালেন হিন্দুস্থানের বাদশার পয়লা বেগম। এক পেয়ালা সিরাজী আর এক টুকরো রুটি—প্রায় এই হলেই বাদশার জীবনে আর কিছু চাই না। হ্যাঁ—চাই নুরজাহান বেগমের ভালোবাসা।

কানাঘুষো, সেই নুরজাহানই এখন হিন্দুস্থান চালান। তাঁর নামে মোহর এসেছে বাজারে। মোহর চৌকো? না, গোল? এই নিয়ে কথা পেড়ে মহাবত খাঁ আসলে কোথায় ঘা দিতে চান তা বুঝতে পেরেছেন বাদশা। হিন্দুস্থানের মানুষ—আগ্রা আজমিরের বাজারে হাটুরে লোকজন এখন তাকে নয়া আসিফ্ বলে থাকে—একথা শুনেছেন জাহাঙ্গীর।

ষাট হাজারি মনসবদার নুরজাহান বেগম এখন বাদশাহের আতালিক—বাদশার মুরুব্বি। তাঁর কথায় বাদশা ওঠেন বসেন। এমন মানুষের নামে মোহর কাটাই হওয়া আশ্চর্যের কি!

নুরজাহানের বাবা ইতিমাদ-উদ্দৌলা এখন উজির। নুরজাহানের ভাই আসফ খাঁ এখন উজিরে আজম। নুরজাহান বেগম খোদ বাদশার আতালিক। সেখানে মহাবত খাঁ মাত্র সাত হাজারি মনসবদার। মাস মাইনে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা। ফি পুর্ণিমায় সাড়ে বাইশ হাজার টাকা পেয়েও হাতির ঘি, উটের যব, ঘোড়ার দানা, বন্ধুকচীর পট্টি, ধানুকীর তীর যোগানো—মাইনে তো আছেই—কঠিন হয়ে পড়েছিল। কেননা, বাইরে থেকে আমদানি করা

ফল, বারুদ, কস্তুরীর দাম দিন দিন যে বেড়েই চলেছে।

তারও ওপর—বাদশা জাহাঙ্গীরের অজানা নয়—দুটো কারণে, বাদশার সুবেদারি জীবনের জিগরি সাগরিদ মহাবত খাঁ বেদম রেগে আছেন।

মহাবত খাঁ শাহজাদা পরভেজের আতালিক। বাদশার বড় ছেলে শাহজাদা খসরু যখন অন্ধ—তখন মসনদের সবচেয়ে বড় হকদার শাহজাদা পরভেজ। কিন্তু একথা কিছুতেই আমল দেয় না—শাহজাদা খুর্‌রম। আর সেই খুর্‌রমের সঙ্গেই নুরজাহান বেগম তার ভাই আসফ খাঁর মেয়ে আরজুমন্দ বেগমের বিয়ে দিলেন মহা ধুমধামে। সেই শাহজাদা খুর্‌রমকেই বাদশা মেবার অভিযানে পাঠালেন। পই পই করে নিষেধ করেছিলেন মহাবত খাঁ—

শাহজাদাকে মোগল সেনাদলের সুলুক সন্ধান জানতে দেওয়া ঠিক হবে না জাঁহাপনা—

জাহাঙ্গীর কানে তোলেননি সে কথা।

এত বড় খোঁচা দেবার পরেও নিশ্চুপ বাদশার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুচ্ছে না দেখে মহাবত খাঁ বেশ অনুযোগের সুরেই বললেন, দার-উল্-সুলতানত আগ্রা আজকাল দার-উল্-বরকত্ আজমিরের সৌভাগ্য দেখে ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরছে আলা হজরত।

কেন? আমি প্রায় তিন বছর হলো আজমিরের কাছেই ছাউনি ফেলে আছি বলে—

হ্যাঁ জাঁহাপনা। আপনিই হিন্দুস্থান—

হা হা করে হেসে উঠলেন জাহাঙ্গীর। তা কি করে হয় মহাবত! আগ্রায় ছ'লাখ মানুষের বাস। সেখানে দুশো তুর্কী হামাম। গাছের ছায়ায় ঢাকা চওড়া চওড়া বাদশাহী সড়ক। সত্তরটা মকবরা। আম জনতার জন্যে প্রায় বিশটা বাগ। আর আজমির! কী আছে তার? জওয়ার ভুট্টার মাঠ। আমলকি বন। উড়ন্ত ময়ূর। পুষ্কর যাওয়ার পথে ওই আন্নাসাগর—

বলতে বলতে জাহাঙ্গীর আন্নাসাগরের জলে তাকালেন। সেখানে ঢেউ উঠছিল। সেই ঢেউয়ের মাথায় রোদ্দুর। সেদিকে তাকিয়ে জাহাঙ্গীর বললেন, মোগলদের কথা একটাই—তখৎ ইয়া তাবুৎ—

জানি জাঁহাপনা। হয় তখৎ—না হয় ফাঁসিকাঠের তক্তা।

চাঘতাই বংশের আমরা জানি তাগদ কাকে বলে। যাকে বলে জং—হামলা—লড়াই—একথা বলতে বলতে বাদশা জাহাঙ্গীর মহাবত খাঁর চোখে সরাসরি তাকালেন, আওরত মানে কী জানেন?

মহাবতের চোখ কেঁপে গেল। কোনো কথা বলতে পারলো না।

বাদশা ফের বলে উঠলেন, আপনি তো বড় যোদ্ধা। ইশক্ কাকে বলে বলুন তো?

এবারও মহাবত খাঁ কোনো কথা বলতে পারলেন না।

॥ দুই ॥

জাহাঙ্গীর বাদশার খাস তাঁবের লড়াকু ঘোড়সওয়ার মীর সফির বয়স বড়জোর এখন ছাব্বিশ। দিনের আলোয় দেখলে আরও কম মনে হবে। আঠারো বছর বয়সে বাদশার আফগান মনসবদার নজবুল খাঁয়ের ঘোড়সওয়ার দলে সে সওয়ার হয়ে ভর্তি হয়েছিল। ঘরবাড়ি কান্দাহারের কাছে হেলমন্দ নদীর পাড়ে। গোড়ায় মাস মাইনে ছিল পঁচিশ রুপেয়া। তুর্কী ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে সে একদিনে বারো মঞ্জিল রাস্তাও পাড়ি দিয়েছে একসময়।

এই আট বছরে মীর সফিকে অনেক রাস্তা পাড়ি দিতে হয়েছে। এখন তার মাসমাইনে পাঁচশো রুপেয়া ছাড়িয়ে গিয়েছে। সে একজন আহেদি। আগে একজন আহেদির তাঁবে দশজন ঘোড়সওয়ার থাকতো। বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীরের আমলে তা কমিয়ে এখন করা হয়েছে পাঁচ ঘোড়সওয়ার। আহেদি মীর সফির ভাগ্য এখন তার নিজের হাতে। তাকে এখন আর কোনো মনসবদারের তাঁবে থেকে লড়তে হয় না। বরং পাচ ঘোড়সওয়ার তার তাঁবে এখন তারা পাঁচজন সফির কথায় জং আজমে ঝাঁপিয়ে পড়ে—তারা তাদের মালিক সফির মতোই জানবাজ।

এটা রবি আউল মাসের মাঝামাঝি হবে। সবে শীত চলে গেছে। দিন চারেক আগে আহেদি মীর সফি পূর্ণিমার দিন মাস মাইনের রুপেয়া পেয়েছে। আকাশে খানিক ক্ষয় হওয়া চাঁদ দেখে সেকথা মনে পড়লো তার। নিচেই ব্রহ্মপুত্রের রুপোলি জল। দুনিয়ার সব নদীর জলই রাতের বেলায় একই রকম দেখতে। একটু শীত পড়ে এখনো এই রাতের বেলায়। জায়গাটা অনেকটা যেন হেলমন্দের তীর ঘেঁষা বলে ভুল হয়। ফারাক শুধু এখানে চারদিক সবুজে সবুজ। নয়তো এখানে দূরের পাহাড় তো সেই কান্দাহারের মতোই দেখতে। তবে হীরাট, কাবুল, কান্দাহারের পাহাড়গুলো বড় ন্যাড়া। এখানে পাহাড়-গুলো গাছে গাছে ঢাকা।

গায়ের তুলো ভরা কাম্বাদার কাবা জোলো হাওয়ায় ভিজে যাচ্ছে একটু একটু। মনসহী ঘোড়সওয়ারির আমল থেকে এই তুর্কী ঘোড়া মীর সফির পায়ের সামান্য খোঁচা পেটে পেলেই তার সওয়ারির মন জেনে ফেলে। সে লম্বা লম্বা চালে ছুটে এগিয়ে চললো।

আহেদি সফি তখন নিজের মনেই বললো, বাদশার বংশও ভেঙে যায় একদিন। বিদ্রোহ হয়। গাঁয়ে মানুষের জিন্দগী—মানুষের ঘরগেরস্থালী কিন্তু টিকে থাকে। মাঠে মাঠে জওয়ার বজরা ফলে। তামাক, অথচ চাষ হয়।

এইসব ভাবতে ভাবতেই সে গাছপালার ভেতর তাঁবুর সামনে এসে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামলো। আর সঙ্গে সঙ্গে পাশেরই সরপর্দা তাঁবু থেকে এক জেনানা ছিটকে বেরিয়ে এসে গাছতলার ঘাসের ওপর পড়লো। তার পেছনে

পেছন কোড়া হাতে এক গোলাম। সে এসেই পড়ে যাওয়া জেনানার চুলের ঝুঁটি ধরে মাথাসুদ্ধ সারা শরীর টেনে তুললো।

আহেদি মীর সফি চেঁচিয়ে উঠলো। থামাও এসব। আর পারা যাচ্ছ না—

দিন গেলে এক রুপেয়া তনখার গোলাম এই ধমকে একদম বেওকুফ বনে গিয়ে টগবগে আহেদির দিকে তাকালো। খোদাবন্দ! এ অকালমন্দ জেনানা বাগী পাইক সনাতনের আওরত। একে মেরামত করলেই সনাতন পাইকের খবর হয়ে যাবে। একটু ভালো করে কোড়া মারলে চাই কি ওর চিৎকার শুনে সনাতনই ছুটে আসতে পারে—

যা ইচ্ছে হয় কর। চিৎকার কান্নাকাটি আর সহ্য হচ্ছে না।

আর বেশি শুনতে হবে না মালিক। কাল ভোর হতেই আগ্রা রওনা করিয়ে দেবো। সেখানকার বাজারে বাঁদী হিসেবে কেউ কিনে নেবে। ইচ্ছে করেন তো আপনিও রাখতে পারেন। আপনিই তো জংফতে করে ওদের কয়েদ করলেন— পহেলা হক তো আপনারই—

বাল বাচ্চা আছে?

একটা লেড়কা—আর একটা লেড়কি। দুটোই তাগড়া। ভালো দাম পাবেন হুজুর আগ্রার মণ্ডিতে। মেয়েটার এই বছর বারো বয়স হবে—

নিয়ে যাও—বলে মীর সফি মাথা নিচু করে কোমরে ঝোলানো ভারি বিরছা কুড়োল খুলতে যাবে—এমন সময় সরপর্দা তাঁবুর ভেতরকার রেড়ির আলো এসে পড়লো টেনে নিয়ে যাওয়া ওই জেনানার মুখে। মাথার লম্বা কালো চুলের গোছা গোলামের মুঠোয়। চোখ দুটো ঝুলে পড়েছে। ঠোঁটের বাঁ কোণটা কেটে তাজা রক্ত ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার প্রায়। কোড়ার ঘা খেলে কার বা জ্ঞান থাকে! আর এ তো আওরত।

যাও আমার তাঁবুতে রেখে এসো।

খোদ জাহাঙ্গীর বাদশার হুকুমে মীর সফি আর তার মতো আরও ন'জন জানবাজ আহেদিকে আগ্রার কাছে সাফেৎ ছাউনি থেকে এই কোচবিহার খুন্তাঘাট লম্বা এলাকায় সাত তাড়াতাড়ি পাঠানো হয়েছে। এখানকার টেটিয়া সরকাশি পাইকদের শায়েস্তা করতে। এরা আদমকশি—সুবিধা পেলেই বাদশার সেপাইদের ওপর চোরাগোপ্তা জুলুম চালায়। শাহী খাজনা বাকি ফেলে— দুর্জন্দি করার তালে ছিল।

আমিই এদের মরদদের মাটি আর গাছ দিয়ে বানানো কেল্লা গুঁড়িয়ে দিয়ে খতম করেছি। যারা পেরেছে জঙ্গলের আরও ভেতর পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছে। আগুন লাগাতে লাগাতে ওদের গাঁয়ে ঢুকে জেনানা আর তাদের বাচ্চা কাচ্চাদের কয়েদ করেছি! আগ্রার বাজারে ভালো দামে বিকোবে। বাদশার বকেয়া খাজনা তা থেকে দিব্যি উঠে আসবে। চাই কি আমি নিজেও ওদের গোলাম বাঁদী করে রাখতে পাবি। আগ্রা থেকে যতই পুবে এগোও—গঙ্গার গা ধরে—ততই নদীর দু'ধার জুড়ে হাড়হারামজাদা সব লোকের বাস। গুনাহর কোনো পরোয়া নেই। বেপরোয়া গুনাহগার। গঙ্গার পানিতে গোসল করলে

সব গুনাহ সাফ হয়ে যায়—এটা জেনেই যেন এন্তার গুনাহ করে চলেছে। আরও পুবে এগোলে এই ব্রহ্মপুত্র। গহেরাই জঙ্গল। আশমান জুড়ে পাহাড়। আর মস্ত লা-পরোয়া সব হাতি। সরকাশি, দুজাদি, আদমকশি সব পাইক।

এদের ঠিক রাখতে চাই তাগদ। সারা হিন্দুস্থান জুড়ে লাখো লাখো সিপাহি। মনসবদারি ঘোড়সওয়ার। পায়দল লস্কর। বন্দুকচী। ধনুকচী। মীর সফির মতো জানবাজ ফতেজং আহেদি লড়াকু। তোপখানার ফ্রানসিসি মীর আতিশ। তার দাগা এক একটা গোলা আস্ত হাতি উড়িয়ে দেয়।

আসলে বাদশাহি রিয়াসৎ মানেই হুকুম, খতম আর তাগদ। ঘোড়া যার জয় তার। এই আটটা বছর অনেকবার প্রাণ হারাতে হারাতে নানা যুদ্ধের পর মীর সফি আজ একজন আহেদি। সে তো ঘরের কাছে ইস্পাহানের সফেদি বাদশার তাঁবেও চাকরি নিতে পারতো। ভাগ্যিস নেয়নি। হিন্দুস্থানের বাদশার খিদমৎগারি না নিলে সে আজ পুবদেশের জেনানাদের এমন সুন্দর কালো চুল আর চোখের জলুস দেখার সুযোগই পেতো না।

নিজের তাঁবুর ভেতর একা একাই বেহুঁশ জেনানার চোখে জলের ঝাপটা দিলো। তবুও চোখ মেলে তাকাতে পারলো না সনাতন পাইকের আওরত। তখন গায়ের কাম্বাদারের ঝোলা থেকে চামড়ায় মোড়া তামার ছোট্ট পাত্রটার মুখ কাত করে রং গড়ানো ঠোঁটে চেপে ধরলো।

ঠোঁট ফাঁক হতে চায় না। কতকাল কোনো জেনানার মুখ এত কাছ থেকে দেখা হয়নি। সাফেৎ ছাউনিতে মাঝে মাঝে আগ্রার ব্যাপারী মহল্লার নাচনেওয়ালি এসে থাকে। তাদের আঙরাখার চুমকি ঝকমকায়। কাঁচুলিতে বেদানার দানার মতো রক্ত লাল পাথর চোখ টানে। কিন্তু মনে তার দাগ থাকে না কোনো।

চোখ মেলেই আওরত চেঁচিয়ে উঠলো। আমায় ছেড়ে দাও। আমি যাবো না। আমার দু'দুটো বাচ্চা আছে—

চোখে যতটা সম্ভব নরম ভাব এনে মীর সফি নিজের ঠোঁটে আঙুল চেপে চেঁচাতে বারণ করলো।

এই আওরতকে মেয়ে বলা যায় না। সফির চেয়ে বড়ই হবে। শক্তসমর্থ। কিন্তু গোলামের কোড়ার ঘায়ে পিঠ বেয়ে রক্ত পড়ে নীল আঙরাখায় শুকিয়ে উঠেছে। মির্জাপুরের দরবেশরা রেশমের সুতোর জন্যে গোয়ালপাড়া হয়ে ব্রহ্মপুত্র পেরোচ্ছিল খেয়ায়। তোমার মরদ সনাতন তার দলবল নিয়ে খেয়া ডুবিয়ে দিয়েছে। লুঠ করে নিয়ে গেছে রেশম—

পিঠমোড়া করে বাঁধা হাত দু'খানা খুলে দিতেই জেনানাটি পিছু হটে আহেদি এই গুলালবার তাঁবুর কাঠের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো। ওদের দু'জনের মাঝখানে এখন রেড়ির আলোর শিখা। সে ভালো করে মীর সফিকে দেখলো। সা জোয়ান সমসের বাজি গঠন গাঠন। এরাই এ ক'দিন এ এলাকায় ঘোড়া দাবড়ে আগুন দিয়েছে।

সনাতন পাইকের বউ কথা বলার দম পাচ্ছিল না। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে সে

সোজা হয়ে দাঁড়ালো। ঠিক করলো—কাছে এলে এই জন্তুটার যে জায়গা পাবে কামড়ে দেবে। তাতে যা হয় হবে। আর তো কিছু হারানোর নেই তার। ঘর নেই—ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। সনাতন নিশ্চয়ই এতক্ষণ বেঁচে নেই। গরু বাছুর নিয়ে গেছে। ছেলেমেয়ে দু'টোকে কয়েদ করেছে। নিশ্চয় সারা জীবন গোলাম বাঁদী করে রাখবে। আমাকে তো বেচে দেবেই। নগদ আশরফিতে ফৌজি সেপাই সুবোদের বড় লোভ। তবে আর পরোয়া কিসের। আহেদি মীর সফির কথার কোনো জবাব না দিয়ে সে সিধে তাকিয়ে থাকলো। এখন হাতের কাছে একটা যদি হরসিংজটাও থাকতো। আপসোস! তাহলে সেই খাণ্ডার এক কোপে সে এই জন্তুটার মাথা নামিয়ে দিতে পারতো।

দরবেশরা সাধু সন্ন্যাসী। সারা বছরের রেশম সুতো কিনে নিয়ে গিয়ে মির্জাপুরের বেনারসী তাঁতিদের কাছে বিক্রিবাটা করে কিছু আশরফি পায়। কারও ভাগে হয়তো কয়েক দাম—কি আধেলা, পওয়া বা দামড়ি জোটে! তাদের তোমরা লুঠ করলে? খেয়া ডুবিয়ে দিলে?

মীর সফি কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছিল। সনাতন পাইকের বউয়ের চোখে পলক পড়ছিল না। ছোট্ট এই তাঁবুর ঘেরের বাইরেই বিরাট অন্ধকার। ছুটে একবার সেখানে গিয়ে পড়তে পারলেই তাকে আর পায় কে! এই জঙ্গল —বনবাদাড় সবই তার চেনা। এক দৌড়ে সে গিয়ে ধুমধুমায় পেঁৗছে যাবে। পাইক মরদদের ডেরায়। হয়তো সনাতন এখনো বেঁচে আছে।

সফির কথার ঘাঁৎ ঘোঁৎ বুঝতে পারছিল সনাতনের বউ। ক্রোরী, কানুনগো, মুস্তাহিজ কিংবা তশীলদাররা খাজনা আদায়ে বেরিয়ে যে ভাষায় এখানে এসে কথা বলে—এ ক'দিনে লক্ষ্য করে দেখছে—এই সব স্কন্ধাবার তাঁবুর উর্দু গেড়েই ফৌজি সেপাইরাও সেই একই ভাষায় কথা বলে। তার স্বামী সনাতন পাইক তাকে বলেছিল, এই নতুন গজানো ভাষাটাই নাকি উর্দু। তাড়া খেয়ে ধুমধুমার গড়ে জড়ো হয়ে সে অনেক কিছু জেনেছে।

প্রায় মুখোমুখি এসে জন্তুটা দাঁড়ালো। আর এগোলেই। সনাতনের বউ দম বন্ধ করে দাঁতে দাঁত ঘষলো!

ক'টা সাধু সন্ন্যাসীকে ডুবিয়ে দিয়ে কি পার পাবে ভেবেছো?

সনাতনের বউ আহেদি মীর সফির ডান হাতের কব্জি যত জোরে পারে কামড়ে ধরলো। কামড়াতে গিয়ে তার চোখ বুজে এলো। অবাক হলো। দাঁত বসছে না তো। আরও জোরে কামড়ে ধরলো সনাতনের বউ।

মীর সফি একটুও নড়লো না। বাইরে ঝিঁঝি ডাকছে। দাঁড়ানো ফৌজি ঘোড়াগুলোর পা বদলানোর শব্দ শুধু। দূরের তাঁবু থেকে হাসির হররা। রাত চরা কুবো পাখির কুব্ কুব্ আওয়াজ।

সনাতনের বউকে হাতের ঝটকায় সরিয়ে দিলো সফি। খুব হয়েছে। বদৌলত আওরৎ। চামড়ার পট্টি জড়ানো হাতে কখনো দাঁত বসে! কাল সকালেই তো আগ্রার বাজারে পাড়ি দিতে হবে—সে খেয়াল আছে?

দড়াম করে গুলালবারের কাঠের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে সিধে হয়ে গেল

সনাতনের বউ। সে রীতিমত আশ্চর্য হলো। কোড়া মারলো না তো। নিদেন পক্ষে একটা লাথি। সে সোজা হয়ে সফির দিকে তাকালো। এ কেমনতরো ফৌজি !

সাধু হোক—চোর হোক—খেয়া না ডুবিয়ে আমাদের রাস্তা ছিল না—একটা দাম নেই হাতে—একটা দামড়ি নেই কারও কাছে—যে কিছু কিনে খাবো। কেউ তো এক আধেলাও ধার দেবে না।

কেন ? চাষ করো না ? চাল হয় তো এদেশে।

তুমি ফৌজি হয়ে জানো না—চৌধুরী, কাজী থেকে পেয়াদা অব্দি সবাই খরচ-ই-দে, মালবা তোলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ? তাদের আরাম আহ্লাদের খরচা আমাদের ঘাড় দিয়ে যায়। বাদশার খাস খরচের জন্যে বিঘায় দশ সের চাল তো আছেই।

কেন ? কেন ? আকবর বাদশাই তো খরচ-ই-দে, মালবার রুপেয়া তোলা বেআইনি করে গেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে সনাতনের বউ বলে উঠলো—

আল্লা হো আকবর
জেল্লে জালালে হু
বাদশার বাদশা আকবর।

মীর সফির এবার অবাক হবার পালা। সে একজন আহেদি। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে খুন্তাঘাটের এই জঙ্গলে তার কাছে কৈফিয়ৎ নেবার কেউ নেই। এই জেনানার প্রাণপানি তার হাতে। সে নিজের কাছে বাঁদী করে রাখতে পারে এই আওরতকে। আবার আগ্রার বাঁদীর বাজারে চালানও করে দিতে পারে।

তুমি হিন্দু না ?

তাতে কি ? আকবর বাদশা তো সবার বাদশা ছিলেন। এখন দেখো গিয়ে আগ্রার নাকের ডগায় মথুরা বৃন্দাবনেও তশীলদারের আমোদ আহ্লাদের খরচ যোগাতে হচ্ছে চাষীদের। জোর কদমে খরচ-ই-দে আদায় হচ্ছে।

আহেদি সফি চুপ করে গেল। সে এই সাম্রাজ্যের সম্মান রাখতে সমসেরবাজ—জানবাজ। ফি বছর তার চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে বাদশার খাতায় ইয়াদদসত্ করা হয়। তাতে বাদশাহি শীলমোহরের একদিকে লেখা থাকে—যে সোজা পথে চলে সে কখনো পথ হারায় না। আর অন্যদিকে লেখা থাকে—আল্লাই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাগদ আল্লার মোহর। —তাজ্জব ! এ তাগদ কার জন্যে ?

সেই সাম্রাজ্যে হিন্দুস্থানের এক আওরত বেসাহারা। তার বাল বাচ্চা কাল ভোরের ঘোড়াডাকের সঙ্গে সঙ্গে আগ্রা চালান হবে। কোনো আমীর বা ব্যাপারী তাদের নগদে কিনে নেবে সারা জীবনের জন্যে।

সফি জানে—হিন্দুস্থানে জমি আন্দাজে মানুষ অনেক কম। যে যার পছন্দ মতো চাষের জায়গা গাঁয়ের মুকদ্দমের কাছে চেয়ে নেয়। একবার নেবার পর সে কিন্তু আর এই জমি থেকে সরতে পারবে না। ও জমি সে বেচতেও পারবে

না। যদিও আগ্রা দিল্লিতে দিব্যি হাভেলি কেনাবেচা চলছে। অধিকার চাষীর শুধু ফসলে। জমিনে খুদ রা ইয়ানি মুজারিয়াৎ, জমিনে খুদ বা নে ফুরুশদ্। ভালো বৃষ্টি হলে—চাষীর তাগদ থাকলেও যদি চাষে না নামে—বাদশাহি হুকুম—তাকে ভয় দেখাবে—জোর করবে—তহদিব ওয়া তাগিদ অনহারা—এমনকি মারবে। দস্তুর-ই আমল-ই বেকাশে এই হুকুমই জারি আছে। তার মানে, যে করে হোক ফসল ফলাও। মালবা দাও। বাদশার খাস খরচা দাও। চৌধুরী আর কানুনগোদের আহ্লাদের রুপেয়া যোগাতে খরচ-ই-দে দিতে থাকো। দারোখানা জমা দাও। আসলে জমিতে জোতা বলদ হয়ে শুধু খেটে যাও। আর খাজনা দিয়ে যাও। খেতে পাও কি না দেখার কেউ নেই। ওদিকে মরা চাষীই বা কী দেবে! তাই জমা যা খাজনা লেখা থাকে তা তামাম হিন্দুস্থানের কোনো সুবার মাঠেই কোনোদিন হাসিল হয় না।

সনাতনের বউ কাঁদছিল। সে বিন্ বিন্ করে বলতে থাকলো—আমাদের এই খুন্তাঘাট সদরেই সাতটা সুন্দরী বউকে চৌধুরি জামান তাব্রিজি তার নিজের হারেমে পুরেছে।

তোমরা তিনজন ডিহিদারকে বিষ খাইয়ে মেরেছো।

ফুঁসে উঠলো সনাতনের বউ। তার চোখে জল। সে পরিষ্কার গলায় বললো, মারবো না? তোমরা হলে কী করতে? আমাদের গাঁয়ের সুন্দরী মেয়েদের—ভালো দেখতে ছেলেমেয়েদের ডিহিদার, ক্রোরীরা নিয়ে যায়—ফেরত দেয় না—কোথায় বেচে দেয় জানি না।

মীর সফি তার বুক শক্ত করে পাল্টা বললো, বড় বড় বাদশাহি গজনল কামান টেনে তুলতে ছ'সাতটা করে হাতি লাগে। তাই হাতি ধরার জন্যে ঘরদুয়ারি পাইকদের লাগানো হয়েছিল। হাতি না ধরে তোমরা বকির খাঁকে দু'টুকরো করে কেটেছো।

কাটবোই তো। জঙ্গলের ফোয়ারার নাম হাতি। ফাঁদে পড়ে তার কয়েকটা এদিক ওদিক পালিয়ে যায়। খালি পেটে মশাল জেবলে—ঢ্যাড়া পিটে—ঘের দিয়ে তাদের সব ধরে রাখা যায় কি? কিছু তো পালাবেই।

তাই বলে বকির খাঁকে দু'টুকরো করবে?

বকির খাঁ পালানো হাতিদের ধরতে হুকুম দিলো। সে নিজে ধরুক তো। ধরতে না পারলে হাতি পিছু হাজার রুপেয়া জরিমানা। কে দেবে! কোথায় পাবে? ক'জনকে বকির ফাঁসিতে লটকে দিলো। বাকি আমরা পালিয়ে বাঁচি—

আহেদি মীর সফি আর কথা বলতে পারলো না। এই কাঁটাওয়ালা জঙ্গলে খালি পেটে মশাল জেবলে হাতি খেদানো? তার গলা বুজে এলো। একটা হাতি পালালে এক হাজার রুপেয়া জরুমানা। যারা কিনা একটা দামড়িও দেখেনি। না দিতে পারলে কোড়া। লাথি। চাবুক। ফাঁসি। এই কি আল্লার দুনিয়া?

আফগান মনসবদার নজবুল খাঁয়ের তাঁবে ঘোড়সওয়ারি জীবনে আমিই তো বাদশাহি হুকুমে জঙ্গল সাফ করে গাঁয়ের পর গাঁয়ে হামলা চালিয়েছি।

আল্লার রহিমে আমি গাঁয়ের মেয়ে আর ছেলেদের কয়েদ করেছি। খাসা তলোয়ারের মুখে মরদদের খতম করেছি। গরু বাছুর তাড়িয়ে নিয়ে গেছি। চাষবাস বন্ধ করেছি। ফলন্ত জওয়ার ভুট্টা জ্বালিয়ে দিয়েছি। এই তাগদ কি খোদাতালার মোহর ! ছোটা কয়েদ থেকে কচি গলার কান্না ভেসে আসছিল। জাতভাই বাকি সব আহেদি কয়েক মঞ্জিল জুড়ে খুন্তাঘাটের এই জঙ্গল বেড় দিয়ে তাঁবু ফেলেছে। দশ আহেদির ছোট ছোট সেপাই ছাউনি, দূরে বড় ছাউনির এগিয়ে থাকা দল।

সনাতনের বউ কান্না শুনে বেরোবার পর্দার সামনে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাকে আটকানো মীর সফির পক্ষে কঠিন হয়ে পড়লো। মরদ হলে সে একটা লাথি কষিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু এ যে বেসাহারা আওরত। চাষী পাইকান ঘরানার বউ। সফি নিজেও হেলমন্দ নদীর পাড়ে সেরা জমিনের সেরা কান্দাহারি চাষী বাড়ির জওয়ান। সে শক্ত করে হাতখানা ধরলো। খবরদার—

আমায় যেতে দাও ভাই—

ধক করে উঠলো সফির বুকের ভেতরটা। ভাই ? তার হাত আলগা হয়ে যাচ্ছিল। শক্ত করে ধরলো। কেন না ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে তাঁবুর সামনেকার উঠোনে পড়লেই গোলাম খিদমতগারদের পাহারাদির কোড়ার মুখে পড়বে। সে কোড়া পিঠের ওপর গর্ত হয়ে বসে যাবে।

সফি আস্তে জানতে চাইলো, তোমার নাম কী ?

থমকে দাঁড়ালো সনাতন পাইকের বউ, কেন ?

আহেদি মীর সফির নরম হওয়ার অভ্যেস নেই। সে অনেক কষ্টে তার সারা শরীর, চোখ মুখ নরম করে ভাবার চেষ্টা করে বললো, বেহুদা খুন, কয়েদ, ফাঁসি, তীরবাজি করে লাভ কী ? এতে হিন্দুস্থানের কোনো ফয়দা নেই। বাদশার কোনো ফয়দা নেই। আমি সদর কোচবিহারে কাসীদ কবুতর পাঠাবো। সেখানে ফৌজদারকে লিখবো—তোমাদের যাতে রেহা করে দেওয়া হয়। তাহলে ফের তোমরা চাষ করবে। চৌধুরি জামান তাব্রিজির বিচার হবে—

সত্যি ?

আমি কোশিশ করবো।

আমার নাম মীনাক্ষী পাইক—

যাও তুমি আজাদ।

আমার ছেলেমেয়ে ?

ওদেরও ফিরে পাবে। তবে এক শর্তে।

চমকে তাকালো মীনাক্ষী, কী ?

কাল সকালে সনাতনকে নিয়ে আসবে।

মীনাক্ষীর বুকের ভেতরটা চলকে উঠলো, বেঁচে আছে ?

আমরা ধরতে পারিনি। জাঁহাবাজ পাইক। তাকে বোলো—কোন্ শর্তে সে এখানকার শাহী খাজনা উসুল করে দেবে—তাই নিয়ে কথা হবে। তখন তোমাদের ছেলেমেয়ে—সব্বাইকে আজাদ করে দেবো—বাদশার খাজনা হাসিল

হলেই আগ্রা খুশ্তবিয়ত ! বাদশা খুশ !

কোনো কথা না বলে মীনাক্ষী পাইক নিমেষে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। তাঁবুর সামনেকার উঠোনে আহেদি মীর সফিকে দাঁড়ানো দেখে যে গোলাম— যে কাসীদ—যে সওয়ার যেখানে ছিল—ঠিক সেখানেই সিসল গাছের মতো দাঁড়িয়ে থাকলো। অন্ধকারে ব্রহ্মপুত্রের আকাশে চাঁদ তখন বেশ ঘোলা মতো— ক্ষয়ে আসা। চলে যাওয়া শীতের হিম কিন্তু বাতাস থেকে যায়নি। কাম্বাদার কাবার কান গলা অব্দি টেনে দিয়ে সাফেৎ ছাউনির খাসা আহেদি তার নিজের তাঁবুতে ফিরে এলো। ফিরে এসে পোশাক না খুলেই রবাবটা টেনে নিয়ে তারে টান দিলো।

পরদিন সকালে ব্রহ্মপুত্রের নিচের দিকে হিন্দুস্থানের এ খুন্তাঘাট জঙ্গলের মাথায় সুন্দর রোদ উঠলো। মীনাক্ষী কথা রেখেছে। তার কথায় সনাতন পাইক এসেছে। তার দু'পাশে দু'জন করে হাতিধরা ঘরদুয়ারি পাইক। তাদের হাতে ধনুক। পিঠে তীর। তীরের জন্যে বিষ। যে-বিষ কিনা পোষা গোখরোর ছোবল থেকে ফি পূর্ণিমায়—ফি অমাবস্যায় একটু একটু করে তুলে নিয়ে জমানো। সনাতন যাতে বিপাকে না পড়ে সে জন্যে পেছনে টিলার ওপর চারজন বন্দুকচী দাঁড়িয়ে।

সনাতনকে স্বস্তিতে বসানোর জন্যে মীর সফি তার বিরছা কুড়োলটা হা হা করে হেসে উঠোনে ছুঁড়ে দিলো। লড়াকু সনাতনকে দিলো সাবাসী। তার সঙ্গী সাথীদের দিলো তারিফ।

এমনিতে সনাতন কৃতজ্ঞ। এই অদ্ভুত এক শাহী আহেদির জন্যে সে মীনাক্ষীকে ফিরে পেয়েছে। নয়তো এতক্ষণে অন্য সব বন্দীর সঙ্গে মীনাক্ষীকেও চালান করা হতো আগ্রার পথে। আর কোনোদিনই দেখা হতো না। ঠিক মতো কথা চালাতে পারলে—অন্য সব বন্দীর সঙ্গে তার দুই ছেলেমেয়েও ফিরে আসবে। ধুমধুমায় গড়ে তোলা মাটি আর গাছ দিয়ে বানানো গড় প্রায় গুঁড়িয়ে গেলেও দশ আহেদি সব দিক থেকে হামলা চালিয়েও দখল করতে পারেনি। তবে এখন কী বা আছে আর লড়াই করার মতো। তবু সনাতন বাইরে তার রোখা ভাবটা বজায় রেখেই কথা বলতে লাগলো।

মীর সফি গোড়াতেই নরম সুতো ছাড়লো। পরিষ্কার বললো, চৌধুরি জামান তাব্রিজিকে আমরা বরখাস্ত করাবো।

সনাতন পাইক আহেদি মীর সফির চেয়ে কিছু বড়ই হবে। চওড়া কাঁধ। সরু কোমর। চোখের দুই কোণ কিছু লাল। কালো হাতলের মতো দুই গোঁফ। সে গম্ভীর হয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলতে লাগলো—

এ দেশে যে হামলা হয়েছে তা আপনাদের জানানো হয়েছে। এখন খাজনা হাসিলের দিকে মন দেবার মতো ক্ষমতা পাইকদের নেই। এ অবস্থায় আপনাদের এখানে চড়াও হওয়া আমরা ভালো মনে মেনে নিতে পারি কী করে ?

সনাতনের কথাগুলো তাড়াতাড়ি টুকে নিচ্ছিল সফি। ওপরে পাঠাতে হবে। ফৌজদার পড়বেন। সেখান থেকে যাবে সুবেদারের কাছে। দরকার বুঝলে তিনি আরও ওপরে উজিরে আজমের দরবারে পাঠাবেন।

গত কয়েক বছরে আমরা দারোখানা, খরচ-ই-দে, মালবা, শাহী খরচ—যতটা পারি হাসিল করে এসেছি। তার বদলে আমরা এমন কী উপকার পেয়েছি যেটাকে আমরা সুবিধা বলে মনে করতে পারি ?

যা হোক চৌধুরি জামান তাব্রিজিকে কড়া শাস্তি দিতে হবে।

পুরো এক বছরের জন্যে খাজনা মাফ করতে হবে।

এখানে আহেদি মীর সফি লিখলো ; ইয়েক সাল দরসথ আজ মুতালেবে মালগুজারি না ফরমান্দ।

মুঘল সিপাহিদের কোচবিহার অব্দি পিছু হটতে হবে।

পাইকদের মাইনে তাদের সরাসরি দিতে হবে। শাহী খাজনার খাতে সেগুলোকে যোগ করা চলবে না।

এখানে সফি লিখে নিলো ; মজুরারি পাইকানেজা দাখিল জমা না কারদে।

ব্যস !

মীর সফি উঠে দাঁড়িয়ে সোজা হয়ে সনাতন পাইককে জড়িয়ে ধরলো। জড়িয়ে ধরে বহুদিন পরে সে যেন হেলমন্দের তীরে তার আব্বাজানের গেঁহু ক্ষেতের গন্ধ পেল। ওলটানো পালটানো জমিনের একটা বিশেষ গন্ধ যেন উল্টোদিকের মানুষটার বুক থেকে উঠে আসছে।

লিখতে লিখতে আহেদি মীর সফি বুঝতে পারছিল—আর যাই হোক—মোগল সৈন্যদের পিছু হঠার কথায় ফৌজদার কিছুতেই রাজি হবে না। পাইকদের মজুরি খাজনার হাতে জমা না করে সরাসরি ওদের হাতে দেবার কথাতেও ফৌজদার রাজি হবে না। রাজি হয় কী করে ? উজিরে আজিম আসফ খাঁর কড়া হুকুম—বকেয়া খাজনা উসুল করে যে করেই হোক জমা আর হাসিলের ভেতর ফারাক কমিয়ে আনতে হবে। অথচ এই তেজী, ভুখা পাইকরাই বা কোত্থেকে খাজনার রুপেয়া পাবে !

সাফেৎ ছাউনি থেকে তড়িঘড়ি ছুটে আসা দশ আহেদির আজম সে নিজে। তার একার সাহসে সে এখন কয়েদকরা জেনানা আর বাচ্চাদের ছেড়ে দেবে। তাতে যা হয় হবে। একটা সরকার মানে কি শুধু কয়েদ করা, গোলাম বাঁদী বেচে মাণ্ডি থেকে আসরাফি তোলা ?

একথাও মনে হচ্ছিল মীর সফির—সামনেই তো ক'মাস পরে পুব দেশে হিন্দুস্থানের বিখ্যাত বর্ষা শুরু হয়ে যাবে। এ বর্ষা যে কী সুন্দর। এমনটি কখনো হেলমন্দের তীরে দেখা যায় না। তখন ঘোড়া হাতি—বিলকুল বেকার হয়ে যাবে। সেই সময় এই পাইকরা বাগী হয়ে উঠলে আবার তো চড়াও হওয়ার হুকুম আসবে। লাভের ভেতর একটা সুবিধা হলো—সনাতন পাইকের চেহারা জানা ছিল না—সামনা সামনি ইয়াসদদসত হয়ে গেল। খোদা না করেন—এই বর্ষার শেষে আবার এখানে তাকে হামলা চালাতে হয়।

গোলামদের দিকে তাকিয়ে সফি হাত তুলে কয়েদখানা খুলে দিতে ইশারা করলো। পাইকান ঘরের মা বউয়েরা তার আগেই নীলা রঙের কয়েদ তাঁবুর সামনে এসে জড়ো হয়েছে। তাদের আর তর সইছিল না। ওদের সবার সামনে সনাতন পাইকের বউ মীনাক্ষী। এখন দিনের আলোয় এই জেনানাকে সে ভালো করে দেখলো। কোথায় কাবুল-হীরাট। আর কোথায় ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে খুন্তাঘাটের এই জঙ্গল। এখানে মীনাক্ষী তাকে ভাই বলে ডেকেছিল। ওর তো এতক্ষণে আগ্রার পথে দু'মঞ্জিল রাস্তা পার হয়ে যাওয়ার কথা ছিল।

শাহী সরকারের কত লোকজন। কত দফতর। আমীর ওমরাহ। জায়গীর মনসব। জায়গীরদার—মনসবদার। কেউ কেউ মনসবদার হলে তাকে জায়গীর দিয়ে বলা হয়—তুমি তনখা মনসবদার। জায়গা থেকে খাজানার তনখা তুলে তাই দিয়ে ঘোড়ার নাল থেকে হাতির ঘি-চিনি সব চালাতে হবে তাদের। বড় বড় রাজপুত রাজা মহারাজা হলো গিয়ে ওয়াতন মনসবদার। তোমার সিংহাসন রাজত্ব সবই থাকলো। তোমার মাস মাইনে—ঘোড়সওয়ারের খরচ খরচা সবই তুলবে তোমার রাজত্ব থেকে। আর আমরা যারা আফগানি, ইরানি, তুর্কি আহেদি-মনসবদার—আমাদের তনখার রুপেয়া-আশরফি আসবে শাহী খাজানাখানা থেকে নগদে। জায়গীর ওয়াতনে আমরা নেই।

মানুষ ভাবে আশমানের বিজলির আগে আগে। মনের ভেতর সেসব ছবি তুর্কি ঘোড়ার চেয়েও বেশি জোরে ছোটে। কিন্তু চোখের সামনে ইনসানের কাজকর্ম চলে দুনিয়ার চালে। গোয়ালে বাছুর ফিরলে গাই যে চোখে তাকায়—যেভাবে ডেকে ওঠে—আদর করে—ঠিক সেইভাবে কয়েদ তাঁবুর সামনে মা বউরা তাদের বাচ্চাদের বুকে জড়িয়ে ধরছে। কেঁদে উঠছে। ফিরে পেয়েই যে যার ঘরের পথে জঙ্গলে মিলিয়ে যাচ্ছে। যদি অবশ্য ঘর বলে এখনো কিছু থেকে থাকে!

মোটমাট ষোলোটা লেড়কি আর একত্রিশটা লেড়কা নিয়ে তাদের আব্বা আম্মারা মুহূর্তে কাঁটা আর সিসল গাছের গহীন জঙ্গলে মিলিয়ে গেল।

এবার সনাতন পাইক একা। সঙ্গী শুধু কয়েকজন ধানুকী। আর দূরের টিলায় ক'জন বন্দুকচী। সনাতন নিজেই এগিয়ে এসে সহবত মোতাবেক তসলিম করলো। পাল্টা তসলিম জানিয়ে মীর সফি শাহী সরকারের একজন আহেদি আজমের উপযুক্ত সম্ভ্রম নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়ালো। তার চোখের সামনে সনাতন পাইক সংগী সাথী নিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। তার মিটমাটের শর্তগুলো এখন এখানে। সেগুলো ছোট চিরকুটে লিখে কাসীদ কবুতরের পায়ে বেঁধে দিতে হবে। কবুতর উড়ে যাবে। কোচবিহারে—ফৌজদারের সদরে।

যাক্; মীনাক্ষী পাইক তার ছেলেমেয়ে ফিরে পেয়েছে। হিন্দুস্থানের আসমানের নিচে এই মুহূর্তে মীনাক্ষী সবচেয়ে সুখী আওরত। একজন মানুষকে সুখী করতে পেরে নিজেও যে কতখানি সুখ পাওয়া যায়—তা একটু একটু করে টের পাচ্ছিল মীর সফি।

রোদ এখন চড়া। ঘোড়সওয়ারদের রান্না চেপেছে। সহিসরা ঘোড়ার গায়ে চিরুনি বোলাচ্ছে। ছোলার জাব ঘোড়াদের মুখে। সারা হিন্দুস্থানে বাদশা জাহাঙ্গীরের পল্টন ছড়িয়ে আছে। ঘাড় ধরে এই একই কাজ সহিসরা করে চলেছে এখন।

কী বিরাট পল্টন বাদশার। কয়েকশো মনসবদারের তাঁবে কয়েক লাখ পল্টন। তারপর ইউসুফজাই, মেঙ্গল, সাঁওতাল, ভীলদের নিয়ে বাদশার জঙ্গলি লস্কর। গাঁয়ে গাঁয়ে ছড়ানো হাজার হাজার জমিনদারের তাঁবে লাখ চল্লিশেক জমিনদারি সিপাহি। এছাড়া আছে উজিরে আজম থেকে গোলাম পেয়াদা তক্ বাদশার আরও কয়েক লাখ খিদমতগার। তাদের লোকলস্কর—ঘোড়া—ঘোড়ার জিন—কত কী।

ভাবতে ভাবতে মীর সফির মাথাটা ঘুরে গেল। কবে এই বিরাট আয়োজনের শুরু হয়েছিল? কবেই বা লোকজন, পল্টন, তাঁবু খিদমতগারদের নিয়ে সদাই বয়ে যাওয়া নদীর সমান এই স্রোত শুকিয়ে আসবে? আসবে তো একদিন ঠিকই। তখন?

সে সাফেৎ ছাউনির কাছে লোদীদের এক সুলতানের ভাঙা গোসলখানা দেখেছে। শ'খানেক বছর আগের সেই হামাম তাকে মনে করিয়ে দেয়—তাগদ, ঐশ্বর্য, জাঁকজমক আর নিয়তি। গত আট বছরের পল্টনি জীবনে সে একটু একটু করে এসব বুঝতে পারছে।

এই যে বিরাট শাহী সরকার—যার শুরুয়াত কোথায়—শেষ কোথায়—দেখা যায় না—তার ভেতরকার জখমি খুন মীর সফি আজকাল স্পষ্ট দেখতে পায়।

হামলা, চড়াও, খতমি, ভুখা ইনসান, আগ্রার মাণ্ডিতে, লাহোরের লাল চকে গোলাম বাঁদীর কেনাবেচা—এসবই মোগল হিন্দুস্থানের সুর—চেহারার এক বনেদি জখম। এই জখমি খুন আর ভালো হবার নয়। ভেতরে ভেতরে নিয়তি তার সুড়ঙ্গ খুঁড়ে চলেছে।

বাদশাহী খাস খরচে খাজনার জমা যা লেখা থাকে—তার কাছাকাছিও হাসিল হয় না। তা হাসিল করতেই ঘোড়সওয়ার ছোটে। মনসবদার, জায়গীরদারের যত ঘোড়সওয়ার, ধানুকী, হাতি, বন্দুকচী রাখার কথা—তা তারা রাখতে পারেন না। পারবেন কোত্থেকে? খরচে কুলোয় না। যাঁর রাখার কথা পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ার—তার তাঁবে রয়েছে আসলে দু'হাজার ঘোড়সওয়ার। কেননা তার তনখা-মনসবে দারোখানা খাজনার জমা যা লেখা আছে—হাসিল হয় তার চেয়ে অনেক কম। তাই ব্যাপারী, চাষী—সবার ওপর পল্টন হামলা চালায়।

সারা মোগল সরকারই চলছে ঘাটতিতে। অথচ বাইরে রীতিমত কেতা-দুরস্ত। ভেতরটা ফাঁপা।

শুধু সুখে আছে রাজধানী আগ্রার রোজিনাদাররা। তারা ভোর হলে রোজকার খরচখরচা শাহী খাজনাখানা থেকে পেয়ে যান। নগদে। কোনো

কিছুই ভাবতে হয় না তাঁদের। যেমন উজির সাদ্দুল্লা খাঁ। মীর সফির ধারণা—সামনের মাসে নওরোজের সময় বাদশা জাহাঙ্গীর সাদ্দুল্লা খাঁকে ইজফা দিয়ে মনসবদারিতে উঠিয়ে নেবেন। ওপরে উঠে তাজা মনসবদার সাদ্দুল্লা খাঁ টের পাবেন—তনখা-মনসবি কী জিনিস। একটা কটু আনন্দে সফির মনটা ভরে উঠলো। এক একটা মনসবি যেন এক একটা বে-ইনসানি কারবার। অন্যায় আর অত্যাচারের কল। সে নিজে এই চাকার কাঠি হয়ে পড়েছে এই আট বছরে। এক একসময় মনে হয়—সব ছেড়ে ছুড়ে চলে যাবে হেলমন্দের তীরে তাদের গাঁয়ের বসতবাড়িতে। হালে উট জুতে সারা জমিন উল্টে পাল্টে দেবে বসন্তের গোড়ায়। তার আর ভালো লাগে না এই আহেদিয়ানা। এখুনি কাসীদ কবুতর ওড়ানো দরকার।

ঠিক এমন সময় সফির সামনে একটা ছায়া পড়লো। চমকে পাশে তাকিয়ে দেখলো, রোদ আড়াল করে ঘোড়ার ওপর বসা তারই আহেদি ভাই বেলাইতি বাজারঘানি। একসময় বাজারঘানি তারই মতো ঘোড়সওয়ার ছিল। ইস্পাহানের কাছাকাছি গাঁয়ে বাড়ি। ইরানি মনসবদারের তাঁবে ছিল অনেকদিন। বছর চারেক হলো বাদশার নজরে পড়ে আহেদি হয়েছে। লোকটা যেমনি নিষ্ঠুর তেমনি মতলববাজ। তার ওপর বোলচালে কিস্তিমাত করতে সবসময় ব্যস্ত। সামান্য আধেলা, পওয়া, দামড়ির জন্যেও মরতে পারে।

খুন্তাঘাট হামলায় মীর সফি আহেদিদের আজম বলে চোখে চোখ পড়তেই ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে বেলাইতি তাকে কুর্নিস করলো। শুনলাম—একপাল জেনানা—তাগড়া লেড়কা লেড়কিকে আজাদ করে দিয়েছো।

সফি শুধু তাকালো। কোনো কথা বললো না।

বেলাইতি বললো, না হোক কয়েক শো আশরফি হারালে। বেচলে দিব্যি আমদানি হতো।

ওসব করে কেয়ামতের দিন কী জবাব দিতাম ?

বেশ তো। না বেচতে। গোটা কয়েক বাঁদী তো এনে রেখে দিতে পারতে। ফরমাস খাটতো। ফুর্তিও চলতো।

এবারও কোনো জবাব দিলো না সফি। লোকটা শেষে লাগানি ভাঙানি না করে আসে ফৌজদারের কাছে গিয়ে। ঠাণ্ডা গলায় বললো, ওদের ধুমধুমা দুর্গ আমরা দখল করতে পারিনি। ওসব করলে সন্ধির কথা পাড়া যেতো কি ? আসলে বাদশার খাজনা যাতে হাসিল হয়—সেটা দেখতেই আমাদের এখানে আসা।

আমিরি চালে একটা ফুঁ দিয়ে বেলাইতি গিয়ে এক লাফে তার ঘোড়ায় উঠলো। উঠেই টগাবগ টগাবগ। মুহূর্তে মিলিয়ে গেলো টিলাগুলোর পেছনে। কী মতলবে এসেছিল কে জানে ! এইসব হিংস্র জানোয়ার লুট আর খতমের ভেতর থাবলে খেয়ে বড় হয়েছে। ইমানের কোনো ধার ধারে না। বলে তো দিলো, গোটা কয় বাঁদী খাসে রাখতে। খাওয়াতাম কী !

ওমরাহ মনসবদারদের শাহী ঠাট না হয় বোঝা গেল। কিন্তু মামুলি এক

আহেদির আমিরি ভড়ং কার ভালো লাগে। বেলাইতি গায়ে দিয়ে এসেছে আমেদাবাদি মলমলের রঙিন কাম্বাদার। নিচে তুলোভরা কাবা। মচ্ছুন্দির আবার দেওয়ানজি-চাল! বিশ রুপেয়া মাইনের সওয়ারের গায়ে যদি আকবরি সিক্কায় দেড় গজি বাক্‌তার লম্বা আড়পলা থাকে তো কেমন লাগে? এদেরই ঘরে বিবির জন্যে কম পক্ষে ছয় রুপেয়া গজের আকবর-শাহী ঝলমল ডোরিয়া ছিটের ইজের শালোয়ার, জরদৌজি ফুলদার আঙ্গিয়া, কাশ্মীরী শালের দোপাট্টা, নাকে হীরের নথ, কানে মোতির দুল, গলায় চুনী-মুক্তোর হার, পায়ে জড়োয়া মখমলের চটি কেমন করে সম্ভব হয়?

সবই লুটের রুপেয়ায়। কয়েদ করা মানুষজন গোলাম বাঁদী করে মাণ্ডিতে বেচে দেওয়া আশরফির জোরে। একবারও ভাবে না—একজনের মাকে বাঁদী করে কিনে নিয়ে গেল খান্দেশের কোন আমির—তারই ছেলে গোলাম হতে চলে গেল হয়তো কাবুলে। সারা জীবনে কোনোদিনই হয়তো ওদের আর দেখা হবে না। ইনসানের সঙ্গে গরু ছাগলের ব্যবহার। বিসমিল্লা! সেই আশরফি দিয়ে আমিরি। হারাম! হারাম!

অবশ্য সস্তায় আমিরি করবে? নানা কিসিমের হীরে, মুক্তো, চুনী-পান্নার অভাব নেই বাজারে। দু'রুপেয়াতেও এক রতি হীরে পাওয়া যায়। হিন্দুস্থানে খুদে মুকদ্দম আর খানদানি গরিবের চিরকালই সেই এক দশা—যাকে বলে—ঘরে ঠেঁটি গামছা আর বাইরে ঝলমলে কাম্বাদার। দেখে দেখে মীর সফির চোখ পচে গেল। বাজে নান্ রুটি খেয়ে বলবে নাসিরি পরওয়াটা—চাকা মুলোভাজা এদেরই শায়েস্তা জবানে হয়ে ওঠে মুলীকা কাবাব!

॥ তিন ॥

সবে শীত গেছে। নদীর জলের ওপরকার কুয়াশা পরিষ্কার রোদে ভাপ তুলে কেটে যাচ্ছিল। এটা জুলকাদ মাস। বনস নদীর সামান্য জল ডিঙিয়ে ওপারে ওঠার সময় হাতির পিঠে বসা মানুষটির আচমকাই মনে পড়লো—শীত শেষ হওয়ার পর খুব সম্ভব গোটা তিনচার পূর্ণিমা বাদেই বাংলা মুলুকে পথে-ঘাটে একদল বাণফোঁড়া মানুষ বেরিয়ে পড়ে। লোহার ফলায় জিভ এফোঁড় ওফোঁড়। কথা বলতে পারে না। এসব হলো গিয়ে হিন্দুদের মানত। চড়কের মানত। বর্ধমানের ফৌজদার তাকে তাই তো বলেছিল—খুব খাতির করে এসব দেখিয়েছিলও। তখন ওখানে খুব গরম পড়ে। পসিনায় পসিনায় সবার জেরবার দশা হয়।

এখানকার গরমও খুব বিখ্যাত। তবে অমন পসিনা হয় না। শুখা গরম। এখন এখানে বাতাস ফুরফুরে। ভোর বেলাতেই আমলকি গাছের ছায়ার নিচে তিনটে ময়ূর মহা বুজুর্গের ঢঙে বাছাবাছি করে ঘাস থেকে পোকা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল।

ভিজে পায়ে হাতি ডাঙায় উঠতেই মাহুতকে থামতে বললো মানুষটি।

সামনে তাকালেই আকাশ বেয়ে উঠে যাওয়া চিতোর পাহাড়। তার খাদ বরাবর বিখ্যাত দুর্গের ভাঙা স্তম্ভের মাথা। হাওদা থেকে মানুষটি নিচে তাকালো। হিন্দুস্থানের বাদশার খাসা এই শেরগির জাতের হাতির জন্যে দু'জন করে মেঠ আর ভৈ লাগে। তারা নদীর জলে গা ধুয়ে নিচ্ছিল।

হাওদায় বসে মানুষটি এবার পেছনে তাকালেন। ওই তো—ওই তো আসছেন কুমার করণ।—

এই বনস নদী—তার জল—নদী পেরিয়ে সামনেই চিতোর গড়—সবই যেন কুমার করণের ঘোড়ার রীতিমত চেনা। হাঁটু ডোবে না এমন নদীতে জলে প্রায় ধনুক তুলে কুমার সমেত ঘোড়া এসে ডাঙায় উঠলো।—পিছিয়ে পড়েছিলাম শাহজাদা। আমায় মাফ করবেন।—বলতে বলতে ঘোড়ার ওপরেই ঝুঁকে তসলিম করলেন কুমার।

আমি লজ্জা পাচ্ছি কুমার। হোক্ না যুদ্ধ—সন্ধির পর কাল থেকে তো আমরা বন্ধু। দোস্ত।

শাহজাদা খুর্রম—আমায় তো ভুললে চলবে না—কার সঙ্গে কথা বলছি। আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি হিন্দুস্থানের ভাবী বাদশার সামনে। সহবত তো মনে রাখতে হবে আমাকে। আমি মেবারের বেদৌলত কুমার। আমার বাবা রাণা অমর সিংহ আপনার কাছে হার স্বীকার করে নিয়েছেন শাহজাদা—

যা বলেছেন আর উচ্চারণও করবেন না। তামাম হিন্দুস্থানের বাদশা এখন সেলিম জাহাঙ্গীর। আব্বা হুজুর বেঁচে থাকতে আমায় বাদশা বলে কুরনিশ করা মানে কি জানেন? বাগী হওয়া। বিদ্রোহ। ওকথা মনেও আনবেন না। আর মনে রাখবেন—আপনিও বেদৌলত নন। এই চিতোর দুর্গ আবার আপনারা ফিরে পেলেন। মেবার আপনাদেরই থাকলো। এখানকার খাজনা-দারোগানা আপনারাই তুলবেন। নানা হুজুর আকবর বাদশা রাণা প্রতাপকে হটিয়ে মেবার সুবার জন্যে মালগুজারি বেঁধে দিয়েছিলেন সাড়ে সাত লাখ রুপেয়া—তাই-ই হবে আপনার সারা বছরের মনসবী তনখা। আপনার আব্বা হুজুর রাণা অমর সিংহ হবেন হিন্দুস্থানের একজন মানী ওয়াতন-মনসবদার। আপনাদের দেশ—আপনাদের ওয়াতন আপনাদেরই থাকলো। আপনি হবেন তাঁর খানাজাদা। তাঁর এন্তেকালে আপনিই হবেন ওয়াতন-মনসবদার। আগ্রা তাই চায়। কানুন মোতাবেক—আপনারা এখানে শান্তি বজায় করবেন। বাদশার বিপদে ঘোড়সওয়ার দেবেন—পাশে দাঁড়াবেন। আগ্রা তাই আশা করে আপনাদের কাছে—

একদমে এতগুলো কথা বলে শাহজাদা খুর্রম থামলেন। হাতির বোধহয় সকালের বাতাস ভালো লাগছিল। সে আপনি আপনি শুঁড় তুলে চিতোর দুর্গকে সালাম জানালো। সেদিকে তাকিয়ে কুমার করণ চ্যাটালো বুক—চোখা নাক মুখ চোখের এই শাহজাদা মানুষটির একটা আন্দাজ নিচ্ছিলেন মনে মনে। সাহসী, ঘোড়া বা হাতিতে একটানা চলাফেরা করে একটুও কাবু হন না—বয়স কতই বা—তারই বয়সী হবেন—এই তেইশ চব্বিশ—একদিন

হিন্দুস্থানের বাদশা হলে তার সঙ্গে এই দোস্তির সুতো মেবার অনেক দূর অব্দি ছাড়তে পারবে তখন।

কুমার করণ বললেন, আমার নানার বাবার সঙ্গে আপনার নানা—আকবর বাদশার ঘমাসান লড়াই হয়েছিল—সে প্রায় পঞ্চাশ বছর হতে চললো। সেই থেকে চিতোর দুর্গ আমাদের হাতছাড়া। আমার নানা—রাণা প্রতাপ আরাবল্লীর পাহাড়ে-জঙ্গলে তিরিশটা বছর কাটিয়ে দিলেন পালিয়ে পালিয়ে—

ওকথা বলবেন না কুমার। পুরনো কথা তুলবেন না। আমার আব্বা হুজুর—সেদিনকার শাহজাদা সেলিমও আপনার নানাকে এঁটে উঠতে না পেরে এলাহাবাদে ফিরে গিয়েছিলেন। তখন আমার নেহায়েত কচি উমর!

আপনার জন্যেই আমরা আবার সব কিছু ফিরে পেলাম শাহজাদা।

আগ্রা আপনাদের দোস্তি চায়। দুশমনি নয়। আপনাদের বাদ দিয়ে তো মিলে জুলে হিন্দুস্থানের খোয়াব দেখা যায় না। একদিকে হেলমন্দ—আরেক দিকে ব্রহ্মপুত্র। নিচে নর্মদা-কাবেরী-কৃষ্ণা-গোদাবরী। ওপরে আপনাদের গঙ্গা। কুমার—এই নিয়েই তো হিন্দুস্থান।

হঠাৎ কোকিলের ডাকে দুই তাজা জংবাজ জোয়ান চমকে উঠলেন। নিমেষে তাঁদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। একজন ঘোড়ার পিঠে। অন্যজন হাতির হাওদায়। দুজনই একসঙ্গে চিতোর দুর্গের দিকে ফিরে তাকালেন।

ভাঙা দুর্গ। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে আকবর বাদশা এই দুর্গ গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। রাণা উদয় সিংহ তখন পালিয়ে বনবাসী হয়েছিলেন। বনে বনে —পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে বেদৌলত রাণা একদিন এই দুনিয়াকে সালাম জানিয়ে চলে গেলেন। জঙ্গলেই রাণা হলেন তাঁর ছেলে প্রতাপ সিংহ। এই কুমার করণেরই নানা। শাহজাদা খুর্রম দেখলেন—ভাঙা দেওয়ালের ওপর পয়লা বাহারের জংলী কোয়েল ডেকে চলেছে। ভাঙা স্তম্ভের ওপর বসে ময়ূর তার পেখম তুলে দাঁড়ালো। এইবার নাচবে। একটা লালগলা সবুজ হীরামন ভাঙা মন্দিরের চুড়োয় গিয়ে এইমাত্র বসলো।

সারা দৃশ্য জুড়ে কে যেন ইতিহাসের পাতা ওলটাচ্ছিল। শাহজাদা খুর্রম আর তাকিয়ে থাকতে পারলেন না। বললেন, খানাজাদা কুমার করণ—আমাকে যে এখুনি ফিরতে হবে—

কৃতজ্ঞ কুমার বললেন, আগ্রায়?

না। আব্বা হুজুর বাদশা জাহাঙ্গীর মেবারের আখবরাতের জন্যে আজমিরের কাছে ছাউনিতে আছেন। আমার জন্যে বসে আছেন যে—

তাঁকে বলবেন, আমি ঘাস হতে পারি—কিন্তু শুকিয়ে মরবো না।

একথা বলছেন কেন খানাজাদা কুমার করণ?

বলবেন, রামসেচে উর্বর জমিতে মাথা তুলে আমি আবার বাতাসে দুলবো।

একথা বলছেন কেন খানাজাদা? আপনি তো দুলবেনই। আমি খুব উদ্বিগ্ন। আব্বা হুজুরের দরবারে যাবো—তেমনই আমার বেগমের কাছেও যাবো। তাঁর মা হওয়ার কথা। ঘোড়সওয়ারদের পেছনে ফেলে একা একা

অনেকটা এগিয়ে এসেছি। লস্করর। তোপের পেছন পেছন আসছে। লড়াইয়ের সামনেকার হারবলের ঘোড়সওয়াররা আমার ফেরার পথে তাকিয়ে আছে। ধানুকীরা বুঝতে পারছে না আমি কোথায়। কিন্তু ওকথা বলছেন কেন কুমার? আমাদের সামনে নয়া দুনিয়া। আপনি আমি দুজনই এখন যুবক। আমরা দুজন সাম্রাজ্যের পতাকা দিকে দিকে নিয়ে যাবো। আপনি কী সুন্দর বললেন, আমি ঘাস হতে পারি—কিন্তু শুকিয়ে মরবো না। —একথা কার কুমার?

শুনবেন? একথা আমার ধার করা—এ-ভাষা আমার ধার করা। বলেছেন কবি তুলসীদাস।

তিনি কে?

তিনি রামচরিতমানসের কবি তুলসীদাস।

কোন ভাষায় লেখেন? খুব মিষ্টি তো।

অবধি ভাষায় শাহজাদা। ফতেপুর-মির্জাপুরের বোলি। তিনি আজকের মানুষ নন। বাদশা হুমায়ুনের তখতে চড়ার সময়ে ওই সন্তের জন্ম। এখন থাকেন কাশীতে। তাঁরই ভাষায় কথা বললাম। আশির ওপর বয়স হবে—

বেগয়র স্বামীর আওরত—আর সূর্য ছাড়া দিন একই খানাজাদা কুমার। আপনি কবির ভাষায় কথা বলবেন। বহুত খুব। আমারও অমন কিছু বলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আমার যে আজমিরে ফেরার তাড়া এখন। কোনো কবির কোনো কথাই এখন মনে পড়ছে না। পরপর তিন লেড়কির পর আবার তিনি মা হতে চলেছেন কুমার—

হো হো করে হেসে উঠলেন কুমার করণ। তাতে বুঝি দুর্গের ভাঙা স্তম্ভে বসা জংলী কোয়েল ঘাবড়ে গেল। সে ডানা মেলে সামনের সিসল গাছের দিকে উড়লো। কুমার করণ বললেন, আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি শাহজাদা। আপনাকে আটকাবো না। আমি বলতে চেয়েছিলাম—আপনার ভালোবাসায় বেড়ে উঠে মেবার একদিন শুকনো ঘাসের মতো এখনকার দশা থেকে মুক্তি পেয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াবে—বাতাসে দুলবে—তার জোস্ ফিরে পেয়ে আপনার পাশে—আগ্রার পাশে দাঁড়াবে—

শুক্রিয়া!

কবি তুলসীদাসের রাম কথাটির জায়গায় শুধু শাহজাদা খুর্রম বসিয়ে নিয়ে এই চৌপাঈ গাইতে হবে। —বলতে বলতে কুমার করণ তাঁর খুবই সাধের চৌপাঈ ভাঁজতে শুরু করেছিলেন।

শাহজাদা খুর্রম খুবই ঠাণ্ডা গলায় বললেন, থামুন। থামুন। দোঁহা চৌপাঈতে নাম বসাতে হয়—বাদশার নাম বসাবেন। আমার নয়। ঝুটমুট ফজুল কথা পেড়ে বিপদ ডেকে আনা কেন?

এই কুমার করণ কিছু কবি মানুষ। দোঁহা, চৌপাঈ, সোরধা, চৌপৈয়ার ভক্ত। এতদিনকার হারানো দুর্গ ফিরে পেয়েও কিছু বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন। শাহজাদা খুর্রমের অনুরোধে ধমকও মেশানো ছিল। সেটা তার

মাথায় ঢুকলো না। নিজের কথার আনন্দেই বলতে লাগলো, শাহজাদা—এই দুর্গের সামনে দাঁড়িয়ে আরেক দুর্গের কথা মনে আসছে। মনে আসছে কবি তুলসীদাসকেও।

শাহজাদা খুর্রম কিছু অবাক হলেন। কিরকম ?

আমার বাবা রাণা অমর সিংহ প্রায়ই একটা কথা বলেন। হিন্দুস্থানের সবচেয়ে বড় জিনিস কী ? যা দেখে তাজ্জব লাগে—

শাহজাদা চুপ করে থাকলেন। এই কুমার বড় প্রগলভ।

রাণা অমর সিংহ বলে থাকেন—আগ্রা দুর্গ। লোদিরা আজ থেকে একশো বছরেরও আগে যে দুর্গ বানিয়ে গিয়েছিল—তা নাকি ছিল ইটের—ছোট মতো—কদাকার দেখতে।

শুনেছি কুমার।

আপনার নানা-বাদশা আকবরের হুকুমে নতুন করে আগ্রা দুর্গ তৈরি হয়—হতে থাকে। এখন আগ্রা দুর্গ দেখলে তাজ্জব বনে যেতে হয়। আমার বাবা আরও বলে থাকেন—হিন্দুস্থানের সেরা দোঁহা চৌপাঈ কোথায় ? তা ওই কবি তুলসীদাসের রামচরিতমানসে—

শাহজাদা খুর্রমের আর তর সইছিল না। রাণা অমর সিংহের এন্তেকালের পর কুমার করণ যে কেমন ওয়াতন-মনসবদার হবেন তা এখুনি তিনি বুঝতে পারছিলেন। এমন মানুষকে তনখা মনসবদার করে সারা হিন্দুস্থানে বদলি করে ঘোরালে টেরটি পেতো !

এই দুই জিনিসের আর জুড়ি নেই শাহজাদা। যেমনি আকবর বাদশার আগ্রা দুর্গ—তেমনি কবি তুলসীদাসের দোঁহা। যতদিন হিন্দুস্থান থাকবে—ততদিন এরাও থাকবে।

খুব একটা কিছু মাথায় না নিয়েও নতুন পাতানো দোস্তির খাতির শাহজাদা খুর্রম বললেন, খুব সাচ্চা কথা বলেছেন কুমার।

আরও তাজ্জবের কথা—বাবার মুখে শুনেছি—যে সনে বাদশার হুকুমে আগ্রা দুর্গ নতুন করে বানানো শুরু হলো—ঠিক সেই সনেই কবি তুলসীদাস রামচরিতমানস লেখেন। সেই সনেই এইসব আনমোল দোঁহা পয়দা হয়—

বলতে বলতে কুমার করণ দেখলেন, শাহজাদার হাতির মুখ ফের বনস নদীর দিকে ঘুরছে। হাতির গলায় রুপোর ঘণ্টা সকালের বাতাসে বেজে উঠলো। শাহজাদার সময় কম। ভৈ আর মেঠ আবার জলে নামলো। মাহুতে যেন সারা হিন্দুস্থানের মুখ এবার নদীর ওদিকে ফেরালো। তাগদ, জোস্ শাহজাদার পেছন ফেরা পিঠ—মাথার পাগড়ির সরবন্ধে বসানো পালকেও যেন ফুটে উঠেছে। তারই বয়সী হবেন শাহজাদা। সারা হিন্দুস্থানের শাহী শক্তি ওঁর পেছনে। অনুগ্রহ, ক্রোধ, ভালোবাসা, দোস্তি, শাস্তি—সবই ইচ্ছা মতো বিলোতে বিলোতে যেতে পারেন। বাকি হিন্দুস্থান ওই হাতির পায়ের কাছে যেন মিশকিনের মতোই দাঁড়িয়ে। যদি কিছু খয়রাতি মেলে। এর নাম দৌলতী। এর নাম বাদশাহীয়ানা। এর নাম শাহজাদায়ানা। এর সঙ্গেই গাঁট

বাঁধলো মেবার।

ওদিকে আন্নাসাগরের তীরে পরিষ্কার নীল আকাশের নিচে নওরোজের মেলা বসে গেছে। খোদ বাদশার ছাউনিতেই এখন আগ্রা। ক্ষমতা যেখানে—জলুস সেখানে—রাজধানীও সেখানে। রাজাকে ঘিরেই রাজধানী। বাদশা জাহাঙ্গীর জানেন—আমোদ আহ্লাদ, উৎসব মাঝে মাঝে না হলে মানুষ বেশিদিন বাঁচে না। যে যার মতো ফুর্তি করতে বেরিয়ে পড়েছে। শাহী খাজনাখানা থেকে রুপেয়া দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—দীপ জ্বালো। সাজাও।

নওরোজ পারসিদের উৎসব। বাদশা আকবর হিন্দুস্থানে এই উৎসব চালু করেন। সেই উৎসবই নওরোজের মেলা। এবার উৎসব-মেলা দুইয়েই হৈ হট্টো খুব বেশি। কারণ আর কিছুই নয়—আগ্রার শাহী চাঘতাই পতাকার নিচে মেবারের শিশোদিয়া রাণা অমর সিংহ মাথা ঝুঁকিয়েছেন। কাবুল থেকে কামরূপ—হেলমন্দ থেকে ব্রহ্মপুত্র—হিন্দুস্থানের সবটাই এখন আগ্রার ছায়ায়।

মশল্লাদার দমপোক্ত রেঁধে হোটেলওয়ালারা খদ্দের ডাকছে। রসুইখানার আশপাশে ভেড়ার বাচ্চার মাংসের গরম গরম ক্বাথ খেতে একদল ইরাকি ঘোড়সওয়ারের ভিড়। ওই ভিড়েই একটু জায়গা করে নিয়ে ইরানি বেদে কোনো কনৌজি না হয় জৌনপুরি ব্রাহ্মণের হাত দেখছিল। ফলওয়ালার ডালায় ডালিম ফেটে লাল। বাদশার নওরোজি দরবারে চলেছেন দু'জন তুর্কি মনসবদার। নিশ্চয়ই নগদী মনসবদার। ঠাটই আলাদা। তাদের দুই হাতির পাশে পাশে এক বাচ্চা হাতি। তিনেরই কানের দু'পাশে বাহারি তিব্বতি চামর। মনসবদারদের একজনের হাতের ওপর পোষ মানানো বাজপাখি বসে। আরেকজনের পেছন পেছন একটি বড়সড় উজবেক কুকুর। সে বারে বারেই পিছিয়ে পড়ছিল। কেন না তার পেছন পেছন আসছিল একজন রাঠোরি নাচনেওয়ালি। বাদামফুল বসানো তার রংদার বাদলাকিনারি, কাঁচুলি না পায়ের তোড়ায় ঝম্ ঝম্ আওয়াজ—কোনটা যে কুকুরটাকে আনমনা করে দিচ্ছিল তা বোঝার উপায় নেই। সারা চত্বরের আলো বাতাসই যে এখন মশল্লাদার।

এটা আবার আলা হজরত সেলিম জাহাঙ্গীরের বাদশাহীর দশ বছর। দুই মঞ্জিল লম্বা আন্নাসাগরের ঢেউতোলা জল টপকে ফুর্তির হাওয়া আজমির শহরে গিয়ে ধাক্কা মারছিল। হবে না কেন ? মেবার জয়ের আহ্লাদ নওরোজ উৎসব—সব মিলে মিশে গিয়ে একাকার। ইরানি, আফগানি, তুর্কি, রাজপুত, খান্দেশি, বিদরি, সিপাহি, লস্কর, মুটে, মজুর, ভিস্তি, কামার, চামার—সবাই আগ্রার কাছাকাছি দারোগা তশীলদারের শাহী ভাষায় কথা বলতে চায়। যাকে বলা যায় কিনা জৌনপুরি-ফতেপুরি খাড়িবোলি। সেই বোলি বলতে গিয়ে তারা সবাই খানিক খানিক করে নিজের ভাষাও মিশিয়ে বসে আছে। আধখানা দুনিয়ার সবরকম ভাষা মেশানো এক আশ্চর্য হৈ হট্টগোল এখন আন্নাসাগরের

তীর থেকে আকাশে উঠছে। ছাউনি যেখানেই পড়ে—সেখানেই তাঁবুর উর্দুগাড়া মানুষজনের এই পাঁচমিশেলি ভাষায় কাজিয়া ফুর্তির কথাবার্তাকে এখন আশপাশের গাঁয়ের মানুষ ছোট্ট করে বলে—উর্দু।

বাদশা বসেছেন সিংহের খেলা দেখতে। আজ নওরোজের ন'দিন চলছে। গুর্জরের গির জঙ্গলের সিংহজোড়া পেছনের পায়ে ভর দিয়ে বসে বাদশাকে কুরনিশ করলো সামনের দুই পায়ে। ওমরাহরা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে তারিফ-সাবাসি দিলো।

গির জঙ্গলের মুখোমুখি দাঁড়ানো আরেক জোড়া সিংহ। এদের লেজ কিছু বেশি লম্বা। তুলো, আদা, গোলাম নিয়ে হিন্দুস্থানের যেসব ব্যাপারি দরিয়া পাড়ি দেয়—তাদেরই জাহাজে আনা এই সিংহ জোড়া বিদেশি। আরব দরিয়া ছাড়িয়ে লাল দরিয়া, তারপর কায়রো যাওয়ার পথে নীল নদ ধরে ব্যাপারিরা দু'পারে গোলাম কেনাবেচা করতে করতে এগোয়। সেই সুবাদে হাবসিদের দেশে গিয়ে, বাদশার কদম মোবারকে নজর দিতেই সেখানকার এই সিংহ জোড়া ব্যাপারিদের নিয়ে আসা।

গুর্জরি সিংহজোড়ার নাম দলীপ আর সিন্ধু। হাবসি সিংহজোড়াকে সবাই দরিয়া আর রুস্তম বলেই ডাকে। রুস্তমই বেশি লড়াকু। আর ওদিকে সিন্ধু হলো গিয়ে খাঁটি জংবাজ। সিন্ধু গোড়া থেকেই ফুঁসছিল। এমনিতে ওদের পপির শরবত খাইয়ে ঝিমিয়ে রাখা হয়। বাদশা কবে খেলা দেখবেন একথা ওয়াকেনবীশ আগাম জানিয়ে রাখেন। তখনই ক'দিনের জন্য দলীপ, সিন্ধু-ওদের পপির শরবত দেওয়া বন্ধ হয়। সেই শরবত না পেয়ে নেশার জন্যে ওরা মরিয়া হয়ে রাগে ছটফট করতে থাকে। বাইরে থেকে দেখতে ওরা তখন ভীষণ চনমনে।

ছেলেদের ভেতর সবচেয়ে ছোট শাহজাদা শারিয়ার। সেলিম জাহাঙ্গীর যে বছর বাদশা হলেন—সেই সনেই ওর জন্ম। দশ বছরের শাহজাদা এখন বাদশার পাশেই বসে। ডানদিকে। আর বাঁ দিকে বসে আছেন—উজিরে আজম আসফ খাঁ, উজির সাদুল্লা, উজির ইতিমাদ-উদ্দৌল্লা। আরও অন্যসব আমীর ওমরাহ। মার্বেল পাথরের গ্লাসে বাদশা মাঝে মাঝে জল খাচ্ছিলেন। আগ্রার কাছাকাছি থাকায় এ-জল এসেছে প্রয়াগের সঙ্গম থেকে। আবদারখানার কর্তা মীর বকাউয়েল বাদশার রান্নাবান্না থেকে খাবার জল সবই দেখে। ওই জল কুঁজোয় ভরে কুঁজোর মুখটা রেশমি ডোরিতে বেঁধে আরেক গামলা জলের ভেতর বসিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তবে আবার এই গড়গড়ির জল তৈরি হয়।

সময়টা দুপুর। আবদারখানায় চালানিগির বাদশার জন্যে রাঁধা সুফিয়ানা নিরামিষ খাবারগুলো চেখে দেখছিল। এরপরই নামমাত্র গরম গরম আমিষ হালিম চেখে দেখবে। বর্জোরি থেকে আনানো খঞ্জন চালের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। আঙুরের রস দিয়ে রুটির লেচি পাকানো সারা। সা-পসিন্দা উটগুলো পা ঠুকছে পাথুরে মাটিতে। তারই খটাখট। একটা বদকশান

ঘোড়া কেশর উড়িয়ে একা একা আন্নাসাগরের দিকে ছুটে যাচ্ছিল। জলে ঝাঁপ দেবে নাকি? গম্ভীর সংযত রাজমতী জাতের একজোড়া হাতি নিঃশব্দে গুচ্ছের আখের সদ্ব্যবহার করে চলেছে। বাদশা মোটা তাজা পাখির মাংস ভালোবাসেন। মানস সরোবরের দিক থেকে উড়ে এসে যেসব বেলেহাঁস কাশ্মীরে ঝোপে জঙ্গলে ধরা পড়ে—তাদেরই গুটিক'য় বেলেহাঁসকে তাগড়া করতে মাংসের ক্বাথ খাওয়ানো হচ্ছিল। ঠিক এই সময়—

চারদিক থেকে একটা হৈ হৈ উঠলো। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীর উঠে দাঁড়িয়েই পাশে দাঁড়ানো তুর্কি খোজার হাত থেকে বল্লমটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়লেন। মাত্র কয়েক হাত দূরে রাগে গররা তুলে সিন্ধু এসে পায়ের কাছে ছেঁচড়ে পড়লো। দুই চোখের মাঝে বর্শাটা বিঁধে গিয়ে গাঢ় থকথকে রক্ত গলগল করে পড়ছে। আর দু'হাত আসতে পারলেই সিন্ধু শাহজাদা শারিয়ারকে থাবার ভেতর পেতো। হোক তা বাঁদীর পেটে জন্ম। তবু তো ছেলে। দশ বছরের শাহজাদা শারিয়ার থরথর করে কাঁপছিল। বাদশা গিয়ে তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। ছেলের বুকের ধকধক হিন্দুস্থানের বাদশা নিজের বুকের ভেতর টের পেতে লাগলেন।

সবাই তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। তিরিশ চল্লিশজন হাবসি খোজা সিংহ-গুলোকে লোহার ফলায় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খাঁচায় ভরতে ব্যস্ত। সিংহের খেলা দেখানোর পাণ্ডা খোজা টার্ডিবেগ এই দুর্ঘটনার জন্যে অনুশোচনায় নিজের কোমরবন্ধ থেকে ছোট কারেদ ছুরি বের করে নিজেরই বুকে বসাবে বলে তুলছে—দেখতে পেয়েই উজিরে আজম আসফ খাঁ ছিটকে আশপাশের সেপাইদের চোখের ইশারায় বললেন, কয়েদ করো। তারা ছুটে গিয়ে তক্ষুনি টার্ডিবেগকে ধরে ফেললো।

বাদশার বুকের ভেতর দশ বছরের শারিয়ার। সেপাইদের হাতে বন্দী টার্ডিবেগ। বাদশার হুকুম ছাড়া কারও খুদখুশি হওয়ারও উপায় নেই। দু'জন আফগান মনসবদার বাদশার কাছাকাছি গিয়ে কুর্নিশ করে বললেন, এমন করে সিংহটাকে আটকানো শুধু চাঘতাই শক্তির পক্ষেই সম্ভব।

জাহাঙ্গীর বাদশা সামান্য হেসে বললেন, শক্তিই আল্লার ঐশ্বর্য! তাগদই খোদাতালার মোহর!! ইয়া তখৎ ইয়া তাবুৎ।—জানেন তো আপনারা?

মনসবদার দু'জনের দেখাদেখি হাজির সবাই একসঙ্গে ঘাড় কাত করলো।

বাদশা বললেন, এই তাগদেই চাঘতাইরা তখৎ-এ থাকে। থাকবে।—বলেই জাহাঙ্গীর শাহজাদা শারিয়ারকে নিয়ে তাঁর ডুরাসানা-মঞ্জেলের দিকে এগোলেন। সামনেই সুখদোলা। শারিয়ারকে নিয়ে তাতে বসতেই বাহেররা দোলা তুললো। দু'পাশের পর্দা পড়ে গেল।

এখন ছেলের মুখোমুখি বাবা। কারও মুখে কোনো কথা নেই। আল্লার ঐশ্বর্য তাগদ নিয়ে পয়দা হয়েও আজ যদি আমার এই ছেলেকে সিংহের থাবা থেকে বাঁচাতে না পারতাম তাহলে কী হতো? একথা ভাবতে গিয়ে বাদশার মনে পড়লো—বড়ছেলে শাহজাদা খসরু অন্ধ। আমারই আদেশে অন্ধ।

মেজো ছেলে শাহজাদা পরভেজ অপদার্থ। মহাবত খাঁর মতো জানবাজ জাঁহাবাজ আতালিক মুরুব্বি লাগিয়ে রেখেও তাকে নিজের পায়ে সাচ্চা মরদের মতো খাড়া করা যাচ্ছে না। এই তাজা উমরে না দাঁড়ালে আর কবে দাঁড়াবে? সেজো ছেলে শাহজাদা খুর্রম—বাবা খুর্রম—আব্বা হুজুর আকবর বাদশা আমায় আদর করে ডাকতেন—শেখুবাবা—আমার বাবা খুর্রমের চোখ দেখে বুঝি না—সে আমায় ভালোবাসে? না, আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে মতলব আঁটছে? থাকলো শেষে এই ছোট ছেলে—শাহজাদা শারিয়ার। এ কবে জোয়ান হবে? ততদিন কি আছি? কার হাতে চাঘতাই পতাকা দিয়ে যাবো? কাকে বসিয়ে যাবো আগ্রায়?

মানুষের মনে হাজারো ভাবনা একসঙ্গে একই লহমায় খেলা করে। একটা নতুন খবর কাসীদরা নিয়ে এসেছে। কথাটা এমনই—যার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমসের বের করা যায় না। দুনিয়ার বাদশাও তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। গুফতগু। যাকে বলে কানাকানি। পাটনা, আগ্রা, দিল্লি, লাহোর রাওয়ালপিণ্ডির মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে নূরজাহানের নামে কাটানো চৌকো নতুন মোহরকে ব্যাপারিরা, খদ্দেররা—আম মানুষজন নাকি মেহের বলে—মোহর বলে না। নয় রুপেয়ায় এক মেহের কেনে। কেনার সময় বলে মেহের। বেচার সময়েও বলে মেহের। বাদশাহির হুকুমনামায় মেহেরুন্নিসা নূরজাহান হবার পর এই চৌকো মোহর কাটানো। আসলে তামাম হিন্দুস্থানের মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে মেহেরকে নিয়ে আমার এই ভালোবাসার লড়কপনহাই চলছে। চলুক! হত খুশি চলুক! আমি তো মেহেরকে ভালোবাসি। আমি খোদার দোয়ায় আওরত জানি। জানি ভালোবাসা। তার পাশে বাদশাহী কী এমন? এক পেয়ালা সিরাজি আর ফুল ময়দার এক টুকরো রুটি নিয়ে এই ইনসান যদি ভরপুর থাকে—তো তোমরা আমার বাদশাহী নিয়ে যা ইচ্ছে কুচ্ছ করো—তাতে আমার কী যায় আসে! আমি আশিক্। মেহের মাশুকা! বাকি হিন্দুস্থান গোল্লায় যাক্। তাতে আমার কী! আমি মেহেরকে ভালোবেসে শুধুই আশিক! না ভালোবাসলেও আমি তামাম হিন্দুস্থানের বাদশা। তোমরা বাদশাও নও—আশিকও নও। তোমরা তাহলে কী?

ইংলিশস্থানের দূত টমাস সাহেব, ক'বছর হলো ওদের দেশের বাদশার কদরদানি জানাতে তিনখানা গাড়ি ভেট দিয়েছেন। এক একটা গাড়ি টানে আট আটটা বদক্‌শান ঘোড়া। তার একখানা বাদশার চলাফেরার জন্যে সবসময় লাহোর দুর্গে তৈরি থাকে। বাকি দু'খানা আগ্রায়। একটা চড়েন বেগম-ই-খোদ নূরজাহান। অন্যটা বাদশা জাহাঙ্গীর। এই গাড়ির নকশায় আরও ছ'-ছ'খানা গাড়ি তৈরি হচ্ছে। হয়ে গেলে এক এক খানা করে পাটনা, আজমির, দিল্লি, রওয়ালপিণ্ডি, মুলতান—চাই কি কাবুলেও রাখা হবে—বাদশার চলা-ফেরার আরাম কেতার জন্যে। গাড়ি ভেট দিয়ে ইংলিশস্থান

আগ্রার কাছাকাছি নীল চাষের সবটাই একা কিনে নেওয়ার মুসারিহৎ করে গিয়েছে। যতদিন না চারজোড়া বদকশান ঘোড়া এখানে গাড়ি না টানছে— ততদিন এই আট বেহারার সুখদোলাই ভালো।

দোলা থেকে ডুরাসানা-মঞ্জেলের সামনে নামতেই বাদশার সামনে এক কাসীদ কুর্নিশ করে এগিয়ে এলো। বাদশা বুঝলেন, তাঁরই জন্যে দাঁড়িয়েছিল।

কাসীদের হাত থেকে বটের আঠায় মোড়া লেফাফা খুলে পড়তে পড়তেই বাদশা জাহাঙ্গীর যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন—সেখানকার মাটিতেই হাঁটু গেড়ে বসে মাথা নুইয়ে জমিন বোস করলেন। তারপর দু'হাত আশমানের দিকে তুলে দোয়া করলেন। শাহজাদা শারিয়ার দেখলো, আব্বা হুজুরের দু'চোখেই পানির ফোঁটা।

শারিয়ার কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। আব্বা হুজুর তো কখনো এমন করেন না।

ঠিক এইসময় উজিরে আজম আসফ খাঁ সেখানটায় এসে পড়ায় শাহজাদা শারিয়ার বাদশার হাত থেকে খসে পড়া কাগজখানা মাটি থেকে তুলে এগিয়ে দিলো।

উজিরে আজম আসফ খাঁ কাগজখানা পড়লেন—

আলা হজরত আব্বা হুজুর
শাহী গোলাপ বাগে কাল
রাতে পহেলা কুঁড়ি ফুটেছে
আমি এখন আমার পহেলা
ছেলের ওয়ালিদদার
আপনার অনুগত দাস শাহজাদা খুর্রম

চাঘতাই দুনিয়ায় সর্বেসর্বা বাদশা। দীন দুনিয়ার মালিক একা বাদশা। বাকি সবাই গোলাম, উজির, বেগম শাহজাদা—সবাই দাসানুদাস। খতে মুসাবিদার মহবতও তাই।

আসফ খাঁর হাত থেকেও কাগজখানা পড়ে গেল। তারও চোখে শাহজাদা শারিয়ার দেখলো—পানি। এ তো বড় তাজ্জব! আজ কি চলছে। একটু আগে সে সিংহের থাবা থেকে বেঁচে ফিরেছে। এখন হিন্দুস্থানের বাদশা জমিন বোস করলেন—যা কিনা তাঁকে কখনো করতে হয় না। এই সিজদা বাদশার করার কথাও নয়। তারপর একই কাগজ পড়ে আব্বা হুজুরের মতোই উজিরে আজমের চোখেও জল।

আসফ খাঁ সামলে নিলেন। মুখে বললেন, এ তো খুশখবর বাদশা।

খবরটা আসফ খাঁর পক্ষেও খুবই খুশির। তিনি নূরজাহানের ভাই। বেগম-ই-খোদ হয়ে নূরজাহান তাঁর ভাই আসফ খাঁর মেয়ে আরজুমন্দ বানুকে শাহজাদা খুর্রমের সঙ্গে বিয়ে দেন। সেই আরজুমন্দ পর পর তিন মেয়ের পর এই প্রথম ছেলের মা হলো।—যদিও প্রথম দু'টি মেয়ে নেই। কোলের মেয়েটির এখনো এক বছর বয়স হয়নি।

বাদশা সামলে নিয়ে বললেন, খবর দিন আমি বাবা খুর্রমের দৌলতখানায় আওলাদের মুখ দেখতে যাবো। ওখানেই নয়া মেহমানের খাতিরে দোগুনী ঈদ মানাবো।

আন্নাসাগরের তীরে ছাউনি জুড়ে হৈ-হল্লা শুরু হয়ে গেল। নফরখানায় কে যেন বাংলা মুলুকের দগর ঢাক বাজাতে লেগে আছে। আনন্দ থামায় কে!

ওদিকে আজমিরের শহরতলিতে তখন অন্য ছবি। মেবার থেকে একটানা তিনদিন ঘোড়া ছুটিয়ে এসে শাহজাদা খুর্রম তাঁর পয়লা আওলাদের মুখ দেখেছেন। হেকিম আবদুল হাজি সিরাজির বয়স হয়েছে। ঠিক তেইশ বছর আগে এই হেকিমেরই দেখাশুনোয় শাহজাদা নিজে পয়দা হন। আরজুমন্দ বেগম ভালোয় ভালোয় মা হওয়ায় খুর্রম একটা রুপোর থালায় একশো আশরফি হেকিম সাহেবের সামনে ধরলেন।

সিরাজি সাহেব বুড়ো হয়েছেন। তিনি তাজাকি ইউনানি হেকিম। আকবর বাদশার টানে নানা জায়গা থেকে নানা রাস্তার গুণীজন—হেকিম, বারুদদার, জ্যোতিষ-গণক হীরাট, কান্দাহার, কাবুল পেরিয়ে থলচোটিয়ালের পাহাড় ডিঙিয়ে আগ্রায় চলে আসেন। আবদুল হাজি সিরাজি তাঁদেরই একজন। এসেছিলেন যখন—তখন ছিলেন জোয়ান। বাচ্চা পয়দা করানোয় পাকা হাত। হামেশাই আমীর ওমরাহদের খাসকুঠিতে ডাক পড়ে তাঁর। ছেলেরা বড় হয়ে কেউ পেশাদস্ত, কেউ বা লস্করে। বিবির এন্তেকালের পর একটি অল্প-বয়সী হায়দরাবাদি মেয়ে নিকা করেছেন। তাঁর বড় ফুলের শখ। তাই সিরাজি সাহেব একটি মাত্র আশরফি তুলে নিয়ে বললেন, বহুত খুব। আমার কোনো অভাব রাখেননি আপনারা। শুধু একটা জিনিস চাইবার ছিল আপনার কাছে—

তিন মেয়ের পর ছেলে হওয়ায় শাহজাদা খুর্রম খুব খুশদিল এখন। বললেন, যা চাইবেন তা-ই আপনার—

বিশেষ কিছু নয়। আগ্রায় দেওয়ানি খাসের গায়ে আঙুরিবাগ থেকে যদি আমায় দুটি সেঁউতির চারা দেন—

ব্যস! আর কিছু নয়?

এই বা কম কি? শাহী দরবারের জেনানা মহলের আঙুরিবাগের সেঁউতি চারা তো অনেক।

আপনি নিশ্চিন্তে বাড়ি যান। সেঁউতিচারা আপনার দৌলতখানায় পৌঁছে যাবে।—বলে সিরাজি সাহেবকে শাহজাদা বাও শুক্রিয়া কাজা করলেন। তারপর ঝাল্লার হ্রদের পাশ দিয়ে খাজা মৈনুদ্দিন চিসতির দরগাহে চললেন। খালি পায়ে। ঘোড়া বাঁধা থাকলো টিলার নিচে।

জায়গাটি খুবই শান্ত। দূরে দূরে আবছা মতো পাহাড়। শাহজাদা খুর্রম হাঁটু গেড়ে বসে নয়া মেহমানের জন্যে অনেকক্ষণ ধরে মোনাজাত

করলেন। তারপর পাথুরে ধাপ বেয়ে কী যেন ভাবতে ভাবতে নিচে নেমে এলেন। আরজুমন্দ বেগমের বড় ইচ্ছে—তিনি খাজা সাহেবের বরকতে সিন্নি চড়াবেন। কিন্তু এখনই বেগমকে এতগুলো ধাপ বেয়ে ওপরে উঠতে দেওয়া যায় না। আরজুমন্দের কাছে খুর্রম খুবই কৃতজ্ঞ। কী এক গোপন ভালোবাসায় আরজুমন্দের মুখখানি তার বুকের কাছে ফুল হয়ে ফুটে উঠলো। সে ফুল শুধু খুর্রমই দেখতে পাচ্ছেন। আর কেউ নয়। আরজুমন্দ আমায় ছেলে দিয়েছে। তিন মেয়ের পর। আকবর বাদশার বিধানে চাঘতাই বংশের মেয়েদের বিয়ে হয় না—তারা তখতেও বসতে পারে না। সেজন্যে চাই ছেলে। এতদিন কোনো ছেলে না হওয়ায় খুর্রমের মনে সব সময় পাহাড় জমে ছিল। শাহজাদা খসরুর ছেলে দাওয়ার বকস্ বেড়ে উঠছে চোখের সামনে। আরজুমন্দ মুখ রাখলো শেষমেষ। সবটাই খোদার মেহেরবানি।

আন্নাসাগরের এক তীরে বাদশাহী ছাউনি। তার গা দিয়ে আজমির থেকে পুষ্কর যাবার রাস্তা চলে গেছে। এর রুজু রুজু ঠিক উল্টোদিকে আরেক তীরে শাহজাদা খুর্রমের ছাউনি।

বাদশা জাহাঙ্গীর এলেন সময়মত। তাঁর জন্যে তোরণ হয়েছে। খাটানো হয়েছে দশ খুঁটির ওপর চৌবীন রৌতি তাম্বু। দড়িগুলো রেশমের। ওপরে চন্দ্রাতপের মতোই সুলতানি বনাত। ভেতরে বেনা বোনা খসখসের চাল। তা আবার কিংখাব আর মখমল দিয়ে ঢাকা।

বাদশা একা আসেননি। সঙ্গে শাহজাদা শারিয়ার। কাল সিংহের মুখে পড়া ইস্তক সে প্রায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। এই বালককে ফুর্তিতে ভুলিয়ে রাখতেই বাদশা তাকে এই আনন্দ উৎসবে সঙ্গে করে এনেছেন।

আগ্রা দুর্গে ধাইমায়েদের কাছে গল্প-কথায় শারিয়ার প্রথম পাঁপির শরবতের কথা শুনেছিল। শুনেছিল এই শরবত খেলে নামধাম পরিচয় ভুলে যায় মানুষ। গোয়ালিয়র দুর্গে নাকি দুর্দান্ত বন্দীদের ওই শরবত খাওয়ানো হয়। খাবার পর বন্দী যতদিন বাঁচে একা একা নিজের পরিচয় হাতড়ে বেড়ায় মনে মনে। তবে কি ওই সিংহটা অল্পক্ষণের জন্যে হলেও তার জঙ্গলের কথা মনে করতে পেরেছিল ? নাহলে ঘোরের ভেতর অমন ঝাঁপিয়ে পড়বে কেন ?

বাদশা জাহাঙ্গীরের আজ বড় সুখের দিন। তাঁর সবচেয়ে সেরা আওলাদ —বাবা খুর্রমের পয়লা ছেলের মুখ দেখবেন। তাঁর সামনে শাহজাদা খুর্রম হাঁটু গেড়ে বসে কদম-বোসি করছেন। দু'ধার থেকে বাদশার ওপর খইয়ের চেয়ে কিছু ভারি ফিনফিনে রুপোর পাতে তৈরি নিসার ফেলা হচ্ছে। চৌবীন রৌতীর বাইরেই আজমিরের পাথুরে মাটিতে একটা নতুন দিনের তাজা রোদ্দুর এই মাত্র লাফিয়ে পড়লো। হিন্দুস্থানের সাবেক কেতার লাজবর্ষণের ধাঁচে ছড়ানো নিসারগুলো—মাটিতে পড়েই ঝিকমিক করে উঠলো। তাতে টাঁকশালের ছাপ দেখতে পাচ্ছিলেন বাদশা জাহাঙ্গীর।

বাদশা মনে মনে বলে উঠলেন, বেঁচে থাকাটাই কত আনন্দের। এখানে

এত সুখ। খুর্রমের মতো তাগদদার ছেলে। নূরজাহানের মতো মাশুকা। আগ্রার মতো হিন্দুস্থানের বাদশাহী। জঙ্গী হাতির খেলা দেখা। গোলামদের হুকুম দিতেও এত ভালো লাগে। এক সঙ্গে দুই গুলি আফিমের মৌতাত। স্বাদু রস ভর্তি নাসিকি আঙুর। গির জঙ্গলে সিংহ শিকার। তোপ দেগে দুশমনদের উড়িয়ে দিতে কী আনন্দ। ইনসানের এ জীবনে মোনাজাত একটাই—খোদা আমাকে সহি সলামত রাখো। আশীর্বাদ করে—জিও হাজার বরষ। আমি মরতে চাই না। আমি বুড়ো হতে চাই না। কেয়ামতের দিন একবারে সব হিসাব দেবো।

শাহজাদা খুর্রম উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বাদশার কদম মোবারকে হাজার আশরফি নজর রাখলেন। রেখে বললেন, আব্বা হুজুর এবার ছেলেটির নাম রেখে দিন। আপনার নাম নিয়ে সে দুনিয়া জয় করুক।

জাহাঙ্গীর হাসলেন। হেসে বাবা খুর্রমের চোখে তাকালেন। খুর্রম চোখ নামিয়ে নিলেন। বাদশার মনটা এক'লহমার জন্যে কেঁপে উঠলো। তবে কি? তবে কি?

ভাববার সময় পেলেন না বাদশা। একখানা বড় বদকশানি মার্বেল পাথরের থালায় শোয়ানো নয়া মেহমান। চারদিক সফেদ নরম আলচি দিয়ে ঢাকা।

বাদশা একটি মাত্র আশরফি ছুঁয়ে উল্টে রেখে দিলেন। তার মানে বাদশা এ নজর নেবেন না! উল্টে তা শাহজাদাকেই বকশিশ করলেন। বললেন, আজ থেকে এই নয়া মেহমান—সুলতান দারাশুকো।

সঙ্গে সঙ্গে চৌবীন রৌতীর বনাতের বাইরে বেনারসি সানাইয়ের সঙ্গে বিদরি ঢোল আর বাংলা দগর বেজে উঠলো। আজ দিনটা বড় সুন্দর।

॥ চার ॥

ঝাল্লার হ্রদের গায়েই সুলতানি বনাতের নিচে আরজুমন্দ বেগমের সরপর্দা তাম্বু! খাজা সাহেবের দরগাহর দিক থেকে সকালের পয়লা রোদ চিলমনের ফিকা কারুকাজের ভেতর দিয়ে বিছানায় এসে পড়তেই আরজুমন্দের ঘুম ভেঙে গেল। মায়ের মন। পাশেই তাঁর প্রথম ছেলে ঘুমিয়ে।

তাকিয়ে দেখেন—ওমা! কখন ঘুম ভেঙে তাকিয়ে আছে। বুকের ভেতরটা গর্বে, আবেগে ভার হয়ে উঠলো আরজুমন্দের। ছ'দিনের শিশু। এখনো দৃষ্টি হয়নি। চাঘতাই বংশের নীল চোখ। মুখের পর ঝুঁকে পড়ে মায়ের বুক কেঁপে উঠলো। একি? ঠিক দেখছি তো?

আরজুমন্দ বেগম গুলালবার এই তাম্বুর কাঠের দেওয়ালের কাছে গিয়ে রেশম ডোরি ধরে দু'বার টান দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডানদিকে কয়েক পর্দার ফারাকে রুপোর ঘণ্টা বেজে উঠলো।

শাহজাদা খুর্রম ভেতরে এলেন। কী ব্যাপার? এখুনি উঠে পড়লে! তোমার খুব ঘুমোনো দরকার বেগম।

কোথায় আর ঘুমোলাম ! দেখবে এসো—

কী।

ছেলের মুখে দেখো।

খুর্রম ছুটে এলেন। গুজরাতি, রঙিন মখমলের ভেতর শিশু তখন হাত পা ছুঁড়ছে। ছ'দিন আন্দাজে বেশ লম্বা। খুর্রম সুলতান দারাশুকোর মুখে ঝুঁকে পড়লেন। ভালো করে দেখলেন। খুব ভালো করে। কপালের ওপর চাঁদির শুরুতেই বাঁ দিকে এক ফোঁটা এক তিল। না, ভুল হয়নি। ঠিকই দেখেছেন শাহজাদা খুর্রম। দেখে উঠে দাঁড়ালেন।

কী হবে ?

এ কথায় আরজুমন্দের মুখে তাকালেন খুর্রম। তিন মেয়ের পর তবে এই ছেলে। সেই ছেলের চাঁদিতে তিল-তাও বাঁদিকে। জিনিসটা ভালো নয়। যদি ডান দিকে হতো তো খুবই শুভ হতো। কিন্তু বাঁ দিকে। নিজের চোখ যাতে কেঁপে না ওঠে—সেদিকে খেয়াল রেখে খুর্রম বেশ তাচ্ছিল্য করেই বললেন, মাথায় চুল হলে ঢাকা পড়ে যাবে।

বলে বেরিয়ে আসার সময় নিজের মনে মনেই বললেন খুর্রম—যে সবাইকে শাসন করবে, তার কপালে কোনো দাগই থাকবে না। বেগমের তাম্বুর বাইরে এসে শাহজাদা খুর্রম ভালো করে আকাশে তাকালেন। ভোরের আসমানে মেঘের কোনো দাগ নেই। ঝাল্লার হ্রদের জলে পানকৌড়ি ঝুপ করে পড়েই সারা গা ডুবিয়ে গলাটা তুলে এগোচ্ছে। শাহজাদা তাড়াতাড়ি নিজের ফরাসখানার পাশ দিয়ে যেতে যেতে ঝোলানো আয়নায় তাকালেন। উষ্ণীষ তুলে নিজের মুখ দেখলেন ভালো করে। না, কোনো দাগ নেই। তিল বা জড়ুলের জন্ম দাগদাগালির কোনো বালাই নেই। তাহলে ? হায় খোদা ! আমার একমাত্র ছেলের কপালে—তাও চাঁদির বাঁ দিকে অমন তিল হতে গেল কেন ?

ঠিক এই সময় বাইরে থেকে একটা হই হই আওয়াজ উঠে এলো। কী ব্যাপার ? তাম্বুর বাইরে বেরিয়ে এলেন শাহজাদা।

একটা কটু গন্ধে খুর্রমের নাক জ্বলে উঠলো। ঝাঁঝ। সেই সঙ্গে মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো গন্ধ। একটা শেরগির হাতিকে কিছুতেই সামলাতে পারছে না মাহুত। তার ভৈ আর মেঠ রীতিমত হিমশিম খেয়ে যাবার যোগাড়। হাতিকে হাটু গেড়ে বসাতে চাইছে, আর সে শুঁড় তুলে চারদিকে জল ফোয়ারা করে ছিটোচ্ছে। ফুরিয়ে গেলে শুঁড় নামিয়ে ঝাল্লার বুক থেকে সোঁ সোঁ করে জল শুষে নিয়ে আবার ফোয়ারা তুলছে।

ভালো করে দেখলেন শাহজাদা। হাতির পেছনের দুই পা পাটকিলে হয়ে ভিজে গেছে। যা ভেবেছেন ঠিক তাই। হাতি এখন মসত্ হয়ে আছে। যে কোনো কাণ্ড করে বসতে পারে। এদিক ওদিক ছুটে চাই কি আরজুমন্দ বেগমের তাঁবুতে গিয়েও পড়তে পারে। এই সময়টায় সঙ্গীর খোঁজে ওদের মাতোয়ারা দশা হয়।

তবু উতলা হলেন না শাহজাদা খুর্রম। মসত্ হাতি এক বিরাট শুভ

চিহ্ন। মঙ্গল দৃশ্য। বাবা হয়ে এ ছবি দেখায় তার ছ'দিনের ছেলে সুলতান দারাশুকোর কুচিহ্নের বিপদ কি মুছে যাবার? শাহজাদা ছুটে গিয়ে হাতিটার সবে নামানো শুঁড়ে পা রেখেই আরেক পায়ে বাঁকানো দাঁতের ওপর পা বদলালেন। বদলেই সঙ্গে সঙ্গে মাথায় ভর দিয়ে মাহুতের জায়গায় নিজেকে শক্ত করে বসালেন। তারপর কীলক খুঁচিয়ে হাতিকে ধাতে আনার চামড়ার পটিতে বাঁ পায়ের চাপ দিলেন জোরে। পর পর তিনবার। হাতি কেঁপে উঠে থমকে দাঁড়ালো।

চারদিকে দাঁড়িয়ে পড়া সিপাই, লস্কর, মজুর, ভিস্তি সবাই এতক্ষণ বিপদ গুনছিল। হাতিকে স্থির হতে দেখে অনেকগুলো বুকের ভেতর হাতুড়ি পড়া বন্ধ হলো। একজন চাঘতাইয়ের উপযুক্ত বেপরোয়া ভঙ্গিতে শাহজাদা খুর্রম হাতি থেকে অবলীলায় নামলেন। মাহুতের যে এগিয়ে গিয়ে শাহজাদাকে নামতে হাত লাগানো দরকার—তাও সে ভুলে গিয়েছিল। সবই ঘটে গেল কয়েক লহমায়।

এই হাতি যেমন শক্তি—এই হাতি তেমনই বোঝা—যদি বিগড়ে যায়। বেগড়ানো হাতিকে গুলি করে মারা ছাড়া কোনো পথ নেই। আব্বা হুজুর বাদশা জাহাঙ্গীর হাতির একজন বড় কদরদার। তাঁর হুকুমে শাহী খাসা হাতির জন্যে এখন শরাব বরাদ্দ। শরাব খেয়ে খেয়ে হাতিগুলোও দিব্যি ফুর্তিবাজ হয়ে পড়েছে। কাল ভোরে বাদশা আগ্রা পাড়ি দেবেন। বলা যায় না—খাসা হাতিগুলো ছ'দিনের রাস্তা ফুর্তিতে পাঁচদিনে ভেঙে আগ্রা পৌঁছে যেতে পারে।

বাদশার আগ্রা ফেরার পথে চৌকিতে চৌকিতে খবর হয়ে গেছে। রাস্তা আগাগোড়া সাফ থাকা চাই। সে-পথে যেন কোনো কানা, খোঁড়া কিংবা রোগা ভোগা লোক না পড়ে। দুর্ভাগা, বেদৌলতি বাদশার দু'চোখের বিষ। এই পথ দিয়েই আরজুমন্দ বেগম আগ্রায় ফিরবেন। বাদশার তাবিনের সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে জাহানারা—ছেলে দারাকে নিয়ে ফেরা। রাস্তার খবর তাই জানার দরকার ছিল শাহজাদা খুর্রমের।

জীবন এত মধুর লাগে শাহজাদার। আগ্রার দশেরি আম, আজমিরের সোঠির ঠাণ্ডা শরবৎ, আন্নাসাগরের তীর ধরে তুর্কি ঘোড়া দাবড়ানো—মনে হয় শরীর এই দুনিয়ার তাজা হাওয়া শুষে নিচ্ছে। কোনো ক্লান্তি নেই। সামনে শুধু সুখ। বেগম আরজুমন্দের মুখখানি, মেয়ে জাহানারার হাসি—তাকে যেন কেমন শান্তি যোগায়।

সারা হিন্দুস্থানে একই সঙ্গে কত কি ঘটে চলেছে। হীরাট, কান্দাহার, কাবুলের মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে যখন গেঁহু ওঠে তখন কনৌজ, কাশী, কামরূপের চাষীরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। কবে মেঘ হবে। ভালো বাদারিয়া হলে তবে জমি ভিজবে—জমি ভাসা হবে। লদলদে কাদায় কল বেরোনো ধান ফেলা হবে।

ধাই মায়ের কোলে চড়ে জাহানারা ভাই দারাশুকোকে দেখতে এসেছে। মা

আরজুমন্দ কোনো বাদশাহী কেতার পরোয়া করেন না। তিনি আর পাঁচজনের মায়ের মতোই জাহানারাকে কোলে বসালেন। ছেলে হতে গিয়ে বেশ ক'দিন মেয়ে জাহানারাকে কাছে পাওয়া হয়নি একদম। তিনি দু'হাতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন। হোক শাহজাদী। আমার তো মেয়ে। আমি চাঘতাই নই।

জাহানারা মায়ের কোল থেকে খুদে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। এক শিশু আরেক শিশুকে দেখছে। এখানে দুনিয়া স্থির হয়ে আছে। তাম্বুর বাইরেই মানুষ তাগদের জোরে ইজফা আদায় করে ওপরে ওঠার জন্যে অবিরাম কোশিশ চালিয়ে যাচ্ছে।

ঠিক এই সময় গঙ্গার গা ধরে ছদিন নাগাড়ে ঘোড়া দাবড়ালে তবে কাশী। কাশীর চেহারা এখন কিছু অন্যরকম। সময়ের চাকায় এক একটা কাঠি এক এক রকমের। দুনিয়াদার একজন সাচ্চা তসবিরওয়ালা। তাঁর এক তসবিরের সঙ্গে আরেক তসবিরের কোনো মিল নেই।

সুবে এলাহাবাদের জৌনপুর, চুনারের মতো বেনারসও একটা সরকার। তার মহল আটটি। সরকার বেনারসকে সবাই কাশী বলে থাকে। গঙ্গার গায়ে এই কাশী কবে হলো তা নিয়ে অনেক কালের অনেক কথা।

কিন্তু এখন এই সকালবেলাতেই গঙ্গার গা ধরে সবাই যে পালাচ্ছে। যে যেদিকে পারে। ঘোড়ায়, গো-গাড়িতে, কোনো কোনো জমিদার ঘোড়া বা হাতির পিঠে চড়েই পালাচ্ছে। বড় বড় বজরায় লোক ভর্তি হয়ে ঠাসাঠাসি করে পালাচ্ছে। দিগ্বিদিক শূন্য।

চুনার গলি, মণিকর্ণিকায় কেউ বা লাশ ফেলে উধাও। বসতবাড়ির সদর দরজা খোলা। ভেতর থেকে মানুষের গোঙানি। মাণ্ডিতে বাজার বসেনি। দশাশ্বমেধ ঘাটে অন্যদিন এই সময় স্নান-আহ্নিকের ভিড় লেগে থাকে। লেগে থাকে মল্লদের তেল মাখামাখি আর মেহনতির হুমহাম, বড় বড় নিঃশ্বাস ছাড়ার আওয়াজ। একটা পায়রা অব্দি নেমে আসেনি ঘাটে।

এমন সময় দেখা গেল—ঘাটে মাথা নেড়া এক বুড়ো মাথার পেছন দিকে শিখা ঝুলিয়ে দিয়ে দু'হাত তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে। তার দুই চোখে জল। তিনি হাত তুলে বলছেন—কাশীকে বাঁচাও। এই অপঘাত থেকে কাশীকে বাঁচাও। রামচন্দ্রজি আমরা তোমার ভক্ত। কাশী না থাকলে হিন্দুস্থান থাকবে না।

অন্য সময় হলে এই বুড়ো ঘাটে এলে সমীহ করে জায়গা ছেড়ে দেয় সবাই। ঘাটে তার ইদানীং আসা হয়নি বড় একটা। বয়সের ভার। মাঝ বয়সে দীর্ঘদিন মথুরার কাছে জঙ্গলেই থাকতেন। সামান্য খাওয়া—সামান্য ঘুমে অভ্যস্ত এই মানুষটি আজ বড় বিচলিত। এত বড় ঘাটে তিনি এখন একা। এখানে এখন তাঁকে সম্ভ্রম করারও কেউ নেই।

কাশীর রাজা তাঁকে বলেন—কবি। সাধারণ মানুষজন তাঁকে সন্ত বলে।

বুড়ো এখন কাঁদতে কাঁদতে বলছেন—

সিয়ারাম একদিন তোমার দিকে আমার মন আমার স্ত্রী রত্নাবলীই উসকে দিয়েছিলেন। তখন আমি যুবক। রত্নাবলীকে দেখতে ছুটে গিয়েছি। তিনি ধিক্কার দিয়ে বলেছিলেন—

লাজ ন লাগত আপকো, দৌরে আ এ হুনাথ
ধিক ধিক ঐসে প্রেমকো, কহা কহোঁ মৈঁ নাথ।

সিয়ারাম এবার কোকিলের থেমে যাবার সময় হয়ে এসেছে। চুহা-বিমারিতে কাশী উজাড় হয়ে গেল। দরিয়ার ওপার থেকে বিদেশী নাবিকরা এ রোগ নিয়ে এসেছে। লাশে আগুন দেবার লোক নেই মণিকর্ণিকায়। কাশী যে সাবাড় হয়ে যায় সিয়ারাম। কোকিল এবার মৌন হবে—

তুলসী পারস কে সময়
ধরী কোকিলন মৌন

বলতে বলতে মানুষটি ঘাটের ধাপে উঠে এলেন। ইনি কবি তুলসীদাস। আজ তাঁর বার বার এই বিরাট মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মনে পড়ছে রত্নাবলীর কথা—

অস্থি চরমময় দেহ মম, তামেঁ জৈসী প্রীতি
তৈসী জো শ্রীরাম মহঁ, হোতি ন তৌ ভরভীতি

সিয়ারাম শুধু তোমাতেই আমার প্রীতি। আর সেই তুমি কাশীর এ কী করলে? বলতে বলতে তুলসীদাস মন্দিরের সামনের রাস্তা দিয়ে চলেছেন। খানিক দূর গিয়ে দেখেন—কাশীর রাস্তায় শাহী সিপাইরা এদিক ওদিক মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। কোমরের তলোয়ার, বিরছা কুড়ুল, হরসিংজটা খাণ্ডা পথেই গড়াগড়ি যাচ্ছে। তাদের ঘোড়া সওয়ার ছাড়াই এদিক ওদিক ঘাস জমিতে নেমে ঘাস খাবার চেষ্টায় ব্যস্ত। তাজ্জব! যতই এগোন তুলসীদাস—ততই দেখেন এদিক ওদিক সেপাইরা পড়ে আছে। কেউ বা গোঙাচ্ছে। কেউ বা শেষ খিঁচুনির পর আকাশ দেখতে দেখতে চোখ উল্টেছে। আরও তাজ্জব দামি দামি তৈজস, মটরমালা, কাশ্মীরী তুষ—সবই রাস্তায় গড়াচ্ছে। তুলসী-দাসের মনে পড়লো—অনেকদিন আগে শুনেছিলেন—হিন্দুস্থানের বাদশা আকবর। তারপর অনেক কাল কেটে গেছে। মানুষ মরণশীল। এখনো কি আর তিনি আছেন! এ সব সিপাই নিশ্চয়ই টেঁটিয়া কোনো গ্রাম কি গঞ্জ শায়েস্তা করে লুটের মাল নিয়ে ফিরছিল। পথে চুহা-বিমারিতে সব সাবাড়। আরও এগিয়ে তুলসীদাস দেখেন—তিনটি ঘর গেরস্থালি যুবতী আর জনা পাঁচেক কিশোরী। পিছমোড়া করে বাঁধা। সেই অবস্থাতেই ওরা মরে পড়ে আছে। এক কিশোরীর চোখ কয়েতবেলের মতো ফোলা। তুলসীদাস এগোতে লাগলেন। হিন্দুস্থান এক আজব দেশ! এ দেশে কে সুলতান—কে বাদশা—সে মানুষ? না বাঁদর?—তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। জানার ইচ্ছাও নেই মানুষের। সিপাই সান্ত্রীরা অভিযান চালালে তারা জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। লুটের মালের ভারে কুঁজো হয়ে সিপাইরা ফেরে। তাদের ফেরার পথের

দুধারও জ্বলে খাক হয়ে যায়। হয়তো এমনই কোনো শায়েস্তা অভিযানের পর সিপাইরা ফিরছিল। এদের সেনাপতিকে তো দেখছি না। সবাইকে রক্ষা করো সিয়ারাম।

চড়চড় করে রোদ উঠেছে এখন।

কোথায় আজমির—কোথায় কাশী—আর কোথায়ই বা খুন্তাঘাট। যেখানে যত মানুষ—সেখানে তত কিস্সা। নদী, পাহাড়, জঙ্গল দিয়ে—কোনো জায়গা বা রাত দিয়ে এক মানুষের ঘটনার ঘনঘোর আরেক মানুষের ঘনঘটা থেকে আলাদা করে রাখা হয়। নইলে কারও যদি একই সঙ্গে সব দেখার ক্ষমতা থাকতো—তো সে বেবাক দেখে ফেলে থ হয়ে যেতো। আমরা ওভাবে একসঙ্গে দেখতে পাই না। তাই আলাদা আলাদা করে কাজ ও কারণ সাজাই—আলাদা আলাদা করে পরিণাম ভাবি।

এখন এই মুহূর্তে ব্রহ্মপুত্রের ভাটিতে তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে মির্জা ইউসুফ বেগ। দু'হাজারি মনসবদার। তার পায়ের নিচে যে রাস্তাটা—সেটা এ-জঙ্গল সে-জঙ্গল ঘুরে খুন্তাঘাটে গিয়ে পড়েছে। এখন সকালবেলা। পাহাড় আর সমতল মেশানো এই সবুজ দেশটায় এখন নানারকমের ফুল ফুটে আছে। আরেকটু বেলা পড়লেই চাঁছাছোলা রোদে সব ফুল মরে যাবে।

ইউসুফ বেগের ছায়া দেখলে মনে হতে পারে সে বুঝি যুবা। কিন্তু তা নয়। মধ্যবয়সী এই উজবেক লড়াকু হিসেবে সারা শাহী লস্করে পয়লা নম্বরের সেপাই। নীল চোখ। রুক্ষ মুখশ্রী। বাবরি চুলের ওপর সোনালি রংয়ের পাগ-বন্ধন জড়ানো। বোঝাই যায় কার জন্যে যেন অপেক্ষা করছে। তার পলকহীন দৃষ্টিপথে খুন্তাঘাটের জঙ্গল। বুকের ওপর বর্মে আঁকা ফুল ঘিরে একটা বুনো মাছি খালি পাক খাচ্ছিল।

হঠাৎ ইউসুফ বেগের কান খাড়া হয়ে উঠলো। তার আগে তার পায়ের কাছে দাঁড়ানো উজবেক কুকুরটির কান খাড়া হয়ে গেছে। হ্যাঁ। ঘোড়া দাবড়ে আসা ক্ষুরের শব্দ একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

এবার একটু বাদেই দু'পাশের বড় বড় গাছপালার ভেতর ঘোড়ার পিঠে যে-মানুষটির মাথা স্পষ্ট থেকে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো—সে আর কেউ নয়—আহেদি-ই-আজম—মীর সফি। তুর্কি ঘোড়ার পিঠে প্রতিটি দুলকি বলগার সঙ্গে সঙ্গে তার টান টান শরীরটা উঠছিল পড়ছিল। সফির কোমরে ঝোলানো বিরছা কুড়ুলটাও সেই সঙ্গে সঙ্গে উঠছিল পড়ছিল।

সামনা সামনি এসে মীর সফি সহবৎ বজায় রেখে হাত কয়েক দূরে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামলো। নেমে প্রথা মতো কুর্নিশ জানিয়ে বললো, দেরি করিনি আশা করি—

—না না। আমিও তৈরি—

এর পরই দেখা গেল—মির্জা ইউসুফ বেগ আর মির সফি যে-যার ঘোড়ায় বসে হালকা চালে চলেছে। যে পথ দিয়ে সফি এসেছেন—সেই পথেই ওরা

চলতে লাগলো। এই প্রথম বসন্তে ঘোড়ার পায়ের শব্দ এখানকার আকাশ ছোঁয়া গাছপালার গা-ঝাড়া দেওয়া বাতাসের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল।

সেই শব্দ শুনে ইউসুফ বেগের মনে হলো—কেউ বুঝি এই সবুজে সবুজ বনসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গত করে চলেছে।

আহেদি হতে হলে অল্প বয়সেই জংবাজ লড়াকু হওয়া চাই। মীর সফি তাই। এরা খাস বাদশার তাবিনের লোক। কোনো মনসবদারের তাঁবে যাওয়ার কথা নয় সফির। কিন্তু আগ্রা থেকে হুকুম এলে হামলা বা অভিযানে তাকে মনসবদারের সঙ্গী হতেই হবে। তাঁবে না থাকলেও সফি জানে—বয়স হলে সেও একদিন ইজফা পেয়ে মনসবদারিতে উঠবে।

আগ্রার কাছাকাছি সাকেৎ ছাউনিতে থাকতে থাকতে সফি একদিন যমুনার পাড় ধরে ঘোড়ার পিঠে বসে গা গরম করছিল। আগ্রা থেকে দু'মঞ্জিল এগোতেই আকবর বাদশার বিখ্যাত ফতেপুর-সিক্রি। পোড়ো-নগরী ধুলো মেখে পড়ে আছে। ঠিকানা শুধোবার মতো কোনো পথিকও নেই। পণ্ডিতদের বৈঠকী কথাবার্তার জন্য বানানো বাদশার সাধের ইবাদতখানা উঁচু মাথা তুলে দাঁড়ানো। তার পাথরে পাথরে তখনো রোদের ঝিলিক। তারই বুরুজে বসা এই উজবেক মনসবদারকে তখন প্রথম দেখতে পান মীর সফি। ইউসুফ বেগ ইবাদতখানার বুরুজে বসে তাকিয়ে ছিলেন দূরে, ঠিক উল্টোদিকে আকবর বাদশার লাল পাথরের পাঁচমহল সমাধির দিকে—সমাধির ভেতর যেখানটায় হিন্দুস্থানের শেষ বীর বাদশা আকবর শুয়ে—তার ওপরকার শ্বেত পাথরের ফুলের দিকে।

ঘোড়ার পায়ে পায়ে উজবেক কুকুর তার মালিকের সঙ্গী হয়েছে। ঘোড়ার পিঠে একজন হেলমন্দ উপত্যকার যুবক। অন্যজন চাঘতাই পাহাড়ে উজবেক গিরি-বনানীর ভেতর ঘোড়া দাবড়ে বেড়ে ওঠা মাঝবয়সী মনসবদার।

আউয়ল আর জুলহিজ মাসে নগর-বন্দরে জানোয়ার জবাইয়ের বারণ আকবর বাদশার হুকুমত থেকেই চলে আসছে। এ জায়গা নগরও নয়—বন্দরও নয়। একটা বর্বরী ছাগল জবাই হয়েছিল কাল। তারই সুসিদ্ধ করেলি মাংস বন্য মধুতে ভিজিয়ে নাস্তা সেরেছে ইউসুফ বেগ। তার ভালোই লাগছিল বনবাতাসের সঙ্গে তালে তালে ঘোড়ার পায়ের খটাখট। সে বলে বসলো, এই তুর্কি ঘোড়াগুলো যেন সঙ্গত জানে—

ঘোড়ার পিঠে বসা মীর সফি তখন ভাবছিল—এই তো জুলহিজ মাস শেষ হতে চললো। এরপর ভীষণ গরম পড়বে। বসন্তের বাতাস তেতে উঠবে সেই বাতাসে। তখন ঘোড়ার কষেও ফেনা এসে দেখা দেবে। আচমকা ইউসুফ বেগের কথার শেষটা তার কানে ঢুকলো। সে সাকেৎ ছাউনিতে রাতের মাইফিলে সঙ্গতীয়া নাচনেওয়ালিদের নাচ দেখেছে। ফট করে বলেই বসলো, বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে ঠিক যেন ডুগি তবলা!

বাঃ! তুমি তো দেখছি সমঝদার। বলো তো যুবক—ডুগি তবলা কে বানিয়েছিলেন?

এ কি কথা শুনি মনসবদারের মুখে ? ঠিক যেন এই ভাবনা নিয়েই ঘোড়ার রাশ টেনে থামালেন মীর সফি। হামলা, কয়েদ, খতম, লড়াই, ফাঁসি, জাহান্নম, হুকুমত—এইসব কথাই তো ওদের জবানিতে লাগসই। সফি থতমত খেয়ে বললো, কে ?

আমির খসরু। হিন্দুস্থানের সাবেক মৃদঙ্গ ভেঙেই ডুগি তবলার জন্ম দেন তিনি। বেনজির বুজুর্গ ছিলেন মানুষটি—কতদিকে যে তাঁর মাথা খেলতো।

ঘোড়া থেমে নেই। মীর সফি শুনেছিলেন, ইউসুফ বেগ সারাদিনের পর নিজের তাম্বুতে ফিরে গহেরা রাত অব্দি কেতাব খুলে বসে থাকে। এমনিতেও ওর চেহারার মতোই মানুষটি তনখায়-সম্ভ্রমে মানী। মিরজা ইউসুফ বেগ দু'হাজারি মনসবদার মানে দু'হাজারি মনসবদারই। দু'হাজার থেকে ঘোড়-সওয়ার একজনও কম নয়। তাই আগ্রার দরবারে এরা পহেলা কেতার আমীর কিছু না হোক মাস গেলে বারো হাজার রুপেয়া তনখা।

এমন মানুষও নাকি এক জায়গায় বেশিদিন থাকলে সেপাই লস্কর যোগাড় করে পাছে বাগী-বেপরোয়া দুশমনির রাস্তা নেয়—তাই জাহাঙ্গীরশাহীতে এদের তিন চার বছর অন্তর বদলি করা হয়। একবার বদলি হয়ে ইউসুফ বেগ অনেকদিন কোনো জায়গীর না পেয়ে—আগ্রার দরবারে মনসবদারদের রেষারেষিতে বিরক্ত হয়ে রাগে দুঃখে ফতেপুর সিক্রির কাছাকাছি সাকেতে এসে উদর্ গেড়ে বসেছিলেন। তখনই সফি ওকে ফতেপুর-সিক্রির পোড়ো ইবাদত-খানার বুরুজে বসে থাকতে দেখে।

সাধারণত ইরানি, ইরাকি, তুর্কি, উজবেক মনসবদাররা নগদী-মনসবদার। তারা নগদে তনখা পায়। কিন্তু কেউ কেউ আকবরী আমলের মনসবদারের ছেলে বা নাতি খানাজাদা থেকে মনসবদার হয়ে জায়গীর-মনসবদারী নিয়েছে। মির্জা ইউসুফ বেগও সম্ভবত সেরকমই হবে।

দেখো যুবক—আমি চাঘতাই উজবেক। হুমায়ুন বাদশার সঙ্গে আমরা—মানে আমার তাওজির আব্বা হুজুরের আব্বা হিন্দুস্হানে চলে আসেন।

মীর সফি মনে মনে বলল, তাহলে ঠিকই ধরেছি।

আমি কোনোদিন চাঘতাই বনানী দেখিনি। যাইনি চাঘতাই পাহাড়ের উপত্যকাতেও। কিন্তু সেখানকার খুশবু পাওয়া যাবে আমার খুনে। আমার ওয়ালিদা-সাহেবার মুখে বচপনে সে জায়গার কথা শুনেছি। কিন্তু এখন এই খুন্তাঘাটে এসে দেখছি—আমার শোনা কহানীর চেয়েও ব্রহ্মপুত্রের এই উপত্যকা আরও সুন্দর। এখানে এত সবুজ—এমন গহেরা জঙ্গল—

—যদি গুস্তাকি মাফ করেন—এখানে বেঁচে থাকাও যে কী ভয়ঙ্কর—

—জানি সফি। পাইকানদের সঙ্গে ঘামাসান লড়াই দিয়েও তোমাকে সন্ধি করতে হয়েছিল।

—উপায় ছিল না। ওরা ডিহিদারদের বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে।

—জানি সফি। কাসীদ কবুতর দিয়ে পাঠানো তোমার কাগজা আমি সুবেদারের কাছে দেখছি। বকির খাঁকে ওরা দু'টুকরো করে কাটে।

—আমি তো ফৌজদারকে পাঠিয়েছিলাম।

—ফৌজদার তার ওপরে সুবেদারকে পাঠায়। তার কাছে তোমার কাগজ পড়ে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম—তুমি দম নেওয়ার জন্যে—আহেদি আজম হিসেবে সন্ধি করেছো যুবক। তোমার পালে হাওয়া লাগাতেই হাতি, ঘোড়সওয়ার, বন্দুকচী, ধানুকী, সেপাইদের নিয়ে আমার এখানে ছুটে আসা সফি—

—পাইকানদের ওপর জুলুমের বহরটাও আপনি জরিপ করবেন আশা করি। চৌধুরি জামান তাব্রিজি ওদের আওরতদের হারেমে পুরেছে। ওদের পাইকান মজুরি খাজনায় ভরে দিয়েছে। বকির খাঁ ভুখা ঘরদুয়ারি পাইকদের দিয়ে হাতি ধরাতে গিয়ে গাফিলতের দায়ে তাদের ফাঁসিতে লটকেছে—জরিমানা করেছে—

আর বলতে পারলো না মীর সফি। তার গলা বুজে এসেছে। সে কোনোরকমে বললো, বেঁচে থাকলে শাহী ফৌজের বেগার খাটো। ভুখা পেটে হাতি খেদিয়ে ধরো। সে হাতি পাললে ফাঁসি যাও। নইলে জরিমানা দাও। হাড়ভাঙা খাটুনির মজুরি খাজনায় জমা পড়ুক। ভুখা পেটে বলদ হয়ে জমিনে জুতে থাকো। ফসল ফলালে তশীলদার, ক্রোরীর ফুর্তি বাবদে মালবা নয়তো খরচ-ই-দে যুগিয়ে যাও। বাদশার শাহী খরচে রুপেয়া যোগাও। এই তো নসীব পাইকান মরদদের। আর জেনানাদের! বাল বাচ্চাদের! কয়েদ হয়ে আগ্রা, দিল্লি, লাহোরের মাণ্ডিতে গোলাম-বাঁদীর বাজারে বিক্রি হয়ে যাও!

হো হো করে হেসে উঠলো মির্জা ইউসুফ বেগ। ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইলো, কাবুলের ছেলে তুমি?

—না। হেলমন্দের তীরে আমার জন্ম। হীরাট যাবার বাদশাহী সড়ক থেকে সাত মঞ্জিল ভেতরে। থল-চোটিয়াল পাহাড়ের গলি থেকে উত্তরে নেমে যেতে হয়।

—শোনো যুবক। আমি চাঘতাই উজবেক বটে। কিন্তু জন্ম আমার রাওয়ালপিণ্ডিতে। আমরা চারপুরুষ ধরে মোগলদের নিমক খেয়ে আসছি। শাহী সলামত আমরা ভালো করে জানি। তুমি কাঁচা উমরে আহেদি হয়েছো। সামনে তোমার বিরাট ভবিষ্যৎ। চাই কি একদিন পাঁচ হাজারি মনসবদারের রিয়াসতি পাবে তুমি। ঠাণ্ডা মাথার কথা বলো। খাস হিন্দুস্থানে আমার পয়দায়িস। আমি হিন্দুস্থানের বাদশাহী রীত-রিসালা বুঝি।

—ইনসানের এই বেইজ্জতি দেখতে দেখতে আমার ঘেন্না ধরে গেল। ইচ্ছে করে এ সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে হেলমন্দের তীরে গিয়ে গেঁহু লাগাই। উট চরাই—

—তাতে কি পেট ভরবে! তাতে কি এই ইজ্জত পাবে? ব্রহ্মপুত্রের তীরে আছো—ভালো আছো। এখানেই থাকো। কেমন অকলমন্দ মানুষ তুমি? যা বলেছো আর বোলো না। শাহী কেতায় তুমি বাগী দুশমনদের মতো বে-ইনসাফি কথা বলছো। পাইকদের জন্যে তোমার চোখে জল?

কি বলতে যাচ্ছিল মীর সফি। তাকে এক ধমকে থামিয়ে দিয়ে মির্জা ইউসুফ বেগ বললো, আম আতরাফ পাইক পাইকান মানুষজনের জন্যে কাঁদলে শাহী লস্করে আহেদি হয়ে থাকবে কী করে ? একদিন মনসবদারই বা হবে কী করে ! চৌধুরি জামান তাব্রিজিকে গ্রেফতারের হুকুমনামা আগ্রা থেকে আনানো হয়েছে। বে-ইনসাফির বিচার করতে তো কাজি আছেন সফি। ও নিয়ে তো তোমার মাথা ঘামানোর কথা নয়। শাহী দস্তুর-উল-আমল মেনে চললে তোমায় তো কেউ ছুঁতেও পারবে না। জাহাঙ্গীরশাহিতে প্রতিভা দেখাতে গিয়েছো তো বিপদে পড়বে। ওই দেখো—বনের ভেতর থেকে টিয়ার ঝাঁক বেরিয়ে এসে আসমানে কেমন রংদার আতসবাজি হয়ে ছড়িয়ে পড়লো—

সে কথায় কান না দিয়ে সফি বললো, ভুখা মানুষ তো বে-ইনসাফির পালটা লড়াই দিচ্ছে।

পাইকদের কথা বলছো ?—বলে থামলো ইউসুফ বেগ। এবার তার ঘোড়াও থামলো। গাঢ় গলায় সে বললো, তুমি কি বোঝো না যুবক—আমরা একটা বারুদের গাদায় বসে আছি—যার নাম মুঘল ইনসাফি—চাঘতাই ঘমণ্ড। কোনো কথা না বলে মীর সফি তাকিয়ে থাকলো। রাস্তার দু'ধারের বন এখানে বেশ গভীর। কোন যুগ-যুগান্তের সব গাছ মাথা ঠেলে আশমান ছুঁতে চাইছে। তাদের গা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সব লতা। কোনো কোনো লতার সঙ্গে গায়ের রং মিলিয়ে দিয়ে সাপ ওৎ পেতে থাকে এখানে। গাছগাছালির ভেতর। খাবারের সন্ধানে। কাঁটা ঝোপের ভেতর থেকে মাঝে মাঝে পাখির ডাক।

—এই চাঘতাই বাদশাহী ভেতরে ভেতরে ফাঁপা হয়ে আসছে—

—কী রকম ?

—ওপরে শাহী ঠাট—ভেতরে ভেতরে কোথাও জমা বরাবর মালগুজারি হাসিল হয় না।

—তাহলে রাজ্যপাট চলছে কী করে ?

—চলছে কি আর! সবই চলে যাচ্ছে ঘাটতিতে। শাহী খরচা ওঠে না খালিশা জমি থেকে। জায়গীর মনসবদারী এখন এক যন্ত্রণা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রসদ যোগানদার বনজারারা বছরের পর বছর রসদ যুগিয়েও পাওনা রুপেয়া পায় না। কিস্তিতে কিস্তিতে তাদের শোধ করা হয়। তাই রসদে—কম সওয়ারি বেশি বেশি দেখিয়ে খাজানাখানা থেকে বেশি রুপেয়া তুলে খরচা সামলানো হয়। শাহীর খরচা ওঠে তো চাষীর পসিনা থেকে। মজুরদের তাগদদার মেহনত থেকে। তা তারাই চাবুক খাচ্ছে—কয়েদ হচ্ছে—বেগার খাটছে—তো ফসল ফলবে কোত্থেকে ?

—আপনার মনসবী তাহলে এত সুন্দর চলছে কী করে ?

—আমি আমার জায়গীরে সব দিকে নজর রাখি। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নগদী ফসলের চাষ করাই। গেঁহু দিই—নীল করাই—তুঁতে গাছের চাষী সব চসরদের এবার সাহস করে বসিয়েছি। কিন্তু আমিই তো হিন্দুস্থান নই !

—তাহলে এই পাইকরা লড়ছে কী করে ?

—লড়ছে ওদের জায়গার জন্যে ভালোবাসায়—ওদের কউম—মানুষজন, গ্রাম-গঞ্জের পেয়ারের জন্যে। আর আমরা? আমরা তো লড়ছি মাস মাইনের জন্যে। আরাম, আয়েস, খোরাকি কেনার রুপেয়ার জন্যে। ও সব কথা থাক যুবক। এসো তোমায় দু'কলি ফারসি কবিতা শোনাই। মন খারাপ কোরো না। শুনে তুমি চাঙ্গা হবে—

—আমি দেহাতি আফগান। ফারসি বুঝি না।

—মোদ্দা কথাটা শোনো। সবাই মরে—সবাই বেঁচে থাকে!

মির্জা ইউসুফ বেগের কথা শেষ হতে না হতে সাঁই সাঁই শব্দ উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে অভ্যেস বশে দু'জনই মাথা নিচু করে যে-যার ঘোড়ার পেটে পায়ের খোঁচা দিলেন। অমনি সওয়ার সমেত ঘোড়া দু'টো বাতাসে ভেসে পড়লো প্রায়। বেশ খানিকটা ছুটে এসে আহেদি মীর সফি বলো, ওরা এগিয়ে এসে চোরা-গোপ্তা ধানুকী বসিয়ে রেখেছিল। আমাদের নিশানা করেই এই তীরবাজি। যদি একটা গেঁথে যেতো—

—তাহলে আর দেখতে হতো না সফি!

—এত সাহস পায় কোত্থেকে?

—কউমকে ভালোবাসা থেকে। ওরা হিন্দুস্থানকে ভালোবাসে সফি। আর আমরা? সেই আব্বা হুজুরের আমল থেকে দেখে আসছি—বাদশা আমাদের জীবন-মৃত্যুর মালিক। বাদশা জং ফতে করতে পারলে আমরা আছি। নইলে নেই। দেশ নয়—কউম নয়—শুধু একজন মানুষই আমাদের হুজুরে হুজুর।

—আমরা এসে গেছি। ওই টিলার ওপাশেই পাইকদের ধুমধুমার গড়। ওখানেই ওদের ঘাঁটি।

হঠাৎ একটা খোলা জায়গায় পড়ে মির্জা ইউসুফ বেগ দেখলো, তার সেপাইদের একটা বড় দল জঙ্গল কাটছে। তাদের দেখা শোনায় কিছু ঘোড়-সওয়ার। কোন গাছের আড়াল থেকে তীর বা গুলি এসে বিঁধে যাবে তার ঠিক নেই। কেননা—পাইকরা আনাড়ি নয়। তাই তোফানগ বাগিয়ে ঘোড়সওয়াররা জঙ্গল কাটাচ্ছে।

মীর সফি বললো, সনাতন কিন্তু খুব একটা বে-ইনাফ শর্ত দেয়নি। ওরা বাদশার হয়ে সীমান্ত পাহারা দেয়। ফি তিন পাইকে এক পাইক বাদশার সেবায় বেগার দেয়। তাই সনাতন পাইক দাবি করেছিল—তাদের জমিতে খাজনা বসানো চলবে না। আমরা খাজনা শুধু বসাইনি—খাজনা বাড়িয়েছি —বাড়িয়ে ওদের খাটাখাটুনির মজুরি পর্যন্ত সরাসরি ওদের হাতে না দিয়ে খাজনার ভেতর দিয়েছি। ভুখা পাইকানরা খাবে কি বলুন তো?

—ব্যস্ কর। আমরা খাজনা বসাই না। সে জন্যে আমীর গুজার আগ্রা থেকে তশীলদার-ক্রোরী-ডিহিদার-চৌধুরী পাঠিয়ে থাকেন। আমাদের পাঠানো হয় শায়েস্তা করতে। আমরা কেউ দরবেশ-ফকির নই। দরকারে আমরা হামলা করবো। গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দেবো।

—ভুলে যাবেন না দয়া করে—এরা আম আতরাফ আনপড় মানুষ নয়।

এরা পাইক। তীরবাজ, তোফানগ্‌বাজ সবাই। পাক্কা নিশানা। আবার চাষীও বটে।

—য্‌বক, তুমি দেখছি একজন ডরপোক্‌ আহেদি। আহেদি-ই-আজম হলে কী করে!

—আমি ডরপোক নই। এ সব কথা বলছি—ওদের শায়েস্তা করতে গিয়ে শাহী দোস্ত হারাবো—নিজেদেরও অনেক কিছ্‌ হারিয়ে মোটা রকম দাম দিতে হবে।

—দরকার পড়লে ঘামাসান লড়াই হবে। জং-ই-আজম হবে। আমি ফতে জং করেই আগ্রায় ফিরবো য্‌বক। চারদিকের এই জঙ্গল ওদের বাগী হতে—দ্‌শমনি করতেই উসকে দেয়।—বলতে বলতে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে ইউস্‌ফ বেগের কপালে তিনটে ভাঁজ পড়লো। রোদে তার উজবেক চামড়া লাল হয়ে উঠেছে।

—কত জঙ্গল কাটাবেন আপনি! দেশের এদিকটা তো জঙ্গল আর পাহাড় দিয়েই তৈরি! ওরা হাতি ধরার অধিকার পয়দায়িস থেকেই ভোগ করে আসছে। এই জঙ্গল— তার ভেতরকার ফোয়ারা সমান হাতি--সেই হাতি ধরার অধিকার—সবই আমরা একে একে কেড়ে নিয়েছি। জামান তাব্রিজির সাগরিদ বলভদ্র দাশ ওদের পিঠে কোড়া মেরে মেরে হাত স্‌খ করেছে। ওরা বাগী হবে না তো কে হবে বল্‌ন?

মির্জা ইউস্‌ফ বেগ মীর সফির কথা কানে নিচ্ছিল কি না বোঝা যাচ্ছিল না। ঘাসে ঢাকা টিলাগ্‌লোর পায়ের নিচে থেকে হাতদায়ে মান্‌ষ সমান ঘাস আর জংলি গাছ কাটতে কাটতে এক দঙ্গল যে মান্‌ষ বেরিয়ে এলো—এদের তো ইউস্‌ফ বেগ চেনে না। খালি গা। পায়ে পটি নেই। রোগা ভোগা চেহারা। অনবরত গা চুলকোচ্ছে দ্‌'হাতে। তাই দেখে একজন ঘোড়সওয়ার কোড়া তুলে ছ্‌টে গেল ওদের দিকে।

—এরা কারা সফি?

—আশপাশের গাঁয়ের মান্‌ষ। ওরা ধ্‌মধ্‌মার গড়ে সনাতন পাইককে চাল, রেড়ির তেল, বার্‌দ, সোরা—এইসব রসদ য্‌গিয়ে যাচ্ছিল। গাঁয়ে গাঁয়ে ঢ্‌কে ঘোড়সওয়াররা আগ্‌ন দিতেই আর ল্‌কিয়ে থাকতে না পেরে ওরা পিল পিল করে বেরিয়ে পড়ে—

—এই ক'টা মোটে?

—বেশির ভাগই সাবাড় হয়ে গেছে ঘোড়সওয়ারদের হাতে।

—এ ক'টাকে আর রাখলে কেন?

—আপনার মির্জা নাথান প্রায় হাজার দ্‌ই সাবাড় করে এদেরও ওই একই গতি করতো। আমিই বাদ সেধেছি।

—কেন?

মীর সফির কানে যেন বাজ পড়লো। এবারে খাঁটি উজবেক মনসবদারি গলা। কৈফিয়ত, ধমক একই সঙ্গে মেশানো।

—এত জঙ্গল কাটুনি কোথায় পাবো বলুন তো? তারপর এ মুলুকে রক্তচোষা জোঁক আছে। শংখচূড় সাপ আছে। আমাদের সেপাইরা সব জায়গায় এগোতে চায় না। জঙ্গল সাফ করতে করতেই বারোটা লোক সাপে কাটায় ঢলে পড়েছে।

—বাকি যেগুলো আছে—জঙ্গল সাফ হলেই সাবাড় করে দেবে।—বলতে বলতে ইউসুফ বেগ তার ঘোড়সওয়ার, পায়দল সেপাই, বন্দুকচী, ধানুকীদের নিয়ে বড় স্কন্ধাবার তাম্বুর দিকে এগোতে লাগলো। দক্ষিণে বড় টিলার পেছনেই মাঝারি পাল্লার তোপ বসানো হয়েছে। সেখানে তোপ দাগার মীর আতিশের সঙ্গে সলা আছে। তাতে সময় যাবে।

ইউসুফ বেগের জং চালানোর কায়দাটা কিছু অন্যরকম। এখন থেকে সনাতন পাইকদের ধুমধুমা গড় ঘিরে রাখলে পানি-ভাতে সোরা-বারুদে ওদের শুকিয়ে মারা যায়। কিন্তু বেশিদিন এভাবে বসে থাকতে থাকতে যদি বর্ষণ এসে যায়—তাহলে কাদায় ঘোড়ার পা গেঁথে যাবে। তোপ ভিজে যাবে। সনাতনদেরই সুবিধা তখন।

তাই—

ইউসুফ বেগ চায়—একেবারে সামনাসামনি পৌছে সত্তর আশিজন ঘোড়সওয়ারের একটা ফিকা পর্দা ধুমধুমা গড়ের গায়ে গিয়ে পাইকদের খোঁচাবে—পিছিয়ে আসবে—আবার খোঁচাবে। এইভাবে উসকে উসকে ওদের একবার গড়ের বাইরে এনে তোপের গোলার পাল্লার ভেতর ফেলতে পারলে হয়। তখন গোলা দেগে দেগে মীর আতিশ এগোবে। তার সামনে থাকবে ঘোড়সওয়ার দঙ্গলের মূল হারবল। তারা হামলা করবে। আর ওই হারবলের মাঝখানে থাকবে ছ'ছটা হাতি। তাদের গায়ে লোহার বর্ম। দাঁতে লটকানো থাকবে দু'ধার ধারালো তলোয়ার। কামানের পেছন পেছন এগোবে বন্দুকচী, পায়দল সেপাই আর ধানুকীর দল। ইউসুফ বেগের লড়াইয়ের কায়দায় সত্তর আশিজন বাছাই ঘোড়সওয়ারের ফিকা পর্দাই আসল কথা। তার ইচ্ছে—ওদের মাথায় থাকুক আহেদি-ই-আজম মীর সফি।

এসব ভাবতে ভাবতেই মিরজা ইউসুফ বেগ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। কী মনে হতে হঠাৎ ঘোড়ার মুখ ঘোরালো।

—গাঁয়ের জেনানাদের পেয়েছো? তাজা বালবাচ্চার দল?

—সব গিয়ে গড়ে সেঁধিয়েছে—

—একটাকেও কয়েদ করতে পারোনি?

—রাত থাকতে থাকতেই কচিকাঁচা, জেনানাদের সবাইকে ওরা পাচার করে দিয়েছে।

উজবেক মনসবদার দুই টিলার মাঝখানে মাটি আর কাঠ দিয়ে গড়ে তোলা গড়ের দিকে তাকিয়ে আছে। সফি জানে, একবার গুঁড়িয়ে দেবার পর সন্ধি করার সুবাদে সাত তাড়াতাড়ি এই গড় গড়ে তুলেছে সনাতন আর তার ঘরদুয়ারি পাইকরা। গড়ে যাবার পথে আসল বাধা গভীর করে কাটা সব

গর্ত। গাছ কেটে তার ওপর ফেলতে গেলে গড়ের ফোকর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বিষ মাখানো তীর এসে পড়বে।

মীর সফি কচি বয়সে মক্তবে ফারসি পড়েনি। পড়েছিল তার দিশি ভাষা। ইউসুফ বেগের ফারসি কবিতার কলিটা বেশ লাগদার। সবাই মরে—সবাই বেঁচে থাকে।

হিন্দুস্থানের বাদশাহী জামানায় কে ক'দিন থাকবে কেউ বলতে পারে না। এই তো উজবেক মনসবদারের ঘোড়সওয়ারদের মুখে শুনেছে—কাশীর মতো সাবেক বসতিও নাকি চুহা-বিমারিতে শেষ হয়ে গেছে। কাফের-মুসলমান কাউকেই রেয়াত করেনি সে বিমারি। কনৌজ-জৌনপুরের বন্দুকচীরা বলছিল—বড় বড় হাভেলির দোর খোলা। দামি দামি জিনিস পড়ে আছে। একজন ইনসানও বেঁচে নেই।

বাদশার হুকুমে যে কোনো মানুষ কয়েদ হতে পারে। ঘাড়ের ওপর মাথাটা হারাতে পারে। ফি-বছর নদীতে নদীতে বর্ষার জলে বান ডাকে। তাতে কত দেহাতি মানুষ ভেসে যায়। লড়াইয়ের পর বন্দীরা গোলাম বাঁদী মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে চলে যায়। কে কোথায় যাবে তা জানারও অধিকার নেই।

এই কি ইনসানের জীবন? এইভাবেই সবাই মরে—সবাই বেঁচে থাকে। শুধু অল্প কিছু ভাগ্যবান আমীর ওমরাহ—মনসবদার-মীর-বহর, ফৌজদার-কোতোয়াল বাঁচার মতো বাঁচে। আরাম আয়াসে ভোগ-সুখে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে। যদি অবশ্য বাদশার নেক নজর থাকে। এই নিয়ে আবার ফারসি বয়েত লেখার বিলাসিতা কেন? কী হবে এই জামানায় আহেদিগিরি করে! কোনো একদিন মনসবদার হয়েই বা লাভ কী?

তার চেয়ে সনাতন পাইক যে মরতে মরতে বেঁচে আছে—তা যে অনেক ভালো।

॥ পাঁচ ॥

দিল্লি যেন বাদশাহী সড়ক আগ্রার ওপর দিয়ে দুর্গের উত্তর পশ্চিমে হাতিপোল দরওয়াজা বাঁয়ে ফেলে আধখানা চাঁদের ঢঙে দক্ষিণ-পশ্চিমে আকবরী দরওয়াজাকে ছুঁয়েছে। ছুঁয়েই এই সড়ক দু'ভাগ হয়েছে। একদিককার রাস্তা পশ্চিমে হেলে রাজধানীর বাইরে আজমিরের দিকে ছুটেছে। অন্যটা সোজা দক্ষিণে ঢোলপুর-গোয়ালিয়র হয়ে মালব আর দাক্ষিণাত্যের দিকে বহু রাস্তা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

এখন দুপুরবেলা। আগ্রা জমজমাট। দুশোর মতো তুর্কি হামামে আমলা, আহেদি, পেশদস্ত, যার কিছু রেস্ত আছে এমন মানুষজন ঢুকছে—আর ভালোমত চানটান করে দিব্যি সাফ-সুতরো হয়ে বেরিয়ে আসছে। সারা রাজধানী জুড়ে নানান মকবরার দোরে দোরে খয়রাতির আশায় মিশকিনদের ভিড়। বাদশা জাহাঙ্গীরের হুকুমে তাঁর যাতায়াতের পথে কানা, খোঁড়া কোনো

মিশকিন পড়লে সঙ্গে সঙ্গে কোড়া খেয়ে কয়েদ হচ্ছে।

পূবে যমুনার বুকে আগ্রা দুর্গের গম্ভীর ছায়া বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে এগিয়ে গিয়ে পড়ছিল। মির্জা ইউসুফ বেগ যাবে দুর্গের ভেতর—লালপাথরে তৈরি আকবরী মহালে—কিছুকাল হলো যাকে মিছিমিছি বলা হচ্ছে জাহাঙ্গিরী মহাল।

সেই খুন্তাঘাট থেকে এই দুই হাজারি মনসবদারকে ছুটে আসতে হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র থেকে যমুনাব তীরে। এখন আকাশে মেঘ রোদ্রের খেলা। মোগলী কায়দায় কামান, সওয়ার, বন্দুকচী সাজিয়েও ধুমধুমার গড় থেকে সনাতন পাইকদের বের করা যায়নি। অথচ বর্ষা এসে গেল বলে।

তবু এতদূর না এসে উপায় নেই। মোগল লশকরী কানুন মোতাবেক বারো বছর অন্তর সব মনসবদারকেই একবার বাদশার সামনে দাঁড়াতে হয়। খোদ বাদশা তখন মনসবদারকে চেহারায় মিলিয়ে নেন। খেয়াল হলে দু'চারটে কথাও বলেন। তার সাফ সাফ জবাব দিতে হয়। সেই বারো বছরী ইয়াদদস্তের সময়টা পড়েছে এই এখন।

দু'হাজারি এই উজবেক মনসবদারদের রাজধানী আগ্রায় ছুটে আসার আরও একটা কারণ আছে। এই ক'মাসের টানা লড়াইয়ে বেশ কিছু ঘোড়া, বন্দুকচীকে সাপে কেটেছে। কয়েকজন সওয়ার বিষ তীর খেয়ে খতম। সেসব জায়গায় নতুন ঘোড়া, নতুন মানুষের অভাব মীর আরজকে বলে ভরাট করে নেওয়া দরকার। রুপেয়ার জন্যে খাসনবিশকেও বলতে হবে।

গম্ভীর আগ্রা দুর্গের সামনে দাঁড়িয়ে ইউসুফ বেগ থ হয়ে গেল। কত বড় দুর্গ। তিনদিক ঘিরে বিশ হাত চওড়া শান বাঁধানো গভীর নালা যমুনার জলে কানায় কানায় ভর্তি। বিরাট উঁচু দেওয়ালের বুরুজে কামানের নল। তার পাশে পাহারাদার সেপাইরা হাঁটছে ঘুরছে। ভেতর দুর্গে হাতিপোল আর আকবরী দরওয়াজার মুখোমুখি সারি সারি মনসবদারি ঘোড়সওয়ারদের হপ্তচৌকী। তার ঠিক মাথায় ফটকের ওপর শাহী নহবতখানা। নিচে উত্তরে মোরি দরওয়াজা। এই পথ দিয়েই নিশ্চয় দুর্গের ময়লা আর জঞ্জাল গাড়ি বের করা হয়। ইউসুফ বেগ শুনেছে—দুর্গের খাস মুস্তৌফী হাড়কিপটে এক খোজা আছে—জোরাবর খাঁ—সে নাকি শুধু হাতির নাদের জঞ্জাল ইজারা দিয়েই বছরে দশ হাজার রুপেয়া কামায়।

কোথায় চাঘতাই উপত্যকা। আর কোথায় এই বিশাল আগ্রা দুর্গ। ঘোড়ার পিঠে ঘুরে বেড়ানো এই বংশ হিন্দুস্থানে এসে রীতিমত থিতু হয়েছে।

পুবদিকে খিজরি দরওয়াজা ফেলে দর্শন দরওয়াজায় ঢুকবার জন্যে ইউসুফ বেগ মজবুত মোটা তক্তার টানা সেতু ঘোড়ার পিঠেই পেরলো। হাতিপোল দরওয়াজার ওপর নফ্ফারখানায় তখন সবে সানাই আর বাঁশি থেমেছে। বড়দামামা বেজে উঠলো। তার মানে বাদশা দর্শন মহলে এসে বসলেন। কাছারি দেওয়ানখানায় তদ্বিরওয়ালাদের জটলা। পাশেই দেওয়ান-ই-আম এখন ফাঁকা। দেওয়ান-ই-খাস আর অন্দরমহলের সামনে রাজপুত

চৌকির তাম্বু।

দিল্লি দরওয়াজার বাইরে বাঁ দিকে দেওয়াল ঘেঁষে বাদশাহী কামান গোলার ঘর, বাঘ-সিংহের আস্তানা, উট-ঘোড়া-গরু-হাতিশালা। তার পরেই মোরি দরওয়াজা।

দেওয়ানখানায় এক কোমর উঁচু আমিরী দীবানের ওপর উজিরে আজমের বসবার জায়গা এখন ফাঁকা। নিশ্চয় বাদশার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। দেওয়ানখানার পরেই কাজীর আদালত।

এইবার ইউসুফ বেগ দূর থেকে মসনদ ঝরোকা দেখতে পেলেন। তখত-গাহে বাদশা বসে। উজিরে আজম আসফ খাঁ দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে কয়েকজন মনসবদার। ছোট লাল ঘেরা জায়গায় কুর্নিশ-গাহে গিয়ে ইউসুফ বেগ কুর্নিশ করলো। তখন মুস্তৌফী তার নাম—তার সওয়ারের কথা, খুন্তাঘাটে বাগী পাইকানদের শায়েস্তা করার কথা বলছিল।

বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীরের চোখ তুলে সোজাসুজি ইউসুফ বেগের মুখে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে ইউসুফ বেগ তার বাঁ হাতে ঝোলানো কস্তা থেকে একটা পাহাড়ি বাজ বের করে বাদশার নজর মোহারকে রাখলো। সেলিম জাহাঙ্গীরের হরেক কিসিমের পাখি, জানোয়ারের শখের কথা কে না জানে! খুন্তাঘাটে এক ধানুকী বাজপাখিটা ধরেছিল।

বাদশা সঙ্গে সঙ্গে সামান্য ঝুঁকে তাকাতেই দুর্গের দারোগা এসে বাজ-পাখিটা সরিয়ে নিলো। অমনি বাদশার চোখ ইউসুফ বেগের পা থেকে মাথা অব্দি জরিপ করে নিলো। ইউসুফ বেগ বুঝলে—তার চেহারা, তাগদ খুন্তা-ঘাটের বাগী শায়েস্তায় সহি সলামত—ঠিকঠাক আছে কিনা তার ইয়াদদস্ত করে নিলেন বাদশা। এবার খাসনবিশ হয়ে মীর আরজের কাছে যাবে তার কাগজ-পত্তর। তাতে শাহী পাঞ্জার ছাপ পড়বে। বাদশা কিছুই জানতে চাইলেন না। দুর্গ থেকে বেরোতে বেরোতে বিকেল হয়ে গেল ইউসুফ বেগের। তার মনে হচ্ছিল, বাদশা যেন কী এক চিন্তায় ডুবে আছেন।

রাজধানীতে একবার এলে জমে থাকা কাজের পাহাড় এখানে নামিয়ে দিয়ে তবে সবাই ফেরে। মির্জা ইউসুফ বেগ এক ঢিলে দুই পাখি মারতেই বেশি ভালোবাসে। খানিক আগে সে যেমন নিজের বারো বছরী ইয়াদদস্ত বাদশার সামনে হাজির হয়ে সেরে নিয়েছে—তেমনি সেরে নিয়েছে মীর আরজের কাছে সওয়ার, ঘোড়া, রুপেয়ার ঘাটতি পূরণের কাজটাও।

এবার ঠিক করলে দরগাহ শরিফ হজরত বাবা লাট্টু শাহ চিসতির ওখানটাও ঘুরে যাবে। সেখানে এক অলি বড় সুন্দর করে ফেরদৌসির রুবাই আওড়ান। যেমন গলা—তেমনি সুরেলা টান। সন্ধের দিকে যমুনার চর থেকে তাজা তরমুজ আসে। রবাব বাজে সেখানে। ফেরদৌসি যেন চোখের সামনেই ভেসে ওঠেন অলিসাহেবের গলায়। লড়াই হামলায় ডুবে থেকে কতদিন যে ভালো করে কবিতা পড়া হয় না—কবিতা শোনা হয় না। বড় আফসোস ইউসুফ বেগের।

আর এই দরগাহর দুটো হাভেলি বাদেই লশকরের রসদ যোগানদার চৌধুরী গয়ানাথ বনজারার গোলা। ঘোড়ার চিরুনি থেকে উটের বুরুশ—যবের বস্তা থেকে শুকনো ফল বোঝাই খেরিয়া—সবই সেখানে মজুদ থাকে। গয়ানাথের সঙ্গে কিছু জরুরী কথাও আছে।

যেখানে মোগল লশকর—সেখানেই এই বনজারারা থাকবে। ওরা ঘোড়সওয়ারদের আগে আগে গিয়ে চলতি লশকরের দরকারি রসদ—রেড়ির তেল, তোপের বারুদ, তাম্বু—সবই যোগাড় করে রাখে। কেনাকাটার জন্যে আগ্রার খাজানাখানা থেকে দাদনও পায়।

আগ্রায় এলে গয়ানাথের গোলায় যেতেই হয় ইউসুফ বেগকে। গয়ানাথের কোচবিহার গোলা থেকে খুন্তাঘাটে যব গেছে ঘোড়ার জন্যে। ঘি গেছে হাতির জন্যে। মনসবদার হিসেবে ফি-পূর্ণিমায় যে বাইশ হাজার রুপেয়া পায় ইউসুফ তাতে দু'দিক কুলিয়ে ওঠা যায় না। সে ঠিক করলে—আগে গয়ানাথের সঙ্গে গিয়ে কথা বলে তবে হজরত বাবা লাঁট্টু শাহ চিসতির দরগাহে যাবে।

চৌধুরী গয়ানাথ বনজারা তার গোলাতেই ছিল। জায়গাটা আগ্রার শহরতলি। বর্ষার মুখে মুখে নতুন ওঠা বিরাট এক কাঁঠাল খাবে বলে খুলে বসেছে। মনসবদার ইউসুফ বেগকে এই অসময়ে দেখে হাত-বাতিটা এগিয়ে ধরলো গয়ানাথ, গোড় লাগে হজৌর—ডাকলেই পারতেন—

—সদর আগ্রার কারবার ফেলে তো আপনি খুন্তাঘাট যেতেন না। সেখানে আপনার গোমস্তাদেরও তো সব বলা যায় না।

—সে তো ঠিকই।—বলে নিজের গদির ওপর একখানা ঝলমলে রঙের তুষ পেতে দিলো গয়ানাথ।

তাতে বসে ইউসুফ বেগ বিনা ভূমিকাতেই বললো, জিনিসপত্তর সবই মাহেঙ্গা হয়ে উঠেছে।

—সে তো ঠিকই। একটা বর্বরি ছাগ কিনতে একটা আস্ত রুপেয়া বেরিয়ে যায় এখন। দেওয়ান প্রসাদ চাল কিনতে নব্বই দাম মণ পিছু।

—ওকথা বলছেন গয়ানাথজি। তবে শুনুন—একটা ইরাকি ঘোড়ার দানা, ঘি, চিনি বাবদে মাস গেলে আঠারো রুপেয়ার কমে হয় না এখন। এর পর আছে চিরুনি, নাল, জিন, গামছার খরচা। তুর্কি ঘোড়সওয়ারের মাস মাইনে তো মোটে পঁচিশ রুপেয়া। তাহলেই বুঝুন! তারপর তো সহিস আছে। ভিস্তি আছে। ফরাস—ঝাড়ুদারও আছে। বাদশা কি এসব বোঝেন! না, বোঝেন আমাদের সিপাহসালার! মনসবদারিতে যা পাই—তাতে কি এসব কুলিয়ে ওঠা যায়?

—সো আপনি ভাববেন না। আমরা আছি কী করতে? আপনারা হিন্দুস্থানের জন্যে কাঁহা কাঁহা মুলুকে পড়ে আছেন।

—আপনি তো সবই জানেন, সবই বোঝেন।

—বুঝতেই তো হবে আমাদের। হিন্দুস্থানের জন্যে জান নিকলে দিচ্ছেন—সে আর জানি না।

—গয়ানাথজি—যা ঘিউ পাঠিয়েছেন কোচবিহার গোলা থেকে—তা খাতায় দেখাবেন দোগুণী করে—

—আর বলতে হবে না। সব বুঝে গিয়েছি। আপনারা হাঁ করলে বুঝতে পারি। আপনাদের নিয়েই তো আমাদের ওঠাবসা—

—এখন তিনশো আশরফি দেবেন। ওই দোগুণী হিসেব থেকে পরে বাদ দিয়ে দেবেন এই আশরফি।

—কথা শেষ হতে না হতে চৌধুরী গয়ানাথ একশো আশরফি করে গুনে মুখ বেঁধে রাখা তিন তিনটে ফেরিয়া মির্জা ইউসুফ বেগের সামনে সাজিয়ে ধরলো।

বেশ বড়সড় হাভেলি গয়ানাথের। তেমহলা। সম্ভবত ইউসুফ বেগের বাবা যখন মনসবদার ছিলেন—তারও আগে থেকে লশকরে রসদ যোগানোর এই বনজারা কারবারে গয়ানাথ পড়ে আছে। বয়স হয়েছে। ছিপছিপে শরীর। একবার যেন বলেছিল—আকবর বাদশার শেষ দিককার কান্দাহার হামলায় বনজারা হয়ে সঙ্গী হয়েছিল গয়ানাথ। জালালাবাদের মাণ্ডিতেই তার ভাগ্য ফেরে। তার নাকের নিচের মোটা সাদা গোঁফ রোদ্দুরের আলোয় ঝকঝক করছে।

—ও কি? কাদের কান্না?

—আর বলবেন না হুজুর। কী কুক্ষণেই যে জায়গা দিয়েছিলাম থাকতে—

একসঙ্গে অনেকগুলো মেয়েলিগলা কাঁদছে। টেনে টেনে! তার ভেতরেই চৌধুরী গয়ানাথ বললো, এনায়েত খাঁ মারা যাচ্ছেন—

—কোন্ এনায়েত?

—সে বাইশা এনায়েত হুজুর। শেষ সময়ে তার বাইশজন বিবিই খবর পেয়ে ছুটে এসেছে। শেষদিকে তো মানুষটা ফতুর হয়ে যায়। হাভেলি হাত-বদল হয়ে রাস্তায় বসার দশা। তাই আমি থাকতে দিয়েছিলাম।

মির্জা ইউসুফ বেগ থামলো। এনায়েত খাঁ আগ্রার বিখ্যাত রইস আদমি ছিলেন একসময়। যেমন সুন্দর দেখতে—তেমনই শৌখীন আর লম্পট। কোরআনের চৌঠা সুরার তিসরি আয়তে আছে এক, দুই, তিন, চারটি পর্যন্ত মোট দশটি বিয়ে একসঙ্গে করা যায়। আবু বিন লয়লা পরে অর্থ করেছিলেন—এক, দুই যোগ দুই, তিন যোগ তিন, চার যোগ চার মোট উনিশটি বিয়ে করা যায়। এই এনায়েত খাঁ সে-হিসেবও ছাড়িয়ে গিয়ে মোট বাইশটি বিয়ে করেন। সারা আগ্রায় তাঁকে বাইশা এনায়েত বলেই সবাই চেনে। সেই এনায়েত মারা যাচ্ছেন।

—একবার দেখতে হয়—বলাতে চৌধুরী গয়ানাথ এগিয়ে এসে বললো, দেখবেন? চলুন—

হাভেলিটি রীতিমত বড়। দুসরি মহল্লায় খোলা দরজা দিয়ে কান্নার সঙ্গে হৈ-হট্টগোল উঠছিল। এনায়েত খাঁ যে সে রইস নয়। তাঁর নানা তিন হাজারি মনসবদার কাসিম খাঁ আগ্রা দুর্গ ঢেলে বানাবার হুকুম পেয়েছিলেন আকবর বাদশার কাছ থেকে। তিনি কাজ শেষ করে যেতে পারেননি। পারার কথাও

নয়। দুর্গের কাজ পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল শুরু হয়েছে। শেষ কবে হবে আল্লা জানে। কাসিম খাঁর হীরে জহরত—আশরফি ফুরোতে ফুরোতে এনায়েত খাঁর জীবন ফুরিয়ে এলো। মির্জা ইউসুফ বেগ তার নিজের যৌবনে একবার দূর থেকে এক মজলিসে এনায়েত খাঁকে দেখেছিল। কী চেহারা! তোয়াজে রাখা একজোড়া গোঁফ। তানসেনের ছেলে বিলাসখান গাইছিলেন। তারিফদারির সময় এনায়েত খাঁর মাথার বাবরি সমে এসে দুলে উঠছিল। সেই মানুষ মরে যাচ্ছেন।

আর কয়েক ধাপ উঠলেই দুসরি মহাল। ঠিক এমন সময় ইউসুফ বেগ একটা চিৎকার—পুরুষের গলা—ধস্তাধস্তি শুনতে পেয়ে বেগে ছুটে ঘরে ঢুকলো।

বিশাল ঘরের মাঝখানে বড় আগনেগারের মতো বাতিদান। সেই আলোয় এনায়েতের কুঁচকে আসা মুখখানা আধো অন্ধকারে মুছে যাবার দশা। তিনি বিছানায় আধাশোয়া অবস্থায় হাত তুলে সবাইকে থামাবার চেষ্টা করছেন। আর ঘরের মাঝখানে তিন চারজন অল্পবয়সী পুরুষ—এনায়েতের রিস্তেদারই হবে সবাই—একজন বেশ বয়স্ক লোককে টেনে তোলবার চেষ্টা করছে। লোকটির চেহারা সম্ভ্রান্ত। মাথায় টিকি। নিশ্চয় হিন্দু। তার সামনে নানান ডাবায় গোলা মতো কী সব। রং হবে। কেন না—কয়েকটা তুলি এদিক ওদিক।

মির্জা ইউসুফ বেগ গিয়ে দাঁড়াতেই ধস্তাধস্তিটা থামলো। হাজার হোক টানটান একজন উজবেক মনসবদারের চেহারায় লশকরী চালটা ফুটে উঠবেই।

—এসব কী হচ্ছে? হচ্ছেটা কী?

ইউসুফ বেগের এ কথায় অল্পবয়সী ছোকরারা থামলো। একজন বললো, দেখুন তো—আব্বা সাহেবের এখন এন্তেকাল হবে। আমরা জানাজার জন্যে তৈরি হচ্ছি—

আরেকজন যুবক বলে উঠলো, এই কাফের তসবিরওয়ালা আব্বা হুজুরের ছবি আঁকছে—

আধোশোয়া এনায়েত খাঁ কী যেন বলতে চাইলেন। ডান হাতখানা একটু উঠলো মাত্র। আবার পড়েও গেল। তাঁর বিবিরা পালঙ্ক ঘিরে কাঁদছে। আধো অন্ধকারে সব বিবির মুখ দেখতেও পেল না ইউসুফ বেগ।

যাকে নিয়ে এত বড় কাণ্ড সেই বয়স্ক লোকটি স্থির হয়ে মেঝেতে বসে। তার চোখ এনায়েতের মুখে। কোলের সামনে একখানা বড় তুলট কাগজ মেলা।

ইসলামে এন্তেকালের পর জানাজার কোনো তসবির নেওয়া গুণাহ। তার ওপর সে তসবিরওয়ালা যদি হয় কাফের—রাফিজি—ইসলামে অবিশ্বাসী শিখাধারী হিন্দু—সে তো ইসলামের দোগুণী বরখেলাপ।

একটু ঝুঁকে মেঝে থেকে তুলট কাগজখানা তুললে ইউসুফ বেগ। রেড়ির আলোয় মেলে ধরলেন কাগজখানা। মরতে বসা এনায়েত খাঁর মুখ চোখ অবিকল উঠে এসেছে ছবিতে। মরে যাবারও একটা কষ্ট আছে। দুঃখ আছে—এই দুনিয়া শেষবারের মতো ছেড়ে যাবার। বহু লড়াইয়ের লড়াকু মনসবদার

ইউসুফ বেগ নানাভাবে মৃত্যুকে দেখেছে। খোবানী, দগ্ধ বেলেহাঁস, কচি দাগমুণ্ডী ভেড়ার মাংসের গরম ক্বাথ, সূর্যের আলো, দু'হাতে তাগদ—আর ফেরদৌসির রুবাই থাকতে মৃত্যু কেন আমাদের তুলে নিয়ে যায় ?

এই বে-খেয়াল তসবিরওয়ালাকে তো বাঁচানো দরকার। আগ্রার রাস্তায় এ ঘটনা ঘটলে বড়রকমের হামলা হয়ে যেতে পারতো এতক্ষণে। খন্দকর, মওসিকর, তসবিরওয়ালা, সেতারী—এদের ওপর ইউসুফ বেগের চিরকালই একটা টান আছে। সে বাইরে গরম দেখিয়ে বললো, এই বরখেলাপী তসবিরওয়ালাকে আমার হাওলাত করে দাও। আমি একে বাইরে নিয়ে গিয়ে মেরামত করছি।

বলতে বলতে শিখাধারী বয়স্ক লোকটিকে ইউসুফ বেগ বাইরে টেনে আনলো। এনায়েতের ছেলেপিলে অনেক হবে। সবাই হয়তো এসে পৌঁছয়নি। যে চারজন হাজির ছিল—তাদের ইউসুফ বললে, তোমাদের এখন দুঃসময়। তোমাদের আব্বা হুজুরের এন্তেকাল হচ্ছে। মানী মানুষ। তাঁর উপযুক্ত জানাজার যোগাড়যন্ত্র করো। একে আমি দেখছি—

বলতে বলতে অন্যমনস্ক, ভ্রুক্ষেপহীন এই বয়স্ক মানুষটিকে রীতিমত লশকরী চালে টানতে টানতে ইউসুফ বেগ চৌধুরী গয়ানাথের গোলায় এনে টাল দেওয়া গেহুঁর বস্তার পাশে বসালেন। গয়ানাথ চিন্তিত। কোনো ঝামেলায় না জড়িয়ে পড়ে।

—আপনি কে ? সত্যি করে বলুন—

ইউসুফ বেগের এই ধমকানি গলায় কোনো কাজই হলো না। মানুষটি যেমন নীরেট চোখে তাকিয়ে—ঠিক তেমনই রইলেন।

আপনি কি জানেন না—ইসলামে এমন ছবি আঁকা গুণাহ ?

—ছবির কোনো ধর্ম নেই।

ইউসুফ বেগ মনে মনে এই কথার তারিফ দিয়ে বললো, আপনি এখন হিন্দুস্থানের রাজধানী আগ্রায় আছেন—

—তা থাকতে পারি !

—নিজে এখানে বসে আছেন—তাও সন্দেহ করছেন ? বলুন তো এখন হিন্দুস্হানের বাদশা কে ?

—কোনো বানর কি সিংহ হবে। কে বাদশাহ তাতে হিন্দুস্হানের কিছু যায় আসে না। হিন্দুস্হান হিন্দুস্হানের মতোই চলছে।

—তোবা ! তোবা !—বলে নিজের দুই কান চেপে ধরলো চৌধুরী গয়ানাথ। এমন কথা শোনাও পাপ।

মির্জা ইউসুফ বেগ তাতে একটুও চমকালো না।

বয়স্ক ভাবনাহীন মানুষটি পরম তৃপ্তিতে পা দোলাতে দোলাতে বললেন, বাদশা ছিলেন—আকবর বাদশা—

—তাহলে আমি ঠিকই ধরেছি—আপনি বাদশার দরবারে ছবি আঁকতেন। আপনি বাদশাহী শিল্পী দশনাথ। আপনার বাবা পালকি-বেহারা ছিলেন।

—বাবার সঙ্গে আমিও পালকি বয়েছি ছোটবেলায়। আমার নাম দশনাথ কুর্মি।

—ঠিকই আন্দাজ করেছি। আপনার আঁকা ছবির ছাপ ফতেপুর সিক্রির ইবাদতখানায় আছে দশনাথজি।

—এখন তো ছবি আঁকা হয় না। শুনেছি আগ্রায় এখন যিনি বাদশা তিনি দিস্তে দিস্তে হাতি, ময়ূর আর সিংহের ছবি আঁকান—

—তাই বলে আপনি জানাজার সময় ছবি আঁকতে বসলেন? কী ঘটতে পারতো জানেন?

—তাজা বয়সে এনায়েত খাঁ বড় সুন্দর দেখতে ছিলেন। তখন ওঁর তসবির বানাতে চাই। বলেছিলেন—যখন মরতে বসবো দশনাথজি—তখন আপনি আমার তসবির বানাবেন। জীবন যৌবনের বড় সমঝদার ছিলেন এনায়েত! ভারি বিমারিতে পড়ে নিজেই আমাকে খবর দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আজ তিনদিন ধরে ওঁর শেষ সময়টাকে ছবিতে ধরে রাখার চেষ্টা করে আসছি—তা সবই তো ভণ্ডুল হয়ে গেল!

—একটা মানুষ মরবে—তখন তার রিস্তেদাররা আসবে না?

—যত ইচ্ছে আসুক। কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ছবিটা তো আঁকতে দেবে তারা। অমন সুন্দর শরীরে মৃত্যু, কেমন ছায়া ফেলে—তাই চোখ ভরে দেখলাম এই তিনদিন। এটাই আমার লাভ। এবার আমি ঘরে বসেও মৃত্যুর ছায়ার ভেতর এনায়েত খাঁকে এঁকে ফেলতে পারবো।

বড় তৃপ্তিভরে কথা বলছিলেন দশনাথ। ইউসুফ বেগেরও খুব ভালো লাগছিল। কতদিন এমন কথা শোনে না। ফেরদৌসি না পাই—দশনাথকে তো পেলাম।

দশনাথ নিজে থেকেই বললেন, দশ বছর বয়সে মথুরার মন্দিরের গায়ে পোড়াকাঠের কালো টিকে ঘষে একটা হনুমান আঁকছিলাম। সেই পথ দিয়ে হাতির পিঠে চড়ে যাবার সময় আকবর বাদশা আমায় দেখতে পান। দেখে আমায় নিয়ে চললেন। ভর্তি করে দিলেন শাহী মক্তবের মকসুদের কাছে—

বলতে বলতে গুরুর নামে দশনাথ কপালে হাত ঠেকালেন। তখন বাদশার হুকুমে শাহেদ আলি আর আবদুল সামাদ সীতার অগ্নিপরীক্ষা আঁকছেন—আঁকছেন জতুগৃহদাহ। আমি সারাদিন বসে বসে তেলে আগ্রার নীল রং মিশিয়ে ওঁদের দুজনের তুলি টানা দেখতাম। পরে ওঁরা আগ্রার শহর-বাজার এঁকেছেন। এঁকেছেন লাহোরের মাণ্ডি। তখন আমি সেয়ানা যুবক হয়ে উঠেছি। একটা ডিম থেকে তার কুসুমটা ফেলে দিয়ে সাদায় রং মেশাচ্ছি—

এবারও চৌধুরী গয়ানাথ দু'কানে আঙুল চেপে বললো, তোবা! তোবা!

দশনাথ খচ্ করে ঘুরে তাকালেন, কিসের তোবা?

—আপনি এত বড় তসবিরওয়ালা। হিন্দু হয়ে শেষে আণ্ডা নিয়ে ছানাছানি করেন?

—ভালো কথা! খোদা কি হিন্দু? না, মুসলমান? আশমান কি হিন্দু,

না মুসলমান? ছবি ছবি। হিন্দুও না—মুসলমানও না। ছবিতে ঘোলাটে ভাব আনতে হলে ডিমের সাদায় রং তো মিশিয়ে নিতেই হবে। এছাড়া তো কোনো পথ নেই। মকসুদ, মুরাক্কা গুলসান, আবু আল সামাদ, খালসা আবজামি ফারসি ধাঁচে যেসব ছবি আঁকতেন—তাতে তো হামেশাই ডিমের সাদায় রং গুলতে দেখেছি। হামজা কেতার ছবিগুলো দেখলেই—

কথা আর এগোতে পারলো না। দূর বাশ্—দূর বাশ্—বলতে বলতে তুর্কি ঘোড়সওয়াররা সন্ধ্যারাতের আগ্রার রাস্তায় মানুষজন সরিয়ে দিচ্ছিল। লোক হটিয়ে দিয়ে এ পথ দিয়ে এখন বাদশার হাওদা যাবে। রাজধানী থেকে এই সড়ক বেরিয়ে গিয়ে গোয়ালিয়রে পড়েছে। আগ্রায় সবাই জানে বাদশা এই সময়টায় এ-পথ দিয়ে কোথায় যান।

চৌধুরী গয়ানাথ সদর দরজা বন্ধ করে দিলো। সে ফজুল কোনো ঝুট-ঝামেলায় পড়তে চায় না। বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীর যখন গয়ানাথের গোলা পার হলেন—তখন তার সদর আর পাঁচটা বন্ধ দোকানপাটের মতো লাগলো। তিনি এখন চলেছেন তাঁর নিজের বড়ছেলে শাহজাদা খসরুকে দেখতে।

আগ্রার এই শহরতলি পেরোলেই পাথুরে মাটি আর বাবলা গাছের দেহাত এলাকা। দূরে দূরে গাঁ-বসতিতে আলোর বিন্দু। মেটে জ্যোৎস্নার ভেতর ফাঁকা মাঠে একটা পোড়ো মতো ছোটখাটো গড় দাঁড়িয়ে। তার কোথাও কোনো আলো নেই। জায়গাটার নাম বিয়ানা। এখানেই নাকি একসময় জোর বাজার বসতো। এই জায়গা ঘিরেই কয়েকশো বছরে আগ্রানগরী গড়ে উঠেছে। গোড়ার দিকে এখানেই নাকি আগ্রা গড়ে উঠছিল। তখনকার এই ফেলে যাওয়া পোড়ো গড় এখন তার অন্ধ বাসিন্দার মতোই কোনো আলো না জেলেই অন্ধ হয়ে বসে আছে মাঠের ভেতর।

তুর্কি সেপাইরা মশাল হাতে ছুটে যেতেই গড়ের ভেতর একটা একটা করে আলো জ্বলে উঠতে লাগলো।

দুয়ারে বাদশাকে কুর্নিশ করলেন অনু রায়। বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীরের ভীষণ বিশ্বাসী এই রাজপুত অনু রায়। পুরো নাম অনুপ রায়। কিন্তু লোকমুখে তিনি অনু রায় হয়ে পড়েছেন।—বছর ছয় আগে শিকারে বেরিয়ে টিলায় দাঁড়িয়ে বাঘকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়েন জাহাঙ্গীর। বাঘ এসে বাদশাকে মাটিতে পেড়ে ফেলে। তখন দু'চাজন লোক-লশকর বাদশার বুকের ওপর দিয়েই পালিয়ে যায়। অনুপ রায় এগিয়ে গিয়ে বাঘের মাথায় ডাণ্ডা মেরেছিলেন। বাঘ বাদশাকে ছেড়ে দিয়ে দুই থাবায় অনুপ রায়কে ধরে। অনুপ রায়ের হাত বাঘের মুখে। তারপরে বাঘে-রাজপুতে কুস্তি—মাটিতে লুটোপুটি। এদিকে অন্য কয়েকজন বাঘকে তলোয়ারের কয়েক ঘা দিতেই বাঘ অনুপ রায়কে ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। রাজপুত গা ঝাড়া দিয়ে আবার বাঘের মুখে মারলো দু-তিন ঘুষি। আবার বাঘে-মানুষে কুস্তি। কিছুক্ষণ পরে অনুপ রায় ফাঁক পেয়েই পালানোয় ব্যস্ত বাঘকে তলোয়ার বের করে মারলেন এক কোপ। সেই কোপে ভ্রুর ওপরের চামড়া কেটে বাঘের দুই চোখের ওপর

ঝুলে পড়লো। তখন অন্যসব বাহাদুররা হাজির হয়ে অন্ধপ্রায় বাঘকে পেড়ে ফেলে। কনৌজের জঙ্গল থেকে ফিরে বাদশা জাহাঙ্গীর নিজের খাস-তলোয়ার অনুপ রায়কে উপহার দেন। সঙ্গে দিলেন উপাধি—সিংহ-দলন। একই সঙ্গে মোগল আর রাজপুত ধন্য হয়েছিল সেবারে।

—শাহজাদা খসরু কেমন আছে ?

—ভালোই। সহি সলামতই আছেন।

—কিছু দেখতে পাচ্ছে শাহজাদা ?

গড়ের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কথা হচ্ছিল। অনু রায় বললেন, হেকিম আবদুল হাজি সিরাজি তো দেখে যাচ্ছেন একদিন অন্তর একদিন। কী সব লাগাচ্ছেনও চোখে। বোধহয় কিছু কিছু দেখতে পান এখন শাহজাদা—

আশায় আশায় মুখখানা জ্বলে উঠলো জাহাঙ্গীরের। সত্যি ? তাই যেন হয় খোদা ! একথা বলে তার মনে এলো, তিরিশ বছরে পা দিলো শাহজাদা। যদি অন্ধ করে দেবার হুকুম না দিতাম সেদিন ! যদি না দিতাম ! আমিই ছাত্রিশ বছর বয়সে হিন্দুস্থানের বাদশা হয়েছি। খসরুর দোষে আমিও তো দোষী। আমিও তো হিন্দুস্থানের সিংহাসনের দিকে হাত বাড়িয়েছিলাম। আব্বা হুজুর আকবর বাদশা তো আকন্দর আঠা লাগিয়ে আমার দু'চোখ অন্ধ করে দেননি—

মুখে বললেন জাহাঙ্গীর—আপনার মতো বিশ্বাসী মানুষকে শাহজাদা খসরুর দেখাশোনার ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। আমি জানি আপনি শাহজাদাকে নিজের ছেলের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন।

অনু রায় কোনো কথা বললেন না। শুধু মাথাটা একটু নামিয়েই আবার সিধে হয়ে হাঁটতে লাগলেন। বাদশার পাশে পাশে। খসরুর মা যোধপুর রাজের মেয়ে। রাজপুত বংশলতায় অনু রায়ের ভাগ্নে সমান।

বাদশা বললেন, আপনি শাহজাদার আতালিক—মুরুব্বি। সে হিন্দুস্থানের বাদশার পহেলা আওলাদ। হোক্ অন্ধ। যদি চোখ ফিরে পায়—সে তো ইনসাফির তরাজু মোতাবেক হিন্দুস্থানের মসনদের পহেলা হকদার। তার যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সেদিকে আপনি কড়া নজর রাখবেন।

জানি আলা হজরত। ইবলিশও যদি শাহজাদার দিকে হাত বাড়ায় তো হাত দু'খানি কেটে রাখবো ইবলিশের। বান্দাগান-ই আলা হজরত একথা বলছেন কেন ?

—হিন্দুস্থানের তখতের দিকে কে না হাত বাড়ায়— !

অনু রায় বললেন, ওই শাহজাদা দাঁড়িয়ে আছেন।

বাদশা জাহাঙ্গীর থমকে পড়লেন। সিংহ-দলন অনু রায় এবার পিছিয়ে এলেন। তাই-ই নিয়ম। হিন্দুস্থানের সবচেয়ে বিখ্যাত বাবা এখন তাঁর বড়ছেলের সঙ্গে কথা বলবেন। নিভৃতি চাই।

পোড়ো গড়ের খোলা চাতালে চাঁদের আলোয় খসরু পিঠ ফিরে দাঁড়িয়ে। শাহজাদা এখন পূর্ণ যুবক। চওড়া কাঁধ, একমাথা কালো চুল, অবিন্যস্ত।

একজন রীতিমত শক্তিধর পুরুষ দাঁড়িয়ে। কিন্তু অন্ধ।

—আমি এসেছি খসরু।

—জানি আব্বা হুজুর।

আশায় আশায় বুকটা দুলে উঠলো বাদশা জাহাঙ্গীরের। তুমি কি তাহলে সত্যি কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছো?

—আমি এখন আগের চেয়েও বেশি দেখতে পাই—সব দেখতে পাই।

হায় খোদা! সবই তাঁর মেহেরবানী! তুমি পুরোপুরি দেখতে পাও এই আমার একমাত্র মোনাজাত—

—এমনকি আপনি যে আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন—তাও দেখতে পাচ্ছি আলা হজরত!

আবেগে বাদশা জাহাঙ্গীর এগিয়ে গিয়ে শাহজাদা খসরুর পিঠে হাত রাখলেন। খসরুর অন্ধ চোখ তখন সামনের জ্যোৎস্না ভেজা ফাঁকা প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে। জাহাঙ্গীর চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, হেকিম সিরাজিকে আমি জায়গীর দেবো। কী আশ্চর্য গুণ তার ওষুধে—

—অবশ্য দেবেন বাদশা। অবশ্যই দেবেন। আমি এখন সামনে পেছনে তো দেখতে পাইই—এমনকি আমার জন্মের আগে ঘটে যাওয়া জিনিসও পরিষ্কার দেখতে পাই!

চমকে উঠলেন বাদশা। তিনি দু'হাতে নিজের ছেলেকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন। এই আধো অন্ধকারে বাদশার পেছনে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র চারজন তুর্কি খোজা। তাদের হাতে খোলা বিরছা কুড়ুল। কোমরবন্ধে খুব দরকারে চালাবার মতো আকবরী পিস্তল। বাদশার ওপর আচমকা হামলা হলে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে। সেলিম জাহাঙ্গীর শাহজাদাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। সত্যিই কি খসরু এখন একটু একটু দেখতে পায়? না, গভীর অন্ধকারে টানা এই দশ বছর ডুবে থেকে আরও নতুন কোনো অন্ধকারের কথা বলে যাচ্ছে—যা কিনা সে একাই বলে—একাই শোনে।

শাহজাদা খসরু বাদশার দু'হাতের আলতো ঘের পিঠ দিয়ে ঠেলে দিয়েই খানিক সরে দাঁড়ালেন, ওই তো আকবর বাদশা তাঁর দশহাজারী মনসবদার শাহজাদা সেলিমকে চিঠি লিখছেন—অল্প কিছু সেপাই-সামন্ত নিয়ে আগ্রায় এসো। নয়তো এলাহাবাদে ফিরে যাও—তোমার মঙ্গলের জন্যেই একথা লিখছি! সবই আমি এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আব্বা হুজুর!

জাহাঙ্গীর ভীষণ জোরে খসরুকে জড়িয়ে ধরলেন, আমায় ক্ষমা করো খসরু। হিন্দুস্থানের বাদশা তোমার দুয়ারে ক্ষমা চাইছে—

শাহজাদা খসরু ঘুরে দাঁড়িয়ে এই আধো অন্ধকারে হিন্দুস্থানের বাদশার মুখোমুখি হলেন। তাগড়া—পুরোদস্তুর যুবক ছেলের বুকের ওঠাপড়া বাদশা নিজের বুকের খুব কাছাকাছি টের পেলেন। তিনি তখনও খসরুকে জড়িয়ে আছেন। ছেলে তাঁর চেয়ে কিছু লম্বাই হবে। চওড়া তো বটেই। আতরে ঘামে মাখামাখি ছেলের গায়ের ঘামের গন্ধ বড় ভালো লাগলো বাদশার। নসীবকে

শুক্রিয়া জানালেন বাদশা—মনে মনে। ভাগ্যিস জায়গাটায় তেমন আলো পড়েনি। নইলে এই সামান্য ফারাকে ছেলের মুখে চোখের জায়গায় অমন অন্ধকারের মুখোমুখি তিনি কিছুতেই হতে পারতেন না। বাদশা নিজে এখন সাতচল্লিশ। শাহজাদা খসরু তাঁর চেয়ে মাত্র আঠারো বছরের ছোট। তাহলে কি আমরা দু'জনই একই সঙ্গে এখনো যুবক? খসরু আমার হুকুমে অন্ধ হয়েছিল উনিশ বছর বয়সে। তখন আমি ছিলাম সাঁইত্রিশ। তখন তো আমরা দু'জন একই সঙ্গে যুবক ছিলাম। তার মাত্র এক সন আগে আমি হিন্দুস্থানের মসনদে বসেছি। এই তো সেদিন!

—হিন্দুস্থানের বাদশা তোমার কাছে ক্ষমা চাইছেন খসরু। তাকে ক্ষমা করো। তোমার চোখের আলো ফিরিয়ে আনতে আমি কোনো কসুর করবো না। ইস্পাহানেও আমি বড় হেকিমের খোঁজ করতে লোক পাঠিয়েছি বাবা খসরু—ক্ষমা করো বাদশাকে—

শাহজাদা খসরু শান্ত ঠান্ডা গলায় জানতে চাইলেন, আপনি বাদশা? না, বাবা?

ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে সেলিম জাহাঙ্গীর সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। এই মুহূর্তে নিজের হাত দু'খানা কোথায় রাখবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না হিন্দুস্থানের বাদশা। তিনি নিরুপায় হয়ে বললেন, তুমি আমার ছেলে খসরু—

—আব্বা হুজুর আমিও একজন ছেলেকে দেখতে পাচ্ছি—

—কে? কে খসরু?

—তাঁরও বাবা বাদশা ছিলেন। বাবার মৃত্যুশয্যার পাশে বসে আছেন অনুতপ্ত শাহজাদা সেলিম। এককালের বাগী শাহজাদা!

—ব্যস্ করো খসরু। ব্যস করো।

শাহজাদা খসরু কিন্তু থামলেন না। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে বাদশা বলে গেলেন—মানীদের মেনে চলবে। আমি যাচ্ছি। তুমি থাকলে। তুমিই হিন্দুস্থানের বাদশা! কেমন আশ্চর্য বাদশা ছিলেন আকবর। তাই না আব্বা হুজুর?

সেলিম জাহাঙ্গীর খানিকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না। বাইরে সওয়ারদের ঘোড়া ঠকাঠক পা বদলাচ্ছে এই নির্জন আবছা সন্ধ্যায়। শেষে জাহাঙ্গীর কোনওরকমে বলতে পারলেন, আমি তো তোমার বেদৌলতি বাবা—একটু রহেম রাখো তার জন্যে—

—আমিও তো একজন বাবা। আমার ছেলে দাওয়ার বকস্ বড় হয়ে উঠেছে। সে তো আর আমার কাছে আসতেই চায় না—

—কেন? কেন? আমি হুকুম দেবো—

—দোহাই আব্বা হুজুর। আর হুকুম দেবেন না। সে এখন কিশোর হয়ে উঠছে। অন্ধ মানুষের কাছে আসতে কোন্ কিশোরেরই বা ভালো লাগে! কতদিন কোনো শিশু দেখি না—বলেই থামলেন শাহজাদা খসরু। শুধরে

নিয়ে বললেন, কতদিন হলো কোনো শিশুকে ছুঁয়েও দেখিনি—

বাদশা জাহাঙ্গীর যেন কী বলতে শুরু করেছিলেন। অন্ধ মানুষ শাহী সহবতের পরোয়াই করে না। শাহজাদা খসরু বাদশার কথার মাঝখানেই বলে উঠলেন, দারার কথা শুনেছি। সেই খুদে সুলতানকে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে—

সুলতান মহম্মদ দারাশুকো এখন নিতান্তই শিশু।

—খুর্রমের পহেলা আওলাদ দারা। তাকেও দেখা হলো না! দেখিনি শাহজাদা শারিয়ারকে। আমি যখন অন্ধ হই—তখন সেও তো ছিল সুলতান দারার মতোই শিশু।

জাহাঙ্গীর কোনো কথাই বলতে পারলেন না।

ঠিক এইসময়ে শাহজাদা খুর্রমের সামনে সাদা পাগড়িওয়ালা নজুমীর দাড়ি নেড়ে দোয়া করছিলেন। তার সামনে মেলা রয়েছে ইউনানি ছক—তাবিজের স্তূপ। সময়—এই একই সন্ধ্যা। জায়গাটা আর কোথাও নয়—আগ্রা দুর্গ। দুনিয়ায় একই সঙ্গে নানান কিছু ঘটতে থাকে। একটা আরেকটার সঙ্গে জড়ানো পাতানো—অথচ কেউ কারও খোঁজও রাখে না। আবার কোনো ঘটনা অন্য ঘটনার সুতোর সাথীও নয়। এই হলো গিয়ে দুনিয়া।

আগ্রা দুর্গের উত্তর-পশ্চিমে হাতিপোল—উত্তরে মোরি দরওয়াজা। পুবে খিঁকির দরওয়াজা। শাহবুরুজের নিচে দর্শন দরওয়াজা। দক্ষিণ-পুবে আকবরী দরওয়াজা। বাইরে মাটির দেওয়ালে দেওয়ালে উঠে চওড়া গভীর মলের নালা পেরোতে মজবুত মোটা তক্তার টানা সেতু। এই সেতু পেরিয়ে হাতিপোল, আকবরী দরওয়াজার দিকে এগোতে হয়। এইসব দরওয়াজাই এক-একটা ছোটখাটো দুর্গ বিশেষ। এই হাতিপোল দরওয়াজার ওপর নফ্‌ফার-খানায় একটু পরে সান্ধ্য রাতের সানাই বেজে উঠবে। নফ্‌ফারখানার পরেই ধ্বজ-পতাকার আলমখানা। তারপর বালুঘড়ি আর জলঘড়ি। শেষে জ্যোতিষী নজুমীরদের ঘর।

শাহজাদা খুর্রমের জরুরি এত্তেলা পেয়ে নজুমীর ছুটে এসেছেন। সমস্যাটা বড়ই জরুরি। সুলতান মহম্মদ দারাশুকোর বাঁ দিকের চাঁদিতে তিল। বড়ই খারাপ লক্ষণ। এর কী করা যায়? সেটাই নানাভাবে বিচার করে নজুমীর বয়াত কবুল করে দাড়ি নেড়ে দোয়া করছিলেন। তাঁর সামনে পাতা ইউনানী ছকে মহম্মদ দারাশুকোর জন্মক্ষণ লেখা—

সোমবার রাত ১২ দণ্ড ৪২ পল গতে
২৯ শে সফর ১০২৪ হিজরি

শাহাজাদা খুর্রম রীতিমত চিন্তিত। কপালে তিনটি ভাঁজ। চোখ দরজায়। ঘন ঘন সেদিকে তাকাচ্ছেন। যে বিষয়টি নিয়ে তিনি জিজ্ঞাসু—তার কোনো সদুত্তর নজুমীর এখন পর্যন্ত দিতে পারেননি।

এমন সময় দরজায় ভেসে উঠলেন জ্যোতিষী রঘুনাথ। দুর্গের কারখানা,

গোশালা, দর্জিঘর, কামারশালা পেরিয়ে তিনি মাঝে মাঝে শাহী বুরুজে গিয়ে ওঠেন। সেখানে বসে আকাশে তাকিয়ে থাকেন। শাহজাদার একজন হাজিরা গিয়ে তাঁকে ডেকে এনেছে।

রঘুনাথ কুর্নিশ করে দাঁড়ালেন। শাহজাদা তাঁকে বসতে বললেন। বসতেই খুর্রম তাঁর সঙ্গে তিল তত্ত্ব নিয়ে পড়লেন।

এই রঘুনাথ জ্যোতিষী কথায় কথায় ফোয়ারার মতো খনার বচন আউড়ে থাকেন। যাত্রা, ঝড়বৃষ্টি, গুনে-গেঁথে পেটের সন্তান আগাম বলে দেওয়ার মতো ব্যাপারস্যাপারে মুঘল ঘরানায় গভীর বিশ্বাস চিরদিনের। একদা ঘোড়ার পিঠে ঘুরে বেড়ানো চাঘতাই-লড়াকুরা এই একশো বছরে ঘোর রাজ্যপাটে পাটোয়ারি হয়ে উঠলেও এই জ্যোতিষ নজুমীরে তাঁদের অগাধ বিশ্বাস!

রঘুনাথ কাকচরিত্রেও পারদর্শী। পারদর্শী স্বপ্নতত্ত্ব, তিলতত্ত্ব, যতুকতত্ত্বেও। শাহজাদা জানতে চাইলেন, ইনসানের বাঁ চাঁদিতে তিল কিসের লক্ষণ?

রঘুনাথ হেসে বললেন, আপনি তিল চেনেন শাহজাদা?

একটু ঘাবড়ে গিয়ে খুর্রম বললেন, কালো মতো—

শুনুন। কালো যতুক যদি মুখের বাঁদিকে থাকে তো জাতক খুব সুখী হয়—

—তাই নাকি? তাহলে কি ওটা যতুক?

—সুলতান মহম্মদ দারাশুকো ভূমিষ্ঠ হয়েছেন—রাত ১২ দণ্ড ৪২ পল গতে। গভীর নিশীথে জন্মালে তো তিল হয় না—যতুক হয়—শাহজাদা।

—তবে কি ওটা যতুকই দেখলাম?

—মুখের ডানদিকে যতুক হলে সম্মানপ্রাপ্তি যোগ—তাছাড়া রাজবৎ সুখী হয় জাতক।

—না, বাঁ দিকে—

—তাহলে তো কোনো চিন্তারই কারণ নেই।

তিল? না, যতুক? এই দোটানায় শাহজাদা খুর্রম মহা ফেরে পড়ে গেলেন। এতক্ষণ নজুমীর একা ছিলেন—বেশ ভালো ছিলেন শাহজাদা। এখন যে সবই তার গুলিয়ে যাচ্ছে।

রঘুনাথ তখন তিলতত্ত্ব আর যতুকতত্ত্বের লক্ষণগুলো পাশাপাশি বলে যাচ্ছিলেন—

ললাটের ডানদিকে নাকের ওপর তিল থাকলে জাতকের দৈবধন ও যশোলাভের খুব সম্ভাবনা।

বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপর যতুক থাকলে জাতক দুঃখী হবে।

চোখের নিচে তিল থাকলে অধ্যবসায়ীর চিহ্ন।

শাহজাদা খুর্রমের মনে হলো—বাদশা বাবরের চোখের নিচে কি তিল ছিল? তিনি তো দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে থাকার মতো অধ্যবসায়ী ছিলেন।

রঘুনাথ জ্যোতিষী বলে যাচ্ছিলেন—

ডানহাতের কনুইয়ের ওপর জাতকের যদি যতুক চিহ্ন থাকে তো সে খুবই নিন্দিত মানুষ।

গণ্ডে তিল থাকলে জাতক কখনো ধনাঢ্য হয় না।

ডান হাতের কনুইয়ের নিচে জাতকের যদি যতুক চিহ্ন থাকে তো সে খুবই কামুক।

নিচের আর ওপরে ঠোঁটে তিল থাকলে জাতক বিলাসী হয়—প্রেমিক হয়।

—থামুন তো। সুখ-দুঃখ-যশ-নিন্দা, রুপেয়া-দামড়ি, কাম-প্রেমের সময় আসতে শিশুর এখনও অনেক—অনেক দেরি। আগে দেখতে হয়—দারার বাঁ চাঁদিতে ওটা সত্যিই তিল কিনা? যদি তিল না হয় তো যতুক নিশ্চয়।

—সেটাই তো সবার আগে জানা দরকার শাহজাদা।

—আমি কি ঠিক চিনতে পারবো?

—খুব পারবেন। আপনি তার বাবা। আর একটা কথা শাহজাদা খুর্‌রম। এত তাড়া কিসের? শিশুর সামনে তো অগাধ জীবন পড়ে আছে। এখন সুলতান দারাশুকো বড় হয়ে উঠুক। তখন একসময় দেখেশুনে স্থির করা যাবে—ওটা তিল? না, যতুক? যদি তিল হয়ে থাকে জাতকের চাঁদির বাঁ দিকে—তো তারও রাস্তা আছে।

—আছে?

—আলবত আছে শাহজাদা। চাঁদ-সুরজের এই দুনিয়ায় কিসের ব্যবস্থা নেই! সোনা রুপো ধরে দিলে কোন দোষ অর্ষে না!

—বলছেন আপনি?

—হ্যাঁ। আমি তো আছি শাহজাদা খুর্‌রম।

এতক্ষণে নজুমীর চোখ খুললেন। খুলে দেখলেন—তিনি এই মুঘল সংসারে রঘুনাথের বাতচিত বোলের অনেক পিছনে পেছিয়ে পড়েছেন। হারানো জমি উদ্ধারের জন্যে নজুমীর কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন।

শাহজাদার কথায় তাঁকে থামতে হলো। ভেতরে ছটফটানি। রাগ। বাইরে ভদ্র হাসি মেলে ধরে নজুমীর চুপ করে রইলেন।

শাহজাদা বললেন, ওটা যদি তিল হয়ে থাকে—আর তা যদি গলায় হতো দারাশুকোর?

রঘুনাথ ফটাস করে ফেটে পড়ার মতোই বললেন, তাহলে জাতক বিয়েতে প্রচুর ধনরত্ন পেতো।

নজুমীর বললেন, মুঘল ঘরানার ইনসানের ধনরত্ন তো ঘরেই আছে। হিন্দুস্থানে তার চেয়ে বেশি হীরাপান্না আর কার আছে? সে কী করে বিয়েতে আরও বেশি করে মোতি পান্না পায়! যত্ত সব!

এইখানে একটা অদৃশ্য যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার কথা। কিন্তু তা হওয়ার সুযোগ থাকলো না।

শাহজাদা খুর্‌রম দেখলেন, দোরে বেনারসি দাঁড়িয়ে। তার হাতের আঙুলে সাংকেতিক আঙটি। আঙটিটি উজিরে আজম আসফ খাঁয়ের—মানে তাঁর

শ্বশুরমশায়ের। বেনারসি আসফ খাঁয়ের খাস গোলাম।

শাহজাদা খুর্রম উঠে বসলেন। আমায় যে উঠতে হচ্ছে—

সঙ্গে সঙ্গে নজুমীর তাঁর ছক, তাবিজের পাহাড় গুটিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। দেখাদেখি রঘুনাথও।

শাহী দস্তুর-ই-আমল মোতাবেক কোনো খবর দিতে এসে—কিংবা ডাকতে এসে কাসীদ, গোলাম বা দাখিলা যদি দেখে অন্য কেউ আছে তো তার বেরিয়ে যাওয়া অব্দি স্রেফ মূর্তি হয়ে চুপ করে থাকবে।

এখানেও তাই ঘটলো। রঘুনাথ আর নজুমীর বেরিয়ে যেতেই বেনারসি গোলাম এগিয়ে এসে কুর্নিশ করলো। তারপর আঙুল থেকে সাঙ্কেতিক আঙটিটা খুলে শাহজাদা খুর্রমের হাতে দিলো।

॥ ছয় ॥

মাথার ওপর আশমান বড় পুরনো জায়গা। দিনে সূর্য জায়গাটা সাদা করে রাখে। অন্ধকার রাতে সেখানে তারা ফুটে ওঠে। পূর্ণিমা থাকলে সে জায়গা হলুদ পারা হয়। হিন্দুস্থানের ওপর দিয়ে আরেকটি বর্ষা চলে গেল। এখন সন্ধে রাতে দু'একটা তারা ফুটেছে। ঘোড়ার পিঠে বসেই মীর সফি উল্টোদিকের ঘোড়ায় বসা মির্জা ইউসুফ বেগকে বললো আমরা আহেদিরা তৈরি।

—হ্যাঁ। তাই থাকো। ভোর রাতে আকাশে তারা থাকতে থাকতে হামলা শুরু হবে।

—অভয় দেন তো একটা কথা বলি।

কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। ইউসুফ বেগ আন্দাজে সফির মুখের জায়গায় তাকালেন। বলো।

গত ক'মাস তো আমরা চেষ্টা করে আসছি। বেহুদা কাল সকাল থেকে কিছু মানুষ সাবাড় হবে—সে আমাদেরই হোক—আর ওদেরই হোক—

—দু'পক্ষেরই হবে সফি।

—ঘোড়াও খতম হবে কিছু। আপনি আগ্রা গিয়ে সব ঘাটতি ভরাট করে আনিয়েছেন। এই ক'মাসে পাইকদের আমরা কব্জা করতে পারিনি।

—সে পারিনি কারণ, বর্ষা ছিল। এখানে তখন হাতি অচল। ঘোড়া কাবু। এখন তো জল শুকিয়ে যাবে জমির। গোলা দাগবো। হাতি এগোবে—

ওরা হিন্দুস্থানের সাবেক মানুষ। পালাবে। আবার মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। আমি আপনি আজ এখানে আছি—কালই হয়তো গুজরাতে বদলি হয়ে যেতে পারি।

—কী বলতে চাইছো সফি—স্পষ্ট করে বলো।

—ইনসান মরবে। মালগুজারি হাসিল হবে না।

—ওরা তো শায়েস্তা হবে। আগ্রা তো তাই চায় যুবক!

—শায়েস্তাও হবে না। মরবে। মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। নয়তো কিছুদিনের জন্যে পালাবে। সুযোগ বুঝে ফিরে আসবে। মাথা নোয়াবে না—

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে দু'হাজারি মনসবদার মির্জা ইউসুফ বেগ মুখ খুললেন। ঘোড়ার পিঠে বসেই তিনি অন্ধকারে তাঁর তাবিনের হাতিদের শব্দ করে গোছা গোছা আখ চিবোনোর শব্দ পাচ্ছিলেন। কী এলাহি ব্যবস্থা। আবছা অন্ধকারে সারি সারি উট দাঁড়িয়ে। চার পাঁচ কাতারে একজন করে সারবান তাদের তোয়াজ করে মেজাজে রাখছে। যাতে ভোররাতে হামলার সময় খিঁচড়ে না যায়।

—এ লড়াই আগ্রার লড়াই। আমি তুমি তো স্রেফ হুকুম বরদার। এ হলো গিয়ে মোগল হুকুমত। আমরা আছি হুকুম তামিল করতে। গোলা ছুটবে, ঘোড়া দাপাবে, হাতি ধেয়ে যাবে—আগ্রা দুর্গে দেওয়ানি খাসে বসে বাদশা জাহাঙ্গীর বলে যাবেন আর সেকথা তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরে লেখা হবে। ঘামাসান লড়াইয়ের নামচা। তাতে চাঘতাই তাগদ ফুটে উঠবে যে—

নিষ্ফল, নিরুপায় রাগে মীর সফি আর একটিও কথা না বলে অন্ধকারে তার চৌকিতে বেরিয়ে পড়লো! শেষবারের মতো দেখে নিতে হবে—কোথায় কে আছে। হামলার আগে সব ঠিকঠাক রাখতে হবে। সারাটা বর্ষাকাল ঘরদুয়ারি পাইকদের পাণ্ডা—সনাতন খুব হয়রান করেছে। ঘোড়ার পা এই পেছল মাটিতে বসে যায়। হাতির শুঁড়ে জোঁক ঢুকে পড়ে। আর সনাতনরা তো এই আছে, এই নেই।

পঁচাত্তর জন করে ঘোড়সওয়ার এক এক রিসালায়—এমন দুই রিসালা নিয়ে আহেদি মীর সফি ভোর রাতে ফিকা পর্দার এক উসকানি তৈরি করলো। বাছা বাছা তুর্কি ঘোড়া। তাদের পিঠে বাছাই বাছাই আফগান, ইরানি, তুর্কি সওয়ার। ভোর রাতের বাতাসের ভেতর এদের নিয়ে এগিয়ে চললো আহেদি সফি। টিলার ঢালের দিকে। ঘোড়ার পেট অব্দি কাঁটাগাছের মাথা। লতায় জড়ানো নাম-না-জানা গাছের বুনো ফলে—কুঁড়িতে, ফুলে বিষ পিঁপড়ে—মাছি। খোলা বিরছায় এক হাতে গাছের বাধা কাটতে কাটতে এগোচ্ছিল সবাই। শুধু কয়েকজন ঘোড়সওয়ার সামনের দিকে বন্দুক তাগ করে বসে। পাছে চোরাগোপ্তা তীর বা গুলি এসে পড়ে উল্টোদিক থেকে।

উজবেক এই মনসবদার যেমনই সুশ্রী—তেমনই সাহসী। দক্ষ তো বটেই—পণ্ডিতও বটে। আবার নিষ্ঠুরও কম নয়। ধুমধুমার গড় থেকে পাইকদের বের করে এনে কামানের গোলায় ছাতু করে দেবার মতলব এঁটেছে। কেউ যাতে পালাতে না পারে সে জন্যে চারদিক ঘিরে আগুন দেবার ব্যবস্থাও পাকা। আবার মাটি-কাঠের সামান্য গড় গুঁড়িয়ে দিতে মির্জা ইউসুফ বেগ দামি বারুদ সোরা খরচা করার পক্ষপাতী নয়। তাই বেলাদারদের দিয়ে পাথরের গোলা ফাটানো হয়েছে। বারুদে ঠাসা লোহার খোলের তোপ-ই-হাওয়াই শুধু খুব দরকারে দাগা হবে।

রোদ ওঠার ভেতর তিন তিনবার পাইকদের উসকানি দিতে ফিকা পর্দার

সওয়ারদের নিয়ে সফি টিলা বেয়ে উঠলো। তিন তিনবারই ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে এলো গর থেকে—একেবারে টিয়ার ঝাঁক যেন। চারজন সওয়ার ঢলে পড়লো।

এখন রোদে হাতি, উট, ঘোড়া, তোপ সবই দেখা যাচ্ছে। ইউসুফ বেগ বুঝলেন, উসকে উসকে পাইকদের ধুমধুমার গড় থেকে বের করা যাবে না।

গোল করে কাটা পাথরের গোলা দাগা শুরু হলো। শব্দ নেই কোনো। কিন্তু গড়ের যেখানে গিয়ে পড়ছে—সেখানটাই খানিক খানিক খসে পড়তে লাগলো।

এভাবে খানিক চলার পর একসঙ্গে বারোটা হাতিকে খেপিয়ে টিলায় তোলা হলো। বিষতীরে হাতি যাতে ঘায়েল না হয়—সে জন্য এক একটা হাতিকে ঘিরে মাছির মতো বন্দুকচী। তাদের আগে আগে ঘোড়সওয়ারের দল। একেবারে সামনে আহেদি-ই-আজম মীর সফি। তার পাশে আহেদি বেলাইতি বাজারঘানি। আর ফিকা পর্দার দুই রিসালা ঘোড়সওয়ার।

হুকুম হলো—তীর আসুক—গুলির ঝাঁক ছুটে আসুক—টিলা বেয়ে ছুটতে ছুটত ওপরে উঠতে হবে একদমে। বারোটা হাতির একটারও ঘায়েল হওয়া চলবে না।

এ যে মৃত্যুর গুহায় সিধে গিয়ে মাথা দিয়ে গুঁতোনো। সফি দাঁতে দাঁত চেপে তার তুর্কি ঘোড়ার পেটে বেদম জোরে খোঁচা দিলো। এক ঘোড়া দৌড়লে তার পেছন পেছন নাকি ঘোড়া দৌড়য়। সকালবেলায় শান্ত খুন্তাঘাটে শুধু এই জায়গাটুকু জুড়েই যেন কোনো অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটছে—যার সঙ্গে আশপাশের বড় বড় গাছ—গাছের পাখির ঝাঁকের কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে এখন হয় বাঁচো—নয় মরো। মানে বাঁচার জন্যে মারো। আরও বেশি বেশি করে মারো।

জন তিরিশেক ঘোড়সওয়ার নিয়ে সফি নালার সামনে বসে কোনোরকমে দাঁড়ালো। বেলাইতি বাজারঘানি ঠিক পেছনে। তার পেছনেই হাতির পাল ধেয়ে উঠে আসছিল। নালা পেরোলেই মাটি, গাছ আর পাথরে গাঁথা গড়ের মোটা দেওয়াল। ঠিক তখনই দেওয়ালের ওপর থেকে পাইকরা আগুনে দাউ দাউ বাঁশের মাচা নিচে ফেললো। ভড়কে গিয়ে কয়েকটা ঘোড়া লাফিয়ে উঠলো।

এক্ষুনি কিছু করতে হবে। টিলার মাঝামাঝি জায়গা থেকে ইউসুফ বেগ ঘোড়ার পিঠে বসেই হাতের বাঁকা তলোয়ারে বাতাস কেটে চেঁচিয়ে উঠলেন, হামলা—

আগুন ধরানো পাকা বাঁশের দাউ দাউ মাচাটা তখন টিলার ঢাল ধরে হাতিদের দিকে গড়াচ্ছে। আর হাত কয়েক। এ আগুন হাতিদের কাছে পেঁছিলে কী কাণ্ড হবে বলা যায় না। চাই কি মনসবী ঘোড়সওয়ারদের থেঁতলে দিয়ে হাতিরা দিক পালটাতে পারে। তখন দু দিকই যাবে। সুযোগ বুঝে গড় থেকে পাইকরা নেমে এসে পেছন থেকে কচু কাটাও করতে পারে।

মীর সফি তার ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে ধেয়ে আসা হাতিদের সামনা-সামনি আগ্নে গড়ানো মাচাটা কোমরে ঝোলানো বিরছা কুড়্ল দিয়ে আঙটার মতো আটকালো। আটকেই এক এক কোপে আগ্নের বড় দলাটা ট্করো ট্করো করে ফেললো।

অন্য সময় হলে মির্জা ইউস্ফ বেগ ঘোড়া থেকে নেমে গিয়ে এই বাহাদ্র আহেদিকে শাবাশী দিতেন। এখন শাবাশী—তারিফিরও সময় নেই। হামলার ম্খে হাতিগ্লোকে শরাব দেওয়া হয়েছে। ওরা দোগ্নী ফ্র্তিতে টিলা বেয়ে ধেয়ে উঠছে। পাক্কা আহেদির মতোই এক ডিগবাজি খেয়ে মীর সফি হাতির পায়ের তলায় না পড়ে টিলার ঢাল ধরে গড়িয়ে পড়লো।

গোলা দাগা থেমে নেই। আরও এক মাচা আগ্ন উঁচু দেওয়ালের ওপর থেকে পাইকরা কায়দা মতো ফেললো। সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে গ্লি। গড়ের এক দিককার দেওয়াল ততক্ষণে ধসে গিয়ে হা হা করছে।

ইউস্ফ বেগ আবারও তলোয়ারে বাতাস কেটে চেঁচিয়ে উঠলেন, হামলা—

ফ্র্তিবাজ হাতিরাও যেন সে হ্কুমের মানে ব্ঝলো। তারা আগ্নে মাচাটা মাড়িয়ে দিব্বি এগিয়ে গেল। তখনি ঝাঁকে পাইক বেরিয়ে পড়ে নিচে নেমে এলো। কারো হাতে রামদা—কারো হাতে বন্দ্ক—কেউ বা শ্ধ্ই লম্বা কুড়্ল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

মীর সফির ঘোড়াটা সওয়ার না পেয়ে ঢাল ধরে নেমে আসছিল। আর একট্ এলেই সফি এক লাফে ওর পিঠে উঠতে পারে। কিন্তু তা হবার নয়। পিঁপড়ের মতো পাইকরা মরছে। বর্শা দিয়ে ঘোড়সওয়াররা ছ্টন্ত, মরিয়া পাইকদের গাঁথছে। হাতিরা ততক্ষণে গড়ের দেওয়াল ভেঙে ঢ্কে পড়লো। আর অমনি মেয়েদের বাচ্চাদের কান্নার রোল উঠলো। এক পাইকের হাত-দায়ে একজন ইরানি সওয়ারের ডান পা ঘোড়ায় বসা অবস্থায় দ্'খানা হয়ে গেল। সেই সওয়ারের পালটা বর্শায় পাইকটির ব্ক, ম্খ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। পাইকটার চোখে রক্ত গড়িয়ে পড়ায় কিছ্ দেখতে পাচ্ছে না। সে দিশেহারা হয়ে চেঁচাচ্ছে। পা-কাটা সওয়ার তারই ওপর ঢলে পড়লো।

হামলার একেবারে পাশেই ঢালে উপ্ড় হয়ে মীর সফি সব দেখতে পাচ্ছিল। এর নাম লড়াই! ফ্র্তিবাজ হাতিগ্লোর পায়ের চাপে কয়েকজন পাইক আওরত থেঁতলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সফি মাথা নামালো।

তখনো মির্জা ইউস্ফ বেশ পাক্কা উজবেকী গলায় আশমান ফাটাচ্ছে, হামলা—হামলা।

মীর সফি আর তাকাতে পারছিল না। সে চোখ ব্জে ফেললো। তখন তখনই এক আওরত মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। সে চিৎকার শোরগোলের ভেতরেও আলাদা হয়ে সফির কানে পেঁছিলো। উটের ডাক ছাপিয়ে।

সে চোখ খ্লে দেখে মীনাক্ষী। মীনাক্ষীই তো। এ নিশ্চয় মীনাক্ষী পাইক। ঘাড় বেয়ে রক্ত পড়ছে। খোলা চুল। হাতের রামদা দিয়ে সে আহেদি বেলাইতি বাজারঘানির কোমরে যতবারই কোপ মারছে—বেলাইতি হাসতে

হাসতে বাঁ পায়ের ঠোক্করে দাবনাসুদ্ধ ঘোড়াকে পলকে খানিক খানিক করে সরিয়ে নিচ্ছে—। আর মীনাক্ষীর হাতের কোপ ফসকে যাচ্ছে। কিন্তু বেলাইতির হাতে তোলা বর্শা একটুও কাঁপছে না। সফি বুঝলো, এক্ষুনি বেলাইতি চোখের পলক না ফেলে মীনাক্ষীকে গেঁথে ফেলবে।

হাতিদের থ্যাঁতলানিতে, উটের পায়ের চাপে, বন্দুকচীদের নিশানায় পাইকদের একমাসের এক কাট্টা দুশমনি তছনছ হয়ে গেছে। দাগা তোপ গিয়ে পড়লো একপাল বাচ্চার ভেতর। উঃ।

পড়ে থাকা একখানা বর্শা কুড়িয়ে নিয়ে নিজের ফাঁকা রেকাবে পা দিয়েই চড়ে বসলো মীর সফি। সওয়ারকে পিঠে পেয়ে ঘোড়া চিনতে পারলো। মীর সফি রক্তে ভেজা ঘাস, উটের কাতার, ধানুকীদের বিষ তীর—কিছুরই পরোয়া না করে একদম বেলাইতি বাজারঘানির কাছাকাছি পৌঁছে গেল।

তখন মরিয়া মীনাক্ষী বাজারঘানিকে ঘোড়ার পেটের নিচে কুঁজো হয়ে পাগলের মতো বাজারঘানির রেকাবের দড়ি কুপিয়ে কাটার জন্য দা চালাচ্ছে। ঘোড়া অনবরত পা বদলানোতে মীনাক্ষীর হাতদা ফসকেই চলেছে। বেলাইতি মীনাক্ষীর পিঠ বরাবর বর্শা তুললো।

—বেলাইতি!

—সফির চড়া গলায় চমকে গিয়ে বেলাইতি তাকালো। সফি।

সঙ্গে সঙ্গে সফি দেখলো, বেলাইতির ঠোঁট তাচ্ছিল্যের হাসিতে মুচড়ে যাচ্ছে। আহেদি-ই-আজম মীর সফি আর দেরি করতে পারে না। হাতের বিরছাখানা সে গায়ের সবটুকু জোর দিয়ে বেলাইতির বর্শা তোলা ডান হাতের গোড়ার দিকে বসিয়ে দিলো।

দিয়েই ঘোড়া থেকে ঝুঁকে সফি রক্ত মাখা, মরিয়া মীনাক্ষীকে এক ঝটকায় টেনে তুললো। তার সামনে দিশেহারা মীনাক্ষী তখনো এলোপাথাড়ি চেঁচাচ্ছে। তার শরীরের আধখানা ঘোড়ার সামনের পায়ের দিকে ঝুলে পড়েছে। মীর সফি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে দুই পায়ের পাতায় ঘোড়ার পেটে বেদম দুই খোঁচা দিলো। আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের দু'জনকে নিয়ে ঘোড়া টিলার গড়ের দিক করে ডান ঢাল বেয়ে ভেসে পড়লো। এই ঝাঁকুনিতে পাছে মীনাক্ষী পড়ে যায়—তাই ঝুঁকে পড়ে সফি ঘোড়ার কেশর বরাবর নিজের বুক প্রায় চেপে ধরলো। সেই অবস্থাতেও সনাতন পাইকের আওরত চেঁচিয়ে চলেছে—আমায় মেরে ফেলো—মেরে ফেলো আমাকে—

মীর সফি এখন সময়ের সঙ্গে লড়ছিল। ডান হাত জখম হলেও বেলাইতির বাঁ হাত এখনো ভালো আছে। আহেদিরা ডান বাঁ—দু হাতেই বর্শা ছুড়তে পারে। তাছাড়াও বেলাইতির চোখের ইশারায় কোনো ধানুকী বা বন্দুকচী সফির পিঠ বরাবর নিশানা নিতে পারে। যে করেই হোক দক্ষিণের ওই জঙ্গলে পৌঁছতে হবে।

সাঁই সাঁই করে দুটো তীর সফির বাঁ পায়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আর খানিকটা। মাত্র খানিকটা। মীনাক্ষী পিছলে পড়ে যাচ্ছিল। লাগাম

সামলাতে সামলাতে সফি মীনাক্ষীর শরীরটা নিজের বুক দিয়ে আরও শক্ত করে চেপে ধরলো। ঠিক তক্ষুণি শিস তুলে একটা গুলি ওদের মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে সামনের একটা গাছের গুঁড়িতে বিঁধে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা পাখি সামনের খোলা আকাশে ছররা তুললো।

ইনসাল্লা।

জঙ্গলে ঢুকতে ঢুকতে সফির মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে এলো কথাটা। খোদার মেহেরবানি। ঘোড়ার চাল কমিয়ে আনতে হলো লাগাম ধরে। এত জোরে ছুটলে জঙ্গলের গাছে গা লেগে—মীনাক্ষী ছিটকে পড়ে যাবে। নিজেও বেদম জখম হতে পারে সফি। কাঁটা গাছে মীনাক্ষীর খোলা মাথার চুল জড়িয়ে গেল খানিকটা। থামবারও উপায় নেই। সেই অবস্থাতেই ঘোড়া এগোতে মীনাক্ষী ব্যথায় চিৎকার করে ঢলে পড়লো।

ঘোড়া থামাতে পারলো না সফি। পেছন পেছন আরও কয়েকটা ঘোড়ার পায়ের শব্দ। কয়েকজন ছুটে আসছে তাকে ধরতে। পট পট করে মীনাক্ষীর মাথার কয়েকগুছি চুল ছিঁড়ে গেল। থামবার উপায় নেই সফির। গভীর জঙ্গলের আরও গভীরে যে করেই হোক তাকে এগোতে হবে। আবারও সে দুই পায়ে ঘোড়ার পেটে খোঁচা দিলো।

বিকেল হবার আগেই ধুমধুমার গড় বলে আর কিছুই থাকলো না। ফুর্তিবাজ বারোটা হাতি মিলে সারাটা জায়গা শুঁড়ের আছাড়—পায়ের চাপে সমান করে দিলো।

বছরের এই সময়টায় হিন্দুস্থানের এই পুব দেশের আশমানে সূর্য টুপ করে ডুবে যায়। তার আগে অনেক কাজ সারতে হবে মির্জা ইউসুফ বেগকে। ফতে জং হলেও তার বকেয়া কাজগুলোও কম জরুরি নয়। ভাগ্য ভালো একটা হাতিও হারাতে হয়নি। সবকটাই সহি-সলামত আছে। গোটা সাতেক ঘোড়া আর তিন কাতার উট সাবাড়। অল্পের ওপর দিয়েই গেল বলা যায়। সওয়ার বা বন্দুকচী কিছু গেল কিনা—তার গোনা গুনতি—চেহারার ইয়াদদস্ত কাল সকালের আগে করা সম্ভব হবে না। সব হিসেব পেলে পর মীর আরজকে ঘাটতি পুরিয়ে দেবার আর্জি জানাতে হবে।

বিকেলের পরও ঘোড়ায় বসে এক আহেদি কয়েদ করা পাইকদের একপাল বালবাচ্চার ভিড়ে জেনানাদের গোনাগুনতি করছিল। বার বার বত্রিশে এসে তার গুনতি গুলিয়ে যাচ্ছিল। বিরক্ত হয়ে সে হাতের কোড়া বাতাসে শব্দ করে ঝলকালো। তার হিস হিস শব্দে একটা বছর বারোর পাইকান ছেলে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলো।

চুপ হারামজাদে।

বাজখাঁই গলার আহেদি-ধমকে ছেলেটা তার কান্না গিলে ফেললো। কোড়া আবার বাতাসে হাতসই করে ঝলকালো আহেদি। বালবাচ্চাদের ভিড় থেকে জেনানাদের আলাদা করে নিয়ে গোনাগুনতির সুবিধার জন্যেই এই ঝলকানি। এবার গুনে গুনে আহেদি পেল চৌত্রিশ জন আওরত। তার মুখে তৃপ্তির হাসি।

এবার এদের তাড়িয়ে নিয়ে কয়েদ-তাঁবুতে তুললেই আজকের মতো কাজ শেষ। পরেসানির শেষ।

একটা বড় গামা গাছ কাটা হচ্ছিল। ছুতোর কামাররা কাজ শুরু করে দিয়েছে। গাছটা কাটা হলে এই খোলা খাসজমিতেই ফাঁসিকাঠ বসাবে তারা। সন্ধেরাতের ভেতর কাজ সারতে চান দু'হাজারি মনসবদার মির্জা ইউসুফ বেগ। শুধু ফতে জং করলেই একজন মনসবদারের কাজ শেষ হয় না। কাসীদ কবুতর দিয়ে ফৌজদারকে সব খবর দিতে হবে। ফৌজদার তা পেয়ে জানাবেন সুবেদারকে। তাছাড়া এই জং আজমে যারা শহিদ হলো—তাদের গোর দেওয়ার কাজও সারতে হবে। বেলদার লোকজন গর্ত খুঁড়ে চলেছে। শহিদদের একে একে গর্তে নামিয়ে দিয়ে মাটি চাপা দেওয়াও কম হুজ্জতের কাজ না। তাদের রিস্তেদারদেরও এত্তেলা পাঠাতে হবে বাদশার তরফে। একজন মনসবদারের হাজারো তরফদারি। এখনো একবার জখম, আধা জখম লশকরদের কাউকেই দেখতে সময় পাননি ইউসুফ বেগ। দুনিয়াটা বড় গংদার জায়গা। এখানেই গোর—গোরের পাশেই জখমী জানবাজদের জন্যে হেকিমি ইলাজ—আবার তার পাশেই ফতে জং-এর বাহাদুর লড়াকুদের শাবাশী দেওয়া—তাদের ইজফা দেওয়া। ইজফা দিয়ে পর দিন সেপাইকে বন্দুকচীতে তোলা।

মির্জা ইউসুফ বেগের ঘোড়াকে দেখে দেখে পা ফেলতে হচ্ছিল। সন্ধে হয়ে আসা বাতাসে পাশেরই জঙ্গলের বুনো ফুলের সুবাস ভেসে আসছে। কাঁটা ঝোপ, গর্ত, দাগা তোপের গোলালো পাথরের ভেতর চারদিকেই পাইকদের লাশ পড়ে। কোনোটা বা হাতির পায়ে থ্যাঁতলানো। কোনোটা বর্শায় গাঁথা। কেউ বন্দুকচীর এক গুলিতেই ঢলে পড়েছে। তখনো যারা মরেনি—গোঙাচ্ছে। তাদের ভেতর তুর্কি পায়দল সেপাই খোলা তলোয়ার হাতে ঘুরছে। তলোয়ারের ডগায় খুঁচিয়ে দেখছে। সে খোঁচায় সাড়া দিলে, নড়ে-চড়ে উঠলে এক কোপে সেই পাইকের মুণ্ডুকে ধড় থেকে নামিয়ে দিচ্ছিল। লাশের কোমরে, হাতে বা দাঁতে সোনা, রুপো বা অন্য কিছু থাকলে কেটে নিয়ে কোমরের থলিতে ভরছিল তারা।

ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে মনসবদার ইউসুফ বেগ ধমকে উঠলো। এমন আনতাবড়ি খতমিই তার পছন্দ নয়। এখনো বাগী পাইকানদের পাণ্ডা—সনাতন পাইককে ধরা যায়নি। দেখতে হবে—আধমরাদের ভেতর সে আছে কিনা। যদি পাওয়া যায় তো জোর হেকিমির ইলাজে তাকে চাঙ্গা করে তুলতে হবে। তুলে আগ্রায় পাঠাতে পারলে সে এক বিরাট শাবাশী পাওয়ার ব্যাপার হবে। বাগীকে জিন্দা ধরাই তো সবচেয়ে বড় কেরামতি। অবশ্য সনাতন পাইকের চেহারা ইয়াদদস্ত করা ছিল আহেদি মীর সফির। তাকেই অনেকক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন না ইউসুফ বেগ।

সাততাড়াতাড়ি ফাঁসিকাঠ বসছে। একজন ছুতোর ফাঁসির মীর্জাপুরি দড়ি টেনে দেখছিল—জুতসই হলো কিনা। ঘোড়ার পিঠে বসে এসব দেখতে দেখতেই ইউসুফ বেগ বিরাট এক গুলমোর গাছের নিচে এসে দাঁড়ালো।

এখানেই গাছতলায় বিশ জনের মতো পাইককে পিছমোড়া করে বেঁধে মাটিতে ফেলে রাখা হয়েছে। ফাঁসিতে লটকাবার আগে একবার শুধু দেখে নেওয়া—তাগড়া মতো যদি কেউ থেকে থাকে—তো তাকে তুলে রাখো। গোলাম হিসেবে খাস তাঁবে রাখতে পারো—বেচতেও পারো। বাকিগুলোকে জাহান্নমে পাঠাও। ফেরার পথে ইউসুফ বেগ বাঁ হাতে তাচ্ছিল্যের বাতাস কাটলো। তার মানে তেমন কেউ নেই।

অন্ধকার হয়ে আসছিল। ওদের ভেতর তাগড়া কেউ চোখে পড়লে ইউসুফ বেগের নিজের কাছে রাখার ইচ্ছে আদৌ নেই। তবে সে যদি গাইতে পারে তো আলাদা কথা। সে তার তাঁবুতে ফিরলো।

রাত বাড়তে ইউসুফ বেগ দুই আহেদির কাছ থেকে দুটো খবর পেয়ে খুবই চিন্তায় পড়লো। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। সকালের আগে কিছু করার উপায় নেই।

ইলাজ করার পর ইরানি আহেদি বেলাইতি বাজারঘানিকে সুখদোলায় চড়িয়ে আনা হলো। ডান হাতে ভারি জখম। কনুইয়ের ওপর বিরছার কোপ পড়েছে। আর সে কোপ দিয়েছে—আর কেউ নয়—মীর সফি।

শুধু কোপই দেয়নি। আধা জখম এক পাইকান জেনানাকে বেলাইতির কব্জা থেকে কেড়ে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে।

সব শুনে কৈফিয়ত চাইলো ইউসুফ বেগ। তুমি কী করছিলে তখন?

—ওই আওরত আমার ঘোড়ার পেটের নিচে গিয়ে রেকারের ডোরি কাটছিল। আমি বর্শা তুলেছি। সুবিধা মতো গাঁথবো। ঠিক এই সময়—

—কী?

—মীর সফি ঘোড়া দাপিয়ে ছুটে এসে একেবারে আমার সামনে হাঁক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। আমি ভাবতেই পারিনি—কোনো আহেদি বাগী হয়—সরকাশি আদমকাশি বাগী পাইকদের দলে যেতে পারে বলে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি কোনোদিন—

—বলে যাও—

হাতের ব্যথায় টাটাতে টাটাতে বেলাইতি বললো, সেই হাঁকে চমকে যেতেই সফি আমার ডান হাতে কোপ দিলো। তারপর তো সব পলকে ঘটে গেল। আমি পড়ে গেলেও আমার তাঁবের পাঁচ ঘোড়সয়ার ধাওয়া করলো।

—তারপর?

—জঙ্গল অব্দি তারা গিয়েওছিল। কিন্তু তারপর ফিরে আসতে বাধ্য হলো ওরা। বাগী সফি সেই জেনানাকে ঘোড়ার সামনের দিকে ফেলে কাঁটা গাছ ভাঙতে ভাঙতে জঙ্গলে ঢুকে পড়লো। তখন আমাদের আর এগোনো ঠিক হতো না। জঙ্গলে নিশ্চয় আরও পাইক লুকিয়ে আছে—

—ওদের সঙ্গে কি সফির আগে থেকেই সমঝোতা ছিল?

—ঠিক বলতে পারি না। তবে—

যা ভাবছো খোলসা করে বলো।

বর্ষার আগে সনাতনের সঙ্গে আহেদি-ই আজম হিসেবে যে সমঝোতা করেছিল সফি—সেটাই আমার কাছে পছন্দ হয়নি।

—ওপরে জানিয়েছিলে ? ফৌজদারকে ?

—জানাবার কথা ভেবেছিলাম। জানানো হয়নি।

—হুঁ। কাল সকালেই তিনটে হপ্তচৌকি জঙ্গলে তল্লাশি চালাবে। চৌধুরী জামাল তাব্রিজির তাঁবে কাজ করে বীরভদ্র। পাইক শায়েস্তায় সে তার কর্তাদের ওপরে এক কাঠি। তাব্রিজির সঙ্গে সঙ্গে বীরভদ্রকেও এ এলাকা থেকে সরানো হয়েছে। তাব্রিজিকে গ্রেফতারির পরোয়ানা আগ্রা থেকে আনিয়েছেও ইউসুফ বেগ। তাব্রিজি কয়েদ হলে বীরভদ্রও কয়েদ হবে। তারই ছোটভাই শীলভদ্র হামলায় আরেকজন আহেদি।

সেই শীলভদ্র বললো, তার তাঁবের পাঁচ ঘোড়সওয়ার সনাতন পাইক সন্দেহে এক পাইককে তাড়া করে ছুটেছে। তারা এখনো ফেরেনি।

—ওরা সনাতনকে চেহারায় চেনে ?

—তেমন চেনে না। তবে ইয়াদদস্তে চেহারা যা লেখা আছে—তাতে মনে হয় তাড়া খাওয়া সেই লোকটাই সনাতন পাইক। দিব্যি চৌকস ঘোড়সওয়ার।

—সনাতনকে কে চেনে ?

—আহেদি-ই আজম মীর সফি—

—ওঃ। মীর সফি। মীর সফি। চুপ করো না লায়েক বেওকুফ। তোমার ঘোড়সওয়াররা ফিরলেই আমায় জানাবে। যাও—

শীলভদ্র কিছু বুঝতে না পেরে চুপ করে গেল। সে মনসবী তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো। বাইরে এখন ঘুটঘুটে অন্ধকার।

এই অন্ধকারেই খুন্তাঘাটের অন্তত পাঁচ ছ' মঞ্জিল দূরে ব্রহ্মপুত্র থেকে বেরিয়ে পড়া সংকোশ নদীটা পেরোচ্ছিল সনাতন। নদী বলতে ঘোড়ার হাঁটু ডোবে না। বর্ষায় এই সংকোশই একদম পাগল। জলের নিচে নুড়িতে ঘোড়া ক্ষুর রাখতে পারছে না। তবু সনাতন পাইকের যাবার উপায় নেই।

এদিককার জঙ্গল, নদী, মাঠ—সবই তার চেনা। তাই শাহী সওয়াররা পাঁচজনও তার সঙ্গে এতক্ষণ এঁটে উঠতে পারেনি। কিন্তু আর যে পারছে না সনাতন। শাহী পাইক হিসেবে সীমানা পাহারা দিতে গিয়ে সনাতন এই ঘোড়া পায়। ঘোড়া তাকে চেনে। নাগাড়ে দৌড়ে মুখের মধ্যে ফেনা জমেছে। তবু দুই পায়ে তার পেটে খোঁচা দিলো সনাতন।

খানিক ছুটে সনাতন বুঝলো, অন্ধকারে হামলাবাজ সওয়াররা পথ হারিয়েছে। এতক্ষণ ওরা সনাতনের ঘোড়ার পায়ের শব্দ ধরেই ছুটে আসছিল।

খানিক এগিয়ে সনাতন দেখলো, এক জায়গায় গাছপালার ভেতর অনেকটা আলো। ঘোড়ার রাশ টেনে সনাতন সেদিকে এগোলো।

খানিক গিয়ে দেখলো—একটা টিলার নিচে খোলা আকাশের মাঝখানে অনেকগুলো রেড়ি জেবলে খানিক আলো করা হয়েছে। আলো ঘিরে রাধাকৃষ্ণের নাম গান হচ্ছে। রাধা আর কৃষ্ণ সেই গানের তালে ঘুরে ঘুরে নাচছে। তাদের

ঘিরে চারদিকে জনা চল্লিশ পঞ্চাশ লোক। মাটিতে বসে। এরা এদিককার গুটি-পোকা চাষী—লোকে ওদের বলে চসর।

বড় ভালো মানুষ ওরা। দলবেঁধে এক এক গাঁয়ে এদের বাস। পেশায় গুটি পোকা চাষী, গান বাজনা খুব ভালোবাসে। রাত চৌকিতে বেরিয়ে এমন গাঁয়ে অনেকবার এসেছে সনাতন। জিরোতে বসার উপায় নেই তার। এই চাষীদের কাছ থেকেই সুতো কিনতে আসে মির্জাপুর ফতেপুরের সাধু-সন্ন্যাসীরা। সেই সাধুদেরই খেয়া ডুবিয়ে দিয়েছিল পাইকরা।

টিলার গায়ে বর্ষার পরের সবুজ ঘন ঘাস। সনাতন ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিলো। ঘুরে খাক। টিলার নিচে নামগানের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের পায়ের ঘুঙুরের আওয়াজ। নিচে নেমে এই গাঁয়ে ঢুকলে নিশ্চয়ই কিছু খেতে পাবে। এতক্ষণে সনাতনের খেয়াল হলো—তার হাঁটুর ওপর অনেকটা কেটে গিয়ে রক্ত শুকিয়ে উঠেছে। ব্যথাও খুব।

সে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে টিলা ধরে নামছিল। আরেকটু এগোলেই চসরদের সামনে গিয়ে পড়বে। ঠিক এই সময়—

খটাখট শব্দ তুলে ঘোড়সওয়াররা ওপর টিলার ওপর ভেসে উঠলো।

ওরা নিশ্চয় তার ছাড়া ঘোড়াকে দেখতে পেয়েছে। সনাতন গড়াতে গড়াতে একেবারে রাধাকৃষ্ণের পায়ের কাছে গিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে নাচ গান দুইই থেমে গেল। চসররা এমন অসময়ে এমন আচমকা টিলার ওপর শাহী সওয়ার—তাড়া খাওয়া একটা রক্তমাখা মানুষ দেখে ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়ালো।

টিলার ওপর থেকে সওয়ারদের একজন চেঁচিয়ে বললো, ভালো চাও তো বাগী পাইককে আমাদের হাওয়ালাত করে দাও—

সনাতন উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত জোড় করে বললো, আমি তোমাদের দেশের লোক ভাই—

চসরদের মাথা একবার টিলায় তাকালো। দেখলো, এক সওয়ার হাত পেছনে পাঠিয়ে পিঠে ঝোলানো বন্দুক খুঁজছে।

সনাতন বললো, আমার বউ ছেলেমেয়ে বেঁচে আছে—না মরে গেছে—জানি না। আমরা খুন্তাঘাটের ঘরদুয়ারি পাইক—

সবাই এবার দেখলো সওয়াররা বন্দুক তাগ করবে করবে।

আমায় ধরিয়ে দিয়ে কী লাভ তোমাদের?

সঙ্গে সঙ্গে আলো করা রেড়িগুলো দপ করে নিভে গেল। সনাতন বুঝলো, ক'জনে মিলে একসঙ্গে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়েছে সব আলো। সে আর দাঁড়ালো না। দৌড়তে লাগলো। কোন্ দিকে দৌড়চ্ছে সে তা জানে না।

ভোর রাতে আর পা চলছিল না সনাতনের। ছোট ছোট গাছের একটা জঙ্গল পেরোতেই দেখে—আবার সে ব্রহ্মপুত্রের তীরে এসে পড়েছে। সামনেই খেয়াঘাট। ভোরবেলায় পয়লা খেয়ায় চেপে বসলো। একদল পাখিধরা চলেছে ওপারে। পাখি ধরতে। জায়গাটা অচেনা সনাতনের।

খেয়া ছেড়ে দিতে সে পাখিধরাদের বললো, ভাই আমার কাছে একটাও

দামড়ি নেই। তোমরা না দিলে আমায় ফিরে যেতে হবে।

পাখিধরারা সনাতনকে দেখলো। দেখে কী মনে হতে সনাতনের খেয়া ভাড়া দুই দামড়ি ওরাই দিয়ে দিলো।

মাঝনদী বরাবর এসেছে খেয়া। এমন সময় সনাতন ফিরে দেখলো, একখানা ছোট নৌকো তীরবেগে এগিয়ে আসছে। ফেলে আসা তীরে সওয়ারদের ঘোড়া দাঁড়ানো। সনাতনের বুকের ভেতর রক্ত জমাট হতে লাগলো। এখন যদি সে সাঁতরাতে যায় তো চোরা টানে তলিয়ে যেতে পারে। চেঁচালে খেয়া থামিয়ে দিতে পারে মাঝি। তার বুকের ভেতর ব্যথা করতে লাগলো। পারবো কি? পারবো কি?

ছোটো নৌকোটা তর তর করে এগিয়ে আসছে।

খেয়া ভিড়বার আগেই এক লাফে সনাতন ডাঙায় উঠলো। পাখিধরারা দেখলো—একখানা ছোট নৌকো তাড়া করে ছুটে আসছে। তাতে কয়েকজন শাহী সেপাই। ভোরবেলা এ কী চমক?

সনাতন ডাঙায় পড়েই যে কোনো একটা আড়ালের জন্যে ছুটতে শুরু করে দিলো। অড়হর ক্ষেত। এবড়ো খেবড়ো নালা। খানিক ছুটেই সে দেখলো—এক বটতলায় মাঠের ভেতর কয়েক খানা মাটির ঘর। হতশ্রী। দরজা নেই। চাল বলতে অড়হরের শুকনো ডালপালা ঠেসে চাপানো।

তার একটায় ঢুকে পড়লো সনাতন। ঢুকে বুঝলো এ কোনো আড়ালই নয়। সওয়াররা এলে ধরা পড়তেই হবে। খোলা ঘরে কোনো মানুষ নেই। হঠাৎ খেয়াল হলো, জানলার খোপে পা দিয়ে ওপরে ওঠা যায়। চালের নিচেই আরেকটা চাল। সনাতন সেটায় উঠলো। বাঁশের মাচা। পাছে শব্দ হয়—তাই টান টান হয়ে মাচার ওপর শুয়ে পড়লো। পাশেই গোটা কয়েক মাটির ভাঁড়। একটায় হাত গলিয়ে ভেতর থেকে কয়েকটা দামড়ি পেল মাত্র। পাশেরটায় দেখলো—শত ময়লা মাখানো ধুলো বোঝাই কিছু খুদ।

ধপ ধপ শব্দ তুলে সিপাইরা ঘরটায় এসে ঢুকলো। সনাতন নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেললো। ধরা পড়লে—সে জানে—তাকে আগ্রায় চালান করা হবে। চাই কি বাঘের খাঁচায় তাকে পুরে দিয়ে বাদশা গোলাপ শুঁকতে শুঁকতে বাঘ কী করে তাই দেখবেন।

সিপাইরা এটা হাটকাচ্ছে। ওটা আছড়ে ফেলছে। ঠিক এমন সময় ঘরের মানুষ বোধহয় ফিরলো। সে কিছুই জানে না। ঘরে ঢোকা মাত্র লোকটা চেঁচিয়ে উঠলো, ও বাবাগো—

—চুপ কর। এই ঘরে থাকিস তুই।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।

—কী করিস তুই?

—ভিক্ষে করি হুজুর।

আরও কী বলতে যাচ্ছিল ভিক্ষুক। কথা শেষ হলো না। কোঁত করে শব্দ করে লোকটা থেমে গেল। সনাতন বুঝলো সেপাইরা কেউ লাথি কষিয়েছে।

লোকটা নিশ্চয়ই লাথি খেয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

ধপ ধপ শব্দ তুলে সেপাইরা বেরিয়ে গেল। খানিক বাদে অন্ধকার চালে নিজের মাথার কাছে গরম নিঃশ্বাস পেয়ে উঠে বসলো সনাতন।

ওখানে এমন অবস্থায় তাকে দেখে ভিক্ষুকটি পড়ে যাচ্ছিল ভয় পেয়ে। দু'হাতে তাকে ধরলো সনাতন, আমি চোর-ডাকাত নই—তোমারই মতো মানুষ—

অল্পবয়সে বুড়ো হয়ে যাওয়া মানুষ। একগাল কাঁচাপাকা দাড়ি। চোখ টলটল করছে জলে। লোকটা আস্তে বললো, তোমার জন্যে এসেছিল তাহলে!

সনাতনের দম বন্ধ হয়ে আসছে। সে আস্তে মাথা নাড়লো। সে তাহলে বেঁচে আছে। ভিক্ষুকটি বললো, চুপ করে শুয়ে থাকো। আবার আসতে পারে। আমি একবার ঘুরে ফিরে দেখে আসি।

হোক্ ভিখারি—মানুষটার মুখ সনাতনের কাছে স্বর্গ থেকে আসা কারও মুখ লাগলো। এত মায়া। এত ভালোবাসা। শাহী সওয়ার আবার ফিরে আসতে পারে। সে দম বন্ধ করে পড়ে থাকলো। এক এক মুহূর্ত মনে হচ্ছিল পাথর বুকের ওপর পড়ে আছে। এই দুনিয়ার একদিকে কিছু তেড়ে আসা ঘোড়সওয়ার—আরেক দিকে শুধু সে একা।

ভিখারির ধাক্কায় সাড় ফিরে এলো সনাতনের। সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে আস্তে ধাক্কা দিয়ে ভিখারি বললো, নেমে এসো। ওরা নদীর দিকে ফিরে গেল দেখলাম।

ভরসা পেয়ে সনাতন নামলো। ঘর নয় ঠিক—কোনোরকমে মাথা গোঁজার ঝুপড়ি। লোকটা তাকে ভালো করে দেখলো। সনাতন নিজেকে লুকোবার কোনো চেষ্টাই করলো না। এখানে সেখানে রক্ত। গায়ের পিরানটা ফালা ফালা। কিন্তু শরীর স্বাস্থ্য টানটান।

তাই দেখে লোকটা জানতে চাইলো, তুমি লশকর? দলছুট?

অভয়ের হাসি হেসে সনাতন বললো, পাইক। আবার চাষ-বাসও করি—মানে করতাম।

কোনো কথা বললো না ভিখারি। ভিখারিই হবে। চেয়ে-চিন্তে যোগাড় করা না হলে ভাঁড়ের চাল কি অত ময়লা হয়। আস্তে সুস্থে চাল চাপিয়ে দিতে দিতে লোকটা বললো, আমিও একসময় চাষ-বাস করেছি। তা লশকর আর তশীলদারদের বায়না মেটাতে মেটাতে ভিখারি হয়ে গেলাম শেষমেশ। এখন বেশ আছি—

খানিক বাদে ভাত ফুটে ওঠার গন্ধে সনাতনের পেটের ভেতরটা পাক দিয়ে উঠলো। সে আলগা করে জানতে চাইলো, কিরকম?

কোনো ঝামেলা নেই। জমি জায়গা নেই। বউ নেই। বাচ্চা নেই। ভিক্ষে করি—যোগাড় হলে খাই। চৌধুরী, সেপাই, তশীলদাররা তো আর ভিখারির কাছে আসে না!—এখানে একটু থেমে মানুষটা সনাতনের মুখে তাকালো, সংসার আছে?

ছিল তো। এখন আর তারা আছে কি না জানি না।

মানুষটা চুপ হয়ে গেল।

সনাতন নিজেই বললো, ঘরে যেতে পারে। আবার কয়েদ হয়ে এতক্ষণে হয়তো আগ্রার পথে চালান হয়ে গেছে। গোলাম বাঁদী হয়ে বিক্রি হয়ে যাবে। তারপর হিন্দুস্থানের কোথায় হারিয়ে যাবে—

—তবে তো ল্যাঠা চুকেই গেছে। ঝাড়া হাত-পা।

—তা একরকম বলতে পারো।

—আমি বলি কি—তাহলে তুমি আমার মতো ভিখিরি হয়ে যাও।

—এই তাগড়া চেহারায় ভিক্ষে চাইলে কেউ দেবে! ভিখিরি বলে বিশ্বাস করবে?

—ঘুরতে ঘুরতে—চাইতে চাইতে—একদিন আমার মতো হয়ে যাবে। আমিও তো একসময় তোমার মতো ছিলাম। আধপেটা থাকতে থাকতে শরীর ভাঙবে। দাড়িটা রাখো। চাই কি শহর-গঞ্জে কোনো বড় মকবরার সামনে বসেও একদিন ভিক্ষে চাইতে পারবে। খাবার যোগাড় করো। হলে খাও। নইলে পেটে কিল মেরে পড়ে থাকো।

সনাতন বললো, ভিখিরি, খোঁড়া, কানাদের ঘুরে বেড়ানো বারণ হয়ে গেছে জানো না? বাদশা জাহাঙ্গীরের ফতোয়া বেরিয়েছে—

—কে জাহাঙ্গীর?

—জাহাঙ্গীর কে তাও জানো না? বাদশা জাহাঙ্গীর। আগ্রার তখতে এখন সেলিম জাহাঙ্গীরই তো বাদশা।—বলতে বলতে বুড়োর মুখে তাকালো সনাতন। কোনো ভাবলেশ নেই।

—আগ্রায় কে বাদশা?—সে মানুষ? না, বাঁদর? হিন্দুস্থানে এসব কে খেয়াল রাখে! আমরা খেয়াল করি—রোদ উঠলো কিনা? আজ বৃষ্টি হবে না তো? ব্যস!

সনাতনের সারা গায়ে টাটানো ব্যথা। অন্ধকারে এলোপাথাড়ি দৌড়ে পা কেটেকুটে একাকার। জায়গাটা কোনো লোকালয় নয় তাই রক্ষে। নইলে তার মতো উটকো একটা নতুন লোক দেখতে এতক্ষণে ভিড় হয়ে যেতো।

ভাত মানে শুধুই ভাত। তবে গরম গরম। লোকটা বললো, যাও তো বাপু—ওই দীঘি দেখতে পাচ্ছো—ওখান থেকে দুটো পদ্মপাতা তুলে আনো।

রোদ এখন কড়কড়ে। তাই মাথায় করেই সনাতন জলের কিনারায় এসে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে এইবার সে জলে পড়া ছায়ায় নিজেকে আবছা মতো দেখতে পেল। মাথাটা কঞ্চির ডগায় ফড়িংয়ের মতোই দুলছে। মীনাক্ষী কোথায়? কোথায় আমার ছেলে বিষ্ণু? মেয়ে লক্ষ্মী? মাথার ভেতর একসঙ্গে অনেকখানি রক্ত চলকে উঠলো সনাতনের। একবার মনে হলো—সে নিজেই যেন কঞ্চির মতো আগুপিছু দুলছে। তারই ভেতর মনে পড়লো—গোল করে কাটা একটা শাহী গোলা এসে পড়লো, ধুমধুমার গড়ের বুরুজে। আমরা ঘরদুয়ারি পাইক। চাষীও বটে। সেপাইও বটে। শেষে কিনা ভিক্ষের চালে ফোটানো

ভাত খাবো ? সনাতন টেরই পেল না—সে বিশাল দীঘির কিনারায় জমা দামের ওপর সিধে কাত হয়ে পড়লো। গরম গরম ভাত নিয়ে বসে থাকা ভিখারি তখন তখনই এর কিছুই টের পেল না। রোদে পোড়া শূন্য প্রান্তরে এখন আর কোনো শব্দ নেই। জঙ্গল আর নদীর মাঝামাঝি, নাবি জমিতে বর্ষার পর তেড়ে ওঠা বাড়ন্ত ধানগাছ—তার সবুজ। সম্পূর্ণ নির্দোষ দেখাচ্ছিল।

ওদিকে দূরে খুন্তাঘাটে তখন গুলমোর গাছের তলাটা হলুদ ফুল আর তার রেণুতে ঢাকা পড়ে যাবার দশা। মাঝে মাঝে সবুজ ঘাসের ডগা। এখান থেকে তাঁবু তুলে সন্ধের আগেই কোনো নিরাপদ জায়গা দেখে আবার তাঁবু ফেলতে হবে। হাতিরা আগে রওনা দিয়েছে। পেছন পেছন উটের কাতার। তোপের নল। মির্জা ইউসুফ বেগ যাবে ঘোড়সওয়ারদের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু যেতে পারছে না। সেই পাঁচ ঘোড়সওয়ার এখনো ফেরেনি। সনাতন পাইক ছুটে পালিয়ে যাবার ভান করে তাদের কোনো ফাঁদে ফেললো না তো ? বিচিত্র কী ! যারা ডিহিদারদের বিষ খাইয়ে সাবাড় করতে পারে—তাদের অসাধ্য কিছুই নয়। একবার মনে হলো—লোকটা আদৌ কি সনাতন পাইক ? না, প্রাণ নিয়ে পালানো সাধারণ কোনো ঘরদুয়ারি ? যাই হোক—সেই পাঁচ সওয়ারের তো ফিরে আসা উচিত এতক্ষণে।

মাথার ওপর তাকালো ইউসুফ বেগ। ডালপালায় ভর্তি গাছটার মাথা ফুঁড়ে জোর রোদ্দুর নিচে পুরোপুরি নেমে আসতে পারছে না। তার ভেতর সারা রাত ধরে শিশিরে ভেজা ষোলোটা পাইকান লাশ ঝুলছে। তাদের পায়ের পাতা কালচে হয়ে এসেছে।

ইউসুফ বেগ ওখানে আর দাঁড়ালো না। মনসবদারদের দাঁড়ানো মানে—তাদের ঘোড়ার দাঁড়ানো। সে আলতো করে পেটে খোঁচা দিলেই ঘোড়া তাকে পিঠে নিয়ে সিসলতলার দিকে এগোলো। তখন ইউসুফ বেগ একা একাই বিড় বিড় করছিল। নিজের মতো করেই।

তার মুখের সে কথাগুলো উদ্ধার করলে এমনটি দাঁড়ায়—

ভুল করলে সফি। তুমি খুব ভুল করলে মীর সফি।

আর যা মুখ দিয়ে বেরলো না ইউসুফ বেগের—যা কি না তার মনের ভেতর তোলপাড় করে পাক খাচ্ছিল—তা সাজালে এমন দাঁড়ায়—সারা হিন্দুস্থানে কে তোমায় শাহী আহেদির ঠাট বাট যোগাবে। বুদ্ধির মাথা খেয়ে তুমি বাগী পাইকানদের সঙ্গে হাত মেলালে ? বাগী পাইকানরাই সাবাড় হয়ে গেল। মাঝখান থেকে তুমি রয়ে গেলে বাগী হয়ে। জঙ্গলে সাপের মুখে পড়বে। নয়তো জংলী হাতি তোমায় থেঁতলে দেবে। আকলমন্দ !

ব্রহ্মপুত্র থেকে বেরিয়ে পড়া নানান্ ধারা এখানকার নানান্ জায়গায় নানান্ নামে পরিচিত। কোনোটায় বিশেষ জল নেই। কিন্তু বর্ষায় পাহাড় থেকে পলি আর নুড়ি বয়ে নিয়ে এরা সমতলে ঢোকে। চাষের ক্ষেত, বসতি

এলাকা ভাসিয়ে দিয়ে এরা তখন পাথর করে ফেলে চারদিক। বর্ষার পর হাঁটুও ডোবে না।

এমনই একটি ধারা এখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। কী বলা যায়। ঝরনার লম্বা ধারাও মনে হয়। তারই তীরে—বা ঘাসে ঢাকা পাথর পাথর জায়গায় একটা ঘোড়া মাথা গলিয়ে ঘাসের চোখা চোখা ডগা জিভে ছুঁয়ে দেখছিল।

দুই তীরেই জঙ্গল কিছু পাতলা। এখানে গাছের ছায়ায় বেলা বোঝা যায় না। ঘোড়া দেখতে পেল—তার এতদিনকার সওয়ারী ছপ ছপ করে জল ভেঙে এপারেই আসছে।

মীর সফি খোঁজাখুঁজি করে অনেক কষ্টে গোটা কয় আতা পেয়েছে জঙ্গলে। খাবার বলতে নদীর জল। খেলেই পেটের ভেতরটা পাক দিয়ে ওঠে। সে এপারে উঠে কাঁটাঝোপের আড়ালে গিয়ে দেখলো, জখম জেনানা তখনো পড়ে আছে। চোখ বন্ধ।

ভয় হলো সফির। মরে গেল না' তো? ছুটে এসে মীনাক্ষীর সামনে মাটিতে বসে পড়ে বুকের কাছাকাছি কান পাতলো। নাঃ! বুক ঢিপ ঢিপ করছে। জেনানা হয়ে কম ধকল যায়নি সনাতন পাইকের বেগমের। ডান কাঁধে রক্ত শুকোনো জায়গাটা ফুলে আছে। কপালে কালশিটে। মীর সফি আবারও কান পাতলো। মীনাক্ষীর সামান্য ওঠাপড়া বুকের কাছাকাছি। কাল সন্ধেরাতে এই জঙ্গলের ভেতর এলোপাথাড়ি ঘুরতে ঘুরতে এ জায়গাটায় এসে পড়ে সফি। কিছু ফাঁকা দেখে। জল দেখে। মীনাক্ষীকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে সে অন্ধকারেই ঘোড়াটা ছেড়ে দেয়। খাবার নেই। জল নেই। মাথার ওপর কোনো তাঁবু নেই। সাপ আছে। হাতি আছে এখানে। পুরোপুরি খোদার ওপর সব ছেড়ে দিয়ে এই বুনো গাছটার গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে সে নিজেও ঢলে পড়েছিল। তার আর দম ছিল না। জঙ্গলটা পেরোলেই ওপাশে ওৎ পেতে রয়েছে বিরাট এক দুঃস্বপ্ন—হাতি, ঘোড়া, উট, কামান, সওয়ার নিয়ে গড়া মনসবী লশকর।

আজ ভোর ভোর চোখ খুলেই সে গোড়ায় জল খুঁজেছে। নিজে নদীটার জল খানিক খেয়েই বুঝেছে—খারাপ। তারপর খাবার খুঁজতে গিয়ে এত আতা পাওয়া। আগ্রার মাণ্ডিতে এ আতা ভালো দামেই বিকোতো।

আহেদি বেলাইতি বাজারঘানির বর্শা যদি মীনাক্ষীকে গাঁথতে পারতো—তাহলে বেচারাকে এখন এই গাছতলায় পড়ে থাকতে হতো না। ধুমধুমার গড়ের সামনেই গতরাত থেকে ও লাশ হয়ে পড়ে থাকতো।

বেলা বাড়ছে। বেলাইতি বাজারঘানির ডান হাতে কোপ মারার কোনো ইচ্ছেই ছিল না সফির। কিন্তু না মারলে যে ওই বেসাহারা মীনাক্ষী মারা যায়। হঠাৎ কোথায় যেন ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ। উঠে দাঁড়ালো মীর সফি। কাল যারা তাড়া করে ফিরে গিয়েছিল—তারা আবার আসছে না তো? পাল্টা লড়াই দেবার মতো কিছুই নেই হাতে। একখানা ছোট কারাদ ছুরি মাত্র সম্বল। এ ছুরি বড়জোর হাতাহাতি লড়াইয়ে একজনের বুকে বসানো যায়।

জঙ্গলে নানা রকমের পাখি আর পোকা ভোর হতেই শব্দ করে চলেছে। এর ভেতর আলাদা করে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ—সেই শব্দে নিরিখ চিনে পাওয়া খুবই কঠিন। তবে ভরসা—সফি নিজেও যেমন জানে না—যারা তাকে ধরতে আসবে—তারাও তেমনি জানে না—এই জঙ্গলের শুরু কোথায়—এই জঙ্গলের শেষ কোথায়।

নাঃ! ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দটা আর নেই। এ দেশে নাকি ঘোড়াপোকা নামে একরকমের পোকা আছে—যারা গাছের গা এমন করেই কুরে কুরে প্যাঁচ দিয়ে যায়—যার শব্দ ঘোড়ার দাবড়ে আসা শব্দের সঙ্গে মেলে। সফি নদীর দিকে এগোবে বলে উঠতে যাচ্ছিল—এমন সময় তার কানের পাশ দিয়ে সাঁই করে একটা পাথর চলে গেল।

হাজার হোক সে একজন লড়াকু আহেদি। তড়াক করে পাশ ফিরতেই দেখে—কখন মীনাক্ষী উঠে দাঁড়িয়েছে। শুধু দাঁড়ায়নি। আরেক খানা চাঁই মতো পাথর তারই দিকে তাগ করেছে।

সঙ্গে সঙ্গে সফি সরে গিয়ে নিজেকে বাঁচালো। এ চাঁইখানা তার মাথায় পড়লে আর দেখতে হতো না। এই বদরাগি জেনানাকে কে বোঝাবে—তার জন্যেই শাহী আহেদি মীর সফি এখন এই অজানা জঙ্গলে একেবারে আম আতরাফ—সাধারণ মানুষ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কী হচ্ছে?

আর কি হচ্ছে! কোনোদিকে খেয়াল নেই! রীতিমত মরিয়া হয়ে ঘাসে ঢাকা জমি থেকে বর্ষাকালে ভাসিয়ে আনা পাথর খুঁজছে মীনাক্ষী।

ছুটে গিয়ে সফি দু'হাতে মীনাক্ষীকে জাপটে ধরলো। কী করছো? কোনো খেয়াল নেই তোমার—

কে কার কথা শোনে। এক ঝটকায় সফিকে ঝেড়ে ফেলতে গেল মীনাক্ষী। পারলো না। সফির হাতের বেড়ের ভেতর নিঃশ্বাস বন্ধ করে মীনাক্ষী নিজেকে খানিকটা সরু মতো করে ফেলে দিব্যি বেড় গলে নিচে মাটিতে বসে পড়লো।

এ জন্যে তৈরি ছিল না সফিও।

মাটিতে বসেই পটি পাকানো পায়ের ওপর দিকে খোলা জায়গায় যত জোরে পারে মীনাক্ষী কামড়ে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় ছটফট করে সফি এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো। তাতে মীনাক্ষী গিয়ে পড়লো বুনো গাছটার শেকড়ের ওপর। পড়েই সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো, আমার ছেলে? আমার মেয়ে লক্ষ্মী—? আমি এ কোথায়?—বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাতে নিজেরই মাথার চুল মুঠো করে ধরলো।

একটা চড় কষাবে বলে হাত তুলেছিল সফি। নিজেকে গুটিয়ে নিলো। এই আওরতের সবচেয়ে আগে দরকার ইলাজ। মনসবী হামলায়—কাঁটাগাছে ঘষটে—দুই ভাবেই মীনাক্ষী ঢের জখম। কাঁধের কাটা জায়গা তো রক্ত শুকিয়ে ফুলে আছে।

সফি দেখলো, পাগল না হয়ে যায়। সে কাছে গিয়ে বললো, আমরা এখন

ধুমধুমায় নেই—
তাকে কাছে এগিয়ে আসতে দেখে লাফিয়ে উঠলো মীনাক্ষী। খবরদার—
হাতে দা থাকলে নির্ঘাৎ বসিয়ে দিতো। হাসি পেল সফির। কী করছো? তোমার মনে নেই কিছু?
মাথার ঠিক ছিল না মীনাক্ষীর। সে অবাক হয়ে তাকালো।
গড় থেকে বেরিয়ে এসে তুমি ঘোড়ার পেটের নিচে গিয়ে রেকাবের দড়ি কাটছিলে—
মুহূর্তে মীনাক্ষীর মাথার ভেতর ধুমধুমার গড়ের সামনেকার লড়াইয়ের ছবিটা চলকে উঠলো। সে কী করবে বুঝতে পারছে না। নিরুপায় অথচ মরিয়া হয়ে সে সফির চোখে তাকালো।
আরেকটু হলেই বর্শায় গেঁথে ফেলতো তোমায়। আমি ছুটে না গেলে—
—এ কোথায় আছি?
—আমিও জানি না। ধুমধুমা থেকে কয়েক মঞ্জেল হবে নিশ্চয়। সময়মত তোমায় ঘোড়ায় তুলে নিয়ে না ছুটলে—
থম মেরে তাকিয়ে থাকলো মীনাক্ষী। চোখের পলক পড়ছে না। মীর সফি দেখলো, কঠিন হলেও সবকিছু হারানো এই আওরতকে সব ঠিকঠাক বলা দরকার। সে আস্তে আস্তে বললো, তোমাদের গড় আর নেই।
তীক্ষ্ন গলায় মীনাক্ষী জানতে চাইলো, কী হয়েছে?
—এতক্ষণে গোলা দেগে—হাতি ছেড়ে দিয়ে নিশ্চয় সবকিছু দুরমুশ—দুরস্ত করা সারা।
—আমি যাবো—বলেই মীনাক্ষী ছুট লাগালো। এক্ষুণি কাঁটাগাছে লটকে উল্টে পড়বে। সফি এক পা এগিয়ে ডান হাতে আটকালো।
—ছেড়ে দাও—বলছি ছেড়ে দাও—
—কোথায় যাবে?
—আমার ছেলে বিষ্ণু—মেয়ে লক্ষ্মী—বলতে বলতে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো মীনাক্ষী—ওদের বাবা—বেঁচে আছে কি না—না মরেই গেল—
সফি শান্ত গলায় বললো, বেঁচে থাকলে ধরা পড়েছে। ধরা পড়লে এতক্ষণে ফাঁসিও হয়ে গেছে। তার চেয়ে জং-কি-ময়দানে পড়ে যাওয়াই ঢের ঢের ভালো।
কান্না পলকে উবে গেল মীনাক্ষীর। সে বড় বড় চোখে মীর সফির মুখে তাকালো। সে মুখে মীনাক্ষী অনেক কিছুরই জবাব পাচ্ছিল না।
এই শাহী আহেদি একা এখানে কেন? এখানে যদি—তো তার সঙ্গে কেন? সে নিজেই বা এখন কোথায় যাবে? কী করবে? খাবে কী? ছেলেমেয়ে যদি বেঁচে থাকে—তাদের কি আর কোনোদিন খুঁজে পাবে? আর কোনোদিন কি দেখা হবে? বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো মীনাক্ষীর। যদি সনাতন বেঁচে থাকে?
মীর সফি নিজে থেকেই বলতে লাগলো, হিন্দুস্থানে আম আতরাফ—

সাধারণ মানুষের জন্যে—ইনসানের পক্ষে এই শাহী তাগদ বিলকুল ইবলিশের কারবার। আমি এই আট বছর ঘোড়ার পিঠেই ঘুরেছি। সব দেখে দেখে ঘেন্নায় আমার চোখ পচে গেল। ইনসানের কোনো কিমত হিন্দুস্থানে নেই—

মীনাক্ষীর নিরুপায় চোখ মাথার ওপর আকাশ খুঁজছিল। গাছপালার ভেতর দিয়ে। কোথাও কি কেউ নেই—যে নেমে এসে এই ইবলিশি কাণ্ড-কারখানার শেকড়সুদ্ধ ঝাড়ে-মূলে কেটে ফেলতে পারে?

মীর সফি একটুও না নড়ে যেখানে ছিল—সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলো। এখন দরকার মাথার ওপর একটুখানি চাল। সে একটা ঝোপড়ি হলেও হয়। দরকার খাবার কিছু। আর দরকার ইলাজ।

॥ সাত ॥

পর পর দুটো বছর আশমান বড় ভালো ব্যবহার করেছে হিন্দুস্থানের সঙ্গে। পর পর দুটো বর্ষাই হিন্দুস্থানকে ধানে ভাসিয়ে দিয়েছে। কামরূপ থেকে কান্দাহার—যেখানে যত নাবি জমি—সব জায়গাতেই ভালো ধান হয়েছে। চরে বেড়াবার মাঠে গরু মোষ খাবার মতো প্রচুর ঘাস পেয়েছে। শাহী খরচের জন্যে জমি থেকে বিঘা পিছু দশ সের করে ধান ভালোমতই আদায় হয়েছে। এখন দেহাতি হিন্দুস্থানের যেখানেই যাওয়া যাবে—চোখে পড়বে—ধান বোঝাই দিয়ে গো-গাড়ি চলেছে ধীরে সুস্থে—ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে।

সামনে কঠিন শীত। আগ্রা, দিল্লি, আজমির, পুষ্করের দেহাতি মাঠে এখন দেখা যাবে—প্রায় এসে পড়া শীতের হিমেল হাওয়ায় আমলকী গাছের সারা গায়ের পাতা যেন নাচছে। দেখাদেখি গাছতলায় দাঁড়ানো ময়ূর নাচবার জন্যেই পেখম তুলে তৈরি।

সবে দুপুর। আগ্রা দুর্গে দেওয়ানি-খাসে শাহী মসনদে বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীর চোখ বুজে বসে বলে যাচ্ছেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে লম্বাই চওড়াই দেওয়ানি খাসের স্তম্ভগুলো ডুবে গিয়ে যেন প্রতিধ্বনি তুলে ওপরের ছাদে পাঠিয়ে দিচ্ছে। বাদশার মেজাজ-শরীফ। বিশেষ করে এ-বছর মালগুজারির হাসিল অনেকদিন পর খুবই ভালো। হিন্দুস্থানে তাঁর পাওনা কুর্নিশ তসলিম তিনি ভালোমতই পেয়ে আসছেন। তাঁর পেয়ারের নাতি শিশু সুজা—যাকে কিনা বাদশার নামে নাম মিলিয়ে আগ্রা দুর্গে এখন অনেকেই সুজাঙ্গীর বলে—মেঝের পুরু ইস্পাহানি বনাতের ওপর আলচিখানা পেতে একমনে খেলছে। শিশু যেভাবে খেলে।

রাজ্যপাটের মাঝখানে সময় করে বাদশা নিজে তার বাদশাহনামা—তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরের কথাগুলো বলে চলেছেন। কোথাও একটু শব্দ নেই। তিনজন ওয়াকেনবীশ মন দিয়ে লিখে চলেছে। যেমন যেমনটি শুনতে পাচ্ছে তারা। লেখা হয়ে গেলে পড়ে শোনানো হবে। তিনজনের লেখায় কোথাও কোনো ফাঁক পড়ে গেলে বাদশা পরে শুধরে দেবেন। শুধরে দেবার পর মহাকালের

ইতিহাসে এটাই হবে হিন্দুস্থানের ইতিহাস। ওয়াকেনবীশের পাশে পেশদস্তরা বসে। লেখা হয়ে গেলে পেশদস্তরা ওই ইতিহাস নিয়ে যাবে লিপিকারদের কাছে। তারা চীন থেকে আনানো তুলট কাগজে সুন্দর হাতের লেখায় সেই ইতিহাস তুলে রাখবে ভবিষ্যতের হিন্দুস্থানিদের জন্য। অনাগত-হিন্দুস্থানে তার নাম হবে—

তুজুক-ই-জাহাঙ্গীর।

বাদশা জাহাঙ্গীর যেমন বলে যাচ্ছিলেন—এ-বছর মানানো বিজয়া দশমী, রাখীবন্ধন, দীপালি উৎসবের কথা—তেমনই বলে যাচ্ছিলেন শবেবরাত, মিলাদ শরীফ উৎসবের কথাও।

'দীপালির রাতে আলো দিয়ে সাজানো হয়েছিল শাহী মহল। মুসলমানদের ভেতর ভাই ভাই ভাব জাগিয়ে মিলমিশ ঘটাতেই শবেবরাত মানানো হলো এ বছর। হিন্দুস্থানের জমিতে ইরানি, তুর্কি, আফগান, হায়দরাবাদি, ফতেপুরি, জৌনপুরি হরেক কিসমের মুসলমান এক হয়ে যাচ্ছে। হজরত মহম্মদের জন্মতিথিতে রহমত আদায় করতে এ বছর আগ্রা দুর্গে মিলাদ শরীফের মজলিস বসেছিল।'

বাদশা বলে যাচ্ছেন। ওয়াকেনবীশরা শুনে শুনে লিখে যাচ্ছে। এবার বাদশা এই সব উৎসবের খুঁটিনাটিও বলতে লাগলেন।

'লাহোরে শবেবরাতের রাতে আলী মর্দান খাঁ আলো দিয়ে সাজিয়েছিলেন অপূর্ব। এমনটি আর কোনোদিন দেখা যায়নি। দরবারি-আমের খোলা চত্বরে এই আলোর সাজ সবাই চোখ ভরে দেখেছে। দরবারি আমে তো বটেই—দর্শন ঝরোকার নিচেও আতসবাজি পোড়ানো হলো। আলোর ফুলকিতে চারদিক দিনের মতো হয়ে যাচ্ছিল। সেই আলোর ভেতর আমি—হিন্দুস্থানের বাদশা দর্শন ঝরোকায় দাঁড়িয়ে আম আতরাফ সবাইকে দর্শন দিলাম।'

'আগ্রা দুর্গে মিলাদ শরীফের মজলিসে মোল্লা ফাজিল এসেছিলেন। এসেছিলেন মোল্লা আবদুল হাকিম। দুর্গে মহা ধুমধামে মিলাদ শরীফের উৎসব হলো। রাতে মিলাদের মজলিসে অনেক জ্ঞানীগুণীকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। কোরান খানি হলো। কোরান পাঠক বহু ধার্মিক মানুষকে নেমন্তন্ন করা হয়। ওই রাতে মোল্লা ফাজিল আর শিয়ালকোটের মোল্লা আবদুল হাকিমকে হজরত মহম্মদের জন্মতিথির তুলাদানের সোনা থেকে দুশো আশরফি করে দান করলাম। গরিব ফকিরদের দান-খয়রাতে দশ হাজার রুপেয়া খরচ করলাম।'

'তখন মজলিসে হজরত রসুলাল্লার পাক জীবন আর গুণের কথার চর্চা হচ্ছিল। তাঁর ভেতর গোলাপজল ছিটানো চলছিল। আতর বেঁটে দেওয়া হলো সবাইকে। বড় বড় থালায় সাজিয়ে ধরা হলো মিঠাই, হালুয়া। রাতের এই উৎসবে ফকিরদের দান করলাম শাল আর ফরুজী। গরিব দুঃখীদের ভেতর ফের বিশ হাজার রুপেয়া খয়রাত করলাম। এই মিলাদ মজলিসে রসুলাল্লার পাক জীবন চর্চার সময় আমি শাহী মসনদ থেকে নেমে সাধারণভাবে

মজলিসের গালিচায় বসলাম।'

হঠাৎ চোখ খুলে বাদশা জাহাঙ্গীর দেখেন—ওয়াকেনবীশরা কলম গুটিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। কারো চোখে পলক পড়ছে না। অবাক হলেন বাদশা। বিরক্ত তো বটেই। এ কী রকমের বেয়াদবি। একবার শাহী ঠোঁট থেকে বেরিয়ে যাওয়া ইতিহাস বাদশাহনামা—তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরের জন্যে সঙ্গে সঙ্গে লিখে না রাখলে তো মহা বিপদ। বাদশা যদি ভুলে যান তো সে ইতিহাস চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেল। সে তো হিন্দুস্থানের পক্ষে বিরাট ক্ষতি। জেনে শুনে ওয়াকেনবীশরা এ বেয়াদবির সাহস পায় কোত্থেকে?

বাদশা অবাক হতে হতে রেগে উঠছিলেন। কিন্তু ওয়াকেনবীশরা তখনো নিশ্চল মূর্তি হয়ে বসে। বাদশার বিরক্তি বা অবাক হওয়ায় তাদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। জাহাঙ্গীর তাঁর দুই পাশে দাঁড়ানো তাতার মেয়েদের দিকে তাকালেন। এরা বাদশার একা থাকার সময়টায় জান কবুল করনেওয়ালি পাহারাদারনির দল।

তাদের একজনের চোখ মেঝের দিকে। সেদিকে তাকিয়ে বাদশাও চোখ নামালেন। শিশু সুলতান সুজা খুব মন দিয়ে লাখো রুপেয়ার হীরা বসানো বাদশাহী নাগরার এক পাটি নিজের কোলে তুলে ডগাটা কচি দুই হাতে দোমড়ানোর চেষ্টায় হিমশিম খাচ্ছে।

হো হো করে হেসে উঠলেন জাহাঙ্গীর। চেঁচিয়ে বললেন, সুলতান সুজাঙ্গীর। এই কচি উমরে অ্যাতো জিদ্দি!—বলতে বলতে বাদশা নিজের নাতির নাজুক হাত দু'খানি থেকে নাগরার পাটি উদ্ধার করলেন। করে সুজাঙ্গীরকে নিজের বাঁ উরুতে বসালেন।

তখন কাছারি চত্বর থেকে চেঁচিয়ে বলা হচ্ছে—শাহজাদা খুর্রম বাদশার মোবারকে হাজির হচ্ছেন—

সেলিম জাহাঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে সিধে হয়ে বসলেন। তখনো তাঁর কোলে সুলতান সুজাঙ্গীর। চাঘতাই বংশে ছেলেরা জন্মেই সুলতান হয়। তারপর তার ভেতর থেকে বাদশা হওয়া রীতিমত নসীব।

জাহাঙ্গীর তাঁর বাদশাহনামার জন্যে বলা শেষ কথা ক'টি আবার বললেন, 'এই মিলাদ মজলিসে রসুলাল্লার পাক জীবন চর্চার সময় আমি শাহী মসনদ থেকে নেমে সাধারণভাবে মজলিসের গালিচায় বসলাম।'

কুর্নিশ করতে করতে শাহজাদা খুর্রম মাথা তুললেন। তুলে দেখলেন, তিন ওয়াকেনবীশ তাড়াতাড়ি বাদশার মুখের কথা টুকছে। টুকেই তারা উঠে গেল।

এদের শাহজাদা খুর্রম জানেন। চেনেন। শাহী দরবারের সঙ্গে চিরকালই এরা জড়িয়ে থাকে। দরবারি ইতিহাসের কারবারিরা আসলে দরবারি মোসাহেব ছাড়া কিছুই নয়। বরং দরবারে পাত্তা না পাওয়া—এক কোণে অবহেলায় পড়ে থাকা ইতিহাসের কারবারিরাই ইতিহাসের সাচ্চা মাল-মশলা ভবিষ্যৎকে দিয়ে যান। আকবর বাদশার সময় নিয়ে আবুল ফজল পঁচিশ তিরিশ বছর হলো

আইন-ই-আকবরী লিখে গেছেন। কত তো ইতিহাস! আকবর বাদশার দরবারে পাত্তা না পাওয়া মোল্লা বদায়ূনী ছিলেন ভাগ্যিস! এখন তো আইন-ই-আকবরী ছিঁড়ে মোল্লা বদায়ূনী বেরিয়ে পড়ছেন। রসদ যোগানদার বনজারারা শাহী খাজানাখানাকে বছরের পর বছর ঠকিয়ে ফতুর করে আসছে—তা মোল্লা বদায়ূনী না থাকলে জানা যেতো কি?

—আমি কি খুশনসীব। আব্বা হুজুর আমায় স্মরণ করেছেন।

সেলিম জাহাঙ্গীর খানিকক্ষণ কোনো কথা না বলে শাহজাদা খুর্রমের চোখে চোখ রাখতে চাইলেন। পারলেন না। শাহজাদা খুর্রম চোখ নামিয়ে নিয়েছেন।

এবার বাদশা বললেন, বাবা খুর্রম—আমার কোলে কে বসে আছে?

—আলা হজরত! এ আর এমন কি কঠিন প্রশ্ন। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি—আমার ছেলে সুলতান সুজা তার দাদাসাহেব আলমপনা সেলিম জাহাঙ্গীরের কোলে বসে আছে।

—বাবা খুর্রম। একদিন তুমিও এমনই আমার কোল আলো করে বসতে। তখন আমি হিন্দুস্থানের বাদশা নই। এলাহাবাদের সুবেদার।

তসলিম করলেন শাহজাদা খুর্রম। আমার ওপর হিন্দুস্থানের জাঁহাপনার কী হুকুম—তাই বলুন। জানকবুল করে তাই হাসিল করবো।

—কান্দাহার থেকে কামরূপ—বিরাট এই হিন্দুস্থানের কোথাও চাঘতাই পতাকা—চাঘতাই নিশানাকে রুখবার কেউ নেই। একশো বছর হতে চললো মুঘল শাহী কায়েম হয়েছে—কিন্তু আজও মুঘল পতাকা নর্মদা পেরিয়ে ওপারে ওড়ানো গেল না—

শাহজাদা খুর্রম সেলিম জাহাঙ্গীরের মুখে তাকালেন।

বাদশা তখন বললেন, শুধু যে মুঘল ধ্বজ নর্মদার ওপারে উদুর্ গেড়ে বসানো যায়নি তা নয়—যেটুকু বা আমরা নর্মদা পেরিয়েছিলাম—তাও মুছে যাবার যোগাড়—

—আব্বা হুজুর। আপনি মালিক অম্বরের কথা বলছেন?

—হ্যাঁ খুর্রম। এই হাবসি এখন আমাদের বালাঘাট কব্জা করেছে। গোলকুণ্ডা, বিজাপুরের সৈন্যসামন্ত, সোনাচাঁদি নিয়ে সে আমাদের বেরার, খান্দেশ, বিদর, মালব থেকেও হটাতে চায়—এ দুশমনি তোমায় রুখতে হবে বাবা খুর্রম। মালিক অম্বরকে আহমেদনগরে তার রাজধানী খিরকি থেকে হঠাও। খিরকি গুঁড়িয়ে দাও—তাই আমি চাই।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে জাহাঙ্গীর বাদশা থামলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারলেন না।

—মালিক অম্বর মারাঠা চাষীদের চোরাগোপ্তা লড়াইয়ের তালিম দিয়েছে। এ-ব্যাপারে আমাদের কাসীদরা যা খবর এনেছে—তা হলো—চাষীদের নিয়ে লশকর গড়ে তুলতে তার ডান হাত হয়েছেন শাহজি।

—মালিক অম্বরের মতলবটা কী আলা হজরত?

—বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহমেদনগর নিয়ে সে আগ্রার বিরুদ্ধে জোট বাঁধছে। মারাঠাদের খেলাচ্ছে। দক্ষিণ থেকে মুঘলদের সে মুছে দিতে চায়। আমি চাই মালিক অম্বরকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হোক। তার রাজধানী খিরকি গুঁড়িয়ে দেওয়া হোক। বালাঘাট আমাদের হাতে ফিরে আসুক। আর এ-কাজে তুমিই হবে শাহী হুকুমতের সিপাহী-সালার—

আগ্রহে, শাহজাদা খুর্রমের একটুখানি সায় পাবার আশায় বাদশা জাহাঙ্গীর মসনদ থেকে অনেকটা ঝুঁকে পড়লেন সামনের দিকে। যদি শাহজাদা খুর্রম হিন্দুস্থানের বাদশার বুকের ভেতর জেগে থাকা অহার্নিশ উদ্বেগ—রাগ-জ্বলুনির আঁচ একটুখানিও পেয়ে থাকে—তো জ্বলে উঠুক—জান কবুলের কসম থাক।

সেলিম জাহাঙ্গীর সেসব কিছুই দেখতে পেলেন না শাহজাদা খুর্রমের মুখে। খুর্রম আবার চোখ নামিয়ে নিয়েছে। বাদশা যেন ক্লান্ত। তিনি ফের পেছনে হেলে মসনদে তাঁর গা এলিয়ে দিলেন।

তখন কুর্নিশ গাহে ইংলিশস্তানের ইলচি টমাস রো এসে দাঁড়াবেন বলে—কাছারি চত্বর থেকে চেঁচিয়ে জানানো হচ্ছিল। শোনামাত্র কুর্নিশ করে শাহজাদা খুর্রম বেরিয়ে গেলেন। বাদশা সেদিকে তাকিয়ে ছিলেন। ছেলের চলে যাওয়া দেখে তিনি নিজেকেই মনে মনে বললেন, হ্যাঁ বা না—কিছুই তো বললো না বাবা খুর্রম।

বাদশার কোলে সুলতান সুজাঙ্গীর তখনো বসে। এই নাতিটি তাঁর বড় পেয়ারের। খুদে সুলতানের বুকে কান পাতার চেষ্টা করলেন বাদশা। ওইটুকু কলিজায় কি ওর বাবার বুকের আওয়াজ পাওয়া যাবে?

পড়ন্ত বিকেলে নিজের অস্থির মনটা ধাতে আনতে বাদশা দুর্গের ভেতর মোরি দরওয়াজার কাছাকাছি হাতিশালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ইদানীং উতলা বোধ করলেই তিনি হাতিশালায় এসে দাঁড়ান। নয়তো সিংহের ঘরের সামনে এসে ওদের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকার চেষ্টা করেন। তাতে মনটা এক জায়গায় এসে স্থির হয়ে যায় খানিকক্ষণের ভেতর। কী হয়েছে বুঝতে পারছেন না—সিংহের ঘরে দরিয়া বা রুস্তম চুপ করে বসে থাকে। গরাদের পাশে হিন্দুস্থানের বাদশা গিয়ে দাঁড়ালেও ওরা মুখ তুলে তাকায় না। বসে থাকলে উঠেও বসে না। কোনো পরোয়াই নেই।

হাতিশালা থেকে ঘি, চিনি, দেওয়ানপ্রসাদ চালের কড়া প্রসাদের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল। সেলিম জাহাঙ্গীর গিয়ে দাঁড়াতেই জটাজুটো নামে সবচেয়ে পালোয়ান হাতি শুঁড় তুলে বাদশাকে সেলাম করলো। বাদশা হাত বাড়িয়ে শুঁড়ে রাখলেন। এমন একশো একটা হাতি সেলিম জাহাঙ্গীরের জন্যে সবসময় তৈরি রাখা হয়। মালবের হোসেঙ্গাবাদের জঙ্গলে বিশাল এই বেহের জাতের হাতিটা ধরা পড়েছিল। বছর তিরিশ হয়তো এর বয়স। স্বভাবে ভীষণ দুর্ধর্ষ ছিল। এখন অনেক পোষ মেনেছে। সেলিম জাহাঙ্গীর ওর খাবারের জায়গাটা

ভালো করে দেখলেন। ঘি, চিনি, চাল, লঙ্কা, গোলমরিচ—হ্যাঁ, সবই আছে।

বাদশা পার হয়ে যাচ্ছিলেন। হাতি যেতে দিলো না। শুঁড়ে বাদশার হাত জড়িয়ে ধরলো আলতো করে।

সেলিম জাহাঙ্গীর হেসে ফেললেন। বিরাট একটা জন্তুর এমন টান তাঁর ভালো লাগলো। কী?

হাতি চুপ করে থাকলো। জাহাঙ্গীর এগিয়ে ওর গায়ে হাত রাখলেন। বেশ লম্বা চওড়া—বড় বড় চোখ—কানের ওপর দুটো সাদা আঁচিল। এই দুই গজমানিকের লোভে শিকারিরা এদের সাবাড় করে চলেছে। জাহাঙ্গীরের মনটা খারাপ হয়ে গেল। দুনিয়ায় যা-কিছু বিরাট—তাই-ই খতম করার জন্যে সবাই ষড়যন্ত্র করে চলেছে। আমি হিন্দুস্থানের বাদশা। দক্ষিণে আমাকে মুছে ফেলার জন্যে মালিক অম্বর উঠে পড়ে লেগেছে। সোনা, চাঁদি, লশকর—সব জড়ো করছে। চাঘতাই পতাকা কি নর্মদার ওপারে উড়বে না?

কালো চামড়ার ভেতর হলুদ চোখে হাতিটা বাদশাকে দেখছিল। ওর গায়ের গজঝম্প, মেঘডম্বুর বেশ সাফসুতরো করেই রেখেছে মেঠ। বাদশার মনে পড়লো—এই তো এই বর্ষায় এই বেহের হাতিটা মসত্ হয়ে ওঠে। রগ ফেটে স্রাব হতে থাকে। দুর্গের এদিকটায় কস্তুরীর মতো একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল তখন। আকবর বাদশার আমলে ওদের বাচ্চা হতে দেওয়া হতো না। বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীর সে পাট উল্টে দিয়েছেন। শরিয়তি কায়দায় ওদেরও চারটি করে আলানসঙ্গীর ব্যবস্থা হয়েছে। একটু দূরেই চারটি হাতি এই হোসেঙ্গাবাদীর পেছনে দাঁড়িয়ে খুব মন দিয়ে আখ চিবিয়ে চলেছে।

ভৈ আর মেঠকে হাতের ইঙ্গিতে ডাকলেন বাদশা।

তারা দাঁড়িয়েই ছিল। এগিয়ে আসতে বাদশা জানতে চাইলেন, এই হোসেঙ্গাবাদীকে শরাব দেওয়া হচ্ছে তো?

ওরা মাথা নেড়ে জানালো, হ্যাঁ, জাঁহাপনা।

—বেশ। বেশ। তাহলেই দিলশরীফ। খুশমেজাজে থাকবে।—বলতে বলতে বাদশা আরেকবার শুঁড়ে হাত দিয়ে বুঝলেন, ফুর্তিতেই আছে।

বাদশা এগিয়ে যাবেন। এমন সময় মোরি দরওয়াজা অব্দি যে যেখানে ছিল—সবাই পলকে হাওয়া হয়ে গেল। শুধু থাকলো সারি সারি দাঁড়ানো হাতির দল। গোশালায় গরু—আর কাতার দিয়ে দাঁড়ানো উট।

সুগন্ধী আতরের সুবাস বাদশার নাকে এসে পৌঁছলো। সামনে তাকালেন ভালো করে। এই সময়ে? এখানে? কী মনে করে?

—কেন? হিন্দুস্থানের বাদশাহী বেগমের আজাদীর এখানে আসতে বারণ আছে নাকি!

—না নূরজাহান। সারা হিন্দুস্থান তোমার সামনে খোলা। তুমি চাঘতাই শাহীর ষাট হাজারি মনসবদার। এই আগ্রা দুর্গ তোমার কাছে খোলা ময়দান।

—মাফ করবেন জাঁহাপনা। আমি তো চাঘতাই নই। আমার আব্বা হুজুর ইস্পাহান থেকে এসেছিলেন।

—সে তো জানি বেগম। এও জানি আমরা চাঘতাইরা ঘোড়ার পিঠেই ঘুরে বেড়াতাম। আরবরা আমাদের ইসলাম দিলো। ইস্পাহান থেকে পেলাম গান, সিরাজি, গোলাপ।

—আর কিছু পাননি ?

—তোমাকে পেয়েছি। কিন্তু কী মনে করে একেবারে এই মোরি দরওয়াজার কাছে ?

নূরজাহান বেগম বাদশার হাত ধরলেন। চলুন—আঙুরীবাগে বসবেন। ওখান থেকে নিচে যমুনা দেখা যায়। এই সময় পাখিরা ফিরে যায় চরে।

দেওয়ানি খাসের গায়ের আঙুরীবাগ। নিচে যমুনা। বাদশা পাথরে বসতেই একটা গোলাপ ছিঁড়ে নূরজাহান বেগম তাঁর হাতে দিলেন। দূরে বাগের কানাচে গোলামরা লাঠি হাতে খাসজঙ্গল খুঁচিয়ে দেখছিল। ক'দিন আগে একটা সাপ বেরিয়েছিল।

গোলাপটা হাতে নিয়ে জাহাঙ্গীর বললেন, বিয়ানায় তুমিই গোলাপ বাগ উপড়ে ফেলার হুকুম দিয়েছিলে বেগম ?

বিয়ানা বলতে সারা হিন্দুস্থানে এখন একজনকেই বোঝায়। তিনি হলেন শাহজাদা খসরু। বিয়ানা বলতে একটি জায়গাই বোঝায়। তা হলো আগ্রার শহরতলিতে অন্ধ শাহজাদা যে গড়ে থাকেন। গড়ের লাগোয়া বাগ—সামনের প্রান্তর।

—সে কথাও আপনার কানে উঠেছে !

—শাহজাদা খসরু গোলাপ ভালোবাসে বেগম।

—আমিও বাসি জাঁহাপনা। আমার খারাপ লাগে শুধু কালো গোলাপ। তাই—

—খসরুর দুনিয়াই আগাগোড়া কালো। তারই কথায় ওখানে কালো গোলাপ বসিয়েছে অনু রায়।

—লড়াকু রাজপুত অনু রায়কে গোলাপ চাষী করে তুললেন শেষে।

—অনু রায় একদিন আমার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিল বেগম।

—জানি জাঁহাপনা।

—সে একজন বড় যোদ্ধাও বটে।

—যোদ্ধাকে যুদ্ধে পাঠান। সেটাই তার আসল ময়দান। নর্দমার ওপারে মালিক অম্বরের সঙ্গে লড়াইয়ে তো আপনার অনেক জংবাজ—জানবাজ লড়াকু দরকার আলা হজরত।

—শাহ্জাদা খসরুকে কে দেখবে ?

—আমি আপনার বেগম। খসরুকে আমি দেখবো। দেখার লোকের অভাব কিসের ? আপনার উজিরে আজমকে শাহজাদার আতালিক করে দিতে পারেন। সে-ই খসরুর মুরুব্বি হতে পারে।

—কে ? আসফ খাঁ ? তোমার ভাই আসফ ?

—হ্যাঁ জাঁহাপনা। সে কি শাহজাদা খসরুর আতালিক হওয়ার যোগ্য নয় ?

—একজন কতজনকে দেখবে নূরজাহান! একেই তো আসফ শাহজাদা খুর্‌রমের শ্বশুর—বড় মুরুব্বিও বটে! তারপরেও আবার?—বলতে বলতে সেলিম জাহাঙ্গীর নিজের গা থেকে কাশ্মীরি তুষখানা আলগোছে বেগম নূরজাহানের পিঠে রাখলেন। রেখে বললেন, শীত পড়ছে। এখন যমুনার বাতাসে হিম—

নূরজাহান দূরে যমুনার চরে তাকিয়ে ছিলেন। দিনের আলো মুছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশমানের পাখির ঝাঁকও মুছে যাচ্ছিল। ওরা সারাদিন আগ্রায় এসে খাবার খুঁটে খায়। চরে ফিরে যায় সন্ধ্যার মুখে মুখে। সেখানেই ওদের আস্তানা।

নূরজাহান অস্ফুটে বললেন, কুতুবুদ্দিনকে মনে পড়ে আলমপনা?

—খুব। ও ছিল আমার ধাইমায়ের ছেলে। সাহসী। লোভী। ওকে বলেছিলাম—কাজ হাসিল করতে পারলে তুমিই হবে বাংলার সুবেদার।

—যেদিন আপনার কুতুবুদ্দিন বর্ধমানে এসে হাজির হলো—সেদিনই তাকে দেখে আমার বুক কেঁপে উঠেছিল।

—আমি আর কুতুব ছেলেবেলায় একসঙ্গে বড় হয়েছি বলতে পারো। এই আগ্রা দুর্গে।

—আমি জানবো না কেন জাঁহাপনা। কুতুব, আপনি, আমি—কাছাকাছি সময়েই বেড়ে উঠেছি। একবার আপনারা দু'জন ওই চর থেকে পাখি শিকার করে ফিরলেন। সঙ্গে ছিল আপনাদের শিকারি উজবেক কুকুর। আমি দুর্গের খিজরি দরওয়াজার ওপরে বালুঘড়ির সামনে দাঁড়িয়ে—

—তখন তো তুমি মেহেরুন্নিসা। আমি ওপরে তাকিয়ে আছি—আর তোমার ঝুঁকে পড়া মুখখানা দেখছি—চোখ ফেরাতে পারছি না—

—এমনই শীতের দিন ছিল জাঁহাপনা। এখনকার মতো তখনো কাশ্মীর থেকে ঝাঁক বেঁধে বেলেহাঁস উড়ে আসতো যমুনার চরে—

—কুতুবুদ্দিন ছেলেবেলা থেকেই ছায়ার মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো। সেদিন তোমাকে দেখার পর কুতুবই আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিলো—মেহেরকে আমায় পেতেই হবে—পেতেই হবে—

হেসে উঠলেন নূরজাহান। কেন? ও ভাবনা আপনা আপনি নিজের মাথায় আসেনি তাহলে।

—না না নূরজাহান। তা নয়। এসেছিল নিশ্চয়। কুতুব সেই ভাবনাটা দিয়েছিল শুধু।

—আলা হজরত। আশা করি রাগ করবেন না—

—বলো নূরজাহান। আমি তোমার কোন্ কথায় রাগ করি? কোন্ কথা রাখি না? বলো—

—আপনার মাথায় তখনো ছিল আনারকলি—

সেলিম জাহাঙ্গীর তখন তখনই কোনো কথা বলতে পারলেন না। একটু থেমে বললেন, তা নয় নূরজাহান। তবে এই যে পাখিরা আশমানে দাগ কেটে

সন্ধ্যার অন্ধকারে মুছে গেল—তাতে কি সব দাগ মুছে যায় ?

নূরজাহান কোনো কথা বলতে পারলেন না।

জাহাঙ্গীর অন্ধকারের ভেতর বললেন, আনার আমার জওয়ানির ভোরবেলা। আর তুমি হলে আস্ত একটা দিন নূরজাহান—

নূরজাহান আস্তে আস্তে বললেন, আপনি কি জানেন জাঁহাপনা কুতুবকে দেখে আমি কেন ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠেছিলাম ?

—তুমি বুঝতে পেরেছিলে—কেন হিন্দুস্থানের বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীর তার জিগরি দোস্ত—ধাইমায়ের ছেলেকে বর্ধমানে পাঠিয়েছে—আসলে জানো নূরজাহান—আজও বর্ধমানের ফৌজদার সাহসী শের আফগানের মুখখানা আমার মনের ভেতরে ভেসে উঠলে আমি চোখ বুজে ফেলি। তাকাতে পারি না—

নূরজাহানের মুখখানা অন্ধকারে দেখতে পেলেন না বাদশা। তিনি চাপা গলায় বললেন, কেউ যদি হিন্দুস্থানের ভাবী বাদশা হয়—সে যদি জওয়ান হয়—দুর্গ বুরুজে একখানা মুখ দেখে তার মনে যদি আগুন ধরে যায়—তো সে বাদশা হয়েই বা কী করবে ? তুমি বলো নূরজাহান—

—আপনি যা করেছেন—তাই-ই করবে।

—আনারের ঘটনার পর আকবর বাদশা আর কোনো ঝুঁকি নেননি। যখন টের পেলেন—এক ইরানী আমীরের মেয়ে মেহেরকে দেখলে তাঁর ছেলের চোখের পলক পড়ে না—তখনই সাততাড়াতাড়ি তিনি সেই মেয়েটির বিয়ে দিয়ে তাকে বর্ধমানে পাঠিয়ে দিলেন।

—জানি জাঁহাপনা। এসব কথা এখন তামাম হিন্দুস্থানের দেহাতে দেহাতে সবাই জানে।

—আমি বাদশা। আমার দু'হাতে তাগদ। আমি যা চাই হিন্দুস্থান তাই আমাকে দেবে। আমার ইচ্ছাই হিন্দুস্থান। আগ্রার মসনদে বসে আমি পাঁচ পাঁচটি বছর যন্ত্রণায় জ্বলেছি। আমি কি মেহেরকে ছিনিয়ে নেবো ? না, মেহের ফৌজদার শের আফগানের সঙ্গে সুখে ঘর-গেরস্থি করে যাবে ? ছিনিয়ে নেবো ? নাকি যেমন আছে তেমনই থাকবে ? এই ভাবনায় দিনে-রাতে আমি তিষ্ঠোতে পারিনি নূরজাহান। তোমাকে পেয়ে আজ আমার তামাম দুনিয়া গোলাপ হয়ে ফুটে উঠেছে।

—আর সে সময় ? আপনার জিগরি দোস্ত কুতুবুদ্দিন বার বার আপনাকে বলেছে—আমায় যদি বাংলার সুবেদার করা হয় তো আমি মেহেরকে এনে দিতে পারি—! কী ? তাই না ?

বাদশা উঠে দাঁড়িয়ে বেগমকে খুব জোরে জড়িয়ে ধরলেন। হ্যাঁ মেহের। হ্যাঁ—ও আমার মনের ভেতরটা জানতো। জেনে—সেখানে আগুন ধরিয়ে দিতো। উসকে দিতো।—

—ছাড়ুন বাদশা। আমি মেহের নই। আমি নূরজাহান। আপনি কুতুবের মন জানতেন না সেদিন—

—কী ?

—হ্যাঁ জাঁহাপনা। আপনি জানতেন না—আকবর বাদশা আমার বিয়ে দেবার অনেক আগেই—আপনার জিগরি দোস্ত কুতুব আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাত তুলে আমাকে চেয়েছিল—

সেলিম জাহাঙ্গীর অবাক হলেন, সত্যি ? কখনো তো বুঝতে পারিনি। তুমি বিয়ে হয়ে চলে গেলে। তখন আমি তো সর্বক্ষণ কুতুবের কাছেই—মেহের —মেহের বলে আমার বুক উজাড় করেছি।

—আর তাই শুনে সে আপনাকে উসকে গেছে সর্বক্ষণ! বাংলার সুবেদারির জন্যে আপনার কাছে উমেদারি ছিল আসলে একটা ভান। ওই সুবাদে বর্ধমানে এসেছিল—আমাকেই দেখতে।

—তাই ?

—হ্যাঁ আলা হজরত। ওকে বর্ধমানে দেখেই আমি কেঁপে উঠেছিলাম।

—আকবর বাদশা আগে জানতে পারলে হয়তো কুতুবের সঙ্গেই তোমার বিয়ে দিয়ে দিতেন।

—হয়তো তাই জাঁহাপানা। আমি পীর বহরামের দরগায় ফুল দিতে গিয়ে দেখি—দূরে দামোদরের তীরে মুঘল তাঁবু পড়েছে। তাকিয়ে আছি। সকালবেলা তখন। তাঁবুর ওখান থেকে ঘোড়ায় চড়ে একটা মানুষ সিধে দরগায় এলো। দেখেই চিনলাম কুতুবুদ্দিন। দেখে কেঁপে উঠলাম।

—ফৌজদার শের আফগান কোথায় তখন ?

—পীর বহরামের বাজারে। পঞ্চ-বিচারে বসেছেন। কুতুবুদ্দিন ঘোড়া থেকে নেমেই হাতটা ধরে বললো, চিনতে পারছো ? আমি তোমায় নিতে এসেছি। চলো আমরা চলে যাই এখান থেকে।

হাত ছাড়িয়ে নিলাম। বললাম, কোথায় ?

বললো, হিন্দুস্থানে আমাদের জায়গা হবে না। গোলকুণ্ডায় লশকরে আমি বহাল হবো। সেখানে মুঘল হুকুমে কোনো কাজ হয় না— চলো, নর্মদা পেরিয়ে আমরা গোলকুণ্ডায় চলে যাই—

সেলিম জাহাঙ্গীর বলে উঠলেন, বেইমান !

—না জাঁহাপনা। বেইমানি করার সুযোগ পায়নি কুতুব! আপনার ফৌজদার শের আফগান পীর বহরামের দরগায় ইবাদত জানাতে বসেছিলেন। চোখ বুজে দু'হাত তুলে মোনাজাত করছিলেন। তখন—ঠিক তখন—পেছন থেকে—

গলা বুজে এলো। নূরজাহান কথা শেষ করতে পারলেন না। সেলিম জাহাঙ্গীর দু'হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। চুপ করো। আর বলতে হবে না। বাকিটা তো এখন সবাই জানে—বলতে বলতে নূরজাহানের চোখের জল নিজের হাতে মুছিয়ে দিলেন বাদশা।

—পেছন থেকে কুতুবুদ্দিনের হরসিংজটা খাণ্ডারের কোপ খেয়েও আপনার ফৌজদার সাহেব টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন। আর দাঁড়িয়েই এক কোপে

বেইমান কুতুবকে খতম করলেন। পরদিন সকালে আমার দুই দাবিদার—ওদের দ'জনকেই যখন পাশাপাশি কবর দেওয়া হচ্ছে—আমি তখন আগ্রা রওনা হচ্ছি—সুখদোলায় চড়ে। আগে পেছনে ঘোড়ার পিঠে মুঘল লশকর—পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে সুখদোলার পর্দা সরিয়ে দেখি—সামনেই চিত্রকূট পাহাড়, কি একটা পাহাড়ি নদী পার হচ্ছিলাম তখন। পেছনে চিরকালের মতো পড়ে থাকলো বর্ধমান। সামনে আগ্রা—

—চুপ করো নূরজাহান। চুপ করো। অনেক কিছু পার হয়ে তবে তোমায় পেয়েছি আমি। আমি তোমাকে হারাতে পারবো না। আমাদের মনের ভেতর কাউকে পাবার জন্যে এমন যন্ত্রণা তৈরি হয় কেন? সে যন্ত্রণায় আমরা যে কোনো কাজ করে বসি কেন? করে ফেলে আবার যন্ত্রণায় দগ্ধ হই কেন? তুমিও ইনসান। আমিও ইনসান। শের আফগানও ইনসান। তবে কেন আমাদের মাঝখানে তাগদ, লোভ, যন্ত্রণা পাবার ইচ্ছে এত জোরদার হয়?

যমুনার ওপর আঙুরীবাগ এখন আশমানের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে অন্ধকারে। সেলিম জাহাঙ্গীর বললেন, চলো। এখন শাহী দরবারে—আমার আরতি হবে—

নূরজাহান নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একাই দেওয়ানি খাসের দিকে এগোলেন। যেতে যেতে বললেন, সেটা বাদশার শাহী ব্যাপার। ওড়না উড়িয়ে প্রদীপ হাতে নাচনি মেয়েরা আপনাকে রোশনি দেখাবে। মোবারক জানাবে। সেখানে আমি থাকি কী করে!

নূরজাহান চলে গেলেন। যমুনার ওপারে দূরে দেহাতি ঘর-গেরস্থিতে ফুটকি ফুটকি আলোর বিন্দু। অন্ধকার আঙুরীবাগে সেলিম জাহাঙ্গীর একা দাঁড়িয়ে রইলেন।

ইংলিশস্তানের পাল তোলা জাহাজ সুরাটে নোঙর ফেলে কেনাবেচা করে। তারপর কিছু জাহাজ ঝাঁক বেঁধে টানা হুগলি, সাতগাঁ অব্দি যায়। আবার কিছু জাহাজ মাঝপথেই ডাঙার ভেতর খাঁড়িতে খাঁড়িতে ঢোকে। থেমে আশপাশেও কেনাবেচা চালায়। এইভাবেই লণ্ডনের জন কোম্পানির সঙ্গে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহমেদনগরের মীর বকসিদের ব্যবসাপত্তর চলছিল। নর্মদা পেরিয়ে যেসব দরকারি জিনিস আগ্রার শাহী হুকুমে ওসব জায়গায় যেতে পারছিল না—তার অনেক কিছুই জন কোম্পানির কুঠিওয়ালারা এভাবে বিজাপুর, গোলকুণ্ডায় পাঠাচ্ছিল।

তাতেই আগ্রার আপত্তি। আপত্তি বিশেষ করে একরকমের চর্বি-তেল নিয়ে। এই তেল মালিক অম্বর আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের হাতে পড়ায় তারা খুব সহজেই কামান বইবার চাকায় সে-তেল লাগিয়ে পাহাড়ি এলাকায় কামান ঠেলে তুলতে পারছে। এটা আগ্রার পক্ষে খুবই অসুবিধার।

খবরটা কাসীদরাই নিয়ে আসে প্রথম। তারপর উজিরে আজম হয়ে বাদশার কানে ওঠে। বাদশা শুধু এক চর্বি-তেলের কথা তুলে বাণিজ্য বন্ধ করতে

পারেন না। তাতে আগ্রারই মান যায়। তাই নানান্ আপত্তি ওজর তুলে ইংলিশস্তানের ইলচি টমাস রোকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল।

টমাস রো কুর্নিশ করে বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীরকে বার্মিংহামের পান দেওয়া একখানা মনোহারী তলোয়ার উপহার দিলেন। দিলেন রূপোর ওপর মীনার কাজ করা ছ'টি পানপাত্র। তারপর এমনটি আর হবে না বলে বাদশাকে আশ্বস্ত করে ফের কুর্নিশ করলেন। করে হাতিপোল দরজা দিয়ে আগ্রা দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলেন। ঠিক করলেন, আজ রাতেই লণ্ডনে জন কোম্পানির গভর্নরকে সব জানিয়ে চিঠি লিখবেন। এ কথা ভাবতে ভাবতেই টমাস রো এসে তাঁর গাড়িতে উঠে বসলেন। অমনি আটটি ঘোড়া সে গাড়ি নিয়ে আগ্রার রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগলো।

আগ্রা দুর্গের সামান বুরুজে বসে আশমানের দিকে তাকিয়ে থাকা জ্যোতিষী রঘুনাথ যদি তখন নিচে চোখ ফেরাতেন—তাহলে দেখতে পেতেন—নৌকোর মতো এক টুপি দিয়ে আড়াআড়িভাবে সর্বক্ষণ ঢেকে রাখা যে-মাথাটি নিয়ে ইংলিশস্তানের ইলচি টমাস রো রাজধানী আগ্রার নামি দামি জায়গায় ঘুরে বেড়ান—দর-দাম করেন—কুর্নিশ জানান বা ঝুঁকে পড়ে মুঘল সহবতের সঙ্গে পাল্লা দেন—সেই মাথায় একগাছিও চুল নেই। তিনি এখন টুপিটি খুলে রেখে আগ্রার প্রথম শীতের বাতাস লাগাচ্ছেন। বাদশার সামনে আর কিছুক্ষণ দাঁড়ালে মাথাটা জ্বলে উঠতো। এই অযৌক্তিক, আবদেরে মানুষটিই হিন্দুস্থানের মতো এত বড় দেশ চালান। আসলে হিন্দুস্থান আপনা আপনিই চলে। মনকে বোঝাবার জন্যেই একজনকে বাদশা করে আগ্রায় বসিয়ে রাখা।

দুর্গের উঁচু সামান বুরুজ থেকে নিচে তাকাতে পারলেন না জ্যোতিষী রঘুনাথ। তিনি এখন এক কঠিন সমস্যার ভেতর খাবি খাচ্ছেন। এত বড় আশমানের কোনো তল নেই। উপুড় করা হাঁড়ির মতো এই আশমানের ভেতরে ঢোকার মুখটাও যে কোথায় তা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ এরই ভেতর তাবত নক্ষত্র সন্ধে হলেই ভেসে ওঠে। কে ওদের ভাসায়? কে ওদের দিনের বেলায় তুলে রাখে?

এমন সময় অন্দরমহল থেকে একজন হাবসি খোজা দাখিলা এসে জ্যোতিষী রঘুনাথের সামনে দাঁড়িয়ে সেলাম বাজালো। শাহজাদা আপনার খবর করছেন অনেকক্ষণ। অনেক খুঁজে তবে আপনাকে এখানে পেলাম।

শাহজাদা মানেই খুর্রম। কেননা, অন্ধ হবার পর খসরু থাকেন আগ্রার শহরতলি বিয়ানায়—অনু রায়ের কড়া পাহারায়। সেখানে জ্যোতিষী, নজুমীর কারও ঢোকার উপায় নেই কোনো।

এই আগ্রা দুর্গেই শাহজাদা পরভেজের আস্তানা, কিন্তু তাঁর আতালিক হলেন গিয়ে মহা দুর্মুখ কড়া মনসবদার মহাবত খাঁ। তাঁকে ডিঙিয়ে শাহজাদার দরবারে কোন্ জ্যোতিষী যায়!

আর শাহজাদা শারিয়ার তো খোদ বাদশার চোখে চোখে থাকেন। এখন তার খেলার সঙ্গী হয়েছে খুদে সুলতান সুজাশুগীর।

দাখিলার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষী রঘুনাথ শাহী অন্দরমহলে এসে ঢুকলেন। বালুপাথরের সিঁড়িগুলো রঙিন গালিচায় ঢাকা। তাতে পা দিয়ে উঠতে মন সরে না। কিন্তু দস্তুর যেমন তেমনই তো চলতে হবে। খানিক ওপরে রঘুনাথ শাহজাদার বিশাল ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে দাখিলা মিলিয়ে গেল।

খুর্রম মেঝেতে পাতা ইস্পাহানি শতরঞ্জের ওপর ঝালরদার তাকিয়া-নামদে হেলান দিয়ে বসে আছেন। হাতে একটা আধ-পাকা আপেল। আপেল-ধরা আঙুলের আঙটিতে বসানো পেল্লাই এক চুনী ঝিকমিক করে উঠলো। কুর্নিশ করতে করতে রঘুনাথ নিশ্চিত হলেন—এ চুনী নিশ্চিত বাদকশানী। নয়তো এত বড় হয়!

ঘরের কোণে সোনালি কিংখাব মোড়ানো কুশন ছিল। কিন্তু শাহজাদা খুর্রম রঘুনাথকে তাঁর সামনাসামনি বসতে বললেন। বসেই রঘুনাথ একটা চেনা গন্ধ পেলেন নাকে। মাটির বড় একটা থালায় টাটকা স্বর্ণচাঁপার স্তূপ।

চাঘতাই বংশের কারও এত কাছাকাছি কখনো বসেননি জ্যোতিষী রঘুনাথ। দু'জনের ভেতর ফারাক মাত্র হাত তিনেক। তবে কি নজুমীরের চেয়ে আমাকে বেশি বিশ্বাস করেন শাহজাদা?

ডান হাতখানা বাড়িয়ে ধরলেন শাহজাদা। দেখুন একবার—নসীব কী বলছে!

তাগদ আর ভাগ্য মেশানো একখানি মুঘল হাত। লালচে সোনালি চামড়া। তার এক পিঠে যৌবনের ঘনকৃষ্ণ লোম—অন্য পিঠে লালাভার ভেতর কয়েকটি দৃঢ় কররেখা।

—আমি তো হাত দেখি না শাহজাদা—

—তাহলে?

—আমি গন্ধবিচারী। যদি অনুমতি করেন—

—বলুন?

—আমি একবার আপনার এই হাতের গন্ধ শুঁকে দেখতে চাই।

শাহজাদা খুর্রম অনেকদিন হলো—শাহজাদা হয়ে বড় হতে হতে এক আরজুমন্দবানু ছাড়া অন্য কোনো মানুষের এত কাছাকাছি কখনো আসেননি বা ঘনিষ্ঠ হননি। আর এখন এই আম আতরাফ সাধারণ এক জ্যোতিষীর নাকের ডগায় নিজের ডান হাত মেলে ধরতে হবে?

কিন্তু কে না জানতে চায়—ভবিষ্যতের পেটে কী আছে? এই ভবিষ্যৎ জিনিসটা বড় মনোহর—রঙিন। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে—আশা, স্বপ্ন, মনোভঙ্গ।

নিজের দু'হাতে শাহজাদা খুর্রমের ডান হাতখানা তুলে ধরলেন রঘুনাথ। কী আশ্চর্য হাত। এই হাতটা একদিন তামাম হিন্দুস্থান শাসন করবে। এই হাতের নির্দেশে হিমালয় তার জায়গা বদলাবে না, গঙ্গার প্রবাহও উল্টে যাবে

না ঠিকই। কিন্তু মানুষ, ঘোড়া, হাতি, উটের ভবিষ্যৎ তো ওই ক'টি আঙুলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

অস্বস্তি লাগছিল শাহজাদার। আসক্তি নেই বলে সাধু কিছু ছুঁয়ে দেখেন না। যে-হাত শক্তি—বা তাগদের ফোয়ারা—তার কাছাকাছিও যায় না কোনো মানুষ। বরং তাগদদার হাতই তার চাইবার জিনিস কেড়ে ছিনিয়ে নেয়। মানুষের চেয়ে বরং একটা জন্তুর অনেক বেশি কাছাকাছি হয়েছেন শাহজাদা। তা হলো ঘোড়া। ঘোড়ার গায়ের গন্ধ নাকে এসে লাগলে তিনি বুঝতে পারেন ঘোড়াটা তুর্কি ? না, ইরানি ? কত মঞ্জেল দাপিয়ে এসেছে ?

—খোদাবন্দ। আপনার হাতে তো আপেলের গন্ধ পাচ্ছি।

খুর্রম হাসলেন। এই তো একটু আগে ওই আপেলটা হাতে নিয়ে চেপে দেখছিলাম—কতটা জোর লাগে শুধু হাতে একটা আপেল চেপে ফাটিয়ে ফেলতে—কতটা জোর আমার হাতে—তারই গন্ধ লেগে আছে—

—না শাহজাদা। আপনি সরোঠার জলে হাত ধুয়ে এলেও আপনার হাতে ও গন্ধ থাকবেই। ওটা আপনার হাতেরই গন্ধ—বলতে বলতে রঘুনাথ আরেকবার দু'হাতে শাহজাদার হাতখানি নিজের নাকের নিচে তুলে ধরলেন। ধরে বুঝলেন, এই নাহলে চাঘতাই হাত! ভারি, লোমশ—আর রীতিমত চওড়া। সাধারণ মানুষের হাতের চেয়ে বেশ চ্যাটালো আর আঙুলগুলো দস্তুরমত লম্বা।

এবার হাতখানা আলগোছে ছেড়ে দিয়ে জ্যোতিষী রঘুনাথ গম্ভীর চোখ তার উল্টোদিকে তাকিয়া-নামদে ঠেসান দিয়ে বসা মানুষটির নীল দুই চোখে রাখলেন। রেখে বললেন, পয়দায়িস্ থেকেই হাতে আপনি আপেলের এই গন্ধ পেয়েছেন। এ গন্ধ তাগদের। এই সুবাস হুকুমতের।

—বলছেন ?

—যার হাতের ইশারায় তামাম ওয়াতন ওঠে-বসে শুধু তার হাতেই এই সুবাস পাওয়া যাবে।

শাহজাদা আশা-আকাঙ্ক্ষায় দুলছিলেন মনে মনে। আচমকা চেঁচিয়ে বলে উঠলেন—

ইয়া আল্লাহ

তেরি রেজা!

সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথও ওপরে তাকিয়ে বলে উঠলো, সবই তোমার ইচ্ছা!

শাহজাদা গম্ভীর গলায় জানতে চাইলেন, এই খুশবু কি কোনোদিন যাবার নয় ?

—সবই একদিন চলে যায় শাহজাদা। যেদিন আপনার তাগদ যাবে—সেদিন এই খুশবুও আল্-বিদা জানাবে!

শাহজাদা খুর্রমের গোলাপি কপালের টান টান চামড়ায় পর পর তিনটি রেখা ফুটে উঠলো। মাঝেরটি বেশি গভীর। খুর্রম নিজের মনের ভেতর নিজেকেই বললেন, তাহলে আমি যদি কোনোদিন হিন্দুস্থানের বাদশা হইও—

হবার পরই যদি আমার হাতের আপেলের গন্ধ মিলিয়ে যায়—তো সঙ্গে সঙ্গে আমি মসনদ হারবো ?

নিজেকেই আবার বললেন, তা কি কখনো হয় ! মসনদে একবার বসলে তো হিন্দুস্থানের লাগাম আমারই হাতে। তখন কে আমাকে মসনদ থেকে নামবে ? কার বুকে এত সাহস ? ধড়ে মুণ্ডু থাকবে !

আমি শাহজাদা খুর্রম। আমার দুই হাতে তাগদ। মগজে বুদ্ধি। হয় আমি আমার দুশমনের শির নেবো—না হয় আমার শির যাবে।

হঠাৎ অনেকদিন আগের একটা ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠলো শাহজাদার। খুর্রম তখন বছর বারো তেরোর কিশোর। দাদাসাহেব আকবর বাদশার এন্তেকাল হচ্ছে। তিনি শুয়ে। অনুতাপে আব্বা হুজুর সেলিম জাহাঙ্গীর দাদাসাহেবের সামনে আসতে পারছেন না। সেদিনকার কিশোর তখন দাদাসাহেবকে ছুঁয়ে মনে মনে কসম খেয়েছিল—দাদাসাহেব যতক্ষণ জিন্দা থাকবেন—আমি তাঁকে ছেড়ে যাবো না। সেই বাদশার বাদশা আকবরকে তো চলে যেতে হয়েছিল !

তাহলে ?

নিজের অজান্তেই শাহজাদা খুর্রমের চোখ খুলে গেল। তিনি এতক্ষণ কী ভেবে নিজের অজান্তেই চোখ বুজে ফেলেছিলেন। চোখ মেলে দেখেন—তাঁর মুখোমুখি জ্যোতিষী রঘুনাথ তটস্থ হয়ে বসে। ইজাজত না দিলে কী করে উঠে যায় মানুষটা !

শাহজাদা বললেন, আসুন—

রঘুনাথ তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করলেন। দরজার বাইরেই দাখিলা দাঁড়িয়ে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে জ্যোতিষী রঘুনাথের মনে পড়লো—আগ্রার কাছাকাছি নারোয়ার জঙ্গলে একবার এক সাধুকে সে সমাধি দশায় দেখেছিলেন। তাঁর গায়ের ওপর দিয়ে কাঠবেড়ালি খেলে বেড়ালেও কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই সাধুর। ভগবানের ভাবনায় ভাবসমাধি।

আজ এইমাত্র তিনি আরেক রকমের সমাধি দেখে এলেন। তাগদ—ক্ষমতার ভাবনায় খানিকক্ষণের জন্যে খুর্রমের যেন সমাধি হয়েছিল। তিনি যে একজন জ্যোতিষী—তিনি যে সামনেই বসে আছেন—সেকথা খেয়ালেই ছিল না শাহজাদা খুর্রমের। চোখ বোজা দশায় শাহজাদার জওয়ানি ভরা মুখখানা—চওড়া চ্যাটালো কাঁধ খুব কাছ থেকে আজ তাঁর দেখে নেওয়ার সুযোগ হলো।

·আগ্রা দুর্গের চত্বরে চত্বরে তখন অভ্রের বাতিদানগুলো আলো ছড়াচ্ছে। ঘরে ঘরে আগেনগারে সুগন্ধী গুগগুল। হাতিপোল দরওয়াজার মাথায় নক্কারখানায় এইমাত্র সানাইয়ের পোঁ ধরলো বাঁশি।

নিজের মহলে ঢুকবার মুখে মুখে শাহজাদা খুর্রম হেকিম আব্দুল হাজি সিরাজির মুখোমুখি হলেন। শৌখিন সফল হেকিম সাহেব অল্পবয়সী একটি হায়দরাবাদিকে নিকা করার পর থেকেই কিছুটা টগবগে হয়ে উঠেছেন।

ফুর্তিবাজ তুর্কি, তাতার ঘোড়সওয়াররা বড় হামলার আগে তাদের ঘোড়ার হাঁটু আগ্রার নীল রংয়ে রাঙিয়ে নেয় যেমন—হেকিম সাহেবও যেন এন্তেকালের দিকে এগোতে এগোতে তেমনি দাড়ি রাঙিয়েছেন গোলাপি রংয়ে—হাঁটা-চলাতেও যেন তাজা টাট্টু।

খোদ জওয়ানি বলতে বোঝায় শাহজাদা খুর্রমকে। তাঁর সামনে পড়ে গিয়ে প্রবীণ হেকিমসাহেব কিছুটা মিইয়ে গেলেন গোড়ায়। নিজের টগবগে ভাবটাও হারিয়ে ফেললেন খানিকক্ষণের জন্যে। তারপর সামলে উঠে বললেন, আমি আপনাদের দু'পুরুষের হেকিম। খোদার কসম খেয়ে—আমাকে সত্যি কথা বলতেই হবে।

জ্যোতিষী রঘুনাথের কথায় ঘোরের মধ্যে ছিলেন শাহজাদা। তাগদের সুবাস তাঁর হাতের পাতায়। হিন্দুস্থান, একদিন হেলবে ঝুঁকবে তাঁরই হাতের ইশারায়। এ কি কম ঘোর! রঙিন স্বপ্ন থেকে এক ঝাঁকুনিতে কঠিন দুনিয়ায় ফিরে আসতে আসতে শাহজাদা বললেন, কেন? কী হয়েছে? কী দেখলেন?

আপনার এখন রঙিন উমর। সিনা ভরে তাজা হাওয়া নেবেন আরও অনেকদিন। আমাদের তো সময় হয়ে এলো।

শাহজাদা খুর্রম মনে মনে বললেন, সময় অনেকদিন পার হয়ে এসেছেন আপনি! মুখে বললেন, ভয়ের কিছু দেখলেন?

—না! তেমন কিছু নয়। তবে এই সময়টায় মন খুশি থাকাই ভালো। আগ্রার বাইরে খুলি হাওয়ায় রোদ থাকতে থাকতে তো ঘুরে আসতে পারেন দু'জনে।

স্বস্তির হাঁফ ছাড়লেন শাহজাদা।

ঠিক তখনই আবদুল হাজি সিরাজি বললেন, বেগম সাহেবের আর মা হাওয়া কি ঠিক?

—কেন? একথা বলছেন কেন?

—তাঁর ভালোর জন্যেই বলছি শাহজাদা—

॥ আট ॥

আকবরশাহী আমল থেকে হাতির জন্যে দৈনিক বরাদ্দ চার সের ঘি, পাঁচ সের চিনি, লবঙ্গ-গোলমরিচ সহযোগে আধ মণ দুধে আধসেদ্ধ আধ মণ চালের কড়া প্রসাদ। এরকমভাবে নিত্যসেবা করে হাতিরা প্রত্যেকে শীতের দু'মাস রোজ তিনশো গাছি আখ পায় চিবোনোর জন্যে—শরীরটা ধাতে রাখতে। বাদশা জাহাঙ্গীর তাদের ফুর্তিতে রাখার জন্যে সামান্য শরাবেরও বন্দোবস্ত করেছেন। সেই সঙ্গে করেছেন শরিয়তী মতে হাতি পিছু চারটি করে আলানসঙ্গিনী হাতির ব্যবস্থা।

কিন্তু দেওয়ানখানা থেকে কড়ায়-ক্রান্তিতে এই সবই বরাদ্দ হলেও হাতির কাছে কি তা কড়ায়-ক্রান্তিতে পৌঁছয়? হাতির মতোই, ঘোড়া, উট, বন্দুকচী,

ধানুকী—মানুষ, জন্তু—সবার বরাদ্দ রসদেই হাত পড়ে। বিরাট অজগরের মতো এই বিশাল লশকর আমলা বাহিনীর আগা মাথা দেখা যায় না। হাতি পিছু এক সের ঘি কিংবা বন্দুকচী পিছু চার টোটা বারুদ সরিয়ে রাখলেই দেদার আশরফি—যা দিয়ে কিনা আগ্রার বাজারে সেরা আরাম—সেরা ফুর্তি কেনা যায়।

এই হলো গিয়ে আগ্রার চাল। আর এখন তো আগ্রাই হিন্দুস্থান। এখানে তাগদ। এখানেই মোহর। সেই তাগদ আর মোহর জোড় লেগেছে আগ্রা দুর্গে। এই জোড়ের নাম বাদশা।

আলা হজরত বাদশা জাহাঙ্গীর এখন ভোগে, সুখে, লোভে, কামে টইটম্বুর। লড়াই তিনি নিজে গা ঘামিয়ে করতে চান না। কিন্তু জয় চান। সে কাজে তাঁর চাইই চাই তিসরি বেটা—শাহজাদা খুর্রমকে।

খুর্রম গা-ঘামানো লড়াকু। ঘোড়া দাবড়ে—ভল্ল ছুঁড়ে তিনি জয় ছিনিয়ে নিতে দড়। তাই তাঁর আব্বা হুজুরের কাছে তিনি সবচেয়ে দরকারি। কেননা, আর তিন শাহজাদা—শারিয়ার বালক, পরভেজ না-লয়েক, খসরু অন্ধ।

সুতরাং সেই খুর্রম যখন চিন্তিত হয়ে পড়েন—তখন সারা আগ্রা দুর্গ চিন্তিত হয়। খুর্রম হাসলে আগ্রা দুর্গ হাসে। অবশ্য আগ্রায় যারা ফুর্তি কেনে—কিংবা যারা বদ-নসিবীতে চোখের জল ফেলে—তাদের ভাগ্যের কোনো হেরফের হয় না।

আকবরী দরওয়াজার পথেই জেনানা-মহল। সোনার লতাপাতা আঁকা তনসুখ কাপড়ের পর্দা খেলাপ না করেই শাহজাদা খুর্রম দেখতে পেলেন—বেগম আরজুমন্দ বানু পাশ ফিরে শুয়ে। সুখ-তাকিয়ায় তাঁর চোখের জল তখনও শুকোয়নি।

খুর্রমের বিয়ে ছ'বছরও পুরো হয়নি। ঘরের ভেতর থেকে একজন ফর্সা তাতারিনী আর একজন ঘন কালো হাবসিনী বাঁদী শাহজাদাকে দেখতে পেয়ে মুহূর্তে মিলিয়ে গেল।

—বেগম তুমি কাঁদছো? আমায় তুমি ক্ষমা করো।

আরজুমন্দ যেমন ছিলেন তেমনই থাকলেন। কোনো কথা বললেন না। খুর্রম নিজের বেগমের পিঠে হাত রেখে বললেন, তোমার কাছে নিজেকে ধরে রাখতে পারি না আমি। আমি জানি—আমারই ভুলে তুমি আবার মা হতে চলেছো। এর জন্যে তুমিও দায়ী।

এবার আরজুমন্দ কোনো কথা না বলে খুর্রমের মুখে তাকালেন।

তখন নিরুপায়ের ভঙ্গিতে খুর্রম বললেন, তোমাকে দেখলে আজও আমার মনে হয়—এই তো কাল তোমার সঙ্গে আমার নিকা হয়েছে—তুমি এত সুন্দর—

আরজুমন্দ চোখ নামিয়ে নিলেন। শাহজাদা বললেন, হেকিম সাহেবের কথা শুনে তুমি মন খারাপ কোরো না।

—কী কথা?

—তোমায় দেখে সিরাজি সাহেব নিশ্চয় বলেছেন—আবারও মা হতে যাওয়াটা বিপদ ডেকে আনতে পারে। জাহানারা, দারা, সুজা—তিন তিনখানা ফুল তুমি আমায় উপহার দিয়েছো। তুমি কিছু ভেবো না—ইনসানের যা সাধ্য তাই আমি করবো—তুমি মা হবে—কোনো বিপদকেই ঘেঁষতে দেবো না তোমার আশপাশে। কেঁদো না তুমি—

ফিরে তাকালেন আরজুমন্দ বানু। ওসব কথা আমি ভাবিইনি।

—তাহলে? তাহলে কিসের দুঃখে—?

—দুঃখে নয়—ভয়ে শাহজাদা—আমার সবসময় ভয় তোমাকে নিয়ে। —বলতে বলতে উঠে এসে দু'হাতে খুর্রমকে জড়িয়ে ধরলেন।

—কিসের ভয়?

—তুমি সত্যি কথা বলো তো—বেনারসি ঘন ঘন কেন তোমার কাছে আসে?

—কে বেনারসি?

—আমার বাবার খাস গোলাম বেনারসি—

—ওঃ! বেনারসি। ভুলে যেওনা—আমি শাহজাদা। আসফ খাঁ তোমার বাবা হলেও শাহী সরকারে তিনি উজিরে আজম। তিনি তো একজন শাহজাদার কাছে জরুরি ব্যাপার স্যাপারে গোলাম পাঠাবেনই—

—আমার বাবাকে নিয়ে আমি ভয় পাই শাহজাদা। তিনি ঘোঁট পাকানো মতলববাজ মানুষ। আমার দাদাসাহেব ইতিমাদ-উদ্দৌলা এতই প্যাঁচ কষা মানুষ যে—শেষ অব্দি ছেলে আসফ খাঁ—মেয়ে মেহেরুন্নিসাকে ছোটটি নিয়ে ইস্পাহান থেকে তাড়া খেয়ে আগ্রায় এসে ঘাঁটি গেড়েছেন—এখানে এসেও ওঁরা জট পাকাতে পাকাতে কোথায় গিয়ে ঠেকবেন বুঝে উঠতে পারছি না—

—কী বলছো আরজুমন্দ? তোমার পিসি এখন বাদশা জাহাঙ্গীরের নূরমহল—শাহী ষাট হাজারি নূরজাহান বেগম!

—আমার পিসিকে আমার চেয়ে তুমি বেশি চেনো না। তাকে আমার আরও বেশি ভয়—ভয় আমার তোমাকে নিয়ে—তোমার চোখে তাকিয়ে সেই তোমাকে আর খুঁজে পাই না শাহজাদা—

—তোমার পিসিই হিন্দুস্থানের শাহী কেতায় আবার আতরের চল ফিরিয়ে এনেছেন। শাহী সহবতে দস্তরখানা এসেছে তাঁরই বুদ্ধিতে—

—ওগো ওসব বাইরের ওপরসা ইরানি কেতায় সারা হিন্দুস্থান ভুললেও আমি ভুলছি না। বাদশাকে বশ করতে এই বয়সে কেউ কাঁচুলি এঁটে আতর ছড়িয়ে খুকিটি সাজে? ফৌজদার শের আফগান খুন হতেই লাডলিকে নিয়ে আগ্রা দুর্গে এসে ওঠা?

—তা লাডলিকে কোথায় রেখে আসবেন? ওইটুকু মেয়ে একা—কোথায় থাকবে?

—আঃ! আমি লাডলির কথা বলছি না। তোমরা পুরুষরা আমাদের কথা বোঝো না। আমার পিসিকে আমি চিনি। চিনি আমার বাবাকেও। আবার ভয়

করে আজকাল তোমার চোখে তাকাতে। সেই সুন্দর চোখ কেমন হয়ে গেছে আজকাল।

—বেগম। আমি আমিই আছি। তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছো।

—জানো না। তুমি ওদের বিশ্বাস কোরো না। বিশ্বাস করে কোন্ বিপদ ডেকে আনবে।

—বাঃ! আরজুমন্দ! তোমার পিসি এখন শাহী সরকারের ষাট হাজারি ঘোড়সওয়ার বাহিনীর মাথায়—

—সেখানেই তো আমার সন্দেহ শাহজাদা। মুঘল খানদানে কোন্ বেগমের কবে ষাট হাজারি মনসবের দরকার পড়েছে? না, কাকে এমন মনসবী দেওয়া হয়েছে? আকবর বাদশার বেঁধে দেওয়া নিয়মে মুঘল শাহজাদীদের বিয়েই হয় না। আর বেগম হয়েই আমার পিসির ষাট হাজার ঘোড়সওয়ারের মাথায় বসার দরকার পড়লো! দরকার পড়লো নিজের নামে মোহর বের করাব!

—আব্বা হুজুর জাহাঙ্গীর বাদশার ইচ্ছেই হিন্দুস্থানের শাহী ইচ্ছে। হুকুমত। আগ্রা এইভাবেই চলে আরজুমন্দ।

—যা ইচ্ছে তাই চলুক। কিন্তু কেন আব্বা হুজুরের খাস গোলাম বেনারসি তোমার কাছে ঘন ঘন আসে? কেন তুমি আব্বা হুজুরের খাস কামরা থেকে রাত করে ফেরো?

—বাঃ! তিনি শাহী সরকারের উজিরে আজম। আমি শাহজাদা। আমি তাঁর দামাদ—হিন্দুস্হান নিয়ে আমাদের কথা থাকতেই পারে।

—কী এত শলাপরামর্শ তার সঙ্গে? আমার ভয় করে শাহজাদা। হিন্দুস্হানের ভাবনা ভাবার জন্যে আমাদের মাথার ওপর তো একজন বাদশা আছেন। তিনি তোমার আব্বা হুজুর। তিনি থাকতেও এত কিসের ভাবনা? আমি শুনেছি—তোমাদের এই রাত-কাবারি শলাপরামর্শে আমার পিসিও দেখা দিয়ে থাকেন—

—বোন তাঁর ভাইয়ের কাছে আসবে না?

—যত ইচ্ছে আসুক। কিন্তু শাহজাদা তুমি সেখানে কেন? কোথায় গেল তোমার মুখের সেই লালী? জাহানারা, দারা, সুজার মতো তিন তিনটি বেলকুঁড়ি তোমায় দিয়েছি শাহজাদা—

—সেজন্যে আমি তোমার বান্দা আরজুমন্দ। আমি কৃতজ্ঞ।

—আরও একটি পেটে এসেছে। সে লাডলা?—না লাডলি? খোদা জানেন।

—সবই খোদার মেহেরবানি বেগম।

সে কথায় না গিয়ে আরজুমন্দ বানু বললেন, মনে রেখো—যারা এসেছে—যে আসছে—সবাই তোমার খুন নিজেদের শরীরে বয়ে বেড়াবে এ দুনিয়ায়। তারা তোমারই আওলাদ। তোমার মন পাবে। তোমারই প্রতিভা রোশনি করবে—উজালা করবে—

শাহজাদা খুর্রম বিস্তরখানা থেকে উঠে বসলেন। গম্ভীর, গাঢ় চোখে

নিজের বেগমের চোখে তাকালেন। কী বলতে চাও?

—বিয়ানা নিয়ে এত মাথা ঘামানো কেন?

—বিয়ানা?

—হ্যাঁ, বিয়ানা শাহজাদা। তিনি তোমার বড়ে ভাই। বদ্‌ কিসমতি মানুষ। তাঁকে নিয়ে টানাটানি কেন? মনে রেখো—তুমি ছেলেমেয়ের বাবা। তোমারও একটা শাহী ঘর-গেরস্থি আছে। খসরু ভাইয়ের ওখানে আব্বাজান এক রিসালা ঘোড়সওয়ার পাঠালো কেন? সে তো তোমারই ভাই। পাঠানো হলে সে-কথা তুমি তোমার বেগমকে বলবে না?

—এসব শাহী দেওয়ানখানার ব্যাপার। এর ভেতর জেনানামহলের কেউ থাকে না আরজুমন্দ।

—জেনানামহলের ষাট হাজারি মনসবী নূরজাহান তো থাকেন!

সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিতে পারলেন না শাহজাদা খুর্‌রম। তিনি দেখলেন, লম্বাটে সুন্দর মুখে দুই চোখ দিয়ে জল পড়ছে আরজুমন্দের।

আরজুমন্দ বললেন, দোহাই তোমায়! অন্ধ বড়েভাইকে রেহা দাও। বেদৌলতী মানুষটা তো কারও কোনো ক্ষতি করেনি। তোমরা তার খুন দিয়ে কী করবে?

শাহজাদা যমুনার দিককার খোলা চত্বরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই শীতের শুরুতেই খুলি হাওয়ার ভেতরেও ঘেমে উঠেছিলেন। কাম্বাদার আঙরাখার গলাটা একটু খুলে দিয়ে বললেন, তুমি হলে গিয়ে শাহজাদা খুর্‌রমের বেগম। ধুলোবালি মাখানো এই দুনিয়ার আজে বাজে জিনিসে মাথা ঘামাও কেন? তমি মা হতে চলেছো। এখন তোমার মন ভালো রাখা দরকার। চলো কোথাও বেড়িয়ে আসি—

—যাবে? একসঙ্গে কতদিন কোথাও যাওয়া হয় না আমাদের—

—চলো। কালই আমরা ফতেপুর সিক্রি ঘুরে আসতে পারি বেগম।

খুশিতে মুখখানা ঝলমল করে উঠলো আরজুমন্দের। তিনি একটা শর্ত দিলেন, হাতি ঘোড়া লশকর নিয়ে হৈ-হল্লা করতে করতে যাওয়া নয়। শুধু তুমি আর আমি থাকবো। আর যাবে দারা, জাহানারা।

—সুজা কী দোষ করলো?

—সে কি যাবে? সে যে এখন খুদে বাদশা বনে গেছে—বাদশা জাহাঙ্গীরের কোলে কোলে থেকে সে এখন বাদশা সুজাঙগীর!

আগ্রা দুর্গের এই জেনানা মহলের খোলা জানলার সামনের আকাশে এখন হিমছায়া ঘেরা চাঁদ। নিচে যমুনার জল অন্ধকার হয়ে আছে।

সেই কবে আকবর বাদশা লোদিদের কদাকার ইটের দুর্গ ভেঙে ফেলে আগ্রায় এই দুর্গ বানাবার হুকুম দিয়েছিলেন—তারপর পঞ্চাশ বছরেরও বেশি কেটে গেছে। আজও আগ্রা দুর্গ বানানো শেষ হয়নি। কবে শেষ হবে কেউ জানে না। ভোর হলে দেখা যায়—গোয়ালিয়র থেকে ছুটে আসা রাস্তায় গো-গাড়ির পর গো-গাড়ি। পাথর বোঝাই হয়ে আসছে তো আসছেই। দিনের

পর দিন। বছরের পর বছর। আগ্রার গায়ে পাথর কাটাইয়ের রাজপুত শিলদারদের বসতিই গড়ে উঠেছে ওখানে কয়েক পুরুষের।

আর পাথরও এসেছে—আসছে হিন্দুস্থানের তামাম পাহাড় থেকে। এমন কি খাইবারের কাছাকাছি থল-চোটিয়াল পাহাড়ের পাথরও বাদ যায়নি। সারাদিন ধরে পাথর কাটাইয়ের নানারকম আওয়াজ। রঙিন কুর্তা পরা রাজপুতদের সঙ্গে হাতে হাতে কাজ করে চলে ঝালরদার কাম্বা গায়ে রাজপুতানিরা। ঠিকঠাক কাটাই পাথর বয়ে নিয়ে যায় উটে টানা গাড়ি। সে পাথর মোটা কাছি দিয়ে গাছের গোলাইয়ের ওপর দিয়ে গড়িয়ে খুব সাবধানে ওপরে তোলা চলে সারাদিন ধরে।

দুর্গের সামান বুরুজের ওপর মুখখানা রেখে সারাদিন ধরে এসব দেখা যায় কিশোর শাহজাদা শারিয়ার। বয়স আন্দাজে বেশ লম্বা। বড় বড় চোখ। দুর্জনরা বলে থাকে—এলাহাবাদ থেকে আগ্রায় এসে বাদশা হওয়ার সময় সেলিম জাহাঙ্গীর কনৌজি এক বাঁদীর দিকে সামান্য কয়েকদিন ঝুঁকেছিলেন বলেই শারিয়ার পয়দা হয়। সে বাঁদী এখন কোথায় কেউ জানে না। কিন্তু সামান্য তামাটে রংয়ের একমাথা চুল নিয়ে এই শাহজাদা যখন বাদশার সামনে দাঁড়ায়—বাদশা স্নেহভরে তার মুখে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন।

ওপর থেকে দেখা যায়—অনেক নিচে একটা তাঁবুর সামনে দিবানে বসে খুব ফর্সা একটা লোক হাত নেড়ে হুকুম করে যাচ্ছে। কখনো বা সে উঠে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ে। আবার কখনো সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে কাঠের মাচায় উঠে আসে। কাজের জায়গায় গিয়ে পাথর দেখে—মশল্লা পরখ করে।

এ-ই নিশ্চয় নসরত খাঁ। বসরা থেকে নিয়ে এসেছেন বাদশা। দুর্গ বানানোর জন্যে। সকালের হালকা পরিষ্কার রোদে নিচেটা পরিষ্কার দেখতে পায় শাহজাদা শারিয়ার। দুর্গ তৈরি হচ্ছে তো হচ্ছেই। শারিয়ারের কাছে মনে হয়—আগ্রার ভেতর এই দুর্গ হলো গিয়ে আরেক আগ্রা। এর কোথায় কী হয় কেউ জানে না। যে যেটুকু দেখতে পায়—শুধু সেইটুকুই সে জানে।

সামান বুরুজের সামনাসামনি এই শীতের সকালে একটা ছায়া পড়লো। টান টান লম্বা চেহারার মেয়েটিকে দেখে শারিয়ারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।
—ওই দ্যাখো কালকের সেই বড় পাথরের চাঙড় গড়িয়ে গড়িয়ে কোথায় তুলেছে।

—এর ভেতর তুলে ফেলেছে?—বলে মুখ ঝুঁকিয়ে যে-মেয়েটি নিচে তাকালো—তার পুরো চেহারা এবার পরিষ্কার রোদে ঝকঝক করে উঠলো। শারিয়ার মন দিয়ে দেখছিল। এবার সে হেসে বললো, নিশ্চয় এবার বলবে—আমাদের বর্ধমানেও এত বড় বড় পাথর আছে!

মেয়েটি ঘুরে তাকালো। এবার তার চোখ দেখে বোঝা গেল, সে কথা বলতে বলতে মনের ভেতরের চোখ দিয়ে শারিয়ারকে দেখছে—আর মনে মনেই তারিফ দিচ্ছে।

মেয়েটি বললো, না শারিয়ার। বর্ধমানে পাথরই নেই। আর আমি তো খুব ছোট থাকতেই চলে এসেছি সেখান থেকে। কিছুই মনে পড়ে না। সব ঝাপসা

হয়ে গেছে—

—তোমার বাবাকে মনে পড়ে লাডলি ?

—হ্যাঁ। তাঁর কোমরবন্ধের লাল মখমল এখনো আমার চোখে লেগে আছে। এই যাঃ! কী ভুলভাল বকছি। আমার আব্বা হুজুর তো এখন তোমারই বাবা—আলা হজরত বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীর।

এসব কথা শাহজাদা শারিয়ারের কানেই গেল না। সে দূরে নিচে যেখানটায় হাতি দিয়ে টেনে আনা কাঠের বড় বড় গোলাই গড়াগড়ি যাচ্ছিল—মোরি দরওয়াজা—বরাবর যমুনার তীরে ঘেঁষে—সেখানটায় তাকিয়ে আনমনা গলায় বললো, আমার মাকে আমার মনেই পড়ে না।

—আমর মা-ই তো এখন তোমার মা!

—কী ?—বলেও থমকে গেল শাহজাদা শারিয়ার। তার চোখ আটকে গেল লাডলির বাসন্তী রংয়ের কুর্তির ওপর কোমরে কষে বাঁধা লাল রংয়ের কাবুলি বনাতের পটিতে। সে মনে মনে বললো, মানুষ কত সুন্দর হয়। মুখে বললো, মক্তবে যাবে না ?

—ফারসি পড়তে আমার একদম ভালো লাগে না শাহজাদা। দৈলেমি সাহেবের সামনে বসে হাতের লেখা মকসো করতে কার ভালো লাগে এই সকালবেলায়—

'কার ভালো লাগে'—বলার সময় এমন করেই লাডলির লালচে ঠোঁট ফুলে উঠলো—যাতে শারিয়ার না বলে পারলো না, আমায় শাহজাদা বলো কেন লাডলি ?

খানিকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলো না লাডলি। মাথা তুলে শেষে বললো, জানো, বর্ধমানে আম্মিজানের জন্যে আব্বা হুজুর ফুলের বাগান করেছিল। পীর বহরামের দরগাহে গিয়ে মা আর আমি ফুল চড়াতাম। সেখানে ফুল দিয়ে আম্মিজান আর আমি একটু হেঁটে দামোদরের তীরে গিয়ে দাঁড়াতাম। এই যমুনার চেয়ে দামোদরের চর অনেক বড়। তাই তো লাগতো আমার।

খানিকক্ষণের জন্যে দু'জনই চুপ করে গেল। আগ্রা দুর্গের সামান বুরুজে শীতসকালে দাঁড়িয়ে দু'জনেই যেন একই সঙ্গে চোখের সামনে দামোদর আর তার বিস্তীর্ণ চর দেখতে পাচ্ছিল। এ যেন যমুনা নয়—আসলে দামোদর। একজন যা একদম দেখেনি। আরেকজন দেখেছিল খুব ছোটবেলায়। আসলে শাহজাদা শারিয়ার লাডলির চোখে তাকিয়ে লাডলিকে দেখছিল। ওর জন্যে শারিয়ারের বুকের ভেতর একটা কষ্ট দম বন্ধ করে আনে।

রোদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আগ্রার বাজার জমে উঠেছে।—চাই তিলের লাড্ডু বলে চড়া গলায় একজন হেঁকে যাচ্ছে। বাজার চলতি ভিড়ে গা ঘষাঘষি। ওরই ভেতর এক বাইজি তার সন্ধের খদ্দেরদের জন্যে উবু হয়ে বসে তরমুজ দর করছিল। এক কাঁকরিওয়ালা আর ঘুড়িওয়ালা বসবার জায়গা নিয়ে প্রায়

কামড়াকামড়ি শুরু করে দিলো। মাঝখান থেকে বছর দশেকের একটা ছেলের হাত থেকে রুপেয়া পড়ে গিয়ে তার কাঁদো কাঁদো দশা। সে যতবারই নিচু হয়ে ধুলোয় রুপেয়া খুঁজতে যায়—ততবারই চলতি মানুষ তাকে প্রায় মাড়িয়ে দিতে গিয়ে ফিরে দাঁড়ায়। কেউ বলে, উজবুক! কেউ বলে, বুরবক কাঁহেকা?

এই অবস্থায় ছেলেটি কাঁদো কাঁদো গলায় আগ্রা দুর্গের গায়ে পাথর কাটাই চত্বরে ফিরে আসে। খালি হাতে। চোখে জল। সে এখানকার ভাষাও ভালো করে বোঝে না।

একজন বুড়ো মতো পাথর কাটাইওয়ালা মাথা নিচু করে থল চোটিয়ালের দানা পাথর ঘর্ঘরায় ফেলে সযত্নে, পেছল করে তুলছিল। এই শীতে খালি গা। সারা শরীরের রগ ফুলে উঠেছে দড়ি দড়ি হয়ে। তার কী মনে হলো সে ছেলেটিকে বললো, কী হয়েছে রে? কাঁদছিস কেন বেটা?

এ কথায় হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললো ছেলেটি।

—কী হয়েছে বলবি তো?

ভয়ে ভয়ে ছেলেটি বললো, বিলকুলি পান আনতে দিয়েছিল—রুপেয়া পড়ে গেছে হাত থেকে—

—ওরে বাবা! নসরত খাঁয়ের পান। যা যা—ছুটে যা বিষণ—গোড় ধরে সাচ কথা বলবি। নয়তো শেষে কোড়া খাবি। —যা সাচের কোনো মার নেই—

ছেলেটি এগোবে কি! সে দূর থেকে দেখলো—উঁচু পাটাতনে তাঁবুর সামনে নসরত খাঁ নাস্তা করতে বসেছে। জবরদস্ত চেহারা। ইয়া বুকের ছাতি। কালো চাপ দাড়ি। ফর্সা মুখে নীল চোখ। নাস্তা শেষ হলেই তো তবক দেওয়া বিলকুলি পান খেতে থাকবে ঘন ঘন—আর দুর্গের এ-মোড় ও-মোড় ঘুরে পাথর বসানোর তরফদারি করতে থাকবে।

ভয়ে ভয়ে পাটাতনের কাছাকাছি এসে ছেলেটি দাঁড়াতেই নসরত খাঁ চেঁচিয়ে ডাকলেন। কী হয়েছে? কাঁদছিস কেন?

ভয়ে সিঁটিয়ে যাবার দশা। ছেলেটি জানে এই জবরদস্ত নসরত খাঁ সারাদিন হাতির মতো খাটে। সন্ধে হলে অন্য মানুষ। চোখে সুরমা, কানে আতর দিয়ে শেরওয়ানি গলিয়ে আগ্রার মাণ্ডিতে কোথায় যেন যায়। ফেরে গভীর রাতে। ঘুমের ভেতর নসরত খাঁয়ের জোড়া ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়াদের পা বদলানোর শব্দ সে শুনেছে। এ ক'মাসে লোকটার খিদমতগারি করে করে সব মুখস্ত ছেলেটির। কোনো কোনো রাতে তাকেই উঠে গরম জল যোগাতে হয়। দরকারে তাঁবুর ভেতরটা গরম করতে আগেনগার রেখে আসতে হয় ছেলেটিকেই।

—রুপেয়া পড়ে গেছে হাত থেকে।

—কোথায় পড়লো?

—বাজারের ভেতর।

ভেড়ার মাংস ভাজা, সেই সঙ্গে কাবুলের পাকা চেরি খোবানি আর পিণ্ডি খেজুর। সেগুলো খুব আরামে সাবাড় করতে করতে নসরত জানতে চাইলো, কোথাকার ভূত তুই! তবকী বিলকুলি পান আনতে গিয়ে আস্ত রুপেয়াটাই

হারিয়ে বসলি ? কোথাকার ভূত তুই ? বল—

—খুন্তাঘাট—

—সেটা কোন্ জাহান্নমে ?

—ব্রহ্মপুত্রের ধারে—

—আজ আর তোকে পেটাবো না। সস্তায় গোলাম কিনে আমার হয়েছে তিন দশা। আজ এটা ভাঙবে—কাল ওটা হারাবে। আজ তুই সারাদিন পাথর কাটাইয়ে যোগাড় দিবি। দিয়ে যা দামড়ি পাবি—তাই দিয়ে সন্ধেবেলা আমার জন্যে চার তবক বিলকুলি পান আনবি।

উপস্থিত কোড়া না খেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো ছেলেটি। সে গুটি গুটি হেঁটে পাথর কাটাই শিলদারদের ছড়িদারদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। এইসব ছড়িদার আসলে বসরার ওদিকে উট চরাতো। তারা হিন্দুস্থানে নসরত খাঁয়ের সঙ্গী—নজরদার। এক একটি জোঁক বিশেষ। বেলদার পাথর কাটাইদের একটু জিরোতে দেয় না। ঘুমিয়ে পড়লে—বা ঢুলতে থাকলে ছড়ি চালাবে। ফাঁকি দিয়েছে—এই বদনাম দিয়ে প্রায়ই তিন দাম—চার দাম কেটে রাখে। নসরত খাঁয়ের চানা, গেঁহু, বাজরার বেনামা কারবারও ওরা চালায়। পাথর কাটাইরা তা কিনতে বাধ্য। অথচ নসরত খাঁয়ের চানার দাম বাজারছাড়া। ওজনেও মারবে।

ছড়িদার ছেলেটির পেটে কোঁতকা দিয়ে বললো, যা—গোলাইগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে আন। জায়গায় ফেলবি। নয়তো এক ছড়ি—কী নাম রে তোর ?

সারা গায়ে দড়ি দড়ি করে জেগে ওঠা রগ—সেই বুড়ো পাথর কাটাইওয়ালা মুখ তুলে বললো, বিষণ—ওর নাম তো বিষণ—

—চুপ কর। ও-ই বলুক।

ছেলেটি বললো, বিষ্ণু—

বুড়ো পাথরকাটাইওয়ালা তখন ছেলেটির দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলেছে। নিজেই বিড় বিড় করে বলতে শুরু করেছে, যমুনার দিককার এই ঠাণ্ডা বাতাসে—ছেঁড়া পিরান গায়ে ওই কচি গোলাম কেমন করে পাথর গড়িয়ে গড়িয়ে দেবে—ওই কচি হাতে ? হায় আল্লা !

আগ্রার এসবে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। আগ্রা যেমন চলে তেমনই চলছে। নসরত খাঁ বাঁ হাতে হাতায় করে খানিকটা গরম দুনিয়াজা নিজেই তুলে নিলেন। এত বড় দুর্গ গড়ে তোলার কারিগর নসরত খাঁ রান্নায় খুশি হয়ে নিজেই এক হাতা কচি মাংসের দুনিয়াজা তুলে নেওয়ায় রসুইকার তাঁবুর সামনেকার পাটাতনে দাঁড়ানো অবস্থায় আনন্দে-বিনয়ে ঝুঁকে পড়লো।

সবই ঘটছিল আশমানের নিচে। খোলা চত্বরে। শীতের আরামের বেলায়। পাশেই চর জেগে ওঠা বুক নিয়ে যমুনা। তার ওপর আগ্রা দুর্গের বিশাল ছায়া।

দুর্গের সামনে দিয়ে যে রাস্তা গোয়ালিয়রমুখো—তার ওপরেই

সবেরেওয়ালা বাজার। ভোর ভোর বসে বলে এই নাম। চলে দিনভর। হঠাৎ দেখা গেল—বাজার প্রায় ফাঁকা করে দিয়ে মানুষজন ছুটছে।

ঠিক তখনই উল্টোদিক থেকে শাহী জুড়িগাড়ি আসছিল। আগে পেছনে এক রিসালা ঘোড়সওয়ার সে-গাড়ি পাহারা দিয়ে এগোচ্ছিল। ছুটন্ত ভিড় সেই আটঘোড়ার গাড়ির সামনে পড়তেই তুর্কি ঘোড়সওয়াররা চেঁচিয়ে হুঁশিয়ারি দিতে লাগলো—দূর বাশ্—দূর বাশ্—

অমনি পড়িমরি করে দৌড়নো ভিড় সওয়ারদের হাতের চাবুক খাওয়ার ভয়ে দূরে হটে গিয়ে—রাস্তার দু'ধারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে—হাত পা ছড়ে গিয়ে আটঘোড়ায় টানা শাহী গাড়িকে রাস্তা করে দিলো।

গাড়ি তীব্র বেগে আগ্রা দুর্গকে বাঁয়ে ফেলে ফতেপুর সিক্রির রাস্তা ধরলো। শাহজাদা খুর্রম বললেন, যত্তো মিশকিন ছিল সব হটেছে।

বেগম আরজুমন্দ বানু পাশেই বসে। পায়ের চটি অব্দি ঢাকা বোরখার ভেতর থেকে বললেন, ওরা কোথায় যাচ্ছে? কেন ছুটছে সবাই?

—আজ বড় মকবরায় মিশকিনদের খাওয়ানো হবে। শাহী দেওয়ানখানার খরচায় মিশকিনরা হালিম খাবে। গরম গরম। মাথা পিছু দু'হাতা—

—কী থাকে তাতে?

—গরম গরম মটর ডালে দু'চার টুকরো মাংস থাকে নিশ্চয়!

—সবাই কি মাংস পায়?

—যার যেমন জোটে। ওই দ্যাখো—ওই যে রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে—ওখান থেকেই আকবর বাদশা—আমার দাদাসাহেব খাজা সেলিম চিসতির আখড়ায় রওনা হয়েছিলেন। সেলিম চিসতি থাকতেন আরও দুই মঞ্জেল উজিয়ে সিক্রি গাঁয়ে।

বালক দারা ঘাড় উঁচু করে দেখার চেষ্টা করলো। কয়েকটা ঝাঁকড়া গাছ —পেছনে একটা ছোট টিলা। এর বেশি সে কিছুই দেখতে পেল না। বুঝলোও না। জাহানারা কিন্তু তাকিয়েই আছে। সে জানতে চাইলো, ওটা কী গাছ বাবা?

শাহজাদা খুর্রম তখন তখনই সে-গাছের নাম বলতে পারলেন না। আটঘোড়ার টানা গাড়ি ঝড়ের বেগে সে জায়গা পেছনে ফেলে ছুটে চললো।

শাহজাদা খুর্রম তার বেগমকে বললেন, ইংলিশস্তানের ইলচি টমাস সাহেব গাড়িখানা কিন্তু ভালো দিয়েছে—যাই বলো আরজুমন্দ। একটুও ঝাঁকুনি লাগছে না—

—এ-গাড়ি সে-গাড়ি নয় শাহজাদা। সে-গাড়ির ধাঁচে আমাদের কামারশালে তৈরি এ-গাড়ি—

—আমি তো চিনতেই পারিনি বেগম। অবিকল একরকম।

—আলা হজরত বাদশা জাহাঙ্গীরের হুকুমে দুর্গের কামাররা এমন আটখানা গাড়ি বানিয়েছে। তোমার তো না-জানার কথা নয় শাহজাদা—! শাহী কাজকর্মের নামে আজকাল কোথায় কাটাও!

—আব্বা হুজুরের হাজারো খেয়াল। সব খবর রাখবো কী করে? এই হয়তো তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরের জন্যে আবুল হাসানকে দিয়ে তসবির আঁকাচ্ছেন —আবার হয়তো দেখা যাবে তাঁর প্রিয় কাবুলি পিচ ফলের চারা বসাচ্ছেন হায়াত-বকস্ বাগে।

মা বাবার কথার মাঝখানে সুলতান মহম্মদ দারাশুকো জানতে চাইলো, এই গাছ কি তখনো ছিল বাবা?

খুররম বুঝতে পারলেন না কোন্ গাছের কথা বলছে দারা। কোন্ গাছ?

—যেখান থেকে আকবর বাদশা সিক্রি রওনা হন—সেখানকার ওই গাছ—ওসব তখনই ওখানে ছিল? না, পরে হয়েছে?

—এ তো হাজার আশরফির সওয়াল বেটা! তখন গাছগুলো ওখানে ছিল? না, পরে ওরা পয়দা হয়েছে? দ্যাখো বেগম এইটুকু ছেলের মুখে কত মগজদার কথা!

বলতে বলতে দারাকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে শাহজাদা খুররম বললেন, সে তো অনেককালের কথা বেটা। সেকালের কোনো গাওহাই বেঁচে থাকলে তাঁর কাছ থেকে জেনে তোমায় বলবো।

সামনে একদল সওয়ারের ঘোড়ার ক্ষুরের ধুলো। পেছনেও তাই। মাঝখানে ইংলিশস্তানের ধাঁচে আগ্রা দুর্গের কামারশালে কামার আর ছুতোরদের হাতে তৈরি চমৎকার এই আট ঘোড়ার গাড়িতে পাশাপাশি বসে শাহজাদা খুররম আর তার বেগম আরজুমন্দ বানু। তাদের মুখোমুখি বসে জাহানারা আর তার ভাই দারাশুকো।

রাস্তা বলতে লালচে পাথুরে ধুলোয় ঢাকা পাথুরে মাটি। তার দু'ধারে পাঁশুটে রংয়ের মরা ঘাস। ঘাসের ভেতর থেকে কোথাও কোথাও পাথর জেগে আছে। আর এলোপাথাড়ি বাবলা গাছ। শোভা বলতে ধু ধু প্রান্তরে ছাড়া গরু মোষের ভেতর রঙিন ইরাকি ঘোড়া—আর কাঁটালতা চেখে বেড়াবার লোভে ঘুরে বেড়ানো উটের পাল। মানুষ বা রাখাল—যা দু'একজন ছিল—তারা শাহী ঘোড়সওয়ার দেখে ছুটে গা ঢাকা দিলো। টিলার আড়ালে। নয়তো কাঁদড়ের ঢালে নেমে গিয়ে।

দূরে দূরে পোড়ো বাড়ি। গড়। কোনোটা বা মক্তব। একটা ভাঙা ছাউনি দেখে মনে হবে—বুঝি বা জলসত্র।

সূর্য যখন মাথার ওপর—তখন ওরা গাড়ি থেকে নামলেন। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন দাখিলা ছুটে গিয়ে বালু পাথরের ধুলোমাখা এক পোড়ো প্রাসাদের চত্বরে দস্তরখানা পেতে দিলো। সমরখন্দের লাল বুক তরমুজ—সেই সঙ্গে সিরাজি।

গলা ভিজিয়ে নিয়ে বেগম আরজুমন্দ বানু শাহজাদাকে বললেন, ছোট মত বাড়িটা কাদের? কারা থাকতেন?

খুররম কয়েকটা সাইপ্রাস গাছের ভেতর দিয়ে একটা পোড়ো ছোট বাড়ি দেখে বললেন, আমি পয়দা হওয়ারও চার পাঁচ বছর আগে দাদাসাহেব

এ-জায়গা ছেড়ে আগ্রা ফিরে যান। সব জায়গা চিনি না। খুব ছোটবেলায় আকবর বাদশার এই সাধের নগরীতে একা একা ঘুরেছি অনেক। মনে তো হচ্ছে—ওটা উজিরসাহেব আবুল ফজল আর তাঁর ভাই ফৈজির বাড়ি। যাবে নাকি ?

—না। এখন নিশ্চয় ওখানে সাপের আড্ডা।—বলতে বলতে আরজুমন্দ বানু বিস্ময়ে সেই বাড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন। শাহজাদা খুর্রম স্বাদু তরমুজ খেয়ে হাত মুছলেন মসলিনে। কী মনে হতে সবার অলক্ষ্যে নিজের দুই হাতের কাছে নাক এগিয়ে আনলেন। নাঃ! আপেলের গন্ধটা উবে যায়নি—

তখন আটটা সাদা ঘোড়াকে রোদে দাঁড় করিয়ে দাখিলারা চান করাচ্ছিল। শাহজাদা ধুলোমাখা ঘোড়া পছন্দ করেন না।

দারাশুকো কোত্থেকে দৌড়তে দৌড়তে এসে খুর্রমের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সারা হিন্দুস্থানে এ-কাজ করতে পারে শুধু আরেকজন। সে জাহানারা। দূরে—বেশ দূরেই—শাহজাদা দেখতে পেলেন—জাহানারা এখন একা একা এই পোড়ো প্রাসাদের এক স্তম্ভ থেকে আরেক স্তম্ভে ছুটে ছুটে গিয়ে একমনে খেলছে।

দারার শরীরটা নিজের বুকের কাছে টের পাচ্ছিলেন খুর্রম। একমাথা চুল। ঘন কালো চোখ। তাতে জানবার আকাঙ্ক্ষা ছায়া ফেলেছে। এখুনি হয়তো একের পর এক জানতে চাইবে—এই শহরটা কার আব্বাজান ? এখানে কোনো মানুষ নেই কেন ? যদি না কেউ থাকে—তবে বানানো হয়েছিল কেন ?

নিজের ছেলের জন্যে গর্বে মনটা ভরে উঠলো শাহজাদার। দূরে প্রায় শুকিয়ে আসা দীঘিতে তিনটে পানকৌড়ি একসঙ্গে বহু উঁচু থেকে ঝুপ করে ঝাঁপ দিলো। একাকী একটি ময়ূর পাখা মেললো। ওর নাচ দেখতে আর কি কেউ এখানে আছে ? রিসালার ঘোড়সওয়াররা যে-যার ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গাছতলায় বসে।

—ওই বুঝি সেকেন্দ্রা ?

আরজুমন্দের এ কথায় চোখ তুলে তাকালেন খুর্রম। দূরে আবছা মতো গম্বুজ। দুটি হাতি বিরাট নিতম্ব ভাসিয়ে আনমনে নিঃসঙ্গ প্রান্তর দিয়ে সেদিকে চলেছে। শাহজাদা অস্ফুটে বললেন, এখান থেকে তো দাদা-সাহেবের সমাধি দেখতে পাওয়ার কথা নয়—

—ওই গম্বুজ তাহলে কিসের ?

—পাঁচমহল সমাধির গম্বুজই তো দেখছি।

—তাই-ই হবে শাহজাদা। অনেকদিন তো আসা হয়নি তোমার এদিকে। তাই ভুলে গেছো।

শাহজাদা খুর্রম চুপ করে থাকলেন। তারপর এক সময় বললেন, ঘর গেরস্থির আলো মুসাফিরকে টানে। রাজমুকুটের হীরার রোশনাই সারা দেশকে আলো দেয়। একসময় এই ফতেপুর সিক্রি সারা দুনিয়ার বুজুর্গদের

এখানে টেনে আনতো আরজুমন্দ—

আরজুমন্দ বানু কোনো কথা না বলে চুপ করে থাকলেন। সামনেই বুলন্দ দরওয়াজা। সাতটা হাতি সেই তোরণ দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে ভেতরে যেতে পারে। চারদিক দেখে মনে হচ্ছিল—এই নগরী যেন কালই তৈরি হয়েছে। শুধু এখানে সেখানে জংলা লতার ভিড়।

—জানো বেগম—দাদাসাহেবের তখন কথা বন্ধ হয়ে গেছে। তবুও আব্বা হুজুর তাঁর সামনে আসতে পারছেন না।

—কেন ? কেন ?

—আব্বা হুজুর তখন শাহজাদা সেলিম। এলাহাবাদের সুবেদার। দশ হাজারী মনসবদার। আসবেন কি! আগ্রার বিরুদ্ধে লশকর নিয়ে বাগী হয়েছিলেন যে!

—তুমি কী করলে শাহজাদা ?•

—আমি মনে মনে তখন খুবই নাজুক ছিলাম বেগম। আকবর বাদশার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো—যতক্ষণ আছেন—কিছুতেই ওঁকে আমি ছেড়ে যাবো না।

—এই তো খাঁটি ইমানদারের মতো কথা।—বলে আরজুমন্দ বানু শাহজাদার মুখে তাকালেন। বড় বড় কালো চোখ। লম্বা চওড়া এই ইনসান আমারই খসম। গর্বে, আনন্দে বেগমের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো।

আরজুমন্দ আর খুর্রম অনেকদিন পরে পাশাপাশি হাঁটছিলেন। চারদিকে নিস্তব্ধ নগরীর নির্ভুল, তকতকে অথচ অতিকায়, শূন্য সব চেহারা। তার ভেতর জীবন, তাগদ, রূপের জিন্দা দুই মূর্তি শাহজাদা আর তাঁর বেগম যেন ঝলসে ঝলসে উঠছিলেন। তাঁরা নিজেরাও তা জানেন না। জানলো ফতেপুর-সিক্রি।

চোখের সামনে ফতেপুর-সিক্রির প্রাণ—মহল-ই-খাস। সেদিকে তাকিয়ে খুর্রম বললেন, সমরখন্দে দিলখুশ প্রাসাদে থাকতেন তৈমুর। আর আকবর বাদশা থাকতেন এই মহল-ই-আমের খাআ-অবু-বাগে।

আরজুমন্দ ফিরে দাঁড়ালেন। ইনসান কেন ইমান হারিয়ে বাগী হয় শাহজাদা ?

চোখ নামিয়ে নিলেন খুর্রম। ওসব কথা থাক বেগম। কান্দাহার থেকে কামরূপ—কাশ্মীর থেকে আহম্মদনগর—এই বিশাল হিন্দুস্থানে কোথায় কে কেন কী করছে—তার জবাব এক খোদাই দিতে পারেন।

যে খতম করে—আর যে খতম হয়—দু'জনের ভেতর একই স্রোত বয়ে চলেছে—তা হলো জীবন।

শাহজাদা খুর্রম বলে উঠলেন, দ্যাখো দ্যাখো—ওই দ্যাখো।

আরজুমন্দ বানু চোখ তুলে দেখলেন, দূরে মহল-ই-খাসের চত্বর থেকে উপরে উঠে যাওয়া দুই স্তম্ভের মাঝখানে পাথরের শূন্য আসনে তাঁরই ছেলে মহম্মদ দারাশুকো বসে। তার উষ্ণীষের সরবন্ধে ময়ূরের কুড়িয়ে পাওয়া পালক

বসানো। দিদি জাহানারা ঝুঁকে পড়ে খেলার রাজাকে কুর্নিশ করছে।

আরজুমন্দ বানুর বুক কেঁপে উঠলো। প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, উঠে এসো—

খুর্‌রম বাধা দিলেন। কেন? বেশ তো দেখাচ্ছে। বসুক না—

—না। উঠে এসো।

—কেন বেগম? একদিন তো হিন্দুস্থানের মসনদে দারা বসতে পারে—পারে কেন? সে-ই আমার—

কথা শেষ করতে পারলেন না শাহজাদা খুর্‌রম। তার কথার মাঝেই আরজুমন্দ বলে উঠলেন, মসনদ মানেই তো হুকুম, হামলা, বেইমানি, খুন—

গর্জে উঠলেন খুর্‌রম। চুপ করো। চুপ করো বেগম—

—আব্বা হুজুরকে দেখছি। দেখছি আমার দাদাসাহেবকেও! ওঁরা মসনদকে ঘিরে দিনরাত শলা করে চলেছেন। সবার সামনে সব কথা কখনোই বলতে পারেন না আমার আব্বা হুজুর। এই তো মসনদ!

—তোমরা ইস্পাহানিরা বড় বেশি দূর দেখতে পাও আরজুমন্দ। মসনদ মানে তাগদ, জোস্, রোশনি, খোয়াব—

ঘুরে দাঁড়ালেন আরজুমন্দ বানু বেগম। চিবুক, কালো চুলের বাইরে বেরিয়ে থাকা গ্রীবা, চোখের পল্লব—সব নিয়ে বেগমের মুখখানাই যেন এই পরিত্যক্ত ছাই রং বালু পাথরের মহল-ই-খাস প্রাসাদের নির্জনতায় আমূল গেঁথে যাওয়া একখানা কারাদ ছুরি। সুন্দর। যুক্তিতে নিষ্ঠুর। সত্যে ভয়ঙ্কর। বেগম শান্ত গলায় কেটে কেটে বললেন, খতমের তাগদ! কোতলের জোস্!! সারা জীবন বন্দী করে রাখার খোয়াব!!! অন্ধ করে রাখার রোশনি!!!! তাই না শাহজাদা?

—কী হয়েছে তোমার আরজুমন্দ?

বেগম আরও কী বলতেন। বলতে পারলেন না। দারা আর জাহানারা দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে আসছে। দুটি জিন্দা ফুল। লাল পাথরের ঘেরাওয়ের মাঝে দাঁড়ানো বিশাল ছাই রংয়ের এই মহল-ই-খাসের বাইরেই লুকিয়ে আসা দীঘি থেকে একটি কালো পাখি আকাশে উঠলো। একটি কিশোর গোলাম খুব মন দিয়ে পরিপাটি করে দস্তরখানা তুলছে। তুলতে তুলতে গুন গুন করে আগ্রার রাস্তার কাওয়ালির কলি ভাঁজছে। চাপা গলায়। খেয়াল নেই কাছে-পিঠেই শাহজাদা আর তার বেগম দাঁড়িয়ে। আগ্রা দুর্গে এমনটি হলে সে তো এক মহা বেতমিজি!

আরজুমন্দের আর কিছু বলা হলো না। মনে মনে তিনি নিজেকেই বললেন, আম আতরাফ—সাধারণ মানুষের জীবন কত সামান্য, সাধারণ—আমাদের মতো মানুষ একটি হুকুমে তা যে কোনো চরমে ঠেলে দিতে পারে। তবে কেন এই জীবনে ঢেউ ওঠে?

দারা ছুটে এসে শাহজাদা খুর্‌রমকে দুই হাটুতে জড়িয়ে ধরলো। জাহানারা সামান্য পিছিয়ে পড়েছিল। ঠিক এইসময় মহল-ই-খাসের সামনে

ভিড় হয়ে গেল। যেন সারা খারাতপুরা ঝেঁটিয়ে ভিখারিরা চলে এসেছে। কোত্থেকে ওরা খবর পায়? বুঝে উঠতে পারেন না শাহজাদা খুর্‌রম।

এইদিনই রাতে জনা বারো ঘোড়সওয়ার আগ্রার শহরতলিতে বিয়ানায় পোড়ো গড়ের সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামলো। হিন্দুস্থানের এদিকটায় এইসময়ে আশমান আর জমিনের ভেতর থাকে শুধু শীত। কান গলা ঢাকা দেওয়া সওয়ারদের মাথা গিয়ে সিংদরজায় দাঁড়াতেই চার পাহারা বন্দুক তাগ করলো।

—আহা! করো কী? এই দ্যাখো বাদশাহী মোহর লাগানো জরুরি হুকুম।

পোড়ো গড়ের পাহারা রাজপুত সেপাই ঘুম চোখে বললো, এত রাতে কী এমন জরুরি? কাল রোদ উঠলে এসো। তখন দেখা যাবে।

—নাহে ভাই—তা হয় না। জরুরি বলেই তো গভীর রাতে এই শাহী হুকুমনামা—

আগুন পোহাবার আগেনগার থেকে লম্বা লম্বা শিখা উঠে পাহারাদার চার রাজপুতের লম্বাই চওড়াই চেহারা গাঢ় অন্ধকারের ভেতর মাঝে মাঝেই কুঁদে দিচ্ছিল। হাতে নিশানদার বন্দুক।

—এটা অনু রায়ের ডেরা। এখানে সব হুকুমনামা চলে না। যাও যাও! কাল ভোরে এসো—

ঘোড়সওয়ারদের মাথা বুঝলো, এখানে মেজাজ দেখালে উল্টো ফল হবে। গাজোয়ারি করতে গেলে গড়ের ভেতর থেকে পিল পিল করে গোঁয়ার রাজপুত সেপাই বেরিয়ে আসবে। নরম গলায় দেহাতি অবধি টানে সওয়ারদের পাণ্ডা বললো, মুঘলশাহীতে সওয়ারিগিরি করাই ঝকমারি। সারা রাত এখন ঘোড়ার পিঠে বসে কাটাতে হবে। খালি হাতে ফিরলে তো মুণ্ডুটি যাবে—

—দাও দেখি হুকুমনামাখানা। পাঞ্জা টাঞ্জা আছে তো?

—ওই তো দ্যাখো—বড় করে বাদশার পাঞ্জার ছাপ—

এ কথায় একেবারে সামনের তাগড়া রাজপুত আগেনগারের শিখার কাছে গিয়ে আলোয় হুকুমনামাখানা মেলে ধরলো। দেখবার জন্যে। যেভাবে ধরেছে —বোঝাই যায়—এক বর্ণও পড়তে জানে না।

ঘোড়সওয়ার ছুটে এলো, কর কী? কর কী ভাই? পুড়িয়ে ফেলবে শেষে বাদশাহী হুকুমনামা। আমার মুণ্ডু তো যাবেই—তোমারও যাবে—

—গেলে তোমার যাবে। আমাদের অত সহজে যায় না। আমরা হলাম গিয়ে অনু রায়ের লশকর।—যাই কর্তাকে গিয়ে ঘুম থেকে তুলি।—বলে সেই সেপাই সিংদরজা গলে ভেতরে গেল। হাতে শাহী হুকুমনামা। বাইরে তিন পাহারা বন্দুক তাগ করে দাঁড়িয়ে থাকলো। সিংদরজাও বন্ধ হয়ে গেল।

শীতে ঘোড়াগুলো অস্থির হয়ে উঠেছে। সওয়াররা অন্ধকারের ভেতর যে যার কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। সেখানে আকবরী পিস্তলের পাশাপাশি কারাদ

ছুরি আর বিরছা কুড়ুল ঝুলছে। যে কোনো অবস্থার জন্যে তৈরি হয়েই ওদের আসা।

অন্ধকার প্রান্তরে দূরে দূরে রাত-চরা পাখির ডাক। ঘোড়াদের পা বদলানোর ঠকাঠক। শেষে দরজা খুললো। সেই তাগড়া রাজপুত বেরিয়ে এসে চাপা গলায় বললো, কর্তা আসছেন।

অনু রায় ভালো করে পড়লেন হুকুমনামাখানা। শাহী পাঞ্জার ছাপ জাল কিনা তাও পরখ করলেন বারবার। তারপর তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো—ইরানি মাগীর অসাধ্য কিছুই নেই—

ধরাচুড়ো পরে তৈরি হতে আরও সময় লাগলো অনু রায়ের। ফের হুকুমনামাখানা পড়লেন তিনি।

শাহজাদা খসরুকে এখনই শাহীমহলে পাঠাতে হবে।

কথাগুলোর নিচে বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীরের পাঞ্জার ছাপ মোহর করা। সারাদিন চলে গেল—তখন না হুকুম দিয়ে এত রাতে ঘোড়সওয়ার পাঠানো কেন? কী মতলবে? অন্ধ মানুষকে কেউ কি দুপুর রাতে তলব করে? নিশ্চয় কোনো গোলমাল আছে—

ভাবতে ভাবতে অনু রায় মশালচীদের তলব করলেন। তারা মশাল হাতে চলন্ত পাথরমূর্তি হয়ে এগোতে লাগলো। অনু রায় নিজেকে বললেন, এ নিশ্চয় ইস্পাহানি কুত্তির বুদ্ধি। বর্ধমান থেকে আগ্রায় এসে যেদিন থেকে ভর করেছে সেদিন থেকেই শাহী মগজে উল্টো পাল্টা কাণ্ড শুরু হয়ে গেল!

বাইরে বেরিয়ে এসে অনু রায় মশালের আলোয় ভালো করে দেখলেন ঘোড়সওয়ারদের। কোনু তাবিনের বোঝা যাচ্ছে না। ষাট হাজারী মনসবী নূরজাহানের? না, খোদ বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীরের?

—এত রাতে তো শাহজাদা খসরুকে পাঠাতে পারি না। তিনি অন্ধ।

—যোগ্য সম্মানেই তাঁকে আমরা নিতে এসেছি। সঙ্গে সুখদোলা রয়েছে—রয়েছে আট বেহারা—

—তারা কোথায়?

—ঘোড়সওয়ারদের পাণ্ডার বুক কেঁপে উঠলো। এখন যদি সুখদোলা দেখতে চায়? যদি বলে—বেহারাদার ডাকো? কিন্তু থেমে থাকবার উপায় নেই। আগ্রায় সবাই জানে অনু রায় কতটা গোঁয়ার। অনু রায়কে খোদ বাদশা কতটা বিশ্বাস করেন। এখন যদি সুখদোলা আর তার বেহারাদের দেখাতে না পারে তো অনু রায় সিধে তলোয়ার বের করবে।

সওয়ারদের পাণ্ডা বললো, ওই তো গাছতলার অন্ধকারে বসে।

অনু রায় বললো, শাহজাদা অন্ধ মানুষ। তাঁকে এই অন্ধকারে জেনে শুনে আমি পাঠাতে পারি না।

—বাদশাহর হুকুমনামায় এখনই তাঁকে শাহীমহলে পাঠাতে বলা হয়েছে—

—শাহী হুকুমেই আমি শাহজাদা খসরুর 'আতালিক'। মুরুব্বি, আতালিক হলে ভালোমন্দর একটা দায়িত্ব তারও থাকে।

—আমরা হুকুমবরদার মাত্র। শাহী হুকুমে—

ওদের কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে অনু রায় বললো, সূর্যাস্তের পর শাহানশাহর হুকুমনামায় কোনো কাজ হয় না।

ঘোড়সওয়াররা অন্ধকারে যেমন এসেছিল—তেমন অন্ধকারেই তারা ফিরে গেল। মাথা নিচু করে।

নুরজাহান বেগমের কড়া শাসনে দিনের বেলা সাধারণত আলা হজরত ধাতে থাকেন। রাত হলে অন্য কথা! আর এ হুকুমনামা তো রাতেরই। তাই—

আসল ব্যাপারটা বুঝতে অনু রায়ের দেরি হয়নি।

।। নয় ।।

সন্ধ্যার আগ্রা একেবারে আলাদা। সূর্যাস্তের পর হামামের দুয়ার বন্ধ হয়ে আসে। এই শীতের আমেজ পুরোপুরি ভোগ করতে রীতিমত রইসদের জন্যেই শুধু হামামের দু'একটা ঠেক অবশ্য খোলা থাকে। সেখানে ধোঁয়া ওড়ানো গরম জলে গলা ডুবিয়ে চাঙ্গা হয়ে কোনো কোনো মনসবদার কিংবা গেঁহুর কারবারি কানে আতর গুঁজে নিজের নিজের শখ আহ্লাদের জায়গায় যায়। নয়তো পাঁচ ছ'লাখ মানুষের হিন্দুস্থানের এই রাজধানীর প্রায় সবাই শীতে কাঁটা হয়ে দোর বন্ধ করে ঘরেই থাকে।

সারাদিন পাথর কাটাই ধুলোর ভেতর নিঃশ্বাস নিয়ে নিয়ে বসরার নসরত খাঁ এই সময়টায় হামামে ঢোকে। সঙ্গে বিষণ। বাইরে এই গোলামের হাতে কুর্তা কামিজ জিম্মা করে নসরত খাঁ হামামের ভেতর ধোঁয়া ওড়ানো জলে গিয়ে নামলো। বসরা থেকে নতুন কাজের ভার নিয়ে হিন্দুস্থানে আসার আগে সে জানতোই না—আগ্রায় এত ধুলো।

বেশি মাসোহারার লোভে খারোসানি, তাতারি, তুরানি মেয়েরা এদেশে খুব আসছে। পাথরের দেওয়ালের ফুটো দিয়ে গরম করা জল এসে শান বাঁধানো জায়গাটায় পড়ছিল। তার ধোঁয়ায় জায়গাটা আবছা। যেন ছোট্ট ঘরে মেঘ করেছে। এর ভেতরে দু'জন তাগড়া খারোসানি নসরত খাঁকে আচ্ছা করে করে রগড়াতে লাগলো। এক এক রগড়ানিতে নসরত খাঁয়ের গা থেকে পাথর কাটাইয়ের ধুলোর পরত উঠে আসছিল। তাতে নসরতের চামড়ার আসল ইস্পাহানি রং ফুটে উঠলো।

নসরত খাঁ শান বাঁধানো জায়গায় গরম জলে গা ডুবিয়ে শুয়ে দেখছিল—খারোসানি মেয়েদের গায়ে কী ভীষণ জোর। তার মতো তাগড়াকে দু'জনে মিলে রগড়াচ্ছে? না, বাচ্চা ছেলেকে মালিশ দিচ্ছে? —তা বোঝার উপায় নেই। তাকে নিয়ে এই মেয়ে দুটো যেন খেলছে। মুলতানি মাটি দিয়ে ডান পাশের মেয়েটি তাকে ঘাড় ধরে ঘষছিল। আরামও লাগছে—আবার একটু ব্যথাও লাগছিল নসরত খাঁয়ের। তার মনে হলো—এই তাগড়া দুই খারোসানি কি জানে—তাদের হাতের নিচে রগড়ানি খাওয়া এই মানুষটিই রাজধানীর

সবচেয়ে বড় দেখার জিনিস—আগ্রা দুর্গ বানাচ্ছে—দুর্গের মাথায় যমুনার দিকে সামান বুরুজ তৈরি করাচ্ছে পাথর কেটে—আজ দু'বছর ধরে? বানানো হয়ে গেলে ওখানে উঠে হপ্তচৌকির পাহারাদার গোয়ালিয়র, আজমির, দিল্লি এমনকি যমুনার দিকেও বহুদূরে অব্দি দেখতে পাবে। দেখে কামানের নল সহি সহি তাগ করতে পারবে।

মুলতানি মাটির একটা আলাদা গন্ধ আছে। যমুনার পাড়ে ভিজে মাটিতে আপনা আপনি ফুটে থাকা কিছু বুনো ফুলেও এ গন্ধ পেয়েছে নসরত খাঁ। আজ হাতে সময় কম। নইলে ককমকে গোলার সঙ্গে গাছনি মাটি মাখিয়ে মাথাটা ধোলাই করে দিতে বলতো সে। এটা করলে তাহলে আর খামোকা মাথার চুল হেনা করার দরকার পড়ে না।

তাগড়া ধবধবে শরীরে কুর্তা কামিজ মানিয়েছে বেশ। এবার বিষ্ণু তার কর্তার পায়ে নাগরা গলিয়ে দিয়েই ছুটে গিয়ে বাইরে দাঁড়ানো টাঙার সামনে বসলো। এটা হলো গিয়ে নসরত খাঁয়ের খবরদারি টাঙা। দেওয়ানখানা থেকে মঞ্জুর হয়ে আসা। এটায় চড়ে সারাদিন সে পাথর কাটাইয়ের বেলদারদের ভেতর তরফদারি করে বেড়ায়।

আগ্রার রাস্তা দিয়ে টাঙা ছুটতে ছুটতে এগোচ্ছে। সন্ধেবেলা এই শীতের ভেতরেও গোকুলা আর সেঁউতির গন্ধ বাতাসে। ঘোড়ায় ছপটি মারছে যে লোকটি তার পাশে বসে বিষ্ণু। পেছনে তাকাবার উপায় নেই তার। সাদা কুর্তা কামিজের ওপর সাদা তুষ গায়ে জড়িয়ে নসরত খাঁ একেবারে মূর্তিটি হয়ে বসে। লালচে সাদা মুখের ভেতর কালো চোখ সুরমার টানে আরও স্পষ্ট—ঝকঝকে।

দিল্লিমুখো শাহী সড়ক থেকে বাঁহাতি আক্কেলদমা চক পেরিয়ে টাঙা এসে নামতেই সরু গলির দু'ধারের ঘন বারান্দায় হই হই পড়ে গেল। এ টাঙা এখন অনেকক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে।

বিষ্ণু একলাফে নেমে নসরত খাঁয়ের হাতে আগে থেকে কিনে রাখা মালা গুঁজে দিলো। এদিকে এলে এটাই তার কাজ। সেই গভীর রাতে ফিরে বিষ্ণুই সবচেয়ে আগে নসরত খাঁয়ের সামনে গরম জল এগিয়ে দেয়।

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কিঙ্গিনার বাজনা কানে এলো। সঙ্গে, কাওয়ালির ঝোঁক। দোরের চিলমন সরিয়ে ভেতরে ঢুকে অবাক হলো নসরত খাঁ।

আগ্রাওয়ালি রেহানার সামনে দুই ফিরঙ্গি বসে। চেহারায় রীতিমত সম্ভ্রান্ত। একজনের মাথায় বেশ টাক। গালিচায় বসে সে তার নৌকো মতো টুপি রেখেছে পাশে। কথাও বলছে সে ফুলঝুরির মতো। কখনো ইংলিশস্তানি জবানে। আবার কখনো আগ্রার খাড়ি বোলিতেও। তার পাশে বসা অন্য ফিরঙ্গি কিছুটা তামাটে আর রোগা। গায়ে পা অব্দি বাকু। মাথা ভর্তি কালো চুল। উসকো খুসকো। কথা বলছে অল্প। ইংলিশস্তানির সঙ্গে মিশেল দেওয়া পাটনাই লবজে।

রেহানা বাই সহবত মতো খাতির করে বসালো নসরতকে। সোনালি চাঁপা ফুল রঙের ওড়না মাথার কাছে তুলে আঙুল মটকে রেহানা বললো, এবার তাহলে শুরু করা যাক? —বলতে বলতে সে কিঙ্গিনা, রবাব-ই-দখন গুছিয়ে গাছিয়ে রাখছিল।

টেকো ইংলিশস্তানি আগ্রাই সহবতে মাথা ঝুঁকিয়ে বললো, আগে একটু আলাপ পরিচয় হোক—রাত তো এখনো বহুত বাকি—সবে সন্ধে—

পাল্টা ঝুঁকে পড়ে নসরত খাঁ তার নাম বলে জানালো, আমি আগ্রা দুর্গের হাতিপোল দরওয়াজার মাথায় আজ ক'বছর ধরে সামান্য বুরুজ বানাচ্ছি। বলতে পারেন আমি একজন বেলদার পাথর কাটাইওয়ালা—

—টু মোডেস্ট নসরত খাঁ! আপনি আরকিটেক্ট ভি হ্যায়—ফিন্ কারিগর ভি হ্যায়—

—যা বলেন। —বলে খুব বিনীত গলায় নসরত খাঁ বললো, আমি ইস্পাহানে কাজ শিখে বসরায় ছিলাম আট বছর। তারপর যাই সমরখন্দ—

—সেখানে কেন?

—ওখানে কানিবুল বাগে তৈমুর একসময় তাঁর ছয় নাতির বিয়ে দেন। তা সেই বাগের পাথরের ফোয়ারাগুলো ফিরে বানালাম। —তারপর—

—তারপর সমরখন্দ থেকে আগ্রায়—সামানবুরুজ বানাচ্ছেন। —বেশ তৃপ্ত গলায় গমগমে ভরাট হাসি হেসে টেকো ইংলিশস্তানি বললো, আই অ্যাম স্যার টমাস রো—

—আমার কী সৌভাগ্য। আপনিই ইংলিশস্তানের ইলচি।

মাথা ঝুঁকিয়ে স্যার টমাস পাশের তামাটে মতো লোকটিকে দেখিয়ে বললো, ইনি জনাব গেলিনসেন। দুনিয়াদারি করা মানুষ। পর্তুগালের মুসাফির!

গেলিনসেন মাথা ঝোঁকালো।

স্যার টমাস বললো, আমাদের লণ্ডন টাওয়ারও খুব উঁচু। তবে তা চারকোণা মতো।

নসরত খাঁ বললো, আগ্রা দুর্গের এই সামানবুরুজও খুব উঁচু অব্দি তোলার কথা মাথায় রেখেছি। ছ'কোণা মতো হবে—

—দেখেছি—

—সবই দেখুন সহি সহি পাথর পাওয়ার ওপর নির্ভর করছে। এমনভাবেই তৈরি করছি—বাদশার হুকুম যা—ওখান থেকে বহুদূরের দুশমনকে যেন দেখা যায়।

তবকমোড়া বিলকুলি পানের ফতেপুরিয়া ডিবাটি এগিয়ে দিয়ে আগ্রাওয়ালি রেহানা বললো, কী ধরবো?

পর্তুগিজ মুসাফির, গেলিনসেন এই গানেওয়ালির সাজপোশাক দেখছিল। ঘরে জেবলে দেওয়া অভ্রের বাতিদানের আলোয় রেহানা জ্বলজ্বল করছে। বড়জোর তিরিশ। কোলের কাছে, রবাব-ই-দখনের তারে চেপে বসা আঙুলের

ডগাগুলোও খয়েরি রঙে রাঙানো।

নসরত খাঁ একটা পান মুখে গলিয়ে দিয়ে বললো, একটা তানসেনি সিন্ধু-কানহারা ধরতে পারো বাই—

তারে আঙুল বুলিয়ে ঝনঝনা তুলে রেহানা বললো, ওরে বাবা! তানসেন? এখানে? কখনো না।

—কেন? কী হলো বাই? কানহারার চুটকিলা তোমার গলায় খুব খোলে—

নসরতের এই অনুরোধেও আগ্রাওয়ালি রেহানাকে টলানো গেল না। সে বললো, উঁহু। আর তিনখানা কোঠা পেরোলেই রসুলনের ঘর। ওখানে বিলাসখান আসেন। মাঝে মধ্যে তাঁর ভাই সুরতসেন আসেন। কিঙ্গিনা বাজে। ওঁরা গান করেন। তালিম দেন। একদিন ভোরে ঘুম ভাঙলো বিলাসখানি টোড়িতে। সে যে কী আনন্দ হলো মনে—তা কি বলবো খাঁ সাহেব—খোদ মিঞা বিলাসখান গলা ছেড়ে গাইছিলেন।

—হু ইজ দিস বিলাসখান?

—মিঞা তানসেনের ছেলে। তাঁর ছোটভাই সুরতসেনের জমজমা শুনেছি টমাস সাহেব। খুব ঘন আর মিঠাজ—

নামগুলো পর পর শুনে পর্তুগিজ মুসাফির গেলিনসেনের মাথাটি বিলকুল ঘুরে গেছে। সে গম্ভীর হয়ে জানতে চাইলো, তানসেন? সুরতসেন? আমি নিজে গেলিনসেন। কত পর্তুগিজ এদেশে এসেছে?

হো হো করে হেসে উঠলো স্যার টমাস। এঁরা কেউ পর্তুগিজ নয় গেলিনসেন। তানসেনের নাম এদেশে যেখানে যাও শুনতে পাবে। আকবর বাদশার কোর্ট মিউজিশিয়ান ছিলেন। তাঁরই ছেলে সুরতসেন।

গেলিনসেন হেসে ফেললো। ততক্ষণে আগ্রাওয়ালি রেহানা আলাপ শুরু করে দিয়েছে। শীত আটকানোর ভারি পর্দা সরিয়ে কিঙ্গিনার বাজনদার কখন এসে বাজাতে বসে গেছে। ওদিকটায় আলো কম।

দরশ বিন নিরাশ সব লাগে-এ-এ

চোখ বুজে এসেছে রেহানা বাইয়ের। রবাব-ই-দখনের তারে আঙুল চলছে আপনা আপনি। কিঙ্গিনার তারে ফুটে উঠছে—দেখতে না পাওয়ার নিরাশা। একটি কলিই রেহানার গাঢ় গলায় ফিরে ফিরে আসছে।

নসরত খাঁ সমঝদারি গলায় বললো, সাচ্চা সিন্ধু—ওস্তাদ নায়েক বখশুর ঘরানা।

সামান্য চোখ বুজে রেহানা আলাপের মধ্যেই আরও সামান্য হাসলো। তার মানে ঠিকই ধরেছেন।

স্যার টমাস প্রশংসার চোখে নসরত খাঁকে চাপা গলয়ে বললো, আপনি পাথর বোঝেন—আবার মিউজিকও বোঝেন—

আলাপের রস চোখ বুজে নিজের শরীরে শুষে নিচ্ছিল যেন নসরত খাঁ। সেই অবস্থাতেই বললো, এ আর এমন কি ইলচিমশায়! আপনি ইংলিশস্তানের

হয়ে হিন্দুস্থানে ব্যবসা বোঝেন—আবার আমাদের গানও বোঝেন—আমাদের জবানের কদরদারিও করেন। তাই না ?

পর্তুগিজ মুসাফিরের দু' চোখ খোলাই ছিল। সে চাপা গলায় বললো, যে-দেশে সাধারণ মানুষ যত কষ্টে দিন কাটায়—বেঁচে থাকে—সে-দেশে মাথার ওপর কিছু মানুষ থাকবেই যারা ওইসব মানুষের মাথায় বসে সূক্ষ্ম কাজে বহুদূর এগিয়ে যায়—

স্যার টমাস কিছু বুঝে উঠতে পারে নি।—তার মানে ?

—সাধারণের খাটুনি থেকে আরাম, আয়েস যোগাড় করে কিছু মানুষ সঙ্গীত, শিল্পে ঝুঁকে পড়ে—সে সঙ্গীত হয়ে ওঠে মহান। লুক অ্যাট দ্য সার্ফস। সেখানকার চাষীরা জমিতে জোতা গোলাম—হুবহু হিন্দুস্থানের মতোই।

নসরত খাঁয়ের কেমন সন্দেহ হলো। মুসাফিরের ছদ্মবেশে এ লোকটা ইস্পাহানের সফেদি শাহীর গুপ্তচর নয়তো। হিন্দুস্থানের শাহী কেতার দুশমনী করে কথা বলছে যেন—

স্যার টমাস রো বললো, ঠিক বুঝলাম না। —মনে মনে বললো, ইংল্যাণ্ডের শেরউড জঙ্গলে এক চোরাগোপ্তা হরিণ শিকারী ধরা পড়ে ঠিক এমন সুরেই কথা বলেছিল।

গেলিনসেন বললো, আমি সারা হিন্দুস্থানে ঘুরেছি। ঘুরেছি ইউরোপে। মধ্য এশিয়ায়—

—তুমি একজন ট্রাভেলার গেলিনসেন। তুমি মুসাফির। ঘুরে তো বেড়াবেই।

—এদেশে চাষীরাই সমাজের সবচেয়ে বড় অংশ। তারা পোলিশ সার্ফদের মতোই গেঁহু, ধান লাগায়। তাদের খাটুনির ওপর কেষ্ট বিষ্টুরা নিজেদের জীবন, মর্যাদা, শিল্প বজায় রাখে। ফসলের তিনভাগ যায় জায়গিরদার, মনসবদার, শাহী খাস খাজানাখানায়। একভাগ পায় চাষী। যারা তিনভাগ পায়—আরাম পায়, আয়েস পায় তারাই। তারাই গান শোনে স্যার টমাস—তারাই গান গায় নসরত খাঁ—সে-গান—সেই পাথরের শিল্প তো মহান হবেই। পোলিশ সোনেটা শুনেই আমি বুঝতে পারি পোলিশ চাষীরা কেমন আছে—

নসরত খাঁয়ের মুখের ভেতরটা তেতো হয়ে গেল। চোখ বুজে রেহানার তানকারির রস নিজের ভেতর টের পাওয়ার চেষ্টা করলো আবার।

দরশ বিন নিরাশ সব লাগে-এ-এ-এ

নসরত টের পেল, সিন্ধুর সঙ্গে আগ্রাওয়ালি বিকট কল্যাণ মেশাচ্ছে। বাঃ। চমৎকার !

রেহানা মাথা ঝুঁকিয়ে তসলিম জানালো এক ফাঁকে। একেই বলে সমঝদারির সমঝদারি।

গেলিনসেনের কথায় স্যার টমাসের মুখ-কান—দুই-ই যেন তেতো হয়ে গেছে। সে হিন্দুস্থানে ইংল্যাণ্ডের জন কোম্পানির হয়ে কথা বলে। কথা বলে,

রাজা চার্লসের হয়ে। সে বোঝে আগ্রার নীল, গুজরাটের তুলো, কামরূপের তসর সুতো। আর একটু আধটু গান, রবাব, নচ্ গার্লদের নাচ। ব্যস্। কিন্তু এ কী সব সর্বনেশে কথা গেলিনসেনের মুখে!

সামনে রাখা গ্লাসে খানিকটা অঙ্গিরা ঢোলে নিয়ে একঢোকে খেয়ে নিলো স্যার টমাস। এবার আগ্রাওয়ালি রেহানা আলাপ থেকে দ্রুত লয়ে ঢুকবে। এ ধারার গান শুনে শুনে স্যার টমাস এখন খানিকটা রস পায়। অন্য কথায় যাবার জন্যে নসরত খাঁকে বললো, আপনি তো আগ্রা দুর্গের বাইরেটা বানাচ্ছেন। ভালোই বানাবেন জানি। কিন্তু দুর্গের ভেতরটার কী হবে?

নসরত খাঁ ঘুরে তাকালো। কেন? কোথাও যদি পাথরে চিড় ধরে তো দেওয়ানখানা থেকে খবর হলেই আমি নিজে গিয়ে সে-পাথর খুলে সেখানে নতুন একখানা পাথর বসিয়ে দিয়ে আসি—

—এ-পাথর সে-পাথর নয় নসরত খাঁ!

—আপনি কী বলছেন? খুলে বলুন—

স্যার টমাস বললো, বাদশা জাহাঙ্গীর চোখ বুজলে কে বাদশা হবে?

—আমি জানি না। জানার চেষ্টা করাও অপরাধ স্যার টমাস।

—আমি জানি। শাহজাদা খুর্রমই ভাবী বাদশা।

—আমি ইস্পাহানি। কাজ করতে এসেছি। কাজ ফুরোলে বসরায় ফিরে যাবো। ওসব জানবার ইচ্ছে নেই। সময়ও নেই আমার।

—এটা কি কোনো কথা হলো খাঁ সাহেব! সারা হিন্দুস্থান যা জানে—তা আপনি জানতে চান না? একথা জানতে তো কোনো কোশিস করার কিছু নেই। আপনি কি জানেন—শাহজাদা খুর্রম এখন সিধে জেনানা মহলে ঢোকেন। লম্বা পা ফেলে আগ্রা দুর্গের ভেতর অন্দরমহলে চলে যান সিধে। কেউ আর পথ আটকায় না—

—আপনি কি ঠিক কথা বলছেন টমাস সাহেব? আমি যতদূর জানি—শাহজাদারা বিয়ের আগে অব্দি অন্দরমহলে যেতে পারেন। সাদি সুদা হয়ে গেলে জেনানামহলে ঢোকা তাঁদের নিষেধ।

—তাহলে আর কী জানেন আপনি! জাহাঙ্গীর বাদশার হুকুমে শাহজাদা খুর্রম এখন জানান না দিয়েই অন্দরমহলে যান—যখন তখন যান! আপনি দেখছি—দুর্গের বাইরেটা নিয়েই পড়ে রইলেন খাঁ সাহেব। দুর্গের ভেতর কত কী ঘটে যাচ্ছে—

—আগ্রা দুর্গ হলো গিয়ে হিন্দুস্থানের কলিজা। সেখানে সব সময়ই কিছু না কিছু ঘটবে, ঘটতে থাকবে টমাস সাহেব। এতে আর তাজ্জবের কী আছে? আমরা বাইরের কারিগর। আমার আগেও অনেক কারিগর এসেছেন। পরেও আসবেন। এখনো দুর্গে অন্তত পঞ্চাশ বছরের কাজ আছে—বাইরেটা নিয়েই আমরা থাকি!

—এ-বছরই যে অনেক কিছু ঘটছে দুর্গের ভেতর। শাহজাদা খুর্রম এখন

সিধে নূরজাহান বেগমের মহলে চলে যান—

—কী বলছেন আপনি! তিনি শাহী বেগম। ষাট হাজারি ঘোড়সওয়ারের মনসব তাঁর—

—যত হাজারিই হোক। তিনি তো মানুষ। নারী। সুন্দরী। শাহজাদা খুর্‌রম বলতে গেলে এখন শাহী সিপাহ্‌-সালার। সা-জোয়ান। তেজি উমর। তাঁকে তো খুশবু টানবেই—

ঝট করে উঠে দাঁড়ালো নসরত খাঁ। আপনি কী বলছেন—আপনি জানেন না।

নসরত খাঁ অমন উঠে দাঁড়ানোয় আগ্রাওয়ালি রেহানা বাই গান থামিয়ে দিলো। গেলিনসেন কিছুই বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইলো। স্যার টমাস বললো, এটা আপনার রেগে যাবার কথা নয়। এ হলো গিয়ে শাহী ঘরানার কথা।

নসরত খাঁ জোর দিয়ে বললো, এই তো সেদিনও বেগম আরজুমন্দ বানুর আবার ছেলে হয়েছে। শাহজাদা খুর্‌রম তার নাম রেখেছেন সুলতান আওরঙ্গজেব—কোল আলো করা এই ছেলে খুবই সফেদ। বেগমকে নিয়ে শাহজাদা তো সুখেই আছেন।

—তাতে কী হলো খাঁ সাহেব! বাবা হতে থাকলে কি ইশক্‌-এর নহর শুকিয়ে খাক্‌ হয়ে যাবে! ইশক্‌-এর নহর তো কানায় কানায় ভরে গিয়ে দুকূল ভাসিয়েও দিতে পারে খাঁ সাহেব। জীবন তো বন্ধ করে গেঁথে তোলা নিরেট দেওয়াল নয়—একদিকে সুখ—আরেকদিকে ইশক্‌।

নসরত খাঁ খুব আস্তে আস্তে ফের গালিচায় বসে পড়লো। অবলীলায়। যেন তার শরীরের ভেতর কোনো হাড় নেই। বসেই গ্লাস কাছে নিয়ে পুরোটাই অঙ্গিরায় ভরে নিলো।

টাঙার সামনে বিষ্ণু তখন শীতে জমে যাওয়ার যোগাড়।

আগ্রা দুর্গকে নসরত খাঁ যে কলিজা বলেছে—কিছু বেশি বলেনি। আর সেই কলিজার ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া তাগদ, খুন—যা-ই বলা যাক—সবই শাহজাদা খুর্‌রম।

খোদ বাদশা সূর্য ডুবলে নূরজাহান বেগমের কড়া পাহারা থেকে ছুটি পেয়ে তাঁর প্রিয় কাবুলি পিচ ফল আর সিরাজি নিয়ে বসেন। তখন আখারা দলের সুন্দরী নাচিয়ে চারটি মেয়ে রবাবে রসুরে নাচে—রুবায়-ই আওড়ায়—বা কখনো সুর করে সেই রুবায়-ই গায়ও। বাদশা নিজে শাহীপনার চেয়ে নূরজাহান বেগমে বেশি আগ্রহী। শাহী গেরস্থালিতে আর পুরুষ বলতে শাহজাদা খসরু—অন্ধ, শাহজাদা পরভেজ—না-লায়েক, আতালিক দুর্ধর্ষ মহাবত খাঁয়ের ছায়ায় ডুবে আছেন, শাহজাদা শারিয়ার কিশোর মাত্র। সাহস, তাগদ, তেজ বলতে একমাত্র শাহজাদা খুর্‌রমকেই বোঝায়। তিনিই হিন্দুস্থানের কলিজা আগ্রা দুর্গের ভেতর বয়ে চলা খুন।

সেই খুন যাতে পছন্দসই সড়ক দিয়ে বয়ে যায়—সেজন্যে খানিকক্ষণ হলো

দেওয়ানখানার পেছনে হায়াত বকস্ বাগের লাগোয়া ইতমিনান্ মহলে তিনজন অপেক্ষা করছিলেন। ইতিমাদ-উদ্দৌলা—তাঁর মেয়ে নূরজাহান বেগম আর তাঁর ভাই উজিরে আজম আসফ খাঁ। ঘরের কোণে বিরাট আগেনগারে আগুনের শিখার সঙ্গে সুগন্ধী সুবাস। নূরজাহান বেগমের পায়ের চটিতে দুটি হীরা যেদিকে আলো সেদিকেই ঝকঝক করে উঠছিল। উজির ইতিমাদ-উদ্দৌলার মুখে সরল হাসি। মাথার চুল, দাড়ি—দুই-ই কাঁচাপাকা। আসফ খাঁ শাহী সরকারের উজিরেআজম। রীতিমত শক্তসমর্থ। মর্যাদা অনুযায়ী সবচেয়ে উঁচু কুরশিতে বসে নূরজাহান বেগম। তারপর খানিক নিচু কুরশিতে আসফ খাঁ। তার পাশেই প্রায় সমান উঁচু কুরশিতে ইতিমাদ-উদ্দৌলা।

অল্পক্ষণের ভেতরেই শূন্য কুশনে এসে বসলেন শাহজাদা খুর্রম। যেমন তেজি কদমে ঘরে ঢোকা—তেমনই তেজি ভঙ্গিতে কুশনে গিয়ে বসা। বাদশাহী বেগমের উপযুক্ত গম্ভীর ভাব দিয়ে নূরজাহান বেগম শাহজাদার দিকে তাঁর প্রশংসার চাহনি ঢাকা দিলেন। কিন্তু তাঁর চোখ গিয়ে পড়ছিল খুর্রমের চওড়া দুই কাঁধ—বিশাল বুক আর প্রসারিত উরুর ওপর। শাহী আঙরাখায় ঢাকা পড়ে আছে সরু কোমর। মাথার সরবন্ধের বাইরে সামান্য কোঁকড়া কালো চুলের ঢেউ উথলে পড়েছে।

বসতে গিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বাদশাহ বেগমকে কুর্নিশ করলেন প্রথামত।

শ্বশুর হলেও উজিরে আজম আসফ খাঁ মর্যাদায় শাহজাদার ওপরে নয়। শাহজাদা বসতেই আসফ খাঁ নিজেই এগিয়ে কুর্নিশ জানালেন দামাদকে।

মেয়ে হিন্দুস্থানের বাদশার পয়লা বেগম। আর ছেলে শাহী সরকারের উজিরে আজম। ইতিমাদ-উদ্দৌলা তাই আর উঠলেন না। তাঁকে হাত তুলে উঠতে বারণ করেলেন শাহজাদা।

মুখ খুললেন নূরজাহান। অনেক আশা করে আরজুমন্দ বানুর বিয়ে দেওয়া হয়েছে শাহজাদার সঙ্গে। আমাদের আশা শাহজাদা শাহী শান—রওশন উজালা করবেন—

সঙ্গে সঙ্গে কোমরের তলোয়ারের খাপে বাঁ হাত চেপে উঠে দাঁড়ালেন খুর্রম। বললেন, আমি তো কোনো ব্যাপারেই পিছপা নই—

—সে আমরা জানি শাহজাদা।—এই প্রথম মুখ খুললেন ইতিমাদ-উদ্দৌলা।

আসফ খাঁ বললেন, শাহজাদাই সিপাহ্-সালার হয়ে এবার মালিক অম্বরকে উচিত শিক্ষা দেবেন।

নূরজাহান বললেন, আগ্রার ঘর সামলে তবে নর্মদা পেরোনো উচিত। এদিকে বিয়ানার কথা ভুলে থাকলে বড় ভুল হবে।

খুর্রম নূরজাহানের চোখে তাকালেন। মনে মনে বললেন, এই জেনানা আব্বা হুজুরের মাশুকা। হিন্দুস্থানের বাদশাহী বেগম। হিন্দুস্থানের মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে এই জেনানার নামে মোহর হাতবদল হচ্ছে। কালো চোখ। লালচে হলুদ মুখখানা বেরিয়ে আছে কালো ওড়নার লতানে কাজের বাইরে।

শাহজাদা মুখে বললেন, বড়ে ভাই তো ?

নূরজাহান মাথা নাড়লেন সামান্য।

—সে তো অন্ধ।

—অন্ধ হলেও সে একজন শাহজাদা। বাদশা জাহাঙ্গীরের মসনদের পহেলা হকদার। এখনো বাদশা তাকে দেখতে ফিরে ফিরে বিয়ানায় যান।

আসফ খাঁ বলে বসলেন, ওই গোঁয়ার রাজপুতটাকে সবচেয়ে আগে ওখান থেকে সরানো দরকার—

ভাইয়ের কথায় বোন বললেন, শাহজাদার খিরকি হামলার সঙ্গী হোক না অনু রায়। একথা আমি বাদশার কানেও তুলেছি।

কৃতজ্ঞ, সপ্রশংস চোখে শাহজাদা বাদশাহী বেগমের চোখে তাকালেন। সে চোখে কোনো পলক পড়লো না। যেন বা কোনো মূর্তি। খুবই সুন্দর এক মূর্তি—একথা মনে আসতেই বুকটা ভেতরে ভেতরে এক পলকের জন্যে কেঁপে উঠলো। আরজুমন্দ বলেছিল, আমার পিসির অসাধ্য কিছু নেই। সব পারে পিসি।

সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে এলো খুর্রমের—আমি শাহজাদা, আমি পুরুষ, আমার লক্ষ্য হিন্দুস্থানের মসনদ। সেদিকে এগোবার পথে যা আমার কাছে আসবে তা কুড়িয়ে নিতে হবে—যা বাধা হয়ে দাঁড়াবে—তাই-ই গুঁড়িয়ে দিতে হবে। আমাদের ভেতরকার লক্ষ্য কী—তা এখনো পরিষ্কার নয়। বাদশাহী বেগম কী চান—বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীরের পরে আমিই গদিনসীন হই ? উজিরেআজমই বা কী চান ? কী চান ওঁদের আব্বা হুজুর ইতিমাদ-উদ্দৌলা ? ইনসাল্লা ! সবার ইচ্ছা একই পথে বয়ে চলুক। ইয়া আল্লা ! তেরি রেজা !

নূরজাহান বেগমই আবার মুখ খুললেন, মালিক অম্বরকে শায়েস্তা করতে জবরদস্ত সব কাপতান চাই সিপাহ্-সালারের। শাহজাদা শাহী লশকরের সিপাহ্-সালার হয়ে নর্মদার ওপারে যেতে পারেন এক শর্তে—

ইতিমাদ-উদ্দৌলা, আসফ খাঁ, শাহজাদা খুর্রম একই সঙ্গে মুখ তুলে চাইলেন।

নূরজাহান বেগম বললেন, মালিক অম্বরের আহম্মদনগরের রাজধানী খিরকিতে শাহজাদা হামলা চালাবেন যদি—

—যদি ?

—যদি তাঁর পাশে থাকেন জবরদস্ত রাজপুত কাপতান অনু রায়।

শাহজাদা মুখ তুলে তাকালেন, বড়ে ভাইসাহেবের তো একজন মুরুব্বি চাই। অনু রায় হামলায় আমার সঙ্গী হলে ভাই সাহেবের আতালিক কে থাকবেন ?

—কেন ? শাহী উজিরেআজম। এত বড় হিন্দুস্থানের দেওয়ানখানার ঝক্কি ঝামেলা সামলাচ্ছেন উজিরেআজম আসফ খাঁ—তিনি একজন অন্ধের মুরুব্বি হতে পারবেন না ?

মনে মনে নিজের বোনকে সাবাসি দিলেন আসফ খাঁ। ছোটবেলা খেলার

সঙ্গী সেই মেহেরুন্নিসা বড় হয়ে যে এত বুদ্ধি ধরবে মগজে একদিন—তা সেদিন বোঝাই যায়নি।

শাহজাদা খুর্রম নিশ্চিত হবার জন্যে বললেন, অন্ধ হলেও তিনি একজন শাহজাদা।

নূরজাহান বেগম বুঝলেন, তাঁরই কথা তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন শাহজাদা খুর্রম। তিনি পাল্টা বললেন, শাহজাদা হলেও তিনি তো অন্ধই বটে।

আসফ খাঁ বললেন, বাদশা জাহাঙ্গীর কি আমাকে বিশ্বাস করে শাহজাদা খসরুর আতালিক করবেন?

ইতিমাদ-উদ্দৌলা বললেন, সবাই গিয়ে বাদশাকে বলি না কেন?

—বেশ তো। এখনই বলা যায়। বাদশা এই সময়টায় খুশমেজাজে পিচফল খান। চেরি খান। রুবায়-ই শোনেন। নাচনিদের নাচ দেখেন। এখনই তো সময়—

ইতমিনান মহল থেকে শাহী অন্দরমহল পেঁছিতে তিনটে হপ্তচৌকি পেরোতে হলো সবাইকে। পায়ের নিচে পুরু তক্তার একটা টানা সেতু পড়লো। চৌকির বিশ্বাসী রাজপুত পাহারাদাররা আন্দাজ করলো, না-জানি দুর্গে আজ কত বড় ব্যাপার ঘটতে চলেছে। বাদশাহী বেগম নূরজাহান, উজিরে-আজম আসফ খাঁ উজির ইতিমাদ-উদ্দৌলা—আর সবার ওপর খোদ শাহজাদা খুর্রম—এই চারজন একসঙ্গে হয়ে কেন হঠাৎ আলা হজরতের বরকতে চলেছেন? নিশ্চয় কিছু একটা আছে। না থেকেই পারে না। তারা পাহারদার মাত্র। লশকরে থাকলে কৌতূহল ভালো জিনিস নয়। দুর্গের ফাঁকা চাতালের ওপর কোথাও কোথাও কোনো ছাদ নেই। পায়ের নিচে পাথর। শীতে পাথর দোগুনি ঠাণ্ডা হয়ে থাকে। তার চেয়েও ঠাণ্ডা মুখশ্রী নিয়ে তারা ওঁদের যেতে দেখলো।

ওঁরা কেউই জানতেন না—বাদশা জাহাঙ্গীর আজ কিসে মেতে আছেন। আগ্রা দুর্গ আসলে একটা খুদে শহর। পাথরের দেওয়ালের এ পিঠ জানে না—ও পিঠে কী হচ্ছে।

আলা হজরত আজ পিচফল বা সিরাজি নিয়ে বসেননি। বসেননি রুবায়-ই শুনতে। বা নাচান মেয়েদের নাচ দেখতে।

শাহী অন্দরমহল মানে বিশাল টানা আর চওড়া মহল। যমুনার ওপর মোতি বাগের লাগোয়া। অনেক উঁচুতে ছাদ দু'দিক দিয়ে ধরে আছে দুটি লালাভ পাথরের স্তম্ভ।

উজির ইতিমাদ-উদ্দৌলা শাহী মহলে ঢুকেই চমকে উঠলেন, আজ তাহলে বুখরা শুরু হয়েছে—

চারজনই দেখলেন, বাদশা দিব্যি খোশমেজাজে দোলনায় দুলছেন। আর তাঁর সামনে পা অব্দি ঢাকা বাকু গায়ে চড়িয়ে সাত আটজন আধবুড়ো নাচছে। তাদের দাড়ির ছায়া দেওয়ালে। এত বড় চাতালে ঝাড়লণ্ঠনের আলো সবটা

অন্ধকার মুছে দিতে পারেনি। তাই দু'ধারে দুই মশাল জেনলে দু'জন পাহারাদার দাঁড়িয়ে। তাতেও জায়গায় জায়গায় অন্ধকার ঘোচানো যায়নি। ওরই ভেতর বিরাট ডেগে কী ফুটছে। বাতাসে সুসিদ্ধ মশলাদার মাংসের গন্ধ। একজন নাচ থামিয়ে ডেগের ঢাকনা তুলে বড় হাতায় মাংস তুলছে। তুলে খাবে হয়তো।

ইতিমাদ-উদ্দৌলা চাপা গলায় বললেন, এ হলো গিয়ে চাঘতাই পাহাড়ে ফরগনা এলাকার সুফী সন্তদের নাচগান। খেয়ে দেয়ে পরমেশ্বরের সাধনা। আজ দেখছি পুরনোতে পেয়েছে বাদশাকে!

পাশেই দাঁড়িয়ে শাহজাদা খুর্রম সেরকমই চাপা গলায় বললেন, আমি তো কোনোদিন এসব দেখিনি।

—দেখবেন কোত্থেকে! বাবর বাদশারও অনেক আগে খোদ ফরগনা, গজনি, খোরাসান, বাদাকশান, বল্ক থেকে এই বুখরাইয়া অরঘুস্টক নাচগানের সাধনা উঠে গেছে। ইস্পাহানের মক্তবে ছোট থাকতে এই সাধনার কথা একবার শুনেছিলাম—কোনোদিন দেখিনি। বুখরাইয়াদের কথা শুধু শুনেইছি আমার আম্মিজানের মুখে।

একজন নাচতে নাচতে অচেনা সুরে গাইছে। অচেনা তার ভাষা। আরেকজন বুখরাইয়া মেঝেতে বসে ঝুঁকে পড়ে কিঙ্গিনা ধরনের—কিন্তু তাতে চারটি লাউ বসানো—একটি তারের বাজনা দিব্যি অবলীলায় বাজিয়ে চলেছে। বাকিরা নাচতে নাচতে তন্ময়—চোখ ওপরে তোলা—যেন আশমানের পরমেশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেছে এই খানিক আগে।

উজিরে আজম আসফ খাঁ চাপা গলায় বললেন, আজ আর কিছু বলা যাবে না। এখন কিছু বলেও কোনো লাভ নেই।

নুরজাহান বেগম ভেবেছিলেন, তবু বলবেন। দেখলেন—ইতিবর খাঁ, মুকর্রব খান—এমনকি রাজা ভাও সিংও দাঁড়িয়ে। ওঁরাও বোধহয় কিছু বলতে এসেছিলেন। এসে দাঁড়িয়ে পড়েছেন বাধ্য হয়ে।

শাহজাদা খুর্রম দেখলেন, সবাই ভাবে বিভোর। তিনি খুবই আস্তে বলে বসলেন, এতদিনকার হারিয়ে যাওয়া বুখরাইয়া নাচ কোন্ জাদুতে আজ আগ্রা দুর্গে ফের জেগে উঠলো! আব্বা হুজুর জাদু জানেন দেখছি—

তেমনই চাপা গলায় ইতিমাদ-উদ্দৌলা বললেন, হয়তো বাদাকশানের কোনো পাহাড়ের কোল থেকে এই সুফী সন্তরা সিধে আগ্রায় নেমে এসেছেন। এসেই বাদশার মোবারকে হাজির হয়ে পুরনো রীত্-রেওয়াজের কথা বাদশার দরবারে পেশ করেছেন। তাই—

হঠাৎ আসফ খাঁ দেখলেন, দূরে ডানদিককার মশালের আলোর নিচে বসে শাহী তসবিরওয়ালা নাদিরুজ্জমান—দুনিয়ার সেরা তসবিরওয়ালা—আবুল হাসান বসে ছবি আঁকছেন। মাঝে মাঝে মুখ তুলে দেখছেন। আবার মাথা নামিয়ে তুলি টানছেন—তুলি ডোবাচ্ছেন পাশেরই ডাবায়।

আসফ খাঁ বুঝলেন, নিশ্চয় বাদশা এই ভাববিভোর নাচের ছবি এঁকে রাখতে হুকুম দিয়েছেন আবুল হাসানকে।

ততক্ষণে ইতিমাদ-উদ্দৌলাও আবুল হাসানকে দেখতে পেয়েছেন। তিনি অস্ফুটে বললেন, ওঃ! একেই বলে শাহী খেয়াল। বুখরাইয়াদের অরঘুস্টক নাচও এঁকে রাখা হচ্ছে। নিশ্চয় বাদশা তাঁর তুজুকে এসব কথা—সুফী সন্তদের এই নাচগান ছবিতে, লেখায় ধরে রাখতে চান। পরে তা একদিন ইতিহাস হবে।

সবই দেখতে পেয়ে শাহজাদা খুর্রম চাপা হাসি মিশিয়ে বললেন, এখন তো ফিরে যাবারও উপায় নেই। আসুন! আমরা সবাই ছবি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। আবুল হাসানের ছবিতে ধরা পড়েছি।

আলো-আঁধারির ভেতর নাচগান বাজনায় এমন ভাববিভোর ছবিতে অনেকের মাঝখানে মাত্র একটি মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার অভ্যাস নূরজাহান বেগমের কোনোদিনই নেই। খোদ বাদশাই তাঁকে দেখলে নড়ে চড়ে বসেন। অন্যদের তো কথাই নেই। তিনি যে সুন্দরী—হিন্দুস্থানের সেরা তাগদওয়ালি—তাঁর সামনে যে কোনো জমায়েতের ভেতর তাঁকে দেখে যে অদৃশ্য ঢেউ উঠে থাকে—তা তিনি জানেন। কিন্তু আজ এখন এই মুহূর্তে তেমন কিছু না ঘটায় বেগম নূরজাহান ভিড়ের ভেতর আবছামত—মনমরা হয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন।

পরদিন সকালে সুন্দর ঝকঝকে রোদে যমুনার দু'তীর ভেসে যাছে। শীতের ভেতর এই রোদ পোহাতে সবচেয়ে আগে বেরিয়ে পড়েছে হাঘরে আম-আতরাফ মিশকিনের দল। ছেঁড়া কানি গায়ে জড়িয়ে তারা কোনোরকমে গা গরম করে নিচ্ছে। এরপর তারা রাজধানী আগ্রার মকবরায় মকবরায় গিয়ে ভিক্ষা চাইবে। যদি কয়েক দাম বেশি জোটে তো চাই কি ফের গরম করা বাসি কাবাবও কিনে খাবে দু'একজন।

মিশকিনের ভয়েই সাদা ধবধবে একজন যুবক দিব্যি আগ্রা বাজারের ভেতর দিয়ে দিল্লি যাওয়ার শাহী সড়ক ধরছিল। তার টাঙার ঘোড়াটি ইয়াবু জাতের। ভিড় কাটিয়ে ছুটের চালে ঘোড়ার হাঁটুর দু'পাশের বালামচি বাতাসে উড়ছে। সেই সঙ্গে উড়ছে—পেছনের গদিতে বসা যুবকটির ঢেউ তোলা সামান্য তামাটে চুল—চুলের শেষে কোনোমতে লটকানো বেণীটিও।

যুবকটিকে আগ্রা বাজারের সবাই চেনে। রাস্তার দু'ধারের দোকানিরা যে যার পশরা নিয়ে ছুটন্ত টাঙার কাছে এসে দাঁড়াচ্ছিল। কারও হাতে পশমিনা টুপি—কারও হাতে বা নাওরা জঙ্গলের মধু। যুবকটি সবাইকেই সামান্য হেসে ফিরিয়ে দিচ্ছিল। তাড়া আছে। তাকে এখন দিল্লি পাড়ি দিতে হবে। সেখানকার কেল্লার কামানগুলোর দেখভাল যাচাই করে তবে আগ্রা ফেরা যাবে। আরেকটু এগোলেই রাজধানী পেছনে ফেলে রাস্তাটা দিল্লির দিকে বাঁক নেবে। ঠিক এইসময় তার টাঙার সামনে এক কিশোর দু'হাত তুলে দাঁড়ালো। একটু হলেই ইয়াবু ঘোড়াটা তাকে থেঁতলে দিয়ে বেরিয়ে যেতো। বুদ্ধি করে রাশ টানলো সহিস। ঝাঁকুনি খেয়ে টাঙা থামলো। সেই সঙ্গে যুবকটিও ঝুঁকে পড়ে

নিজেকে সামলালো। বিরক্ত হয়ে বললো, কী চায়? মিশকিন নিশ্চয়। দুই দাম দিয়ে দাও। হিন্দুস্থানে যে কত ভিখারি!

এদের সামলাতেই কয়েক রুপেয়ার দাম খেরিয়া ঝোলায় করে সহিসের কাছে রেখে দেওয়া থাকে। যখন যেমন দরকার—যুবকের হুকুমে সহিস তা মিশকিনদের দিয়ে দেয়। এবারও সহিস খেরিয়া থেকে দুটো দাম বের করছিল।

কিশোরটি কিন্তু নিলো না। সে টাঙায় ওঠার পাদানির কাছে ছুটে এলো। রাস্তা এখানে কিছু নির্জন। যুবকের কাছাকাছি গিয়ে কিশোরটি দু'হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলো, মানুচ্চি সাহেব—

টাঙায় বসা যুবক অবাক হলো। কোনো মিশকিনের তো আমায় চেনার কথা নয়। তারা চেনে দাম, দামড়ি, আধেলা, পওয়া—বড়জোর রুপেয়া!—তুমি আমায় চেনো?

ঘাবড়ে গিয়ে কিশোর একদম বোবা হয়ে গেল। সে আশাই করতে পারেনি—রাস্তা আটকে দাঁড়ানোয় মানুচ্চি সাহেবের টাঙা থামবে।

মানুচ্চি আবার জানতে চাইলো, আমায় তুমি চেনো?

ঘাড় কাত করে কিশোরটি বললো, হুঁ। আপনি শাহী তোপখানার মীর আতশ।

—তুমি কে? মিশকিন?

—না, আমি ভিখিরি নই। গোলাম—গোলাম বিষ্ণু—

—হিন্দু?

—হ্যাঁ। আমি নসরত খাঁয়ের কেনা গোলাম।

—কোন নসরত? কী চাও তুমি বিষ্ণু?

—আগ্রা দুর্গে ক'বছর ধরে সামানবুরুজ বানাচ্ছেন যে নসরত খাঁ, তাঁরই গোলাম আমি। ঠাণ্ডায়—খাটুনিতে মরে যাবার দশা। তারপর তো আছে চাবুক। বেশির ভাগ দিন আধপেটা খেয়ে পড়ে থাকি। আমি সব কাজ জানি। আপনাকে কিছু বলতে হবে না। পা দাবানো জানি। জুতো বুরুশ করে দেবো। ছুটোছুটি করবো। যা বলবেন—

—আমার তো এখন গোলামের দরকার নেই। —বলে একটা রুপেয়া কোমরবন্ধের গেঁজে থেকে বের করে মানুচ্চি সাহেব বিষ্ণুকে দিতে গেল। দিতে দিতে বললো, বসরার নসরত খাঁ তো। তার গোলাম আমি কী করে কিনি?

রুপেয়া নিলো না বিষ্ণু। ঠাণ্ডা বাতাসে তার গায়ের ছেঁড়া খোড়া পিরানের কানাত উড়ছিল। তার ভেতর দিয়ে হাড় বের করা একখানি কিশোর বুক দেখা যায়। বিষ্ণু কাকুতি মিনতির গলায় বললো, আপনি দয়া করে আমায় কিনে নিন। বেশি লাগবে না। খুব সস্তা। মাত্র ছয় আশরফি দিয়ে নসরত খাঁ আমায় কিনেছিলেন। এখন তো আমি দাগী গোলাম। খুঁতো গোলাম। দুবলা হয়ে গেছি। আরও কম পড়বে আপনার। চাই কি তিন আশরফিতেও পেয়ে যেতে পারেন আমায়। নয়তো—

মানুচ্চি নিজের মনে মনে বললো, মাত্র তিন আশরফি ? তিন আশরফির বদলে সারা জীবনের জন্যে আস্ত একটা মানুষ! শান্তির সময় আমি সত্তর আশরফির রোজিনাদার। তার মানে দিনে সত্তর আশরফি পেয়ে থাকি। লড়াই হামলা বাধলে রোজিনাদারি বেড়ে দাঁড়াবে দিনে একশো আশরফি। এছাড়া খাওয়া থাকা, পোশাক আশাক সবই চালায় শাহী দেওয়ানখানা। সত্যি! হিন্দুস্থানে ইনসান সবচেয়ে সস্তার জিনিস!

মানুচ্চি জানতে চাইলো—নয়তো কী ?

—আমাকে নসরত খাঁয়ের বড় বেপসন্দ। আগ্রার লালচক মাণ্ডি থেকে আমায় কিনেছিলেন। আবার সেখানে নিয়ে গিয়েই হয়তো বেচে দেবেন।

—তাতে অসুবিধে কিসের ?

—কোন্ বিদেশে বিভুঁইয়ে গিয়ে পড়বো শেষে।

—গোলামের আবার বিদেশ বিভুঁই! দেখো ভালো মালিকের কাছে গিয়েই পড়বে এবারে। মন খারাপ কোরো না।

—আপনি জানেন না হুজুর—হীরাটে দুর্গ তৈরি হচ্ছে—সেখানে পাথর ভাঙার কাজে সস্তায় গোলাম কিনছে বনজারারা—

—তুমি শুনলে কী করে ? অবাকই হলো মানুচ্চি। বেশ চৌকশ গোলাম তো।

—বিলকুলি পান, গরম গরম শিককাবাব কিনতে যেতে হয় মাণ্ডিতে। সন্ধের দিকে। তখন লোকের মুখে শুনেছি।

—আর কী শুনেছো ?

বিষ্ণুর মুখখানা এক লহমায় উদাস হয়ে গেল। চোখ গম্ভীর। সে বেশ আস্তে আস্তে বললো, হীরাট থেকে গোলামরা আর ফেরে না—সস্তায় কেনা গোলাম তো। বনজারাদের কিছু যায় আসে না। শীত, হাড়ভাঙা খাটুনি। খাবার বলতে রুটি আর পেঁয়াজ। শেষে যদি ওরাই আমায় কিনে নেয়—

বলতে বলতে বিষ্ণু কেঁপে উঠলো। মানুচ্চি তাকে দুটি রুপেয়া দিয়ে বললো, রাখো। আমি নসরত খাঁয়ের সঙ্গে কথা বলবো—

—বলবেন ? সত্যি!

—হ্যাঁ। তুমি সামনের পূর্ণিমার সন্ধ্যায় শাহী চবুতরায় গিয়ে দাঁড়াবে। ফুলওয়ালিদের ওখানটায়। আমি যাবো—

বিষ্ণুর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। একটু তাড়াতাড়ি আসবেন কিন্তু। সন্ধেবেলা খুব ভিড় হয়।

•

টাঙা এবার ফাঁকা রাস্তায় গিয়ে পড়লো। এ রাস্তা এখন দিল্লি গিয়ে থেমেছে। মাঝে মাঝে বসতি। সিসিলি থেকে জাহাজে করে ভাগ্য ফেরাতে বেরিয়ে পড়ে সে কয়েক বছর আগে। আজকের ওই কিশোর গোলামের মতোই মানুচ্চিও যেন তার ভাগ্যদেবীর টাঙার সামনে দু'হাত তুলে সেদিন দাঁড়িয়েছিল। কাভাইরো, ইস্পাহান হয়ে শেষে এই আগ্রায়। তোপ দেগে

নির্ভুল চাঁদমারি করার জন্যেই শাহী লশকরের তোপখানায় সে এখন মীর আতশ।

দুপুরবেলায় শাহী সড়কের গায়ে টাঙা থামিয়ে মানুচ্চি নাস্তা সারলো। শামি কাবাবের সঙ্গে ফুল ময়দার রুটি। বর্বরি ছাগলের মাংসের গরম গরম সুরুয়া। শেষ পাতে তরমুজ আর সিরাজি। হিন্দুস্থানের চমৎকার রোদের ভেতর টাঙায় আধো চিত হয়ে মুখের ওপর ক্যানোকি টুপি ঢাকা দিয়ে খানিকক্ষণ ঘুমিয়েও নিলো মানুচ্চি।

ঘুম ভাঙার পর যতই এগোয়—ততই কেমন এক পচা গন্ধ নাকে আসে মানুচ্চির। একটু পরে দেখলো—রাস্তার লোকজনও নাকে কাপড় দিয়ে যাচ্ছে। কাকে জিজ্ঞেস করা যায়? কাউকে পেল না।

খানিক এগিয়ে দেখলো, শোনপথের বিশাল দুই বলদ বিরাট একটা গাড়ি টেনে নিয়ে আগ্রার দিকে চলেছে। কাছাকাছি আসতেই নাকে কাপড় দিলো মানুচ্চি।

সারা গাড়ি বোঝাই দিয়ে হাঁড়ি কলসির মতোই মানুষের মুণ্ডু সাজানো। কাটামুণ্ডু। ক'দিনের বাসিই হবে। খুব গন্ধ। সব মাথাই ভালো করে কামানো। মুণ্ডুগুলোর নাকের নিচের গোঁফ শুকোনো রক্তে লাল।

মানুচ্চি জানে, এই মুণ্ডুগুলো আগ্রায় নিয়ে গিয়ে শাহী চবুতরায় সাজিয়ে রাখা হবে। বাদশাহী তাগদের নমুনা। আম-আতরফ মানুষজন দেখে শিউরে উঠবে। গল্প করবে নিজেদের ভেতর। বলাবলি হবে—বিদ্রোহের পরিণাম!

এই-ই হলো রেওয়াজ। রাজধানী ছাড়ার আগেই মানুচ্চি শুনে এসেছে—আগ্রার কাছাকাছি চাষীরা মালগুজারি জমা করেনি। শুধু তাই নয়—লশকরি চৌকি রাতের অন্ধকারে ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে। সে জানতোই—শিগগিরি এমন কিছু একটা হতে চলেছে। নিজেই দেখেছে—ক'দিন আগে সাকেত ছাউনি থেকে বন্দুকচী, ধানুকীরা তৈরি হয়ে বেরিয়ে গেছে।

মানুচ্চি যতই এগোয়—সেই গন্ধ আরও জোরালো হয়ে নাকে এসে লাগে। রোদ পড়ে আসছিল। শাহী সড়কের পাশে দেখলেন—কোমর সমান উঁচু করে কী গাঁথা হচ্ছে।

টাঙা থামিয়ে নামলো মানুচ্চি। কী হচ্ছে? জনা ছয় লশকরের মাথায় এক উজবেক। সে মানুচ্চিকে চিনতো। হেসে বললো, জুলুমবাজ, বাগী চাষীদের মুণ্ডু দিয়ে মিনার গাঁথা হচ্ছে—আর কোনোদিন কেউ বাগী হওয়ার সাহস পাবে না—

শিউরে উঠলো মানুচ্চি। চুন আর বালি দিয়ে গাঁথা মিনারের খোপে খোপে মাথা কামানো চাষীদের কাটামুণ্ডু। গোঁফ রক্তে লাল। মরা চোখে ধড় ছাড়াই চাষীরা সন্ধে হয়ে আসা হিন্দুস্থানের দিকে তাকিয়ে আছে।

বমি এসে যাচ্ছিল মানুচ্চির। কোনোরকমে সামলে সে জানতে চাইলো—এভাবে মিনার গেঁথে গেঁথে কতদূর অবদি যাবে তোমরা?

—ইচ্ছে তো আগ্রা অব্দি হুজুর। যদি না কাটামুণ্ডুতে টান পড়ে!

তাড়াতাড়ি টাঙায় উঠে সহিসকে বললো, জোরসে হাঁকাও—

ডাকচৌকিতে সন্ধে রাতে পৌঁছে মানুচ্চি সেখানে এই টাঙা জমা রাখবে। ওখান থেকে ঘোড়া নিয়ে কাল সকালে আবার দিল্লির পথে। সন্ধে এলো বলে। কোনোরকমে বমি সামলে সে টাঙায় শুয়ে শুয়েই একটি কাজ করলো। যতই এগোয় ততই দেখে—একটার পর একটা মিনার। এক ক্রোশ রাস্তার ভেতর অন্তত এমন ছ'টা মিনার পড়লো।

মিনার গুনতে গুনতে একসময় সন্ধ্যার অন্ধকার সারা হিন্দুস্থানকে ঢেকে ফেললো। মানুচ্চি দেখলো, তখন পর্যন্ত সে একচল্লিশটি মিনার শাহী সড়কের পাশে দেখতে পেয়ে গুনেছে। এখন অন্ধকারে কিছুই আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ফি-মিনারে কম করেও ওরা পঁচিশ তিরিশটা করে কাটামুণ্ডু বসিয়েছে।

পুরো অন্ধকারে এক জায়গায় লশকরি গলা পেয়ে টাঙা থামালো মানুচ্চি। এটি তার হিসেবে বেয়াল্লিশ নম্বর মিনার। কোনো লশকরেরই মুখ দেখা যাচ্ছে না। সহিস তার রেড়ির বাতিদান জেলে তুলে ধরলো।

সেই আলোয় মানুচ্চিকে দেখতে পেয়ে দু'জন লশকর এগিয়ে এলো। মানুচ্চি হুকুমদারি গলায় জানালো—সে শাহী তোপখানার মীর আতশ।

সঙ্গে সঙ্গে লশকররা তাকে কুর্নিশ জানালো।

মানুচ্চি জানতে চাইলো, তোমাদের মনসবদার কে?

মির্জা ইউসুফ বেগ—

॥ দশ ॥

আগ্রা দুর্গের বাইরে সবচেয়ে দামি হাভেলি সম্ভবত আবদুল হাজি সিরাজির। তিনি শাহী হেকিম। শাহজাদাদের শাহজাদারাও তাঁরই হাতে এই দুনিয়ার আলো দেখে। তাঁদের পয়দায়িস হেকিম সিরাজি সাহেবেরই হাতে। তাই তাঁর হাভেলির সামনে কেওয়াড়ি পাহারা ব্যবস্থা শাহী দেওয়ানখানা থেকে হয়ে থাকে।

হাভেলিটি দু'মহলা। পাথরের দেওয়াল। কাঠের মেঝে। বড় বড় জানলায় ভারি চিলমন টানা থাকে সারাদিন। সামনে পেছনে বাগানে হরেক ফুলের মেলা। বাড়ির পেছনটা গোলাম-বাঁদীদের থাকবার ঘর। তার পেছনেই যমুনা। ডানপাশে ঘোড়া ঘর। এখন সেখানে ঘোড়া থাকে না। তাজা বয়সে হেকিম সাহেব ঘোড়া দাবড়াতেন। এখন দেওয়ানখানা থেকে তাঁর জন্যে দুই ঘোড়ার জুড়ির ব্যবস্থা আছে।

ইদানীং হেকিম সাহেব হাভেলি থেকে বেরোন কম। যতটা না বয়সের ভারে—তার চেয়ে বেশি হায়দরাবাদ থেকে কিছুকাল হলো নিকা করে আনা একটি কচি বেগমের পাহারাদারির জন্যে। বেগমের নাম সুরাইয়া। হায়দরাবাদ থেকে সুরাইয়া একা আসেনি। নসিব ফেরাবার জন্যে ভাই ওয়াসিমকেও

সঙ্গে এনেছে।

এখন ঠিক দুপুরবেলা। নতুন গরম পড়তে শুরু করেছে। সেকেন্দ্রার দিক থেকে এই সময়টায় কোকিল আসে খুব। আগ্রার গাছে গাছে তো বসেই। তাদের দলছুট কয়েকটা কোয়েল সিরাজি সাহেবের বাগানেও এসেছে। তারা চোসা আমগাছে বসে কুশি আম তো নষ্ট করছিলই—বাগানের মাটিতে নেমে বেলির কুঁড়িও খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল।

কিন্তু সব দেখেও কিছু করতে পারছিলেন না হেকিম সাহেব। বাগানের লাগোয়া চাতালে গামানি কাঠের বিশাল এক কাঠের ঘেরাওয়ের ভেতর বসে তিনি। দু'জন গোলাম তাঁকে দুধে চান করাচ্ছিল। আমলকির তেল, শুকোনো হরীতকীর চূর্ণ, ঈশের মূল—আরও অনেক হ্যানাত্যানা পাশেই সাজানো। নিজে ইউনানি হেকিম হয়েও খুবই গোপনে নিজের হাভেলির ভেতর বসে তিনি বিশুদ্ধ কবিরাজি মতে কায়কল্প করছিলেন। কারণ, বেগম সুরাইয়া তাঁর বয়সের তুলনায় নিতান্তই কচি।

সময়টা এমন বেছে নেওয়ার কারণ, আজ সুরাইয়া বেগম গেছে শাহী মীনাবাজারে। হাভেলি ফাঁকা দেখেই তিনি তাজা জওয়ানি ফিরে পেতে গোপনে এ কায়কল্পে বসেছেন। বছরে এই একটি দিনে শাহী হারেমের জেনানা মহল থেকেই আওরতরা সবাই পসরা সাজিয়ে বসে। খোদ বাদশা ছদ্মবেশে বেরিয়ে সেই মীনাবাজারে কেনাকাটা, দরদাম করবেন আজ। অন্য কোনো পুরুষ সেখানে ঢুকতে পারে না। রাজধানী আগ্রা হলেও কেতায়-সহবতে-রইসে হায়দরাবাদ ফেলনা নয়। বরং বিশিষ্ট। এই মীনাবাজারেই জেনানাদের ভেতর সেই কেতা আর সহবত নিয়ে গোপনে অদৃশ্য এক রেষারেষি চলে। আমীর-ওমরাহ, মনসবদার-জায়গীরদারদের বেগমরা মনকাড়া সাজে সেজে পসরা নিয়ে বেচতে বসে। সেখানে খদ্দের একজনই। খোদ বাদশা। তবে ছদ্মবেশেই তাঁর ঘোরাঘুরি। সেখানে খুবসুরতি, জওয়ানি, ঠাট-ঠমকে হেকিম সাহেবের চোখা কচি বেগমটিই না শেষে আশপাশের জেনানাদের চক্ষুশূল হয়ে খোদ বাদশারই মন কেড়ে বসে। বাইরে থেকে কিছুই জানার উপায় নেই। ভেতরে পাহারায় অল্পবয়সী সুন্দরী চেড়ির দল—বাইরে পাহারায় খোজা বাহিনী। শেষে না এই বুড়ো বয়সে বুক চাপড়াতে হয়।

দুই গোলাম দুধ ঢালছে মাথায়। এবার গা মুছিয়ে হরীতকীর গুঁড়ো মেশানো আমলকি তেল দিয়ে সারা গা ডলাই মলাই করবে। কিন্তু সুরাইয়া বেগমকে নিয়ে ওই ভয় হেকিম সাহেবকে অস্থির করে তুলছিল। কী দরকার ছিল মীনাবাজারে যাওয়ার? হাত তুলে কোয়েল ক'টাকে তাড়াতে পারছিলেন না তিনি। সারা মন জুড়ে থাকা আতঙ্কটাই যেন কোয়েল তাড়ানোর বাধা!

গামানি কাঠের ঘেরাওয়ের ভেতর ভিজে গায়ে বসে হেকিম সাহেবকে বাগানের দিকে গোলামকুঠিতেও চোখ রাখতে হচ্ছিল। সুরাইয়া বেগমের ভাই ওয়াসিম না হতে পেরেছে সমশেরবাজ—না হতে পেরেছে লাঠি খেলায় তুখোড় লকড়েইট। যদি ঢাল নিয়ে লড়াকু ঢালুয়াও হতে পারতো তো লশকরে ঢুকিয়ে

দেওয়া যেতো। ঘোড়ায় তো উঠতেই পারে না। যা পারে তা হলো—গোলাম কুঠির আড়াল আবডালে গিয়ে বাঁদীদের পাশে ঘোরাঘুরি করতে। সারাদিন ছোঁক ছোঁক।

বাঁদীদের ভেতর লছমীকে নিয়ে ভাবনা হেকিম সাহেবের। বারো তেরো বছরের এ বাঁদীটি তিনি নিয়েছিলেন বেশ সস্তায়। সাত আশরফি আর দরকষাকষি করে আরও ছয় রুপেয়ায়। এসেছিল প্যাঁকাটি। এই ক'বছরে গায়ে-গতরে দিব্যি ডাগর হয়ে উঠেছে। আর তার সঙ্গে আড়ালে আবডালে ওয়াসিমের যত ফুসুর ফুসুর।

গা মুছিয়ে দিয়ে গোলামরা হেকিম সাহেবকে বাগানের দিকে পিঠ করে ঘুরিয়ে বসালো। আর তখনই ওয়াসিম কী করছে জানার জন্যে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। গোলামরা তখন তাঁর গায়ে পিঠে ঈশের মূল মেশানো হরীতকী আর সাদা তিল বাটা মাখাতে শুরু করেছে।

ওয়াসিম বছর উনিশের সুশ্রী হায়দরাবাদি জওয়ান। খুব একটা তাগড়া নয়। বরং শায়েরদের মতোই হালকা ছিমছাম দেখতে। সে তখন হাভেলির পেছন দিককার বাগান পেরিয়ে একেবারে যমুনার কিনারায়।

সুরাইয়া বেগমের ছেঁড়াখোড়া কামিজ কুর্তি গায়ে দিয়েই লছমীর দিন কাটে। আর এই টুটাফাটা কামিজ কুর্তাই তার সর্বনাশ ডেকে আনে।

শরীরের যে জায়গাই লছমীর বেরিয়ে থাকে—সেটাই হয়ে ওঠে ওয়াসিমের মরণ। ওয়াসিম লক্ষ্য করেছে—লছমী ঠিক কনৌজি নয়—ফতেপুরিও নয়। চলনে বলনে যে ঠাটঠমক আছে ওদের মতো—তাও নয়। কেমন নরম—সবসময় দুঃখী দুঃখী ভাব—ডাকলে হরিণের মতো কেঁপে ওঠে লছমী—। মুলতানি বাঁদী খাদেজা যতটাই দাপটিয়া—লছমী যেন ততটাই ভয়ে কাহিল—মাটির সঙ্গে মিশে থাকা।

হাভেলির বাইরে লছমী কারিপাতা তুলছিল। বুকের ওপর রসুইঘরের কাপড় কষে বাঁধা। বোঝাই যায়—রসুইঘর থেকে সোজা পাতা তুলতে এসেছে।

ওয়াসিম একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে লছমীর কোঁচড় থেকে সব কারিপাতা মাটিতে ঘাসের ওপর পড়ে গেল। পড়ে যেতে সে একদম মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

—করলে কী? সব ফেলে দিলে!—বলতে বলতে ওয়াসিম নিজেই উবু হয়ে কারিপাতা একটা একটা করে তুলতে লাগলো। তুলতে তুলতে বললো, এত ভয় কিসের আমাকে? আমি বাঘ? না, ভাল্লু!

লছমী খুব আস্তে আস্তে বললো, বেগম সাহেবা দেখলে আবার মারবে—

—আপা এখন ঘরে নেই।

—সাহেব এখন হাভেলি চত্বরে—

—গোলামরা তাঁকে ডলাই মলাই করছে।

লছমী কোনো কথা বললো না। দূরে যমুনার চরে কারা এই দিনের বেলায় আগুন দিয়েছে! সেই আগুনের সাদা ধোঁয়া নীল আকাশের দিকে কুণ্ডলী

পাকিয়ে উঠছিল।

কারিপাতাগুলো তুলে লছমীর কোঁচড়ে ফের জমা দিয়ে ওয়াসিম আবার তার হাত ধরলো। তুমি খুব সুন্দর লছমী—

লছমী কোনো কথা না বলে চোখ নামিয়ে নিলো। যমুনার বাতাসে তার মাথার চুল উড়ছে। সুরাইয়া বেগমের কাচ খসে যাওয়া পুরনো কামিজ ওড়নায় লছমীকে এখন কোনো বেদৌলতি শাহজাদীর মতোই লাগলো ওয়াসিমের। সে দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো তার বেদৌলতি শাহজাদীকে।

লছমী কোনো বাধা দিলো না। ওয়াসিম তার ঘাড়ে, গলায়, ঠোঁটে মুহুর্মুহু চুমু দিতে লাগলো। শেষে একসময় ক্লান্ত হয়ে থামলে লছমী খুব আস্তে আস্তে বললো, বেগম সাহেবা মারবেন—

—মারলেই হলো। আমি বাঁচাবো তোমাকে—

লছমী কোনো কথা বললো না।

ওয়াসিম জানতে চাইলো, তুমি কোনো কথা বলো না কেন?

—এই তো বললাম—

—ওরকম নয়। নিজের থেকে কোনো কথা তো তুমি বলো না—

—গোলাম বাঁদীদের কোনো কথা থাকতে আছে নাকি?

—এই তো বেশ কথা বলতে পারো দেখছি। অন্য সময় তো মুখ ফোটে না। বলতে বলতে ওয়সিম খাঁটি শাহজাদার কেতায় ডান হাত খানা শূন্যে তুলে যমুনার দিকে তাকিয়ে বললো, আমি তোমায় বেগম করে রাখবো।

—আস্তে কথা বলুন। বেগমের কানে গেলে ফের মার খাবো।

—কাকে ভয় করি আমি লছমী? এত বড় হিন্দুস্থান। আমাদের জন্যে একটু জায়গা হবে না।

—বাঁদী চুরি করে শেষে পস্তাবেন কেন শুধু, তাই—?

এ কথায় নিজেকে সামলাতে পারলো না ওয়াসিম। সে দু'হাতে পাঁজাকোলে তুলে ফেললো লছমীকে। লছমী কোনো কথা বললো না। সে চুপ করে সবই দেখে যাচ্ছিল। তার নিজের যেন কোনো ইচ্ছা শক্তিই নেই। সে শুধু দর্শক।

ওয়াসিম অস্থির হয়ে পড়েছিল। তার আর তর সইছিল না। হাভেলির পেছন দিককার সীমানা বলতে কিছু আগাছা। সেগুলো ডিঙিয়ে পাঁজাকোলে নিয়েই ওয়াসিম ঘোড়াঘরে এসে উঠলো। এমনিতে হালকা পাতলা। কিন্তু এখন যেন চারটে ওয়াসিম একটা ওয়াসিমের ভেতর কাজ করছে।

হেকিম সাহেবের জুড়ির ঘোড়া দুটো নিয়ে সারবান এখান থেকে অনেক নিচে যমুনার জাগা চরে ঘাস খাওয়াতে গেছে। সেই সারবানের বিচুলি গাদানো বিছনাই সই। তাতে নিয়ে গিয়ে লছমীকে পেড়ে ফেললো ওয়াসিম।

লছমী ঝাঁকুনি খেয়েই সারবানের বিচুলি গোঁজা গাদেলায় গিয়ে পড়লো। কোনো বাধা দিলো না। হিন্দুস্থানের রাজধানী এই আগ্রা মানে তার কাছে স্রেফ বর্তন ধোলাই—ঘরগেরস্থালি সাফা রাখা। সুরাইয়া বেগমের ফাইফরমাশ

খাটা। সন্দেহবশে কিংবা ভুল করেও যদি বেগম সাহেবা পায়ের চটি খুলে ক'ঘা বসিয়ে দেয় তো মুখ বুজে সে মার খেয়ে যাওয়াও তার কাছে না বুঝতে পারা—এই আগ্রা--যেখানে অনেক মানুষ ঘুম থেকে উঠে ঘুমোতে যাওয়া অব্দি নানা ফুর্তিতে মেতে থাকে—আরও হরেক ফুর্তি মগজ থেকে বের করার জন্যে রাত কাবার করে ঘুমিয়ে নেয়। শুধু তারই ভালো করে ঘুম হয় না। কোথায় সে খুন্তাঘাট—আর কোথায় এই আগ্রা! বেগম সাহেবার ভাই তাকে নিয়ে এখন যা কিছু করছে—এটাও নিশ্চয় আগ্রার আরেকটা ফুর্তি। লছমী কোনো বাধা দিলো না।

সেকেন্দ্রা থেকে উড়ে আসা কোয়েলরা এবার সিরাজি সাহেবের বাগান ছেড়ে যমুনার আকাশে ঝাঁক বেধে উড়ে পড়লো। ওয়াসিম শান্ত হলো। সে খুব নরম গলায় জানতে চাইলো, তোমার ভালো লেগেছে?

লছমী চুপ করে থাকলো। সে থেমে গেছে। খুব আস্তে জানতে চাইলো, উঠতে পারি?

এ কথায় রীতিমত আহত হলো ওয়াসিম। ওভাবে কথা বলছো কেন পিয়ারি? তুমিই আমার দুনিয়া—

খচ করে ঘুরে তাকালো লছমী। রোজ সাতসকালে এক বৈরাগিনী আসতো। এসে সিরাজি সাহেবের হাভেলির সামনে দাঁড়িয়ে নেচে নেচে গাইতো—

রাধা পিয়ারি
বেদারো মন
রাধা পিয়ারি—

পিয়ারি কথাটায় একটা ভারি মিষ্টি ঝোঁক দিয়ে গাইতো বৈরাগিনী। মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা। গলায় যেন খান্দেশরী গুড় ছিল। রাধা পিয়ারি। বেগম সাহেবার কড়া হুকুম—এদিক পানে যেন আর না দেখি—জারি হওয়ার পর বৈরাগিনী আর আসে না।

পিয়ারি কথাটায় কী ছিল। খুব লজ্জা হলো লছমীর। সে কুর্তি কামিজ সামলে মাথা নিচু করে ছুটে পালালো।

ওদিকে বাদশাহী হারেমের দরজায় তখন জেনানা দারোগারা এসে জায়গা নিয়েছে। ভেতরে মীনাবাজার জোর জমে উঠেছে। খোজা পাহারাদাররা আরও দূরে সরে গেল এইমাত্র। বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীর আজ সেজেছেন তুর্কি পশম ব্যাপারী। আমীর-ওমরাহ, মনসবদার-জায়গীরদারদের সুন্দরী সুন্দরী বেগমরা পসরা সাজিয়ে বসে। বাদশার চোখে কে কত সুন্দরী—চোখা, মনোহারিনী হয়ে উঠতে পারে—তারই অদৃশ্য রেষারেষি শুরু হয়ে গেল। নীলচে ওড়নায় বাদামফুলি কাজ কারও। কারও বা বাদলাকিনারি কাঁচুলিতে খুব গোপনে চুয়ার নির্যাস মাখানো। বাদশা যেই ঝুঁকে পড়ে দর করবেন—তখনই পসারিনীর শরীর থেকে সুগন্ধী চুয়া তাঁর নাকে গিয়ে লাগবে।

একটা প্রকাণ্ড মাঠ। চারদিক উ'চু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। তার ভেতর একদল বেগমের জন্যে এক একটা মহল। দু'তিনটি মহলের ভেতর একটি করে বাগ—বাগের মাঝে বড় দীঘি—আবার কুয়োর ব্যবস্থাও আছে। এই প্রকাণ্ড মহলই হলো হারেম। আগ্রার বাজারে আজও শোনা যায়—বেগম, চেড়ি, দাসী মিলিয়ে পাঁচ হাজারের ওপর জেনানা আকবর বাদশার হারেমে থাকতো। এখন বাদশা জাহাঙ্গীরের আমলে আহেদিদের তাঁবে ঘোড়সওয়ার যেমন কমেছে—তেমনই কমেছে হারেমে বেগম।

এক একদল বেগমের ওপর একজন করে জেনানা দারোগা। এই দারোগাদের সর্দারনীই হারেমের সর্বেসর্বা। বাদশা বেগমদের মাসোহারাও ঠিক করে দিয়েছেন। বয়সে, রূপে, গুণে সবচেয়ে সেরা বেগমরা মাসে আঠারোশো রুপেয়া অব্দি পেয়ে থাকেন। তাঁদের ঠাট ঠমকই আলাদা। এই মীনাবাজারে তাঁরাই সবচেয়ে দেমাকি ঢঙে পসরা সাজিয়ে বসেছেন। বয়স হয়ে গেলে এই বেগমদের হারেম ছেড়ে চলে যেতে হয়। তখন তাঁদের থাকার জায়গা আলাদা।

বাদশা জাহাঙ্গীর সুরাইয়া বেগমের সামনে গিয়ে খুব দর কষাকষি করছিলেন। হায়দরাবাদিনী সুরাইয়া সবাইকে টেক্কা দিতে কোনো চুনী পান্না নিয়ে বসেনি। সে এনেছে নাওরার জঙ্গলের শিকারীদের কাছ থেকে কেনা কিছু মৃগনাভি—আর গুজরাটি গুগ্‌গুল।

বাদশা জাহাঙ্গীর স্বাদু সিরাজি, কাবুলি চেরি, শেরগির হাতি, হাবসি সিংহ, বেদানার রসে মাখা ফুল ময়দার রুটি, আবুল হাসান বা মকসুদের আঁকা তসবির আর ঠমকদার জেনানার সমঝদার। সুরাইয়া বেগমের পসরা থেকে একটি মৃগনাভি হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে তিনি হাতের বাইরে সুবাস নিলেন। মৃগনাভি যাচাইয়ের এটাই সাচ্চা নিয়ম বা রাস্তা। পাকা তুর্কি পশম ব্যাপারীর ভাবভঙ্গি হুবহু ফুটিয়ে তোলায় সুরাইয়া বেগম তার চোখে সাবাসী দিলো। বেগমের একবার মনেও হলো বাদশা বুঝি মজে যাচ্ছেন।

হারেমের বড়া দরওয়াজায় মুসরেফদের কড়া চৌকি কিন্তু বন্ধ নেই। তাদের দস্তখতি কাগজ ছাড়া হারেমের খরচার জন্যে একটি দামড়িও খাজানাখানা থেকে দেওয়া হয় না। বেগমদের কিছু দরকার পড়লে তাঁরা মুসরেফের কাছেই আর্জি করেন। সে আর্জিতে বেগমের মাসোহারা, বয়স, অভাবের কথা লিখে রেখে মুসরেফরা তবে রুপেয়ার কাগজে দস্তখত করে। তাই এই জমজমাট মীনাবাজারের কাছাকাছি দাঁড়িয়েও মুসরেফরা তাদের সম্ভ্রান্ত ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে মুখে রুক্ষ ভঙ্গিটা যতখানি সম্ভব ঝুলিয়ে রেখেছে।

তারা নগদ রুপেয়ার বাইরে একটি দামড়িও বেগমদের হাতে ঠেকায় না।

বেগমদের ওড়না, কুর্তি, সাজপোশাক জেনানা দারোগারা সবাই মিলে পরামর্শ করে বাদশার মন জেনে তবে স্থির করে। সেসব পোশাকের কড়াকড়ি আজকের এই মীনাবাজারে বেগমরা মানেন না। আজ যেন সবাই স্বাধীন।

এই মীনাবাজারে হারেমের রুপেয়া, দাম, আধেলা, পাওয়া, দামড়ি বাজার চলতি রুপেয়া, দাম থেকে কিছু ভিন্ন। এখানকার রুপেয়া শুধু

এখানেই চলে।

বেগম মহলের পাহারাদার চেড়িরাও আজ মীনাবাজারে ফাই ফরমাশ খাটছে বেগমদের। বাদশা যে ঘরে যেদিন শোবেন—সে ঘরে সেদিন বেগমমহল পাহারায় সুন্দরী, অল্পবয়সী, বিশ্বাসী চেড়িরা থাকে। তারা বাদশার মন মেজাজ বোঝে।

হারেমের একেবারে বাইরে সবচেয়ে বড় পাহারায় রয়েছে রাজপুতরা। সময়ে সময়ে বাদশা কোনো বিশেষ ওমরাহ বা আহেদিকেও খাতির কদর করতে হারেমের বড় দরওয়াজায় পাহারাদারি দিয়ে থাকেন। আজ পাহারায় আছেন বুঁদির ওয়াতন মনসবদার রাজা ছোটে ছত্রশাল। বড় বড় ওমরাহ এই পাহারাদারি পাওয়ার জন্যে সবসময়ে তাকিয়ে থাকেন। হারেমের দেখাশুনোর ভার খোদ বাদশার হাতে।

সেই বাদশাই আজ খদ্দের। তুর্কি পশম-ব্যাপারী। তাঁকে খদ্দের হিসেবে পাওয়ার জন্যে হারেমের বেগম থেকে আমীর ওমরাহদের বেগম অব্দি সবাই কাড়াকাড়ি শুরু করে দিলো। বাদশাও যেন এত সুন্দরী সুন্দরী জেনানার ভেতর পড়ে গিয়ে আহ্লাদে আনন্দে রীতিমত বালক নাটুয়া হয়ে পড়েছেন। তিনি হাসছেন—খুব বেশি বেশি করে পশম ব্যাপারী হয়ে উঠেছেন। যাতে কিনা আশপাশের মীনাবাজারি বেগম-জেনানারা ঢলে ঢলে পড়ে—রসিকতা করে।

আগ্রায় এখন আনকোরা গ্রীষ্ম। আকাশে নানা রঙের ঘুড়ি। বাতাসে জাফরানের গন্ধ। বাদশা ভালো করে তাকালেন সুরাইয়া বেগমের মুখে। আজ সকালেই তিনি রাতের শিশির সঞ্চয় করা শরবতের পরই দুই গুলি আফিম খেয়েছেন। সঙ্গে খোবানি। বাদলাকিনারি কাঁচুলিতে আঁটো, চোখা এই আওরত আসলে যে কার—তা তিনি চিনে উঠতে পারলেন না। তাছাড়া সুরাইয়া বেগমের গায়ের চুয়ার গন্ধের সঙ্গে পসরার মৃগনাভির সুবাস মিশে গিয়ে সুরাইযার মুখখানা লাগলো যেন কোনো স্বপ্নলোকের। কিন্তু একটা মুশকিল হচ্ছিল বাদশার। তিনি সুরাইয়া বেগমের মুখ পাশাপাশি দু'খানা করে দেখতে লাগলেন। দেখতে দেখতে হঠাৎ বাদশা লক্ষ্য করলেন, তাঁর চোখের সামনে শাহজাদা খসরু—সামনের জ্যোৎস্না ভেজা প্রান্তরে তাকিয়ে। বাদশা নিজে যেন তাজা জোয়ান ছেলের পেছনে দাঁড়িয়ে। তিনি ছেলের পিঠ দেখতে পাচ্ছেন। শাহজাদার গা থেকে আতর মেশানো ঘামের গন্ধ বাতাসে। তুর্কি পশম ব্যাপারীর ছদ্মবেশে সেলিম জাহাঙ্গীর আর তিষ্ঠোতে পারলেন না। তিনি মুহূর্তে বাদশা হয়ে উঠলেন। ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে সারা মীনাবাজার স্তব্ধ। হিন্দুস্থান চলে একের ইচ্ছায়। কিংবা হিন্দুস্থান চলে নিজের ইচ্ছায়। যে যার কাজ করে যায় শুধু।

বাদশা সটান দিয়ে সুখদোলায় উঠলেন।

নূরজাহান বেগম আগ্রা দুর্গে আসার পর থেকেই বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীর

তাঁর কড়া শাসনে চলে এসেছেন। ইদানীং তিনি একাহারী হয়েছেন। সারাদিন বাদশা থাকেন নূর বেগমের কড়া নজরে। দিনে দুই গুলি আফিম। সন্ধের পর চেরির সঙ্গে সিরাজি—বলা ভালো, সিরাজির সঙ্গে চেরি—তার বেশি কিছু নয়। সেই সঙ্গে সামান্য নাচ গান। কিংবা রুমি বা সাদির রুবায়-ই।

এখন দিন বড় হচ্ছে। শাহী সড়কে গাছের নীচে ছায়ায় মানুষজন শুয়ে। সূর্য যমুনার ওপরে ঢলে এলো। ঠিক সেই সময় দেখা গেল—বাদশা মসনদে গম্ভীর মুখে বসে। চোখ বুজে এসেছে তাঁর মুখোমুখি গালিচায় বসে তিন ওয়াকেনবীশ—খুব মন দিয়ে লিখে চলেছে বাদশার মুখের কথা। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীর লেখা চলছে। বাদশা বললেন—

শাহজাদা খসরুকে শাহী উজিরে আজম আসফ খাঁয়ের হাতে তুলে দেওয়ার হুকুম দিলাম। এখন থেকে শাহজাদার আতালিক হলেন আসফ খাঁ। শাহজাদা খসরু এখন আসফ খাঁয়ের দেখভালে বুরহানপুর দুর্গে। আমার বড় ছেলেটি বড়ই শীতকাতুরে। বিয়ানা থেকে বুরহানপুর সে গেল এই গ্রীষ্মের ভেতর। কিন্তু শীত তো আবার আসছে। সেই শীতের কথা ভেবেই শাহজাদা খসরুকে একখানি খাসা শাল উপহার পাঠালাম।

বাদশা এখানে থামলেন। চোখ তখনো বুজে আছে। সেই অবস্থাতেই বাদশা অনেকক্ষণ চুপচাপ। উজিরে আজম আসফ খাঁয়ের হাতে শাহজাদা খসরুকে তুলে দেওয়ার আগে দুটি কাজ নিঃশব্দে করতে হয়েছে বাদশাকে।

গোঁয়ার কিন্তু বিশ্বস্ত—সাহসী কিন্তু দুর্মুখ অনু রায়কে শাহী হুকুমে দক্ষিণে বদলি করা হয়েছে। বদলির হুকুম পেয়ে অনু রায় বার কয়েক বাদশার মোবারকে নজর জানাতে এসেছিলেন। বাদশা দর্শন দেননি। কী করে দেবেন সেলিম জাহাঙ্গীর। অনু রায় তাঁকে একসময় বাঘের মুখ থেকে বাঁচান। অনু রায় জান পরোয়া না করে শাহজাদা খসরুর ওপর শাহজাদা খুর্রম, বেগম নূরজাহান, উজিরে আজম আসফ খাঁকে থাবা মারতে দেননি এতদিন। সেই অনুগত জনকে কোনো কারণ না দেখিয়ে নর্মদা পেরিয়ে বালাঘাটে বদলি করার পর বাদশা কী করে তাঁকে আর মুখ দেখান!

অন্ধ শাহজাদা খসরুকেও জানানো হয়নি—তিনি কোথায় যাচ্ছেন। কিংবা সুখদোলায় চড়িয়ে তাঁকে যে বুরহানপুরের দুর্গে পাঠানো হচ্ছে—তাও বাদশা তাঁর অন্ধ বড়ছেলেকে বলতে পারেননি। বলতে পারেননি—এখন থেকে তোমার আতালিক আসফ খাঁ। একখানি খাসা শাল উপহার পাঠিয়ে একজন বাবা তার স্নেহের—ভালোবাসার পরিচয় দিয়েছেন মাত্র। অন্ধ ছেলের মুখোমুখি হবার সাহসে কুলোয়নি একজন বাদশা বাবার। বাদশা জাহাঙ্গীরের মনে পড়লো, খসরুই তো একদিন জানতে চেয়েছিল—আপনি আমার কে হন আসলে? আমার আব্বা হুজুর? না, হিন্দুস্থানের বাদশা?

জাহাঙ্গীর টের পাচ্ছিলেন, সুদূরে বুরহানপুর দুর্গে দু'টি দৃষ্টিহীন চোখ আগ্রার দিকে তাকিয়ে আছে। ওই দুটি প্রশ্ন সেই দুই চোখে। খসরু, আমি তোমার বাবাও নই!—বাদশাও নই!

বাবা হলে তাকে আমি জেনে শুনে শাহজাদা খুর্রমের শ্বশুর আসফ খাঁয়ের হাতে তুলে দিতে পারি না। যদি আমি হিন্দুস্থানের বাদশা হয়ে থাকি তো আমার ইচ্ছাই হিন্দুস্থান। আমার তো ইচ্ছা ছিল না—শাহজাদা খসরুকে বুরহানপুরে পাঠাই।

তাহলে পাঠালাম কেন?

এইসব জিজ্ঞাসা আফিমের মৌতাতের ভেতর বাদশার মগজে শিথিল সুতো হয়ে ঘোরাঘুরি করতে লাগলো কিলবিল করে।

আসলে আমি আশিক। মাশুকা নুরজাহান বেগমের আশিক। তাঁর ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আমি শাহজাদা খসরুর আব্বা হুজুর নই। আমি হিন্দুস্থানের বাদশাও নই। আমি আসলে সামান্য একজন আশিক। নুরজাহান বেগমের ইচ্ছার হুকুমবরদার মাত্র। হিন্দুস্থানের শাহী হুকুমত বজায় করতে চাঘতাই পতাকাকে নর্মদার ওপারে উড়িয়ে নিতে শাহজাদা খুর্রমের তাগদ, জোশ, রৌশন চাই-ই চাই। এখন সে যদি চায় তার বড়ে ভাইকে উজিরে আজম আসফ খাঁয়ের হাতে তুলে দিতে—তাহলে?

তাহলে আমি কে?—একথা মনে আসতেই বাদশার মাথার ভেতর সব গুলিয়ে গেল। তিনি চোখ খুলবেন? না, চোখ বুজেই থাকবেন? তাও ঠিক করতে পারলেন না।

ওয়াকেনবীশরা ঠায় বসে। এর ভেতর একজন কিছু হালকা পাতলা চেহারার ওয়াকেনবীশ মির্জা রঘুনাথের বেশ বয়স হয়েছে। ফারসিতে তুখোড়। কিন্তু ঠোঁটকাটা। মানুষটি আসলে কনৌজি কায়েত। ইসলাম নেওয়ার পর আকবর বাদশার আমলে নয়া মুসলমান হিসেবে দেওয়ানখানায় চাকরি পায়। তারপর ধাপে ধাপে এই ওয়াকেনবীশিতে উঠে এসেছে। মির্জা রঘুনাথ চোখ বুজে থাকা বাদশা জাহাঙ্গীরের মুখে তাকিয়েছিল। দেখছিল—একজন বাদশার মুখ কেমন হয়। এতখানি ক্ষমতার ফোয়ারা যে মানুষ—তার নাক, কান, বুজে থাকা চোখ, ঠোঁট কেমন হয়ে থাকে। সে কি আমাদেরই মতো? মনে মনে মিলিয়ে দেখছিল মির্জা রঘুনাথ।

আচমকাই বাদশা জাহাঙ্গীরের চোখ খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মির্জা রঘুনাথ চোখ নামিয়ে নিলো। বাদশার মুখোমুখি তাকিয়ে থাকা রীতিমত বে-সহবত কাণ্ড।

বাদশার মুখে লালি ফিরে এসেছে। শাহী কপালে রেখাগুলোও মিলিয়ে গেল। তিনি বলতে থাকলেন—

বালাঘাট আবার শাহী আগ্রার হুকুমতে ফিরে এসেছে। বিজাপুর, গোলকুণ্ডাকে নিয়ে মালিক অম্বর আগ্রার বিরুদ্ধে জোট পাকাতে চেয়েছিল। চেয়েছিল—আহম্মদনগরে রাজধানী খিরকি হয়ে উঠুক তাগদের ফোয়ারা।

কিন্তু তা হয়নি। হয়নি শাহজাদা খুর্রমের তাগদে। মালিক অম্বরকে শায়েস্তা করতে বাবা খুর্রমকে আমি এখন দক্ষিণের সুবেদার পদে ইজফা দিয়েছি। বাবা খুর্রম মালিক অম্বরের রাজধানী খিরকি গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

সে-ই এখন সিপাহ্-সালার।

বাদশা একটু থামলেন। এবার চোখ বুজেই বলতে লাগলেন। কথা বলার সময় তাঁর ঠোঁটে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো।

শাহজাদা খুর্রম এবার দক্ষিণ থেকে আগ্রায় তাঁর ওয়ালিদা-ই-খোদ শুধু নুরজাহান বেগমকেই নজর পাঠিয়েছে দু'লক্ষ রুপেয়া। তাছাড়া বাকি সব আস্মিজানদের মিলিয়ে নজর পাঠিয়েছে মোট ষাট হাজার রুপেয়া—

তিন ওয়াকেনবীশ ঘাড় গুঁজে লিখে যাচ্ছিল। এমন সময় পা অব্দি আলখাল্লায় ঢাকা—বুকে জপের মালা ঢেকে ফেলা দাড়ি দোলাতে দোলাতে শাহীমহলে ঢুকে পড়লেন এক বুড়ো।

তাঁকে দেখে বাদশাও উঠে দাঁড়ালেন। ওয়াকেনবীশরাও অবস্থা বুঝে পাততাড়ি গোটালেন। কিছুকাল হলো বাদশা জাহাঙ্গীর ফকির-দরবেশ, সাধুসন্তদের দিকে ঝুঁকেছেন। বিশেষ করে শাহজাদা খসরুকে অনু রায়ের আতালিকি থেকে বের করে বুরহানপুরে উজিরে আজম আসফ খাঁয়ের আতালিকিতে পাঠানোর পর থেকেই। মির্জা রঘুনাথ আর দুই ওয়াকেনবীশকে দিনের ভেতর বেশ খানিকটা সময় তুজুক-ই-জাহাঙ্গীর লেখার জন্যে বাদশার কাছাকাছি থাকতে হয়—বলা যায় একেবারে তাঁর মুখোমুখি বসতে হয়। তাই ওরা লক্ষ্য করেছে—বাদশা যেন আজকাল কী এক অলৌকিক ঘটনার জন্যে খুব আশা করে অপেক্ষা করে থাকেন। তিনি যেন মনে করেন—কী একটা ঘটতে চলেছে—যাতে কিনা সব ঠিক হয়ে যাবে। না-লায়েক শাহজাদা পরভেজ লায়েক হয়ে উঠবেন। শাহজাদা শারিয়ার তো জওয়ান হয়ে উঠলো বলে। শাহজাদা খসরু আবার এই দুনিয়া দু'চোখ ভরে দেখতে পাবেন। শাহজাদা খুর্রম তাঁর তাগদ, জোশ, রৌশনের সবটাই নিজের আব্বা হুজুরের কদমে উজাড় করে ঢেলে দেবেন। এইসব অলৌকিক আশা পূরণে তাই বাদশা ইদানীং পীর ফকিরদের দোয়া, আগাম সংকেত বা সময় চান।

দেওয়ানি-খাস পেরিয়ে ওয়াকেনবীশরা দেওয়ানখানার কাছারি চত্বরে পড়লেন। সেখানে অভ্রের বাতিদানের আলোয় চারদিক উজ্জ্বল। জায়গাটা এখন সন্ধ্যার মুখে বেশ নির্জন। ঠোঁটকাটা মির্জা রঘুনাথ বললো, নুরজাহান বেগমের ইশকে হাবুডুবু খাওয়া বাদশার কাণ্ডটা দেখলে! নুরজাহান বেগম শেষে শাহজাদা খুর্রমের ওয়ালিদা-ই-খোদ পড়লেন?

বাকি দুই ওয়াকেনবীশ বেশ সতর্ক। তারা কোনো কথাই বললো না। মুঘল শাহী সংসার নিয়ে কোনো কথা পাঁচ কান হলে তো গর্দান যাবে। ঠোঁট কাটা রঘুনাথের বয়স হয়েছে। আকবর বাদশার আমল থেকে দেওয়ানখানায় ওঠাবসা তার। পরিষ্কার বললো, শাহজাদা খসরুর মা যোধপুরের রাজা বিহারীমল্লের মেয়ে—আর শাহজাদা খুর্রমের মা হলেন গিয়ে জগৎ গোঁসাইনী। তা নুরজাহান বেগম কবে থেকে খুর্রমের আসল মা হলেন? আফিমে— নুরজাহান বেগমের ইশকে বাদশার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে যে—

অন্য ওয়াকেনবীশ বললো, বাদশার পক্ষে এখন আফিমও যা—নূরজাহান বেগমও তাই।

তাই তো দেখছি! জগৎ গোঁসাইনী থাকতে নূরজাহান হয়ে পড়লেন, ওয়ালিদা-ই-খোদ!

কালের ইতিহাসের সাক্ষী এই তিন ওয়াকেনবীশ যখন দেওয়ানখানার চত্বর পেরিয়ে হাতিপোল দরওয়াজার দিকে এগোচ্ছিল তখন মসনদের সামনে সামান্য ঝুঁকে সেই বৃদ্ধ বললেন, আপনি আম-আতরাফ থেকে আমীর ওমরাহ—সবার বাদশা। আপনি দাঁড়াবেন কেন?

সেলিম জাহাঙ্গীর তবু বসলেন না। বিনীতভাবে বললেন, আপনি দীনদুনিয়ার বাদশা মিঞা মীর—খলিফা ওমরের বংশধর। এই বয়সেও এতটা কষ্ট করে লাহোরের কাফিপুরা থেকে এতদূর এসেছেন।

মিঞা মীর বাদশার উল্টোদিকে বসে বললেন, বয়স আর এমনকি বাদশা! দুনিয়াদারির হিসেবে মাত্র সত্তর বছর। আমরা শিস্তানের মানুষ। সেখানকার লোক অনেকদিন বাঁচে। পঁচিশ বছর বয়সে শিস্তান থেকে লাহোরের কাফিপুরায় চলে আসি—তাও তো পঁয়তাল্লিশ বছর হয়ে গেল।

—আমি আশাই করতে পারিনি আপনি আসবেন।

—হিন্দুস্থানের বাদশার ডাক বলে কথা! বলুন? কী কথা আছে আপনার?

—আমি আগ্রার সামান্য সেলিম জাহাঙ্গীর—

—আপনি সামান্য নন, বাদশা। শাহেনশা জালালুদ্দিন আকবরের মোনাজাতে সিক্রিতে খাজা সেলিম চিস্তির কুটিরে আপনার পয়দায়িস। সারা হিন্দুস্থান সেকথা জানে। বলুন?

ঠিক এমন সময় ফুলের মতো দেখতে দুই বালক ছুটতে ছুটতে মসনদের সামনে এসে দাঁড়ালো। তাদের ভেতর সামান্য ছোট জন একলাফে বাদশার কোলে বসে পড়লো। অন্যজন মসনদের পাশে দাঁড়িয়েই থাকলো।

সুফী মিঞা মীর দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটির মুখে তাকিয়ে বললেন, এরা দু'জনই আপনার নাতি নিশ্চয়?

—হ্যাঁ। কোলেরটি মহম্মদ সুজাঙ্গীর। আর এটি সুলতান মহম্মদ দারাশুকো।

দারার দিকে তাকিয়ে থাকলেন মিঞা মীর। বেশ খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, এরই পয়দায়িস খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তির দরগাহ—আজমিরে।

—আপনি তো সবই জানেন দেখছি—

—সারা হিন্দুস্থান জানে বাদশা। আপনার ঘরগেরস্থি নিয়ে তামাম হিন্দুস্থানের দেহাতে দেহাতে চর্চা হয়। তাগদদার শাহজাদা খুর্রমের তিনটি ছেলে এখন। ছোটজনের নাম আওরঙ্গজেব—তাও হিন্দুস্থানে সবাই জানে বাদশা। এদের বড়ভাই ওই মহম্মদ দারাশুকোকে পেয়েছেন শাহজাদা খুর্রম—

আজমিরে খাজা সাহেবের দরগায় অনেক-অনেক মোনাজাতের পর—একথা এখন কে না জানে ?

বলতে বলতে মিঞা মীর বালক দারার দিকে দু'খানা হাত তুলে ধরলেন। অমনি নীল চোখ, লাল ঠোঁট, রক্তে ফেটে পড়া সাদা বরফ পেছল খুনখারাবি গায়ের রংয়ের ফুটফুটে ছেলেটি একমাথা কালো চুল ঝাঁকিয়ে সুফী মিঞা মীরের কোলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

মিঞা মীর তাকে কোলে তুলে নিয়ে বসালেন। বালক দারার মনে হলো, গরমে সারা আগ্রার ভেতর জোব্বায় ঢাকা এই মানুষটির কোলই সবচেয়ে ঠাণ্ডা জায়গা। যেন বা গাছের ছায়া।

মিঞা মীর বললেন, বলুন ?

—তাগদ কী জিনিস ?

—আম আতরাফ সাধারণ মানুষ থেকে বাদশা অব্দি সবাই ভাবে—নিজের হাতের জোর, তলোয়ারের ধার, মোহরের ঝনঝনাই হলো তাগদ। আসলে তাগদ হলো আল্লাতালার কৃপা—

—ইনসান বাগী হয় কেন ?

—যে-ইনসান ইনসানিয়াতের উল্টো নির্যাতনের ভেতর—হৃদয়ের অপমানের ভেতর—লাঞ্ছনার ভেতর জীবন কাটায়—বেড়ে ওঠে—সে-ভাবে আমিও একদিন আমার নিচে সবাইকে নির্যাতন করবো—লাঞ্ছনা করবো—অপমান করে দেখবো—না জানি এসবে কী আশ্চর্য মধু লুকিয়ে আছে। তাই সবাইকে বাগে আনতে সে একদিন নিজেই বাগী হয়ে ওঠে। ক্ষমতার লোভে—না-চাখা আনন্দের লোভে—

মিঞা মীরের কোলে বসা বালক দারা সুফী মানুষটির গা থেকে কী এক আশ্চর্য সুবাস পাচ্ছিল। সে কোনো কথাই বুঝতে পারছে না। কিন্তু কথার সঙ্গে সঙ্গে মানুষটির দাড়ি নাড়া টের পাচ্ছিল। তার কানের পাশে। মাথার পাশে। পাখির পালকের মতোই।

—ইশক বলতে কী বুঝবো ?

—ইনসানে ইনসানে টান ভালোবাসায় এই শরীর থাকে অনেকটা জায়গা জুড়ে। তাতে থাকে লেনদেন—দেনাপাওনা। শরীর ছাড়িয়ে—হিসেব ছাড়িয়ে স্বার্থগন্ধহীন টান যখন অচিন পথে চলে তখনই তা হয়ে ওঠে সাচ্চা ইশক। সে পথ আনন্দের। সে পথ বিস্ময়ের। সে পথ বাদশা অকারণ পুলকের—পরমেশ্বরের দরওয়াজায় তখন আমরা পৌঁছে যাই—

বাদশা জাহাঙ্গীর ভরাট মনে বললেন, আপনি যা চান তাই হুকুম করুন। হিন্দুস্থানের বাদশা আপনার কদমে এখন ফরমায়েজ বরদার—আপনি কি কিছু চান আমার কাছে ?

—আমি যা চাই তাই-ই দেবেন ?

—আলবত। অতি অবশ্য আমি তা দেবো।

মিঞা মীর কোল থেকে সুলতান মহম্মদ দারাকে নামিয়ে দিয়ে উঠে

দাঁড়ালেন। তারপর বাদশার দিকে শান্ত চোখে তাকিয়ে বললেন, আমি চাই—আমি আপনার কাছে একটি জিনিস চাইবো। আপনি কথা দিন তা করবেন?

—বলুন—

—আমি চাই—আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হলো আপনি ভবিষ্যতে আর কখনো আমাকে আপনার কাছে টেনে এনে বিব্রত করবেন না।

বাদশার মুখখানি কৃতার্থ হবার জন্যে জ্বলে উঠেছিল। এ কথায় এক লহমায় নিভে গেল। তিনি স্তব্ধ হয়ে রইলেন। শেষে বললেন, আপনার হুকুম পালিত হবে।

মিঞা মীর যেমন এসেছিলেন—তেমনি চলে গেলেন সটান। বালক দারা টের পেল, দাড়িওয়ালা ফকিরের সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে সুবাসও বিদায় নিলো। সে বাদশার মুখের দিকে তাকালো। গম্ভীর। কিছু না বুঝে তার ছোটভাই সুজা বাদশার কোল থেকে মেঝের গালিচায় নামলো। ওর বড় লোভ বাদশার পায়ের চটিতে।

বেগম আরজুমন্দ বানুর হয়েছে মহা জ্বালা। তার খসম শাহজাদা খুর্‌রম যতই হিন্দুস্থানের শাহী হুকুমতে হামলা, দখল, তাগদে সবচেয়ে দরকারি ইনসান হয়ে পড়ছেন—ততই তিনি নিজের মানুষটিকে হারাচ্ছেন। ইদানীং অবরে সবরে শাহজাদা যখন দক্ষিণ থেকে আগ্রার ডাকে রাজধানীতে আসেন—তখন খুর্‌রমের গায়ে তিনি স্রেফ ঘোড়ার বদবু—বারুদের শুকনো গন্ধ পান। সেই গভীর চোখের মানুষটিকে আর পান না। ঘুমন্ত শাহজাদার গা থেকে উঠে আসে অচেনা মানুষের ছবি।

এখন আগ্রায় বর্ষা নেমেছে। কাল রাতে শাহজাদা এসেছেন। কিছুদিন থাকবেন। কেননা, নর্মদা এতই ফুলে ফেঁপে উঠেছে যে পেরিয়ে ওপারে ফিরে যাওয়া কঠিন। বেগম আরজুমন্দ বানু একথাও জানেন—শাহজাদার পক্ষে দক্ষিণ থেকে এতদূরে সর্বক্ষণ রাজধানীতে বসে থাকাও কঠিন। গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, আহম্মদনগর মানেই সুদূরের কোনো বারুদস্তূপ। যে কোনো সময় জ্বলে উঠতে পারে।

রাজধানীতে শাহজাদা ফিরলে আগেই খবর পাঠিয়ে দেন আরজুমন্দকে। কিন্তু খোদ আরজুমন্দের কাছে এসে পেঁছিতে পেঁছিতে আগ্রা ঘুমিয়ে পড়ে। বেগম অপেক্ষা করে করে ঢলে পড়েন। এক একদিন ঘুমন্ত বেগমের স্বপ্নময় মুখশ্রীর সামনে হিন্দুস্থানের সেরা লড়াকু শাহজাদা খুর্‌রম নতজানু হয়ে বসেন। বসে চুপচাপ দেখতে থাকেন নিজেরই বিয়ে করা বউকে—আর ভাবেন—আরজুমন্দ কত সুন্দরী। তখন তখনই তাকে জাগিয়ে তুলে শাহজাদা কখনো দেন গোলকুণ্ডার চুনী, বালাঘাটের মৃগনাভি—কখনো বা খিরকির কারিগরদের তৈরি মায়া-আরশি। ঘুম ভেঙে উঠে আরজুমন্দ সদ্য উপহার পাওয়া আরশিতে নিজের মুখ দেখে চিনতেই পারেন না। এ কোন্ আরজুমন্দ! অভিমানে, অপেক্ষায় ক্লান্ত আরজুমন্দ? জাহানারা, দারা, সুজা, রোশনআরা, আওরঙ্গজেবের আম্মিজান আরজুমন্দ? না, অন্য কোনো আরজুমন্দ?—যাকে

কিনা একজন বাদশার সেরা শাহজাদা—সেরা যোদ্ধা বিয়ে করার পর থেকেই গভীর ভালোবেসেও লড়াই, হামলা, শাহী শলা-পরামর্শের জন্যে এমনই ব্যস্ত থাকতে হয় যে একটুখানি কাছে যাবার জন্যে সময়ই করে উঠতে পারেন না।

বৃষ্টি ভেজা ভোরবেলায় আগ্রা দুর্গের ঝরোকা দিয়ে কেঁপে ওঠা যমুনার বুক দেখা যায়। গোয়ালিয়রের দিককার আকাশ মেঘে মেঘে জমাট হয়ে আছে। বেগম আরজুমন্দ ঘুমন্ত শাহজাদাকে না ডেকে ঝরোকার পাশেই ঢাকা চত্বরের নিচে এসে দাঁড়ালেন। এখান থেকে আগ্রার শাহী সড়ক বর্ষায় ডুবে যাওয়া যমুনার চর, দুর্গের সামান বুরুজে ঘড়িঘর, সানাইবাজিয়েদের নক্কারখানা—সবই দেখা যায়। এখনো সারাদিনের জন্যে আগ্রা জেগে ওঠেনি। নিচে যমুনা ঘেঁষে গড়ে তোলা মোতিবাগ থেকে ভিজে ফুলের সুবাস ওপরে উঠে আসছিল। আরজুমন্দ বানুর ভারি ভালো লাগলো। আজ দিনটা বড় সুন্দর। দূরে নিচে কয়েকটা লশকরি ইয়াবু ঘোড়া ভিজছে। ব্যাপারিরা পারা নিতে মাণ্ডিতে আসছে। কোনো সরাইখানায় এই সাতসকালেই মশল্লাদার ভুনি কাবাব খেতে হাটুরে মানুষের ভিড়। যদি আম আতরাফ সাধারণ ইনসান হতে পারতাম—তো আমিও এই ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজে মাণ্ডির রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে পারতাম। কিন্তু আমি যে শাহজাদার বেগম। হিন্দুস্থানের ভাবী বাদশার বেগম। সে হবার নয়।

ঘুরে তাকালেন আরজুমন্দ। ঘুম ভেঙে শাহজাদা কখন উঠে বসেছেন। মাথায় পাগড়ি নেই। এলোমেলো চুল। মুখের ওপর আলো পড়ায় খুর্রমকে একদম অন্য মানুষ মনে হলো আরজুমন্দের। তিনি কাছে গেলেন।

—একদম চেনা যায় না—

—কেন? পালটে গেছি বেগম?

আরজুমন্দ কোনো কথা বললেন না। মনে মনে বললেন, সে মুখ কোথায়? সব সময় যেন কেমন সন্ত্রস্ত চাউনি। যেন কোনো জং-কি-ময়দানে আছেন সবসময়। যে কোনো দিক থেকে যে কোনো সময় কেউ হামলা করতে পারে—তাই সবসময় জেগে থাকা এক অদ্ভুত সতর্ক ভঙ্গি—চোখ ছোট হয়ে আসা—কুঁচকে যাওয়া ভ্রু। ফর্সা লালচে মুখও যেন পুড়ে কালো হয়ে গেছে।

শাহজাদা খুর্রম নিজে থেকেই বললেন, ক'বছর হয়ে গেল—ঘোড়ার পিঠে পিঠেই তো আছি। রোদ-বৃষ্টি, নদী-পাহাড়—সব সময়ই তো ঘোড়ায় আছি। নয়তো তাঁবুতে। না পালটে উপায় আছে!

—আমি তোমার সঙ্গে যাবো এবারে—

—তা কী করে হয় বেগম। আমি আজ রাতে এখানে তাঁবুর উর্দু গাড়ছি—তো কাল সকালে আরেক জায়গায় তাঁবুর উর্দু গাড়ি। তুমি সেখানে কী করে থাকবে? লশকর, ঘোড়া, তোপ, হাতি, বন্দুকচীর মাঝখানে?

—তুমি যেমন করে থাকো শাহজাদা।

—তা হয় না আরজুমন্দ। তুমি থাকবে তোমার ছেলেমেয়েদের মাঝখানে—

—আর শাহজাদা তুমি থাকবে ঘোড়ার পিঠে! এই কি খোদার বন্দিশ?

শাহজাদা খুর্রম উঠে এসে তার বেগমকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, চিরকাল নয় আরজুমন্দ। চিরকাল নয়। আর কিছুদিন সবুর করো। দেখবে সব কিছু পালটে গেছে।

নিজের খসমের দু'হাতের শক্ত বাঁধনের ভেতরেও আরজুমন্দ একথায় কেঁপে উঠলেন। যেন তার পায়ের নিচের শুকনো পাথর এইমাত্র পেছল হয়ে পড়ায় তিনি পিছলে পড়ে যাচ্ছিলেন।

—এখন আমি আলা হজরত বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীরের ইচ্ছায় ঘোড়ার পিঠে পিঠে হিন্দুস্থানের এক কোণা থেকে আরেক কোণায় ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছি। একদিন তো তামাম হিন্দুস্থানে আমার ইচ্ছাই সব হয়ে দাঁড়াতে পারে।

—তার কী দরকার শাহজাদা? তুমি সুবেদার। তুমিই এখন শাহী সিপাহ্-সালার। আমরা তো সুখেই আছি। আমাদের আর কী দরকার?

—সবই কি দরকারে ঠিক হয় আরজুমন্দ? ইনসানের তো খোয়াবও থাকে। সে খোয়াব যদি সুনহ্‌রা—সে খোয়াব যদি সারা হিন্দুস্থান জুড়ে কেউ দেখে!

আরজুমন্দ বানু আর কথা বাড়ালেন না। নিজের মনে মনেই বললেন, হবে না—ওকে আমার ফেরানো হবে না। হলো না।

—কী?

—চলো না দেখবে—

শাহজাদা জানেন—বেগম আরজুমন্দ কিছুদিন হলো এই আগ্রা দুর্গে তাঁর নিজের মহলের গায়ে খানিকটা জায়গায় মাটি এনে নানারকম ফুলের চারা বসিয়েছেন। বেলি, লতানে চাঁপা, গোকুলা। বর্ষায় তারই কোনোটার ফুল এসে থাকবে।

—চলো।

আরজুমন্দ বানু শাহজাদাকে হাত ধরে পাশের টানা লম্বা ঘরে নিয়ে এলেন। সে ঘরের চিলমন, কুশন, দীবান, পালঙ্ক—সবই আলাদা। এই মেঘলা দিনের ভোরে ঘরখানা যেন বেহেসত্ হয়ে আছে। কিংবা স্বর্গের একটা টুকরো যেন এখানেই পড়ে আছে।

শাহজাদা খুর্রম চোখ ফেরাতে পারলেন না। পরপর পাঁচটি ইনসান শুয়ে। তার ভেতর জাহানারাই সবচেয়ে বড়। বছর সাত আট। আর সবচেয়ে ছোট—বছর তিনেকের সুলতান আওরঙ্গজেব একেবারে শেষে। মাঝখানে সুলতান মহম্মদ দারা, সুলতান সুজাঙ্গীর আর রৌশনআরা। সবাই ঘুমিয়ে। পাঁচ পাঁচটি শাহীফুলের ঘুম তখনো ভাঙেনি।

বেলা বাড়তে শাহজাদা খুর্রম বেরোবার জন্যে তৈরি হয়ে আরশির সামনে দাঁড়িয়ে উষ্ণীষে সরবন্ধ বাঁধছিলেন। এমন সময় নিচের মোতিবাগ থেকে ছেলেমেয়েদের চেঁচামেচি তাঁর কানে এলো। দু'একজন দাখিলার গলাও তিনি

পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরজুমন্দ বানুও ছুটে এলেন।

শাহজাদা আর তাঁর বেগম সঙ্গে সঙ্গে নিচে ছুটে গেলেন। গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন দু'জনেই। কোনো কথা নেই মুখে। শাহজাদাকে আর বেগমকে অমন ছুটে আসতে দেখে দাখিলারাও চুপ করে গেছে। জাহানারা একেবারে মোতিবাগের সিন্তানলতার কুঞ্জের কাছাকাছি। দারা, সুজা, রৌশনআরা, আওরঙ্গজেবের মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেছে। যাবারই কথা।

বর্ষার ভিজে মাটিতে যমুনার গায়ে নানান গর্তে অনেক সাপ থাকে। তাদেরই বিরাট একটা কালো সাপ উঠে এসে ধীরে ধীরে মোতিবাগের সেঁউতি কুঞ্জ দিয়ে বেলির গোড়া ছুঁয়ে যমুনার দিকে ফিরে যাচ্ছিল। আশ্চর্যের কথা—শাহজাদা খুর্রম দেখলেন—কালো সাপটার মাথায় খুব ছোট—সাদা মতো দেখতে একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে। ছেলেমেয়েরা সবাই তা দেখে নির্বাক।

শাহজাদা খুর্রম ইঙ্গিতে একজন দাখিলাকে কাছে ডাকলেন। তাকে কি একটা বললেন। অমনি সে দুর্গের সামান বুরুজের দিকে ছুটলো।

খানিক পরেই দেখা গেল, নজুমীর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছেন। বৃষ্টিতে তার গা ভিজে। খুর্রম সব বলে তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, এটা কিসের লক্ষণ? কিসের ইঙ্গিত?

নজুমীর আস্তে জানতে চাইলেন, সাপ দুটো কোথায়?

—তারা কি এতক্ষণ থাকে! কোথায় চলে গেছে।

—ওঃ! চলে গেছে? তা শ্বেত সর্প—কৃষ্ণসর্পের মাথায়—এ তো খুবই শুভ লক্ষণ।

—কিসের লক্ষণ? খুলে বলুন।

—এ দৃশ্য তিনিই দেখেন—যিনি ভাবী বাদশা।

শাহজাদা খুর্রম ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলেন।

নজুমীর ইউনানি ছক মতে সব বিচার করেন। তিনি জানতে চাইলেন, কে দেখেছেন সবার আগে? যিনি দেখেছেন সবচেয়ে আগে তিনিই হিন্দুস্থানের ভাবী বাদশা।

শাহজাদা ঠিক করতে পারলেন না, তিন ছেলে দারা, সুজা, আওরঙ্গজেবের ভেতর সবার আগে কাকে ডেকে জানতে চাইবেন, তোমাদের ভেতর কে সবচেয়ে আগে কালো সাপটার মাথায় কুণ্ডলী পাকিয়ে বসা সাদা সাপটাকে দেখতে পেয়েছো?

ওরা শিশু। ওরা সদ্য বালক। ওদের কাছ থেকে সঠিক জবাব পেতে হলে ওদের আলাদা আলাদা করে ডেকে জানতে চাওয়া দরকার। কাকে আগে ডাকবেন তা কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারলেন না খুর্রম।

মোতিবাগের সেঁউতি কুঞ্জ তখন বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে।

॥ এগারো ॥

ইংলিশস্তানের ইলচি স্যার টমাস রো রাজধানী আগ্রা থেকে এতদূরে হিন্দুস্থানের দেহাতে কখনো আসেননি। নীল আর তাঁতীদের সুতো নিয়ে যা কিছু জন কোম্পানির কাজ কারবার তিনি আগ্রায় কুঠিতে বসেই সেরে থাকেন। কিন্তু এবার তার বেরিয়ে না পড়ে উপায় ছিল না। লণ্ডন থেকে কোম্পানির গভর্নর বাহাদুর কড়া চিঠি পাঠিয়েছেন।

জায়গাটা আগ্রা থেকে দক্ষিণে—অনেক দূরে—বুরহানপুর। সাতপুরা পাহাড় পেরিয়ে তাপ্তি নদীর তীরে। এখন শীতের শুরুতে তাপ্তি বড় নিরীহ দেখতে। পথে আসতে আসতেই রো শুনে এসেছে—গত বর্ষাতেও তাপ্তি দুকুল ভাসিয়ে ক্ষেতি, গরু-মোষ ফর্সা করে দিয়েছে। এখন কিছু জানি না ভাব করে অনেক নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে। পরিষ্কার রোদে নীল জলধারা সামনে রেখে বিরাট এক গোলমোহর গাছের নিচে ঘোড়া থেকে নামলো টমাস সাহেব। আর এক রাতের রাস্তা কাবার করলেই বেরার সুবার সীমানায় গিয়ে পৌঁছনো যায়।

গঞ্জ মতো এই বুরহানপুর শহরে ঢুকতেই সবচেয়ে আগে চোখে পড়লো শাহী দুর্গের উঁচু সামান বুরুজ। সেখানে অনেক উঁচুতে চৌকির ভেতর পাথরের মূর্তির ভঙ্গিতে বন্দুক উঁচিয়ে দুই পাহারাদার দাঁড়িয়ে। শুনেছে—ওখানেই অন্ধ শাহজাদা খসরু এখন থাকেন।

দিনে দিনে ঘোড়ার পিঠে—নয়তো যেখানে যেমন পাওয়া যায় এমন টাঙায় রাস্তা ভেঙে ছয় ছয়টি রাত টমাস সাহেবকে কাটাতে হয়েছে ডাকচৌকিতে। খাওয়া দাওয়া সেখানকার সরাইয়ে। এইসব সরাইয়ের মোগলাই মশল্লাদার গোস্ত এখন আর তার মুখে রুচছে না।

এখন চাই চানের জন্যে গরম জল। পেটের জন্যে হাল্কা কিছু খাবার। সেই সঙ্গে বিশ্রাম। আগ্রার দেওয়ানখানার দেওয়া পরিচয় পত্রখানি জামার বাঁ হাতার নিচে গুঁজে নিয়ে আবার ঘোড়ায় উঠলো টমাস সাহেব। আরামের রোদ ছড়ানো সূর্য এখন মাথায়। রোদ, আলো—এই দুটো জিনিসের কোনো কিপটেমি নেই হিন্দুস্থানে। অঢেল।

এমন রাঙন মানুষ দেখার অভ্যেস নেই দেহাতের মানুষের। হাঁটু অব্দি ঢাকা চামড়ার ফিতেদার কালো জুতো। উরুর সঙ্গে এঁটে বসা সবুজ পাতলুন। তার ওপর পেছনকাটা লম্বা কোট। কোটের বুকের কাছটায় ঝালরদার সাদা জামা ঢেউ তুলে খানিক বেরিয়ে! মুখখানা রোদ চড়তেই লালচে পারা হয়ে উঠেছে টমাস সাহেবের। টাক ঢাকা লাল নৌকো টুপিখানার নিচে এক জোড়া নীল চোখ সবসময় এদিক ওদিক দেখছে।

দুর্গের তক্তা তোলা তোরণে দেহাতি মানুষের ভিড় জমে উঠেছিল স্যার টমাসকে দেখতে। ওপর থেকে তাড়াতাড়ি পাহারা নেমে আসতেই সে ভিড় পাতলা হয়ে গেল। ঘোড়া থেকে নেমে আগ্রার দেওয়ানখানার পরিচয়পত্রখানি

এগিয়ে দিলো টমাস সাহেব। এখানে কেমন ব্যবহার পাবে তা বুঝে উঠতে পারছিল না সে। আগ্রার হুকুম সব জায়গায় সময় ধরে চলে না। তা জানে স্যার টমাস।

বেশিক্ষণ কিন্তু তাকে দাঁড়াতে হলো না। দুর্গের ভেতর থেকে দু'জন নতুন পাহারা এসে স্যার টমাসকে ভেতরে নিয়ে গেল। বাঁধানো চাতাল দিয়ে পাহারাদের সঙ্গে জোর কদমে হাঁটতে হাঁটতে স্যার টমাস লক্ষ্য করলো, দুনিয়ার সব দুর্গই একই নিয়মে বানানো। বিপদে জল ঢোকানো বা বের করে দেবার জন্যে অন্য দুর্গের মতোই এখানেও তাপ্তির জলের সঙ্গে ঘেরাও নালার সরাসরি যোগ। দরকার মতো পাথরের দরজা ওঠানো নামানোর ব্যবস্থাও আছে।

কড়া পাহারার ভেতর তিন তিনটে দরজা পেরিয়ে স্যার টমাস এসে যখন তাপ্তির খোলা বুকের মুখোমুখি এক বিশাল চাতালে হাজির হলো—তখন দেখে—দুর্গের মাথায় দশাসই লড়াকু চেহারার একজন মানুষ একটা উঁচু দীবানে বসে আছে—আর তার সামনে ঝকঝকে সাদা গোঁফ ঝুলিয়ে একটা পাকানো শরীরের ধড়িবাজ দেখতে বুড়ো খুব তোষামোদ করে কথা বলে চলেছে।

নিজের সম্ভ্রম বাঁচিয়ে সামান্য ঝুঁকলো স্যার টমাস। তারপরই সিধে হয়ে দাঁড়ালো। বললো, আশা করি আমি এখন কেল্লা-ই-আজম-এর বরাবরে এসে দাঁড়িয়েছি—

কেল্লা-ই-আজম হাত তুলে বসতে ইঙ্গিত করে বললেন, আগ্রার কাগজ দেখলাম। আপনি জন কোম্পানির হয়ে আসছে সনের জন্যে দাদন দিতে এসেছেন—

—আপনি তো সবই ভালো করে জানেন দেখছি।

—জানি বলেই তো দোটানায় পড়েছি ইলচিমশায়।

—দোটানা কিসের ?—অবাক হয়ে জানতে চাইলো স্যার টমাস।

কেল্লা-ই-আজম সেই সাদা ঝোলা গোঁফকে দেখিয়ে বললেন, ওকেই জিজ্ঞাসা করুন না কেন !

গোঁফওয়ালা লোকটি নিজেই বললো, আমি চৌধুরী গয়ানাথ। শাহী হুকুমতের পুরনো বনজারা।

স্যার টমাস রো এক লহমায় সব বুঝে ফেললো। কিন্তু মুখের ভাব একটুও বদলাতে দিলো না। শান্ত গলায় বললো, বলুন চৌধুরীজি।

—টমাস সাহেব আপনি যে-কাজে এসেছেন—আমিও সে কাজে এসেছি এই বুরহানপুরে—এখানকার দেহাতে দানাদার গেঁহু যেমন হয়—তেমনি হয় মিহি সুতোর তুলো।

—দু'জনই চাষীদের দাদন দিতে এসেছি। শুধু ফসলটা দুজনের দু'রকম চৌধুরীজি !

গয়ানাথ গম্ভীর গলায় বললো, হুঁ। আপনি চান তুলো। আমি চাই গেঁহু। এই যা—

কেল্লা-ই-আজম রসিকতা করে বললেন, এবার আপনারাই দু'জন মিলে একটা ফসল স্থির করুন। তা ঠিক হলেই আমি সরকার বুরহানপুরের গাঁও মুকদ্দমদের ডাকবো।

ছয় ছয়টা রাত সরাইয়ে কাটিয়ে স্যার টমাস রোয়ের আগ্রা থেকে এতদূর আসা। ইউরোপের বাজারে হিন্দুস্থানের রংদার কাপড়ের চাহিদা যতটা, ততটা কাপড় পাঠাতে না পারায় লণ্ডন থেকে জন কোম্পানির গভর্নর বাহাদুর কড়া ধাতানি দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। সামনের বছরের সরবরাহ বাড়াতে টমাস সাহেবকে এখানে দাদনের ঝোলা নিয়ে হাজির হতে হয়েছে। আর এখানেই মূর্তিমান বিপত্তি চৌধুরী গয়ানাথের মতো শাহী বনজারা এসে হাজির।

স্যার টমাস দেখলো—ব্যাপারটার এখন এখনই ফয়সালা হলে হাওয়া তার বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে। এই বনজারারা শাহী ফৌজকে রসদ যোগায়। গেঁহু থেকে বারুদ—লশকরি আঙরাখা থেকে ধানুকীর তীর—সবই এরা যোগাড় করে ফৌজকে পাঠায়। এ জন্যে চৌধুরী গয়ানাথ শাহী খাজানাখানা থেকে কোটি রুপেয়া দরকারে আগাম পায়। সুতরাং তবিলের ঝনঝনায় রো গয়ানাথের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না। তাই সময় নেওয়া দরকার। স্যার টমাস বললো, তাড়াতাড়ি কিসের। আগে তো গরম জলে চান করি—

সহবত মোতাবেক কেল্লা-ই-আজম শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পাহারা এসে স্যার টমাসকে আবদারখানির দিকে নিয়ে গেল। কাঠের ঘেরাওয়ের ভেতর দুর্গের হামাম। কেল্লা-ই-আজম নিজের চানের জায়গাটি ছেড়ে দিয়েছেন। গা ঘষতে ঘষতে ইংলিশস্তানের ইলচি বুঝলো, এত খাতির যার—তখন ভালোরকম প্যায়েরভি ছাড়তে হবে। প্যায়েরভি ছাড়া হিন্দুস্থান চলে না। আগ্রার দেওয়ানখানার কাছারিতে আশরফি ঝাড়লে তবে শাহী দফতরখানার এক চত্বর থেকে আরেক চত্বরে কাগজ এগোয়। সারা হিন্দুস্থান চলে প্যায়েরভিতে।

হামামের জানলা দিয়ে রো তাপ্তির ওপারে তাকালো। দুপুরের বুরহানপুরে ওপারে যেন মেলা বসে গেছে। সারি সারি গো-গাড়ি, শোনপথের দিককার আলিসান সব বলদের মাথা—ধুলোর মেঘের ভেতর জেগে উঠেছে। তার ভেতর আবছামত সব তাঁবুর উদু ঠেলে উঠেছে।

চান সেরে পরিপাটি করে পোশাক পরলো ইলচিমশায়। গরম জলে গা ঘষে চান করে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে উঠেছে। তাপ্তির ওপারে একবার যেতে হয়। মেলা বসে থাকলে নিশ্চয় সরকার বুরহানপুরের তাঁতীরা তাদের পসরা সাজিয়ে বসেছে। নানান্ বুনটের সুতোর নমুনা পাওয়া যাবে। চাই কি কেতাদুরস্ত কাপড়ের খোঁজও পাওয়া যেতে পারে। সেসব কাপড়ের নমুনা দেখে লণ্ডনে জন কোম্পানি হামলে পড়তেও পারে।

আবদারখানার পাশেই রসুইখানা। সেখান থেকে সুসিদ্ধ মাংসের সঙ্গে পরিণত মশল্লার পাকা মিশেল সুবাস ছড়াচ্ছে প্রথম শীতের বাতাসে। এটা দই মাংসের মালঘোবা রান্নার গন্ধ। টমাস সাহেব ভেবেছিলো আর মাংস খাবে না।

কিন্তু এই প্রিয় গন্ধে তার শরীরটা চনমন করে উঠলো।

কেল্লা-ই-আজমের মুখোমুখি খেতে বসতে হলো টমাস সাহেবকে। রসুইখানার চাশনিগির দস্তরখানা পেতে প্রথমেই সাজিয়ে দিলো লাল লাল কাবুলি বাবাসেতি ফল। তারপর এলো ফারসি নিরামিষ রান্না সুণ্ডিয়ানা। তাতে মুখ বদলে ইংলিশস্তানের ইলচির ক'দিন ধরে একটানা গোস্ত খাওয়ায় কাঁটা কাটলো। কিন্তু কেল্লা-ই-আজমের তরফ থেকে এতটা খাতিরের বহর দেখে টমাস সাহেব ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলো। কেননা, আগের ডাকেই লণ্ডন থেকে কোম্পানি বাহাদুর জানিয়েছেন—কাজ উদ্ধারের জন্যে এভাবে সারা হিন্দুস্থানে প্যায়েরভি ছড়াতে থাকলে 'কমপানিজ ককার উইল রিচ্ ইটস্ রক বটম্!'

কেল্লা-ই-আজম খেতে খেতে জানতে চাইলেন, আগ্রা কেমন আছে?

রাজধানীর চালেই ইলচিমশাই বললো, আগ্রা আগ্রার মেজাজেই আছে। রাজধানী কি কারও দিকে তাকায়!

—তা সত্যি। —বলতে বলতে কেল্লা-ই-আজম বললেন, আমি মির্জা জানি বেগ। আমার বড়েভাই টার্ডি বেগ বাদশার সিংহের দেখাশুনো করতেন।

—এখন করেন না?

—সেই কথাই বলছি। একবার বাদশার সামনে খোলা চত্বরে একটা হাবসি সিংহ ক্ষেপে যায়—

—তারপর— ?

—খোদ বাদশাই সিংহটাকে সামলান। লজ্জায় অপমানে বড়েভাই নিজের ছুরি দিয়ে খুদখুশী করছিলেন। কিন্তু তাঁকে বাধা দেন উজিরে আজম। তারপর—টার্ডি বেগকে আগ্রায় কেউ আর দেখেনি।

—কোনো খবর পাননি?

—না। বড়েভাই বেঁচে আছেন? না, আগ্রার কোনো কয়েদখানায় পচে মরছেন—তা আমরা জানি না।

স্যার টমাস রো খাওয়া থামিয়ে হাত গুটিয়ে বসেছিল। জানি বেগ বললেন, আপনি তো আগ্রা দুর্গে যান আসেন—আপনি কি একটু খুঁজে দেখবেন—আস্ত একটা মানুষ উবে যায় কী করে?

—অবশ্যই। আমার ক্ষমতায় যা কিছু করার সবই করবো জানি বেগ।

—হয়তো দেখুন গে গোয়ালিয়র দুর্গে বড়েভাই পড়ে আছেন। সিংহের মনমেজাজ কি ইনসান সবসময় ঠিকঠিক ধরতে পারে? হয়তো পপির শরবত খাইয়ে দেওয়ায় মানুষটা সবকিছু ভুলে গিয়ে কয়েদখানার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

—আপনি এত বড় দুর্গের কেল্লা-ই-আজম। আপনি বুরহানপুরের ফোতেদার। আপনি আগ্রায় গিয়ে খুঁজে বের করতে পারেন না বড়েভাইকে?

—খোঁজ করেছি আগ্রায় গিয়ে। কিন্তু মুশকিল কি জানেন—আমরা যে উজবেক।

—তাতে অসুবিধে কিসের ?

—হিন্দুস্থানে উজবেক, ইরানি, তুরানিরা—মানে বাইরে থেকে যারা এসেছি এদেশে তারা আজও বাইরেই আছি !

—তাই কি ? ইস্পাহানের আসফ খাঁ-ই তো শাহী উজিরে আজম।

—মির্জা জানি বেগ একটা বাবাসেতি তুলে নিয়ে কামড় দিলেন। তারপর বললেন, আসফ খাঁয়ের কথা আলাদা। তিনি নূরজাহান বেগমের ভাই। আমরা ইরানি, তুরানি, উজবেকরা নগদে তনখা পাই। তনখা আমাদের এদেশীদের চেয়ে বেশিই—কারণ, ওরা যে জায়গীর পায়।

—আপনারাও জায়গীর নিলে পারেন—

—আমরা ফৌজি। এদেশের জমিন জায়গার মুঝাচিয়াত বুঝি না। নগদে তনখাই ভালো আমাদের। এই তনখাই আমাদের কাল হয়েছে টমাস সাহেব।

—কেন ? কেন ?

—বড় বড় জায়গায়—আগ্রা দুর্গে—দেওয়ানখানার কাছারিতে—সব জায়গায় রাজপুতেরা বসে আছে। ওরা কম তনখা পায় বলে আমাদের জায়গা মতো পেলেই হয়রান করবে—আগ্রা দুর্গে দেওয়ানখানার কাছারিতে গিয়ে বড়োভাইয়ের খোঁজ করে তাই কোনো হদিসই পাইনি।

স্যার টমাস মনে মনে বললো, আচ্ছা ! তোমার একটা দুর্বল জায়গা পাওয়া গেল শেষে। এই পথ দিয়েই ইংলিশস্তানের ইলচি তোমার ভেতরে ঢুকবে মির্জা জানি বেগ ! আগ্রায় আশরফি ছড়ালে টার্ডি বেগের হদিস করতে কতক্ষণ !

দুপুর দুপুরই স্যার টমাস অনেকটা জায়গা চর পেরিয়ে তাপ্তির ওপারে গিয়ে উঠলো। সব দেখে তার চক্ষুস্থির। এ তো মেলা নয়। বলা যায় শাহী বনজারা চৌধুরী গয়ানাথের রসদ কেনাবেচার জলুস। পালে পালে বলদে টানা গো-গাড়ি। হিন্দুস্থানের এক দিক থেকে গেঁহু, বজরা, মধু, সোরা—শতেক পসরা কিনতে কিনতে চলেছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে সুবিধা মতো জায়গায় বোঝা খালাস করে দিয়ে বিক্রিবাটাও চলছে। তিনখানা বাঁশ দিয়ে ঝোলানো ওজনের কাঁটা। পরপর সারি সারি তাঁবু। এ যে একেবারে চলন্ত মাণ্ডি। মূলধন বলতে শাহী খাজানাখানার দাদনের রুপেয়ায়। চৌধুরী গয়ানাথ কিনে চলেছে শাহী রুপেয়ায়। বিক্রিও করছে শাহী দুর্গে—শাহী ফৌজি ছাউনিতে। বিশেষ করে শাহজাদা খুররম দক্ষিণে মালিক অম্বরকে শায়েস্তা করতে নামায়—এই ক'বছর শাহী ফৌজের জন্যে রসদ যোগাড়ের বহর যে কিছু বেড়েই গেছে তা দেহাতে ঘুরতে বেরিয়ে গো-গাড়ির সারি দেখলেই মালুম হয়।

সন্ধেবেলা কেল্লা-ই-আজমের মুখোমুখি হলো দুজনই—স্যার টমাস আর চৌধুরী গয়ানাথ। গয়ানাথের কথা একটাই। গত বর্ষায় সরকার বুরহানপুরে তাপ্তি সব চাষবাস ভাসিয়ে দিয়েছে। এবার তাই অনটনের বছর। সামনে দুর্ভিক্ষও দেখা দিতে পারে। গাঁয়ের মুকদ্দমরা বলছে, গেঁহু লাগাবো শীতে। বৈশাখে গেঁহু উঠলে ভালো দর পাওয়া যাবে। তুলো চাষে এত পয়সা আসবে না।

এসব কথা এলোমেলোভাবে বলে চৌধুরী গয়ানাথ এইভাবে তার যুক্তিতে শেষ পোঁচ লাগালো—টমাস সাহেব আপনি কি হিন্দুস্হানকে দুর্ভিক্ষের মুখে ঠেলে দিতে চান ?

স্যার টমাস বুঝলো, সে বাঘের মুখে পড়েছে। পাথরের দেওয়ালে গয়ানাথের ছায়াটাও পড়েছে বাঘেরই মতো। কেল্লা-ই-আজম মির্জা জানি বেগ সামান্য আলোতেই তার আকবরি পিস্তলটার নলের মুখে ফুঁ দিয়ে দেখছিলেন, টোটা বেরোবার রাস্তায় কোথাও কোনো ময়লা জমে আছে কিনা। তার ফলে একটা তীক্ষ্ম শিসধ্বনি উঠছিল নল দিয়ে।

টমাস সাহেব বললো, একথা বলছেন কেন চৌধুরীজি ? আমি জানি আপনাকে শাহী ফৌজকে রসদ যোগাতে হয়।

—আপনি কারও চেয়ে কিছু কম জানেন না ইলচিমশায়। আগ্রায় বাদশার সামনে আপনার ওঠাবসা। আপনি সরকারে সরকারে ঘুরে দাদন দিচ্ছেন তুলো চাষের জন্যে—সামনের মরসুমে তুলোর আবাদী হলে গেঁহুর কী হবে ? দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে নাকি ?

—এত বড় হিন্দুস্থান—তার কয়েক সরকারে তুলো হলে হিন্দুস্হান সেই সুতোয় কাপড় তৈরি করে বাইরে ভালো দর পাবে—চাষীরাও দুটো রুপেয়ার মুখ দেখবে। লণ্ডনের বাজারে হিন্দুস্হানের রৌশন হবে। সারা হিন্দুস্হান পড়ে রয়েছে—তার সবটাতেই গেঁহু লাগান না কেন ! এখানে তুলো হোক। তাঁতীরা দুটো দামড়ির মুখ দেখুক।

—আমি শাহী ফৌজের রসদে টান পড়তে দিতে পারি না। হিন্দুস্হান আমাদের দেশ। এখানকার ক্ষেতিবাড়ি কি লণ্ডন থেকে ঠিক হবে ইলচিমশায় !

মির্জা জানি বেগ হা হা করে ওদের দুজনের মাঝখানে পড়লেন। নিন—আপনারা এখন থামুন। এমন সুন্দর সন্ধ্যায় গেঁহু—তুলো আর ভালো লাগছে না। আসুন একটু সেবা করুন—

এই বলে জানি বেগ গরম গরম হালিমের ধোঁয়া ওড়ানো পাত্র এগিয়ে দিলেন। স্যার টমাস হাত এগিয়ে দিলো। চৌধুরী গয়ানাথ হাত গুটিয়ে নিলো।

—ওঃ ! আপনার তো এসব চলবে না। নিন্—আপনি এই বাবাসেতিটা খান। টাটকা—

চৌধুরী গয়ানাথ বাবাসেতিটা হাতে নিলো। তখন তখনই খেল না। কালো হাতের ভেতর লাল, গোলমত বড় একটা বাবাসেতি। গায়ে মোটা জৌনপুরী খাস জোব্বা। পাকানো মুখের ওপর সাদা ঝকঝকে ঝোলা গোঁফ।

মির্জা জানি বেগ বললেন, এখানে শেষ কথা বলতে পারে চাষীরা। বলতে পারে তাঁতীরা।

চৌধুরী গয়ানাথ বাঘের মতো চেঁচিয়ে বলে উঠলো, চাষীরা তাঁতী নয়।

সঙ্গে সঙ্গে স্যার টমাস বললো, কিছু কিছু তাঁতী আবার চাষীও বটে—

হিন্দুস্হানের দেহাতের চাষী, তাঁতীদের ব্যাপারে একজন বিদেশীর এমন

টনটনে জ্ঞান দেখে স্যার টমাসের মুখে অবাক হয়ে তাকালেন জানি বেগ। বললেন, বেশ তো। কালই সকাল সকাল আপনারা দু'জনে কয়েকখানা গাঁয়ে ঘুরে আসুন। দেখুন চাষীরা কী বলে—তাঁতীরাই বা কী বলে—? গানেকরদের সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যাবে। বোঝা যাবে গাঁয়ের মুকদ্দমদের সঙ্গে কথা বললে।

স্যার টমাস সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। সে জানে, ফল তো বলবে নগদ রুপেয়া। দরবারের ঘর-গেরস্থিতে নগদ নগদ দামড়ি, আধেলা পড়লে কথা তার দিকেই ঘুরে যাবে। চৌধুরীজি কি সঙ্গে সঙ্গে রুপেয়ার ঝুলি ঢেলে উপুড় করে দিতে পারবে?

চৌধুরী গয়ানাথ চুপ করে থাকলো। দুর্গের চাতালে ঘোড়ার পা বদলানোর শব্দ। দূরে তাপ্তির ওপারে চৌধুরী গয়ানাথের জৌলুসের তাঁবুতে তাঁবুতে আলোর ফুটকি।

রাত বাড়তে তামাম হিন্দুস্থান নিঃঝুম হয়ে যায়। বুরহানপুরও সেই নিঃঝুম অন্ধকারে ঘুমিয়ে পড়লো। পরদিন সকালে দেখা গেল এক বিচিত্র দৃশ্য। একদম উল্টো পোশাক পরা মানুষ দুটি ঘোড়ায় চেপে তাপ্তির গা ধরে সাতপুরা পাহাড়ের দিকে চলেছে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে দশ বারোজন ঘোড়ওয়ারের ছোট্ট একটি রিসালা।

রাস্তা যতই দেহাতে ঢুকছিল—ততই ঘাসে দু'পাশ ঢেকে আসছিল। গয়ানাথ সঙ্গে রিসালা নেবার পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু টমাস সাহেবের জন্যেই নিতে হয়েছে। রাস্তার কুকুরে ইংলিশস্তানের ইলচির বড় ভয়। ঘোড়ার ওপর তার অপরিচিত চেহারা দেখলেই আগ্রার বাইরে কয়েকবার কুকুররা লাফ দিয়ে দিয়ে ছুটে এসেছে। প্রায় কামড়ে দিতো। আর এ তো দেহাত।

সকালবেলার ছোট্ট এই বিচিত্র মিছিল যতই গাঁ বসতির দিকে এগোচ্ছিল—ততই বুরহানপুরের দুর্গ থেকে আসা ঘোড়সওয়ারদের গা ঘামানো দুলকি চাল স্যার টমাসের চোখে পড়ছিল।

ওরা সবাই মির্জা জানি বেগের তাঁবের ঘোড়সওয়ার। বলক্ কিংবা বাদাকশানের মানুষ হবে হয়তো। সারা হিন্দুস্থানের ফৌজি লশকর এক বিরাট অজগর। কান্দাহার থেকে কামরূপ ছড়িয়ে আছে এরা। ঘোড়সওয়ারদের মুখের কথা যা দু'একটা শুনতে পাচ্ছিল টমাস—তার কিছুই বুঝতে পারছিল না। লশকরে হরেক দেশের মানুষ—তাদের হরেক ভাষা। রুপেয়ার তিন ভাগের একভাগ ইরানি। প্রায় সিকিভাগ রাজপুত। বাকিদের নিয়েই রুপেয়ার প্রায় অর্ধেকটা। সেই অর্ধেকে আছে আফগান, বাদাকশান, উজবেক, তুরানি, এদেশী সব খান-মহম্মদ আর বলুকের লড়াকুরা। এত ভাষা কি বাদশা নিজেও বোঝেন? ভেবে উঠতে পারলো না স্যার টমাস। কয়েকটি টিলা পেরিয়ে এগোতেই হিন্দুস্থানের সাচ্চা দেহাত বেরিয়ে পড়লো। ক্ষেতিবাড়িতে জল দেবার জন্যে কুয়োর ওপর চাকা লাগানো বিরাট এক চক্কর। তার কপিতে মোটা

রশি। আরে উট গেল কোথায় ?

চৌধুরী গয়ানাথ অবাক হলো। উটটা কোথায় ? কুয়োর কাছাকাছি এসে ওরা দেখলো, জল তোলার কাঠের চাকাটা ভাঙা। তার কাঠিতে কাঠিতে নিচে থেকে জল তোলার ভিস্তি বসানো।

কুয়োর পাড়েই একটা ঝাঁকড়া মতো মহুয়া গাছ। পাকা মহুয়া ফল পড়ে গাছতলা প্রায় ঢেকে ফেলেছে। গয়ানাথ অবাক হলো। তাজ্জব কি বাত! মহুয়া ফল পড়ে পচছে—আর উট নেই ?

স্যার টমাস রো না বুঝতে পেরে বললো, মানে ?

—সারা মরসুম যে-উট এই চাকা টানে সে তো পড়ে থাকা পাকা মহুয়া খাবেই। ওটাই তার খাবার। মহুয়া খায় না এমন উট আছে নাকি হিন্দুস্থানে!

—হয়তো কোথাও চরতে গেছে—

—এখন চরে বেড়াবার সময় ? এখন গেঁহুর জমি জিরাত তৈরি করার সময়। উট জল তুলবে—উট হাল টানবে—তাইতো জানি। একজন ইনসানকেও তো দেখতে পাচ্ছি না।

আর খানিকটা এগিয়ে সবার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। মাটির রাস্তায় গভীর করে গো-গাড়ির শিক বসে গেছে। এক এক শিকের ওপর দোগুণী, চারগুণী করে শিকের দাগ।

রিসালার এক ঘোড়সওয়ার বললো, কেল্লা থেকে এ জায়গা এক মঞ্জেল হবে বড় জোর। কিছুই তো টের পাইনি আমরা।

স্যার টমাস বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে বললো, কী টের পাবে ?

—এ রাস্তা দিয়ে শাহী ফৌজ গেছে নিশ্চয়। চারদিকের অবস্থা দেখছেন না! ওই তো তোপ টেনে নিয়ে যাবার দাগ মাটিতে।

গয়ানাথ বললো, হাতিও ছিল নিশ্চয়। নয়তো ওইসব ডাবা গর্ত আসবে কোত্থেকে ?

আরেকটু এগোতেই সারা গাঁয়ের চেহারা পরিষ্কার হয়ে উঠলো। একখানা ঝুপড়িও আস্ত নেই। যেন কেউ হাতি লেলিয়ে দিয়ে সব লণ্ডভণ্ড করে ধামসে দিয়ে গেছে।

চৌধুরী গয়ানাথ নিজেই বিড় বিড় করে বললো, গাঁয়ের কুকুরগুলো গেল কোথায় ? মানুষজন ?

কেল্লা থেকে পাঠানো সঙ্গী রিসালার এক ঘোড়সওয়ার চাপা হেসে বললো, এ তো কেল্লা থেকে বেরিয়ে আসা পাহারা লশকর নয় চৌধুরীজি! এ হলো গিয়ে শাহজাদা খুররমের হামলাই ফৌজ—

স্যার টমাস রো অবাক হলো। কী করে বোঝা গেল ?

সেই ঘোড়সওয়ার তখন রিসালার ভেতর ঘোড়ার পিঠে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। সে শুনতেও পেল না।

তখন চৌধুরী গয়ানাথ বলছিল, একটা ঘোড়া বা উট—এমনকি গাঁয়ের

গরু মোষগুলোকেও দেখছি না।

প্রায় সব ঘরই ভাঙা। চালের খড় খুলে নেওয়া হয়েছে যেন। এত বড় গাঁ—অথচ একটা মোরগের ডাক নেই। ঘরের আড়া ভেঙে হলুদে রাঙানো একটা মস্ত পিপুল কাঠ কারা যেন নিয়ে যেতে পারেনি বলে রাস্তাতেই ফেলে গেছে।

স্যার টমাস বলেই ফেললো, কার সঙ্গে কথা বলবো? একজন মানুষও তো দেখতে পাচ্ছি না—

মানুষের দেখা পাওয়া গেল। গাঁয়ের শেষে। সাতপুরা পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসা পাথরের ঢালে।

কিছু বুড়ো। আর কিছু গুঁড়ো। জনা কয়েক বুড়ি। একটি বউ। আর কিছু আধশোয়া মানুষজন। তারা কাঠকুটোয় আগুন জেবলে খাবার দাবারের যোগাড়যন্তর করছিল। ঘোড়সওয়ার দেখে ছুটে পালাতে গেল কয়েকজন। ঘোড়সওয়াররা ঘোড়া দাবড়ে তাদের ঘিরে ফেললো।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন বাচ্চা কেঁদে উঠলো। কেঁদে উঠলো কয়েকজন বুড়োও। আধশোয়া একজন ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে পালাচ্ছিল। সে ঘোড়সওয়ারদের তাড়া খেয়ে পড়ে গিয়ে গোঙাতে লাগলো।

সবার আগে ঘোড়া থেকে নেমে চৌধুরী গয়ানাথ সবাইকে হাত তুলে অভয় দিলো, আমরা ফৌজ নই ভাই—ফৌজ নই—বনজারা—

কান্না একটু থামলো। গোঙাতে থাকা লোকটি আধশোয়া ভঙ্গিতে উঠে বসার চেষ্টা করলো। ওদের ভেতর এক বুড়ি এগিয়ে এসে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। কাঁদতে কাঁদতেই বললো, কাল ভোর রাত থেকে এই পথ দিয়ে শাহী ফৌজ গেছে। ওদের পথে যেসব গাঁ পড়েছে—সেগুলো আর নেই—

এবারে অনেকে একসঙ্গে কথা বলে উঠলো। স্যার টমাস ঘোড়া থেকে নামলো। কাঠকুটোর আগুনে বসানো কী একটা কন্দ জলের অভাবে পুড়ে গিয়ে কটু গন্ধ ছড়াচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এক বুড়ি ছুটে গেল আগুনের কাছে।

স্যার টমাস মনে মনে বললো, সকালবেলাই এখানে ভূমিকম্প হয়ে গেছে—ওরা সবাই যা বললো—তাতে অনেকটা এরকম দাঁড়ায়। ফৌজ তার যাবার পথে চাল থেকে খড় তুলে টেনে নিয়ে গেছে। খাবার দাবার তো কেড়ে নিয়েছেই—জ্বালানির জন্যে যেখানে যেটুকু কাঠ ছিল ভেঙে—কেটে কুটে নিয়ে চলে গেছে। গোয়ালের গরুগুলোও তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। মাল বইতে। মাংসে টান পড়লে কেটে খাবে।

চৌধুরী গয়ানাথের মুখ থমথম করছে। এ কোন গাঁয়ে সে গেঁহু ফলানোর জন্যে দাদন দিতে এসেছে! স্যার টমাসের ওঠা বসা আগ্রার ওপর মহলেই। দেওয়ানখানার কাছারির নিয়ম-কানুনের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত। আইন-ই আকবরীর আমিল-ই-দস্তুর বেকাশের নিয়মকানুন তার শোনা। সে গম্ভীর হয়ে বললো, আকবর বাদশা তো নিয়ম বেঁধে দিয়ে গেছেন—শাহী ফৌজের দরুন গাঁয়ের, চাষের, ইনসানের কোনো ক্ষতি হলে শাহী খাজানাখানা থেকে

রুপেয়া দিয়ে তা পুষিয়ে দেওয়া হবে—

চৌধুরী গয়ানাথ একগাল হেসে স্যার টমাসের দিকে তাকালো তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললো, আমিল-ই-দস্তুর বেকাশে আর আর কী আছে বলুন তো !

এটা ঠাট্টা ? না, তার জ্ঞানের পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে তা বুঝতে পারলো না স্যার টমাস। চুপ করে গেল।

গয়ানাথ বললো, আইন-ই-আকবরীর কচকচি তো কাজীর এজলাসে। তার আগে ওরা নিজেদের সামলাক।—একথা বলে গয়ানাথ রিসালার পেছনে বোঝা বওয়ার খচ্চরের পিঠ থেকে গেঁহুর বস্তা নামাতে ইশারা করলো।

স্যার টমাস ওসব কিছু সঙ্গে আনেনি। সে এনেছে—থলে ভরে রুপেয়া। কিন্তু রুপেয়া দিয়ে এই শ্মশানে তো কিছু কিনতে পাওয়া যাবে না—যা কিনা এখন এখনই পাওয়া যায়।

হেরে যেতে যেতে ইংলিশস্তানের ইলচি দেখলো, চৌধুরী গয়ানাথ বড় খেরিয়ার মুখ খুলে মার খাওয়া মানুষদের ভেতর নিজের হাতে গম দিচ্ছে। এক বুড়ো কোঁচড় ভরে গম নিতে নিতে কেঁদে বসে পড়লো।

—স্যার টমাস এগিয়ে গেল। কী হলো ?

—এত গেহুঁ দিয়ে কী হবে এখন !

—খাবে।

—আমি তো এখন একা।—বলতে বলতে বুড়োর কথা বন্ধ হয়ে এলো। গায়ে কিছু নেই। তাপ্তির দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছে। বুকখানা জুড়ে শুধু কয়েকখানা হাড়। পাশের বউটি বললো, ওর দুই ছেলেকেই ফৌজ ধরে নিয়ে গেছে। তোপের গাড়ি টানতে—

—আর কেউ নেই ?

—বউ ছিল। সে অনেককাল হলো নেই—

স্যার টমাস সান্ত্বনা দিয়ে বললো, ছেলেরা ফিরে আসবে তো।

বুড়ো এবার এই বিদেশীর চোখে তাকালো। যেন ওখান থেকেই তার ছেলেরা ফিরে আসবে। স্যার টমাস তাকিয়ে থাকতে পারলো না। চোখ নামিয়ে নিলো।

বুড়ো সব গমটা কোঁচড় থেকে মাটিতে ঢেলে দিলো। দিয়ে বললো, ফৌজ একবার বেগার দিতে নিলে সে-মানুষ আর ফেরে না সাহেব। কাজ ফুরোলে ওরা রাস্তার পাশে ছিবড়ে দশায় ফেলে দেয়—

সান্ত্বনা দেবার আর কিছু নেই। স্যার টমাস চৌধুরী গয়ানাথের কাছে প্রথম চক্করে হেরে গিয়ে দ্বিতীয় চক্করে প্রতিশোধ নিলো। নিজের গায়ের কোটটা খুলে বুড়োর গায়ে পরিয়ে দিলো।

তাপ্তির তীরে সাতপুরা পাহাড়ের গা ঘেঁষে শাহী ফৌজ চলে গেছে দক্ষিণের পথে। এবার শীত আসবে। সাতপুরা পাহাড়ের গায়ে নাম-না-জানা

ফুলগুলো ফুটে একা একা রাতের শিশিরে ভিজবে। আয়ু ফুরোলে ঝরে যাবে। সারা হিন্দুস্থানে নানারকমের জলবাতাস। কোথাও শীত বাড়তে বরফকুচি ঝরে সারা রাত ধরে। কোথাও বা দরিয়ার সামনে শীতই তেমন মালুম হয় না।

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, নর্মদা, কাবেরী, গোদাবরী তো আছেই—আছে হেলমন্দ, রাভি, যমুনা, তাপ্তির মতো নদীও। এক এক নদীর মেজাজ এক এক রকম। তাদের গায়ে রকমারি বসতি। স্রোতও ভিন্ন। নদীর খাতও রকমারি। চড়ার চেহারাও আলাদা আলাদা।

যমুনা এখন হিন্দুস্থানের সবচেয়ে রংদার নদী। তারই বুকে আগ্রা দুর্গের ছায়া পড়ে। এখন সন্ধে রাত। দুর্গের ছায়া জলের বুক থেকে মুছে গেছে অনেকক্ষণ।

দুর্গের শাহবুরুজ মহলের দোতলা অলিন্দে আটকোনা গম্বুজ ধরনের ছত্রীর সামনে বাদশা জাহাঙ্গীর অন্দরমহলের দরবারে বসেছেন। এই সময়টায় মোগল বাদশার ভেতরমহল নিয়মে বাঁধা এক সুশৃঙ্খল জেনানা রাজ্য—যেখানে একমাত্র মরদ শাহানশাহ স্বয়ং। এখানে সেপাই সান্ত্রী, চাবুক-হাজত-ফাঁসি, দেওয়ানী দপ্তর, মালখানা দলিল দস্তাবেজের মুহাফিজখানা, বকশী, আরজ-বেগী, মীরসামানী, মক্তব, নাচওয়ালী, নটগুরু সবার সবকিছু এখন বন্ধ থাকে। মনসবদার থেকে গোলাম—সবাই এখানে শাহানশানের সামনে স্রেফ ক্রীতদাস। অল্প কিছু শাদিসুদা জেনানা এখানে দিনে দিনে কাজ করে সন্ধ্যার মুখে ঘরে ফিরে যায়। মোগল বাদশার সদরে অন্দরে সমান—দামড়ি-আধেলা, হীরা জহরত, জামা-জুতো, কার্পেট সুজনী প্রতিটি জিনিসের কড়াকড়ি হিসাব—হুকুমতের ভেতর বাইরে কাগজী-রাজ।

রাজধানী আগ্রায় এই সময়টার কিংবা সফরের অবসরে খোদ বাদশা অন্দরমহলের জেনানাদের অভাব অভিযোগ শুনে থাকেন। আজও জাহাঙ্গীর বাদশা যেন শুনবেন বলেই দরবারে বসেছেন। জেনানা-দেওয়ান আর মুস্তৌফী হুজুরে সব পেশ করার জন্যে একই সঙ্গে দু'জন কুর্নিশ করে বললো, জাহাঁপনা সলামত! বান্দাগান-ই-আলা হজরত!

আর ঠিক তখনই বাদশা জাহাঙ্গীর চেঁচিয়ে উঠলেন, আমি কে?

সঙ্গে সঙ্গে 'পাখোয়া' চালিয়ে যে দাসী খুব আস্তে বাদশার মাথার পেছনে বাতাস কাটছিল—তার হাত থেকে পাখোয়া পড়ে গেল। কেউ কোনোদিন বাদশাকে এভাবে চেঁচিয়ে উঠতে দেখেনি। বাদশাকে ঘিরে দাঁড়ানো জেনানার দল পায়রার মতোই মুহূর্তে উড়ে গেল।

আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে ঢুকলেন নূরজাহান বেগম। ঢুকেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন।

সেলিম জাহাঙ্গীর ফের চেঁচিয়ে উঠলেন, আমি কে? উঃ! কিছুতেই মনে পড়ছে না।

খুব শান্তভাবে নূরজাহান বেগম এগিয়ে গেলেন। একেবারে মুখোমুখি

দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করলেন। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি সেলিম জাহাঙ্গীর—

—সে কে?

নূরজাহান বেগম চারদিকে তাকালেন। না, এখানে আর কেউ নেই। এবার তিনি চাপা গলায় বললেন, হিন্দুস্থানের বাদশা—

একথাতেও জাহাঙ্গীর বাদশার চোখ মুখ পাল্টালো না। তিনি চাপা গলায় বললেন, সে কে?

—আলা হজরত! আজ আপনি দিন থাকতেই আবার মস্তি করে বসে আছেন। উঃ!—বলতে বলতে নূরজাহান বেগম শিউরে উঠলেন। এত বড় দুর্গের ভেতর যে মানুষটিকে ঘিরে আমি নূরজাহান বেগম—যার চোখে আমি নূরমহল বলেই বর্ধমান থেকে আজ আগ্রায়—সে-ই যদি ভুলে বসে—সে কে?—তাহলে আমি কোথায়? আমি কেন?

নূরজাহান বেগমের পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠলো। এখুনি আবার আমি শের আফগানের বিধবা মেহেরুন্নিসা হয়ে পড়তে পারি যে কোনো সময়। বাদশাই যদি ভুলে যান—তিনি বাদশা—তাহলে আমি কে? এই আগ্রা দুর্গের নানা চত্বর, পাথরের গলিখুঁজি বাতিদান জেবলেও পুরোটা আলো করা যায় না। এই অবস্থায় কেউ যদি আমার জন্যে ওৎ পেতে বসে থাকে—আচমকাই যদি আমাকে এই দুর্গের অন্ধকার কয়েদে কেউ ঠেলে দেয়?

নূরজাহান এগিয়ে এসে বাদশার পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়া সোনালি পাত্রটা তুললেন। সিরাজি শেষ। সামান্য কয়েক ফোঁটা গালিচায় গড়িয়ে পড়েছে। আলোয় ধরে দেখলেন—পাত্রের একেবারে শেষে গলে যাওয়া একটি আফিম-গুলি তখনো পড়ে আছে।

চমকে উঠলেন নূরজাহান। দু'টি করে গুলি খেয়ে থাকেন বাদশা। আজ তাহলে ক'টি খেয়েছেন? তাও সিরাজির সঙ্গে মিশিয়ে। নূরজাহান বেগমের আর কিছু ঠিক থাকলো না। হিন্দুস্থানের বাদশার মাথা-মুখ তিনি দু'হাতে নিজের বুকের সঙ্গে চেপে ধরলেন। ইয়ে আল্লা! তেরি রেজা!

এক লহমায় বেগমের বুকের ভেতর সারা হিন্দুস্থান দুলে উঠলো। একমাত্র সর্ব-শক্তিমান খোদাতালাই রক্ষা করতে পারেন। আটকোণা গম্বুজ ধাঁচের ছত্রীর বাইরেই অলিন্দের খোলা চত্বর। তার পরেই যমুনার বুকের ওপরকার শূন্য অন্ধকার। নূরজাহান যত জোরে পারেন বাদশাকে বুকে চেপে ধরলেন।

কয়েক মুহূর্ত মানে অন্তহীন ভয়। অন্তহীন অপেক্ষা। আলোর ভেতরেও যেন জমাট অন্ধকার। আগ্রা থেমে নেই। কাছেই কোথাও পাহারাদের চৌকি বদলের শব্দ। অনেক নিচে রাজধানীর রাস্তায় মানুষজনের কথার কলরোল আবছা শব্দ হয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে।

—মেহের—

নূরজাহান কোনো শব্দ না করেই কেঁদে ফেললেন।

—মেহের আমি কোথায়?

আনন্দে নূরজাহানের দু'চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এলো।

—আপনি আমার বুকের ভেতর বান্দাখান-ই-হজরত।—বলতে বলতে নূরজাহান নিশ্চিন্ত হলেন—অচেনা ভয়ের জগৎ—নিজেকে ভুলে যাওয়ার আতঙ্ক থেকে বাদশা এইমাত্র চেনা দুনিয়ায় ফিরে এসেছেন। এখানে আনন্দ। এখানে নিত্যদিন নতুন নতুন আহ্লাদের আয়োজন। বাদশাকে ঘিরেই তো আগ্রায় রোজ রাতে রুমি, সিরাজি, কিঙ্গিনা, রবাব-ই-দখন।

—আমার কী হয়েছিল?

—কিছুছু নয় বাদশা—

—তবে আমি এভাবে এখন তোমার বুকের ভেতর কেন?

—আমি কি আপনাকে এভাবে পেতে পারি না?—বলতে বলতে দাঁড়িয়ে থাকা নূরজাহান ঝুঁকে পড়ে বাদশার মুখের সামনে সেই বিখ্যাত হাসি হাসলেন। যে-হাসি দেখে সেলিম জাহাঙ্গীর কোনোদিনই ঠিক করতে পারেননি —নূরমহল তাঁকে কাছে টানছে? না, দূরে আরও দূরে সরিয়ে দিচ্ছে?

কয়েক লহমার জন্যে সবকিছু ভুলে যাওয়ার ভেতর থেকে এইমাত্র ভুস করে ভেসে ওঠা সেলিম জাহাঙ্গীর প্রায় জলে ডুবে যেতে থাকা মানুষের মতোই নূরজাহান বেগমকে দু'হাতে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরলেন। তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না বেগম—

আনন্দে সুখে নূরজাহান সেই আকর্ষণে ধরা দিলেন, কোথায় যাবো জাহাঁপনা! আমার চেয়ে সুখী কে?

—তুমি যেও না। আমি নিরুপায়—

নূরজাহান বেগম কোনো কথা বলতে পারলেন না। তাঁর বুকের ভেতর উষ্ণীষ সমেত চাঘতাই বংশের সেরা মাথাটি। তাঁর চোখ, ভ্রূ, নিঃশ্বাস, ঘ্রাণ, বুকের ধক্‌ধক্‌।

বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীর অন্ধকার, সুখের সেই সুড়ঙ্গের ভেতর আস্তে আস্তে বলে উঠলেন, ধরো সেদিন যদি কুতুবুদ্দিন খতম না হতো?

চোখ বুজে আসা নূরজাহান বেগম বললেন, বলুন—

—তাহলে আজ তুমি কোথায়?

—তাহলে! আজ এখন শাহজাদা খুর্রমের ফৌজ আমাকে আর কুতুবকে বিজাপুরের জঙ্গলে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে—! এতদিনে কুতুবের মুরুব্বি মালিক অম্বর অনেক আগেই শায়েস্তা!

মাথা তুললেন সেলিম জাহাঙ্গীর। নূরজাহান বেগম দেখলেন, বাদশার মুখে সেই আতঙ্ক আর নেই। স্বাভাবিক। বুকের ভেতরটা শান্ত হয়ে এলো বেগমের।

বাদশা বললেন, বাবা খুর্রম তামাম হিন্দুস্থানের পহেলা জংবাজ—

নূরজাহান কোনো কথা বললেন না। তাঁর চোখ স্থির। কোনো পলক পড়লো না। ধারালো চিবুক। কুঁদে কাটা মুখ। ক্ষমা বা রাগ—কোনো কিছুই সে মুখে ছায়া ফেলতে পারে না।

সেলিম জাহাঙ্গীর ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলেন। নূরমহলের মুখে কঠিন রাগও সুন্দর হয়ে ওঠে। বাগী চাষীদের শায়েস্তা করতে যখন কঠিন ফরমান বেরোয়—তখন এই নূরজাহান বেগমের মুখে নিষ্ঠুর হুকুমত সুন্দর ঝরনা হয়ে ঝরে পড়ে।

—কুতুব তোমায় ভালোবাসতো?

—আলা হজরত। আমি সুন্দরী—একথা আপনি অস্বীকার করতে পারেন?

—এই প্রশ্ন আসছে কেন নূরমহল?

—আপনি জানতে চাইছেন বলেই বললাম। কুতুব আমায় চেয়েছিল। আমি তো তাকে চাইনি। আমার সুন্দরী হওয়া কি অপরাধ?

—এটা হলো গিয়ে খোদাতালার ইচ্ছা। ইখানে কারও কোনো যুক্তি খাটে না। তবে আমিও ইনসান। আমার বুকে কষ্ট হয়।

—আমি কোনো দিন কুতুবের কথা ভাবিনি আলা হজরত। আপনার অনেক কিছু আছে। তাগদ। ফৌজ। হিন্দুস্হান। আমার কী আছে বলুন তো?

—তোমার সব আছে নূরমহল। তুমি একাই যে কোনো ইনসানের খোয়াবে আগুন ধরিয়ে দিতে পারো।

—তাতে কী যায় আসে! বলে নূরজাহান বেগম হাসলেন। হেসে বললেন, আমি কোথায় কোথায় আগুন ধরিয়ে দিতে পারি—এটাই কি আমার পরিচয় জাঁহাপনা? আমি কি আপনাকে ভালোবাসিনি?

ভালোবাসার কোনো ওজন নেই। ভালোবাসার কোনো হিসেব নেই। এ জিনিসটা—সেলিম জাহাঙ্গীর ভালো বোঝেন। বেইমান কুতুবের কথা মনে পড়লে তাঁর বুকের ভেতর ব্যথা করে।

বাদশা বললেন, কুতুব যে বেইমানি করবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি নূরমহল।

—ভালোবাসায় কোনো বেইমানি নেই আলা হজরত। বেইমানি বলছেন কেন?

—তবে কী বলবো বেগম?

—যার যেমন চোখে লাগে! আমি তো শের আফগানের বেগম ছিলাম। তাই না? ছিলাম ফৌজদারের বেগম। হয়েছি—বাদশার বেগম।

—সে তো আকবর বাদশার বোঝার ভুল নূরমহল। আমি তো তোমার নিকার আগেই তোমায় ভালোবাসতাম। বর্ধমানের ফৌজদারের বেগম হবার আগেই তো তুমি শাহজাদা সেলিমের বেগম হতে পারতে! তাই না?

—ভালোবাসা মানুষকে অন্ধ করে জাঁহাপনা। কুতুবের তো ওভাবে মরবার কথা ছিল না।

—বলতে পারো নূরজাহান—শের আফগানেরও ওভাবে মরবার কথা ছিল না।

—কী বলছেন আলা হজরত !

—ঠিকই বলছি। কুতুবুদ্দিন দিনের পর দিন আমার ভেতর তোমাকে পাওয়ার জন্যে আগুন উসকে দিয়ে এসেছে।

—আপনি শের আফগানকে খতম করার হুকুম দেননি কুতুবকে ?

—না নুরজাহান। হিন্দুস্থানের বাদশা অতটা নিচে নামেন কী করে ! আমি শুধু চেয়েছিলাম—কুতুব তোমাকে নিয়ে আসুক। বাদশা হয়ে ফৌজদারের ক্ষতি চাইতে পারি ?

—ওই হলো ! আপনার ক্ষতি না করে আমাকে তুলে নিয়ে যাওয়া যায় ?

—ফৌজদার কোতল হোক—তা তো আমি চাইনি নুরজাহান।—বলতে বলতে বেগমের মুখে তাকালেন বাদশা। বেগম ভেতর মহলের গালিচায় দাঁড়িয়ে। চোখ খোলা জানলা দিয়ে যমুনার দিককার অন্ধকার আকাশে তাকিয়ে। সেলিম জাহাঙ্গীর প্রায় কৈফিয়তের গলায় বললেন, আমি হয়তো তোমায় ভুলেই থাকতে পারতাম বেগম। কুতুব আমায় ভুলতে দেয়নি তোমাকে। আমার ভেতর তোমার কথা জাগিয়ে রেখেছে সবসময়। কেন জানো ?

—বলুন কেন ?

—আসলে কুতুব নিজেই তোমায় ভুলতে পারেনি কোনোদিন। আমার ভেতরে তোমায় জাগিয়ে রেখে—আসলে বেগম সেই আগুনে নিজেই জেগে থেকেছে কুতুব।

নুরজাহান বাদশার মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন। এই সরিয়ে নেওয়াটুকুও সেলিমের মনে আগুন ধরিয়ে দিলো। তিনি বললেন, জানো নুরমহল—আমার হুকুমের আড়ালটুকুই ছিল কুতুবের ছল। ও নিজেই আসলে নিজেরই জন্যে ছুতো করে বর্ধমানে গেছে। ও নিজের জন্যেই ফৌজদারকে খতম করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ভেবেছিল, ফৌজদার সাবাড় হলেই রাস্তা পরিষ্কার—তোমায় নিয়ে তখন বেইমানি করে নর্মদা পেরিয়ে যাবে—যাবে দক্ষিণের এমন জায়গায়—যেখানে আগ্রার হুকুম চলে না। ভাবতেই পারেনি—কোতল হতে হতেও ফৌজদার ঘুরে দাঁড়াবে—মরণ কামড় দিয়ে তবে মরবে।

নুরজাহান বেগম ঘুরে দাঁড়িয়ে সরাসরি বাদশার মুখে তাকালেন। সে চোখে হিসেব চাওয়ার কোনো অস্ত্র নেই। কোনো রাগ নেই। কোনো শোক নেই। ভালোবাসাও নেই। শান্ত। প্রশ্নহীন।

সেলিম জাহাঙ্গীর মসনদ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে খানিক এগিয়ে গেলেন। অভ্রের স্বচ্ছ বাতিদানের আলোয় গম্বুজ ছত্রীর সামনে বাদশার ছায়া পড়লো। বেগমের ওই মুখে তাকিয়ে বাদশা বললেন, বিশ্বাস করো নুরজাহান—কোনো খুনী পরোয়না হাতে দিয়ে কুতুবকে সেদিন আমি বর্ধমানে পাঠাইনি—

একথায় না গিয়ে নুরজাহান বললেন, ভালোবাসার জন্যে কোনো কিছুই বেইমানি নয়। ভালোবাসা মানুষকে অন্ধ করে জাঁহাপনা। আমাকে পাওয়ার জন্যে দু'হাত তুলে কুতুবের মোনাজাত একদিন আমি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। কুতুব খতম না হলেও—ওর সঙ্গে আমি কিছুতেই দক্ষিণে যেতাম না আলা

হুজরত। আবার ওকে ফিরিয়েই দিতাম—ওকে তো কোনোদিন আমি চাইনি—

বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীর এগিয়ে এসে দু'হাতে বেগমকে বাঁধলেন, আমায় বাঁচালে বেগম—

দু'খানি চাঘতাই হাতের বাঁধন বড় শক্ত। এককালে ঘোড়ার পিঠে ছোটা এলাহাবাদের সুবেদার শাহজাদার বয়সের জোশ, তাগদ যেন এইমাত্র ফিরে পেয়েছেন বাদশা। তিনি কিছুতেই আর হাত ছাড়া করবেন না নুরজাহান বেগমকে।

নুরজাহান সে বাঁধনে ধরা দিয়ে ফের বললেন, ভালোবাসা মানুষকে অন্ধ করে—

—যদি করে তো করুক। আমি তোমায় ভালোবেসে অন্ধ হয়ে যেতে চাই বেগম—

সেদিক দিয়েই গেলেন না নুরজাহান। কেটে কেটে বললেন, আপনি তো শাহজাদা খুর্রমকেই জেয়াদা পেয়ার করেন।

—হ্যাঁ। বাবা খুর্রম হিন্দুস্থানের সেরা জংবাজ—লড়াকু জানবাজ--

—আপনার তো আরও আওলাদ আছে আলা হজরত। শাহজাদা পরভেজও তো জোয়ান হয়েছেন—তিনি তো শাহজাদা খুর্রমের চেয়ে বড়। তাকেও তো শাহী মনসব বাড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল। তারও তো খাতির—কদর দরকারি। আপনার ভালোবাসার খুর্রম এখন দক্ষিণে সুবেদার। সুবেদার হয়েই সে কি আগ্রার কথায় আমল দিচ্ছে? কেমন লা-পরোয়া চলাফেরা—

বাদশা জাহাঙ্গীর গম্ভীর মুখে বললেন, শাহজাদা পরভেজ বড়—কিন্তু একদম না-চিজ, না-লায়েক।

।। বারো ।।

মুঘলরা বহুকাল ধরেই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ফরগনায় তাঁদের আদি ঘরগেরস্থি হলেও তাঁরা ঘোড়ার পিঠে পিঠেই এ প্রান্তর থেকে ও প্রান্তরে চষে বেড়াচ্ছিলেন। দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে ঘোড়ার পিঠে বসেই ওঁরা অনন্ত বন-পথ পেরিয়ে যেতেন। চাঘতাই পাহাড়ের উপত্যকার ভেতর দিয়ে চলে গেছে সেই পথরেখা। শিবিরের পর শিবির গড়ে চলেছে চাঘতাই জাতি দলবেঁধে গাইতে গাইতে। দুই পাহাড়ের ভেতর একজনও মানুষ নেই। সেই নির্জন গিরিপথ পেরিয়ে ফরগনার সর্বেসর্বা তৈমুর চলেছেন সমরখন্দের ফুলে ঢাকা বনপথ ধরে। যাযাবরদের মিলন-মেলা তারিম সৈকত পেরিয়ে বরফ ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটার পরোয়া না করেই মুঘলদের নতুন যাত্রা শুরু হলো। শেষঅব্দি মুঘলরা হিন্দুস্থানের দুয়ারে এসে হাজির হলেন।

দুনিয়া জয়ের জন্যে ওঁরা বেরিয়ে পড়েছিলেন। একদল গেলেন পশ্চিমে। আরেক দল চীন পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তাঁদেরই সোনালি দলটি হিন্দুস্থানে

শেষ ঘাঁটি করলেন।

—সোনালি দল? সে আবার কী?

এ কথায় মুল্লা আবদুল লতিফ সুলতানপুরী একটু থমকালেন। আগ্রা দুর্গে তিনি শাহী সংসারে আজ তিরিশ বছর মক্তবের মাথা। পড়াচ্ছিলেন এমনই একখানি বই যা কি না আকবর বাদশার আমল থেকেই শাহী সংসারে শাহজাদা সুলতানদের অবশ্যপাঠ্য।

জিন্দানামা ও দস্তুর-ই-তৈমুর।

তৈমুরের জীবনী ও বিধান।

আর ছাত্র হলো গিয়ে ছ'সাত বছরের সুলতান মহম্মদ দারাশুকো। এই খুদে সুলতানটি বা মক্তব রফতান-ছাত্র হতেই সুলতানপুরীর মন কেড়ে নিয়েছে। সর্ববিষয়ে অবিরাম জিজ্ঞাসা দারাশুকোর। পড়িয়ে খুব আরাম পান সুলতানপুরী।

আগ্রা এই গরমে পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আগ্রা দুর্গের ভেতর হায়াত-বকস্ বাগের ওপর এই মক্তব জায়গাটি বেশ ঠান্ডা। মুল্লা আবদুল লতিফ সুলতানপুরী বললেন, চাঘতাই মুঘলরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে দুনিয়া জয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সোনালি দলের মুঘলরা অন্য কোনো জাতির সঙ্গে শাদিসুদা না করে একদম সাচ্চা চাঘতাই ছিলেন। আর চাঘতাইদের কালো দলটি নানা জাতির সঙ্গে শাদিসুদা করে নানান্ দেশে নানান নাম নিয়েছেন।

ঠায় মাথা তুলে সব কথা গিলে যাচ্ছিল দারাশুকো। এসব শুনতে শুনতে তার মনে হয়—অতীতের পেটে কত কী জিনিস আছে। আমি নিজে অতীতের সেই তৈমুর বংশের একজন সুলতান তাহলে?

সুলতানপুরী তাঁর হাতের জিন্দানামা ও দস্তুর-ই-তৈমুর বইখানি তুলে ধরে বললেন, এখানে সেই মহান তৈমুর বাদশা বলছেন—আমার স্বার্থের প্রয়োজনে আমি আমার রিস্তেদারির বন্ধন বা জাকাতের মর্যাদা নষ্ট করিনি। আত্মীয়দের খতম করতে কিংবা বন্দী করতে হুকুম দিইনি।

সমরখন্দে তাঁর দিলখুস প্রাসাদের দুয়ারে তৈমুরকে খাতির কদর করে ভেতরে আনার জন্যে নানান্ দেশের রাজা দাঁড়িয়ে থাকতেন। সমরখন্দের সেরা বাগ কানিবুলে তিনি তাঁর ছয় নাতির একসঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। দুনিয়া জুড়ে মুঘলশাহী তাঁর নাতিরা এক সুতোয় গাঁথবেন—এই ছিল তাঁর স্বপ্ন।

দারা কিছু বুঝছিলেন। কিছু বুঝতে পারছিলেন না। নিচে হায়াত-বকস্ বাগে এখন কোয়েল এসেছে যমুনার চর থেকে। ঝাঁক বেঁধে। তাদেরই ডাক বাতাসে। মুল্লা আবদুল লতিফ সুলতানপুরীর দাড়িটি হেনায় রাঙানো। তিনি চাঘতাই বংশের কথা বলতে বসে এক একদিন এক এক জায়গা থেকে শুরু করেছেন। আজ তিনি বলতে থাকলেন—

তৈমুর তাঁর রিস্তেদারদের খতম করার হুকুম দেননি কখনো। কিন্তু হুমায়ুন বাদশা তাঁর ভাই কামরানের চোখ উপড়ে নিয়েছিলেন। কারণ,

কামরান চাঘতাই আওলাদকে খতম করেছিলেন। হুমায়ুন বাদশার ভাই মির্জা আসকারি যদিও শিশু আকবরকে চুরি করেন—তবু তিনি সজ্জন ছিলেন। আকবরকে যত্নেই রেখেছিলেন। আর মির্জা হিন্দাল তাঁর ভাই হুমায়ুন বাদশার জন্যে জান কুরবানি দেন।

যুদ্ধে হারতে হারতে বাবর বাদশা কসম খেলেন—আর ছোঁবো না সিরাজি। তাঁর তিনশো জানবাজ লড়াকুও কসম খেল—আর মদ নয়। জয় অথবা মৃত্যু। আল্লা হু আকবর বলে তাঁরা দুশমনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হিন্দুস্থানে মুঘল মসনদের পত্তন হলো।

সুলতান মহম্মদ দারাশুকো—আপনি এই খানদানের আওলাদ। আপনার খুনেও সেই একই খুন—

মন দিয়ে শুনছিল দারাশুকো। সে তার অজান্তে গিয়েছিল নির্জন গিরিপথের অচেনা অজানা চাঘতাই শিবিরে। যেখানকার ঘোড়া দাবড়ানো—ঘুরে ঘুরে বেড়ানো চাঘতাইরা একদিন এই হিন্দুস্থানে এসে হাজির হয়েছিল। সুলতানপুরীর এ কথায় বালক দারা চমকে তাকালো।

সুলতানপুরী তখন বলছিলেন—

এ বংশ যেমনই যোদ্ধা—তেমনই ধার্মিক।

মহম্মদ দারাশুকো তখনো তাকিয়ে। এমন গাঢ় সুরেলা গলা মুল্লা আবদুল লতিফ সুলতানপুরীর, দুর্গের দেওয়ালে সে গলা ধাক্কা খেয়ে ইতিহাস, অতীত রেণু রেণু হয়ে ঝরে পড়ছিল।

তৈমুরের এন্তেকালের আগে মহম্মদের বংশধর আল্ বরোকীকে তাঁর সঙ্গে কবর দিতে হুকুম দেন। কারণ, শেষ কেয়ামতের দিনে আল্ বরোকী মহম্মদের কাছে তৈমুরের ভালোর জন্যে মোনাজাত করবেন। সত্যিই আল্ বরোকীকে তৈমুরের সঙ্গে একসঙ্গে কাপড় দিয়ে বেঁধে কবর দেওয়া হয়েছিল।

দারাশুকো চমকে উঠে বললো, আল্ বরোকী তো তখন জিন্দা?

—বেশক্ জিন্দা। তৈমুর বাদশার হয়ে বেহস্তে মোনাজাত তার চেয়ে ভালো করে কে আর করতে পারতেন?

সুলতানের পোশাকের ভেতর দারার শরীর আগাগোড়া কেঁপে উঠলো। তাই বলে জিন্দা গোর!

শাহী মক্তবের ডানদিকে খোলা চত্বরে দুপুরের রোদ এসে পড়েছে। বাঁ দিকে অনেক নিচে যমুনা। তার গা ঘেঁষে গড়ে তোলা হয়েছে হায়াত-বকস্ বাগ। সে বাগে বেলি, যুঁই, সেঁউতির কেয়ারি করা কুঞ্জ। বর্ষাকাল হলে ভিজে ফুলের সুবাস উঠে আসতো ওপরে। হায়াত-বকস্ বাগের একদিকে খেজুর গাছের বনপথ। বেলা পড়ে এলে ওখানটায় খেলতে যায় দারা।

পড়াতে বসে সুলতানপুরী সাহেব এক একদিন ইতিহাসের এক এক জায়গা বলেন। ইতিহাস মানে বালক দারাশুকোর কাছে কহানি, স্রেফ কহানি। বলার ভঙ্গিটি আলাদা। কোনোদিন বা পড়াতে পড়াতে সুর করে গেয়ে ওঠেন। গজনির সুলতান মামুদের হিন্দুস্থান বিজয় নামে লম্বা কবিতা। আনসারির

কাব্য থেকে। কিছু বোঝে দারা—কিছু বোঝে না। গাইতে গাইতে বলতে থাকেন—জ্ঞানীরা চিন্তিত, জেনানারা কাঁদছে, ইনসানের মনের ভেতর সবসময় একটা শের ওৎ পেতে বসে আছে। বালক দারা বুঝতেই পারে না—মনের ভেতর বাঘ ঢোকে কী করে?

তবু খুদে সুলতান মহম্মদ দারাশুকো সুলতানপুরী সাহেবের ভরাট গলার জন্যে কান পেতে থাকে। ইতিহাসের চেয়ে গান—কহানির চেয়ে কবিতার জন্যে তার মনটা বেশি উন্মুখ হয়ে থাকে। তাতে থাকে আবছা অজানা জগতের হাতছানি। সুর। অচেনা সুরেলা শব্দ।

আলিফ-বে—হাতের লেখা লেখাবার খোশনবীশ মুল্লা মীরক হরবনী আগ্রার বাইরে থেকে আসেন বলে রোজই তিনি একটু আধটু দেরি করে ফেলেন। মোটা সোটা মানুষটি পান খেতে ভালোবাসেন। সুলতান দারাশুকোকে হাতের লেখা শেখাবার সময় তাঁর দু'চোখ মুদে আসে।

দারা লক্ষ্য করেছে—মুল্লা মীরক হরবনীর চারদিকে নজর কিন্তু খুব টনটনে। ওই মুদে আসা চোখে তিনি তখন বলেন, সুলতান সাহেব—এটা হলো গিয়ে নাসতালিক লিপি—নাসতালিক লিপির ফারসিতে আলেফ বে পে তে সে একটু ঢেউ খেলিয়ে লিখবেন—তখন দারাশুকো লক্ষ্য করেছে—আশ্চর্য ঢেউ তোলা হরফগুলো সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে খোশনবীশ হরবনী সাহেবের কলমে।

আজও কিছু দেরিতে এসে হরবনী সাহেব খুব সুন্দর করে দারাশুকোকে হাতের লেখা লেখাতে বসে গেলেন। ঢেউ তোলা হরফ সুন্দর করে ফুটে উঠছিল মুল্লা হরবনীর কলমে।

সোনালি কাজ করা অপরূপ মলাটের জিন্দানামা ও দস্তুর-ই-তৈমুর বইখানি মসলিনের চাদরে গুছিয়ে বাঁধতে বাঁধতে সুলতানপুরী সাহেব বললেন, আপনি তো খোশনবীশী করতে এসে হরফে হরফে তসবির বানিয়ে তুলছেন!

সুলতানপুরীর এ-খোঁচা গায়ে না মেখে হরবনী বললেন, আপনি ভালো করেই জানেন—ইসলামে ছবি আঁকা গুণাহ—

—আলবৎ গুণাহ।

—কিন্তু পানির ধর্ম ফোয়ারা হওয়া। ইনসানেরও ঝোঁক তসবির বানানোতে—

—কী বলতে চান হরবনীসাহেব?

—বলতে চাই—ইনসানের ভেতরকার সেই ঝোঁক তাকে দিয়ে এই ঢেউ তোলা নাসতালিক ফারসি হরফ লেখায় সুলতানপুরী সাহেব—আলাদা করে ছবি আঁকতে না-পারার ঝোঁক হরফে ঢুকে পড়ে ঢেউ তোলে—

খুদে সলতান মহম্মদ দারাশুকো এই কথাবার্তার কিছুই বুঝলো না। তার চোখের সামনে সুলতানপুরী আর হরবনী—দু'জন লায়েক ইনসান একই সঙ্গে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন।

এই হাসি বালক দারাশুকোর কাছে সংকেতের মতো। সে জানে এবার কী

হবে। প্রায়ই দু'জনের ভেতর কথার ঘষাঘষি চলে। তারপরই ফোয়ারার মতো দুটো মানুষের ভেতর থেকে কবিতা বেরোতে থাকে। একসময় সে কবিতা গান হয়ে ওঠে। এসবের একমাত্র শ্রোতা সে নিজে। যেন তাকে সাক্ষী রেখেই এই গান আর কবিতার আসর। মহম্মদ দারাশুকোর কাছে মক্তব এখন আসলে এক ভারি মজার—আনন্দের জায়গা। কহানি, গান, কবিতায় ভরপুর। তার ফাঁকে ফোকরে হাতের লেখার খোশনবীশী—আলেফ বে তে সে নিয়ে ঢেউ তোলা মকসো। জিন্দানামা ও দস্তুর-ই-তৈমুরের কহানি। যার অন্য নাম ইতিহাস। চাঘতাই পাহাড়ের নির্জন বনপথে ঘোড়ার পিঠে বসে ফরগনার গান।

মুল্লা মীরক হরবনী মুদে আসা চোখ খুলে মুল্লা আবদুল লতিফ সুলতানপুরীর মেহেদি রাঙানো দাড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—

হেনা রঙ্গিন না শওয়াদ
ত ব হিন্দোস্তান আমদ—

সঙ্গে সঙ্গে সুলতানপুরী সাহেব নিজের রঙিন দাড়ি হাতের ভেতর নিয়ে সাবাসি দিলেন। দিয়ে বললেন, ঠিকই বলেছেন হরবনী সাহেব—হিন্দোস্তানে না আসা অব্দি হেনা রঙিন হয় না।

বালক হলেও মহম্মদ দারাশুকো শাহজাদা খুর্রমের বড় ছেলে। শাহী সুলতান। এই সুকুমার সুলতানের সামনে দুই রসিক পণ্ডিতের ভেতরকার দরজা যেন আপনা আপনি খুলে যায়। দারার মুখ দেখে ওঁরা দুজনই বুঝলেন, বালক এই বয়াতের ভেতরে ঢুকতে পারছে না। দুজনই বুঝলেন—ফারসি কবিতার এই চুয়াচন্দনে ডুব দেবার বয়সই হয়নি সুলতানের।

দারাশুকো তখন নিজেই বললো, অন্য একটা কবিতা বলুন না—কবিতা শুনতে বড় ভালো লাগে—

সুলতানপুরী উৎসাহভরে গমগমে গলায় বলে উঠলেন—

বা হমা নিকুই সরোদ সরাই
রোদ সাজি ব রক্স্ চাবুক পাই

সঙ্গে সঙ্গে দারাশুকো বলে উঠলো, এ তো ফেরদৌসির—

—ঠিক ধরেছেন সুলতান—আশ্চর্য !

—আরেকদিন বলেছিলেন। সেই যে কোন্ বাঁদী কিঙ্গিনা বাজিয়ে নাচতে নাচতে মিষ্টি গলায় গাইছে—আপনিই বলেছিলেন তো—

মুল্লা আবদুল লতিফ সুলতানপুরীর বুক গর্বে ফেটে যাচ্ছিল। এমন শাহী পড়ুয়া—এত কম বয়স—গোলাপ ফোটা মুখ—কোনো সুলতানি ঘমণ্ড বা বে-তমিজি নেই—সব কিছু জানার ইচ্ছা—সব কিছু মনে রাখার ক্ষমতা—

মহম্মদ দারাশুকো বললো, সেই যে—খুয়াহিম ইয়ারা—

সঙ্গে সঙ্গে মুল্লা মীরক হরবনী প্রায় গান গেয়ে উঠলেন—

খুয়াহিম ইয়ারা, কিম্‌শব্ ন খুসপি
হক্-এ খুদারা, কিম্‌শব্ ন খুসপি
চুন সর্‌ভ্ ও সৌসন, তা রোজ-এ রৌশন

খুবিম ও জিবা, কিম্‌শব্‌ ন খুসপি

বালক দারাও হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে সুরেলা কচি গলায় বলে উঠলো, কিম্‌শব্‌ ন খুসপি—কিম্‌শব্‌ ন খুসপি—

দুই বয়স্ক পণ্ডিতের চোখে তখন শুধুই প্রশংসা। দু'জনই নির্বাক। আত্মহারা বালক সুলতান কবিতার সুরে আনমনে দুলছেন। শাহী মক্তবে শুধু রসের ফোয়ারা।

হঠাৎ বালক ঘুরে তাকিয়ে বললো, রুমির ? তাই না ?

—ঠিক মনে রেখেছেন সুলতান ! একবার শুনেই আপনার মনে থাকে। এটা রুমিরই রুবায়-ই।

দারাশুকো কোনো কথা বললো না। সে তখনো নিস্তব্ধ অদৃশ্য ছন্দের ভেতর ভাসছিল। কিম্‌শব্‌ ন খুসপি—

এই অলীক মক্তবে আশ্চর্য পণ্ডিত মুল্লা মীরক হরবনী তখন রুমিকে নিজের মতো করে আরও সরল করে ফতেপুরি খাড়িবোলিতে বলে উঠলেন—

পিয়ারি আমার ঘুমায়ো না আজ রাতে।

দোহাই খোদার ঘুমায়ো না আজ রাতে।

সঙ্গে সঙ্গে বালক দারাশুকো ছন্দে দুলে উঠে বললো, কিম্‌শব্‌ ন খুসপি—

সুলতানপুরী বা হরবনী—কারও মুখে আর একটাও কথা নেই।

নিজের ভেতরের দিকে তাকানো চোখে বালক সুলতান জানতে চাইলো, আচ্ছা—পিয়ারি কে ? একটিও কথা বলতে পারলেন না প্রথমে। শেষে হরবনী সাহেব বললেন, আপনি বড় হয়ে সুলতান আস্তে আস্তে জানতে পারবেন।

—কবে বড় হবো ? আর কত দেরি বড় হতে ?

—খুব বেশি দেরি নেই। সময় মতোই বড় হবেন সুলতান—

—দারাশুকো সেই ভেতরে তাকানো চোখেই বললো, রুমিকেই আমার বেশি ভালো লাগে—

এ কথায় সুলতানপুরী আর হরবনী কোনো কথা বলতে পারলেন না। একে অন্যের চোখে তাকালেন। সেই যুগল দৃষ্টিতে এই শাহী পড়ুয়ার জন্যে একই সঙ্গে স্নেহ আর প্রশংসা মিশেছিল।

·

মক্তবের ডানদিকের খোলা চত্বর দিয়ে তখন ব্যস্তসমস্ত শাহজাদা খুর্‌রম যাচ্ছিলেন। যাবেন দেওয়ানখানার কাছারিতে। উজিরে আজম আসফ খাঁয়ের কাছে। কয়েকদিন হলো নর্মদা পেরিয়ে রাজধানীতে এসেছিলেন। এসে আটকে গেছেন। আটকে যাবার মতোই অবস্থা। রাজধানী থেকে দূরে দক্ষিণে পড়ে থাকায় আগ্রায় ঘন ঘন অনেক ওলটপালট হয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় ঘটনা—শাহজাদা পরভেজকে সামনে এনে বাদশা বেগম নূরজাহান আলা হজরত বাদশা জাহাঙ্গীরকে দিয়ে তাঁর মনসবে ঘোড়সওয়ার বাড়িয়ে দিয়েছেন। রাজধানী থেকে দূরে পড়ে থেকে আমি করবো লড়াই ! আর মসনদের কাছে থাকায় শাহজাদা পরভেজের বাড়বে মনসব ? যতই ভাবেন একথা—ততই

শাহজাদা খুর্রমের ভেতরটা জ্বলতে থাকে। তাহলে আমি যে সুদূর দক্ষিণ থেকে বাদশা বেগমের মোবারকে লাখো রুপেয়ার নজর পাঠালাম—তার কী হলো ? এই কি তাহলে ইনসাফ ?

এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই শাহজাদা খুর্রম যাচ্ছিলেন শাহী উজিরে আজম আসফ খাঁয়ের কাছে। তিনি বাদশা বেগমের ভাই। তিনি শাহজাদা খুর্রমের শ্বশুর।

হাঁটায় চলায় লড়াকু শাহজাদা হিন্দুস্থানের সেরা জংবাজ। পা ফেলার ভেতর ভরপুর সেই বিশ্বাস ফুটে উঠছিল। সামনে যারা পড়ছিল তারাও তটস্থ হয়ে সরে দাঁড়াচ্ছিল।

ঠিক এই সময় খোলা চত্বরে দক্ষিণের সুবেদার খুর্রম থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর চোখের সামনে আশ্চর্য এক ছবি।

মক্তবের গালিচায় দুই বয়স্ক পণ্ডিত মানুষ—মুল্লা আবদুল লতিফ সুলতানপুরী আর মুল্লা মীরক হরবনী বসে। ওদের মাঝখানে তন্ময় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ওঠা বালক সুলতান মহম্মদ দারাশুকোর দিকে দু'জনই অবাক হয়ে তাকিয়ে।

কী হলো ? কী হতে পারে ?—ভেবে শাহজাদা খুর্রম ছুটে মক্তবের দলিজে এসে দাঁড়ালেন। আচমকাই শাহজাদাকে এত কাছাকাছি দেখে সুলতানপুরী আর হরবনী প্রায় একসঙ্গে তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

—বসুন। বসুন আপনারা—পড়ুয়ার খবর কী ?

—দারাশুকো ছুটে এসে শাহজাদা খুর্রমের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সে আকর্ষণ এড়াতে পারলেন না দক্ষিণের সুবেদার। ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, সুলতান পড়ছেন ?

সুলতানপুরী বা হরবনী কেউই বসেননি। ওঁদের একজন বললেন, এত কম বয়সে এমন সুন্দর খোশনবিশী দেখা যায় না—আর কবিতা তো সুলতানের প্রাণ—একবার শুনলেই মনে রাখতে পারেন—

—কাব্যের সঙ্গে ইতিহাসও পড়তে হবে। জানতে হবে দর্শন—

—সবই ভালোভাবে এগোচ্ছে শাহজাদা।

—ওসবে কে তালিম দিচ্ছেন ? আবদুল রশিদ দৈলমি সাহেব ? তাঁকে তো দেখছি না। তিনি কোথায় ?

—এইবার সমস্যা হলো। এবার তিনি আসবেন। সেই যমুনার ওপার থেকে তো আসেন—

কোল থেকে ছেলেকে নামিয়ে দিয়ে খুর্রম বললেন, আচ্ছা সুলতান—বলো তো—সেকেন্দার শা কে ছিলেন ?

—বড় এক জংবাজ শাহেনশা—অরিস্টটুর চেলা—

—কে অরিস্টটু—

—বাঃ ! আব্বা হুজুর—অরিস্টটু হলেন গিয়ে আফলাতুনের চেলা।

—সে আবার কোন্ জংবাজ ? সেকেন্দারের চেয়েও বড় ?

সুলতানপুরী আর হরবনী—দু'জনই মহা মুশকিলে পড়লেন। এমন জ্ঞানী এক খুদে পড়ুয়া যে কিভাবে তাঁদের বিপদে ফেলতে পারে তা তাঁরা খানিক আগেও বুঝে উঠতে পারেননি। আসলে যে এখন শাহজাদার সামনে তাঁদের পড়ানোই যাচাই হয়ে যাচ্ছে। শাহজাদা কি অরিস্টটু, আফলাতুনকে ভুলে গেলেন!

খিল খিল করে হেসে উঠলো মহম্মদ দারাশুকো। আফলাতুন তো তখনকার সবচেয়ে বড় বুজুর্গ ছিলেন। সেই যে না এক বুজুর্গের ওপর খুশি হয়ে সেকেন্দার শা বলেছিলেন, আপনি যা চান তাই দেবো। বলুন আপনি কী চান?

তাতে সেই বুজুর্গ বলেছিলেন, শাহেনশা—এখন আপনি একটু সরে দাঁড়ান। রোদ্দুর আড়াল হচ্ছে—

—তাতে কী হলো? সেকেন্দার শা কত বড় জংবাজ ছিলেন—

—চাঁদ সুরযের সামনে সবচেয়ে বড় হলেন তাঁরাই—যাঁরা সবার আগে সব কিছু দেখতে পান—যাঁরা বুজুর্গ—

সুলতানপুরী আর হরবনীর মুখে কোনো কথা ফুটলো না। তাঁরা খুদে সুলতানের ফুলের মতো মুখখানিতে তাকিয়ে। এ তো বালক নয়। যেন কোনো মহাজ্ঞানী। এই বয়সে এত মগজদার।

শাহজাদা খুর্রম নিজের মনের ভেতরে বললেন, খোদার মেহেরবানি। এমন ছেলে পেয়েছি আমি! ভাবতে ভাবতে আবারও নিজের কোলে তুলে নিলেন সুলতানকে। চলো—এবার তুমি আমার সঙ্গে দক্ষিণে যাবে—

বলতে বলতে শাহজাদা খুর্রম তাঁর রাস্তা পাল্টালেন। যাচ্ছিলেন দেওয়ানখানায়। চললেন—অন্দরমহলে। আরজুমন্দ বানুর কাছে।

—কবে আব্বা হুজুর?

—শিগগির। দক্ষিণে আমার সঙ্গে থেকে জং কাকে বলে জানবে। তোমায় কাছে রেখে শাহী হুকুমতে তালিম দেবো আমি। হুকুমত শিখবে হাতে-কলমে—

আজই দেওয়ান-ই-খাসের দরবারে একেবারে নতুন ঘটনা ঘটতে চলেছে। ঘটনাটি ঘটাচ্ছেন বাদশা বেগম নূরজাহান। তাঁরই ইচ্ছায় শাহজাদা পরভেজ আজ বাদশা জাহাঙ্গীরের সামনে এসে তাঁকে কুর্নিশ জানাবেন।

নূরজাহান বলেছিলেন, পরভেজও তো একজন শাহজাদা। শাহী হুকুমতে তারও হক্ আছে।

বাদশা জাহাঙ্গীর তাঁর নূরমহলের মুখে তাকিয়েছিলেন। ভাবখানা—এতদিন পরে কী শুনছি! আমি তো সেই নেশাখোরকে নালায়েক বলেই জানি।

শাহজাদা পরভেজের আতালিক মহাবত খাঁ আগেই এসে বসেছেন। বসেছেন উজিরে আজম আসফ খাঁ তাঁর জন্যে রাখা উঁচু দীবানে। উজিরে

আজমের মুখে কোনো রেখা পাল্টায় না। চোখে পলকও পড়ে না। তাঁর দিকে তাকিয়ে মহাবত খাঁ মিটি মিটি হাসছিলেন।

সে হাসি থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন আসফ খাঁ। যে আনন্দে তাঁর সায় ছিল না—সেই আনন্দে এখন তাঁকে যোগ দিতে হবে। সবটাই মেহেরের খেলা। মেহেরের ইচ্ছাই এখন হিন্দুস্থান। মেহেরের ইচ্ছাই শাহী হুকুমত।

দীবানখানা থেকে চেঁচিয়ে বলা হচ্ছিল—শাহজাদা পরভেজ আসছেন।

বাদশা জাহাঙ্গীর পর্যন্ত ভেতরে ভেতরে তটস্থ হয়ে উঠলেন। তিনিও জানেন না—শাহজাদা পরভেজ কোন্ মেজাজে, কী ভঙ্গিতে দেওয়ান-ই-খাসে এসে হাজির হবে।

পরভেজ এলেন সুস্থভাবেই। আজ তাঁর পোশাক কিছু অন্যরকম। মাথায় উষ্ণীষের সরবন্ধে ময়ূরের পালক। মাঝখানের মুক্তাটি জ্বলজ্বল করছে। শাহজাদা পরভেজ কোমর থেকে ভাঁজ হয়ে কুর্নিশ করলেন।

বাদশা নিয়মমাফিক ছেলের পা থেকে মাথা অব্দি ভালো করে জরিপ করলেন। এটাই মনসবীর বাদশাহী ইয়াদদস্ত। পরভেজ সিধে হয়ে হিন্দুস্থানের বাদশাহের মুখে তাকালেন। সামনে হিন্দুস্থানের মসনদে বসে তাঁরই বাবা।

দু'জন দু'জনকে অনেকদিন পরে এত কাছাকাছি, মুখোমুখি হয়ে দেখলেন। বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীর দেখলেন, ছেলের চোখে পলক পড়ছে না। তিনি অনেকদিন এ মুখ দেখেননি। এখন পরভেজ পুরো ইনসান। কিন্তু পুরোপুরি ইনসান কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তবু সান্ত্বনা পেলেন মনে। পরভেজের চোখে তাকানো যায়। তাকানো যায় না শাহজাদা খুর্রমের চোখে। তাকালেই খুর্রম চোখ নামিয়ে নেয়। আর খসরুর চোখে তো তাকানোর উপায়ই নেই কোনো। বাদশার মনে হলো—পরভেজের চোখ যেন সুদূর। সে কি অভিমানে? না, এতগুলো বছরের টানা অবহেলায়?

সারা দরবার এখন বাদশার দিকে তাকিয়ে। বাদশার কোথাও থেমে থাকার উপায় নেই। তবু তাঁর মনে হলো—পরভেজ আর তাঁর মাঝামাঝি জায়গায় দুনিয়া একদম স্থির হয়ে আছে।

হিন্দুস্থানের বাদশা হিসেবে আমি এখন দেওয়ান-ই-খাদে বসে তাগদের বিলি বাঁটোয়ারা করছি। খোদাতালার রেজা! তাই আমি তাগদের ফোয়ারা। কিন্তু আওলাদ কী জিনিস? ছেলে মানে কী? বাবা কে হয়? এসব ভাবতে ভাবতেই বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীর মনসবদারির কাগজে তাঁর পাঞ্জার ছাপ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সামনের দিকে তাকিয়ে শাহজাদা পরভেজ পিছোতে লাগলেন। তাঁর ঘোড়সওয়ার বেড়ে তিনি আজ থেকে বারো হাজারি মনসবদার। সারা শাহী হিন্দুস্থানে কত মনসবদার। তাদের কত কত ঘোড়সওয়ার। বন্দুকচী। ধানুকী। পদাতিক। হাতি। উটের কাতার। তোপ। তাগদের এক বিরাট অজগর সারা হিন্দুস্থানের বুকের ওপর শুয়ে আছে। সেই অজগর সেলিমের বাঁশিতে জেগে ওঠে, নড়েচড়ে বসে।

ফিরে যেতে যেতে শাহজাদা পরভেজ দেওয়ান-ই-খাসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে

হঠাৎ ফিক করে হাসলেন। তাই দেখে তাঁর আতালিক মহাবত খাঁ তড়িঘড়ি উঠে এসে পরভেজের পাশে দাঁড়ালেন। প্রায় আড়াল করে।

শাহজাদা পরভেজ তবু ফিরে হাসতে গেলেন। মহাবত খাঁ তাঁকে আড়াল করে দেওয়ান-ই-খাসের চত্বর থেকে একরকম জোর করেই বের করে নিয়ে এলেন।

এখন এখানে কোনো লোক নেই। মহাবত খাঁ দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, কী হচ্ছে শাহজাদা? সকালবেলাতেই ভাঙ দিলো কে আপনাকে?

—ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়! সরুন আপনি। একবার বাদশার সামনে গিয়ে হো হো করে হেসে উঠবো—

—কী বে-তমিজি হচ্ছে? হিন্দুস্থানের বাদশার কদরদানির এই দাম? আপনার মনসবদারি বাড়িয়ে দিলেন বাদশা—আর আপনি?

—থামুন। ওই লোকটা বাদশা?

—চুপ। চুপ করুন। আপনার আব্বা হুজুর তো—

—আব্বা, হুজুর! ওই লোকটা বাদশাও নয়—আমার বাবাও নয়।

দু'পাশে পাথরের দেওয়াল। মহাবত খাঁ একরকম ঠেলাতে ঠেলতেই শাহজাদা পরভেজকে দুর্গের সেই পাথরগলির ভেতর কোণঠাসা করেই এগিয়ে নিয়ে চললেন। সদ্য ইজফা পাওয়া মনসবদার সকালবেলার ভাঙের নেশায় একাই ফিক করে হাসলেন ফের।

লোহার ফলায় শান দিয়ে কেউ বানায় ছুরি, কেউ বা বানায় তরোয়াল। আবার কেউ সেই ফলা দিয়েই বানায় কুড়োল। কিন্তু কেউ যদি সময়ের ঘাড় ধরে নিজের মতো করে নিতে চায়? তখন কী হয়?

একদিকে শাহী সরকার চলেছে আগ্রার চালে। সেখানে ইজফা, দালালি, রাজদণ্ড, নিয়তি—সবই চলে সমান তালে। আরেক দিকে চলেছে সারা হিন্দুস্থান। নিজের চালে। যে চালে সূর্য ওঠে। ফতেপুর জৌনপুরের মাঠে উটে হাল টানে।

শীত চলে গিয়ে নতুন গরম পড়তে শুরু হয়েছিল। যমুনার চর থেকে উড়ে আসা কোয়েলের ঝাঁক দেখা যাচ্ছিল। কিসের থেকে কী হলো। আজমিরের নিচের দিকে গুর্জরের বুরহানপুর এলাকায় আকাশে মেঘ জমতে লাগলো। দ্বারকার ঘাটে ঘাটে বড় বড় সব বজরা এসে নোঙর ফেললো। বড় দরিয়ায় তুফান দেখা দেবে। সাতপুরা পাহাড়ের দিক থেকে হিমেল বাতাস এসে অসময়ের ঝুপঝুপে বৃষ্টির দানা তাপ্তির বুকে ফেলতে লাগলো। চলে যাওয়া শীত ফিরে এলো। মাঠে মাঠে পাকা গেঁহু পড়ে পড়ে ভিজতে থাকলো।

ঠিক এমন রাতে আগু পিছু দুই রিসালা বাছাই ঘোড়সওয়ার নিয়ে একজন ইনসান বুরহানপুর দুর্গের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। দুর্গের মশালচী অন্ধকার নিয়ে মশালের আলোর লোফালুফির ভেতর যেটুকু দেখতে পেল—তাতে বুঝলো, ইনি একজন কেউকেটা লোকই হবেন। এমন রাতে এমন মানুষ তখনই পথে বেরোন—যখন তিনি ঠিক করেন—সময়ের ঘাড় ধরে তাকে তিনি

নিজের মতো করে নেবেন।

খবর না থাকলে সূর্যোস্তের পর দোর খোলা হয় না। তার ওপর দুর্গের যিনি মাথা—মির্জা জানি বেগ এত রাতে ঘুম থেকে ওঠার মানুষ নন। হিন্দুস্থানের জল-বাতাসে উজবেক পাহারা পরিষ্কার বলে দিলো, কাল সকালে রোদ উঠলে দেখা যাবে। এখন দুর্গের দরজা খোলা হবে না।

ঘোড়ার পিঠে বসা কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা মানুষটি একজন ঘোড়সওয়ারকে হুকুম করলো—বল গিয়ে আগ্রার হুকুম।

দুর্গের উঁচু সামান থেকে হপ্ত চৌকির পাহারা বললো, সন্ধের পর আগ্রার হুকুম এখানে চলে না।

এবার ঘোড়ায় বসা মানুষটি মুখের ওপর থেকে কালো কাপড় সরিয়ে দিয়ে নিজেই বলে উঠলো, উজিরে আজমের পাঞ্জা দস্তখত রয়েছে হুকুমে। এখুনি দরজা খোলো—

পাঞ্জা দস্তখত নয়—কালো কাপড়খানা সরে যাওয়ায় ঘোড়ার পিঠে বসা সেই মানুষটির মুখ দেখতে পেল চৌকির পাহারা। দেখেই পাথর কাটা ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে বন বন করে নেমে এসে কুর্নিশ করলো। করে বললো, এখুনি খবর দিচ্ছি শাহজাদা—

খানিক পরেই অবিশ্বাসীর চোখ নিয়ে ঘুম থেকে উঠে এলেন মির্জা জানি বেগ। এত রাতে শাহজাদা খুররম? তাও আগ্রা থেকে এতদূরে? আর তিনি তো দক্ষিণেই থাকেন। সেখানকার সুবেদারি ফেলে এতদূরে? আগ্রায় কিছু হয়নি তো?

এইসব সাত পাঁচ ভেবে তিনি উঠে এসে দেখেন—আরে সত্যিই তো! খোদ শাহজাদা খুররম।

মির্জা জানি বেগের দোগুণী কুর্নিশের ভেতর দুর্গের দরজা শব্দ করে খুলে গেল। ঘোড়সওয়ারদের রিসালা সমেত দুর্গ চত্বরে ঢুকতে ঢুকতে শাহজাদা জানতে চাইলেন, কেমন আছেন?

মাটিতে দাঁড়ানো মির্জা জানি বেগ মাথা তুলে বললেন, ভালোই তো। আজও সকালে শাহজাদা বাগে বেড়াচ্ছিলেন দেখেছি। ওঁর পছন্দের কালো গোলাপ বসানো সারা। অসময়ে বৃষ্টি না নামলে দু-চারদিনের ভেতর ফুটতো—

কথার শেষটা জানার জন্যে শাহজাদা খুররম আর দাঁড়ালেন না। তিনি একই ঘোড়া নিয়ে টগবগ করে তাপ্তির দিককার তক্তাপোলে ছুটে গেলেন। এ দুর্গ তাঁর নখদর্পণে। এখানেই রৌশনআরা চার বছর আগে আরজুমন্দবানুর কোলে আসে।

না ডাকলে সঙ্গে যাওয়া যায় না। তবু মির্জা জানি বেগ এ খবর জানতে চাইলেন, আমি কি আসবো?

দুর্গের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে শাহজাদা খুররম বললেন, কোনো দরকার নেই। বড়ো ভাই অসুস্থ শুনেই আমার ছুটে আসা—

কথাটা শুনে খটকা লাগলো জানি বেগের। সকালেই তো শাহজাদা খসরু

একা একা ঘুরছিলেন। বিয়ানা থেকে এখানে আসার পর বুরহানপুর দুর্গের বাগ তাঁর সড়গড় হয়ে এসেছে।

তাপ্তির দিককার সামান বুরুজের পাশের খোলা চাতালে দু'জন পাহারা কাঠকুটো জেবলে আগুন পোহাচ্ছিল। শাহজাদা খুর্রমকে দেখে তারা তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ালো। খুর্রম এখানকার সব মহলই চেনেন। রোশনআরা হবার সময় আরজুমন্দের সঙ্গে ক'টা দিন কাটিয়ে গিয়েছেন।

লালচে পাথরের দেওয়ালে অভ্রের আলো তত খোলে না! গরাদ সরিয়ে খুর্রম ভেতরে ঢুকতেই বিশাল ঘরের প্রায়ান্ধকার থেকে একটা গাঢ় তীক্ষ্ম গলা উঠে এলো, কে?

খুর্রম বুঝলেন—তাঁর বড়োভাই শাহজাদা খসরু ঘুমোচ্ছিলেন। এবার বড়োভাই উঠে আসবেন।

ঘরের অন্ধকার সামান্য আলোয় সয়ে এলো খুর্রমের। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলেন খসরু। কতদিন খুর্রম দেখেননি তাঁর বড়োভাইকে। বড় সুন্দর দেখতে হয়েছেন এই ক'বছরে। বিরাট চওড়া কাঁধ। পূর্ণবয়স্ক হাতির শুঁড়ের ডগার মতোই মোটা গলা। মাথা ভর্তি কালো চুল। গায়ের শালখানি দেখে চিনতে পারলেন খুর্রম। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, আব্বা হুজুরের খাসা শালখানি আপনাকে খুব মানিয়েছে বড়োভাই—

—খুর্রম! শাহজাদা খুর্রম! আমার ভাই খুর্রম! কতদিন পরে আমায় তুমি দেখতে এসেছো? এই শীতের ভেতর? বৃষ্টির ভেতর? এখন নিশ্চয় রাত—গভীর রাত—তাই তো মনে হচ্ছে খুর্রম।

বলতে বলতে দু'হাত তুলে নিজের ভাইকে জড়িয়ে ধরার জন্যে শাহজাদা খসরু এগিয়ে এলেন। আরেকটু হলেই খুর্রমকে তিনি জড়িয়ে ধরতে পারতেন। ঠিক সময়মত খুর্রম সামান্য সরে গেলেন।

অমনি শাহজাদা খসরুর নিভে থাকা মুখ আরও নিভে গেল। ও কী? তুমি সরে গেলে কেন? কতদিন তোমাতে আমাতে আর দেখা হয় না। আব্বা হুজুর এলাহাবাদে সুবেদার থাকতে আমি আর তুমি খেলতাম একসঙ্গে।

খুর্রম নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করলেন। শক্ত তাঁকে হতেই হবে। শাহাজাদা পরভেজের মনসবে ইজফা দিয়ে ঘোড়সওয়ার বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। খোদ বাদশা তাঁর খাসা শাল পাঠিয়ে দিয়েছেন বড়োভাইকে গায়ে দিতে। বাইরে অন্ধকারে তাপ্তির বুক থেকে অদ্ভুত অজানা সব শব্দ উঠে আসছে।

আমাকে শক্ত হতেই হবে। এ সুযোগ হারানো চলবে না। সুবেদারি নিয়ে হামলায় জড়িয়ে আমি থাকবো দক্ষিণে—আর আগ্রায় বসে শাহজাদাদের নিয়ে ঘুঁটি সাজিয়ে যাবেন বাদশা বেগম নূরজাহান—ওটি হতে দিচ্ছি না!

—জানো খুর্রম—আমি কোনোদিন আগ্রার মসনদের দিকে তাকাইনি। তাকাবার বয়সও হয়নি তখন আমার। আমার কাল হলো আমার মুরুব্বিরা—

—কী রকম?

—তুমি তখন ছোটো। আব্বা হুজুর দাদাসাহেব আকবর বাদশার মসনদের দিকে তাকিয়েছিলেন। এলাহাবাদ থেকে লশকর নিয়ে আগ্রার দিকে এগিয়ে এসেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন মহাবত খাঁ। দাদাসাহেব অবিশ্যি আব্বা হুজুরকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু দাদাসাহেবের আমীর-ওমরাহরা সেদিনকার সুবেদার সেলিমকে ক্ষমা করেননি। ওঁরা চেয়েছিলেন—বাগী শাহজাদা সেলিম জাহাঙ্গীরের বদলে তাঁর ছেলে খসরু সিংহাসনে বসুক। একথা তাঁর আকবর বাদশাকেও বলেন। দাদাসাহেব অবশ্য রাজি হননি। তিনিই সেলিম জাহাঙ্গীরকে হিন্দুস্থানের মসনদে বসিয়ে যান—

—জানি বড়েসাহেব।

—যেটা জানো না—তা হলো সেদিন থেকেই শাহজাদা খসরুকে তাঁর আব্বা হুজুর বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীর সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন। আমায় ভাবতে লাগলেন মসনদের আরেক দাবিদার। যেন তাঁর ছেলে নই আমি। তাই তোমার বড়েভাইকে একদিন বাদশার হুকুমে চোখ দুটো খোয়াতে হলো। একজন বাবা যখন তাঁর ছেলেকে সন্দেহের চোখে দেখেন—সে যে কী যন্ত্রণা—কী বলবো তোমায় খুর্রম। আব্বা হুজুরের ভালোবাসা কোথায় উবে গেল।

সামান্য আলোয় ঘরখানা থমথম করছে। বাইরে অসময়ের ঝোড়ো ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা পাথরের দেওয়ালে আছড়ে আছড়ে পড়ছিল। সেই সঙ্গে হাড় কাঁপিয়ে দেওয়া বৃষ্টি।

—তুমি তখন কিশোর। সুন্দর হয়ে উঠেছিলে। তখনই—তখনই আমি শেষবারের মতো এই রঙিন দুনিয়া দেখি। তারপর সব কিছু আমার চোখের সামনে থেকে মুছে গেছে। তোমাদের মুখও ভুলে গেছি প্রায়।

—বড়েভাই—এবার আপনি তৈরি হোন।

—কিসের জন্যে? আমায় তুমি আগ্রায় নিয়ে যেতে এসেছো? উঃ! কী মায়া তোমার শরীরে খুর্রম। এ জায়গাটা আগ্রার তুলনায় খুবই স্যাঁতসেতে—আমি তো একরকম তৈরিই—আমার আর কী আছে! আমার তো বিশেষ কিছু লাগে না—

পাল্টা কোনো জবাব না পেয়ে শাহজাদা খসরু ফের নিভে গেলেন। আস্তে আস্তে বললেন—আমার কাছে যা বিয়ানা—তা-ই বুরহানপুর। ওখানে যমুনা। এখানে তাপ্তি। দুই জায়গাতেই সেই একই অন্ধকার। যে-অন্ধকারের কোনো শেষ নেই। আগ্রায় যাবার কী দরকার খুর্রম। এই তো এখানে বেশ ভালো আছি। এ জায়গা তো তোমার ভালোই চেনা। পাহারা বলেছিল—তোমার এখানেই একটি মেয়ে হয়—

—তৈরি?—বলতে শাহজাদা খুর্রমের গলা যেন গর্জে উঠলো। তাতে হুকুম—শাসানি—দুইই ছিল। তিনি দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন বলেই যেন দোগুণী চেঁচিয়ে উঠলেন।

অন্তহীন অন্ধকারের ভেতর একজন অন্ধ মানুষ ভীষণ চমকে উঠলেন। আস্তে জানতে চাইলেন, কিসের তৈরি? কিসের জন্যে খুর্রম?

ঘরের সামান্য আলোয় শাহজাদা খসরু যদি দেখতে পেতেন—তাহলে দেখতেন, তাঁর ছোটভাই শাহজাদা খুর্রমই আসলে তৈরি হচ্ছিলেন। কাম্বাদার আঙরাখার দুটো হাতাই গুটিয়ে ফেলেছেন। দুই চোখ তাঁরই মুখে তাকিয়ে। পাথরের ঠাণ্ডা মেঝেতে কোনো ইনসান নয়—যেন কোনো শের থাবা গেড়ে দাঁড়ানো।

—আপনি জানেন নিশ্চয়—চাঘতাই বংশে বাদশার মেয়েরা সব কিছু ভোগ করতে পারেন—কিন্তু তাদের শাদি হয় না।

—দাদাসাহেব আকবর বাদশার আমলেই এই নিষেধের চল হয়েছে।

—একথাও আপনি নিশ্চয় জানেন—শাহজাদাদের সামনে পথ একটিই খোলা—

—কী বলতে চাইছো খুর্রম ? আমি যে অন্ধ।

—অন্ধ হলেও বড়েভাই আপনি একজন শাহজাদা। একজন শাহজাদার সামনে ইয়া তখত ইয়া তাবুদ। আপনাকে তাই—

—খুর্রম ! খুর্রম ভাই—

আর কথা বলা হলো না শাহজাদা খসরুর। বাইরে ঝোড়ো ঝাপটা। ভেতরে বাতিদানের ভেতর অভ্রের শিখাটি ভীষণ দুলছিল। কোনো সাক্ষী না থাকলেও—কোনো বাধা না থাকলেও শাহজাদা খুর্রমকে রীতিমত বেগ পেতে হলো। অন্ধ হলেও শাহজাদা খসরুর গায়ে জমে থাকা হাতির জোর যেন ফিরে এলো। তিনি এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন।

ছাড়িয়ে নিয়ে পেছোলেন ? না, এগোলেন ? তা তিনি ঠিক করতে পারলেন না। কেননা, আজ পনের বছর হলো তিনি অন্ধ। মাত্র উনিশ বছর বয়সে বাদশার হুকুমে তাঁর চোখে আকন্দের সাদা আঠা লাগানো হয়েছিল। অভ্রের বাতিদানটা যে ঠিক কোথায় তাও ঠাওর হয় না! শাহজাদা খসরু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চারদিকেই হাত পা চালাতে লাগলেন।

শাহজাদা খুর্রমেরও মহা বিপদ। যে কোনো সময় অতি উৎসাহী—অতি অনুগত মির্জা জানি বেগ কয়েকজন পাহারা নিয়ে হাজির হতে পারেন। একাজে কোনো সাক্ষী রাখা চলবে না। চলবে না রক্তপাত। নয়তো কোমর থেকে তরোয়াল বের করে একজন অন্ধের পেটে বসিয়ে দেওয়া তো সবচেয়ে সহজ কাজ।

এবার শের ঝাঁপিয়ে পড়লো। খুর্রমের ধাক্কায় তাঁর বড়েভাই পড়ে গেলেন। তার ওপর চেপে বসে খুর্রম খসরুর গলা দু'হাতে চেপে ধরলেন।

পরদিন ভোর হতেই ঝড় জল কিন্তু থেমে গেল। শীতও উবে গেল। দেখা দিলো প্রথম গরমের চড়া রোদ্দুর। যেখানে যা ভিজে ছিল—তা সবই কড়কড়ে শুকনো হয়ে উঠতে লাগলো।

ক'দিন বাদে দুপুরবেলা বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীর দেওয়ান-ই-খাসে বসে। খানিক আগে তিনি সোরেঠার ঠাণ্ডা জলে গাছানি মাটি দিয়ে গা মেজে ভালো

করে চান করেছেন। মানে চান করানো হয়েছে তাঁকে। জানকবুল তাতারনীরা যেমন তাঁকে অন্দরমহলে পাহারা দেয়—চামর দোলায়—তেমনি অন্দরেরও অন্দরে তাঁরাই বাদশাকে চান করায়।

একটু বাদেই চাশনিগিররা বাদশার জন্যে রান্না খাবার চেখে দেখে সন্দেহমুক্ত হলে তবে খবর হয়ে যাবে। তখন দু'দিকে পাহারার ভেতর মুখ আঁটা সব রান্না শাহেনশার জন্যে সাজানো হবে। বাদশা গিয়ে বসবেন তখন।

তার আগে বাদশার সামনে দেওয়ান-ই-খাসে ওয়াকেনবীশদের ডাক পড়েছে। কী মনে পড়ায় বাদশা ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ইদানীং যখন তখন বাদশা তাঁর তুজুকের জন্যে বলে যান। সময় অসময় নেই। বলতে বলতে অনেকক্ষণ থেমে থাকেন। ভুলে যান শুরুটা। তখন ওয়াকেনবীশরাই বাদশাকে আবার ধরিয়ে দেয়।

আজ বাদশা নিজেই গড় গড় করে বলে যেতে থাকলেন। যেন এসব কথা পাছে তাঁর তুজুক থেকে বাদ পড়ে যায়—তাই এতটা তড়িঘড়ি সবকিছু লিখে রেখে যাওয়ার আয়োজন। ইদানীং বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীর ওয়াকেনবীশদের যেমন ডাকছেন—ডাকছেন ছবি আঁকিয়ে আবুল হাসানকেও। হিন্দুস্থানের সেরা আঁকিয়ে—নাদিরুজ্জমান আবুল হাসান মাঝে মাঝে ওয়াকেনবীশদের পাশে এসে বসেন। তুলি আর কাগজ নিয়ে। বাদশার ইচ্ছেকে তিনি ছবি করে তোলেন। আজ অবশ্য, তাঁর ডাক পড়েনি।

বাদশার গলা গাঢ়। চোখে পলক পড়ছে না। তিনি গম্ভীর গলায় বলতে লাগলেন—

আমার বড় ছেলে শাহজাদা খসরুর জীবনের দীপশিখা নিভে গেল। বুরহানপুর দুর্গে পিতৃভক্ত খসরু গভীর নিশীথে ফাংকুলঞ্জ রোগে ভুগে বেহস্তবাসী হয়েছেন। এই পিত্তশূল রোগে অবর্ণনীয় ব্যথায় কষ্ট পেয়েও শাহজাদা খসরু শান্ত চিত্তে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। তিনি ছিলেন সুপুরুষ আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভাই, আদর্শ স্বামী এবং আদর্শ পিতা। এন্তেকালের সময় শাহজাদা খসরুর বয়স হয়েছিল মাত্র চৌত্রিশ। তাঁর সুঠাম সুশ্রী চেহারা আমার চোখে ভাসছে—কী গাঢ় কণ্ঠস্বর, কী বিশাল বুক—জড়িয়ে ধরলে প্রিয় হৃৎস্পন্দন টের পেতাম।

ওয়াকেনবীশ মির্জা রঘুনাথ খুব সাবধানে মুখ তুলে বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীরের মুখে তাকালেন। ছেলের জীবনদীপ নিভে যাওয়ার কথা আত্মজীবনীতে লিখে যাওয়ার সময় একজন বাদশার মুখের চেহারা তাহলে এমন হয়ে থাকে? বাদশা হলেও সেলিম জাহাঙ্গীর তো একজন বাবাও বটে। কী এমন বয়স হয়েছিল শাহজাদা খসরুর! পিত্তশূলই বা কি এমন অসুখ? শাহী হেকিমের পক্ষে কিছু অসাধ্য রোগ নয়। আর বিশেষ করে রোগটা যখন একজন শাহজাদার—হিন্দুস্থানের বাদশার বড় ছেলের।

বাদশা জাহাঙ্গীর আবার বলতে শুরু করলেন—

সুখের কথা—শাহজাদা খসরুর এন্তেকালের সময় সেখানে উপস্থিত

ছিলেন তিসরি বেটা শাহজাদা খুর্রম। আচমকা বুরহানপুরে গিয়ে পড়ায় শাহজাদা খুর্রম তার বড়োভাইয়ের শেষ সময়টি যতটা পারেন শান্তির—সুখের মধুর করে তোলার জন্যে যা কিছু করার সবই করেন। বড়ো ভাইয়ের মৃত্যুর পরে শোকে অভিভূত শাহজাদা খুর্রম কর্তব্যচ্যুত হননি। ওই দুঃসময়েও তিনি কর্মে অবিচল ছিলেন। আমার উপযুক্ত পুত্র শাহজাদা খুর্রম তাঁর বড়ো ভাই শাহজাদা খসরুর জন্যে বিরাট জানাজার আয়োজন করেন। খসরুর শবানুগমনে বুরহানপুরে বিরাট শোকমিছিল খুর্রমই পরিচালনা করেন। শুধু তাই নয়—এই দুঃসংবাদ শাহজাদা খুর্রম নিজেই লিখে জানান—আব্বা হুজুর—ফাংকুলঞ্জে ভুগে বুরহানপুর দুর্গে বড়ো ভাইসাহেব বেহস্তবাসী হয়েছেন।

এই গভীর শোকের ভেতরেও কর্তব্যে অবিচল থেকে শাহজাদা খুর্রম বাদশাকে দুঃসংবাদটি দিয়ে সব কিছু জানাবার কথা ভোলেননি। আমি সেলিম জাহাঙ্গীর—হিন্দুস্থানের বাদশা—আমার পুত্র শাহজাদা খসরুর জন্যে আমি গর্বিত। গর্বিত আমার পুত্র শাহজাদা খুর্রমের জন্যেও—

বলতে বলতে বাদশা উঠে দাঁড়ালেন। আবদারখানায় দুপুরের খাবার সাজানো সম্পূর্ণ। এবার গিয়ে বাদশা বসলেই হয়। বাতাসে সুসিদ্ধ দুনিয়াজা, মালখোবার সুবাস।

আগ্রার বাতাসে প্রথম বসন্তের এই দুপুরবেলায় নানারকম সুবাস ছড়িয়ে যায়। খয়রাতপুরা, যোগীপুরা মহল্লা বাদ দিয়ে—বাকি আগ্রায় এখনও খাওয়া-দাওয়ার সময়। সরাইখানাগুলোর সামনে আমআতরাফে সাধারণ মানুষের ভিড়। সেখানে সস্তার হালিমের ডেগ থেকেও সুগন্ধী এমন ধোঁয়া ওঠে যে তাতে খিদে চাগাড় দিয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। কেউ বা যমুনার কিনারে তার সামান্য ছাতুটুকু জলে ভিজিয়ে নিয়ে মণ্ড পাকাচ্ছে। এবার হাঁ করে মুখে পুরে দিয়ে পেটে পাঠাবার জন্যে আরেকটু জল ঢালবে গলায়।

রাজধানীর মকবরাগুলোর সামনেও এই দুপুরবেলায় ভিড় কমে আসে। চকে চকে ইউনানি হেকিমরা জড়িবুটি শুকনো শিলাজুত শ্যাওলা নিয়ে পসরা সাজিয়ে বসেছে। দুপুরের নাস্তার পরই ভিড় শুরু হয়ে যাবে।

আমীর্-ওমরাহ—রাজধানীর মনসবদারদের বড় বড় হাভেলির সামনেটা এখন নিঃঝুম। একটু কান পাতলেই পেয়ালা-পিরিচ—বাসন-কোসন নাড়াচাড়ার শব্দ পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে নাকে উঠে আসে সুগিয়ানা—দমপোক্তের ধোঁয়া ওড়ানো খিদে চাগানো সুবাস।

এরকমই দুপুরে ইংলিশস্তানের ইলচি সবে তার খাওয়া দাওয়া সেরে বসেছে। হাভেলির সামনে দিয়ে শাহী সড়ক চলে গেছে গোয়ালিয়রের দিকে। সে পথে ধুলো উড়িয়ে উটের পাল যাচ্ছিল। সামনে লম্বা গরম। টমাস সাহেব চিকের আড়াল থেকেই কী হুকুম দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় বসে থাকা দুই পাখোয়া উঠে গেল। তারা এতক্ষণ সাহেবের মাথার ওপর টানা দড়িতে পাখোয়া এদিক-ওদিক করে বাতাস

দিচ্ছিল। এবার তারা টমাস সাহেবের সামনে কাগজ-কলম এনে রাখলো।

এদেশের ময়ূরের পালকের কলম কালিতে ডুবিয়ে একটানা দশ বারোটা শব্দ লেখা যায়। সাত তাড়াতাড়ি কালি ফুরোয় না। এই এক স্বস্তি।

দেশে জন কোম্পানির গভর্নর বাহাদুর বরাবরে হিন্দুস্থানে নীল, তামাক, সুতোর দরের নানা মাণ্ডিতে ওঠা পড়ার খুঁটিনাটি লেখার পর স্যার টমাস এদেশে ইংলিশস্তানের ইলচি হিসাবে আরও কয়েকটা জরুরি সন্দেশ রীতিমত মুন্সিয়ানা মিশিয়ে সাজিয়ে লিখতে লাগলো।

উপস্থিত আরও জানানো যায় যে, গত শীতের শুরুতে যে গেলিনসেনকে বিচক্ষণ মুসাফির ও পর্তুগিজ বলে আপনাদের জানিয়েছিলাম—সে আসলে ওলন্দাজ এবং সে আদৌ কোন মুসাফির নয়। তবে অবশ্যই বিচক্ষণ। কেন না—দেখা যাচ্ছে—সেই গেলিনসেন সারা হিন্দুস্থান ঘুরে ঘুরে সরেজমিনে চাষী, পাইক, ফৌজ, বণিক, কারিগরদের সম্পর্কে খুঁটিনাটি সংগ্রহ করার পর সুরাট বন্দরে ওলন্দাজ কুঠিয়াল হিসেবে এখন আত্মপ্রকাশ করেছে। শুধু তাই নয়—সে এখন ইংলিশস্তানের সোরার কারবারের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। ভবিষ্যতে অন্য সব বিদেশি সম্পর্কে আমাদের আরও সতর্ক হতে হবে।

দেশে রাজা চার্লসের রাজত্বে যাঁরা কারা সংস্কারের দাবি তুলে হইচই জুড়েছেন—পোর্টস্‌মাউথ থেকে তাঁদের জাহাজে করে হিন্দুস্থানে পাঠানো দরকার। তাঁরা এসে এদেশে একবার হিন্দুস্থানের কারাগারগুলো দেখে যাক। একই কারাগারে পাশাপাশি গারদে হাবসি সিংহ আর মানুষকে কয়েদ করে রাখা হয়েছে। সিংহ আর মানুষ—দু'জনকেই স্মৃতি ভুলিয়ে দেবার জন্যে বিষাক্ত পপির শরবত খাওয়ানোর ফলে সিংহ বা মানুষ—দুই কয়েদীর কারুরই মনে নেই—সে কে? কোত্থেকে এসেছে? কোথায় যাবে? স্মৃতিভ্রংশ প্রাণীর অবস্থা দুঃসহ। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানহীন এই দুই প্রাণীই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে আছে।

আগ্রায় আমরা নজর রাখছি। এখানে এখন ক্ষমতার ধাপ বেয়ে তিনি নির্ভুলভাবে ওপরে উঠছেন—তিনি শাহজাদা খুর্‌রম। তিনিই হিন্দুস্থানের বাদশা। স্থিতধী, সেরা যোদ্ধা এবং কূটনীতিকও বটে। অতি সম্প্রতি পথের কাঁটা সরাতে তিনি তাঁর বড়ভাই শাহজাদা খসরুকে বুরহানপুরে পাকা হাতে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিলেন। দেবার পর তাঁরই শোকযাত্রা আবও পাকা হাতে পরিচালনা করলেন। এই মানুষটির ওপর কোম্পানিকে এখন সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। একে এখন থেকেই ভেবে-চিন্তে উপঢৌকন দিতে হবে। মানুষটি অসাধারণ করিৎকর্মা এবং উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী। একটি উদাহরণ দিলেই বুঝবেন। উদ্ভিদভোজী হাতিকে যুদ্ধে ফূর্তিবাজ রণমাতাল করে তোলার জন্যে বাদশা জাহাঙ্গীর হাতি পিছু নির্দিষ্ট পরিমাণে সরাব খাওয়ানোর বরাদ্দ করেন। আমাদের যা খবর—যুদ্ধের হাতিকে আরও জঙ্গী করে তুলতে শাহজাদা খুর্‌রম নিরামিশাষী হাতিদের মৃত্যুদণ্ডে 'সদ্য দণ্ডিত' মানুষের তাজা লাশের সুরুয়া খাওয়াচ্ছেন। ইস্পাহান বা কাভাইরোতেও আমি এ

জানিস শুনিনি।

এবার বটের আঠায় চিঠির মুখ ভালো করে বন্ধ করলেন স্যার টমাস।

॥ তেরো ॥

কাশীর অসসী-গঙ্গা সঙ্গমের গায়েই হনুমানের বিরাট মূর্তিতে কয়েকজন ভক্ত তেল সিঁদুর মাখাচ্ছিল। দুপুরের রোদ পড়ে সিঁদুর মাখানো হনুমানজি ঝকঝক করছেন। চ্যাটালো বুক—সরু কোমর—পাথরে কাটা ধনুকের মতো লেজও তেল সিঁদুরে ঝকঝকে। লেজের ডগায় এক ভক্ত বেলপাতা আর আকন্দফুল চড়াচ্ছিল। পাশেই রামমন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি। হনুমানজিকে এমনভাবে বসানো যে, তিনি সিধে মন্দিরের ভেতর বসানো রামচন্দ্রজিকে দেখতে পাচ্ছেন। মন্দিরের গা থেকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি গিয়ে নেমেছে গঙ্গায়। সেখানে জলের ওপর আখ বোঝাই নৌকো এসে এইমাত্র ঘাটে ভিড়লো।

এমন সময়, মন্দিরের সামনে ধুলোপায়ে একজন মানুষ এসে দাঁড়ালেন। ছিপছিপে। হাতে ঝোলানো একতারাটির লাউ আবার ফাটা। সাদা মাথা হলেও মানুষটির শরীরের বাঁধন এখনো খুব ঢিলেঢালা হয়ে যায়নি। মুখের ভারি চাপদাড়ি আলাদা একটা রূপ এনেছে মানুষটির চেহারায়।

এবারে সেই মানুষটি রামমন্দিরের চাতালে উঠে এদিক ওদিক তাকাতেই একজন টিকি লটকানো রোগা মতো মানুষ প্রায় খেঁকিয়ে এগিয়ে এলো, কী চাই?

বয়স হলেও বেশ আঁটো ধাঁচের সেই চাপ দাড়ি মানুষটি এই খেঁকানিতে আদৌ ভড়কালেন না। বরং ওসব ভ্রূক্ষেপ না করেই মানুষটি জানতে চাইলেন, সে কোথায়? সে— ?

এতে টিকিধারী লোকটি আরও চটে গেল। বেশ ঝাঁক দিয়ে বললো, অন্যের খোঁজ রাখবো কখন! এখন ঠাকুর ভোগ হবে। দোর বন্ধ করবো—

তার মানে—তুমি এসো। আমরা ব্যস্ত।

ওকথাতেও দাড়িঅলা লোকটির ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি বললেন, বাঃ! ভক্ত অভুক্ত—আর ঠাকুরের ভোগ হবে? সে কোথায়?

—কার কথা বলছেন?

—তুলসী। তুলসী কোথায়?

টিকিঅলা লোকটি অবাকই হলো। সে ভাবটা চেপে রেখে বললো, কার কথা বলছেন? সন্ত কবি তুলসীদাস?

—ওই হলো। সে কোথায়?

—দেখা হবে না।

—খুব হবে। বলো গিয়ে আমার কথা—

—শরীর ভালো নেই। কারও সঙ্গে দেখা করছেন না তিনি।

—তাহলে তো দেখা করতেই হয়। কী হয়েছে তুলসীর?

—বয়স তো হলো। তারপর সারাদিন লেখালেখি থাকে—

—কোথায় আছে সে, কোথায় তাকে লুকিয়ে রেখেছো তোমরা? বলো। বলতে হবে এখুনি—

এমন আকুল জিজ্ঞাসার গলা শুনে টিকিধারীর মুখ কিছু নরম হলো। সে বললো, সন্ত কবি তো গুহা কেটে তার ভেতরে আশ্রয় নিয়েছেন—

—গুহা? কোন্ পাহাড়ে?

—উঁহু। পাহাড় নয়। ওই তো ওখানে—বলে সামান্য হেসে লোকটি বললো, কতদিন আপনাদের দেখা হয়নি?—আমিই তো এসেছি বিশ বছর হয়ে গেল।

ওসব কথায় কান না দিয়ে মাটির দিকে তাকালেন চাপদাড়ি। হনুমান মূর্তি আর রামমন্দিরের মাঝামাঝি একটা জায়গায় চাতালের নিচে নামার সিঁড়ি। সেদিকে তাকিয়ে চাপদাড়ি প্রায় ছুটে যাচ্ছিলেন।

তাঁকে আটকালো টিকিধারী। নিচে অন্ধকার। চোখ সইয়ে তবে নামতে হয়। নয়তো পড়ে যাবেন—

একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন আসছিল চাপদাড়ির মনে। তুলসীদাসের কী হয়েছে? তুলসীদাস মাটির নিচে গুহায় কেন?

টিকিধারী বলে যাচ্ছিল, আমি আসার পর সন্তজি এই মন্দির করলেন। হনুমানজির মূর্তি বসলো। এখন তো কাশীর মানুষ এখানটাকে বলে তুলসীঘাট—

—তাই বুঝি? তা তুলসীর কী হয়েছে?

—নিচে গিয়েই দেখবেন—বলে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে টিকিধারী থামলো, কী বলবো গিয়ে—?

—রহিম। রহিম এসেছে—

—কী? —বলে লোকটি একদম থেমে গেল।

—হরিভক্ত রহিম। তিরিশ বছর হয়ে গেল আসিনি।

টিকিধারী নিচে নেমে গেল। দুপুরে তুলসীঘাট প্রায় ফাঁকা। আখ নামিয়ে দিয়ে নৌকোটা মাঝনদীতে ফিরে গেছে। মণিকর্ণিকার দিক থেকে শ্মশানের পোড়াকাঠও ভেসে আসছে।

—আসুন—

তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে চোখে অন্ধকার দেখলেন হরিভক্ত রহিম। টিকিধারী তাঁকে হাত ধরে নামাচ্ছিল। নামাতে নামাতেই বললো, এই গুহা গহ্বর সন্তজির হুকুমে তৈরি।

—তুমি কে? তোমাকে তো আগে দেখিনি?

—অনেকদিন আসেননি। আমি বেণীমাধব। কবিবরের তো বয়স হলো।

—কত বয়স?

—তা নব্বই পেরিয়ে গেছেন। সবসময় এখন আমিই দেখাশুনো করি—

—আমারই তো একশো তেরো বছর বয়স হলো। দিব্যি চলে ফিরে

বেড়াচ্ছি। হরি—হে হরি! আরও কতকাল যে আছি কে জানে!

—ছিঃ! ওকথা বলবেন না। আপনারা থেকেই তো দুনিয়াটা সরেস করেন। এই যে এসে গেছি—

গুহা—গহ্বর যাই বলা যাক—মাটির নিচে বেশ লম্বাই চওড়াই পরিষ্কার জায়গা। মাথার ওপর সর্বক্ষণের কাশী। পাশেই গঙ্গা। সেদিকে একটি বড় জানলা দিয়ে গঙ্গার বুক—ওপারের চর জায়গা চোখে পড়ে।

হরিভক্ত রহিম থমকে দাঁড়ালো। এ কি তুলসী? এ কী অবস্থা তোমার?

কম্বলে বসা ক্ষীণ শরীরে তুলসীদাস নড়েচড়ে বসলেন। —তোমার অদর্শনে ক্ষয় হয়ে গেছি রহিম! কতকাল আসোনি।

—অনেকদিন। লাহোরের গায়ে কফিপুরায় মিঞা মীরের আখড়ায় ছিলাম দশ দশটা বছর। তারপর সারা হিন্দোস্তান এফোঁড় ওফোঁড় করে ঘুরেছি আর হরির নাম গেয়ে চলেছি। তা শরীরের এই হাল হলো কী করে?

—চুহা-বেমারি এসেছিল কাশীতে। তাতে এই বাঁ হাতখানা গেছে। ওঠাতে পারি না। তার আগে গেছে অজন্মা—তাতেও কাহিল হয়েছি কিছু—

—ডান হাত তো লিখে লিখে কাহিল করে এনেছো!

—কোথায় আর লিখি।

—এখন কী লিখছো?

—বিনয় পত্রিকা। এটাই শেষ লেখা। না শেষ করে মরতে পারছি না রহিম—

—মরা বাঁচা হরির ইচ্ছা! কী নিয়ে লিখছো?

সন্ত তুলসীদাসের মুখখানা কী এক বিশ্বাসে অদৃশ্য ভাবের ভেতর ভেসে উঠলো। শান্ত গলায় বললেন, চিঠি। শ্রীরামচন্দ্রকে চিঠি লিখছি—

—কী লিখলে শুনি—

—শুনবে? শোনো—হে পিতঃ দীনের এই বিনীত আবেদন—তুমি নিজেই এ চিঠি পড়ে দেখবে। তুলসী তার হৃদয়ের কথা লিখেছে। তুমি কৃপা করে আগেই তাতে সিলমোহর দিও—তারপর সভাসদদের সঙ্গে পরামর্শ কোরো।

—ভালো! তা কাশীতেই তো জীবনটা কাটিয়ে দিলে।

—তাই দিলাম। এখানেই তো কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড লিখেছি।

—শেষবার যখন দেখা হয়—তখন তুমি হনুমান ফটকে থাকতে।

—তারপর কাশীর কত জায়গায় ঘুরলাম। গোপালমন্দির, প্রহ্লাদঘাট, সংকটমোচনে তিনটি বছর—তারপর অস্সীতে। সেখান থেকে এখানে—

—গোড়া থেকেই তোমার ভেতর তুলসী ফণা ভাব দেখে আসছি।

—কী ভাব সে তুমি জানো রহিম। আমি জানি শ্রীরামকে।

—ফণা ভাবে তুমি তোমার ভেতরকার আমিকে ত্যাগ করেছো। সেই তিরিশ বছর আগেই টের পেতাম—তোমার ভেতর গরিবি এসে গেছে। তুমি দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে শ্রীরামে মন দিয়েছো—

—সত্তর আশি বছর হয়ে গেল—হিন্দুস্থানের হাটে মাঠে ঘাটে তুমিও

হরি হরি করে বেড়াচ্ছো।

—করলে কী হবে তুলসী! তোমার মতো ফণা হয়নি আমার। গরিবিও আসেনি আমার।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। বেণীমাধব গঙ্গার চরের বড় কালো একটি তরমুজ কেটে হরিভক্ত রহিমের সামনে ধরলো।

রহিম ছুঁয়েও দেখলেন না। বললেন, খিদে নেই। অনেকদিন হলো কোনো খিদে টের পাই না—তাই কিছুই খাই না—

বেণীমাধব বললো, কতদিন খান না?

—অত মনে নেই। তবে মাস ছয়েক হয়ে গেল কিছুই দাঁতে কাটিনি।

—মাস ছয়েক?

—মনে শান্তি নেই বেণীমাধব। খাবার ইচ্ছে নেই—

হরিভক্ত রহিমের একথায় তুলসীদাস মিটিমিটি হাসলেন। কোনো কথা বললেন না।

রহিম বলতে লাগলেন, দিনের বেলা তো হরি হরি করে কাটাই। কিন্তু রাতে ঘুম নেই। সাধুদের গুহায় গুহায় ঘুরি। তবু বুকের ভেতরকার এক অজানা ব্যথার ওষুধ কোথাও খুঁজে পাই না। ভাবি—হেঁটে হেঁটে চীনদেশে জ্ঞানীদের কাছে যাই—আবার ভাবি খোরাসানের সন্ন্যাসীদের কাছে যাই—কখনো ভাবি তিব্বতের লামাদের সঙ্গে গিয়ে আলাপ করি—কখনো ইস্পাহানের পর্তুগীজ সাধুদের দিকে মন টানে—কখনো বা ভাবি ইরানের আগুন পুজোর জেন্দাবেস্তার কূট রহস্য জানি। জানাশুনো ধর্ম—তার ভক্তি বা যুক্তিতে আমার আর বিশ্বাস নেই বেণীমাধব—

এবার তুলসীদাস মুখ তুলে চাইলেন। কোমরের ওপর থেকে কম্বল সরে গেছে। অসাড় বাঁ হাতখানি উরুর ওপর পড়ে আছে শুকনো কাঠের মতোই। ডান হাতখানি বরাভয়ের মতো শূন্যে তুলে কবি বললেন, তুমি তো এক রহিম—আরেক রহিমের কথা বলছি শোনো। আবদুল রহিম খানখানা—আকবর বাদশার মন্ত্রী—

হরিভক্ত রহিম বলে উঠলেন, তুলসী—তুমি এখনো আকবর বাদশার কালে পড়ে আছো! কবেই তাঁর এন্তেকাল হয়ে গেছে—

—তাই বুঝি? কেউ তো বলেনি আমায়—

—এখন তুলসী-বাদশা হলেন গিয়ে জাহাঙ্গীর।

—তা সে যে-ই হোন—আবদুল রহিম খানখানার কথা শোনো। আমি প্রহ্লাদঘাটে থাকতে কয়েকবার এসেছেন। রামচরিত মানসের কথকতা—গান হচ্ছে শুনলেই সেখানে গিয়ে শুনতে বসে যেতেন। আমার চেয়ে কিছু ছোট। এখন অনেকদিন কোনো দেখাশুনো নেই। তা তিনিও তোমার অবস্থায় পড়েছিলেন। মনের খিদের খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন হন্যে হয়ে। শান্তি পান না কিছুতেই। তো আমি বললাম—যা ভাবেন তাই লিখতে বসে যান। আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, হিন্দি—চারটে ভাষাতেই দখল খুব রহিম খানখানার। খাড়ি

হিন্দিতে লিখে ফেললেন—রহিম সতসঙ্গ। তাতেই মন বসে গেল। তুমিও তোমার ভাবের কথা লিখতে বসে যাও রহিম। দেখবে মন বসেছে—

হরিভক্ত রহিম বললেন, দেশের রাজা যেমন—মন্ত্রীও তো তেমনই হবে। আকবর তাই আবুল ফজল, রহিম খানখানার মতো মন্ত্রী পেয়েছিলেন।

—রাজা কেমন হবেন জানো রহিম ? তবে শোনো।

—তুমি নিশ্চয় শ্রীরামচন্দ্রের কথা বলবে তুলসী—

—শোনোই না। তিনি হবেন—মালী, ভানু, কিসানু সম নীতি নিপুণ। রাজা হবেন মালী, সূর্য আর কৃষকের মতো। তিনি ফুল ফোটাবেন, আলো দেবেন আর খাবার তুলে দেবেন প্রজাদের হাতে—

কথা শেষ হতে পারলো না তুলসীদাসের। গুহামুখ দিয়ে কাশীর তাবত ধুলো নিচের চাতালে ঢুকে পড়লো। সেই ধুলোয় তুলসীদাস কাশতে আরম্ভ করলেন। কাশতে কাশতেই তিনি বললেন, দ্যাখো তো বেণীমাধব—

হরিভক্ত রহিম গায়ের আলখাল্লার কানাত দিয়ে নাকমুখ ঢেকে ফেললেন। ফেলতে ফেলতে জানতে চাইলেন, ওপর থেকে এত ধুলো আসে ?

বেণীমাধব উঠে দাঁড়িয়েছিল। সেই অবস্থাতেই বললো, প্রায়ই এমন হচ্ছে। কিছু করার নেই—

—কেন ?

—ফৌজ যাচ্ছে এ-পথ দিয়ে। কখনো রাতে। কখনো দিনে।

রহিম জানতে চাইলেন, কী ব্যাপার ?

—কখনো সারাদিন ধরেই যাচ্ছে। শুনছি নাকি শাহজাদা খুররম নর্মদা পেরিয়ে আগ্রার দিকে চলেছেন। মালব, গুর্জর থেকেও ফৌজ এসে তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। আগ্রা ঘিরে ফেলবে।

গুহার ওপরে তখন সারা হিন্দুস্থানের খাস জমি ঘোড়ার ক্ষুরে ওলট-পালট হচ্ছিল। দক্ষিণ থেকে—পশ্চিম থেকে বনজারাদের গো-গাড়ি ফৌজের সঙ্গে সঙ্গে রসদ বয়ে নিয়ে চলেছে।

দিনে রাতে সবসময় লশকরি ছোটাছুটি চারদিকে। তোপের গাড়ি টেনে নিয়ে চলেছে পানিপথের বড় বড় বলদ। তাদের পেছন পেছন গোলা দাগার মীর আতশ আর তার সাঙ্গোপাঙ্গ। সেই সঙ্গে চলেছে—সুড়ঙ্গ কাটার বেলদার বাহিনী। গোলা ফুরিয়ে গেলে মাপসই পাথরের গোলা তৈরি রাখতে পাথর কাটাইদাররাও সঙ্গে চলেছে। চলেছে পদাতিক, ধানুকী, বন্দুকচী। এছাড়া হাতির সঙ্গে তার ভৈ, মেঠ তো আছেই। আছে ঘোড়ার সঙ্গে সওয়ার—সওয়ারের পেছন পেছন সহিস, ভিস্তি। যেমন কিনা উটের কাতারের সঙ্গে রয়েছে সারবান। এছাড়া তাঁবু গাড়ার—তাঁবু গোটানোর মুটে, কামার, ছুতোর, চামার। পাকশালা, আবদারখানার লোকজন। মালবের সুবেদার তার বাহিনী নিয়ে চলেছে। লক্ষ্য আগ্রা। ঘুরপথে যাওয়ার কারণ—পথে বাঘেলাখণ্ড আর ঝাঁসিকে এড়িয়ে যাওয়া। ওদের মন এখনো জানা যায়নি।

ওরা কোনদিকে তাও বোঝা যাচ্ছে না।

শাহজাদা খুর্‌রম দক্ষিণে মালিক অম্বরকে শায়েস্তা করে পাঁচ বছর হলো সারা দক্ষিণের সুবেদার। আগ্রা থেকে দক্ষিণে নর্মদা পেরিয়ে যাতায়াতের পথে অনেকেই তাঁর বন্ধু হয়েছে। যেমন মালবের সুবেদার। গুর্জরের সুবেদার। বিশেষ করে এই দুই সুবেদারের মালগুজারি হাসিলের হিসেব গত ক'বছর খুবই খারাপ যাচ্ছিল। আগ্রার নজরে এরা না-লায়েক হয়ে পড়ছিল।

কিন্তু খুর্‌রম যেদিকে তাকিয়ে হাসবেন—সেদিকে হেসে উঠবেই। শাহী দেওয়ানখানায় সর্বেসর্বা উজিরে আজম আসফ খাঁ। দামাদ শাহজাদা খুর্‌রমের কথায় আসফ খাঁ এ'ক'বছর চোখ বুজে থাকায় ওই দুই সুবেদার গদিতেই আছে।

মালবের সুবেদার যতই ঘুরপথে আগ্রার দিকে এগোচ্ছে—ততই লক্ষ্য করছে, সামনের রাস্তায় আকাশে মেঘ জমছে। যদি বর্ষার আগেই বর্ষণ এসে যায় তো ভারি লশকর কাদায় আটকে যাবে। ঘর্ঘরা, সরযূ—দু'দুটো নদী বর্ষায় ফুলে ওঠে। তখন ওদের পেরিয়ে ওপারে ওঠাও কঠিন। অথচ এদিকে শাহজাদা খুর্‌রমের কোনো কাসীদও এসে পেঁছিচ্ছে না।

দিল্লি আর আগ্রার মাঝামাঝি বিলোচপুরে এসে শাহজাদা খুর্‌রম তাঁবু ফেলেছেন। তিনি মালব আর গুর্জরের শাহী ফৌজের অপেক্ষায়। বিলোচপুর জায়গাটা খোলামেলা। দিল্লি-আগ্রা শাহী সড়কের ওপর এখানে মোগলবাহিনীর জন্যে বড় বড় দুটো সরাই সারা দিনরাত খোলা থাকে। কিন্তু এ'ক'দিন দক্ষিণের পুরো ফৌজ শাহজাদা খুর্‌রমের সঙ্গে এসে হাজির হওয়ায় খাবার-দাবার দিতে সরাইগুলোর নাস্তানাবুদ দশা।

সকালবেলাটা বিলোচপুর ঠান্ডা থাকে। কিন্তু যে-ই রোদ ওঠে তো চারদিক তেতে যায়। এই গরমে শাহজাদা খুর্‌রমের তাঁবুর ভেতর থেকে বেগম আরজুমন্দ বানু বেরিয়ে এলেন।

খুর্‌রম সবে ঘোড়ায় উঠেছেন। লশকর সযুত কিনা দেখতে বেরোবেন তিনি। এমন সময় পেছন থেকে ডাক শুনলেন, শাহজাদা—

খুর্‌রম ঘুরে তাকালেন।

তেজি ঘোড়ার পিঠে তাজা ইনসান। এ ছবি দেখে আরজুমন্দের বুক ভরে উঠলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি কী এক ভয়ে এগিয়ে এলেন।

বেগম সাধারণত এমন বেরিয়ে আসেন না। চারদিক খোলা। বিশেষ করে বেপর্দা অবস্থায়। তাই দেখে চারদিকের সেপাই, দাখিলা, গোলামরা যে যেদিকে পারলো ছিটকে সরে গেল।

ঘোড়ার পিঠে বসা শাহজাদা নিচে তাকালেন। সেই বিখ্যাত মুখের দিকে। যে মুখ নিত্যদিন শাহজাদার নতুন মনে হয়।

—এ আপনি আমাদের কোথায় এনে তুললেন?

হো হো করে হেসে উঠে খুর্‌রম ঘোড়া থেকে নামলেন। নেমে বেগমের একখানা হাত ধরে তাঁকে তাঁবুর দিকে নিয়ে চললেন, কোনো চিন্তা নেই

আরজুমন্দ। আমরা আগ্রার কাছাকাছি গিয়ে পড়লেই—সুবা লাহোর, দিল্লি, আগ্রার বাদশাহী মনসবদাররা নুরজাহান বেগমের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরবেন—দেখো তুমি—

মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়লেন আরজুমন্দ। তাঁবুর ভেতর জাহানারা, দারা, রৌশনআরা, আওরঙ্গজেব এখনো ঘুমিয়ে। একটা গোলা এসে পড়লে কাউকে খুঁজেও পাওয়া যাবে না—

আবার হাসলেন খুররম। কোনো চিন্তা কোরো না। সব তোপের মুখ আগ্রার দিকে। এত সকালে উঠেছো কেন? ছেলেমেয়েদের কাছে গিয়ে খানিকক্ষণ শুয়ে থাকলে পারতে—

—কী বলছেন আপনি? আমার পিসিকে আমি চিনি না! ঘোরানো তোপের মুখ তিনি ঘুরিয়ে দিতে পারেন। কী দরকার ছিল এসবের? আমাদের তো কোনো সুখের অভাব ছিল না শাহজাদা—

থমকে দাঁড়ালেন শাহজাদা। তুমি কি চাও—সারা জীবন ধরে আমি দক্ষিণে পড়ে থাকবো! সারাজীবন ধরে সেখান থেকে দফে দফে নুরজাহান বেগমকে দামি দামি নজরানা পাঠিয়ে যাবো? —তাঁর মন মেজাজ শরিফ রাখতে?

—তাই বলে নিজের আব্বা হুজুরের বিরুদ্ধে বাগী হবেন? যে-আব্বা হুজুর আপনার কদর করেন? অজানা মাঠের ভেতর চার ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমি তাঁবুতে গিয়ে রোদ ওঠার পরেও শুয়ে থাকবো?

—তুমি ভেসে যাওনি আরজুমন্দ। তোমার চারপাশে শাহী ফৌজ তাঁবু ফেলে আছে। তুমি তো অকূলে পড়নি—

—এই শাহী ফৌজ তো বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীরের।

—তোমার শাহজাদাও একদিন বাদশা হবে।

আরজুমন্দ বানু খুররমের মুখে তাকালেন। কোনো কথা বললেন না। শাহজাদার তাঁবু ঘেঁষে একজন সারবান গুটি পাঁচেক উটকে তাড়িয়ে নিয়ে জলের দিকে যাচ্ছিল। রোদ পড়তেই সারা বিলোচপুর তেতে উঠেছে। শাহজাদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেগমের তাঁবুতে ফিরে যাওয়া দেখছিলেন।

ওদিকে আগ্রা দুর্গে তখন নুরজাহান বেগমের অন্য মূর্তি। বাদশা জাহাঙ্গীর ইতমিনান মহলের ছায়ায় বসে। তাঁর পাশে বাদশার সবচেয়ে প্রিয় মোসাহেব মুতামিদ খাঁ। সামনের খোলা চত্বরে রোদের ভেতর আট দশটি তাতার বাঁদী দাঁড়িয়ে। চত্বরে দশ পঁচিশির কোট রং ছড়িয়ে আঁকা হয়েছে। বাদশা এবার ওই তাতার বাঁদীদের জিন্দা গুটি করে দশ পঁচিশি খেলতে শুরু করবেন। বাঁদীগুলো দশ পঁচিশির দান অনুযায়ী লাফিয়ে লাফিয়ে পাঁয়জোর বাজিয়ে—নাকের নথ ঝলকে এক এক কোটে গিয়ে দাঁড়াবে।

বেগম নুরজাহান দূর থেকে বাদশার চোখে চোখ রেখে তাঁর মুখ নিজের দিকে ফেরাতে চাইছিলেন। জাহাঙ্গীর ফিরে তাকালে ইঙ্গিতে তাঁকে ডাকতেন। কাছে ডেকে কিংবা কাছে গিয়ে খুবই জরুরি কথা বাদশাকে

বলা দরকার।

এমনই কথা—যা কিনা ন্রেজাহান বেগম ম্তামিদ খাঁয়ের সামনে বলতে চান না। পর্দা খেলাপ করে তিনি আবারও বাদশার দিকে ইঙ্গিত করলেন। বাদশা এবারও ব্ঝতে পারলেন না। দশ পঁচিশির লম্বা দান দিলেন। দান অন্যায়ী বাঁদীরা এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে স্ন্দর ভঙ্গিতে এক এক কোটে গিয়ে দাঁড়ালো।

ন্রেজাহান বেগমের তখন মরিয়া দশা। দিল্লির মাত্র তিরিশ মাইল দ্রে আগ্রা যাবার শাহী সড়কের ওপরে বিলোচপ্রে এসে শাহজাদা খ্র্রম থানা গেড়েছে। আর বাদশা নিশ্চিন্তে দশ পঁচিশি খেলছেন? আশ্চর্য! তিনি আর থাকতে পারলেন না। ছ্টে গিয়ে বাদশার সামনে দাঁড়ালেন।

চমকে সেলিম জাহাঙ্গীর ম্খ তুললেন। কী ব্যাপার? বেগম?

ন্রেজাহান ধৈর্যের সব বাঁধ ভেঙে ফেললেন। তিনি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, এই কাসীদটাকে এখান থেকে এখ্নি চলে যেতে বল্ন জাঁহাপানা—

এদিক ওদিক তাকালেন জাহাঙ্গীর। কার কথা বলছো বেগম? এ তো আমাদের ম্তামিদ খাঁ—

—হ্যাঁ। আপনার সবচেয়ে প্রিয় মোসাহেব!

—ম্তামিদ?

—হ্যাঁ আলা হজরত। ও-ই গিয়ে সব খবর দিয়ে আসে বাইরে—

—ম্তামিদ? না, তুমি ভুল বলছো ন্রেজাহান।

ম্তামিদ খাঁ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে। সামনের দিকে কুর্নিশ করতে করতে সে পিছিয়ে গেল। খানিক গিয়ে দেওয়ান-ই-খাসের দিকে প্রায় ছ্টে পালালো।

—আমি কিছ্ ভুল বলিনি বাদশা। ও-ই গিয়ে সব কথা উজিরে আজমের কানে তোলে—

—তুল্ক না। সে তোমারই ভাই—আসফ খাঁ—

—আঃ! জাঁহাপনা। মসনদের পাশে কে ভাই? কে ছেলে? ভুলে যাবেন না—সে আমার ভাই হলেও শাহজাদা খ্র্রমের শ্বশ্র।

—খ্র্রম তো আমারই ছেলে।

—তাই তো সে বাগী হয়েছে? উঃ! কোন্ মান্যকে আমি বোঝাবো? এক ছিলেন আমার আব্বা হ্জ্র। তাঁর কাছে যেতে পারতাম। তাও তো ক'মাস হলো তাঁর এন্তেকাল হয়েছে।

—খ্র্রমকে নিয়ে ভেবো না। আমি তার আব্বা হ্জ্র।

—আপনি খবর রাখেন বাদশা? সে নিজেই শ্ধ্ বাগী হয়নি। মালব আর গ্জরের শাহী ফৌজ কুচ করে আসছে। তিনদিক থেকে ওরা আগ্রাকে ঘিরে ফেলবে। গোয়ালিয়র, আজমির, দিল্লি—তিনদিক থেকেই--

—এ স্রেফ লড়কপনহা বেগম! আগ্রা যে কোনো সময় বিলোচপ্রকে গ্ঁড়িয়ে দিতে পারে। গ্ঁড়িয়ে দিয়ে খ্র্রমকে আমি ডেকে পাঠাবো। মসনদের

সামনে তাকে দাঁড় করিয়ে ক্ষমা করে দেবো। তখনই সে বুঝবে বাদশাহী কত বড়—বাদশা কত বড়! আকবর বাদশা কি একদিন তার বাগী শাহজাদাকে ক্ষমা করেননি।

—আপনি সেই খোয়াব নিয়েই থাকুন জাঁহাপনা। সেই আকবর বাদশাও নেই—সেই সেলিম শাহজাদাও নেই আজ। তার ভেতর দেখুন আপনার পেয়ারের শাহজাদা খুর্‌রম শাহী তখতের কত আছে এসে পড়ে।

দশ পঁচিশি খেলার তাতার বাঁদীরা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাদশা জাহাঙ্গীর হাতের ইঙ্গিতে তাদের সরে যেতে বললেন।

বাঁদীরা মিলিয়ে যেতে নূরজাহান বেগম মেঝের গালিচায় বসে পড়লেন। তারপর মাথাটি ভাঁজ করে রাখলেন বাদশার উরুতে। জাহাঙ্গীর খুব আস্তে নূরজাহানের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, বেগমের বরকতে একজন বাদশা তো হাজির আছে—

নূরজাহান সেই অবস্থাতেই বললেন, শাহজাদা পরভেজকে খবর করুন আলা হজরত। কোথায় তার আতালিক মহাবত খাঁ? খবর দিন সুলতান দাওয়ার বকসকে। আসুক তার আতালিক মির্জা আজিজ। এই তো হিন্দুস্থানের বাদশার জন্যে নিজেকে দাখিল করার সময়—কাকে বিশ্বাস করবো বুঝতে পারছি না। এই আগ্রা দুর্গেরই আনাচে কানাচে দুশমনরা শলা-পরামর্শ করছে। অথচ আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি না জাঁহাপনা। আমি যে বড় একা—মাথার ওপরে ছিলেন আব্বা হুজুর। তা তিনিও আজ নেই।

—তুমি তো একা নও। আমি আছি বেগম।

—আলমপনা। আপনি ভালোবেসে শাহজাদাকে ডাকেন—বাবা খুর্‌রম। সেই খুর্‌রম এখন বিলোচপুরে ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

—আমিও একদিন এলাহাবাদ থেকে ফৌজ নিয়ে আগ্রার দিকে এগিয়েছিলাম। কিছুতেই ভেবে পাই না—ইনসানকে মসনদ এমন টানে কেন? কেন ইনসান বাগী হয়ে এগিয়ে যায়? কী আছে মসনদে?

নূরজাহান বেগম আচমকাই উঠে দাঁড়ালেন। চেঁচিয়ে বললেন, এটা এখন ভাববার সময় নয় জাঁহাপনা। এখন আপনার বিলোচপুরের দিকে এগিয়ে যাবার সময়।

বাদশা জাহাঙ্গীরও উঠে দাঁড়ালেন। সকালের আফিমটা জোর হওয়ায় পা কিছু টলমলে। তিনি শান্ত স্বরে—শান্ত চোখে বললেন, যদি মসনদ যায় তো যাক না—তাতেই বা কী যায় আসে নূরজাহান!

—কী বলছেন আলা হজরত?

—ঠিকই বলছি। নাই বা থাকলো বাদশাহী। তখন আমি আগাগোড়াই নূরজাহানের—আর—

—আর কী জাঁহাপনা?

—মসনদে যে একদিন বসতো—সেই শাহজাদা খুর্‌রমের হাতেই তো পড়ছে সেই মসনদে! কিছু আগে। এতে আর উনিশ বিশ কী!

নূরজাহান বেগম তাঁর ওড়নাখানা বাঁ চোখের ওপর দিয়ে টেনে নিলেন। নিতে নিতে কিছুটা পিছিয়েও গেলেন। তারপর তাঁর সেই বিখ্যাত বিষাদ আর হাসির মিশেলে সামান্য হেসে বললেন, মসনদ না থাকলে—তখন কি আপনি জাঁহাপনা আগাগোড়াই আমার হতে পারবেন? এই শাহী মেজাজ? এই শাহী খোয়াব? তখন কি হারিয়ে যাবে না? তখন তো আপনার ইচ্ছাই হিন্দুস্থান নয়! আপনিই হিন্দুস্থান নয়! তখন শাহজাদা খুর্রমই হিন্দুস্থান। তার ইচ্ছাই যে হিন্দুস্থান হয়ে দাঁড়াবে।

বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীর টলটলানো পায়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাই? তাই বলছো বেগম? আমি তো তোমায় হারাতে পারবো না কিছুতেই।

নূরজাহান বেগম কোনো জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে মেঝের গালিচায় তাকালেন। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই বাদশার গলা তার কানের সামনে ফেটে পড়লো।

—মহাবত খাঁ—মহাবত খাঁ কোথায়?

বাদশার এই গলা শুনে নূরজাহান বেগম নিজের মনের ভেতর একা একা হেসে উঠলেন। আনন্দের হাসি। বিশ্বাসের হাসি। আমার ভ্রূভঙ্গিতে—কটাক্ষে, সামান্য হাসিতে হিন্দুস্থানের বাদশা জ্বলে ওঠেন। আমি পারি। আমি এখনো ইনসানকে উসকে তুলতে পারি।

একথা ভাবতে ভাবতে তাঁর মন আবার ভয়ে কাঁটা হয়ে উঠলো। মহাবত খাঁকে বাদশার মনে পড়েছে। পড়ারই কথা। সেলিম জাহাঙ্গীর যখন এলাহাবাদে সুবেদার—তখন থেকেই মহাবত খাঁ নানান হামলা, পাগলামিতে সেলিমের সঙ্গী।

কিন্তু সেই মহাবত খাঁকেই তো আমি চটিয়ে রেখেছি। বাদশা যাকে শাহজাদা পরভেজের আতালিক করে বসিয়েছে—তার ইজ্জেকে আমল না দিয়ে এই ক'বছরে আমি শাহজাদা খুর্রমকেই সওয়ারে—জাতে—কদরে শুধুই ওপরের দিকে ঠেলে তুলেছি। নিজের অজান্তেই নূরজাহান বেগম একা একা কেঁপে উঠলেন। সেলিম আর বাদশা নেই—এটা ভাবতেই নিজের শিরদাঁড়া ছুঁয়ে অবিরাম জলের ফোঁটা নেমে যাওয়া টের পান। বাদশার বেয়াড়া বাঘ—মহাবত খাঁ কি এখন বাদশার ডাকে সাড়া দিয়ে বিলোচপুরে ঝাঁপিয়ে পড়বে?

সেদিন আগ্রায় হামামে হামামে একটাই তর্ক। বাদশা কি ফৌজ পাঠাবেন বিলোচপুরে? সে তর্ক হামাম থেকে চকে—চক থেকে রাজধানীর বাগে বাগে ছড়িয়ে পড়লো। পড়লো এক মকবরা থেকে আরেক মকবরায়। শাহজাদা খুর্রমের তাঁবে শাহী ফৌজের ক'খানা তোপ তাও মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে আম আতরাফ লোকজন বলাবলি করতে লাগলো।

দুর্গের ভেতর মোতি মসজিদের কাছেই শারিয়ার আর লাডলির নতুন সংসার। দুজনেই সংসারে আনাড়ি। নূরজাহানের ইচ্ছেতে লাডলির সঙ্গে শাহজাদা শারিয়ারের কিছুদিন হলো বিয়ে দিয়েছেন বাদশা।

দুর্গের এদিকটা কিছু নির্জন। এখান থেকে দাঁড়িয়ে মোরি দরওয়াজার কাছাকাছি বাদশার হাতি, সিংহ, ঘোড়াঘর স্পষ্ট দেখা যায়। সেদিক দিয়েই আঙুরিবাগে যাওয়ার সংক্ষেপে একটি রাস্তা আছে। সন্ধের মুখে সেই পথ দিয়ে শাহজাদা শারিয়ারকে তাড়াহুড়ো করে ছুটে আসতে দেখে লাডলি বেগম ঘর থেকে বেরিয়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো। কী ব্যাপার? অমন ছুটে আসছো কেন?

চারদিক তাকিয়ে শারিয়ার বললো, মোরি দরওয়াজা দিয়ে তো কোনো শাহজাদা যাতায়াত করে না—

—তা তুমিই বা ওদিকে গেছলে কেন?

—আর বলো কেন? সারা দুর্গে সাজো সাজো রব পড়ে গেছে। বিলোচপুর ছাড়া আর কোনো কথা নেই কারও মুখে। সেই ফাঁকে আঙুরিবাগ থেকে এই জুঁইগুলো নিয়ে এলাম তোমার জন্যে—চুলে দিলে বড় সুন্দর লাগে তোমায়।

—কী রকম শাহজাদা তুমি বলো তো? সবাই তৈরি হচ্ছে বিলোচপুরের জন্যে। আর তুমি গ্যাছো ফুল কুড়োতে?

নতুন যুবক শারিয়ার। শায়ের গোছের চেহারা। সে বড় বড় চোখ তুলে বেশ অভিমান ভরেই বললো, তোমাকেও দেখছি তোমার আম্মিজানের রোগে ধরেছে! মনসব, সওয়ার, মোহর, লড়াই! বাঃ!

—ভুলে যেও না শাহজাদা—আমার আম্মিজান হিন্দুস্থানের বাদশা-বেগম। তোমারও আম্মিজান—

—আমারও আব্বা হুজুর হিন্দুস্থানের বাদশা। তিনি তোমারও বাবা।

—না। আমার আব্বা হুজুর মরহুম শের আফগান।

সাদা ফুলগুলো দু'জনের মাঝখানে একটা লালপাথরের রেকাবিতে পড়ে থাকলো। দু'জনের মুখে কোনো কথা নেই। বিকেল ফুরিয়ে যাবে বলে যমুনার ওপারে ঢলে পড়া সূর্য ওদের এই দুর্গের ঘর-গেরস্থালিতে কয়েকটি লাল সুতো পাঠিয়ে দিয়েছে। তাতে সাদা ফুলগুলো গোলাপি হয়ে উঠলো।

শাহজাদা শারিয়ার উঠে দাঁড়িয়ে অস্থির হাতে নিজের কপালে ঘুষি মারলো। এত বড় হিন্দুস্থানে লাডলি—সবারই কাজ আছে। কেউ যুদ্ধ করে। কেউ তাড়া খেয়ে পালায়। শুধু আমিই কারও কিছুতে নেই। কেউ আমাকে একটা যুদ্ধেও ডাকে না। আমি কারও পক্ষে নেই। আমি কারও দুশমনও নই। আমি তাহলে কী? আমি তাহলে কে?

লাডলি বেগম একটা জুঁই তার চুলে গুঁজে সামনে এসে দাঁড়ালো। তারপর শাহজাদার বুকে ডান হাতখানি রেখে বললো, তুমি শারিয়ার। যেমন ছিলে তেমনই আছো।

—শাহজাদা খুর্রম বাগী হয়। শাহজাদা পরভেজের মনসব বাড়িয়ে দিয়ে তাকে দরবারে ডাকা হয়। শাহজাদা খসরুর আচমকাই এন্তেকাল হয়। শুধু আমিই কিছু হই না। আমারই কিছু হয় না। সবাই শলাপরামর্শ করছে লাডলি। কেউ ছুটে যাচ্ছে। সবাই জরুরি কিছু করছে। আমিই শুধু

আঙুরিবাগ থেকে ফুল কুড়িয়ে আনছি। এর চেয়ে বড় কিছু আমি জানিও না !

লাডলি বেগম উঁচু দীবানে বসলো। তারপর বললো, তুমি তোমারই কাজ করছো। কাউকে তো ফুল কুড়োতেই হবে। এসো আমার সঙ্গে—

শাহজাদা শারিয়ার বেগম লাডলির পাশাপাশি হেঁটে দুর্গের তক্তাপোলের মুখোমুখি ওদের ঘরসংসারের সবচেয়ে সুন্দর জায়গায় এসে দাঁড়ালো। বাদশা জাহাঙ্গীর শাহজাদা শারিয়ারকে বিয়ে দিয়েছেন বটে—কিন্তু চোখে চোখে রাখতে চান—তাই দুর্গের ভেতরেই শাহজাদা শারিয়ার বেগম লাডলির এই থাকাথাকি।

এ-ঘর থেকে অনেক নিচে দুর্গের গা ধরে যমুনার জল-ধরা নালা, আজমির যাবার সড়ক ধরে উটের পালের যাতায়াত—সবই দেখা যায়। এখান থেকে গাছে গাছে ঢাকা আগ্রার ভালো ভালো রাস্তার মাথাও দেখা যায়।

বেগম লাডলি বললো, এবার তোমাকে খুব বড় একটা কাজ দেবো। তুমি খুব মন দিয়ে করবে কিন্তু—

শারিয়ার তার এই সুন্দরী বেগমের মুখে আগ্রহ ভরে তাকালো।

—শোনো। কাল সন্ধেবেলা আমার গলার মালা থেকে তিনটে চুনী এখানটায় খসে পড়েছে। মালাটা দিয়েছিলেন আম্মিজান। তাঁর সামনে গলায় দিতে পারছি না—গলা খালি দেখলেই জানতে চাইবেন। আমার সবসময় গলায় পরার হার বলতে পারো—

—তা আমি কী করবো ?

—তুমি এই পাথরের সরু জায়গাটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে হারানো চুনী তিনটে বের করবে। খুব দামি। বাদাকশানি চুনী তো—

আর বলতে হলো না। শাহজাদা শারিয়ার উবু হয়ে বসে পাথরের দেওয়ালের জোড় জায়গাগুলো ভালো করে দেখতে লাগলো। দেখতে দেখতে বললো, একটা আলো হলে ভালো হতো লাডলি—

লাডলি বেগমের মুখেই পাতলা একটা হাসি খেলে গেল। বাদশা জাহাঙ্গীরের কোলের শাহজাদা বলা যায় শারিয়ারকে। কী সরল! মুখে বললো, এখুনি এনে দিচ্ছি—

সারাদিন আগ্রা গরমে ঘেমে থাকে। সন্ধের মুখে মুখে ঠান্ডা বাতাস এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে যমুনার বুক থেকে। ঠিক এখন রাজধানীর চবুতরায় ফুলওয়ালিদের মেলা বসে গেছে। এই সময় আগ্রার রইসরা নানান আতর ছড়িয়ে সন্ধ্যার আসরের দিকে পাড়ি জমাবে। এখন সারাদিনের খুদ কুঁড়ো কুড়িয়ে ভিখিরিরা তাদের খয়রাতপুরার ডেরায় ফেরে। যোগীপুরায় এমন সময় সাধু-সন্ন্যাসী দরবেশ-ফকিরের জটলা। আর শয়তানপুরায় কসবি, নাচওয়ালি, তবাইফ্ আর পাতুরিয়া। মেয়েদের দোরে দোরে এখন গ্রাহক ধরতে আলো জ্বলে উঠবে। সারা রাজধানীর পানশালাগুলো সঙ্গে সঙ্গে খুলে যাবে। এ

ছবি রাজধানী আগ্রায় দুর্গে বসে অনেকদিন ধরে দেখা আরজুমন্দ বানুর। আসলে কিছুটা দেখা। দুর্গের উঁচু থেকে। যেমন যেমন চোখে পড়ে। আর কিছুটা শোনা কথা থেকে কল্পনায় সাজিয়ে নিয়ে মনের ভেতর বসিয়ে দেওয়া।

সেই তুলনায় বিলোচপুরে সন্ধে হয়ে আসাটা অনেক সাদামাটা। পাথর বেরনো পাঁশুটে ঘাসে ঢাকা ঢিবির পর ঢিবি। মাঝে মাঝে বাবলা গাছ। দূরে পথরেখার পাশে দাঁড়ানো ঝুরিনামা বট। আরও দূরে লোকবসতি—গ্রামের আভাস।

এরকম জায়গায় শাহজাদা খুররমের ছাউনির মাঝখানে ডুরসানা-মঞ্জেল তাঁবুর পর্দা সরিয়ে বেগম আরজুমন্দ বানু দাঁড়িয়েছিলেন। দূরে একটা দীঘির পাড়ে কয়েকটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে। বড় বড় বলদ রসদ টেনে নিয়ে যাচ্ছে গো-গাড়িতে। এর ভেতর উঁচু নিচু ঢিবি টপকে চার ছেলেমেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তাঁবুতে ফিরছিল। আরজুমন্দের নজর এড়ায়নি—এই তাঁবু, তাঁর ছেলেমেয়ের ওপর আচমকা কোনো হামলা রুখতে দূরে দূরে বন্দুকচীরা সারাদিন বন্দুক বাগিয়ে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সেই যে শাহজাদা বেরোলেন—ফেরার তো কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।

এমন সুন্দর মাঠ—চারদিকে তেজি ঘোড়া—ফুলের মতো ছেলেমেয়ে—লড়াকু সওয়ারদের টগবগিয়ে রাস্তা দাপানো, শুঁড়ে জল ফোয়ারা করে হাতিদের মাতামাতি—দুনিয়া যে কী সুন্দর! এর নাম হিন্দুস্থান। এত ফুলেল। এত বাহারি। এত সুগন্ধী। অথচ শাহজাদা খুররমের এ সুখ কাঁটা হয়ে বিঁধলো। এ সুখ—এ শান্তি তাঁর সইলো না।

দূরের প্রান্তর জুড়ে সন্ধ্যা নামছিল। ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেগম আরজুমন্দ বানু তাঁবুর ভেতরে এলেন। জাহানারা, দারা, রোশনআরা, আওরঙ্গজেব। তাঁবুর ভেতরকার গুলালবারে বাতিদার অভ্রের আলো ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে এরই ভেতর।

আগ্রা দুর্গ থেকে বেরিয়ে এভাবে খোলা হিন্দুস্থান সুলতান মহম্মদ দারাশুকো বা তার ভাইবোনেরা বড় একটা দেখেনি। মাটির ওপর ঘাস, খানিক ঘেরা জায়গার ভেতর অনেকটা জল—যার নাম দীঘি, তার বুকে আশপাশের গাছের ছায়া—এসবই তাদের মন কেড়েছে।

জাহানারা বড় হয়ে উঠছে। মাথার চুল ঝাঁকিয়ে সে আরজুমন্দের কাছে ছুটে এলো। আম্মিজান—শোনো কথা! দারা বলছে—আমরা যা দেখি—সেটাই দুনিয়া নয়। দুনিয়া নাকি আমাদের মনের ভেতর যা ভেসে ওঠে—খোয়াবে যা দেখতে পাই—সেটাই আসলে দুনিয়া।

আরজুমন্দ বানু কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি তাঁর বড় ছেলের মুখে তাকালেন। সারাদিন খোলা মাঠে খেলে সুলতানের দামি জামা ধুলো ময়লা একেবারে। মাথার চুল কপালে এসে পড়েছে। তার ভেতর থেকে বড় বড় চোখ দুটি সারা মুখে ভেসে আছে।

ছেলের মুখ দেখে গর্ব হলো আরজুমন্দের। কী শুনছি এসব? আবার

জেগে জেগে খোয়াব দেখা হচ্ছে ?

—না আম্মিজান—খোয়াব নয়।

জাহানারা বলে উঠলো, জানো আম্মিজান—দারা বলছিল—দীঘির পাড়ে দাঁড়ানো পিপুল গাছটা আসলে পিপুল গাছ নয়। আসল পিপুল গাছ হলো গিয়ে দীঘির বুকে ছবি হয়ে ভেসে ওঠা গাছটা। আর দীঘির পাড়ে দাঁড়ানো গাছটা সেই ভেসে ওঠা গাছটার স্বপ্ন— !

—তাই বলেছো দারা ?

—হ্যাঁ আম্মিজান।—বলে দারাশুকো মুখ তুলে তাকালো মায়ের মুখে।

সে মুখে গভীর বিশ্বাসের চিহ্ন দেখতে পেলেন আরজুমন্দ। তিনি খুব আস্তে জানতে চাইলেন, কী রকম ?

দারাকে ঘিরে তখন তার বাকি তিন ভাইবোন দাঁড়িয়েছে।

সুলতান দারাশুকো বলে উঠলো, আম্মিজান—তুমি তো আবদুল রশিদ দৈলেমি সাহেবের পড়ানো শোনোনি ? অরিস্টটু, আফলাতুনের কথা জলের মতো বলে যান দৈলেমি।

জাহানারা ঠাট্টা করে বললো, সে যুগে আফলাতুনের শিষ্য ছিলেন অরিস্টটু। আর অরিস্টটুর শিষ্য ছিলেন সিকান্দার।

দারাশুকো তার চেয়ে অল্প বড় দিদি জাহানারার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লো। আফলাতুন, অরিস্টটুর মতো ইনসানের মাঝে সিকান্দার আসছে কোত্থেকে ?

—বাঃ ! আসবে না ? সিকান্দারের মতো দুনিয়া দাপানো লড়াকু আর কোথায় পাবে ? দুনিয়া দখলের খোয়াব দেখতেন সিকান্দার—

—আমাদের খোয়াবের ভেতর বাইরের এই দুনিয়ার চেয়ে অনেক বড় দুনিয়া আছে দিদি। সেই দুনিয়ার খোয়াব দেখতেন আফলাতুন।

জাহানারা আবার ফোড়ন কাটলো, জানো আম্মিজান—সে যুগে আফলাতুনের চেলা অরিস্টটু। অরিস্টটুর চেলা সিকান্দার। আর এ যুগে আবদুল রশিদ দৈলেমির চেলা সুলতান মহম্মদ দারাশুকো।

আরজুমন্দ বানু কোনো কথা বললেন না। তিনি তাঁর তর তর করে বেড়ে ওঠা বড় ছেলের মাথায় হাত বোলালেন। এলোমেলো একমাথা চুল। মাথার ভেতরটা জানবার ইচ্ছায় সবসময় গরম হয়ে আছে।

আরজুমন্দ মনে মনে নিজেকেই বললেন, কবে যে আবার আগ্রায় ফিরে যাবো জানি না।

।। চোদ্দো ।।

আগ্রা যাবার শাহী সড়কের ওপর বিলোচপুর। পেছনে দিল্লি। সামনে আগ্রা। দু'পাশে মাঝে মাঝে গেঁহুর ক্ষেত। পাকা গমের ওপর পাখির ঝাঁক। এমনিতেও এখানে পৃথিবীটাকে দেখতে খুব নিরীহ—নির্দোষ। কিন্তু ওরই

ভেতর শাহজাদা খুর্‌রম তাঁর দক্ষিণী ফৌজ নিয়ে তৈরি হচ্ছিলেন।

গত পাঁচ ছ'বছর এই ফৌজ দক্ষিণে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহমদনগরে মাঠে প্রান্তরে—শাহজাদা খুর্‌রমের হুকুমে উঠেছে বসেছে। মালিক অম্বরকে শায়েস্তা করেছে। হামলার পর হামলা চালিয়েছে।

আর এখন? হিন্দুস্থানের খোলা প্রান্তরে কড়কড়ে রোদে ঘামে গরমে অস্থির হয়ে উঠেছে। ঘোড়া ঘামছে। ঘোড়সওয়ার ঘামছে। অন্যদেরও বা কি আলাদা দশা! দুপুরবেলা চড়া রোদে যেমন হয়ে থাকে।

আগাম ঘোড়সওয়ার পাঠিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শাহজাদা খুর্‌রম। যে-পথ দিয়ে শাহজাদার ফৌজ যাবে—তার দু'পাশের গাঁয়ের মানুষকে অতি অবশ্যই শাহী সড়কের ওপর রেড়ির ডাল কেটে ঘন করে বিছিয়ে রাখতে হবে আগাম। নয়তো কামানের গাড়ি যাবে কী করে? চাকা বসে যাবে।

গাঁয়ের মানুষ জানে। শাহী হিন্দুস্থানে থাকতে হলে এই ফৌজী ফরমান মেনে বেগার দিতেই হবে। রেড়ির তেল বের করার পর ডালপালা শুকিয়ে জ্বালানি করা হয়ে থাকে। সেসব তুলে এখন রাস্তায় ফেলতে হচ্ছে। এ জন্যেই গাঁয়ের মানুষ এ রাস্তাকে বলে থাকে কাক্কড়ওয়ালি সড়ক। রেড়ির ডালের নাম কাক্কড়।

এই সড়ক খানিক এগিয়ে সরযূর গা ধরে চলেছে। শাহজাদা খুর্‌রম তাকিয়ে দেখলেন—চর পেরিয়েও সরযূর বুকে এখনো অনেকটা জল আছে। তাপ্তি, সরযূ, বনসু, ঘর্ঘরা, টৌঁস—সব নদীই দু'ধারে চর জাগিয়ে জলধারাকে ক্ষীণ করে বসে আছে। কামানের গাড়ি টেনে আনা তাই কঠিন। চরের বালি নয়তো জলে চাকা বসে যাবে। দরকার গজনল। ভাগে ভাগে কাঁধে করে এনে তীরে উঠে ফের জোড়া লাগালে—আবার যে কামান—সেই কামান। কিন্তু মালব বা গুর্জরের সুবেদারের তো সেই গজনল নেই।

ফৌজ সাজানো প্রায় সম্পূর্ণ। শাহজাদা একদম সামনে রেখেছেন বাছাই ঘোড়সওয়ারদের দুটি রিসালা নিয়ে তৈরি একটি ফিকা পর্দা। এই ফিকা পর্দার ঘোড়সওয়াররা এগিয়ে গিয়ে হামলা চালাতে লাগলো। এরা যেমন দক্ষ তেমনই ক্ষিপ্র। এদের ঠিক পেছনেই প্রায় দশ হাজার ঘোড়সওয়ারের হারবলের মাঝখানটায় হাতির পিঠে শাহজাদা খুর্‌রম। তার পেছনে সারি সারি তোপ।

ফিকা পর্দার চৌকস ঘোড়সওয়াররা এগিয়ে গিয়ে উল্টোদিকের ফৌজে হামলা চালিয়েই ফিরে আসছিল। ওদিকে ফৌজ চালাচ্ছেন পাকা মাথার মির্জা আজিজ। শাহজাদা খুর্‌রমের বড়ে ভাই মরহুম শাহজাদা খসরুর শ্বশুর। তার মানে ভাতিজা সুলতান দাওয়ার বকসের নানা সাহেব। তিনি দাওয়ার বকসের আতালিকও বটে। মির্জা আজিজের মেয়ের ছেলেই তো দাওয়ার বকসু।

খুর্‌রমের মতলব ছিল—ফিকা পর্দার ঘোড়সওয়ারদের উস্কানিতে মির্জা আজিজ তাঁর ফৌজ নিয়ে এগিয়ে আসবেন। গোলার আওতায় এসে গেলেই শাহজাদা খুর্‌রমের পেছন থেকে তোপ দাগা শুরু হয়ে যাবে। তোপে দুশমন নয়-ছয় হয়ে গেলেই লড়াকু হাতির দল ছেড়ে দেওয়া হবে। তাদের পেছন পেছন

এগিয়ে যাবে বন্দুকচী—ধানুকীর দল। পদাতিকরা তো আছেই। আছে উজবেক কুকুর।

মোট তিরিশটা লড়াকু হাতির গায়ে সেই শেষ রাতে লোহার বর্ম আঁটা হয়েছে। ঘি চিনি যব আখ ছাড়াও বেশ খানিকটা করে সরাব খেয়ে হাতিগুলো এখন রীতিমত ফুর্তিবাজ। তাদের দাঁতের দু'দিকে তলোয়ারও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তলোয়ারের দু'দিকেই ধার। দুশমনের ভেতরে পড়ে মাথা নাড়লেই অনেকখানি কাজ হয়ে যাবে।

তোপে ছয়ছত্র হয়ে পড়লে এই হাতি গিয়ে দুশমনের লোকজনের ভেতর দাপাবে। কিন্তু শাহজাদার মতলব মতো কিছুই হচ্ছিল না। খোলা প্রান্তরের ভেতর হাতির গা ঘেমে উঠেছে শুধু।

মির্জা আজিজ পাকা জানবাজ। তিনি বাদশা জাহাঙ্গীরের পতাকা নিয়ে লড়তে নেমেছেন। শাহজাদা খুর্রমের ফাঁদে পা দিলেন না।

শাহজাদা খুর্রমের কপালে ভাঁজ পড়লো। গুর্জর বা মালব—কোনো সুবার ফৌজই এসে পৌঁছলো না। তিনি ধরেই রেখেছিলেন—গুর্জর, মালব, দক্ষিণ—তিন সুবার ফৌজ একসঙ্গে আগ্রার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালে বাদশাহ বেগম নুরজাহানের পরোয়া না করেই রাজধানীর মনসবদাররা তাদের ফৌজ নিয়ে তাঁর দিকে চলে আসবে। কিন্তু মতলব মতো কিছুই তো হচ্ছে না। কোথায় আগ্রা! এখনো তো বিলোচপুরেই আটকে আছি। আশা করে বসেছিলাম—আমরা গিয়ে আগ্রা ঘিরে দাঁড়ালেই লাহোর, দিল্লি, আগ্রার শাহী মনসবদাররা বেগম নুরজাহানের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াবে। ইয়া আল্লা! তেরি রেজা!

আগ্রার দিক থেকে বিলোচপুর যেতে হলে শাহী সড়কের বাঁ দিকে পড়ে সাকেত ছাউনি। মির্জা আজিজ সেখান থেকে ফৌজ নিয়ে শাহজাদা খুর্রমের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। টিলার ওপর থেকে তিনি সবই দেখতে পাচ্ছিলেন। নিচে দূরে—উল্টোদিকে হাতির পিঠে শাহজাদা খুর্রম। এতই দূরে যে বন্দুকের নিশানার ভেতর পড়ে না। মির্জা দাঁতে দাঁত ঘষে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে পেছন দিকে ছুটে গেলেন।

পদাতিক, ধানুকীদের ভেতর ঘোড়ার পিঠে নিজের নাতির মুখখানা দেখতে পেলেন মির্জা আজিজ। সুলতান দাওয়ার বকস্ তখন ধানুকীদের ঠিক মতো দাঁড় করাচ্ছিলেন। শাহজাদা খসরুর পয়লা আওলাদ—দাওয়ার বকসের এখন ঠিক সতেরো। মির্জা আজিজ দেখলেন—নাতি তাঁর জামাইয়ের মতোই লম্বা হয়ে উঠেছে। তেমনি চওড়া ধাঁচ। মস্ত মাথা কালো চুলে ভর্তি।

—একি? নানাসাহেব? আপনি এখন এখানে?

দাওয়ার বকসের এ কথায় একগাল হেসে মির্জা আজিজ বললেন, তোমায় একটা জিনিস দেখাতে এলাম। দেখবে এসো।

ঘোড়ার পিঠেই নানাসাহেবের পেছন পেছন টিলায় উঠে এলো দাওয়ার বকস্। কী?

—ওই দ্যাখো—ওই যে-হাতির পিঠে—

—হ্যাঁ। দেখেছি—

—কে বলতো ?

—চাচা হুজুর—শাহজাদা খুর্রম—

—এ লড়াইয়ে আমার পয়লা নিশানা—বলতে বলতে মির্জা আজিজ দূরে শাহজাদা খুর্রমের দিকে তাকিয়ে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলেন। শাহজাদা খুর্রম যে অস্থির হয়ে পড়েছেন তা বুঝতে পারলেন। নইলে বেহুদা অমন তোপ খরচ করে কেউ ? গোলা এসে পড়ছে দু'পক্ষের মাঝের ফাঁকা মাঠে।

দুপুর শেষ হবার আগেই শাহজাদা খুর্রমের কাছে খারাপ খবর নিয়ে এলো কাসীদরা। গুজর্র, মালবের কোনো খবর নেই। কিন্তু শাহজাদা পরভেজের আতালিক—বাদশা জাহাঙ্গীরের বেয়াড়া বাঘ—মহাবত খাঁ আজমিরের দিক থেকে ভয়ঙ্কর বেগে এগিয়ে আসছেন। তাঁর তোপগাড়ি টানছে বিকানিরের জবরদস্ত সব উট। এসে পড়লেন বলে। মনে মনে খুর্রম সাবাসি দিলেন বাদশা বেগম নূরজাহানকে। নিজের ঘোর দুশমন মহাবত খাঁকে ঘুরিয়ে নিজের কাজে লাগাতে পেরেছেন।

আগ্রা অনেক দূরে। বরং দিল্লি কয়েক মঞ্জেলের ভেতর। একবার শাহজাদা খুর্রম ভাবলেন, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বেগম আরজুমন্দকে দিল্লি পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়। কেননা, খবর এসেছে—আমেরের রাজা মির্জা জয়সিংহ আর দুর্ধর্ষ পাঠান মনসবদার খানজাহান লোদি ফৌজ নিয়ে আগ্রা রওনা হয়েছেন। ওঁরা বিপদে বাদশার পাশে। শাহজাদা বুঝলেন, এখুনি ঝড়ের বেগে হামলার পর হামলা চালিয়ে যাওয়া দরকার।

এই অবস্থায় আগ্রাব দিকে এগোনো মানে শাহী ফৌজের হাতে ধরা দেওয়া। শাহজাদা খুর্রম হাতি থেকে নেমে ঘোড়ায় উঠলেন। এখুনি একবার রাজা বিক্রমাজিৎকে খুঁজে বের করা দরকার। ধানুকী, পদাতিকদের ভেতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন খুর্রম। রাজাই তাঁকে গত পাঁচ বছর ধরে নর্মদার ওপারের হামলার বুদ্ধি দিয়ে, ঘোড়সওয়ার দিয়ে—তাগদ জুগিয়েছে। তাঁরই বুদ্ধিতে শাহজাদা খুর্রম এবার আগ্রার দিকে ধাওয়া করে বাগী হয়েছেন। রাজার সঙ্গে এখুনি পরামর্শ করা দরকার। পরামর্শ দরকার দারা খাঁয়ের সঙ্গেও। দারা খাঁ সবচেয়ে চৌকস ঘোড়সওয়ারদের নিয়ে একেবারে সামনাসামনি মির্জা আজিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। শাহজাদা খুর্রমের কানের পাশ দিয়ে শিস্ তুলে একটা গুলি বেরিয়ে গেল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে শাহজাদা ঘোড়ার পিঠে এগোতে লাগলেন। দু'পাশে তাঁরই লোক লশকর।

সারা হিন্দুস্থান জানে—বাদশা জাহাঙ্গীরের পয়লা শাহজাদা খসরু আর নেই। যদি থাকতেন—একজন অন্ধ শাহজাদা হিন্দুস্থানের কী কাজে আসতেন! শাহজাদা পরভেজ কখনো শাহী ফৌজের হয়ে তলোয়ার ধরেননি—একথা হিন্দুস্থানের যে কোনো খেয়াঘাটের পারাপারের মাঝিও জানে। জানে

—শাহজাদা শারিয়ার আজও ডাগরটি হননি। তাই বাদশা জাহাঙ্গীরের সবচেয়ে বড় বল ভরসা—হিন্দুস্থানের সেরা লড়াকু—দক্ষিণে ফতেজং সুবেদার শাহজাদা খুররম।

সেই খুররম বাগী হয়েছেন। আগ্রার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। এটা একটা বড় খবর। আগ্রার মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে গেঁহু, যব, বাজরার দর পড়ে যাচ্ছে। পড়ে যাচ্ছে মোহরের কদর। জাঞ্জিবার, সিরিয়া, তুর্কিস্থান, খোরাসানের ব্যাপারিরা বাজারে পড়ে থাকা মোহর-দিনার তুলে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সন্ধের পর যে যার ঝাঁপ বন্ধ করে ভেতরে চুপচাপ বসে থাকে। এর ভেতর পাঁচটি জায়গা আগ্রাকে চাঙ্গা রেখেছে। যোগীপুরায় ফকির-সন্তদের ওঠা বসা, চলাফেরা, ধুপধুনোর কোনো খামতি দেখা যাচ্ছে না। খয়রাতপুরায় ভিখারি-মিশকিন বেড়েই চলেছে। আর শয়তানপুরায় বেশ কয়েকদিন হলো মেয়েদের ঘরে ঘরে ফৌজী লোকজনের আমদানি বেড়ে গেছে। কেননা নানান্ শাহী ছাউনি থেকে জং-কি-ময়দানে সামিল হতে যাবার আগে সব ফৌজীকেই একবার রাজধানী আগ্রায় এসে ইয়াদদস্ত করে যেতে হয়। যাবার বেলায় তাদের অনেকেই শয়তানপুরায় ঘুরে যায়। তাতে শাহী খাজনাখানার আয়ও বেড়ে গেছে আচমকা। শয়তানপুরায় মেয়েদের ঘরে বসতে হলে শাহী খাজনা জমা দিয়ে তবে বসা যায়। মকবরাগুলো মোনাজাতে মোনাজাতে সবসময় সরগরম। আর ভিড়ের কোনো কম নেই হামামগুলোয়। এই পাঁচ জায়গা বাদে—বাকি আগ্রা সন্ধের পর প্রায় শুনশান।

শাহজাদা খুররম বিলোচপুরে বাগী হয়ে ওঠার খবরের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী আগ্রা যেন অনেকটাই পাল্টে গেছে। খোদ বাদশা জাহাঙ্গীর এখন সকালে দর্শন ঝরোকায় এসে দাঁড়ান। বেশ সকাল সকালই। দেখা না দিলে পাছে গুজব রটে—বাদশার খুব অসুখ—কিংবা বাদশা আর নেই—তাই।

ভোর ভোর বাদশাকে দেখতে আগ্রার রাস্তায় লোকের কোনো অভাব নেই। দর্শন ঝরোকায় দেখা দিয়ে সেলিম জাহাঙ্গীর দরবার-ই-খাস-এ এসে বসলেন। এমন সময় সাধারণত বাদশা দরবারে বসেন না। কিন্তু বিলোচপুর থেকে শাহজাদা খুররমের হটে যাবার খবরটা কাল রাতে শোনার পর থেকেই বাদশা খুব খুশ মেজাজে রয়েছেন। দরবারে বসেই বাদশা সব শুনতে লাগলেন।

প্রথমেই উজিরে আজম আসফ খাঁ লড়াইয়ের আখবরাত পড়ে শোনাতে লাগলেন। শুনতে শুনতে বাদশা চোখ তুলে তাকালেন উজিরে আজমের মুখে। আসফ খাঁয়ের চোখে কোনো পলক পড়লো না। সেলিম জাহাঙ্গীর মনে মনে বললেন, উজিরে আজম! যে-যুদ্ধের হার জিতের খবর পড়ে শোনাচ্ছেন—তার একদিকে আপনার বাদশা! আরেক দিকে আপনারই দামাদ! আপনার বাদশারই ছেলে! তার বউ আপনারই মেয়ে! যে তাড়া করে চলেছে—সে আমি। যে তাড়া খেয়ে পালাচ্ছে—সেও যে আমি। কী অলীক যুদ্ধ! কী আশ্চর্য এই জং। উজিরে আজম আসফ খাঁ তখন পড়ে যাচ্ছিলেন—

দিল্লি থেকে কয়েক মঞ্জেল উজিয়ে বিলোচপুরে বাগী খুররমের ভাগ্য

পরীক্ষা হলো...

হাত তুলে আসফ খাঁকে থামালেন বাদশা। আর ভালো লাগছে না শুনতে। একটু গান হোক—

আজ দরবারে সবাই বুঝতে পারছেন—বাদশার মন-মেজাজ বেশ ভালোই আছে। দুর্গের সামান বুরুজের পাশে নক্কারখানায় সানাই, বাঁশি এই মাত্র থামলো। বর্ষাকালের মেঘভাঙা রোদ এসে পড়েছে দেওয়ান-ই-খাসের গায়ে খোলা চত্বরে। তার নিচে তাকালেই যমুনার গা ধরে সাজানো আঙুরিবাগ।

বাদশা জাহাঙ্গীর দূরে বসা একজনকে দেখে বললেন, সেই যে গেয়েছিলেন একবার—

লোকটি উঠে দাঁড়ালো। কোন্ গানটি আলা হজরত?

—সেই যে—সকালবেলা গাইলেন—

—ভৈরবী?

—টোড়ি কি ভৈরবী—ঠিক বুঝিও না বিলাসখান—

—আলমপনা! এ আপনার নিতান্ত বিনয়। আপনি সবই বোঝেন। আবুল হাসানের ছবি বোঝেন আপনি। নায়েক গোপালের ধ্রুপদ শুনে আপনি তারিফ করেন। ভৈরবী, টোড়ি তো তুচ্ছ আপনার কাছে। কোন্ গানটি বলুন তো?

—সেই যে গেয়েছিলেন—তুসে নাহি বলুঁ—

—ওঃ! এ যে টোড়ি। ভোরবেলার গান—

—টোড়ি কী ঠিক আসলে?

বাদশার কথায় বিলাসখান গলে গেলেন। হিন্দুস্থানের বাদশা জানতে চাইছেন—টোড়ি রাগটি কী আসলে? এর চেয়ে আনন্দের কী হতে পারে?

—টোড়ি আসলে সবটাই ভৈরবী।

—তাহলে? তাহলে আলাদা নাম কেন?

—শুধু গান্ধার—ধৈবতের একটুখানি লীলা আছে। তাই আলা হজরত—

—নমুনা শুনি।

বাদশার একথায় সবাই তাকিয়ে পড়লো বিলাসখানের দিকে। তিনি জাহাঙ্গীর বাদশার দরবারি গায়ক। তানসেনের ছেলে। তানসেন গাইতেন আকবর বাদশার দরবারে। সে গানও শুনেছেন বাদশা জাহাঙ্গীর।

বাদশা তাকিয়ে। তাকিয়ে আছেন উজিরে আজম আমীর ওমরাহরা। বিলাসখান উঠে দাঁড়ালেন। তাই দেখে সবাই বুঝলো, বিপদ সামনে। বাদশা টোড়ি রাগের নমুনা শুনতে চেয়েছেন। আর গায়ক তা না গেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

সেলিম জাহাঙ্গীরের ভ্রূ কুঁচকে গেল।

বিলাসখান উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমায় ক্ষমা করুন বান্দাগান-ই-হজরত!

আসফ খাঁ চুপ করে থাকতে পারলেন না। কী ব্যাপার?

বিলাসখান খুব করুণ করে বললেন, অন্য কিছু গাইতে বলুন।

আমি গাইছি—

—কেন ? টোড়ির কী হলো ?

—টোড়ি আমি গাইতে পারবো না।

বিলাসখানের সংগী কিঙ্গিনা বাজিয়ে অল্পবয়সী ছোকরার বুক কেঁপে উঠলো। এ যে বাদশার মুখের ওপর না বলা। এমন বে-তমিজির জন্যে গর্দান হারানোও কিছু না।

—কেন পারবেন না ?

সারা দেওয়ান-ই-খাসে টু শব্দটি নেই। বিলাসখান খুব আস্তে বললেন, সবাই জানেন—আমি বেহিসেবি মানুষ। গান নিয়ে থাকি। তা একবার পূর্ণিমার পর দেখি হাতে একটাও আশরফি নেই—

—শাহী দরবার তো আপনার সব খরচা দিয়ে থাকে—

—তা দেয় আলা হজরত। আমার কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু খরচ খরচা কুলিয়ে উঠতে না পেরে আমাকে গয়ানাথ চৌধুরীর গোলায় যেতে হয়েছিল—বনজারা গয়ানাথ—

সব গুলিয়ে যাচ্ছিল বাদশা জাহাঙ্গীরের। কোথায় টোড়ি রাগে গান! আর কে এক চৌধুরী গয়নাথ! অবাক হয়ে জানতে চাইলেন বাদশা, টোড়ির সঙ্গে গয়নাথ আসছে কোত্থেকে ?

বাদশা সেলিম জাহাংগীর ভালোই জানেন—তসবিরওয়ালা, ফন্দকার, শায়ের, মওসিকার, গাইয়েরা কিছু অন্যরকম হয়। তাদের ব্যাপারটাই এলোমেলো। সব কিছুর পেছনে তাদের একটা করে কহানি থাকবেই।

—আলা হজরত—আমি চৌধুরী গয়ানাথের গোলায় টোড়ি রাগটা বাঁধা রেখে তিনশো আশরফি কর্জ নিয়েছিলাম—

বাদশা জাহাংগীর অসম্ভব অনেককিছুই শুনেছেন—দেখেওছেন। কিন্তু গানের রাগ বাঁধা দিয়ে ধার নেওয়া শোনেননি—দেখেনওনি। বললেন, রাগ বাঁধা দিয়ে ?

—হ্যাঁ আলা হজরত। আমার নামের সঙ্গে টোড়ি রাগটা জড়িয়ে গেছে তামাম হিন্দুস্থানে। তা আমি যখন ধার চাইলাম—চৌধুরী গয়ানাথ টোড়ি রাগটা বাঁধা রেখে তিনশো আশরফি দিলেন। কর্জ শোধ না হওয়া অব্দি তো ও রাগ আমি কোথাও গাইতে পারবো না। গাইতে হলে আশরফিতে গয়ানাথকে শুধে তবে টোড়ি ছাড়িয়ে এনে গাইতে পারি—

বাদশা জাহাঙ্গীরের মেজাজ আজ খুবই শরিফ। তিনি হেসে হাত তুলে কী এক ইশারা করতেই একজন উঠে গেল। খানিক পরে লক্ষ্য করলে দেখা যেতো—দুর্গ থেকে এক ঘোড়সওয়ার তীরবেগে বেরিয়ে বিয়ানার দিকে ছুটলো।

আগ্রার শেষাশেষি বিয়ানা যাবার পথেই চৌধুরী গয়ানাথের গোলা। সকাল বেলাতেই গোলার দুয়ারে ঘোড়সওয়ার দেখে ঘাবড়ে গেল লোকজন।

ঘোড়সওয়ার তিনশো আশরফি বোঝাই খেরিয়া থলেটা ঝমঝম করে বাজিয়ে

বললো, চৌধুরীজিকে ডাকো—

একজন এগিয়ে এসে বললো, চৌধুরীজি তো নেই।

—কোথায় তিনি। আমি শাহী দেওয়ানখানার কাছারি থেকে আসছি।

—তিনি তো এখানে নেই।

—কোথায় গেছেন ?

এবার গোলার সেই লোকটি হাউ হাউ করে কেঁদে পড়লো। কয়েকদিন হলো শাহজাদা খুর্রম তাঁকে বিলোচপুরে ধরে নিয়ে গেছেন—

—ধরে নিয়ে গেছেন ? কেন ?

হিন্দুস্থানের জায়গায় জায়গায় চৌধুরী গয়ানাথের গোলা আছে। শাহজাদার ফৌজ যাতে ঠিকমতো রসদ পায় সেজন্যে শাহজাদা খুর্রম চৌধুরীজিকে ধরে নিয়ে গেছেন বিলোচপুরে। জামিন হিসেবে।

আসলে গয়নাথ তখন আর বিলোচপুরে নেই। শাহজাদা খুর্রম পিছু হটছিলেন। সেই সংগে কড়া পাহারায় চৌধুরী গয়ানাথকেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পথে তার অনেক গোলা। সেখান থেকে গেঁহু, যব পাওয়াটা নিশ্চিত করতেই শাহজাদা তাকে আটকে রাখলেন।

বিলোচপুরে দিন রাত কী ভাবে কেটে যাচ্ছিল তা হিসেব করে বোঝার মতো মনের অবস্থা শাহজাদা খুর্রমের ছিল না। তিনি দম ফেলার সময় পাননি। একে মির্জা আজিজের ফৌজ—তার ওপর মহাবত খাঁ এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর ঘোড়সওয়ারদের মাঝখানে হাতির পিঠে শাহজাদা পরভেজ। আগ্রাকে যতটা দুর্বল ভাবা গিয়েছিল—তা নয়।

শাহজাদা খুর্রমের ফৌজে বুদ্ধি-বল—দুইই যুগিয়ে আসছেন রাজা বিক্রমজিৎ। তিনি বেশ কিছু আশরফি দিয়ে মহাবত খাঁয়ের বাদশাহী ফৌজের বড় লড়াকু আবদুল্লা খাঁকে বশে এনেছিলেন। এ ব্যাপারটা রাজা বিক্রমজিৎ আর কাউকে না বলে নিজের ভেতরেই রেখেছিলেন।

জোর লড়াইয়ের ভেতর মহাবতের বিশ্বস্ত আবদুল্লা খাঁ তার ফৌজ নিয়ে শাহজাদা খুর্রমের দিকে চলে এলো। সংগে সংগে সুখবরটা খুর্রমের একেবারে সামনের বাহিনীর মাথা—দারা খাঁকে জানাবার জন্যে রাজা বিক্রমজিৎ ঘোড়ার পিঠে উঠে ছুটলেন। চারদিকে তখন বৃষ্টির মতোই বাদশাহী গোলা এসে পড়ছে। ছুটন্ত রাজা বিক্রমজিৎ তারই একটি গোলায় টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে গেলেন।

যুদ্ধ করতে করতে পিছিয়ে আসা খুর্রমের ফৌজীরা হঠাৎ দেখলো—তাদের পেছনেই লশকর নিয়ে আবদুল্লা খাঁ দাঁড়িয়ে। আবদুল্লা তো মহাবত খাঁয়ের ডান হাত। সে এখানে কেন ?

খুর্রমের লশকররা ভয় পেয়ে গেল। তাহলে কি আমরা হেরে গেছি ? এই আশঙ্কায় ওদের লড়াইয়ের ইচ্ছাই নষ্ট হয়ে গেল। সূর্য তখন সবে হেলেছে। এই গরমে পায়ের পট্টির ভেতর বালি ঢুকে গিয়ে ফোসকা পড়ার দশা।

পেছনেই ফৌজ নিয়ে দাঁড়ানো আবদুল্লা খাঁ। শাহজাদা খুর্রমের লোক-লশকর ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে পড়লো।

হেসে যেতে যেতে খুর্রম ঠিক করলেন—দক্ষিণে পিছু হটি। কয়েক হাজার খুব বিশ্বাসী ফৌজ নিয়ে খুর্রম পিছু হটছিলেন।

ছেলেমেয়েদের নিয়ে আরজুমন্দ বানু একটা শেরগির হাতির পিঠে গাদেলায় বসে। পাশে পাশে ঘোড়সওয়ারদের পাহারা। সামনে আবছা জ্যোৎস্নায় বিলোচপুরের প্রান্তর। লম্বা রাস্তা। নর্মদা পেরোলে তবে দম ফেলা যাবে। কিন্তু দম যে ফেটে যাবার যোগাড়। উঃ। নর্মদা—সে কতদূর? মহাবত খাঁ তাড়া করে ছুটে আসছে। পেছনের লশকররা গোলার জবাব গোলায় দিয়ে একটু একটু করে পিছু হটছিল। এই ক'মাস শাহজাদা খুর্রমের সঙ্গে লড়াইয়ের ভেতর থেকে থেকে তিনি এখন অনেক কিছু বুঝতে পারেন।

আরজুমন্দের মনে পড়লো—আগ্রায় থাকতে এই সন্ধ্যার সময় তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে দুর্গের খোলা চত্বরে আকাশের নিচে দাড়াতেন। কখনো বা আঙুরিবাগে ফোয়ারার পাশে বসতেন। তখন ওরা ছুটে ছুটে খেলতো। শুধু সুজাঙ্গীর থাকতো তার দাদাসাহেবের কাছে কাছে।

হাতির পিঠে গাদেলাতে আওরঙ্গজেব ঘুমিয়ে পড়েছে। রৌশনআরা ঢুলু ঢুলু। জাহানারা অন্ধকার মাঠের দিকে তাকিয়ে। হাতি চলেছে মাঠঘাট ডিঙিয়ে। দারা এক মন দিয়ে মাহুতের হাতি চালানো দেখছিল। অন্ধকারে। দুশমনের নিশানার ভয়ে কোনো আলো জ্বালানোর উপায় নেই। সুজাঙ্গীর এই সন্ধ্যার কথা কোনোদিন জানবে না।

আগ্রায় এখন অন্য চেহারা। সন্ধে হতেই আগেকার আগ্রা আগ্রায় ফিরে এলো। বাদশা জাহাঙ্গীরের পেছনেই যে শাহী ফৌজ এখন একথাটা সারা হিন্দুস্হানে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে। বিদেশী ব্যাপারীরা বাজার থেকে লগ্নী গুটিয়ে ফেলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এখন তারা আবার আগের মতোই ঢিলেঢালা হয়ে উঠেছে। শাহজাদা খুর্রম যত বড় লড়াকুই হন না কেন—বাগী হলে আগ্রা তাকে শায়েস্তা করতে জানে। একথা এখন আগ্রার বাতাসে।

সন্ধ্যার সরাইখানায় আবার ভিড় উপচে পড়ছে। শয়তানপুরার গায়েই আগ্রাওয়ালি রেহানা তার কোঠা ঘরে মুজরোয় বসেছে সন্ধে সন্ধে। বিলোচ-পুর ঘিরে আগ্রা যত গরম হয়ে উঠেছে—ততই রেহানার কারোবারে ঢিলে গেছে গত কিছুদিন। অনেকদিন পরে আজ ঝাঁপ খুলে বসেছে রেহানা। পায়ে দামী নাগরা। নাগরার বাইরে ঝমঝমানো পাঁয়জোর। গায়ে মসলিন। হাত হেনায় রাঙানো। আগ্রা দুর্গে বাদশা-শাহজাদার ভেতর এক একটা কী হবে—আর অমনি তার জ্বলুনি-পুড়ুনি সইতে হবে তার মতো মুজরো করা সামান্য একটা মেয়েকে—এ একদম ভালো লাগে না রেহানার। সে বহুদিন আগে শেখা একটা ভজন গাইছিল গুনগুন করে—

উলটু জলে মীন চলে
বহি যায় গজরাজ—

ফিরিয়ে ফিরিয়ে গাইছিল। উল্টো স্রোতে মাছ সাঁতার কেটে বেরিয়ে যায়। আর সেই স্রোতেই হাতি ভেসে যায়। সবই খোদার ইচ্ছে। আল্লার রহেম। তিনি যাকে দয়া করেন—সেই উতরে যায়। গাইতে গাইতে আগ্রাওয়ালি রেহানা নিজের মনে মনেই বলে উঠলো, আহারে!

আর গাইতে পারলো না রেহানা। সে চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছে—চার চারটি কচি ছানাপোনা নিয়ে আরজুমন্দ বানু জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর শাহী ফৌজ তাড়া করে নিয়ে চলেছে তাদের। শাহজাদা খুররমের সুন্দর দুই চোখ ঝিমিয়ে পড়েছে। আহা! মাসুম বাচ্চাদের এই কষ্ট সহ্য করা যায় না। কেন যে শাহজাদারা সময় হবার আগেই মসনদে লোভ করে বাগী হয়! হেরে গিয়ে চোখ হারায়। নয়তো মুণ্ডুটাই হারায়।

এমন সময় কাঁচা পাকা এক গাল দাড়ি নিয়ে একটা লোক ঘরে ঢুকলো। গায়ে গেরুয়া রঙের আঙরাখা। খুশিই হলো রেহানা। এমন মাঝবয়সী গাহেকই রেহানাদের পছন্দ বেশি। গান শুনে—বড়জোর দু'চার পাক নাচ দেখে এদের পেট ভরে যায়। কিছু খেল কি খেল না। গালিচায় ঘুমিয়ে পড়ে। কাকভোরের আগে উঠে চলে যায়। কোনোরকম বিরক্ত করে না। এখন বিলোচপুরের লড়াই ফেরত কোনো উজবুক উজবেক আহেদি এলে তো ফেরানো যেতো না তাকে। তার চেয়ে এই ভালো।

লোকটিকে খাতির করে পানের বাটা এগিয়ে দিলো আগ্রাওয়ালি রেহানা।

পান না নিয়ে লোকটি জানতে চাইলো, কী যেন গাইছিলে একটু আগে? রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কানে লাগলো।

—ও কিছু না। আপনি ভালো করে বসুন। তারপর হুজুর ফরমায়েশ করুন। যা সামান্য জানি—তাই শোনাবো—

—উঁহু। ওই গানটাই শুনবো—আমার চেনা গান।

আগ্রাওয়ালি রেহানা গলা ছেড়ে ধরলো—

—উলটু জলে মীন চলে

বহি যায় গজরাজ—

দাড়িওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে ফিরতি চালে গেয়ে উঠলো—

যো যাকে শরণ লয়ে ভাই

সৌ রাখে তাকে লাজ—

রীতিমত ভালো গলা। রেহানা গুটিয়ে গেল। অবাকও হলো। এমন লোক তো এসব কোঠাঘরে এসে হাজির হয় না? কোনো দলছুট রসিক নয়তো। রেহানা হাতের কিঙ্গিনা থামিয়ে ফেলেছিল। তুলে নিয়ে ফের তারে আঙুল বোলালো।

—আপনার তো বেশ সাধা গলা। ধরুন—

—নাঃ! আসছি লাহোর থেকে। যাবো বৃন্দাবন। পথে দাঁড়িয়ে পড়লাম তোমার গলায় দোঁহা শুনে—

—দোঁহা?

—হ্যাঁ। তুমি জানো না?

—আমি এমনি শুনে শুনে গলায় তুলে নিয়েছিলাম ছোটবেলায়। ভুলেও গিয়েছিলাম। আজ অনেকদিন পরে ফের মনে এলো। কার দোঁহা?

এবার দাড়িওয়ালা লোকটি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে গেরুয়া আঙরাখার ভেতর থেকে একটা ছোট্ট একতারা বের করলো।

রেহানা তো চমকে উঠেছিল। ছোরা বের করবে নাকি? একতারার সঙ্গে বেরোলো ছোট মতো লোহার চিমটে। বাঁহাতের লোহার বালায় লেগে তা বেজে উঠতেই লোকটা যেন পাগল হয়ে গেল।

ঘরের মাঝখানটায় গালিচার পরোয়া না করেই নাচতে শুরু করেছিল। নাচে আর গায়। গায় আর নাচে। স্রেফ একটি কলি—

জাতি জুলহা
নাম কবীরা
বলি বলি
ফিরে উদাসী

যেমনি দরাজ। তেমনি ভরাট। অভ্রের জোরালো আলোয় লোকটিকে বেশ সুন্দর লাগতে লাগলো রেহানার। থামেই না। খানিক বাজায়। আবার গায়। গাইতে গাইতে গানে ডুবে যায়—আবার বাজায়। এতদিনকার এত বড় ঘর আজ যেন খুব ছোট হয়ে এসেছে।—ফিরে উদাসীতে এমনই একটা মন ফাঁকা করা টান—

রেহানা বসা অবস্থায় চুপ করে দেখছিল। দেখতে দেখতে যেন স্বপ্নের ভেতরেই দেখলো, মানুষটা থেমেছে। থেমে ধামসানো গালিচায় বসে পড়লো। বসে বললো, কিছু খেতে দাও। বড্ডো খিদে পেয়ে গেল—

—আপনাকে তো এখানকার কিছু দেওয়া যাবে না।

—কী আছে? দাও না—

—আমি গানেওয়ালি। সরাব আছে। বলেন তো সরাইখানা থেকে কাবাব-দুনিয়াজা কিছু আনিয়ে দিই—

—না। লাগবে না। তোমার ওই সরাবই দাও। খেলে নিশ্চয় খিদে মিটে যাবে।—

—খেলে খিদে বাড়ে—

—তাই দাও। আহারে! বড় সুখ হলো আজ গান গেয়ে—

দিতেই—ঢক ঢক করে অনেকটা খেয়ে গালিচাতেই গড়িয়ে পড়লো মানুষটা।

এ তো বড় মুশকিল। গালিচা জুড়ে গড়িয়ে পড়া মানুষটাকে নিয়ে এখন কী করা যায়? সরাব দিতেই পানির মতো ঢক ঢক করে খেয়ে নিলো। যেন অনেক দিনের তৃষ্ণা। এ তো এখন উঠবে না।

অথচ অনেকদিন পরে ঝাঁপ খুলে আজ সেজেগুজে তৈরি হয়েই বসেছিল রেহানা। ঝাড়পোঁছ করে ধরানো বাতিদানে দিব্যি আলো। থালায় রাখা

সেঁউতির গন্ধের সঙ্গে গুগ্‌গুলের গন্ধ মিশে গরমকালের সন্ধের বাতাসে ঝুলে আছে। সবই সারাদিনের এই সুন্দর সময়টিতে গাহেক ধরার জন্যে।

আর এখন? গালিচায় ঘুমন্ত এক মাঝবয়সী দাড়িওয়ালা। যার একতারা, চিমটে—দুইই গড়াগড়ি যাচ্ছে দু'পাশে। এমন দেখে কোনো গাহেক কি ঘরে বসে?

রাস্তার দু'ধারের কোঠাঘর থেকে মুজরোর হাসি, হর্‌রা, গান, ঘুঙুরের বোল ভেসে আসছিল। গলির ওপিঠে বিলাসখানের ঘরখানা থেকে রবাব-ই-দখনের ভারি, গম্ভীর টঙ্কার। সরু গলির পাথুরে রাস্তায় আওয়াজ করে টাঙার যাতায়াত।

আগ্রাওয়ালি রেহানার সস্তায় কেনা একটি গোলামও আছে। লোকটা পুব দেশের। বোবা, বয়রা, কুঁজো। একমনে রসুইখানায় মশলা পিষছে। খদ্দের বুঝে রান্না চাপে এসব কোঠাঘরে। আজ যে কী রান্না হবে তার কোনো ঠিক নেই। বোবা বয়রাকে ডেকে কোনো লাভ নেই। বোঝাতেই সময় চলে যাবে।

দাড়িওয়ালা ঘুমন্ত লোকটাকে টেনে পাশের ঘরে সরাবার জন্যে হাত লাগালো রেহানা। যতটা লম্বা—ততটা ভারি নয়। টানতে গিয়ে গায়ের গেরুয়া আঙরাখা গালিচায় গুটিয়ে গেল।

পাতের মতো সাধু শরীর। নাইকুণ্ডুলির বাঁ দিকে একটা কাটা দাগ দেখে ঝুঁকে পড়লো আগ্রাওয়ালি রেহানা। তারপর ঘুমন্ত লোকটার মুখ মাথার চুল—গালের দাড়ি খানিক সরিয়ে ভালো করে দেখলো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে উঠে দাঁড়ালো রেহানা। বিড়বিড় করে বললো, ওঃ! তুমি? তাহলে সাধু হয়েছো এখন—?

বলতে বলতে রেহানা এলোপাথাড়ি দৌড়ে ভেতর ঘরে গেল। তারপর সে-ঘর পেরিয়ে ভাঙা জিনিসপত্তরের জঞ্জাল হাঁটকাতে লাগলো। শেষে তার ভেতর থেকে শ্যাওলা পড়া একটা খাপ খুঁজে পেল। উঠে দাঁড়িয়ে খাপ থেকে একখানা ছুরি বের করলো। আবছা অন্ধকারে রেহানার মুখ দেখা যাচ্ছিল না।

সামনের ঘরে রেহানা ছুটে এলো। আরে! লোকটা কোথায় গেল? চাদ্দিক তাকাতেই চোখে পড়লো। কখন উঠে বসে ঘরের কোণে গিয়ে একতারার তার টান টান করতে বসে গেছে।

—এ কী? এ কী? ছুরি কেন?—বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো লোকটি। লক্ষ্য হারিয়ে ছুরি হাতে রেহানা এবার নিশানা ঠিক করতে ঘুরে দাঁড়ালো।

—করো কী? কী হলো তোমার? বেশ তো গাইলে একটু আগে—

রেহানা একেবারে কাছাকাছি এসে বললো, এই ছুরিখানা চিনতে পারো?

—ছুরি? কোন্ ছুরি—?—বলতে বলতে লোকটির হাত থেকে তার একতারাটি খসে পড়লো। চিমটেখানা আগে থেকেই গালিচায় পড়ে ছিল।

এই ছুরির সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলে! এখন মনে পড়বে কেন? অনেকদিন হয়ে গেছে তো। তাই না বসন্তলাল—?

লোকটি হতভম্ব হয়ে মুখ বুজিয়ে ফেললো। হ্যাঁ—আমিই একসময় বসন্তলাল ছিলাম। কিন্তু—কিন্তু সে তো অনেকদিনকার কথা। তুমি জানলে কী করে?

—এসব কথা বলার সুযোগই পেতে না—যদি না তোমার ঘুম ভাঙতো!

—ঘর গেরস্থি ছাড়ার পর—আজকাল আমি ক্ষণে জাগি—ক্ষণে ঘুমোই। —বলতে বলতে একগাল হাসলো লোকটি। তারপর খুব নরম করে জানতে চাইলো, এত রাগ কেন শরীরে? আমিও কৃষ্ণের জীব—তুমিও কৃষ্ণের জীব—

—রাখো!—বলে ধমকে উঠলো আগ্রাওয়ালি রেহানা।

তাতে একটুও ঘাবড়ালো না লোকটি। হেসে বললো, আমায় ঘুমন্ত অবস্থায় খতম করে কী লাভ হতো তোমার? তুমি কে? কে তুমি? এমন ভালো গান গাও—

—ন্যাকা! এ জায়গা তুমি চেনো না? আগ্রার শয়তানপুরার গায়ে কারা থাকে? কারা গান গায়?

—অ্যাতো রইসি জায়গায় আমি কোনোদিন আসিনি।

—ভালো। এবার তৈরি হও—

—এ কী? সত্যি সত্যি আমায় মেরে ফেলবে? কে তুমি? তুমি কে গো?

হাসতে হাসতে ছোরা হাতে এগিয়ে এলো রেহানা। তার চোখে কিন্তু পলক পড়ছে না। সে শান্ত গলায় বললো, আমি তোমার সাবেক কসবি গো! এবার চিনতে পেরেছো? কসবি—রেহানা বাই—জৌনপুরের তবাইফ ঘরানার সেই সাত আট বছরের মেয়েটাকে মনে পড়ে—?

বাঁ চোখ লাফিয়ে উঠলো বসন্তলালের। সে পলকে পিছিয়ে যেতেই ছোরা হাতে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়া রেহানার বাঁ পা গিয়ে পড়লো একতারটার ফাটা লাউয়ের ওপর। সেটা তো ভাঙলোই। আগ্রাওয়ালি রেহানাও পড়ে গেল। ছোরাটা মেঝেতে।

তাকে দু'হাতে তুলতে তুলতে বসন্তলাল বললো, তুমিই সেই রেহানা—আশ্চর্য! এতদিন পরে আবার দেখা হলো। আমি তখন কত খারাপ লোক ছিলাম।

রেহানা সঙ্গে সঙ্গে উঠতে পারলো না। তার পায়ের আঙুলে লেগেছে। সে চুপ করে গালিচার ওপর বসে থাকলো। সামনে বসন্তলাল।

বসন্তলাল নিজে নিজেই বলতে লাগলো। নিজের কথা। আমার তখন বিয়ে করে করেই চলতো। জৌনপুরে তোমাদের ঘরানার সাত আট বছরের মেয়েদের নাচ গান শিখিয়ে নামকেওয়াস্তে একজনের সঙ্গে বিয়ে দেয়। আমি সেই সব বিয়ের খসম হতাম—

বসা অবস্থাতেই রেহানা বললো, বিয়েতে শিরচানাই আচার চুকে যেতেই তোমার মুখ দেখলাম। আমি তখন কী বুঝি! তুমি আমার চেয়ে অন্তত পনেরো বছর বড় ছিলে—

—এখনো সেই বড়ই আছি।

—তখনো সব জানি না। তোমার মুখখানা দেখে বড় ভালো লেগেছিল সেই বয়সে। তোমার কসবি হয়ে তোমার সঙ্গে থাকতে লাগলাম। কিছু ডাগরটি হয়ে একদিন দাঁতে মিশি দিলাম। সেই মিশিতে দাঁত মেজে নাথনী উতারনা আচারও একদিন হয়ে গেল। তখন তুমি কেটে পড়েছো। নাকের নথ খুলে ফেললাম। ওই ছোরাখানার সঙ্গে আমার বিয়ে হলো তখন। সেই বিয়ের দিন থেকেই আমি পুরোপুরি কসবি হয়ে গেলাম।

—সেই থেকে আগ্রায় ?

—দূর ! এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি সুরাটে সাধু হয়েছো ! এক লাফে আগ্রায় আসা যায় ? লাহোর, মুলতান হয়ে সুরাটে নেমে এলাম। একদিন আর থাকতে না পেরে বন্দরে ফিরিঙ্গিদের জাহাজে পালিয়ে গিয়ে আমরা তিন কসবি আশ্রয় নিলাম। সাহেব হলে কী হবে ! পুরুষমানুষের স্বভাব তো যাবার নয়। জাহাজ হয়ে উঠলো দরিয়ায় ভাসন্ত আরেক দোজখ্ !

—তারপর ?

—পর্তুগিজরা আমাদেব হুগলি বাজারে নিয়ে গিয়ে তিন মাস পরে বেচে দিলো। সেখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে—

—আমিও অনেক ঘুরলাম রেহানা। জৌনপুর থেকে মথুরা। সেখান থেকে গাজিপুর। তারপর অনেক দেশ। কিচ্ছু মনে নেই আমার। একদিন এক সাধু গাইছিল—

ক্যা তেরা সাহেব বহরা হ্যায় ?

কিরে তোর ওপরওলা আল্লা কি কালা ? এত জোরে আজান দিচ্ছিস ? শুনে তো আমি থ। পরের কথা শুনে আমার গা পাথর হয়ে গেল রেহানা—

—কী কথা ?

—পিঁপড়ের পায়ের শব্দও

ওই আল্লাই তো শুনতে পান—

ক্যা তেরা সাহেব বহরা হ্যায় ?

শুনতে শুনতে আমি পালটে গেলাম রেহানা—

—যদি আমিও পালটে যেতে পারতাম—বলতে বলতে আগ্রাওয়ালি রেহানা তার ভাঁজ করা মাথাটা হাঁটুর ভাঁজের ওপর রাখলে।

॥ পনেরো ॥

চৌধুরী গয়ানাথের মতো রসদ যোগানদার বনজারা তামাম হিন্দুস্থানে খুব কমই আছে। বিলোচপুর থেকে হটে আসা শাহজাদা খুর্রম এটা মনে মনে স্বীকার না করে পারলেন না। দুপুর রোদে নর্মদার বুকের ওপর দিয়ে শাহজাদার হাতির দল পার করানো হচ্ছিল।

একাজে গয়ানাথই ভরসা হয়ে দাঁড়ালো। নর্মদার গায়ে তার গোলা থেকে কাঠের বড় বড় গোলাই ভাসিয়ে ভেলা তৈরি হয়েছে। লম্বায় চওড়ায় ভাসন্ত

এক একটা চত্বর। তার মাঝখানে হাতি—হাতির পাশে তার ভৈ আর মেঠ। যাতে একদিকে বেশি ওজন হওয়ায় ভেলা না ডোবে—সেজন্যে হাতির দু'পাশে তোপের গাড়ি বসানো হলো।

শেষ হাতিটি পার করাতে করাতে বিকেল হয়ে গেল। ততক্ষণে ঘুরপথে জাগা চরের ওপর দিয়ে ঘোড়সওয়ার, পদাতিক, ধানুকী, বন্দুকচীরা সবাই ওপারে গিয়ে উঠেছে। সে পথে হাতিও পার করানো হতো—যদি না সে রাস্তাটা অনেক দূরে হতো।

সন্ধের মুখে চৌধুরী গয়ানাথ বললো, শাহজাদা আমি আকবর বাদশার আমল থেকে রসদ যোগানদার। আমার কাজে কোনোদিন ফাঁকি দিইনি। এবার যদি আমায় অনুমতি করেন—

—কেন? আপনিও চলুন আমার সঙ্গে। আপনি এত কাজের মানুষ—এখানে আপনার গোলা না থাকলে তো হাতি পার করতে ভীষণ বেগ পেতাম—

—আমার কর্তব্য আমি করেছি মাত্র। সামনের সব গোলায় হুকুম পাঠালাম তো—যখন যা দরকার তাই-ই পাবেন। এবার আমায় ছেড়ে দিন।

—ওপারে গিয়েই তো মহাবত খাঁকে গোলা যোগাবেন। মির্জা আজিজকে আর যব গেঁহুর যোগানের কথা ভাবতে হবে না!

—আমরা হুকুমের বান্দা শাহজাদা। যেখানে কাজ পাই—সেখানে যোগান যোগাই—এ কাজই তো শিখেছি মুঘল শাহীর খিদমদগারি করে। আপনার আব্বা হুজুর—তাঁর আব্বা হুজুরের আমল থেকেই এই একটা কাজই জেনেছি। এবার আমায় ছুটি দিন শাহজাদা—

শাহজাদা খুর্রম ভালো করে তাকালেন বনজারা চৌধুরী গয়ানাথের মুখে। সন্ধ্যার আঁধারে হাতির পাল মুছে যাচ্ছিল। জায়গাটা প্রান্তর মতো। কাছাকাছি কোনো লোকালয় নেই। কিংবা থাকলেও ফৌজ দেখে পায়রার মতো মিলিয়ে গেছে। সারাদিনের টানাহ্যাঁচড়ায় শাহজাদার ঘোড়ার মুখেও ফেনা। সঙ্গী রিসালার সওয়াররা সম্ভ্রম মতো কয়েক হাত দূরে ঘোড়ার পিঠে একদম মূর্তি হয়ে বসে।

—শুনুন চৌধুরীজি। আপনাকে আমার খুব দরকার।

—ওদিকে আগ্রারও তো আমাকে খুব দরকার। ফৌজের রসদ যোগাবো বলে দেওয়ানখানা থেকে বড় দাদন খেয়ে বসে আছি।

—দাদনের কথা ভুলে যান চৌধুরীজি। একদিন তো আপনার এই শাহজাদাই আগ্রায় বসতে পারেন।

—বসলে দেখবেন—এই চৌধুরী গয়ানাথ কোনো কিছুতেই কম যাবার নয়।

—তার আগেই তো আপনার মতো লোক দরকার। আপনারা সাহারা দিলে এই শাহজাদা হিন্দুস্থানের বাদশা হতে পারেন।

—বাদশা আকবরের কান্দাহার হামলায় বনজারা হয়ে ঢুকেছিলাম। সেই

তখন থেকেই মুঘল শাহীর খিদমদ করে আসছি। একদিন বাদশা হয়ে আপনি কি আমায় গদ্দারি করতে বলবেন ?

এবার শাহজাদা খুর্রম আর কোনো কথা বলতে পারলেন না। শান্ত গলায় বললেন, চলুন আপনাকে ওপারে দিয়ে আসি—

—সে দরকার হবে না। দয়াপরবশ হয়ে যদি আপনার তাঁবের একটা ঘোড়া দেন তো পলকে আপনার চোখের সামনে থেকে মুছে যাই—

শাহজাদা চুপচাপ তাই দিলেন। আর মনে মনে বললেন, এদের জন্যেই শাহী আগ্রা টিকে আছে। হিন্দুস্থানের জমিনে এরাই মুঘল শাহীর শেকড়। খুর্রম দেখলেন, ঘোড়ার পিঠে পাকানো শরীরে সাদা ঝোলা গোঁফ নাকের নিচে ঝুলিয়ে চৌধুরী গয়ানাথ নর্মদার খাবলা খাবলা ভাঙা পাড় ধরে অন্ধকারে নেমে গেল—চর জায়গার খোঁজে—যেখানটায় ঘোড়া পায়ের নিচে মাটি পাবে—নদী পেরনো সহজ হবে। ওপারে উঠেই গয়ানাথ নিশ্চয় তাড়া করে আসা শাহী ফৌজের কাজে আসবে।

একজন ঘোড়সওয়ার তার বন্দুক তাগ করলো। শাহজাদা সঙ্গে সঙ্গে হাত উঁচু করে তাকে থামালেন। যেতে দাও—

শাহজাদা ঘোড়া ছুটিয়ে অন্ধকার ফুঁড়ে এগোতে লাগলেন। বেগম আরজুমন্দ বানু ছেলেমেয়েদের নিয়ে দুপুর দুপুরই নর্মদা পেরিয়ে এসেছেন।

কী আশা করেছিলাম ! আর কী হলো ! মালবের সুবেদারের পথ আটকে দাঁড়িয়েছেন নিশ্চয় মির্জা জয়সিংহ। গুজর্রকে তাড়া করেছেন খানজাহান লোদি। আমার টুঁটি টিপে ধরার জন্যে দু'দিক থেকে ছুটে আসছেন—মহাবত খাঁ আর মির্জা আজিজ। যদি বিলোচপুরেই গুজর্র আর মালবের ফৌজ এসে আমার সঙ্গে মিলতে পারতো। উঃ ! যদি—

হটে যাবার সময়—হেরে যাবার সময় দুপুরের রোদকে মনে হয় বেশি কড়া। সামনের নদী বুঝি ভয়ংকর গভীর। রাতের অন্ধকারে যেন ঢুকে পড়ার কোথাও কোনো জায়গা নেই। সবটাই—জমাট, নিরেট।

শাহজাদা অন্ধকারে ঘোড়া দাবড়ে এগোচ্ছেন। আশপাশে হটে আসা পায়দল সেপাইরা চলেছে। তাদের পিঠে জলের গাড়ু। বোঁচকায় রেঁধে খাওয়ার রসদ। কিন্তু কোথাও দাঁড়াবার উপায় নেই বলে হাঁটতে হাঁটতেই সেপাইরা শুকনো চানা চিবোতে চিবোতে চলেছে। সেই চিবুনির কড়র মড়র একটু কান পাতলেই শোনা যায়।

শাহজাদার পথের আশপাশে মাঝে মাঝে দু'একটা বসতি পড়ছিল। কোথাও বিশেষ লোকজন নেই। মাঝে মধ্যে দু'একটা কুপি জ্বলা কুঁড়ে। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের কান্না। তা থামানোর জন্য বয়স্ক গলার ধমক। এসবের ভেতর দিয়ে প্রায় চোরের মতোই শাহজাদা খুর্রম এগোচ্ছিলেন।

এক রাতের জন্যে থাকবার মতো কোনোরকমে গাড়া তাঁবুতে এসে হাজির হলেন খুর্রম। ঘোড়া থেকে নামতেই দাখিলা এসে ঘোড়া ধরলো। কোনো

দিকে না তাকিয়ে পর্দা সরিয়ে শাহজাদা ভেতরে ঢুকলেন। সারি সারি দড়ির দোলনায় ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে। শাহজাদাকে দেখে বেগম আরজুমন্দ উঠে এলেন। কী হলো ?

শাহজাদা কোনো কথা বলতে পারলেন না। বেগমের মুখেও তাকাতে পারলেন না। নিজের থেকেই বলতে লাগলেন, জেতা লড়াই হারতে হলো। সবটাই নসিবের কেরামতি !

—নসিব ?

—হ্যাঁ বেগম—নসিব। রাজা বিক্রমজিৎ যদি আগে থেকে জানিয়ে রাখতেন —ওদিককার আবদুল্লা খাঁ তাঁর সেপাইদের নিয়ে এদিকে চলে আসবেন— তাহলে আমাদের দারা খাঁয়ের সেপাইরা ভড়কে গিয়ে পালাতো না—জয় আমাদের হতোই বেগম—

—ওসব কথা কে শুনতে চেয়েছে!

থমকে গিয়ে তাকালেন খুর্রম।

—আমি জানি—নসিব আপনার হাতের মুঠোয়। আজ না হোক কাল নসিব আপনার হাতে বন্দী হবে। আপনি কি কিছু খেয়েছেন ?

—আমারই জন্যে—আমারই জন্যে আজ তোমরা এখানে আরজুমন্দ ! আমিই দায়ী—

—কিছু খেয়েছেন আপনি ?

—এটা কি খাওয়া দাওয়ার সময় বেগম। আমি দারা, জাহানারা ওদের মুখে তাকাতে পারি না। সারাদিন হাতির পিঠে পিঠে ঘোরা। রাতে তাঁবুতে দড়ির দোলনায় ঘুমোনো—

—ওরা বেশ ফুর্তিতেই আছে শাহজাদা। সারা হিন্দুস্থান দেখতে দেখতে ঘুরে বেড়ানো। একদিন তো ওদেরও নসিবের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে হবে। মনে করবো—আগে থেকেই তার মহড়া দিচ্ছে।

—জানি না—বিজাপুর, গোলকুণ্ডা আশ্রয় দেবে কিনা আমাদের। যদি না দেয়—

—তাতে কী হবে শাহজাদা ?

খুর্রম আরজুমন্দের মুখে তাকালেন। তাঁবুর সামান্য আলোয় মুখখানা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। লড়াইয়ের মানে কি এই মুখ জানে ? হয় জয়— না হয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া। আরাম, সুখ, সম্মান, স্বপ্নকে মুহূর্তে বিদায় জানানো। তা কি পারবে আরজুমন্দ ?

—তখন হয়তো আমাদের জঙ্গলে আশ্রয় নিতে হতে পারে বেগম—

—আপনি যেখানে—আমরাও সেখানে। আসুন—পেছনের এই পর্দা সরিয়ে আপনাকে একটা ছবি দেখাই। রাতের হিন্দুস্থান কত সুন্দর। আগ্রা দুর্গে থাকলে কি এসব দেখার সুযোগ হতো ? বলুন ?

বিলোচপুরে ঘুরে দাঁড়িয়ে শাহজাদা খুর্রম আগ্রা, আজমির, দিল্লি,

জৌনপুরের মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে কয়েকদিনের জন্যে রসালো আলোচনার খোরাক হয়েছিলেন মাত্র। মহাবত খাঁ, মির্জা আজিজ, মির্জা জয়সিংহ, খানজাহান লোদি বাদশা জাহাঙ্গীরের পাশে এসে দাঁড়াতেই খুর্রমের সব মতলব ভেস্তে গেল। তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা বিলোচপুরের বেলে মাটিতে মিশে গেল। গুর্জর বা মালবের ফৌজ এসে তাঁর সঙ্গে হাত মেলাতে পারলো না। দিল্লি, মুলতান, লাহোরের মনসবদাররাও আগ্রার মুখে ঘুরে দাঁড়ালো না।

তাই হিন্দুস্থানের কোথায় একজন শাহজাদা বাগী হওয়ার পর তাড়া খেয়ে কোন্ জঙ্গলে সেঁধোলেন—বা কোন্ নদী পেরোলেন—তা নিয়ে আগ্রার কোনো মাথা ব্যথা নেই। আগ্রায় নিত্যদিন সকালে বাদশা জাহাঙ্গীর দর্শন ঝরোকায় দাঁড়িয়ে দর্শন দিচ্ছেন। দেওয়ানখানায় মালগুজারির জমা আর হাসিলের হিসেব পড়ে যাচ্ছে খাতায় খাতায়। শুধু মাঝে মাঝে দেখা যায়—উজিরে আজম আসফ খাঁ শাহী কাছারির দক্ষিণের জানালায় দাঁড়িয়ে দূরে তাকিয়ে থাকেন।

বড় কোনো লড়াই নেই সেখানে। মনসবদাররা সুসিদ্ধ গোস্ত, ভালো সরাব, সুগন্ধী আতর আর সুরেলা গলার গানের সমঝদারি করে জীবনটা পুরো একখানা আশরফির কায়দায় ভাঙিয়ে আরও তাগদ, আরও মোহর আরও আওরত দিয়ে ভরভরাট করে ফেলছিল।

বর্ষা চলে যাওয়ার পর হিন্দুস্থানের মাঠে মাঠে ধান চারায় এখন গর্ভ থোড় এসেছে। গোহালে গোহালে বয়স্থা গাই গরু পাল খাওয়ার জন্যে অমাবস্যা পূর্ণিমায় ডাক দিচ্ছে। তাপ্তি, তমসা, সরযূ, ঘর্ঘরার চর জায়গায় কাশবনের দিকে তাকিয়ে নদীজল একবার এগিয়ে আসে—আবার পিছিয়ে যায়।

এরই ভেতর হিন্দুস্থানের এক প্রান্তর থেকে আরেক প্রান্তরে লশকর চলাচল করে। কেউ ভ্রূক্ষেপও করে না। লশকরের সঙ্গে সঙ্গে হাতি, ঘোড়া, উট, কুকুর তো আছেই—আছে গো-গাড়ির পর গো-গাড়ি। মেঠো সড়কে মানুষ আর পশুর পায়ের ধুলো আকাশ বেয়ে অনেকটা উঠে যেন মেঘ ডেকে আনে। আবার একসময় সে মেঘ মিলিয়েও যায়। এরই ভেতর হিন্দুস্থানে দিন মিলিয়ে গিয়ে রাত আসে।

আগ্রার চকবাজারে চবুতরায় ফুলওয়ালিদের সঙ্গে কিছুদিন হলো নতুন একজন ফুলওয়ালি এসে বসছে। সে আর পাঁচজনের চেয়ে কিছু অন্যরকম। এদিককার ফুলওয়ালিদের মতো টাঙায় কোনো রইস মানুষ দেখলেই ফুলহাতে ছুটে যায় না—বা খদ্দেরকে ঠাটঠমক, ঝংকার দিয়ে ভোলাবার চেষ্টাও করে না।

দুপুর পড়ে এলেই ফুলের গোছা সমেত এসে হাজির হয়। সঙ্গে থাকে ভীষণ ফর্সা একজন পুরুষ। তার মুখ কালো চাপ দাড়িতে গম্ভীর। এই আজীব ফুলওয়ালি ফুলের গোছায় জল ছিটিয়ে বসতে না বসতেই চাপদাড়ি চলে যায়। আবার ফিরে আসে সন্ধে রাত পেরিয়ে। তখন আগ্রায় মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে ঢিমে ঢল নামে।

আজও চাপদাড়ি এসে আগ্রার সেই চবুতরার সামনে দাঁড়ালো। শালোয়ার

কুর্তা পরনে লোকটি বেশ লম্বাই চওড়াই। চ্যাটালো বুক। দেখলেই বোঝা যায়—লাহোর, মুলতান পেরিয়ে ওধারের মানুষ। সে তুলনায় এই প্রায় বোবা ফুলওয়ালি বেশ কালো। তবে গঠন গাঠন এখনো রীতিমত ধারালো। একটু বয়স হয়েছে। কালো চোখ।

চাপদাড়িকে দেখে অন্য ফুলওয়ালিরা হেসে ঠ্যাকার দিয়ে বললো, তোমার খসম এসে গেছে—

এই ফুলওয়ালি তার কোনো জবাব না দিয়ে মালা আর ফুলের গোছা গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর দু'জনে মুহূর্তের ভেতর আগ্রার ভিড়ের রাস্তায় হারিয়ে গেল। রাজধানীর খলিফামহল পেরিয়ে লালচক অব্দি রাস্তায় মানুষ গিজগিজ করছে। তার ভেতর দিয়ে চলাই দায়। সেই ভিড়ে হাঁটতে হাঁটতে ফুলওয়ালি কোনো ডাগর ডোগর মেয়ে বা ছেলেকে দেখলে দাঁড়িয়ে পড়ে —ঝুঁকে পড়ে তার মুখ দেখে। দেখার চেষ্টা করে। কেননা—দু'পাশের পসারীদের আলোয় সবকিছুই আবছা লাগার কথা। অমন ভাবে দেখার চেষ্টা করায় অনেকে আবার ধমকে ওঠে মেয়েটিকে।

পুরুষটি বললো, এভাবে তুমি কিছুতেই পাবে না—কত খুঁজবে এত বড় হিন্দুস্থানে !

মেয়েটি কোনো কথা বললো না। সে একটা ঝুরিনামা বটতলায় বসে পড়লো। জায়গাটা অন্ধকার।

—মীনা। এভাবে হবে না। ঘরে চলো—

—তুমি যাও। আমি আরেকবার টহল দিয়ে তবে ফিরবো।

পুরুষটি গেল না। দাঁড়িয়ে থাকলো। শেষে বললো, কোনো লাভ নেই। তার চেয়ে চলো এই শীতে প্রয়াগে কুম্ভে যাই—

—কী লাভ সফি ?

—শুনেছি কুম্ভে হারানো মানুষ ফিরে পাওয়া যায়—

একখানা বিষাদের চাহনি মেলে ধরে মীনা বললো, ওদের তো এখনো কুম্ভস্নানের বয়স হয়নি। অনেক অনেক দেরি সে বয়সের—যদি অবশ্য বেঁচে থাকে।

—ওদের বাবা তো আসতে পারে।

—কে ?

—সনাতন পাইক।

—ওঃ ! তুমি এখনো আশা করো—সে বেঁচে আছে !

আবার খানিকক্ষণ কোনো কথা নেই। ঝুরিবটের পাশ দিয়েই মানুষজনের চলাফেরা। মেয়েটি উঠে দাঁড়াতে পুরুষটি তার পাশে ছুটে এলো। এতটা পথ হেঁটে যেতে পারবে ?

—কেন ? টাঙা ভাড়া করবে নাকি ! হাসালে সফি—

—তা নয়। সেই ভোরে উঠে বাগানে খোন্তা চালিয়েছো। তারপর গোলাপ, সেঁউতির গোড়ায় জল ঢালা—মাধবীলতার মাচান সাফাই—বসে

তো থাকোনি।

—ভুলে যেও না—আমি পাইকান বাড়ির মেয়ে—পাইকান ঘরের বউ। চলো—

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে আগ্রাকে পেছনে ফেলে দিলো। সামনে যমুনার অন্ধকার বুক। দূরে নিচে নদীর চরে আলোর ফুটকি—পরপর অনেকগুলো। ওরা দু'জন সেদিকে এগিয়ে গেল। পরদিন খুব ভোরে সে জায়গায় আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল—সারি সারি ঝুপড়ি—আর তার দু'ধারে চষামাটি। চরের বাইরেই বর্ষা শেষের যমুনার নীল জল। ওখানে দাঁড়িয়ে দূরে উঁচুতে আগ্রা দুর্গের সামান বুরুজ চোখে পড়ে।

আলো আরও পরিষ্কার করে দিলো চারদিক। এখন একটাই যমুনা—ততটাই বা তার চেয়েও বেশি জায়গা জুড়ে চর। আর সেই চর যেন দূরে সাদা আকাশ বেয়ে ওপারে উঠে গেছে। ঝুপড়ির পর ঝুপড়ি। মাঝে মাঝে পাহারা মাচা। যেদিকে তাকাও মানুষ নিচু হয়ে মাটির সঙ্গে লেগে আছে। কাছে গেলে তবে বোঝা যায়—কে মাটি খোঁচাচ্ছে—কে বা ফুল তুলছে—কিম্বা কে তরমুজ ঠিকমত শুইয়ে দিচ্ছে।

ভোর বেলার আলোয় এখন দেখা যাচ্ছে—এক এক চাপে এক এক ফুলের চাষ। গোকুলা, সেঁউতির পাশাপাশি চাষ। গোকুলার বাড়তি টান হলো তার গায়ের লতানে পাতাও সুগন্ধী। এক চাপে অনেকটা জুড়ে বেলি। তারপরেই এক ঢালে যতটা দেখা যায়—শুধু তরমুজ।

এই তরমুজ এদিকে একচেটিয়া চাষ করে মুলতানি চাষীরা। ওরা এ চাষ জানতো না! লোদি বা সৈয়দদের সঙ্গে সঙ্গে কোনো একসময় এ তল্লাটে ওরা আসে। তারপর কী করে যেন সমরখন্দের চালানি তরমুজের বীজ পুঁতে চারা বানানো শিখেই ওরা একধার দিয়ে চরের ভালো জায়গার প্রায় সবটাই দখল করে নিয়েছে। আগ্রা, আজমির, দিল্লিতে তরমুজ এখন একটা ভালো ব্যবসা।

চরের বুকে কুয়ো কেটে কিছু ভালো জল পাওয়া যায়। চামেলি, চাঁপা, কেতকী, পারুল, হেনার আদত গন্ধটা বজায় রাখতে চাই ভালো জল। সেরকমই এক কুয়ো থেকে জল তুলছিল সফি। চাকায় বসানো ভিস্তিতে জল উঠে আসছিল কুয়োর নিচু থেকে। আর জল তোলার চাকা টেনে টেনে দড়ি গলায় এক লালচে উট নানা রঙের ফুলের গা ধরে আল বেয়ে দূরে চলে যাচ্ছিল।

হাঁটু অব্দি শাড়ি তুলে মীনাক্ষী বেছে বেছে সরেস কিছু বেলি তুলছিল। বিকেলে আগ্রার চবুতরায় ফুলের হাটে নিয়ে গিয়ে বেচতে বসবে।

ঠিক এমন সময় তরমুজ চাষী শের খাঁ ক্ষেত থেকে উঠে এসে সিধে সফির মুখোমুখি দাঁড়ালো। দাঁড়িয়েই মুখ খারাপ করে বললো, সব পানি কি তোর ওই চামেলি বাগে যাবে— ?

সফি কী বলতে যাচ্ছিল। তার কথার মাঝখানেই শের খাঁ সফিকে টেনে ধরে বেদম জোরে এক ঘা লাথি দিলো। দূর থেকে কুয়োর গোড়ায় অমন

ধস্তাধস্তি দেখে মীনাক্ষী ফুল ফেলে ছুটে আসছিল।

সফি এখন ফুল চাষী হলেও আদতে সে শাহী ফৌজের আহেদি মীর সফি। বছর সাতেক আটেক ঘোড়ায় না চড়লেও কসরত মেহনতে এখনো সে যে কোনো ইনসানের চেয়ে দড়।

সফি পাল্টা লাথি কষিয়ে দৈত্য-সমান শের খাঁকে মাটিতে ফেলে দিলো। ততক্ষণে মীনাক্ষী কাছে এসে গেছে। সে চাপা গলায় বললো, করেছো কী? সর্বনাশ ডেকে আনলে—

মীর সফি তখনো রাগে ফুঁসছিল। সে একসময়কার শাহী আহেদি। এক লাফে ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে সে পিঠের ওপরেই ডিগবাজি খেতে পারে। তলোয়ার, বিরছা কুড়ুলে তার হাত পাকা। ধনুক, বন্দুক—যা-ই দেওয়া যাক—নির্ভুল চাঁদমারি তার কাছে কিছু নয়। এমন লোক ফুল চাষে জড়িয়ে আছে বলেই কি আনপড় চাষীর হাতে পড়ে পড়ে মার খাবে?

সর্বনাশ যা হবার তা ততক্ষণে হয়ে গেছে। আশপাশের তরমুজের মাঠ থেকে ছ'সাতজন ইয়া ইয়া মুলতানি চাষী ছুটে এলো। এসেই তারা সফিকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরলো। তাদের কারও হাতে খোন্তা। কারও হাতে মাটির ঢেলা ভাঙার ডান্ডা। কারও হাতে মাটি খোঁচানোর লোহার কাঁটা।

মীনাক্ষী ছুটে গিয়ে সফির বুকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো। আগে আমায় মারো—আমায় না মেরে ওকে ছুঁতে পারবে না—

শের খাঁ উঠে দাঁড়িয়ে হা হা করে হাসলো এক চোট। শেষে বললো, ও কে হয় তোর?

রাজধানীর গা ঘেঁষে এই চর জায়গায় তরমুজ আর ফুলের মতো দুঁদুটো দাম দামড়ি ওড়ানো দামি চাষের মাঠে আরেকটা দামি জিনিস—মেয়েমানুষ। দিনে বালি তাতানো গরম—রাতে শীত টেনে আনা বেলে মাটির এই দুনিয়ায় মেয়েমানুষ বড় একটা টেঁকে না। ঘর-গেরস্থি করতে এসে ওরা মরে যায়—নয়তো পালায়। এর ভেতর মীনাক্ষীই এক বিস্ময়—আলাদা—আবার আকর্ষণও বটে। সে এ দেশের মেয়েদের মতো নয়। শাড়ি পরে। চুলে ফুল দেয়। চাউল খায়।

—যে-ই হোক—তাতে তোর কী?

মীনাক্ষীর পিঠখানা—শরীরের সামান্য তার গায়ে লেপটে যাওয়ায় মীর সফি রীতিমত কাঁটা হয়ে উঠলো। সে কোনোদিন মীনাক্ষীর এত কাছাকাছি হয়নি। হিন্দুস্থানের মাঠে ঘাটে আজ সাত আট বছর দু'জনে ঘুরছে। এই ঘোরাঘুরির সবটাই কেটে গেছে সনাতনের যদি দেখা পাওয়া যায়—যদি খুঁজে পাওয়া যায় লক্ষ্মী আর বিষ্ণুকে—এই তত্ত্ব-তালাশে। সেই সুবাদে এক এক জায়গায় এক এক রকম কাজ করেছে দু'জনে। একবার রাজমহলে বর্ষাকালে আচমকা বানে মীনাক্ষী ভেসে যাচ্ছিল। তখন সফি তাকে দু'হাতে জাপটে ধরে কোনোরকমে ডাঙায় তুলতে পেরেছিল। তারপর আজই এই প্রথম দু'জনের বুকে পিঠে লেপটে যাওয়া। আজই প্রথম সফি এত কাছ থেকে মীনাক্ষীর ঘামে

ভেজা গায়ের গন্ধ পেল।

বছর দেড়েক হলো মীনাক্ষী আর সফি এই চরে এসে আস্তানা গেড়েছে। যখন ওরা আসে তখন এখানে এমন বড় করে ফুলের চাষ হতো না। যা হতো তা তরমুজ। ফুলগাছের চারা করা—জমি বানানো, গোবর দিয়ে গোলাপের কলম জাগিয়ে তোলায় মীনাক্ষী রীতিমত পাকা। ওরা আগ্রার বাজারে বাজারে ঘুরে বুঝে নিয়েছিল—হিন্দুস্থানের রাজধানীতে হালকার ওপর দামি ব্যবসার নাম—ফুল। জায়গাও পড়ে আছে রাজধানীরই গায়ে—যমুনার চরে। আগ্রা দুর্গের দেওয়ানখানার কাছারিতে ধর্না দিয়ে ক্রোরী, তশীলদারদের মন ভিজিয়ে জায়গাও পেয়ে গেছে সফি। সন্ধে হলে রাজধানীতে তরমুজের চেয়ে ফুলের চাহিদা কিছু কম নয়—বরং বেশিই বলা যায়।

তরমুজের মুলতানি চাষীরা গোড়ায় গোড়ায় মন দিয়ে ওদের এই তোয়াজি ফুল চাষ দেখতো। এখন দেখে মীনাক্ষীকে। দু' একজনের এগিয়ে আসা হাতে মীনাক্ষী খোন্তার বাড়িও দিয়েছে।

কিন্তু আজকের অবস্থা কিছু অন্যরকম।

সফি আর মীনাক্ষীকে ঘিরে মুলতানি চাষীদের ঘেরাওটা অনেক ছোট হয়ে এসেছে। ওদের নাকের ফুটো, দাঁতের শ্যাওলা সকালের রোদে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সফি।

শের খাঁ চেঁচিয়ে উঠলো, মরদটা নামাজ পড়ে। তুই তো পড়িস না—তুই কে? হিন্দু?

—আমি ইনসান। ব্যস্—আর এগোলে কাউকে আমি ছাড়বো না।

মীনাক্ষীকে দু'হাতে ধরে সরিয়ে দিতে গেল সফি। সরে যাও বলছি। আমি একাই দেখছি—

মীনাক্ষী সরলো না। সে এবার ঘুরে গিয়ে দু'হাতে সফিকেই জড়িয়ে ধরলো। এমনভাবে মীনাক্ষী কখনোই সফিকে জড়িয়ে ধরেনি। সফিরও এরকম অভ্যেস নেই। কোনো একসময় সে এমন খোয়াব দেখলেও—অনেকদিন আগেই সে তার এই স্বপ্ন থেকে অনেকদূরে সরে এসেছে। নইলে সনাতন ওদের তালাশ করতে মীনাক্ষীর পাগলপারা খোঁজাখুঁজির শরিক হয় সে কী করে?

এক ঝটকায় সফি মীনাক্ষীকে সরিয়ে দিলো। তুমি কেন শুধু শুধু আমার সঙ্গে নিজের নসিবকে জড়াচ্ছো?

মীনাক্ষী পড়ে গিয়ে ওঠবার চেষ্টা করলো। পারলো না। ততক্ষণে শের খাঁ আর দু'জন মিলে সফির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

—মীনা বাঈকে রেখে তুই এখান থেকে কেটে পড়—কিছু বলবো না—

সফি ওদের ভেতর থেকে এক ঝটকায় বেরিয়ে এসে পা তুলেছিল। লাথি কষাবে। পারলো না। আস্ত পাখানা ধরে শের খাঁ এমন জোরেই মুচড়ে দিলো যে—সফি মুখ থুবড়ে চষা জমির ওপর উপুড় হয়ে পড়লো। পড়ে গোঙাতে লাগলো।

মীনাক্ষী ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাতের নখে শের খাঁয়ের মুখ খুবলে দিতে

গেল। সুবিধা করতে পারলো না। শের খাঁ তাকে কোলে তুলে নিয়ে হো হো করে হেসে উঠলো। মিঞা বিবি নও দু'জনে। কিসের এত টান মীনা বাঈ? ওটাকে খতম করে দিলেই দিব্যি সুখে থাকবে আমার কাছে—তখন চুটিয়ে বেলা-চামেলির বাগ বানাবে—

মীনাক্ষী ওর বুকের কাছে হাঁটু দিয়ে গুঁতোতেই শের খাঁ পড়ে গেল। তার ওপর মীনাক্ষী পড়লো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েই নিজের নিড়েনের জায়গায় ছুটে এসে মীনাক্ষী বড় খোন্তাটা তুলে নিলো।

এবার খোন্তা হাতে মীনাক্ষীকে ছুটে আসতে দেখে শের খাঁও ভয় পেল। ততক্ষণে সফি উঠে দাঁড়িয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে একজনের পড়ে যাওয়া লোহার কাঁটা হাতে তুলে নিয়েছে।

প্রথমে শের খাঁ পেছোলো। তার সঙ্গে সঙ্গে বাকিরাও। পিছোতে পিছোতে ওরা তড়পাচ্ছিল। আবার আসবো। দেখবো—তোরা বাঁচিস কী করে—

ওদের দিকে তাকিয়ে মীনাক্ষী বড় করে থুথু ফেললো। তারপর মুখ ঘুরিয়ে বললো, এসে দেখিস—পা কেটে রাখবো—

সফি তখন দাঁড়িয়ে। মীনাক্ষী কাছে এসে দাঁড়াতেই সফি তার গায়ে টলে পড়লো। মীনাক্ষী সফিকে জড়িয়ে ধরতে ধরতে মাটিতে পড়লো। পড়েও বুঝলো, তার দু'হাতের ভেতর সফির বাঁ দিকটা থরথর করে কাঁপছে।

—রাক্ষসটা বাঁ পা মুচড়ে দিয়েছে—দেখি—

পা সরিয়ে নিলো মীর সফি। খোলা আকাশ। পরিষ্কার রোদ্দুর। চষা মাঠে নানান রঙের ফুল। তার গা দিয়ে কাঁচা তরমুজের ঘন কালচে লতা। বাতাসে রাজধানী আগ্রা থেকে ভেসে আসা কলরোল। অথচ জায়গাটা রীতিমত নির্জন। মাঝে যমুনার জলের এগিয়ে আসার শব্দ। পিছিয়ে যাবার শব্দ। পাখি। আর দূরে দূরে মুলতানি চাষীরা ফলে আসা তরমুজ সামান্য তুলে তোয়াজে শয়ান দিচ্ছে—ফলটা যাতে পুরো ফলে—গোল আর কালো হয়। ওদের ভেতর কেউ শের খাঁ। কেউ কেউ শের খাঁয়ের স্যাঙাত। ওদের আলাদা করে এখান থেকে চেনার উপায় নেই কোনো। ঢালাও সবুজের ভেতর জায়গায় জায়গায় রক্তে মাংসে ঢাকা রাগ, লোভ, হিংসে ঘাপটি মেরে আছে। সুযোগ এলেই ফের ঝাঁপিয়ে পড়বে।

—তুমি তোমার কাজে যাও মীনা—

—এখন যাবো না। তুমি উঠো না। আমি ধরে আছি—

—কতক্ষণ থাকবে। তোমার ফুল তোলো গিয়ে। বিকেলে আগ্রা যাবে না—

মীনাক্ষী কোনো জবাব দিলো না। তার দু'হাতের ভেতর মীর সফির বাঁ উরু—কোমর তখনো থেকে থেকে থরথর করে কাঁপছে। সেই অবস্থাতেই সফি উঠতে গেল।

—থাক্।—বলে মীনাক্ষী আরও জোরে তাকে জড়িয়ে ধরলো। তাতে সফির সারা শরীর নিস্তেজ হয়ে এলো। সে কোনোদিন এভাবে মীনাক্ষীর এত

কাছে থাকেনি। রাজমহল, পাটনা, রোহতাস, বুরহানপুর—যেখানেই একসঙ্গে থেমেছে—সেখানেই মীনাক্ষী এক অদৃশ্য আড়াল তুলে ধরেছে। আজই খানিক আগে তরমুজ চাষীদের হামলায় সে আড়াল একদম খসে পড়েছে।

এভাবে থাকতে থাকতে ঝিমিয়ে পড়ছিল সফি। সে আস্তে উঠতে গেল। মীনাক্ষী উঠতে দিলো না। বললো, আরেকটু থাকো। ব্যথাটা কমলে জলের ধারানি দিয়ে দেবো।

—নাঃ! মীনা। উঠতেই হবে। ফজরের নামাজ আদায় করা হয়নি।

—উঠবেই? বেশ ওঠো। সাবধানে কিন্তু। দাঁড়াতে পারবে তো?

সফি উঠে দাঁড়ালো। ইয়া লম্বা। মানানসই চওড়া। মীনাক্ষী মাটিতে বসা অবস্থাতেই সফিকে দেখে নিজের বুকের ভেতর ভীষণ গর্ব বোধ করলো।

—আজ যদি শাহী ফৌজে থাকতাম—

—কেন? ছেড়েছুড়ে দিয়ে আফসোস হচ্ছে! আমি কিন্তু তোমায় টেনে আনিনি সফি।

—আমি সেদিন নিজের থেকেই চলে আসি মীনা। না এলে তোমায় বাঁচানো যেতো না।

—না এলেই পারতে!

—তাহলে আমি কিসের ইনসান? আফসোস এজন্যে যে—আজ যদি শাহী ফৌজের আহেদি থাকতাম—তাহলে ওই মুলতানি চাষীদের তরমুজ ফলানো বের করে দিতাম। পাঁচজন ঘোড়সওয়ারকে ওদের চাষের জমিতে নাগাড়ে দৌড় করাতাম। ওরা সব এসে তখন পায়ে পড়তো—

—সেটাও একটা বে-ইনসাফি হামলা হয়ে দাঁড়াতো। তাই না সফি! যে ইনসাফির জন্যে তুমি ফৌজ ছাড়লে—নিজেই সে ইনসাফি হারাবে?

তরমুজ চাষীদের দিকে তাকিয়ে মীর সফি বললো, ওরা হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে যে তরমুজ ফলায়—তরমুজ বেচে কী এমন পায়! তাই আমাদের হালকা পলকা ফুলের কারবারকে ওরা বিষনজরে দেখে। হিংসে করে মীনা—আর সেজন্যেই ঝগড়া বাঁধায়—আমাদের তুলে দিতে চায়। তোমাকে চায়—আমাকে তাড়াতে চায়—খতম করতে চায়—

মাথা নামালো মীনাক্ষী। খুব আস্তে বললো, একটা কথা বলি—তুমি ঠাণ্ডা মাথায় শোনো।

—কী?

—এসো। আজ থেকে আমরা মিঞা-বিবির মতোই থাকি না কেন?

—কী?—বলে কাঁপতে কাঁপতে ধপাস করে পড়ে গেল সফি। তার আগেই মীনাক্ষী তাকে শক্ত করে ধরলো।

—কী বলছো মীনা?

—ঠিকই বলছি সফি—

—সনাতন পাইক ফিরে এলে কী বলবে?

—ফিরে তো আসুক। তখন দেখা যাবে। এভাবে আর পারা যায় না

সফি। এরকম যদি থাকি আমরা—ওই শের খাঁ-ই একদিন আচমকা তোমায় খতম করে যমুনায় ভাসিয়ে দেবে—

—সে এমনিও পারে মীনা। মিঞা-বিবি হলেই কি আটকাবে?

—মিঞা-বিবি হয়ে গেলে দু'বার অন্তত ভাববে শের খাঁ।

—তোমার ওপর ওর খুব লোভ মীনা।

—কাছে পাই তো গলা কেটে রাখি।

—তার চেয়ে চলো মীনা আমরা এখান থেকে কোথাও চলে যাই—

—এমন সুন্দর তৈরি বাগান ফেলে রেখে? এত মেহনতের পরে? লোকে বলবে আমরা নেহায়েত ডরপোক্ আছি! তাই না?

—শুধু জিন্দা থাকার লোভে আমি তোমায় শাদি করবো কী করে মীনা? সেও তো ডরপোকেরই কাজ! তাই না?

—তুমি শাদি করবে আমায় ভালোবাসো বলে। এমন বেওকুফ্ তো কখনো দেখিনি! মনে নেই—রাজমহলে থাকতে রাতের বেলায় আমার ঘরের বাইরে বসে ঢুলতে—বিড় বিড় করতে—আবার থাকতে না পেরে দোরে খুট খুট করতে। আমি জেগে গিয়ে দোর খুলতেই দেখতাম—তুমি মড়ার মতো ঘুমোচ্ছো—আসলে চোখ বুজে পড়ে থাকতে—

—তুমি বুঝতে পারতে?

—ওমা! দ্যাখো। কেন বুঝবো না? আমি তো মেয়েমানুষ সফি।

—তুমি বড় কঠিন ছিলে—বলতে বলতে মীর সফি অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো। তার দু'চোখ দিয়ে তখন জল পড়ছে।

—এই দ্যাখো! কাঁদে আবার। কেমন মরদ গো তুমি? বলতে বলতে মীনাক্ষী মীর সফির চোখের নিচে হাত দিলো।

এতবড় হিন্দুস্থানের হৃৎপিণ্ড যদি হয় আগ্রা—তা সে আগ্রাকে বাইরে থেকে দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই—হিন্দুস্থানের কোথায় কী হচ্ছে। বড় বড় ঝড়, বন্যা, মহামারী, অজন্মাই টের পাওয়া যায় না আগ্রায় বসে। শাহজাদা খুর্‌রম এখন কোথায়? কী অবস্থায়? সে খবর জানে শুধু হামলার শরিক শাহী ফৌজ আর আগ্রা দুর্গে দেওয়ানখানার মীরবকসি। কেননা, হামলায় হাতি-ঘোড়া, লোক-লশকরের ক্ষয় আছে। মীর বকসি সেই ক্ষয় নতুন সেপাই, নতুন হাতি পাঠিয়ে পুষিয়ে দেন।

শীতের মাঝামাঝি এক সকালে শাহজাদা খুর্‌রম গোলকুণ্ডা সীমান্তে পৌঁছে দেখলেন—খিরকি যাবার রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে ঘোড়সওয়ার দাঁড়িয়ে। এই সেদিনও বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহমেদনগর তাঁর কথায় উঠতো বসতো। তখন তাঁর পেছনে ছিল শাহী ফৌজ। হাতে ছিল খোদ বাদশার ফরমান।

আর এখন? তিনি একজন বাগী শাহজাদা মাত্র। খুর্‌রম আর এগোলেন না। পেছনে তেড়ে আসছে মহাবত খাঁ। সামনে পথ বন্ধ। জোর করে ঢুকলে সামনেও লড়াই ডেকে আনা হবে।

ডানদিকে পেছোলেই বিরাট বিরাট গাছ আর কাঁটালতার জঙ্গল। একদমে কয়েক মঞ্জেল পিছোলেই বিরাট কালো দরিয়া। সেই দরিয়ার গা ধরে ধরে এই জঙ্গল।

প্রথমে দশটি হাতি ঢুকলো সে-জঙ্গলে খস খস্ করে। ডালপালা ভেঙে। কাঁচ পাতালতা খেতে খেতে। তার পেছনে তিন রিসালা ঘোড়সওয়ার। হাত-দা-য়ে কাঁটালতা কাটতে কাটতে।

ওরা খানিক এগোলে হাতির পিঠে জঙ্গলে ঢুকলেন শাহজাদা খুর্রম। পেছনের হাতিতে বেগম তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে গাদেলায় বসে। শুধু দারা খুর্রমের পাশে বসে—সামনের হাতিতে। ভোর ভোর তাঁবু গুটিয়ে রওনা হওয়ার সময়েই দারাশুকো তার আব্বা হুজুরের পাশে এসে বসেছে।

—আমরা কোথায় চলেছি আব্বা হুজুর?

শাহজাদা খুর্রম জঙ্গলের ভেতর সামনের দিকে তাকিয়ে বললেন, বড় আফসোসের কথা! বলেছিলাম—পাশে রেখে তোমায় হুকুমত শেখাবো—হাতে-কলমে শাসন করতে শিখবে ভেবেছিলাম। আর কী শেখাচ্ছি এখন!

—কেন? অনেক কিছুই তো শিখছি রোজ।

—তা শিখছো! হামলার মুখে পড়ে কিভাবে হটে আসতে হয়। কিভাবে পালিয়ে বেড়াতে হয়। তাই না?

—এটাও তো একটা শিখবার জিনিস আব্বা হুজুর।

—তা বটে।

হাতিরা থেমে নেই। কয়েক হাজার মানুষ আর হাতি, ঘোড়া, উট সারাটা জঙ্গল তছনছ করে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে জঙ্গলের ছায়ায় মাথার ওপর দিয়ে রোদ এসে পড়ছিল।

খুদে সুলতান মহম্মদ দারাশুকো এই ক'মাস ধরে হাতির পিঠে—তাঁবুতে শুয়ে শুনে আসছে—একটা যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধটা যে এমন মনোহারী ব্যাপার তা সে জানতো না। হাতির পর হাতি, রঙিন ঘোড়া, উটের আচমকা ঠেলে উঠে দাঁড়ানো, তীর-ধনুক, রিসালাদারদের উষ্ণীষে কাজ করা সরবন্ধের বাঁধন—সব মিলিয়ে কয়েক হাজার মানুষ আর পশুর এই ডামাডোল—তার ভেতর মাঠে প্রান্তরে—নদীর কিনারায় তাঁবু গাড়া—তাঁবু গোটানো—এক এলাহি কাণ্ড।

—আব্বা হুজুর, এ জঙ্গল কতদূর? মনে হয় শেষ নেই যেন—

দারা তার বাবার মুখে তাকালো। স্থির—বিষণ্ণ দুই চোখ।

—আপনি মন খারাপ করবেন না আব্বা হুজুর।

চমকে ছেলের মুখে তাকালেন শাহজাদা। কী বলতে চাইছো?

—আমি হুকুমত না শিখি—আমার ভাই তো শিখছে—

অবাক হয়ে তাকালেন খুর্রম।

—কেন? সুজা ভাই তো দাদাসাহেব বাদশা জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।

খুররম কোনো কথা বললেন না। ছেলেবেলা আর ভালোবাসা থেকে যুদ্ধ—হামলা, লড়াই কতদূরে। বালক বয়স দেয় স্বপ্ন। যৌবন সেই স্বপ্নে তাগদ মেশায়। সেই তাগদদার খোয়াবের আলোর নাম সাহস। যা কিনা জয়ের নেশা ধরিয়ে দেয়। তলোয়ার ধরলে মনে হয়—কেউ আমাকে আটকাতে পারে না। আমি জলের মতো—বাতাসের মতো হয়ে যাবো। নদী পেরোবো। পাহাড় ডিঙোবো। দুশমনের দুর্গ গুঁড়িয়ে দেবো।

কিন্তু হায়! কিছুই পারিনি এখনো। শুধু পিছু হটছি।

—দারা। তুমি পিছু হটাই দেখছো। এগিয়ে যাওয়া দ্যাখোনি আমার—

—আম্মিজানের মুখে শুনেছি—আপনি—আমি যেবার জন্মাই—সেবার উদয়পুরকে হারিয়ে কুমার করণকে দাদাসাহেবের বরকতে হাজির করেছিলেন। কিন্তু—

ছেলের মুখে তাকালেন শাহজাদা।—কিন্তু?

—যা দেখতে পাচ্ছেন—সবটাই তা নয় আব্বা হুজুর।

—কিরকম?

—যা দেখতে পাই আমরা—তার বাইরে যে আরও অনেক কিছু থাকে। আমরা তো আগামীকালের কথা জানি না। সেই আগামীকালের ভেতর আপনার জয় লুকিয়ে থাকতে পারে তো—

জঙ্গলের ছায়ায় নিজের ছেলের নির্দোষ মুখশ্রী দেখতে যে এত ভালো লাগে শাহজাদা তা জানতেন না। তিনি তাকিয়েই থাকলেন। নিজের মনে মনে বললেন, খোদাতালার অসীম করুণায় এমন ছেলে পেয়েছি।

আমরা সবাই যদি একই সঙ্গে জানতে পারতাম—আমরা কে কেমন আছি—তাহলে নিশ্চয় কেউ নিজের অবস্থা নিয়ে মাথাই ঘামাতাম না। রাজধানী আগ্রায় আজই সন্ধেবেলা রাজা কি মাণ্ডিতে আতশবাজির জলুস চলছে। আবার শাহী কয়েদখানায় পাঁপির শরবত খাওয়ানোর পর কোনো স্মৃতিভ্রষ্ট কয়েদী অবুঝ চোখে গরাদ ধরে রাতের রাজধানীর আকাশে তাকিয়ে। সন্ধ্যায় যমুনার যোধাবাঈ ঘাট থেকে একজন ঘোড়া দাবড়ে চলেছে আগ্রা দুর্গের দিকে। হপ্ত চৌকির সামনে সেই ঘোড়সওয়ার ঘোড়া থেকে নামতেই চেনা গেল—ইরানি আহেদি বেলাইতি বাজারঘানি—এই ক'বছরে কিছুটা বয়স বেড়েছে—দুর্গের পাথরের চত্বরে তার পা ফেলা রীতিমত তাগদে ডগমগ—দাম্ভিক—সুখী, বেপরোয়া—কোমর থেকে শাহী কাগজ বের করে পাহারাদার রুক্ষ রাজপুত সেপাইয়ের হাতে দিলো। যোগীপুরা মহল্লায় ধুনী জেলে এক সাধু নিজের গলা ছড়িয়ে দিচ্ছে রাজধানীর বাতাসে—

ক্যা তেরা সাহেব বহেরা হ্যায়?

তোমার ভগবান কি কানে শুনতে পান না? এত চেঁচিয়ে তাঁকে ডাকতে হচ্ছে কেন?

বহেরা হ্যায়? বহেরা হ্যায়?

আশপাশে ঘিরে বসা বাকি চেলাদের দোয়ারকি।

এই যে আতশবাজির জলুস, নিজেকে ভুলে যাওয়া কয়েদীর আকাশে তাকানো, আহেদি বাজারঘানির তাগদে ডগমগ পা ফেলা, যোগীপুরায় ধুনী জেবলে সাধুর আত্মহারা গান—আর রাজধানীর বাকি সব ইনসানের আলাদা আলাদা কয়েক লক্ষ জিন্দেগি যদি একই সঙ্গে দেখতে পাওয়া যেতো—তাহলে কি আমরা শুধু আমাদেরই কথা ভাবতে বসতাম ? কে এসব একই সঙ্গে দেখতে পায় ? তিনি আল্লা ? তিনিই কি ভগবান ? না, লাখো লাখো ইনসানের নানান দুঃখ, আহ্লাদ, দেমাক, আত্মহারা দশা আশমানে উঠে গিয়ে, মিশে গিয়ে যখন একাকার হয়ে যায়—তখন তাকেই কপালে হাতের ঘা দিয়ে মীনাক্ষী বলে—সবই কপাল ! সবই নিয়তি ! সেই নিয়তিই কি এসব একই সঙ্গে দেখতে পায় ?

সন্ধের নামাজ আদায় করে মীর সফি আকাশে তাকিয়েছিল। এইসব সাত পাঁচ তার মাথায় আসছিল। দূরে মীনাক্ষী হাতে কুপি জবালিয়ে আকাশের নিচে কয়েকটা সেঁউতির চারা ঝুনো মাটিতে রেখে আসছিল। রাতে শিশিরে ভিজে সুস্থ থাকবে। ভোরে বসিয়ে দেবে। অনেক দূর দিয়ে চর মাটিতে তরমুজ চাষীদের মাঠকোঠায় আলোর ফুলকি। সেখানে অন্ধকার মাটিতে দাঁড়িয়ে শের খাঁ রাজধানীর হৃৎপিণ্ড অতিকায় আগ্রা দুর্গের আলোর দিকে তাকিয়েছিল। তার অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা মূর্তিও মীর সফি দেখতে পেল। দেখে সে ভেবে ভেবে কূলকিনারা পায় না। লাখো লাখো ইনসানের লাখো লাখো কাহানি। আমরা কতটুকুই বা জানি। একদিন রাজা কি মাণ্ডিতে আতশবাজির জলুস দেখেছিলাম। আরেকদিন আগ্রার চবুতরায় বসে পাপির শরবত খাইয়ে দেওয়া নিজেকে হারিয়ে ফেলা কয়েদীদের কথা শুনেছি। যোধাবাঈ ঘাট থেকে এক আহেদিকে ঘোড়া দাবড়ে আগ্রা দুর্গে যেতে দেখেছিলাম। সে হয়তো আদৌ বেলাইতি বাজারঘানিই নয়। সবই আমার ধারণা। খোয়াব। তবে যোগীপুরায় এক সাধুকে ওভাবে ধুনী জেবলে গাইতে দেখেছি। জেগে থেকে দেখাশোনা—আর খোয়াব দেখা—সবই একাকার হয়ে যাচ্ছে। এইসব একই সঙ্গে কে দেখতে পায়। সর্বজ্ঞ খোদাতালা। আর দেখতে পায় মীনাক্ষীর নিয়তি।

ক্ষেত থেকে ফিরে এলো মীনাক্ষী। কালো চুলের গোছার ভেতর সবুজ পাতাসমেত একটি টগর—সাদা। মীর সফি চোখ ফেরাতে পারলো না। সে খুব ভয়ে ভয়ে বললো, আমি তোমায় রাখতে পারবো না। ঠিক হারাবো—

চমকে তাকালো মীনাক্ষী। পায়ে পায়ে হিন্দুস্থান ঘুরে বেড়ানো মীনাক্ষীর চোখে এখনো আশমানের বিজলি। সে হেসে বললো, কেমন মরদ তুমি ?

—সত্যি কথা বলছি। ঠিক লুট হয়ে যাবে।

—সেই ভয়েই তো তোমার বিবি হলাম !

—ওভাবে তুমি শের খাঁকে ঠেকাতে পারো। কিন্তু লুটেরা আগ্রাকে—সেখানকার দৌলতদার তাগদদার লুটেরাদের আমি সামান্য মীর সফি আটকাবো কী করে ?

সুখে খুশিতে মীনাক্ষী তার চেয়ে কিছু ছোটই এই আফগান যুবককে জড়িয়ে ধরলো। পাঁচ ছ'মাস হয়ে গেল আমরা মিঞা-বিবি। এখন আর আমি কিছু ভাবতে পারবো না সফি। সব ভাবনা তোমার—

মীনাক্ষীকে দু'কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে রীতিমত কেঁপে উঠলো সফি। তারপর ভীষণ উত্তেজিত গলায় বললো, হেলমন্দের তীর হলে আলাদা কথা ছিল। আমরা আদি যমুনার চরে। এখানে তোমার মতো সুন্দরী বিবিকে আমি রাখবো কী করে? শের খাঁয়ের মতো অনেকেরই নজর তোমার ওপর। তোমায় পেতে আমাকে খতম করতেও ওদের আটকাবে না। তুমি পুরুষের লোভ জানো না মীনা—আমার ভয় করে—

—ও ভেবে লাভ নেই! সনাতন তো ধুমধুমায় গড় গড়ে তুলছিল—কী হলো তাতে? আটকানো গেল! সবই আমার কপাল!

কপাল কথাটা শুনে ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলো সফি।

মীনাক্ষী বললো, ভয় আমারও করে। তবে অন্য কারণে—

—কী?

—কাজীর কাছে গিয়ে তো আমায় বিয়ে করলে না সফি?

—ওঃ! তার চেয়ে বড় বিয়ে হয়ে গেল তোমার সঙ্গে। তোমার বাগের ফুলের মালা পালটাপালটি করে বিয়ে হলো আমাদের। এর চেয়ে বড় আর কী আছে মীনা—

মীনাক্ষী কোনো কথা বললো না। আবছা চাঁদের আলোয় বেলি, যুঁই, চামেলি ছায়ার সঙ্গে মিশে আছে। সে তার চুলের গোছা থেকে টগরটা খুলে সফির হাতে দিলো। দিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়ালো।

আবছা অন্ধকারে সফি মীনাক্ষীর পিঠে তাকালো। অন্ধকারের সঙ্গে মাথার চুল মিশে গেছে। কিন্তু কাঁধের ওপর এক চিলতে আলো পড়ে দেখাচ্ছে যেন—যমুনার বিশাল ভাঙা তীর। সফির হাত কেঁপে উঠলো। সে খুব সাবধানে অন্ধকারের ভেতর টগরটা গুঁজে দিলো। এতবড় হিন্দুস্থানে কেউ তা জানতে পারলো না।

এক একদিন রাতে মীনাক্ষীর সঙ্গে শুয়ে এমন কেঁপে ওঠে সফি। তার বিশ্বাসই হয় না—মীনাক্ষী তার বিবি। সেই প্রথম দেখা মীনাক্ষীর তেজ, সাহস—ছেলেমেয়েদের জন্যে উতলা ভাবটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে সফির।

মীনাক্ষী সামনের দিকে তাকিয়েছিল। পেছন থেকে তার দুই কাঁধে হাত রাখলো মীর সফি। রেখে বললো, একটা কথা বলি তোমায়—চলো না এখান থেকে চলে যাই আমরা।

—কেন? কোথায় যাবো?

—রাজধানীর এত কাছে—এই যমুনার চরে আমাদের পড়ে থাকার কী দরকার?

—বাঃ! বেশ তো আছি। কী সুন্দর ফুল বসিয়েছি। এমন জায়গা পাবো কোথায়?

—এতবড় হিন্দুস্থানে জায়গা হবে না আমাদের ? রাজধানী মানেই নানা গোলমাল। লোভ। আরও লোভ। তার গায়েই এই চর জায়গায় ফুলের চাষে আমরা তরমুজের চেয়ে অনেক বেশি নাফার মুখ দেখছি। এটা ওদের সইছে না। শের খাঁ একটা না একটা ছুতো খুঁজছে। ঝাঁপিয়ে পড়লো বলে—

—তুমি না একজন আহেদি ছিলে ?

—সেকথা আমি ভুলতে চাই মীনা—। আমি একজন ইনসান মাত্র। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। কমও কিছু নয়।

—এখানে বহুদিন কোনো মেয়েমানুষ নেই বলে শের খাঁয়েরা অমন হয়ে গেছে। এমনিতে তো ওরা খারাপ নয়। ঝাঁপিয়ে পড়লেই হলো।

—সবাইকে তুমি আটকাবে কী করে ? আমিই বা একা কী করতে পারি ? আমার সে ঘোড়া নেই। তলোয়ারও ধরিনি অনেকদিন।

—ভুলে যেও না আমিও ঘরদুয়ারি পাইকান বাড়ির মেয়ে।

—কিন্তু কপালকে আটকাবে কী করে !

—বাঃ ! চমৎকার ! হেলমন্দের মানুষের কপালে এত বিশ্বাস কবে জন্মালো ? জানতাম না তো !—বলতে বলতে মীনাক্ষী মীর সফির গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো।

সফি তার বুকের ওপর আরেকজন মানুষের ধুক্‌ধুকি টের পাচ্ছিল। তার গলা শুকিয়ে এলো। এই তেজী, সাহসী আওরতকে বিবি করার পরেও সবটা বুঝে উঠতে পারে না সফি। বেপরোয়া, একগুঁয়ে এই জেনানার জেদের গন্ধ অব্দি সে পাচ্ছে। আমায় শক্ত করে ধরো। আমি তোমার বিবি। ধরো—

সফি দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো মীনাকে। পুব দেশের এই মেয়েরা দেখতে যতই নরম-সরম হোক না কেন—কথায়-বার্তায় বাইরে থেকে দেখতে শান্ত—কিন্তু একবার বাই উঠলো তো—সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। বর্ষার ব্রহ্মপুত্রের মতো।

সফিও যেন ভেসেই যাচ্ছিল। মীনাক্ষী আবারও বললো, শক্ত করে ধরো।

সফি আর পারলো না। সে মীনাক্ষীকে জাপটে ধরে ঝুপড়ির ভেতরে ঢুকলো। চরের কাশ, রেড়ির ডাল, আর মাটি মাখিয়ে গাঁথা দেওয়ালে গা ঘষটে গেল দু'জনেরই। শীত শেষের সন্ধ্যারাতে মীনাক্ষী ঘেমে উঠলো। সে হাসছে ? না, উসকে দিচ্ছে ?—বোঝা যায় না অন্ধকারে। ওর ভেতরেই মীনাক্ষী বললো, শাহী ফৌজের আহেদি থাকতে হামলা করেছো তো অনেক !

—হ্যাঁ মীনাক্ষী। হ্যাঁ—

—লুটপাট করেছো তো !

—করতে হয়েছে মীনাক্ষী। হ্যাঁ। কেন ?

—কোনো মেয়েমানুষ লুট করোনি কি কোনোদিন !

আর কোনো জবাব দিতে পারলো না এক কালের আহেদি মীর সফি। লুট, হামলা, গ্রেফতার, দখল। উঃ ! একটা ইনসানকে আষ্টেপৃষ্ঠে দখল করা যে কী কঠিন। মীনাক্ষীকে তার অতিকায় এক প্রাণী মনে হতে লাগলো।

সাহসী। যে সাহস ইনসানকে খুবসুরতি দেয়। যাকে আঘাত না করে দখল করা যায় না। দখল রাখা যায় না। যমুনার জলে খেলে বেড়ানো মাছ দেখতে খুব সুন্দর। তাকে কোঁচে গেঁথে ডাঙায় তুলতে হয়।

॥ ষোলো ॥

রাজধানী আগ্রার বড় মকবরার গায়েই চবুতরা চক। যেখানে আর কি বিকেল হতে না হতেই ফুলের মেলা বসে যায়। দেহাত থেকে ফুলের গোছা নিয়ে এসে মেয়েরা পসরা সাজায়। সন্ধের মুখে মুখে রইস মানুষজনের বাহার হলো এই ফুল। তারা ফুল কিনে ডানদিকে এগোলে শয়তানপুরায় পোঁছে যায়। বাঁদিকের রাস্তাটা গিয়ে মিশেছে রাজা কি মাণ্ডিতে। পাথুরে গলি। গলির দু'ধারে বাড়ির গায়ে বাড়ি। ঘিঞ্জি মতো। রাজা কি মাণ্ডি এই ভাবেই শয়তানপুরার শেষাশেষি গিয়ে মিশেছে। এই মেশামেশির জায়গাতেই গানেওয়ালিদের ঘর। শরীর আর সুরের পাশাপাশি বসবাস।

সারা রাত বর্ষার ভেতরেও ঘোড়ার গাড়ির আনাগোনা থেমে নেই। হঠাৎ হঠাৎ যমুনার আকাশে বিদ্যুৎ ঝলকায়। তাতে পলকের জন্যে ভিজে পাথুরে গলি অন্ধকারে ভেসে ওঠে। দেখা যায় কোতোয়ালের ঘোড়সওয়ার আপাদমস্তক ঢেকে শয়তানপুরার দিকে কাদের যেন তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওরই ভেতর দোতলার আলো ছড়িয়ে পড়া জানলা দিয়ে ভাঙা হাসি, মেয়েলি গলার আধখানা দাদরা গড়িয়ে পড়ে।

প্রথম রাতে আগ্রাওয়ালি রেহানা আজ দু'জন সমঝদার খদ্দের পেয়েছিল। একজন কনৌজের চানার কারবারি। অন্যজন দেওয়ানখানার বেশ মাঝারি মাপের কোনো শাহী আমলা—নিজের পরিচয় কবুল করেননি। রেহানা ধরেছিল কেদারা—প্রায় মাঝরাত অব্দি টেনেছিল।

চানার কারবারি সরাব বিশেষ ছোঁয়নি। খাবার পড়েই ছিল। রেহানা সমে এসে পোঁছলে সামান্য দুলছিল। কিন্তু সমঝদারিতে চানার কারবারির কোনো বাড়াবাড়ি ছিল না। দেওয়ানখানার আমলা যাও বা দু'একবার কাবাব ভেঙে খেয়েছে—সরাব ছুঁয়েও দেখেনি। রেহানার গানে তারিফ জানাতে মাঝে মাঝে মাথার ফুলকারি টুপি খুলে ফেলছিল—আবার পরে নিচ্ছিল।

তারা চলে যেতে দোর বন্ধ করে রেহানা নিজের কাছে বসেছিল। একবার উঠে জানলা বন্ধ করা দরকার। বৃষ্টির কোনো থামা নেই। এখন সে শব্দ যেন তার মাথার ভেতর গিয়ে পড়ছে। গালিচার ওপর বসা নিজের ছায়া উল্টোদিকের বিরাট আরশিতে। নিচে আবদারখানায় রসুইকার, বাঁদীরা সবাই এতক্ষণে ঘুমে কাদা হয়ে আছে। আরশির রেহানাকে দেখে আসল রেহানা নিশ্চিন্ত হলো: এই গানেওয়ালি মেয়েটা নিশ্চয় কোনো ভাবনায় ভেতরে ভেতরে কাঁটা হয়ে আছে।

কিসের সেই ভাবনা? যে বসন্তলাল একদিন তার নাকের নথ খসিয়েছিল

—সে আজ সাধু ! আর আমি ?

আরশিতে একে একে ছবির মতো সবই দেখতে লাগলো আগ্রাওয়ালি রেহানা। একটি আট ন'বছরের মেয়ে খুব সেজেছে। ঘাগরা সামলাতে সামলাতে সে বিরাট এক পিপুলগাছের নিচে এসে দাঁড়ালো। জৌনপুরে কোঠাবাড়িটা বড়ই ছিল। তার সঙ্গে সঙ্গে বাজনদাররাও গাছতলায় এসে বাজাতে লাগলো। দিগর, ঢোল, সানাই, বাঁশি, পণব। মেয়েটিকে ঘিরেই সব। গাছতলায় ছুটে এসে একদল মেয়েও ওই মেয়েটিকে ঘিরে নাচতে লাগলো। বাজনার সঙ্গে সঙ্গে। নাচিয়ে মেয়েগুলো অনেক বড়। নাচ আর থামেই না। আট ন'বছরের মেয়েটির নাকে মোতি বসানো বড় এক নথ।

সামনের উঠোনে বড় পেতলের ডেগে বিরিয়ানি বসেছে। তার সুগন্ধ বাতাসে। এমন একটা আনন্দ বাতাসে চারিয়ে যাচ্ছে চারদিকে—তা থেকে কেউ বেরোতে পারছে না। সবাই হাসছে। উঠোনের উল্টোদিকে আমলকির ডালে একটা হীরামন এসে বসলো। লাল গলা।

সবাই ছোট মেয়েটিকে বললো, রেহানা—তুই খুব ভাগ্যবতী। হীরামন খুব ভালো লক্ষণ।

বিকেল হতে ছোট রেহানার গায়ে একের পর এক গয়না পরানো হলো। চোখে সুরমা। কপালে বিন্দিয়া। পায়ে পাঁয়জোর। ঘাগরায় আতর। ঠিক সন্ধের মুখে একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের ছেলে এলো ঘোড়ায় চড়ে। সঙ্গে সানাই।

হুলস্থুল পড়ে গেল। রেহানা জানতে চাইলো, কী ব্যাপার ?

একজন বয়স্কা মেয়েমানুষ বললো, ওমা ! আজ তোর যে বিয়ে—তাও জানিস না ?

মেয়েটি বিড়বিড় করে বললো, আমার বিয়ে ? মিশি দিয়ে দাঁত মেজে মিশমি হলো। তারপর যে বিয়ে হলো আমার ? মেয়েমানুষটি বললো, আমরা তওয়াইফ ঘরের মেয়ে। এই তো আমাদের নিয়ম মনে নেই তোর—যখন আরও ছোট ছিলি—খুব নাচগান হলো—শিরঢাকাই দিয়ে তোর একবার বিয়ে হয়েছিল। তারপর মিশমির পর আরেকবার। আজ তোর সেই মিশমির খসম এলো আবার ঘোড়ায় চড়ে—দেখবি'খন কী হয় ?

রেহানার ঘুম পাচ্ছিল সন্ধের দিকে। হাই তোলার দশা। অথচ তাকে ঘিরেই সব। নাচ, গান, সানাই—কত কী। খসমকে একবার দেখেছে রেহানা উঁকি দিয়ে। বেশ দেখতে। মিশমির সময় দেখেছিল। কিন্তু ঠিক মনে নেই।

খানিক রাত হতে রেহানাকে একটা ঘরে ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দিলো খালেদা ফুফু। হাসতে হাসতে। সামনেই পালঙ্ক ছিল। তার ওপর হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়লো রেহানা। মুখ তুলে দেখে—পালঙ্কের কোণে সেই খসম বসে। দিব্যি গোরাপানা। গায়ে চকচকে কাম্বাদার।

সে এগিয়ে এসে বললো, মুখটা তোলো। একবার দেখি—

রেহানা পিছিয়ে এলো, তুমি কে ?

—আমি? হাসলো ছেলেটা, তোমার খসম। বসন্তলাল। এবার মুখটা তোলো তো—

রেহানা মুখ না তুলতেই বসন্তলাল আলতো করে নাক থেকে মোতি বসানো নথ খুলে ফেললো।

—খুললে যে বড়—

—নথ উতারনাই তো আমার কাজ! আমি যে বসন্তলাল! এসো। কাছে এসো। কত নথ খুলে নিলাম এই অল্পদিনে।

পরদিন ঘুম থেকে উঠতে লজ্জা করছিল রেহানার। কিন্তু আস্তে আস্তে সব সয়ে এলো। তওয়াইফ্ রীত্ রিসালা মতো বসন্তলালের চলে যাওয়ার কথা পরদিন সকালে। কিন্তু বসন্তলাল থেকে গেল। রেহানার ওপর টান ধরে গেল। রেহানারও তাই।

আরেকখানা ছবি সামনের আরশিতে। যেন বা রেহানার মনের ভেতরটা সামনের আরশিতে গিয়ে ফুটে উঠেছে। সন্ধেবেলা খসম বসন্তলাল হঠাৎ ফিরে এসেছে ঘরে। এই সময়টা তার মাণ্ডিতে বসে রাজা-উজির মারার কথা। ঘরে তখনো আলো জ্বলেনি। আচমকা এসে বসন্তলাল তার দুই হাতের জোড় রেহানার মাথার চুলের ঢালে খুলে দিলো। দিয়েই হাততালি। দ্যাখো দ্যাখো —কী সুন্দর!

রেহানা বুঝতে পারেনি। কী? কী সুন্দর?

—ভালো করে দ্যাখো।

মাথার পেছন থেকে চুলের গোছ বুকের ওপর টেনে এনেই চমকে উঠলো রেহানা। করেছো কী? এই বেতমিজি আমার ভালো লাগে না।

—ভালো করে দ্যাখো। সন্ধ্যার এই অন্ধকারে কী সুন্দর দেখাচ্ছে। যেন জরির কাজ।

রেহানা কোনো কথা না বলে নিজের চুলের গোছ থেকে একটা একটা করে জোনাকি বেছে বের করতে লাগলো।

আরেক জায়গায় নথ উতারনার ডাক পড়ায় সেই বসন্তলালও একদিন চলে গেল। শয়তানপুরায় গিয়ে ওঠার মহরত করে দিয়ে যাবার সময়—বসন্তলাল একখানা ছোরা পালঙ্কের বাজুতে বসিয়ে দিলো। দিয়ে বললো, রেহানা—এই ছোরার সঙ্গে তোমার এখন বিয়ে হলো। আজ থেকে এই ছোরাই তোমার খসম।

রেহানার চোখ জলে ভরে গিয়ে অন্ধ হয়ে গেল। সে আন্দাজে ছোরাখানা তুলে নিয়ে বসন্তলালের পেটে বসিয়ে দিলো। অন্ধ কান্নায়। অন্ধ দুঃখে। বসন্তলাল পড়ে গেল। চিৎকার। ছোটাছুটি। হেকিম। খালেদা ফুফু ভীষণ পেটালো রেহানাকে। চোট তেমন গহেরাই নয় বলে বসন্তলাল দিন সাতেকের ভেতর উঠে দাঁড়ালো। নাইকুণ্ডুলির বাঁ দিকে একটা কাটা দাগ নিয়েই সে আরেক জায়গায় নথ্ খসাতে চলে গেল। সেই ছুরির সঙ্গেই ফুফু রেহানার বিয়ে দিলো। অনেক পরে রেহানা শুনেছিল—সুরাটে গিয়ে বসন্ত সাধু হয়েছে।

বসন্তলাল চলে যেতে সেই ছোরা বাঁট অব্দি তার বুকে বসে গেল। এখন একবার মনে হলো রেহানার—ওড়না সরালেই বুকে গেঁথে থাকা ছোরার হাতলের ছবি আরশিতে ভেসে উঠবে।

চমকে উঠে দাঁড়ালো আগ্রাওয়ালি রেহানা। চিৎকারই করে উঠলো। বাইরে মাঝরাত জুড়ে বৃষ্টি। ঘরে নিভে আসা আলোয় আরশিতে এ-কার ছবি?

লোকটা ছুটে এসে রেহানার মুখ চেপে ধরলো। শব্দ কোরো না। আমি গান শুনতে আসিনি।

রেহানা তার শক্ত হাতখানা দাঁতে কামড়াতে গেল। পারলো না। সে নিজেই রেহানাকে ছেড়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে রেহানা পিছিয়ে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ রাখলো, আপনি কে?

—সে পরিচয়ে তোমার দরকার কী? বৃষ্টি থামলেই চলে যাবো। রাত ফুরনোর অপেক্ষায় থাকবো না।

রেহানা ভালো করে দেখলো মানুষটিকে। ফৌজিই হবে। কোমরবন্ধে আকবরি পিস্তল ছাড়াও হাতকুড়ুল ঝুলছে। বোঝাই যায় বুকের কাম্বার নিচে লোহার পাত আছে। মাথায় সবসময় উষ্ণীষ থাকে। কেননা, সেইমত চুলের ভাঁজ। সারা গা ভিজে চুপসে গেছে। পায়ের পট্টি, নাগরারও একই দশা। একগাল পাকা দাড়ি। মাথাটিও কাঁচাপাকা। দাঁড়ানো, ঘুরে তাকানো—রীতিমত বাঘেরই মতো।

—হঠাৎ কোতোয়াল যদি এসে পড়ে তো কী বলবো? আপনি অন্তত গাহেক সেজে বসুন। আমি কিঙ্গিনা ধরি—

—বেতমিজ! আমি ফৌজে গান শোনাই না! গান শুনিও না! আমার হুকুমে গোলা ছোটে, ঘোড়সওয়ার ছোটে—

—এখন আপনি কোত্থেকে ছুটে আসছেন! আপনার ভালোর জন্যেই বলছি—

রসিকতার ধারও ধরতে পারলো না ফৌজি মানুষটি। সে বললো, উপস্থিত কালাহাণ্ডির জঙ্গল পেরিয়ে—মহানদী ডিঙিয়ে তবে আসা। রাতে রাতে চলা—দিনে দিনে লুকিয়ে থাকা—

—ওঃ! আপনি তাহলে শাহজাদা খুর্রমের ফৌজে—

—ফৌজ আর কোথায়! সবাই চলে গেছে রাজমহল।

—আপনি তাহলে?

—আমার রিসালা মহাবত খাঁয়ের তোপের মুখে পড়ে উড়ে গেল। আমরা ক'জন মোটে তখন কালাহাণ্ডির জঙ্গলে রাস্তা খুঁজে মরছি। শের, বরা, সাপ—কী নেই সে জঙ্গলে।

—শাহাজাদা কোথায়?

—খুর্রম তখন রাজমহল পাড়ি দিয়েছেন।

—আপনি তো বাগী শাহজাদার তাঁবের লোক। আপনাকে লুকিয়ে রেখে শেষে আমি মরি!

—রাত ফুরোবার আগেই চলে যাবো। অন্ধকার থাকতে আগ্রা দুর্গ পার হয়ে ফতেপুর সিক্রির রাস্তা ধরতে চাই—

—কোথায় যাবেন ?

—সেকেন্দ্রা ছাড়িয়ে পগারের ভেতর দিয়ে দশ মঞ্জেল গেলে আমার গাঁ—

—সেখানেও তো শাহী ফৌজ গিয়ে আপনাকে পাকড়াও করতে পারে।

—ধরা পড়ি তো দেশের দশজনের ভেতর পড়বো। এভাবে আর লুকিয়ে বেড়াতে পারি না।

বাইরে সর্বক্ষণ বৃষ্টির ছলছল। সেই শব্দে অতি ব্যস্ত ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের খটাখটও চাপা পড়ে যায়। আগ্রাওয়ালি রেহানা দেখলো, মানুষটি খুবই ক্লান্ত। বয়সের ভারে কিছুটা ঝুঁকে পড়েছেন। এগিয়ে হাত দু'খানি ধরলো। আপনি বসুন। রাত ফুরোতে এখনো অনেক বাকি।

ফৌজি মানুষটি এ কথায় চুপচাপ এসে বসলো। এবার এই মানুষটি আগ্রার রাজা কি মাণ্ডির এই সামান্য গানেওয়ালি মেয়েটির কথায় অবাক হয়ে গেল।

রেহানা জানতে চাইলো, বেগম আরজুমন্দ বানু কেমন আছেন ?

ফৌজি মানুষটির মনে হলো—যেন, ঘরের কোনো মানুষের খবরাখবর জানতে চাইছে। তুমি তাকে চেনো ?

—এমনি কোনো জান-পহচান নেই। কিন্তু কে না তাঁকে চেনে! তামাম হিন্দুস্থান জানে—তিনি শাহজাদা-বেগম।

—আওরতদের ভেতর তিনি স্ত্রীরত্ন। এই যে পথের কণ্ট—রোদ-বৃষ্টি-শীত।—তাঁবুতে শোওয়া-বসা—সব মেনে নিয়েছেন বেগম। মুখের হাসিটি মোছেনি।

—মাসুম বাচ্চারা কেমন আছে ?

ফৌজি মানুষটি আরও অবাক হলো। তুমি ওদের দেখেছো ?

—না। দেখবো কোত্থেকে। থাকি রাজা কি মাণ্ডিতে! গাই গান। আমাদের কি সে-ভাগ্য আছে! তবে শুনেছি।

—ওরাও ওদের আম্মিজানেরই মতো। মঞ্জেলের পর মঞ্জেল হাতির গাদেলায় বসে পার হচ্ছে। তাঁবু গাড়লে সেখানকার মাঠেই ছোটাছুটি খেলাধুলো করছে। শাহী মাসুম বাচ্চা বোধহয় ওইরকমই হয়।

শুনতে শুনতে রেহানা গালিচার দিকে তাকিয়ে ছিল। বাইরে জলের ছলছল শব্দে গাঁথা জমাট অন্ধকার এক রাত। ভেতরে মধ্যবয়সী পরাস্ত এক যোদ্ধা। এত বড় অন্ধকার রাতে বিশাল হিন্দুস্থানের কোথায় এক কোণে শাহজাদা খুর্রম বেগম আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। শয়তানপুরা মহল্লা আর রাজা কি মাণ্ডি বাদে বাকি আগ্রা গভীর ঘুমে। দুর্গেও নিশ্চয় সবাই ঘুমিয়ে। দেওয়ানি খাসের সামনের খোলা চত্বর এখন বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে। মোরি দরওয়াজার বাঁ পাশে হাতিশালায় হাতিরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে।

—বৃষ্টি ধরে এলো। আমি উঠি—

—যাবেন ?

—মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই। রাত থাকতে আগ্রা দুর্গ পেরিয়ে যাবো।

রেহানা কোনো কথা বললো না। মানুষটি বেরিয়ে গেলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় একবারও পেছনে তাকালেন না। নিচে দরওয়াজা বোধহয় বন্ধ হয়নি। বাতাসে—বৃষ্টির তোড়ে পাল্লা খুলে যাচ্ছে। আবার বন্ধ হচ্ছে শব্দ করে।

এর ভেতরেই রাজধানীর বড় মকবরার বুরুজ থেকে ভোরের আজান রেণু রেণু হয়ে ভেসে আসছিল—

লা ইলাহা ইল্লালা
মহম্মদুরসুলুল্লা-আ-
হাই আলে সালা—
হাই আল্লেল ফলা—

আজানের সুরেলা মিঠাজ যেন বৃষ্টির ফোঁটায় ফোঁটায় ভর দিয়ে যমুনার আকাশে এসে ভাসছে। রেহানা তাড়াতাড়ি কনুই অব্দি ধুয়ে নিলো। ধুয়ে নিলো পা। কান গলা। তারপর চটি পায়ে গলিয়ে এসে নামাজের মাদুর বিছিয়ে ফেললো। ওড়নায় মাথা, কান, গলা ভালো করে মুড়ে নিয়ে পা ভাঁজ করে চোখ বুজলো—

আসসামে আল্লা হোলেমান হামিদা
সোবান রব্বের আলামিন
সোবান কুদ্দু সোবান কুদ্দু-উ-

ফজরের নামাজ কবুল করে এবার সালাম ফেরাতে বসলো আগ্রাওয়ালি রেহানা। কিন্তু পারলো না।

কে যেন কাঁদছে। উঠে দাঁড়াতে পারলো না। মনস্থির করে সালাম ফেরালো। তারপর সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়ালো রেহানা। কে ? কে কাঁদে ?

কেউ জবাব দিলো না। তার বদলে একেবারে কচি মতো কে কেঁদে উঠলো। সেই সঙ্গে দরজা হাট করে খুলে যাওয়ার শব্দ। আবার সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা বাতাসে দরজা হুট করে বন্ধ হয়ে যাবার শব্দ।

সাহস করে নিচে নেমে এলো রেহানা। নামতে নামতেই বুঝলো—সিঁড়ির প্যাঁচের নিচে কে যেন—কী যেন আছে—কিছু না দেখেই তার মনে হলো।

চেঁচিয়ে উঠলো রেহানা, কে ওখানে ?

বদলে ভেসে এলো গোঙানি। অবাকও হলো রেহানা। বাগী শাহজাদা খুর্রম লড়াই করছেন—কালাহাণ্ডি, রাজমহলের ওদিকে। সেখানকার লড়াকু জখম হয়ে এখানে এতদূরে আসে কী করে ? আসা সম্ভব ?

রেহানা এবার সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে পা ফেলতে গিয়ে সরিয়ে নিলো পলকে। মাড়িয়ে দিয়েছিল প্রায়। আরেকখানা পা। তবে মেয়েলোকের। পায়ের পাতা অব্দি শালোয়ারে ঢাকা।

—কে গো তুমি? বলতে বলতে নেমে এসে দেখার জন্যে যেই আলো তুলেছে রেহানা—অমনি এক চিৎকারে তা প্রায় পড়ে যাওয়ার দশা হলো। বাচ্চার কান্না। হাত-আলোটা সামলে নামিয়ে নিয়ে এলো রেহানা।

মাটির সঙ্গে মিশে গেছে একখানা মুখ। রক্তহীন, সাদা। জলে কাদায়—রক্তে মেখে গেছে গায়ের জামা। কোল বেয়ে একটি বাচ্চা। সবে দুনিয়ায় এসে—শীতে ঠাণ্ডায় ভীষণ জোরে কেঁদে উঠলো।

—এ কী? কার বাচ্চা? কে তুমি?

মেঝের সঙ্গে মিশে যাওয়া মুখখানা কোনোক্রমে বলতে পারলো, আমি লক্ষ্মী—

—লছমি? হিঁদু? তা মরতে এখানে কেন? এটা কি মরবার জায়গা? —বলতে বলতে রেহানা হাতবাতিটা সিঁড়িতে রেখে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলো। নিতে নিতে বাঁ পায়ে এক ঠেলায় খুলে যাওয়া দরজার পাল্লা ফের বন্ধ করে দিলো।

এই মহাপৃথিবীর যেটুকু একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়—সেটুকুই একজন মানুষের নিজের পৃথিবী। তার সঙ্গে যোগ হয় বড় জোর তার আগেকার দেখা পৃথিবীর কিছুটা কিছুটা। সেইসঙ্গে কিছু শোনা কথা। পড়া বই। আর খোয়াব। আশা। উচ্চাশা—যার ভালো নাম আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু এর বাইরেও তো মহাপৃথিবী পড়ে আছে নদীনালা, পাহাড় পর্বত, মানুষজন নিয়ে। সেই পৃথিবীতে হাতি, কামান, উট, ঘোড়সওয়ার, ঘোড়া, বন্দুকচী দিয়ে ঘেরা দুনিয়াটা যেন ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে মনে হলো শাহজাদা খুর্‌রমের।

কালাহাণ্ডির জঙ্গল ধামসে দিয়ে শাহজাদার হাতি চলেছে। বর্ষার পর হাতিরা চলার পথের দুধারে কচিপাতা, নরম ডাল শুঁড়ে পেঁচিয়ে গলা দিয়ে পেটে পাঠাচ্ছিল। হাতির পিঠে গাদেলায় বসে শাহজাদা খুর্‌রম বুঝলেন, তাঁর এই প্রিয় হাতি—ফিল-ই-জং কোথায় যেন অস্বস্তিতে ভুগছে।

হাতি থামাতে বলে শাহজাদা নিচে নামলেন। ভৈ আর মেঠ তো তটস্থ। বিলোচপুর থেকে হটে আসা—তাও দু'বছরের বেশি হয়ে গেল—সেই থেকে শাহজাদা তার এই পেয়ারের হাতি—ফিল-ই-জংয়ের পিঠে পিঠেই রয়েছেন। দক্ষিণে হটে যাওয়া—আবার বিন্ধ্য পাহাড় বাঁয়ে ফেলে কালাহাণ্ডির দিকে উঠে আসা—আগাগোড়াই কোনো হাতি বদলাননি শাহজাদা।

খুর্‌রম নেমে পড়ায় তাঁর পেছনের হাতিরাও থেমে পড়লো। শীত আসেনি! আবার গরমের গরম চলে গেছে। আরজুমন্দ বানু বারবার বললেন, তুমি এখন নিচে নেমো না দারা—

হাতির গা থেকে পিছলে নিচে নেমে পড়লো দারা। এই যাবো আর আসবো আম্মিজান—

কয়েকটা হাতি পেরিয়ে দারা একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালো। দুপুর-

বেলার বনতল আশ্চর্য নির্জন আর সুন্দর। এখানকার কোনো গাছেরই সে নাম জানে না। জানে না পাখিদের নাম। বিশাল দুই গাছের ঘন ছায়ার নিচে নিজের আব্বা হুজুরকে দেখে মনে হলো—বনের বাদশা দাঁড়িয়ে আছেন। সামনে তাঁর পেয়ারের হাতি—ফিল-ই-জং দাঁড়িয়ে। তার দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

এ ছবি দেখে দারা দৌড়ে তার আব্বা হুজুরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। এখন তার নিজেকে আগের চেয়ে অনেক বড় মনে হয়। আগ্রা দুর্গের মক্তবে গালিচায় বসে দৈলেমি সাহেবের কাছে আফলাতুন পড়ার চেয়ে এই জঙ্গলের কাছে—ওই দূরের পাহাড়ের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আশমানের চাঁদোয়ার নিচে আলো, শব্দ, রং, জিন্দা জীবনের পড়া চোখ দিয়ে চাখতে—কান দিয়ে শুনতে অনেক বেশি ভালো লাগে সুলতান মহম্মদ দারাশুকোর। দু'বছরেরও বেশি হয়ে গেল—সে হিন্দুস্থানের বনপথে, পাহাড়ে, প্রান্তরে হাতির পিঠে গাদেলায় বসে রাত দেখেছে—দিন দেখেছে—শীত গ্রীষ্ম বর্ষা শরীর দিয়ে মালুম করেছে। এর চেয়ে বড় জানা আর কী হতে পারে? দুনিয়ার মক্তবে বসে দুনিয়াকে পড়ে ফেলা। এই পায়ে পায়ে হিন্দুস্থান ঘুরে তার বয়স যেন দশ সন বেড়ে গেছে। দখল, হামলা, মেহনত, পসিনা, জন্ম-মৃত্যু, জয়-পরাজয়, কয়েদি-আজাদি সবই এক ইনসানের জীবনে ছবির মতো যায় আসে। খোদাতালা ছবিগুলো বদলে বদলে দেন শুধু। এর জন্যে উতলা হবার কিছু নেই।

—কী হয়েছে আব্বা হুজুর?

—এখুনি দেখতে পাবে। এত বড় জানোয়ার এতক্ষণ চুপচাপ সহ্য করেছে। আর পারেনি। তাই চোখ দিয়ে জল পড়ছে। —বলতে বলতে শাহজাদা খুর্রম দু'হাতে দস্তানা পরে নিলেন।

সবার চোখের সামনে খুর্রম ফিল-ই-জংয়ের শুঁড়ের মাঝামাঝি গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর দু'পায়ের ভেতর শুঁড় উঁচু করতেই খুর্রম ফিল-ই-জংয়ের মুখের কাছাকাছি পোঁছে গেলেন। তাঁর মাথার দু'পাশে হাতির দুই বিশাল দাঁত। ভৈ আর মেঠ ওদিকে তাকাতে পারছিল না! ফিল-ই-জং বড় মেজাজি লড়াকু হাতি। যে কোনো মুহূর্তে শাহজাদাকে দাঁতে গেঁথে ফেলতে পারে এখন।

খুর্রম অবলীলায় তাঁর দস্তানা পরা হাতখানা হাতির মুখের ভেতর পাঠিয়ে দিলেন। দিয়েই হাত বের করে এনে শূন্যে বাড়ালেন। সাত আটটা জোঁক খসে পড়লো। এভাবে দফে দফে খুর্রম প্রায় তিরিশটার মতো জোঁক বের করে এনে তবে লাফিয়ে নিচে নামলেন। নেমে দারাকে বললেন, হাতি লড়াই হামলার পহেলা হাতিয়ার। তাকে সবসময়—সযত্ন রাখবে—

গর্ব আর বিস্ময় দারাকে একই সঙ্গে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আব্বা হুজুরের সাহসের জন্যে গর্ব। বিস্ময়? আব্বা হুজুর কী করে জানলেন—জোঁকের জন্যেই ফিল-ই-জং কাঁদছে।

আগেই খবর ছিল—ময়ূরভঞ্জ, কেওঞ্ঝর, কালাহাণ্ডি, পারলাকোমিডি—এইসব সরকার আর দরিয়া অব্দি ছড়ানো বাকি জায়গার সুবেদার আহম্মদ বেগ কাজ-কর্মে আস্ত একটি অপদার্থ। শাহজাদা তাঁকে চিঠি পাঠান। আমাদের সঙ্গে যোগ দিন। আগ্রায় মসনদে বসলে আপনাকে যথাযোগ্য পুরস্কৃত করা হবে।

এই চিঠির জবাবের অপেক্ষায় ছিলেন শাহজাদা। খবর এলো সুবেদার আহম্মদ বেগ পালিয়ে গেছেন। তিনি এখন রাজমহলের পথে। খুররমের মুখখানা ঝলসে উঠলো। হাতিতে উঠতে উঠতেই তিনি হুকুম দিতে লাগলেন। ঘোড়সওয়াররা কোন পথে এগোবে। কামানের গাড়ি কী ভাবে নিয়ে গেলে বাংলার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ ফতেজং একদম সন্দেহ করবেন না। রসদ ফুরোলে রাজমহলের আগেই গঙ্গাতীরে কোথায় কী পাওয়া যাবে—তার বিশদ হিসেব।

দুই হাতি পিছনেই ছিলেন বেগম আরজুমন্দবানু। তিনি খবর করলেন, শাহজাদাকে একবার আসতে হবে।

এগোতে এগোতেই শাহজাদা হাতি ছেড়ে ঘোড়ার পিঠে সারা বাহিনীর এপিঠ ওপিঠ ঘুরে তদারকি করছিলেন। এই অবস্থাতেই তিনি একবার বেগমের হাতির পাশাপাশি এসে দাঁড়ালেন।

তখন বিকেল। জঙ্গল পেরিয়ে ফৌজ চলেছে একটা উঁচুমত টিলার পাশ দিয়ে। উঁচু নিচু ঘাসে ঢাকা মাঠে লাল রঙের গাই। কালো রঙেরও আছে। যতদূর দেখা যায়—গাঢ় সবুজের ভেতর লাল, কালো, ছাই রংয়ের গাই গরু। তার ভেতর মাঝে মাঝে কালো-উঁচু হাতি।

গাদেলার ওপর থেকে আরজুমন্দ বললেন, এবার আমরা আগ্রায় ফিরে যাই সবাই। দু'দুটো বর্ষা চলে গেল। বাদশার মোবারকে গিয়ে তাঁর ছেলে দাঁড়ালে তিনি কি ফিরিয়ে দেবেন—

হিন্দুস্থানের লম্বা বিকেল। তার আলোতে যেন আশার ছিটে ছড়িয়ে পড়েছে। শাহজাদা ঝলসে উঠলেন। কী বলছো বেগম! আমি এখন দরিয়া অব্দি সারা ওড়িশা কব্জায় আনতে পারবো। চাই কি সুবে বাংলার রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর অব্দি আমার তাঁবে আসবে। রাজমহলেই আমরা জয়ের মুখ দেখবো প্রথম।

আরজুমন্দবানু শাহজাদা খুররমের আশা-আকাঙ্ক্ষায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠা মুখখানা দেখলেন। কোনো কথা বললেন না। হাতির পিঠে গাদেলায় বসলে একটা দুলুনি আসে। দু'বছরেরও বেশি হয়ে গেল—হিন্দুস্থানের মাঠে ঘাটে এই গাদেলায় দুলতে দুলতে এগোনো যেন তাঁর অভ্যেসের ভেতর এসে গেছে। এই দুলতে দুলতে চলা—দারা জাহানারার নতুন নতুন জায়গায় নেমে তাঁবু গাড়ায় আনন্দ—রোশনআরা আওরঙ্গজেবের অজানা প্রান্তরে নেমে খেলাধুলো—সবই যেন কোনোদিনই শেষ হবার নয়। এইভাবেই জীবনটা চলে যাবে। ওই যে আশমান থেকে মেঘের তিনটে ঢেউ নর্মদার দিকে চলে গেছে—তা কি

চিরকাল ওখানেই থাকবে? ইনসানের জয়ী হবার নেশা কোনো কষ্টকেই কষ্ট মনে করে না। এই দু'বছরে শাহজাদার মুখখানা একদম পালটে গেছে। বিলোচপুর থেকে হটে আসার দিনই যে কালচে ছায়া পড়েছে খুর্রমের মুখে—তা যেন আজ এইমাত্র আরও গভীর লাগলো আরজুমন্দের। তিনি ঘোড়ার পিঠে বসা মানুষটির দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি যে আবার মা হতে চলেছি—

—তাই?—বলে হাসলেন শাহজাদা।

আরজুমন্দ সে হাসি মিলিয়ে যেতেও দেখলেন। সামনে সন্ধ্যা। আগে আগে দাখিলা, মুটেরা এগিয়ে গিয়ে এতক্ষণে সুবিধামত জায়গায় তাঁবু গেড়ে অপেক্ষা করছে। রসুইকাররা পাকশালায় এতক্ষণে রান্নাবান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পৌঁছেই যাতে খাবার পাওয়া যায়—শোওয়া বসায় যাতে কোনো অসুবিধে না হয়।

অন্য অন্যবার মা হবার কথাটা ভাঙতেই—আরজুমন্দ দেখেছেন—শাহজাদা খুর্রম আহ্লাদে আনন্দে আটখানা হয়ে পড়েন। জয়, সুখবর, সৌভাগ্য—এখনো কতদূরে জানি না। আমারই আব্বা হুজুর—শাহী উজিরে আজম আসফ খাঁয়ের বিলি ব্যবস্থায় মহাবত খাঁ, মির্জা আজিজ আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। অথচ আব্বা হুজুরের শলাপরামর্শ শুনেই তো শাহজাদা খুর্রমের এতদিনকার ওঠাবসা।

হেকিম আবদুল হাজি সিরাজিকে হাতের কাছে পেলে হতো। কোলের ছেলে আওরঙ্গজেবের ঘুম কম। প্রায়ই রাত থাকতে বিস্তরখানায় জেগে উঠে বসে থাকে। কিন্তু হেকিম সাহেব তো আগ্রা দুর্গে।

শাহজাদা খুর্রম এর ভেতর ঘোড়ার পিঠে আরও পেছনে চলে গেলেন। ধানুকীদের কাছাকাছি। ধানুকী, পদাতিক, বন্দুকচীরাই লড়াইয়ের শেষ ভরসা। ওরাই শেষ পর্যন্ত হাতাহাতি লড়াই করে জায়গা দখল করে।

এতদিন মার খেতে খেতেও এই লড়াকু মানুষগুলো শাহজাদাকে ছেড়ে যায়নি। এই প্রথম দূরে কোথাও যেন জয় অপেক্ষা করছে—এমন একটা কথা মনে হবার মতো অবস্থা হয়েছে। শাহজাদা নিজে ঘুরে ঘুরে সব খবর নিতে লাগলেন। তীর মারবার আগে দেখে নেওয়া দরকার বিষের মজুত কতটা। যদি একটানা দু'তিনদিন লড়াই চলে তো রান্নার সময় পাওয়া যাবে না। তাহলে দাঁতে কাটবার মতো চানা থাকা চাই হাতের কাছে। থাকা চাই গলা ভেজাবার জন্যে পানি। গর্ত খোঁড়ার খোন্তা। হাতাহাতি যুদ্ধের সময়কার হাত কুড়োল।

তিনদিনের মাথায় টানা কুচ্‌ করে শাহজাদা খুর্রমের ফৌজ ভোররাতে রাজমহলের দুয়ারে এসে পৌঁছলো। এতদিন খুর্রম তাড়া খেয়ে ফিরেছেন। এই প্রথম তিনিই আহম্মদ বেগকে তাড়া করে সুবে বাংলায় ঢুকে পড়লেন। সামনেই ভোরবেলার গঙ্গা। কোথাও যে যুদ্ধ হচ্ছে—হিন্দুস্থানকে দেখে বোঝার উপায় নেই কোনো। তবে ফৌজের পথে যেখানে যে গাঁ পড়ছে—মাণ্ডি পড়ছে—তা একদম শুনশান। মানুষজন কোথায় যে লুকিয়ে পড়ছে বোঝার

উপায় নেই।

বাংলার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ ফতেজং বয়সে বুড়ো হলেও সাহসী মানুষ। কারিতকর্মা। বাদশা জাহাঙ্গীরে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। ওড়িশার সুবেদার যেদিন সরকার রাজমহলে পা রেখেছেন—সেদিন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—শাহজাদা খুর্রম এলেন বলে।

গঙ্গাকে পেছনে রেখে তিনি তাঁর ঘোড়সওয়ারদের হারবল সাজাচ্ছিলেন। লোক-লশকর তেমন এসে পৌঁছয়নি বর্ধমান থেকে—রাজধানী ঢাকা-জাহাঙ্গীর-নগর থেকেও। তবে গঙ্গায় জঙ্গী নৌবহর রাখতে ভোলেননি সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ। তিনি রাজধানী থেকে এগিয়ে এসেই গঙ্গার গায়ে শাহজাদা খুর্রমকে আটকাতে চান। সামনেই বাংলায় ঢোকার পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে রাজমহল পাহাড়।

এতদিন শাহজাদা খুর্রম কোথাও দাঁড়াবার মাটি পাননি পায়ের নিচে। এই প্রথম। এই প্রথম তিনি যেন দেখতে পাচ্ছেন—তেমন একটা সুযোগ হাতের মুঠোয়। বাগী হলেও হতে পারে—এই সন্দেহে আব্বা হুজুর বাদশা জাহাঙ্গীর বড়েভাই খসরুর চোখে আকন্দের আঠা লাগানোর হুকুম দেন। আর আমি তো সরাসরি আগ্রার দিকেই গোলা দেগেছি। আমাকে হয় যুদ্ধ করে যেতে হবে—না হয় ধরা দিয়ে কয়েদে গিয়ে পপির শরবত খেতে হবে। এ কথাটা বোঝে না কেন আরজুমন্দ? এবারই আরজুমন্দ জানবে—তার শাহজাদা নেহায়েত নিকম্মা নয়। সে সত্যিই একজন শাহজাদা। বাদশা হবার মতোই শাহজাদা।

রোদ চড়তে না চড়তেই খুর্রমের হারবলের মুখে দারা খাঁ বাছাই দুই রিসালা ঘোড়সওয়ার নিয়ে সিধে বাংলার তোপখানার দিকে ছুটে গেল। এরা যে কিসের জোরে লড়ে খুর্রম ফিল-ই-জংয়ের পিঠে বসে উঁচু থেকে সব দেখতে দেখতেও কোনো হিসেবে মেলাতে পারছিলেন না।

বাংলার তোপগুলো সোজা শাহজাদার হারবলের মুখে পড়ে সওয়ার সমেত তুর্কি ঘোড়াগুলোকে শূন্যে তুলে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল। খুর্রম বুঝলেন, মহা বিপদ। এখুনি তাঁর ফৌজ ছত্রাখান হয়ে যেতে পারে।

দূরে অনেক পেছনে তখন তাঁবুর হাতায় খোলা মাঠে ওরা খেলছিল। অন্তত এক মঞ্জেল পেছনে। এক একটা গোলার আওয়াজে আরজুমন্দ কেঁপে কেঁপে উঠেছিলেন। আর দেখছিলেন, সে আওয়াজ কানে যেতেই তাঁর ছেলে-মেয়েরা এক একজন এক এক রকমভাবে তা নিচ্ছিল।

জাহানারা কানে আঙুল দিয়ে বসে পড়লো মাটিতে। আরেকটা গোলা বিকট শব্দ করে ফাটলো কোথায় দূরে। তার থ্যাতলানো ভারি আওয়াজে দারা চোখ ফিরিয়ে বড় বড় করে আশমানে তাকালো। সে তাকানোতে ভয় নেই। যেন কোনো গভীর চিন্তায় এই শব্দ সায় দিলো। যেন দারা বুঝতে পারছে—লড়াই হলে এমনই হয়ে থাকে। রোশনআরা এসব শব্দে নির্বিকার। নির্বিকার আওরঙ্গজেব। তাদের সকালবেলার খেলাধুলোয় কোনো দাগই পড়লো না।

বাংলার কামানের নলগুলোর মাথা এবার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ ফতেজংয়ের হুকুমে খানিকটা নামানো হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসা দারা খাঁয়ের সওয়ারদের ওপর আগুনের বৃষ্টি হতে লাগলো।

একসঙ্গে তিন চারজন করে ঘোড়সওয়ার গোলা ফেটে ছিন্নভিন্ন হয়ে ছিটকে পড়ছিল। ঘোড়ার মরণযন্ত্রণা—শূন্যে কোমর ভেঙে পড়া—দেখার মতো ভয়ঙ্কর সুন্দর—আবার কষ্টেরও।

দারা খাঁ দেখলেন—যে করেই হোক বাংলার তোপখানায় গিয়ে পৌঁছতে হবে। ওই নলগুলো ঠাণ্ডা না করতে পারলে সবাইকে সাবাড় হয়ে যেতে হবে। জনা কুড়ি ঘোড়সওয়ার নিয়ে খোলা তলোয়ার হাতে যখন ওঁরা তোপখানায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন—তখন পেছনে দুই রিসালা সওয়ারের বাকি কেউ আর জিন্দা নেই।

এরপর ব্যাপারটা হাতাহাতি। দূর থেকে সব দেখতে দেখতে হাতির পিঠে দাঁড়িয়ে উঠে শাবাসি দিলেন শাহজাদা খুর্রম। তখন বাংলার মীর আতশের কুশলী গোলন্দাজের সঙ্গে বাছাই ঘোড়সওয়ারদের নিয়ে দারা খাঁ জয় অথবা মৃত্যু—যেটা পাওয়া যায়—তাই খুঁজে নিচ্ছিলেন।

খুর্রমের হুকুমে তাঁর গোলন্দাজরা প্রথমেই তোপ দাগতে লাগলো গঙ্গায়। সেখানে ভেসে থাকা নৌকোরা পলকে উধাও হয়ে গেল। এবার তোপের মুখ নামিয়ে আনা হলো দুশমনের বুক বরাবর।

খুর্রম দেখলেন—দুশমনের পদাতিক সেপাই দারা খাঁয়ের কাঁধ এইমাত্র এফোঁড় ওফোঁড় করে দিলো। দারা খাঁ উল্টে পড়লেন। কিন্তু ততক্ষণে সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ ফতেজংয়ের সব ক'টা কামানই ঠাণ্ডা করে ফেলেছে বাকি ঘোড়সওয়াররা।

এবার খুর্রমের কামানগুলো দুশমনের ঘোড়সওয়ারদের ফিকা পর্দা ছিঁড়ে খুঁড়ে আদত হারবলের মুখে গোলা ফেলতে লাগলো। সূর্য মাথায়। ধুলো, ঘাম, রক্তে সে এক অদ্ভুত মিশেল। তার সঙ্গে ঘোড়া, উট, হাতির ঘেমো গন্ধ মিশে বাতাস ভার হয়ে এলো। বাতাস শুঁকে খুর্রম বুঝলেন—এটাই জয়ের গন্ধ—এটাই যুদ্ধের আসল গন্ধ।

সুবেদার ফতেজংয়ের ঘোড়সওয়াররা দিশেহারা হয়ে পড়লো। সুবেদার নিজে হাতি থেকে নেমে ঘোড়ায় উঠে ওদের মাঝখানে এসে পড়লেন। পড়েই কোমর বেঁধে সবাইকে একত্র করার জন্যে ছুটে ছুটে উৎসাহ দিতে লাগলেন। প্রায় ছত্রভঙ্গ বাংলার ফৌজ আবার যখন ঘুরে দাঁড়াবে দাঁড়াবে—সূর্য গঙ্গার ওপারে অনেকটা ঢলেছে তখন—ঠিক তখনই একজন ধানুকীর বিষ-তীর গিয়ে সুবেদার ইব্রাহিম খাঁয়ের গলায় বিঁধলো।

সুবেদার বুড়ো মানুষ। বাঁ হাতে তীরটা টেনে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। দিয়েই ঘোড়াসুদ্ধ তীরবেগে ছুটে আসছিলেন। শাহজাদা বুঝলেন—লক্ষ্য তিনিই। কয়েক বলগা ছুটেই ইব্রাহিম খাঁ ঘোড়ার ওপরেই অসাড়ে পড়ে গেলেন।

সুবেদারকে দেখতে না পেয়ে বাংলার ফৌজ এদিক ওদিক ছত্রাকার হয়ে গেল। ডুবন্ত সূর্যের সামনে গঙ্গার তীরে রাজমহলে শাহজাদা খুর্রম অনেক-দিন পরে জয়ের মুখোমুখি হলেন। বহুদিন পরে তিনি জয়ের সেই চেনা তীব্র গন্ধটা নাকে টের পেলেন। ঝাঁঝালো। কিন্তু বুকের ভেতর ঢুকে ঢেউ তোলে।

বাংলার অচল তোপখানায় দারা খাঁয়ের লাশ খুঁজে বের করতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। সেই রাতেই নিহত মুসলমানদের গোর দেওয়া শুরু হলো। দারা খাঁকে মাটি দেবার সময় খুর্রমও নিজে দু'মুঠো মাটি দিয়ে জানাজার সামিল হলেন

নিহত হিন্দুদের গঙ্গার তীরে দাহ করা হচ্ছিল। সে কাজ দেখছিলেন—ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সর্বেসর্বা ভীম শিশোদিয়া। কাঠের আগুনে ভীমের গালপাট্টা সমেত মুখখানা ভয়ঙ্কর লাগছিল। জানাজা সেরে শাহজাদা খুর্রম ভীমের সামনাসামনি হলেন।

বাতাসে এখনো সারাদিনের গরম। সেই গরম মালুম হচ্ছিল—দাহের আগুনের শিখার এদিক ওদিক ঢলে পড়ায়—আবার ফিরে ফিরে উঠে দাঁড়ানোয়।

শাহজাদাকে দেখে ভীম শিশোদিয়া কুর্নিশ করলেন ঝুঁকে। তারপর বললেন, এবার আপনার মোবারকে দুই সুবা—বাংলা আর ওড়িশা—

—রাজধানী কোথায় থাকবে?

—কেন মালিকে মুলুক? যেখানে আছে—ঢাকা-জাহাঙ্গীরনগরেই রাজধানী থাকবে। হামলা করতে হলে গাদাগুচ্ছের নদী পেরিয়ে তবে হামলা করা যাবে! ওখান থেকেই আপনার শাহী ফরমান বেরোবে—

—মোটে দুই সুবা নিয়ে কি শাহী জমে! আকবর বাদশার বাদশাহী ছিল পনেরো সুবা নিয়ে—

—শুরুতে তো তা হয়নি শাহজাদা। বাবর-শাহী শুরুতে কী ছিল হজরত? ধীরে ধীরে আপনার শাহীও আগ্রা পেরিয়ে কান্দাহার অব্দি ছড়িয়ে পড়বে।

—পড়বে বলছেন ভীম শিশোদিয়া? আপনারা সহায় থাকলে হয়তো তাই হবে।—বলতে বলতে শাহজাদা খুর্রম তাঁর পেয়ারের ফিল-ই-জং-এর হাওদায় গিয়ে উঠলেন। অমনি রাতের অন্ধকারে গলঘণ্ট দোলাতে দোলাতে হাতি চললো। আশমানে তারা। পায়ের নিচে দুই সুবা। সামনে পেছনে কোনো আতঙ্ক নেই। এখুনি মহাবত খাঁ কিংবা মির্জা আজিজ শাহজাদাকে ঘাঁটাবেন না।

নিশ্চিন্ত খুর্রম যখন তাঁবুর সামনে এসে নামলেন—তখন রাত বেশ গভীর।

একটা দুটো সুবা মাঝে মধ্যে বিগড়েই থাকে হিন্দুস্থানে। কখনো বান

—কখনো বা অজন্মা। তাছাড়া আছে হঠাৎ হঠাৎ সুবেদারদের সাপের পাঁচ পা দেখা। আগ্রা থেকে অনেকদূরে সুবার রাজধানীতে বসে সুবেদারদের মনে হতেই পারে—আল্লার পরেই তারা সুবার তাবত মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। বাদশাকে হাসিল উশুল করে পাঠিয়ে দেবার পর আগ্রা বড় একটা পেছন ফিরে কিছু ঘেঁটে দেখে না সুবায়।

আগ্রা দুর্গে বাদশা জাহাঙ্গীর তাই দর্শন ঝরোকায় যেমন নিত্য সকালে দর্শন দিতে দাঁড়াচ্ছিলেন—তেমনই সিরাজির সঙ্গে কাবুলি পিচ দিয়ে ফি সন্ধ্যায় তেষ্টা মিটিয়ে দিব্যি ফারসি রুবায়-ই আর সেই সঙ্গে সুন্দরীদের নাচ চেখে চেখে দেখছিলেন।

চিন্তিত শুধু দুই ভাইবোন। বোন নূরজাহানের আক্ষেপ—খুর্রমকে এখনো বন্দী করা গেল না? ভাই আসফ খাঁয়ের একমাত্র ভাবনা—দামাদ কি আর কোনোদিন জয়ী জঙ্গীর বেশে আগ্রায় ঢুকবে না?

বেগম নূরজাহানের আক্ষেপের কোনো ঢাকা চাপা নেই। এ ব্যাপারে তিনি বসেও নেই। আর উজিরে আজম আসফ খাঁ বাদশার দরবারে বসে ভুলেও খুর্রম কথাটি মুখে আনেন না।

বাকি আগ্রা আগ্রাই চালে চলছিল। সেখানে কেউ জাগে ভোরের আজানে। কেউ ঘুমোতে যায় শেষরাতে মুজরো সেরে। রাজা কি মাণ্ডিতে চবুতরা বা লালচকের চেয়ে শীত যেন বেশি পড়ে। জানলায় জানলায় ভারি পর্দা। তাতে গাহেকের আরাম। যে গায় তারও আরাম। কেননা, বাইরে পাথুরে গলি থেকে ঘোড়ায় টানা গাড়ির ঘরঘর ওপরে উঠে গানের সঙ্গে মিশতে পারে না।

তবু এক একদিন কোনো কোনো গান পর্দা ছাপিয়ে রাজা কি মাণ্ডির সরু গলির আকাশে ভাসতে থাকে। ভোর রাতে ঘুম ভেঙে গেল আগ্রাওয়ালি রেহানার। দারুণ রেওয়াজি গলায় বিলাসখান গাইছেন—

তুসে নাহি বলুঁ-উ-উ

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একই কথা। তুসে নাহি বলুঁ-উ-উ

ভৈরবী। কিন্তু সামান্য হেরফেরের লীলা। হঠাৎ নিজের ঘরের কোণে চোখ পড়ে গেল রেহানার। তার মুজরোর গালিচায় একটি শিশু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বড় আরামে। দামি তুষের নিচে।

টোড়ির সঙ্গে একটু একটু করে ভোর হচ্ছিল। শেষ রাতের বৃষ্টি ধরে এলো। মাখন-মিছরির ফেরিওয়ালারা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। বিলাসখান যমুনার দিককার জানলা খুলে দিয়ে গলা সাধছিলেন। এখান থেকে যমুনা দেখা যায় না। কিন্তু জানলার দিকেই যমুনা ভেবে নিলে গাইতে সুবিধা হয়। নিজের ছোটবেলায় দেখা আগ্রার চেয়ে এখনকার আগ্রা অনেক ঘিঞ্জি হয়ে গেছে। দম ফেলা যায় না।

কে যেন দরজা খটখট করলো। একবার নয়। দু'দুবার। মহা বিরক্ত হয়ে বিলাসখান থামলেন। কোঠাবাড়ির সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন তিনি। দরজা খুলতেই থমকে গেলেন বিলাসখান। সারা রাত বৃষ্টির পর আগ্রায়

তখনো ভালো করে ভোর হয়নি। একটু আগে কোতোয়ালের রাত পাহারার ঘোড়সওয়াররা রাস্তা কাঁপিয়ে ফিরে গেছে। বিলাসখানের সামনে এখন বোরখায় ঢাকা এক জেনানা দাঁড়িয়ে।

আগ্রায় নামি দামি মানুষদের চলতি রেওয়াজ—রাজধানীর বাইরে কোথাও গেলে নেশায় বা ঝোঁকের মাথায় দুম করে নিকা করে বসা। সেই সব নিকার আওরতরা মাঝে মধ্যে রাজধানীতে এসে বেগমের অধিকার দাবি করে। তাই নিয়ে হই-হুজ্জত, কেলেঙ্কারি লেগেই থাকে। কাজীর বাড়ি গিয়ে মাসোহারার পাওনাগণ্ডা স্থির করে তবে তাদের কেউ কেউ রাজধানী ছাড়ে। কোনো কোনো আওরত মিথ্যে দাবি করেও আশরফি, দামড়ি হাতিয়ে থাকে।

বিলাসখান গোড়াতেই বলে নিলেন, দ্যাখো বাপু—এখন আমি গাইছি। কী চাই? কত চাই? তাড়াতাড়ি বলে ফেলো। থাকলে দিয়ে দিচ্ছি। নইলে বিদেয় হও—এমন সুন্দর সকালটা মাটি করে দিও না—

বোরখার ভেতর থেকে আওরত কোনো কথা বললো না।

বিলাসখান বুঝলেন, এ বড় সেয়ানা জেনানা। মোটা দাঁও মারতে এসেছে। বললেন, আমায় রেহাই দাও না। আমি বুড়ো হতে চলেছি। সারা জীবন গানবাজনা করে এ-বয়সে কি আর শাদি করা সম্ভব!

বলেই ঘুরে ওপরে উঠে আসবেন বিলাসখান। পারলেন না। বোরখার ভেতর থেকে আওরত আচমকাই তুসে ঢাকা একটা ঘুমন্ত বাচ্চা বের করে একদম বিলাসখানের পায়ের ওপরেই শুইয়ে দিলো। আপনার কদমে জমা দিলাম হুজুর—

—তোবা! তোবা! আমি বাইরে কোথাও কোনো নিকাই করিনি তো বাচ্চা পয়দা হবে কোত্থেকে?—এখুনি সরাও বলছি। কোথায় একটু গলা ছেড়ে গাইবো—তা নয় ভোরবেলাতেই যত ঝামেলা। নাও—কত চাই?—বলে মিরজাইয়ের ভেতর থেকে হাতে যা উঠলো তাই ওই আওরতের সামনে মেলে ধরলেন বিলাসখান।

—হুজুর। আমি কিছুই চাইতে আসিনি। আপনি ওস্তাদ তানসেনের ছেলে। সবসময় আমাদের মতো মেয়েদের জন্যে তিনি দাঁড়িয়েছেন—

—তুমি কে?

—আমি এই রাজা কি মাণ্ডির গানেওয়ালি—রেহানা—

—ওঃ! তা তোমার এ বাচ্চা?

—আমার নয় ওস্তাদ। আমি তওয়াইফ ঘরানার আওরত। এ হলো গিয়ে এক হিন্দুর বাচ্চা।

—হিন্দুর? তো তোমার কাছে?

যা ঘটেছিল—তাই বললো রেহানা। শেষে বললো, জন্ম দিয়েই ওর মা আমাদের সিঁড়ি-ঘরেই মারা যায়। এই মাসুম বাচ্চাকে আমার কাছে তো আর রাখা যাচ্ছে না—কে দেখবে? কার কাছেই বা দেবো? শুনেছি—ওস্তাদ তানসেন আমাদের মতো আওরতদের জন্যে সব সময় সামনে এসে দাঁড়াতেন।

আপনি তাঁরই ছেলে। তাই—

আগ্রা জেগে উঠছিল। বিলাসখান কী ভাবলেন একবার। বললেন, আমি তো এখানে সময় গুজরানে আসি।

—সে কথা জানি হুজুর।

—যে-জেনানার এ কোঠাঘর—তিনি তো—

—বড়ে গানেওয়ালি ছিলেন একসময়। সবই শুনেছি হুজুর। রাজা কি মাণ্ডিতে ওঁর গানের খুশবু সারা আগ্রায় ছড়িয়ে পড়তো একসময়।

—তা সে জন্নত বাই আজ ক'বছর তো বিস্তারা ছেড়ে উঠতেই পারেন না। বাতে কষ্ট পাচ্ছেন। আমি বসে বসে গান শোনাই।

—সে-গানই আমরা শুনতে পাই হুজুর—

—এক কাজ করো রেহানা—ওকে শাহী এতিমখানায় দিয়ে এসো। আমি বলে দেবো। দেখভাল হবে ঠিকমত। আমার এখানে কে দেখবে ওকে?

—না ওস্তাদ। এতিমখানায় দেবো না। জেনানা বাচ্চা—একটু বড় হতেই এতিমখানায় শয়তানরা ওকে কাবুল নয়তো খোরাসনের ব্যাপারিদের কাছে বেচে দেবে—

—তা আমি কোথায় রাখবো? এখানে জায়গা কোথায়?

—আপনি অনেককে জানেন। আপনার নিজের দৌলতখানায় রাখতে পারেন। এক কোণে পড়ে থাকবে আপনার নিজের বাড়িতে। জানি—সেখানে কেউ ওর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। মাসুম—নাদান বাচ্চা—

—হিন্দু যে ও—তা বুঝলে কী করে?

—ওর মায়ের হাতের কবচে লেখা ছিল—লছমি। কবচটা ওর গলায় লটকে দিয়েছি।

বিলাসখান লম্বা মানুষ। মাথাটি কাঁচাপাকা। একটু ঝুঁকে তুসের ভেতর ঘুমন্ত শিশুর দিকে তাকালেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হয়তো কোনো আনন্দের—কিংবা ভয়ের—বা দুঃখের খোয়াবে মাসুম বাচ্চাটি বুঁদ হয়ে আছে। ও জানেও না—আগ্রা কী জিনিস! ইনসান কতটা বেদরদি হতে পারে।

গাঢ় গলায় তিনি বললেন, আমার কোলে তুলে দাও—

আগ্রাওয়ালি রেহানা সে কণ্ঠস্বর শুনে মনে মনে তারিফ করলো। কী ভরাট। কী সুরেলা। কথার দানাই যে এত মিঠাজ হতে পারে মানুষের তা আগে জানা ছিল না। নিচু হয়ে সে তুস সমেত শিশুটি তুলে বিলাসখানের বাড়ানো হাতে জমা দিলো। হুজুরের হাতের পাতা দু'খানি লম্বা লম্বা।

বাচ্চাটা জমা দিয়েই রেহানার চোখ ছলছল করে উঠলো। এই ক'মাসে একটা মায়া পড়ে গেছে। পলতে ভিজিয়ে দুধ খাইয়েছে রেহানা। তার নিজের বুকে দুধ আসে না। কোনোদিন আসবেও না। সে তওয়াইফ ঘরানার আওরত যে! বিলাসখানের কোলের ভেতর ঘুমন্ত অবস্থাতেই একটা মোচড় খেল বাচ্চাটা। আরামের মোচড়। ঘুমের মোচড়।

পেছন ফিরেই এক ছুট্টে আগ্রাওয়ালি রেহানা রাজা কি মাণ্ডির গলি

পেরোলো। এখনো বৃষ্টিতে গলির পাথর ভিজে। ছুটে সে নিজের কোঠা-ঘরের সিঁড়িতে এসে ধপ করে বসে পড়লো। এমন মাসুম বাচ্চা এতিমখানায় বড় হতে হতে যদি বিক্রি নাও হয়ে যায়—বয়সকালে কোনো হিন্দু দালালের খপ্পরে গিয়ে পড়বেই পড়বে। ওদের আড়কাঠি আগ্রার গলিতে গলিতে ছড়ানো। সেই গোলকুণ্ডা থেকে রাওয়ালপিণ্ডি অব্দি। সব জায়গায় ওদের জাল বিছানো। তখন জওয়ান বয়সে হিন্দুর পাতুরিয়া ঘরানায় ঠিক ওকে ঠেলে দেওয়া হবে। আমারই মতো কোনো পিপুল গাছের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে নাকের নথ খসাতে হবে।

তার চেয়ে এই অনেক ভালো হলো।

।। সতেরো ।।

আব্বা হুজুরের ফৌজে কত রকমের সেপাই লশকর—তার একটা আন্দাজ এখন সুলতান মহম্মদ দারাশুকোর হয়েছে। সেপাই সান্ত্রীর মাথায় কয়েকজন সেনাপতির নামও এখন তার মুখস্থ। শের খাঁ, ভীম শিশোদিয়া আব্বা হুজুরের মন-পসন্দ লড়াকু। আরও অনেক অনেক।

ইরাকি সওয়াররা হামলায় যাবার আগে তাদের ঘোড়ার হাঁটুতে নীল রং মাখায়। চাঘতাই তুর্কি পায়দল লশকরদের কারও কারও সঙ্গে আদরের উজবেক কুকুর থাকবেই। আফগান বন্দুকচীরা সন্ধে হলে তাঁবুর সামনে বসে লম্বা তারানা বাজায়—সঙ্গে গান। খোরাসান—বলক্ বাদাকশানের তাগড়া সেপাইরা খুব ফুর্তিবাজ। বেশ কয়েক মঞ্জেল কুচ করার পর নাচবেই। ইরানি আর রাজপুত গোলন্দাজরা রীতিমত গুরুগম্ভীর। সেই তুলনায় দক্ষিণী ইসমাইলি ধানুকীরা যে কোনো সময় তর্ক জুড়ে দিতে পারে। কী যে বলে—বুঝতে পারে না দারা—কিন্তু তর্ক করতে করতে ওদের মুখগুলো ছুঁচলো হয়ে ওঠে।

গুলেবকাওয়ালির কহানির চেয়েও ফৌজি ছবিটা অনেক বেশি রংদার। অনেকটা এই বিশাল হিন্দুস্থানের মতোই।

দারাশুকো একা একাই কর গুনে এখন হিন্দুস্থানের দশটা নদী—দশটা পাহাড়ের নাম বলতে পারে। পারে পাঁচ কিসমের হাতির নাম বলতে। চাররকম উট। ছয় জাতের ঘোড়ার নাম।

কোথায় সেই হেলমন্দ—আর কোথায় ব্রহ্মপুত্র। সাতপুরা পাহাড়, বিন্ধ্যাচল, রাজমহলের পাহাড়। শোণ, কোশী, গঙ্গা। তাদের নানান ধারা হিন্দুস্থানের শরীরে শিরার মতো ছড়ানো। তমসা, কমলা-বালান, গণ্ডক, গোমতী, ঘর্ঘরা, সরস্বতী, বৈতরণী—আরও কত কত। আবার একই নদীর এক এক জায়গায় এক একরকম নাম। আগ্রা দুর্গে ফিরে গিয়ে মক্তবে বসে দৈলেমি সাহেবকে এসব কথা বলে তাক লাগিয়ে দিতে হবে।

রোহতাস দুর্গের হপ্তচৌকির সামনে দুপুরবেলা পাহারা বদল হচ্ছিল। দুর্গের খোলা চত্বরে পাথরের উঁচু দেওয়ালের কানাতে থুতনি চেপে দাঁড়ানো

দারা বড় বড় চোখে তাকিয়ে। আর মনে মনে এসব ভাবছিল।

দারার অনেক পেছনে একটা দীবানে আধশোয়া হয়ে রয়েছেন আরজুমন্দ। তাঁর পাশে সুখদোলায় শুয়ে একটি শিশু। ওদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শাহজাদা খুর্‌রম। বাইরে রোদের তাপ কমে এসেছে ইদানীং। দুর্গের চারদিকের চওড়া নালা কাছেরই নদীজল দিয়ে ভরাট করা। শীত আসবে বলে রোদের নিচে একটা ফিনফিনে বাতাস সব সময় টের পাচ্ছিলেন আরজুমন্দ বানু। দূরে দাঁড়ানো বড় ছেলেকে দেখে বললেন, দারার এখন দশ হলো—

সেদিকে তাকিয়ে খুর্‌রম বললেন, সবসময় তুমি দারা দারা করো।

—মহম্মদ দারাশুকো যে আমাদের প্রথম ছেলে শাহজাদা—

খুর্‌রমও কোনো কথা বলতে পারলেন না, এবারে দু'জনই একসঙ্গে তাঁদের ছেলের দিকে তাকিয়ে। ছেলের মাথা-পিঠ, দাঁড়াবার সিধে সবল ভঙ্গি বাবা মায়ের মনে একই সঙ্গে তৃপ্তি, সুখ, গর্ব এনে দেয়।

—রোহতাস দুর্গে এখন কোনো শব্দ নেই। দূরে খোলা প্রান্তরে ইরানি সওয়াররা তাদের ঘোড়াদের চান করাচ্ছে। দুধ সাদা কেশর ওড়ানো এক একটা ঘোড়াকে কিছুতেই বাগ মানানো যাচ্ছে না। তারা সওয়ারের হাত ছাড়িয়ে ছুটে ছুটে যাচ্ছিল। আবার বাগে আসছিল।

সেদিকে তাকিয়ে শাহজাদা খুর্‌রম বললেন, আমাদের নয়া মেহমানের দিকে তাকাও একবার বেগম!

আরজুমন্দ সুখদোলায় ঘুমন্ত ক'দিনের শিশুর দিকে তাকালেন। মুরাদ বকস্! এখনো তুমি জানো না—কোন্ দুনিয়ায় এলে!

—ওর দুনিয়া এখন তুমি।

—আমি মা শাহজাদা। আমি আর কতদিন পাবো ওদের! তোমার খুন ওদের শরীরে। চাঘতাই মুঘল প্রতিভা নিয়ে যেদিন ওরা ঘোড়ায় উঠবে—পায়ের নিচের দুনিয়া কাঁপাবে—তখন আমি কোথায় সরে যাবো! আমার শরীর দিয়ে ওদের তৈরি করি—হাঁটতে শিখে ওদের শরীর আলাদা হয়ে যায়—

—কোথায় সরে যাবে বেগম? এই তো সবে আমার নসিব খুলতে শুরু হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর থেকে পাটনা অব্দি এখন আমাদের পায়ের নিচে। তমসার তীরে শের খাঁ, ভীম শিশোদিয়া ঘোড়সওয়ারদের নিয়ে হারবল সাজিয়েছে। মহাবত খাঁ, শাহজাদা পরভেজকে হামলার পর হামলা দিয়ে ব্যস্ত রাখা হবে। সেই সুযোগে আবদুল্লা খাঁ ওদের চোখে ধুলো দিয়ে ডান দিকে এগিয়ে যাবে। আমি লশকর নিয়ে এগোবো বাঁ দিকে। তাহলে সহজেই এলাহাবাদ, অযোধ্যা হাতে এসে যাবে বেগম। তখন আগ্রা আর কতটুকুই বা দূরে—

শুনতে শুনতে বেগম আরজুমন্দ বানু কেঁপে উঠলেন। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন—শাহজাদার অমন গভীর চোখ আগামীদিনের সব জেতা লড়াইয়ের স্বপ্নে গোল গোল হয়ে উঠেছে। আগেকার সেই সুন্দর, শান্ত মুখশ্রী কোথায় হারিয়ে গেছে। সে মুখে এখন অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার জেদ। সেই

জেদে—সেই স্বপ্নে কপালে—চোখের নিচে কয়েকটি রেখা বেঁকে কুঁচকে আসছিল কথা বলতে বলতে তেতে ওঠার সময়।

—আপনি শাহজাদা জাহাঙ্গীরনগর থেকে আগ্রা—আগ্রা ছাড়িয়ে দিল্লি, লাহোর, মুলতান, কাবুল অব্দি আপনার পায়ের নিচে আনতে চান—

—হাঁ বেগম। হ্যাঁ। তামাম হিন্দুস্থান দেখবে একদিন তোমার শাহজাদারই ইচ্ছা হয়ে দাঁড়াবে।

—তাই ?

—হ্যাঁ বেগম। সেদিন আর বেশিদূরে নয়—

—বুঝেছি শাহজাদা! বুঝেছি!

এখন অব্দি সবচেয়ে ছোট ছেলে—মুরাদ বকস্ দুনিয়ায় এসেছে সাতদিনও হয়নি। আজই সবে বাইরে এসে বসেছেন আরজুমন্দ বানু। বসেই এ কী কথা বলছেন আরজুমন্দ ? এ কী ভঙ্গি ? কোনোদিন তো আরজুমন্দ আমার লড়াই, হামলার চিন্তা ভাবনার শরিক হয় না। বরং ওসব বুঝতেই চায় না। আজ এ কী শুনছি তার মুখে ? তবে কি আরজুমন্দ বদলে গেল ? আমার খোয়াব কি আরজুমন্দও দেখছে ?

খুশিতে, আনন্দে শাহজাদা খুর্রমের চওড়া বুক ভেতরে ভেতরে ঢেউ হয়ে উঠলো। তুমি আমার পাশে থাকলে জয় আমার হবেই। একদিন তুমিই হবে হিন্দুস্থানের বাদশা-বেগম—

—আমি তো আপনার পাশে পাশেই আছি শাহজাদা!

কৃতজ্ঞ খুর্রম তাঁর ডান হাতখানি আরজুমন্দের কাঁধে রাখলেন। তুমি সঙ্গে থাকলে আমি সব পারি।

—শুধু বেগম আর বাদশা-বেগমে ফারাক কোথায় ? দু'জনেই তো সেই একই বেগম!

—ইনসাল্লা! ফারাক নেই আরজুমন্দ ? আমি বাদশা হলে তার শাহী শান রওনক তোমাকেও ঘিরে রাখবে। হিন্দুস্থানের গৌরব, জলুসের ফোয়ারা হবে তুমিই বেগম—

—ওঃ! এই কথা। আপনি এখন বলতে পারেন শাহজাদা—আপনার মেয়েরা—জাহানারা, রৌশনআরা কোথায় ?

—নিশ্চয় তারা নিচের বাগে খেলছে।

—আপনার বড় ছেলে দারাশুকো—ওই যে একা আনমনে দাঁড়িয়ে—

—হ্যাঁ বেগম।

—আপনার মেজো ছেলে সুজা তার দাদা সাহেবের কাছে রয়েছে।

—সেখানে সে আদরেই থাকে বেগম।

—আদর আর দেখাশুনো এক জিনিস নয় শাহজাদা। যে-মন দিয়ে আপনি লড়াইয়ের জঙ্গী হাতির তত্ত্বতাবাস করেন—তার কতখানি দিয়ে আপনি আপনার সেজো ছেলে আওরঙ্গজেবের খবর রাখেন ? সেও তো বছর সাতেক হলো। সে কোথায় এখন ?

—নিশ্চয় দিদিদের সঙ্গে খেলছে—

—নিশ্চয় !—বলে এমন হাসি হাসলেন আরজুমন্দ—যা দেখে খুর্রমের মনে হলো—বেগমের ঠোঁট বেঁকে যাচ্ছে।

—এখন ওদের মক্তবের সময়—। বড় হলে আপনার প্রতিভা—আপনারই চরিত্র ওদের ভেতর থেকে ফুটে উঠবে। ওরা তাঁবুতে সুখদোলায় ঘুমোচ্ছে। খেলছে—যেখানে আপনার তাঁবু পড়ছে—তার হাতায়। হিন্দুস্থানের মাঠ-পগার পেরিয়ে যাচ্ছে হাতির পিঠে গাদেলায় বসে দুলতে দুলতে। আর আপনি বুঁদ হয়ে আছেন মসনদের খোয়াবে। হাতি সাজাচ্ছেন। ঘোড়া সাজাচ্ছেন। তোপ বসাচ্ছেন। নিশ্চিত জানেন না—আপনার মেয়েরা এখন কোথায়! আপনার সেজো ছেলে কোথায় !

—আকবর বাদশাকেও শাহী রাখতে গিয়ে বনে বনে ঘুরতে হয়েছিল। ঘুরেছেন হুমায়ুন বাদশাও। জঙ্গলে-পাহাড়ে—মাঠে প্রান্তরে লড়াই করে।

—আমার মতো শাহজাদা ? চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ? দিনের পর দিন ? আড়াই বছর ধরে ? নসিবের ওঠা পড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ?

খুর্রম সঙ্গে সঙ্গেই কিছু বলতে পারলেন না। তারপর খুব শান্ত গলায় বললেন, জিন্দা দুনিয়া—তার গাছপালা, ইনসান, নদী-পাহাড়-প্রান্তর নিয়েই আল্লার সবচেয়ে বড় মক্তব। সেই মক্তবেই বাদশা আকবরের সবকিছু শেখা। সেই মক্তবের পড়ুয়া বলেই হুমায়ুন বাদশা তাঁর হারানো মসনদ ফিরে পেয়েছিলেন। তোমার ছেলেমেয়েরাও এই জিন্দা মক্তবের পড়ুয়া। ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েও ওদের লাভই হবে। কোনো ক্ষতি হবে না আরজুমন্দ।

—ক্ষতি হবে না শাহজাদা ? নিজের আব্বা হুজুরের সঙ্গ না পেলেও কোনো ক্ষতি হবে না ছেলেমেয়ের ?

—ওরা ওদের মাকে তো পাচ্ছে বেগম।

এরপর কথা বললেন না আরজুমন্দ। একটানা কথা বলে তাঁর বুক কাঁপছিল। তাঁর চোখের সামনে প্রান্তরের ওপর দিয়ে তোপখানার বেলদার বাহিনী চলেছে। কাঁধে কোদাল। এরা দরকার মতো রাতারাতি সুড়ঙ্গ কেটে ফেলতে পারে। হঠাৎ আরজুমন্দ বানু ঘুরে তাকালেন শাহজাদা খুর্রমের দিকে।

—শোনো।

খুর্রম বেগমের চোখে চোখ রাখলেন। ক্লান্ত—শান্ত সে চোখ। হেকিম আবদুল হাজি সিরাজি অনেকদিন আগেই বলেছিলেন—বেগমের আর মা না হওয়াই ভালো। গত কয়েক বছর শাহজাদা শুধু উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, সংশয় আর অজানা ভবিষ্যতের সরু একটা রেখার ওপর দিয়ে হেঁটেই চলেছেন। যে কোনো মুহূর্তে সেখান থেকে পিছলে পড়তে পারেন। এই আতঙ্ক থেকে—এই দুটি শান্ত চোখের নিচে তিনি প্রতি রাতে আশ্রয় চেয়েছেন। আগ্রা দুর্গে আরজুমন্দ বৈ অন্য কোনো আশ্রয় নেই। ছিল না। গত প্রায় তিন বছর হিন্দুস্থানের পথে প্রান্তরে—দিনে রাতে শাহজাদা একমাত্র আশ্রয় পেয়েছেন যেখানে—

সেখানকার নাম আরজ্‌মন্দ বানু। তাই আরজ্‌মন্দকে আবারও মা হতে হলো।

বেগম বললেন, শুধু মাকে পেলেই হলো! আপনি ওদের দুনিয়ায় এনেছেন। আপনার জেদ, সাহস, অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার নির্ভুল চাঁদমারি সমান ছক কষে এগোনোর স্বভাব ওরা তো পাবেই শাহজাদা।

—আমি জানি না বেগম—আমি কেন অস্থির। আমি কেন সারাদিন ধরে ঘোড়া দাবড়ে সারা রাত বসে তোপখানার গোলাগুলো তৈরি রাখার নেশায় বুঁদ হয়ে যাই। আমার ভেতরে কী আছে জানি না। হয়তো দারা—হয়তো আওরঙ্গজেব—কোনোদিন বা ওই শিশু মুরাদের ভেতর আমার এই জেদ—সাহস ওদের বয়সকালে ফুটে বেরোবে—

বলতে বলতে শাহজাদা খুর্‌রম জোর কদমে কয়েক পা হেঁটে বড় ছেলে দারাশুকোর কাছে চলে এলেন। তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, কাল তুমি আমার সঙ্গে জং-কি-ময়দানে যাবে—

—সত্যি আব্বা হুজুর?

শাহজাদা কোনো কথা বললেন না। তিনি মন দিয়ে সুলতান মহম্মদ দারাশুকোকে দেখতে লাগলেন। চওড়া কাঁধ। বেশ দীঘল কাঠামো। বয়সকালে খুব সুন্দর দেখাবে দারাকে। চোখ দুটি খুবই ভাবালু।

যে-পথ দিয়ে ফৌজ যায়—সে-পথের দু'ধারের বসতির মালুম হয়—হ্যাঁ, ফৌজ যাচ্ছে। বাকি হিন্দুস্থান জানেও না—কে কোথা দিয়ে এগোচ্ছে—বা হটে আসছে। তবে চৌধুরী গয়ানাথ বা আর পাঁচজন ফৌজি ঠিকাদার ঠিকই লড়াইয়ের খবর রাখে। না রাখলে রসদ যোগানো যায় না সময়মত।

পাখিরা গাছে। নদীতে মাছ। মাটিতে মানুষ। সবকিছুই আগের মতো চলছে। এর ভেতর শাহজাদা পরভেজ দিনে দশ মঞ্জেল কুচ্‌ করে এগিয়ে আসছিলেন। তার পাশে তাঁর আতালিক—মুরুব্বি সমান মহাবত খাঁ।

দক্ষিণে শাহজাদা খুর্‌রমকে হারাবার পর আগ্রার হুকুমে শাহজাদা পরভেজ এখন চল্লিশ হাজার ঘোড়সওয়ারের মনসবদার। এক লাফে চল্লিশ হাজার সওয়ারের এই ইজফা পেয়ে শাহজাদা পরভেজ যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। এখন আগ্রায় প্রশ্ন একটাই। সরাইখানায়, গানেওয়ালির মুজরোর পর শুনিয়েদের মাইফিলে, মান্ডিতে মান্ডিতে একটি প্রশ্ন নিয়েই চর্চা হয়ে থাকে। সেসব কথা মহাবত খাঁয়ের কানেও এসেছে। কথাবার্তা অনেকটা এই ঢঙে এগোয়—

—আকবর বাদশার আমলে চুয়া-চন্দনে যে সুবাস থাকতো—তা আর পাওয়া যায় না আজকাল।

কিংবা, শাহী তোপখানায় এবার ফিরিঙ্গি যা এসেছে না—সে এমনই তোপ দাগে যে, হারবলের ভেতর ঠিক জঙ্গী হাতির কপালে চাঁদমারি করে দিতে পারে।

কেউ বা বললো, বরফ গলে যাবার পরেই ইস্পাহানের সফাবি বাদশা এবার কান্দাহার দুর্গ আক্রমণ করছেন।

আবার এমনও কেউ হাসতে হাসতে বললো, জানেন তো—আগ্রা দুর্গে এক উজবুক উজবেকি মনসবদার এসেছেন—তিনি এমনই গেঁয়ো যে, কচি দাগমুণ্ডী ভেড়ার ক্বাথ ফেলে দিয়ে বর্কার ছাগলের গোস্ত দুনিয়াজা আদর করে খাচ্ছেন! বুঝুন ব্যাপারটা!

এইসব কথার ওপরই গম্ভীরভাবে আলোচনা জমতে থাকে। অনেকটাই এই পথে—বাদশা জাহাঙ্গীরের তো বয়স হচ্ছে। ভোগে সুখে থাকায় তিনি আকবর বাদশার মতো অতদিন তো আর দুনিয়া রোশন করার সুযোগ পাবেন না। তাহলে?

তার মানে তারপর কে? কে বাদশা হবেন তখন? এখানে এসে কথাবার্তা খাদে নেমে আসে। বাদশা জিন্দা থাকতে—আবার কারও নাম বাদশাহীর জন্যে বলাও গুনাহ্।

সেই চাপা আলোচনায় আগে শোনা যেতো একটি নাম। শাহজাদা খুর্রম। এখন শোনা যায় আরও একটি নাম—শাহজাদা পরভেজ। বাগী খুর্রমকে পরভেজ তাড়া করে চলেছেন—এ খবর লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ায় ইদানীং পরভেজের নামটা নিয়েও মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে কথা হচ্ছে। জাহাঙ্গীরের পর কে? পরভেজ? না, খুর্রম?

এই জন্যে? না, চল্লিশ হাজার ঘোড়সওয়ারের ইজফা পাওয়ায় আগেকার—সেই পরভেজ এখন আর নেই। পাশাপাশি ঘোড়ায় ছুটতে ছুটতে মহাবত খাঁ দেখছিলেন—কোনো ক্লান্তি নেই শাহজাদার—স্বচ্ছন্দে হাতির পিঠে গাদেলায় গড়িয়ে গড়িয়ে যেতে পারতেন যে মানুষ—তিনি যাচ্ছেন আর পাঁচজন ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে সঙ্গে একটা সাধারণ ইয়াবু ঘোড়ার পিঠে চেপে। আসলে খুর্রমের মুখোমুখি হওয়ার আগে নিজের তাঁবের ফৌজকে পরভেজ চাঙ্গা করতে তুলছেন।

মঞ্জেলের পর মঞ্জেল রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে চলেছেন শাহজাদা পরভেজ। তাঁর দুশমন এখন—তাঁর চেয়ে বছর তিনেকের ছোট—শাহজাদা খুর্রম। চারদিক ধুলোয় অন্ধকার। যতদূর দেখা যায়—ধুলোর মেঘের ভেতর দিয়ে ছুটন্ত কয়েক হাজার ঘোড়ার মাথা, গলা। ধুলোর মেঘে ঘোড়ার পা, রেকাব, পিঠের সওয়ার কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে বাতাসে ভাসন্ত লেজটা চোখে পড়ে। ঘোড়ার ক্ষুরের নিয়মিত একটানা শব্দে বাকি সব আওয়াজ চাপা পড়ে গেছে।

খবর ছিল—সুবা এলাহাবাদের জৌনপুর শহরে শাহজাদা খুর্রম ডেরা ফেলেছেন। আজই ভোর রাতে মহাবত খাঁ আর শাহজাদা পরভেজ বাছাই বাছাই চার রিসালা ঘোড়সওয়ার নিয়ে জৌনপুরের কোতোয়ালি দিয়ে শহরে ঢোকেন। ঢুকে দেখেন—পাখি হটে গেছে রাত থাকতেই।

ওঁদের খবর আগেই পান খুর্রম। তিনি নিজে ঘোড়ার পিঠে। সঙ্গে হাতির

পিঠে দারাশুকো। সারা রাত দারা দেখলো, অন্ধকারে কী করে ইনসান আর জানোয়ার একই সঙ্গে কোনো শব্দ না করে পিছু হটে। দেখে দেখে তার মনে হচ্ছিল—ইনসানও খোদার একরকমের জানোয়ার। লড়াই হামলার সহবত এমনই যে, ইনসান আস্তে আস্তে জানোয়ার হয়ে যায়। ঘোড়াও যেমন কোনো শব্দ না করে হাঁটু জলে নদী পেরোলো—মানুষ তেমনি গলায় আসা কাশি গিলে ফেলে নদী পেরোয়। পাছে দুশমন হদিস পেয়ে যায়।

পিছিয়ে এসে খুর্‌রম তমসার তীরে লশকর, হাতি, বন্দুকচীদের জায়গা মতো সাজাতে লাগলেন। সকাল থেকেই আব্বা হুজুরের সেই সাজানো দারার চোখের সামনে চলতে লাগলো। এভাবে প্রায় যখন বিকেল—তখন প্রান্তরের শেষ সীমায় কালো কালো মাথাগুলো দেখা গেল। তারপরই সারা প্রান্তর জুড়ে একখানা ধুলোর মেঘ উঠলো আকাশে। সেই সঙ্গে ঘোড়ার পায়ের ছুটে আসার অবিরাম শব্দ।

শাহজাদা পরভেজ আসছেন। সেদিকে তাকিয়ে শাহজাদা খুর্‌রম বুঝলেন, আগ্রা এগিয়ে আসছে। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়লো। ওই চলন্ত, ছুটন্ত—এগিয়ে আসা মেঘ মানে খোদ বাদশা জাহাঙ্গীর। ওই মেঘ মানে বাদশা-বেগম নুরজাহান। ওই মেঘ মানে—এতদিন শাহজাদা খুর্‌রমকে ইজফা দিয়ে দিয়ে মহাবত খাঁয়ের বাড়িয়ে তোলা মজুত বিদ্বেষ। শাহজাদা খুর্‌রম এই ঘনিয়ে আসা বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে হাসলেন। মনে মনে বললেন, শাহজাদা পরভেজ—তুমি বাদশা-বেগম নুরজাহানের ঘুঁটিমাত্র!

অন্ধকার করে সন্ধ্যা এসে পড়ায় দম ফেলার সময় পেলেন শাহজাদা খুর্‌রম। ভোরের আলো ফোটার অনেক আগেই ঘোড়ার পিঠে পিঠে সবটা জায়গা—তোপখানা, লড়াকু হাতির দঙ্গল, ঘোড়সওয়ারদের হারবল—সবই ঘুরে ঘুরে দেখলেন শাহজাদা খুর্‌রম। দেখতে দেখতে হঠাৎ নজর পড়লো—তার নিজের হাতির পিঠে গাদেলায় কানাত ধরে দাঁড়ানো সুলতান দারাশুকো কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। কানাতের বাইরে ছোট্ট ডান হাতখানা ঝুলছে। খুর্‌রম ঘোড়া থেকে নেমে হাতির সামনে দাঁড়ালেন। তারপর হাতিকে পা ভাঁজ করে মাটিতে বসিয়ে ছেলেকে নিজের কোলে তুলে নিলেন। দশ বছরের দারা তাঁর বুকে লেপটে গেল। ঘুমে অসাড়। হাতি, উট, তোপ, লোক-লশকরের ভেতর দিয়ে বালক শরীরখানা কাঁধে নিয়ে পেছনের তাঁবুতে যাওয়ার সময় শাহজাদার মনে হতে লাগলো—জীবনের সবচেয়ে দামি জিনিস নিয়ে তিনি এক অপরিচিত রাস্তা দিয়ে চলেছেন। এই জিনিসের নাম আওলাদ। শাহজাদা এগোচ্ছেন—আর ধানুকী, পদাতিকরা রাস্তা করে দিচ্ছে সম্ভ্রমে। খুর্‌রমের মনে হলো—এই যে আমার লড়াই—এই যে পেছনে হটে এসে ফের লশকর সাজানো—সবই তো আওলাদকে ঘিরে এক সুখের খোয়াবের জন্যেই। ছোট্ট শরীরটা ঘুমে অচৈতন্য।

ভোরের আলো ফুটলে মহাবত খাঁ প্রথমেই দেখতে পেলেন—নদীর বুকে সারি সারি জঙ্গী নৌকো। খুর্‌রম ওগুলো নিশ্চয় বাংলা থেকে আনিয়েছেন। জল তত গভীর নয়। হাতি এ-জল ভেঙে গুলিগোলার তোয়াক্কা না করে ঠিক ওপারে দুশমনের সামনে গিয়ে ঠেলে উঠতে পারে। কিন্তু বাধা হলো ওই জঙ্গী নৌকোর বহর। সারি সারি প্রায় শ' দেড়েক নৌকো। হাতিকে ভয় খাওয়ানোর জন্যে ফি নৌকোতেই আগুনের মশাল জ্বালানোর আয়োজন।

মহাবত খাঁ নৌকো বরাবর তোপ দাগার হুকুম দিলেন। এটা ভাবা ছিল না খুর্‌রমের। কয়েকটা গোলা পড়তেই খান সাতেক নৌকো তলিয়ে গেল। অমনি বাঁচার তাগিদে নৌকোর বহর পাখির ঝাঁকের মতোই মিলিয়ে গেল।

এমনিতেই শাহজাদা খুর্‌রমের লোক-লশকর অনেক কম। ভোরের বাতাস অল্পক্ষণেই গরম হয়ে উঠলো। খুর্‌রম হিসেব করে দেখলেন, মজুত গোলা-বারুদ, খাবার দাবার নিয়ে বড় জোর সন্ধে অব্দি লড়াই চালানো যায়। শের খাঁ, ভীম শিশোদিয়া, সবাই তাঁর জীবন-মরণের সঙ্গী। অসমসাহসী। মরণপণ লড়াকু। পেছনে অনেক দূরে তাঁবুতে বেগম আরজুমন্দ বানু ভোরের বাতাসে গোলার শব্দে নিশ্চয় ঘুম ভেঙে উঠে বসেছেন। এখন—এই অবস্থায় পিছু হটারও উপায় নেই।

শাহজাদা খুর্‌রম হাতির পিঠে দাঁড়িয়ে উঠলেন। হাতে খোলা তলোয়ার। পাশেই ঘোড়ার পিঠে বসা বাছাই এক রিসালা সওয়ার বন্দুক তাগ করে দাঁড়ানো। শাহজাদাকে কেউ যদি দূর থেকে চাঁদমারি করে বসে—তো তাকেই এক ঝাঁক গুলি দিয়ে সবার আগে পেড়ে ফেলবে। খোলা তলোয়ার হাতে খুর্‌রম যেন ঝলসে উঠলেন। চেঁচিয়ে বললেন, হামলা—

তুচ্ছ নদী। তুচ্ছ দুশমনের গুলি। রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চোখ ঢাকার নিচে ঘোড়াদের কপাল বেয়ে ঘামের ফোঁটা। হিন্দুস্থানের বাতাসে ইরাকি ঘোড়ারা সবার আগে ঘেমে ওঠে। লড়াইয়ের পয়লা চোটে ওদের কাজে না লাগাতে পারলে পরে ওরা হামলার পক্ষে বোঝা হয়ে ওঠে। যেমন কিনা ঘোড়ার ক্ষুরের ধুলো শেরগির হাতিরা কিছুতেই ঠেকাতে পারে না। নিঃশ্বাসের সঙ্গে শুঁড়ে ঢুকে পড়ে।

রাজা ভীম শিশোদিয়া আর শের খাঁ শ'দুই ঘোড়সওয়ার নিয়ে গুলি-গোলা, তীরের মুখোমুখি ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। মহাবত খাঁয়ের ঘোড়সওয়ার-দের ফিকা পর্দা টুকরো টুকরো করে দিয়ে রাজপুত আর আফগান লড়াকুরা শাহজাদা পরভেজের জানবাজ হারবলের সামনে গিয়ে পড়লো। হাজার দশেক ঘোড়সওয়ারের নিরেট হারবল মানেই মৃত্যু।

রাজা ভীম আর শের খাঁ জানেন—এ লড়াইয়ে পালিয়ে বাঁচার কোনো রাস্তা নেই। হামলাই বাঁচার রাস্তা। তাঁরা এই অঙ্ক কষেই গোলার মুখোমুখি ঘোড়া ছুটিয়েছেন—যার হিসেব হলো—তমসা ডিঙোতে গিয়ে কিছু সওয়ার গোলায় ঘায়েল হয়ে জলে ভেসে যাবে—কিন্তু ঢলে পড়বে ডাঙায় উঠতে উঠতে—কিছু সওয়ার ঘোড়াসমেত গোলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে যাবে—কিছু বা বিষ তীর

বিঁধে ঘোড়ার পিঠেই ঢলে পড়বে।

বাকি পঁচিশ তিরিশজন ঘোড়সওয়ারই শাহজাদা পরভেজের তোপখানা অচল করে দিতে পারবে। তোপের পেছনেই সারি দিয়ে দাঁড়ানো বন্দুকচী, ধানুকী আর পদাতিকের দল। তারা কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই কামানের নলের ভেতর রাজা ভীমের সওয়াররা মৃত্যু তুচ্ছ করে রেড়ির তেল ভরে দিতে লাগলো। দেখতে দেখতে কামানগুলো অকেজো হয়ে গেল।

তোপখানা অচল করেই বেপরোয়া ঘোড়সওয়ারের দলগুলিতে—বিষতীরে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে জেনেও খানিকদূরে হাতির পিঠে বসা শাহজাদা পরভেজের দিকে ধেয়ে চললো। আর মাত্র কয়েক রশি।

হাজার তিনেক ঘোড়সওয়ার নিয়ে শাহজাদা খুর্‌রম তমসার জল ভেঙে ডাঙায় উঠেই দেখলেন—রাজা ভীম আর শের খাঁ তো নিমেষে অসাধ্য সাধন করে বসে আছেন। এবার জয় প্রায় হাতের মুঠোয়। তিনি আবারও খোলা তলোয়ার রোদের ভেতর ঝলসে দিয়ে হাঁক ছাড়লেন—হামলা—

খুর্‌রমের বুকের ভেতর তখন অন্ধকার কেটে যাওয়া আশা আলো হয়ে দেখা দিচ্ছিল। শাহী ফৌজের বন্দুকচী, ধানুকী—কাউকেই পরোয়া নেই খুর্‌রমের। তিনি যেন দোগুণ জোস পাচ্ছেন গায়ে। ছুটন্ত একখানা ভল্ল শাহজাদার বাঁ কাঁধ ফসকে তাঁরই ঘোড়ার পায়ের কাছে পড়ে মাটিতে গেঁথে গেল।

শাহী ফৌজে হাহাকার পড়ে গেল। শাহজাদা পরভেজ এই বুঝি সাবাড় হলেন। রেড়ির তেল ঢুকে কামানের পলতের জায়গা ভিজে চুপচুপে। একটাও গোলা ছোঁড়ার উপায় নেই আর! শাহজাদা খুর্‌রমের ঘোড়সওয়াররা হারবল তছনছ করে ধেয়ে চলেছেন।

শাহজাদা পরভেজের বাহিনীর বাঁ দিকটা দেখছিলেন যোধপুরের রাজা গজ সিংহ। সম্পর্কে খুর্‌রম তাঁর নাতি—মেয়ের ঘরের ছেলে। কিন্তু মাত্র বছর খানেক আগে শাহজাদা পরভেজ গজ সিংহের মেয়েকে বিয়ে করেছেন। এই দোটানার স্রোতে পড়ে এই প্রচণ্ড লড়াইয়ের ভেতরেও গজ সিংহ চিন্তায় পড়লেন। ভাবতে ভাবতে তাঁর পেচ্ছাপ পেল।

রাজা গজ সিংহ সবেমাত্র তাঁর পায়জামার ডোরি খুলছেন—এমন সময় রিসালাদার গোবর্ধন দাস রাঠোর সেখানে এসে হাজির। তিনি কড়া সুরে বলে উঠলেন, মহারাজ! সব ভেসে গেল—আর এখন আপনার পেচ্ছাপে বসার সময়?

রাজা গজ সিংহ কাজটি না সেরেই পায়জামার ডোরি কষে কোমরে বাঁধলেন—তারপর বললেন, আমি দেখছিলাম—খবর দেওয়ার জন্যে কোনো রাজপুত বেঁচে আছে কিনা?

মহাবত খাঁ ঘাবড়াবার মতো সেনাপতি নন। দক্ষিণে শাহজাদা খুর্‌রমকে হারিয়ে খান-ই-খানান খেতাব পেয়েছেন। তিনি রাজা ভীম আর শের খাঁকে আটকাবার জন্যে জটাজুটকে ছেড়ে দিলেন।

জটাজুট শাহী হাতিশালার সবচেয়ে পাগলা জঙ্গী হাতি। তার দুই দাঁতে

দু'ধার ধারালো খাণ্ডার তলোয়ার লটকানো। মাথা, গা—লোহার বর্মে ঢাকা। জটাজুট যেন রাজা ভীমের সওয়ারদের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়লো। খাণ্ডারের ঘায়ে—শুঁড়ের দোলায়—পায়ের চাপে রাজা ভীমের জানবাজ সওয়াররা ধড়াধড় পড়তে লাগলো।

শাহজাদা খুর্রমের হাতের মুঠো থেকে জয় ফসকে বেরিয়ে গেল। দল ছেড়ে আবদুল্লা খাঁ খুর্রমের তাঁবে এসে যোগ দিয়েছিল। বিপদ দেখে সে এবার তার ঘোড়সওয়ারদের নিয়ে পালিয়ে গেল। রাজা ভীম খান-ই-খানান মহাবত খাঁয়ের সঙ্গে মুখোমুখি লড়তে লাগলেন মহাবত খাঁয়ের সড়কি তাঁর বুকে বিঁধতেই ভীম শিশোদিয়া পড়ে গেলেন।

শাহজাদা খুর্রম দেখলেন—তিনি একরকম জিততে জিততেই হেরে যাচ্ছেন। সন্ধ্যার মুখে মুখে তমসার জলে শেষ আশা ভেসে গেল। তমসার প্রান্তরে বিশ্বাসী সঙ্গীদের লাশ ফেলে রেখেই শাহজাদা খুর্রম পিছু হটতে শুরু করলেন। সামনে অন্ধকার রাত। সঙ্গী-সাথীদের অনেকেই জখম। সেই একই পরিণাম। নসিব বারবার তাঁকে পরাজয় উপহার দিচ্ছে।

আবার বিন্ধ্যাচল। আবার নর্মদা। হটে যাওয়া কিংবা জিতে এগিয়ে যাওয়ার ভেতর কোনো ফারাক নেই দারাশুকোর কাছে। সেই হাতির পিঠে মাঠ ভাঙা। দুলতে দুলতে নদী পেরোনো। কিংবা গিরিপথ ধরে পাহাড় ফুঁড়ে ফের আরেক মাঠে গিয়ে পড়া। উটের কাতার, বলদের কাঁধে কামান-গাড়ির জোয়াল। সবই চেনা দারাশুকোর।

কয়েক বছর আগে বাদশা জাহাঙ্গীরের হুকুমে শাহজাদা খুর্রম প্রথম দক্ষিণে আসেন। সেবারই প্রথম নর্মদা ডিঙিয়ে এসে তিনি মালিক অম্বরকে শায়েস্তা করেছিলেন। আহমেদনগরের খিরকিতে অম্বর কাবু হয় সেবার। বাদশার হুকুমে খুর্রম হয়েছিলেন দক্ষিণের সুবেদার। বাদশা-বেগম নুরজাহানের ইচ্ছায় তাঁর ঘোড়সওয়ার বাড়িয়ে ইজফা দেওয়া হয়েছিল।

শীতের মুখে মুখে সেই পথেই পাতা ঝরা গুলমোহর গাছের রোগা রোগা ছায়ার ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা সকালে শাহজাদা খুর্রমের ঘায়েল, ক্লান্ত লোকজন ফিরছে। অনেক আগে হাতির পিঠে গাদেলায় বসে এগিয়ে গেছেন বেগম আরজুমন্দ। সঙ্গে তাঁর ছেলেমেয়েরা। কয়েক মাসের মুরাদ বকস মাঝে মাঝে আশমানের দিকে তাকিয়ে ছোট ছোট হাত নাড়ছিল।

মালিক অম্বরকে শায়েস্তা করার আগে থেকেই শাহজাদা খুর্রমের মনে আগ্রার মসনদ উঁকি দিতে থাকে। তখন থেকেই খুর্রম ঘোড়া দাবড়াতে দাবড়াতে—ঘুমোতে ঘুমোতে একটি মাত্র খোয়াব খুব নরম মখমলের ভেতর লুকিয়ে রেখেছেন। এই বিরাট হিন্দুস্থান যেদিন তাঁর ইচ্ছায় উঠে দাঁড়াবে—তাঁর হুকুমে বসে পড়বে—সেদিনই এই খোয়াব পুষে রাখার শেষ। নয়তো এ যে কী যন্ত্রণা—যে মনে মনে পোষে—শুধু সে-ই জানে।

খিরকি গুঁড়িয়ে দেবার সময় খুর্রম আশরফি, মোহর, মুক্তো, চুনী

পেয়েছিলেন। অম্বরের মজুত আশরফি তিনি কেড়ে নেন। তারই জোরে আজ দু'বছরের ওপর তিনি লড়াই চালিয়ে এসেছেন। এখন সে মজুত প্রায় ফাঁকা। অনেকগুলো ইরাকি ঘোড়া হারাতে হলো তমসার জলে। খান-ই-খানান মহাবত খাঁ আটটা হাতি কেড়ে নিয়েছেন। রাজা ভীম শিশোদিয়া আর নেই। এখন আগ্রায় নিশ্চয় তাঁকে আর শাহজাদা বলা হয় না। সেখানকার মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে চর্চা হচ্ছে বাগী খুররমকে নিয়ে। শুধু খুররম।

হটে আসাটাও একটা লড়াই। যতটা পারা যায় গোলাবারুদ বাঁচিয়ে, ইনসানকে চাঙ্গা রেখে হটতে হয়। আগে ছিল আশরফির জোর। সামনে খোয়াব ছিল—আগ্রার মসনদে বসলে বাদশা হয়ে তিনি সবার তনখা বাড়িয়ে দেবেন। এখন এই আশাভঙ্গের পর খুররম কী দিয়ে এদের ধরে রাখবেন!

হিন্দুস্থানের যে-পথ দিয়ে ফৌজ যায় বা ফেরে—সে পথে আম আতরাফ ইনসান থাকে না। শুধু জয়ী সেনাপতিকেই হিন্দুস্থান বরণ করে। আর জয়গান করে লড়াইয়ের বন্দীরা। এই ফেরা যে কত কষ্টের তা পায়ে পায়ে টের পাচ্ছিলেন খুররম।

একটা বড় গাছের ছায়ার নিচে দুপুরে ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেতে বসলেন বেগম আরজুমন্দ। ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে এসে হাজির হলেন শাহজাদা খুররম। ঘোড়া থেকে নামতে নামতে সব দেখে তাঁর বুক ভেঙে গেল। খোয়াব ছিল—আরজুমন্দ হবেন বাদশা বেগম। সেই আরজুমন্দ গাছের নিচে সামান্য গালিচায় বসে। পায়ের সুনহেরা চটি ঘাসে উল্টে পড়ে আছে। বেগম একমনে দোলনায় শোয়ানো মুরাদকে বসে বসেই খেলা দিচ্ছেন। দারা আর জাহানারা ছুটে ছুটে ফড়িং ধরতে ব্যস্ত। রোশনআরার সামনে সমরখন্দি তরমুজের ফালি পড়ে আছে রেকাবিতে। ফুল ময়দার রুটিও সে ছোঁয়নি। আর আওরঙ্গজেব তো অনেকদূরে নরম রোদের ভেতর একা দাঁড়ানো। তার গায়ের রং ফর্সা। রোদ পড়ায় মনে হবে বুঝি বা কোনো শ্বেতপাথরের মূর্তি দাঁড় করিয়ে গেছে কেউ ওখানে। দূরে দূরে সেপাইরা বন্দুক হাতে পাহারায় দাঁড়িয়ে।

না ঘুমোনো শুকনো মুখ। গায়ের আঙরাখা এখানে ওখানে ছেঁড়া। মুখের ওপর ভেসে ওঠা সেই দু'চোখ কোথায়? খুররমকে এ অবস্থায় দেখে উঠে দাঁড়ালেন আরজুমন্দ। দু'হাতে ধরতে গেলেন মানুষটিকে।

শাহজাদা খুররম সরে গেলেন। তিনি চোখ তুলে তাকাতে পারছিলেন না। বারবার মনে হচ্ছিল তাঁর—আমিই দায়ী। আমিই দায়ী। মুখে কিন্তু সে কথা আনতে পারছেন না।

আরজুমন্দের চোখের ইশারায় একজন দাখিলা পাহাড়ি বেতের ঝুড়ি থেকে কয়েকটা টাটকা বাবাসেতির সঙ্গে কিছু মনাক্কা আর খোবানি শাহজাদার সামনে একটি লাল পাথরের রেকাবিতে রেখে গেল। তার পাশে আরজুমন্দ নিজে একখানি সুন্দর মীনা করা ছোট্ট পিরিচে খানিকটা কিমা সুরবা সাজিয়ে খেতে দিলেন।

কিমা সুরবা দেখিয়ে খুর্‌রম জানতে চাইলেন, ওরা খেয়েছে ?

—ওদের গোস্তে অরুচি ধরে গেছে। খেতেই চায় না। আওরঙ্গজেব তো কিছুই খায়নি।

খুর্‌রম শুধু একটা বাবাসেতি তুলে নিলেন। তাঁকে দেখে ছেলেমেয়েরা সবাই ছুটে এলো। এলো না আওরঙ্গজেব। তাকে ডাকলেন শাহজাদা খুর্‌রম। ডাকতে আওরঙ্গজেব ধীর পায়ে কাছে এসে দাঁড়ালো।

—তুমি কিছুই খাওনি ?

গাছতলা একদম চুপচাপ। আওরঙ্গজেব বললো, না। ইচ্ছে করছে না।

—কিছু খাও। শরীর খারাপ হবে—

—না। খিদে নেই।—একটু থেমে থেকে সে জানতে চাইলো, আব্বা হুজুর, আমরা আগ্রা যাবো কবে ?

তার ভাইবোনেরাও এই কথায় একদম সিধে তাদের আব্বা হুজুরের মুখে তাকালো। বেগম আরজুমন্দের চোখের পাতা একবার কেঁপে উঠলো।

শাহজাদা খুর্‌রম বললেন, একদিন যাবো।

রৌশনআরাও জানতে চাইলো, কবে যাবো আব্বা হুজুর ?

—একদিন যাবো।—বলে খুর্‌রম নিজের মনের ভেতরে হাসলেন। তিনি মুখে বলতে পারলেন না—তোমাদের আব্বা হুজুরের পক্ষে রাজধানী আগ্রা জায়গাটা আর নিরাপদ নয়। একজন বাগীর পক্ষে রাজধানী—বাদশা—এই দুটি জিনিস কোনোদিনই স্বস্তির নয়।

অনেকদূরে কোথায় এলোমেলো বন্দুকের গুলির আওয়াজ। একটা ঘায়েল হাতি কোথায় তার বিশাল বুকের ভেতর যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো। দূরে দূরে লোক-লশকরের কথাবার্তা।

বেগম আরজুমন্দ আস্তে জানতে চাইলেন, রাজা ভীম ?

খুর্‌রম নিঃশব্দে বেগমের চোখে চাইলেন, তিনি আর নেই—

আরজুমন্দ কোনো কথা বলতে পারলেন না। মাথার ওপরে শীতের বেলা পরিষ্কার রোদে ঝকমক করছিল। খানিকবাদেই রোদ পড়ে আসবে। সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে শীত নেমে আসবে। শুরু হয়ে যাবে কোনো শব্দ না করে পিছু হটা। হাতি, ঘোড়া, উট, গো-গাড়ির বলদ—সব জানোয়ারের সঙ্গে মিছিল করে ইনসানের পালানো—অন্ধকারের ভেতর ঘাপটি মেরে থাকা। এর চেয়ে আগ্রা দুর্গে পোষমানা শাহজাদা হয়ে থাকা—পরভেজ বা শারিয়ারের মতোই বাদশার সুবোধ, সুশীল শাহজাদা হয়ে থাকাই তো আরামের ছিল।

খুর্‌রম শান্ত গলায় ছেলেমেয়েদের বললেন, তোমরা সবাই কিছু খেয়ে নাও। আওরঙ্গজেব—তোমাকে এই কিমা সুরাবটুকু খেতেই হবে। খুব তাড়াতাড়ি আমরা এগিয়ে যেতে চাই। সেই অনেক রাতে তাঁবু পড়বে—তার আগে কেউ আর খাবার সময় পাবে না।

আওরঙগজেব শাহজাদা খুর্‌রমের চোখে তাকালো। সে-চোখে কোনো পলক পড়লো না। বালকের মনে হলো—আব্বা হুজুর এরকমই। খাবার কোনো

ইচ্ছাই ছিল না আওরঙ্গজেবের। তবু তাকে কিমা সুরবার পিরিচটি হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে হলো।

পৃথিবীতে এক একটি দিন আসে।—বেলা বেড়ে রাত হবার সঙ্গে সঙ্গে তা আগের দিনটির কবরে চলে যায়। ইনসানের পয়দায়িসের সঙ্গে সঙ্গে সে ভেতরে ভেতরে খরচ হতে শুরু করে। এই খরচার নামই ক্ষয়। এই ক্ষয়ের পাশাপাশি আমরা কাজ করে যাই—স্রেফ বেঁচে থাকার আহ্লাদে। থাকার জন্যে আনন্দে।

শীতের দুপুরে সারাটা যমুনার চর তটস্থ হয়ে উঠলো। দফায় দফায় কয়েকজন ঘোড়সওয়ার এসে শের খাঁয়েদের তরমুজ ক্ষেত, মীর সফিদের ফুলের বাগ, মাছের ডিমপোনা তৈরির চর জায়গা, হাঁটু জলে শুকোতে দেওয়া জালের ঘের ঘোড়ার ক্ষুরে যেন দোয়ারা চষে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল।

চরের বাতাসে শুধু একটাই কথা। শাহজাদা আর শাহজাদা-বেগম আসছেন। পাখি শিকারে।

মীনাক্ষীর আর গোলাপগাছ ছাঁটা হলো না। যতদূর দেখা যায় ধু ধু চর চলে গেছে সেকেন্দ্রার দিকে। ওখানে গিয়ে নাকি যমুনা বাঁক নিয়ে স্রোতের মতো জল ফিরে পেয়েছে। ডিমপোনা তৈরির মেছো মানুষজন সরু সরু ডিঙি ভাসিয়ে সেদিকটায় চলে গেল। সূর্য যখন মাথায় মাথায়—তখন দেখা গেল —দুটো শাদা ঘোড়ার পিঠে শাহজাদা আর শাহজাদা বেগমকে।

মীনাক্ষী যুঁই বাগে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখছিল। শাদা ঘোড়ার পিঠে যেন লালচে পরী। কোমর থেকে সোনালি রংয়ের কোমরবন্ধ ঝুলে পড়েছে। ঘোড়ার দুলকি ছুটে শাহজাদার মাথার চুল উড়ছে। আবার ঘাড়ে পড়ছে।

—কী সুন্দর—

সফি মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে চাপা গলায় বললো, শুয়ে পড়ো মীনা—শুয়ে পড়ো—

—কেন?

—আমরা আম আতরাফ। শাহজাদা শারিয়ার, লাডলি বেগমের সামনে ফুলওয়ালা ইনসানের মাথা তুলে দাঁড়ানো বে-তমিজি। শুয়ে পড়ো বলছি—

মাথা নিচু করতে করতেও আরেকবার দেখে নিলো মীনাক্ষী। ঘোড়ার পিঠে চলন্ত ছবির মতো শাহজাদা শারিয়ার এগিয়ে আসছেন। লালচে ঠোঁট। মাথায় উষ্ণীষের সরবন্ধে ময়ূরের পালক। তাঁর পাশে পাশে লাডলি বেগম। চোখ ফেরানো যায় না। বেগমের হাতে বন্দুক। শাহজাদার হাতে কিছুই নেই।

মাথা নিচু করে ভুঁইয়ে পড়তে পড়তে মীনাক্ষী বিড়বিড় করে বললো, তাহলে এঁদের হুকুমেই শাহী ফৌজ ধুমধুমার গড় গুঁড়িয়ে দেয়? ফাঁসিতে লটকায়! কোড়া মারে? কয়েদ করে! অথচ এঁরাই এত সুন্দর! এত ভয়ংকর!

ওদের কয়েক হাত দূরে শারিয়ার.লাডলিকে পিঠে নিয়ে ঘোড়া দুটো ছুটে

গেল। পাশে পাশে ভয়ঙ্কর দেখতে আরও সাত আটজন ঘোড়সওয়ার। এবার মীনাক্ষী মাথা তুলে দেখলো—ঘোড়াদের পায়ে পায়ে আট দশটা কুকুর। তারাও পাল্লা দিয়ে ছুটছে।

চর কাঁপিয়ে দিয়ে গুলির শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ডিমপোনা তৈরির জায়গা থেকে এক ঝাঁক ডোখোল পাখি ছররা তুলে যমুনার আকাশে উঠলো। মীনাক্ষী দেখলো—বেবাক তরমুজ চাষী শের খাঁয়ের মাতব্বরিতে কুকুরগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঝোপঝাড়, জলকাদা থেকে ঘায়েল পাখি কুড়োচ্ছে।

চরে পাখি নানা জাতের। বেশিরভাগ আসে কাশ্মীর থেকে। বেলেহাঁস নামে সন্ধে সন্ধে—উড়ে যায় ভোর ভোর। পূর্ণিমার রাতে ফাঁদ পেতে গোটা দুই ধরেছিল একবার মীনাক্ষী। খেতে বেশ

—জানো মীনা—নতুন নতুন আহেদি হবার পর আমায় একবার বাদশা জাহাঙ্গীরের শিকারে যেতে হয়েছিল।

—সারা হিন্দুস্থান জুড়ে এত ইনসান শিকার করেও ওদের সাধ মেটে না! আবার জানোয়ার—পাখি শিকার করা কেন?

—নারোয়ার জঙ্গলে আমরা বাদশার জন্যে তাড়া করে শের, হরিণ—সব ঘেরাওয়ের ভেতর নিয়ে এলাম—

—কাকে বলছো! আমরা ঘরদুয়ারী পাইক ঘরের মেয়ে। শাহী ফৌজের জন্যে আমাদের বাপ খুড়ো খেদা করে হাতি ধরতো—

কথা আরও এগোতো। কিন্তু চোখের সামনে দু'জন ঘোড়সওয়ারকে শাহজাদা শারিয়ারদের দিকে ছুটে যেতে দেখে ওরা চুপ করে গেল। কী ব্যাপার? খানিকপরেই দেখা গেল—শাহজাদা শারিয়ার আর তাঁর বেগম লাডলি ফিরে চলেছেন।

আগ্রার মতিগতি আগ্রা দুর্গের মতোই রহস্যময়। বাইরে থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই দুর্গের ভেতর কী হচ্ছে। ঘোড়া রেখে শারিয়ার তাঁর বেগমকে নিয়ে আকবর দরওয়াজা দিয়ে নিজেদের সাধারণ মহালে এসে ঢুকলেন। পাশেই মোতি মসজিদে দেওয়ানখানার ওয়াকেনবীশরা নামাজ পড়ে সবে বেরিয়ে এসেছিলেন। নিজেদের চত্বরে ঢুকে শারিয়ার লাডলির দিকে তাকালেন। ঘোড়ার পিঠে দোলায় একটা ঝাঁকুনি আছে। লাডলির কপালে ঘামের বিন্দু। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। লাডলিও শারিয়ারকে দেখছিল দেখে তার মনে হচ্ছিল—জীবন কী সুন্দর। এই দুনিয়ায় জিন্দা থাকাটাই এত আনন্দের। মাত্র বিশ বছরের শাহজাদা যেন একখানি খোলা তলোয়ার। বাইরে জানালায় রোদে ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশ। যমুনার চরে উড়ন্ত পাখির ঝাঁক যেন এখনো খুশির চিহ্ন হয়ে মনের ভেতর উড়ছে।

—এমন কী জরুরি ছিল আম্মিজান শিকার থেকে ডেকে পাঠালেন—

শাহজাদা শারিয়ার বললেন, তিনি বাদশা-বেগম নূরজাহান। ডেকে পাঠাতেই পারেন। তৈরি হয়ে নাও।

একথা বলে নিজের মাথার উষ্ণীষ খুলতে যাবেন শাহজাদা শারিয়ার।

লাডলির সঙ্গে বিয়ের পর এই গেরস্থালির ভেতরেই যেন তাঁর সারাটা দুনিয়া ধরে যায়। আনমনে রুমির রুবায়-ই গাইছিলেন তিনি—আন নিশান এ-দীপ এ হিন্দুস্থান বুবদ—অ—

ঠাণ্ডা, শান্ত, তীক্ষ্ম কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলেন শারিয়ার।

—শাহজাদা শারিয়ারকেও ডেকেছি আমি !

এ-গলা শুনে শাহজাদা-বেগম লাডলিও চমকে উঠলের। সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে কুর্নিশ করলেন লাডলি। আম্মিজান ? এসময়ে ? এখানে ?

দেখাদেখি শাহজাদা শারিয়ারও কুর্নিশ করলেন। আপনি বাদশা-বেগম এখানে ?

শারিয়ারের দিকে তাকিয়ে নুরজাহান বললেন, আমি লাডলির মা। আমি কি এখানে আসতে পারি না !

লাডলি দৌড়ে গিয়ে মায়ের হাত ধরলেন। তুমি একবার ডাকলেই তো আমরা গিয়ে হাজির হতে পারি—

শারিয়ার আবারও কুর্নিশ করলেন। আপনি হিন্দুস্থানের বাদশা-বেগম। হিন্দুস্থানের যে কোনো জায়গাই আপনার জায়গা।

—ছেলের চেয়ে বড় জায়গা তো আর কিছু নেই শারিয়ার।

শাহজাদা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আগ্রা দুর্গের বলা যায় এক কোণে লাডলিকে নিয়ে তাঁর ঘরগেরস্থালি। এখানে কোনোদিন কোনো বাদশা বা বেগম আসেন না।

—যে-কথা বলতে আমি তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছি—তা আমি এখুনি বলতে চাই। আর তা তোমাদের বলা রীতিমত জরুরি হয়ে পড়েছে।

এ-গলার স্বর সম্পূর্ণ আলাদা। যেন শাহী কোনো ঘোষণা বাদশা-বেগম নুরজাহান মুখস্ত বলছেন।

নুরজাহান বললেন, তোমরা আর ওভাবে যমুনার চরে শিকার করতে যেতে পারো না। তোমাদের একদিন অনেক বড় দায়িত্ব নিতে হবে—

লাডলি বেগম বললেন, কেন আম্মিজান—অনেক ঘোড়সওয়ার নিয়েই আমরা শিকারে গিয়েছিলাম—

—শোনো মা, আমি চাই—তুমি একদিন হিন্দুস্থানের বাদশা-বেগম হবে—

শারিয়ারের ভেতরটা আগাগোড়া কেঁপে উঠলো।

লাডলি বললেন, এই তো আমরা বেশ আছি আম্মিজান। খুব সুখেই আছি। বাদশাহীতে আমাদের কাজ নেই—

বাদশা-বেগম নুরজাহান চোখ ছোট করে তাকালেন। শোনো শারিয়ার—আমার একমাত্র মেয়ে লাডলিকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছি—

শাহজাদা শারিয়ার চুপচাপ তাকিয়ে থাকলেন বাদশা-বেগমের মুখে।

—তোমাকে বিরাট দায়িত্বের মুখোমুখি হতে হবে একদিন—

শারিয়ার নুরজাহানের মুখ থেকে চোখ নামিয়ে নিলেন। বাদশা

এখনো জিন্দা—

—আলা হজরতের বয়স হচ্ছে। ভবিষ্যতের কথাও তো ভাবতে হবে শারিয়ার!

—শাহজাদা পরভেজ?

—সে ভাবনা তোমার নয় শারিয়ার। শাহজাদা পরভেজ এখন দক্ষিণে সুবেদার। খুররমকে হারিয়ে হটিয়ে দিয়ে সুবেদার বখশিস পেয়েছে পরভেজ।

—শাহজাদা খুররম?

—শাহজাদা! বলো—বাগী খুররম। যে বেদৌলত বাদশা জিন্দা থাকতেই মসনদের দিকে তাকিয়েছিল।

—তিনি তো শাহজাদা বটে! আমার চেয়ে বড়ও বটে!

—হ্যাঁ! এখন সে হটতে হটতে নাসিকে গিয়ে ডেরা ফেলেছে। তোমার ভাবনা তুমি ভাবো শাহজাদা। তামাম হিন্দুস্থানের বাদশাহী। কত বড় বোঝা ভাবো তো? শীতের দুপুরে যমুনার চরে বেগমকে নিয়ে পাখি শিকার করতে যাওয়া নয়—নিশ্চয়!

—বাদশা বেগম। গুস্তাকি মাফ করেন যদি তো একটা কথা বলি।

—তুমি এক কেন, একশোটা কথা বলো। আমার মেয়ে লাডলি তোমার বেগম।

—এত বড় হিন্দুস্থানের বাদশাহী সত্যি আমার পক্ষে বিরাট বোঝাই হয়ে দাঁড়াবে। আমি না লড়াকু—না বিশেষ কোনো গুণে গুণী। আমি না-লায়েক। থাকি শিকার, গান, রুমি-ফেরদৌসির রুবায়-ই আর লাডলি বেগমকে নিয়ে। আপনার স্নেহে বেশ সুখেই আছি। আমার কিছুই আর চাই না। লাডলিকে নিয়ে এই ঘরগেরস্থিই আমার দুনিয়া বাদশা-বেগম।—

—ছোট জীবনে মানুষ ছোট্ট খোয়াব দেখে শারিয়ার। বড় জীবনের কথা ভাবো। বড় খোয়াব দেখো। ডরপোক হয়ো না—

লাডলি বেগম অবাক হয়ে নিজের আম্মিজানকে দেখছিলেন। এ কোন আম্মিজান? অনেকদিন আগে যে বর্ধমানে ফৌজদারের গেরস্থালিতে লাডলি নামে একটি মেয়ের জন্ম দিয়েছিল—সে? না, আগ্রায় যাঁর নামে মোহর কাটাই হয়ে তামাম হিন্দুস্থানের মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে ব্যাপারিদের হাতে হাতে ঘোরে?

—তোমার সামনে বিরাট এক শান আর সওকত জীবন পড়ে আছে। তুমি একদিন হিন্দুস্থানের বাদশা হবে। লাডলি হবে বাদশা-বেগম। আমি আর কতদিন! যতদিন থাকবো—তোমার পেছনেই থাকবো শারিয়ার। তোমায় দেখবো। তারপর তো তোমরা দুজনে মিলে হিন্দুস্থানকে দেখবে—

—শাহজাদা খসরুর ছেলে সুলতান দাওয়ার বকস্ তো বড় লড়াকু। তেজী, তাগদদার ইনসান। খুররমকে তাড়া করে সাহস আর দিমাগের পরিচয়ও দিয়েছে এই বয়সে।

—সে আর যাই হোক—শাহজাদা নয়। তোমার আগে মসনদে তার দাবির কথাই আসতে পারে না শারিয়ার। তুমি বাদশা জাহাঙ্গীরের একজন শাহজাদা।

—বাদশা-বেগম। আমার কোথাও কোনো দাবি নেই। এত বড় হিন্দুস্থানে—এত বড় আগ্রা দুর্গে—এই গেরস্থিটুকুই আমার মতো ইনসানের পক্ষে যথেষ্ট।

নূরজাহান বেগম কী যেন ভাবলেন। ছোট করে তাকালেন শাহজাদা শারিয়ারের মুখে। তোমায় এত ছোট করে ভাবলে চলবে না শাহজাদা শারিয়ার। তোমায় বড় করে খোয়াব দেখতে হবে। বড় জীবনের কথা ভাবতেই হবে। আমি তো আছি তোমার পাশে। ভয় কী? আমার একমাত্র মেয়ে লাডলির হাত শুধু শুধু তোমার হাতে দিইনি।

শাহজাদা শারিয়ার বিরাট খোলা জানলা দিয়ে যমুনার চরের দিকে তাকালেন। তাঁর মনে পড়লো, তরমুজ চাষীরা—ঘোড়ার পায়ে পায়ে শিকারী কুকুরগুলো গুলি খাওয়া পাখিগুলোকে ঝোপঝাড়—জলকাদা থেকে তুলে আনছিল। এখন জানলার বাইরে আগ্রার শীতের বিকেল।

কখন একজন কাসীদ এসে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছে। তাকে দেখে বাদশা-বেগম নূরজাহান উঠে দাঁড়ালেন।

।। আঠারো ।।

সামনে নওরোজ উৎসব। আগ্রা, দিল্লি, লাহোর, এলাহাবাদ—বড় বড় শহর আলোর মালায় সাজিয়ে তোলার আয়োজন চলছে। বিশেষ করে অতিকায় আগ্রা দুর্গের কাঁহা কাঁহা উঁচুতে রেঁড়ির তেলের প্রদীপ বসবে—তার ব্যবস্থা করতেই নসরত খাঁয়ের হিমশিম খাবার দশা। মই বেয়ে ওপরে উঠে প্রদীপ বসাতে গিয়ে দু'দুটো লোক সটান নিচের চাতালে পড়ে ফটাফট মরেছে। দূর থেকে আলোর মালা দেখতে সুন্দর। সেই আলোর ব্যবস্থা করতে জীবন যায়।

গরম পড়ার মুখে মুখে নওরোজের দিন যতই এগিয়ে আসে—আগ্রা যেন ততই ফুরফুরে হয়ে উঠছে। সন্ধের বাতাসে কাওয়ালির কলি, বেলা চামেলির সুবাস।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের চাতালে-চত্বরে, ঘরে-দোরে—ঢাকা বারান্দায়—সব জায়গাতেই বাতিদাররা আলো জেলে দিয়ে গেল।

বাদশা-বেগম নূরজাহান খর পায়ে চত্বরের পর চত্বর পেরিয়ে আকবর দরওয়াজার গা ঘেঁষে একটা সরু পথ ধরে একেবারে অন্দরমহলে এসে হাজির হলেন। তিনি যে-পথ দিয়েই যাচ্ছিলেন—সে-পথেই পাহারা, দাখিলা, কাসীদ, হাজিরা, খোজা এমনকি জেনানা-পাহারাদারনীরাও মুহূর্তে সম্ভ্রমে—ভয়ে সরে যাচ্ছিল। এটাই মুঘল দুর্গের রীতি।

বাদশা জাহাঙ্গীর তখন মসনদে। তাঁর গায়ের পেশোয়াজে আলো পড়ে ঠিকরে যাচ্ছিল। তিনি কোমরের সাহাজিদের পাশে বাঁ হাতে একখানা সোনার রেকাবি ধরে আছেন। তাতে কাবুলি পিচ। বাদশা একটা একটা করে তুলে

মুখে দিচ্ছিলেন। আর তাঁর সামনে রুপোর বাতিদান হাতে গুটিকয় অল্পবয়সী মেয়ে নেচে নেচে তাঁকে আরতি করছিল। দুটি মেয়ে বাজাচ্ছে রবাব-ই-দখন।

বাদশা জাহাঙ্গীরের পেয়ারের ওয়াকেনবীশ মির্জা রঘুনাথ চেঁচিয়ে বললেন, আঠাশ। আঠাশটা পিচ। বাদশা তাহলে আজ সব মিলিয়ে আঠাশটা পিচ খেলেন—

বলতে বলতে মির্জা রঘুনাথ ফরমান পড়ে শোনানোর ভঙ্গিতে গড়গড় করে বলে তুজুক-ই-জাহাঙ্গীর লিখতে লাগলেন—

আজ শনিবার দোসরা জমাদি-উস-সানী, হিজরি ১০৩৫ সন্ধ্যায় আলা হজরত বাদশা জাহাঙ্গীর তাঁর প্রিয় ফল কাবুলি পিচ সর্বমোট আঠাশটি খেলেন। খেয়ে তাঁর মুখে এখন তৃপ্তির শাহী হাসি।

বাদশা-বেগম নূরজাহান অন্দরমহলে এসে পড়তেই রবাব-ই-দখন থেমে গেল। পলকে নাচিয়ে মেয়েদের সঙ্গে বাজিয়ে মেয়েরাও কোথায় মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল ওয়াকেনবীশ, তাতার জেনানা চামর দোলানির দল।

বাদশা যেন খোয়াব দেখছিলেন। মিষ্টি মধুর হেসে জানতে চাইলেন, কী হুকুম বেগম! তামাম হিন্দুস্থান তো এখন শান্ত।

—মহাবত খাঁকে ডেকে পাঠানো দরকার আলমপনা—

—তোমার ইচ্ছেয় বেগম শাহজাদা পরভেজ এখন দক্ষিণে—

—সে তো খারাপ নেই সেখানে। শাহজাদা সেখানকার সুবেদার।

—আমার কাছাকাছি কি কোনো ছেলে থাকবে না আমার?—বলতে বলতে বাদশার মুখখানা যন্ত্রণায় কুঁচকে গেল। শাহজাদা খসরু? নেই! শাহজাদা পরভেজ? দক্ষিণে সুবেদার! ডাকলে নর্মদা পেরিয়ে আসতে আসতে আরেক পূর্ণিমা এসে যাবে। শাহজাদা খুর্রম?

বলতে বলতে গলা বুজে এলো জাহাঙ্গীরের।

—থামলেন কেন আলা হজরত? আপনার সবচেয়ে পেয়ারের শাহজাদা! বাবা-খুর্রম!

—তোমারও খুব পেয়ারের ছিল সে। তোমার সুপারিশেই তাকে দক্ষিণে সুবেদার করে পাঠানো হয়। আমার সুবেদারি আমলের সঙ্গী খান-ই-খানান মহাবত খাঁয়ের ইচ্ছে ছিল না—তবু আমি তোমারই কথায় শাহজাদা খুর্রমের ইজফা বাড়িয়ে দিয়েছি দফে দফে।

বেগম নূরজাহান কুর্নিশ করে বাদশার মুখোমুখি নিচু একটা দীবানে বসে পড়লেন। রীতিমত অন্যমনস্ক গলায় যেন নিজের কাছেই জানতে চাইলেন, কেন যে ইনসান বিশ্বাস ভাঙে—জানি না—

বাদশা বললেন, কেন যে বাগী হয় তাও বুঝি না বেগম। আমি তো একসময় হয়েছিলাম। কেন হয়েছিলাম?

—মুলুকে মালিক। সবই তাগদের নেশা। আপনি তো এখন একেবারে একা নেই আগ্রায়। আপনারই আরেক ছেলের ঘর-গেরস্থি তো এই

আগ্রা দুর্গেই—

—তোমার দামাদের কথা বলছো নূরজাহান। শারিয়ার। একেবারে কাঁচা শাহজাদা! লড়াই হামলায় যায়নি কোনোদিন। স্রেফ পাখি শিকার করতে পারে!

এমন সময় উজিরে আজম আসফ খাঁ এসে দূর থেকে কুর্নিশ করলেন বাদশাকে।

বাদশা-বেগম নূরজাহান সামান্য ভ্রূ কোঁচকালেই বাদশার ইঙ্গিতে আসফ খাঁকে বিদায় নিতে হতো সঙ্গে সঙ্গে। নূরজাহান তেমন করেও থাকেন মাঝে মধ্যে। আজ কিন্তু তা করলেন না বাদশা-বেগম।

কুর্নিশের পর তসলিম সেরে আসফ খাঁ বললেন, সুবেদার শাহজাদা পরভেজের তো একজন আতালিক চাই—

—তাও তো বটে। ইব্রাহিম খাঁ ফতেজং মাটি নিতে তার জায়গায় সুবেদার করে বাংলায় পাঠানো হলো মহাবত খাঁকে—তার জায়গায় কাকে পাঠাবো? কাকে পাঠানো যায়?

—আলা হজরত। খানাজাহান লোদি শাহজাদা পরভেজের আতালিক হতে পারেন। মরুব্বি হিসেবে খুবই ভালো। এমনটি আর পাওয়া কঠিন—

ভাই আসফ খাঁয়ের একথায় নূরজাহান বেগমের ডান চোখ কেঁপে উঠলো। তিনি মনে মনে বললেন, খানজাহান লোদি তোমার পোষা চর ভাইসাহেব! তিনি আসলে তোমার হয়ে শাহজাদা পরভেজকে নজরবন্দী করে রাখবেন! আমিও তাই চাই ভাইসাহেব। ইজফা দিয়ে দিয়ে শাহজাদা পরভেজকে এখন চল্লিশ হাজার ঘোড়সওয়ারের মনসবদার করা হয়েছে। সে এখন আগ্রা থেকে যত দূরে যাবে ততই ভালো। তুমিও তাই চাও ভাইসাহেব! তোমার দামাদ শাহজাদা খুর্রমের জন্যে আগ্রার রাস্তা পরিষ্কার রাখতে শাহজাদা পরভেজকে তোমার নজরে রাখতেই হবে!

বাদশা জাহাঙ্গীর বললেন, তাই হোক। খানজাহান লোদির মাথাটি পাকা। বিজাপুর গোলকুন্ডার ওপর নজর রাখতে পারবেন।

বলতে বলতে বাদশার হাই উঠলো। তার মানে শাহী ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে অনেক মেহনত—অনেক পরেশান গেল—এবার উজিরে আজম মানে মানে বিদায় নিতে পারেন।

ইঙ্গিতটা না বোঝার নয়। আসফ খাঁ যা চাইছিলেন—তা পেয়ে গেছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কুর্নিশ করে যেমন এসেছিলেন—তেমনই চলে গেলেন।

বাদশা জাহাঙ্গীর রেকাবি থেকে আরেকটা কাবুলি পিচ তুললেন। খাবেন। বেগম নূরজাহান এগিয়ে এসে সে-হাত আলতো করে চেপে ধরলেন। আর নয় আলমপনা—হেকিম সাহেবের কথা মনে নেই?

সাজে, রূপে নূরজাহানকে এখনো তাকিয়ে দেখার মতো। তাই মনে হলো বাদশার। জাহাঙ্গীর চোখ না সরিয়ে বললেন, আরেকটা খাই। পিচগুলো খুব ভালো—

—কাল আবার খাবেন বাদশা। সন্ধে থেকে আঠাশটা খেয়েছেন।

—খুব মিঠাজ—

—সে জন্যেই তো বারণ করছি আলা হজরত। মিঠাজে হেকিম সাহেবের নিষেধ, মনে নেই আপনার?—বলতে বলতে নূরজাহান বেগম বসে পড়লেন। চোখ ছলছল করে উঠলো।

—আচ্ছা খাবো না। চোখ মোছো বেগম।

নূরজাহানের দু'চোখেই তখন দু'ফোঁটা জল টলটল করছে। তিনি চোখ না মুছেই বললেন, এই এত বড় দুর্গে আপনার কিছু হলে কেউ দেখার নেই আমাকে—

হো হো করে হেসে উঠলেন বাদশা জাহাঙ্গীর। শোনো বেগম—আমি এখনই চলে যেতে চাই না। বরং আরও অনেক—অনেকদিন আমি জিন্দা থাকতে চাই—

—তাই থাকুন জাঁহাপনা। হাজার বরষ সহি সলামত থাকুন। তাই তো চাই—

বাদশা জাহাঙ্গীর দু'হাতে নূরজাহানকে জড়িয়ে নিজের বুকে নিলেন। জানো বেগম—এই আগ্রা দুর্গ আব্বা হুজুর আকবর বাদশা খুব মজবুত করে বানাতে হুকুম দিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু—

—কিন্তু কী?

—আমার মনে হয়—এ দুর্গ তেমন মজবুত নয়। এখানে সন্ধের পর সব জায়গায় আলো পৌঁছয় না। অন্ধকার অন্ধকার গলিঘুঁজি, চত্বর, ঢাকা-পথ পেরোবার সময় আমার মনে হয় কি জানো?

বাদশার বুকের ভেতর নূরজাহান বেগম কেঁপে উঠলেন, কী জাঁহাপনা?

—ওই অন্ধকারে কে যেন আমার জন্যে বসে আছে—সব সময় বসে থাকে—

—কে?

মৃত্যু। কেমন সে-মৃত্যু জানি না বেগম। এখান থেকে চলে যাবার পরোয়ানা হাতে নিয়ে এই বুঝি সে বেরিয়ে এলো আলোতে—!

নূরজাহান বেগম বাদশাকে দু'হাতে জাপটে ধরলেন। আপনি যতদিন—আমিও ততদিন এখানে—

—না নূরজাহান। তোমার মতো সুন্দর জিনিসের জিন্দা থাকা দরকার। তুমি চলে গেলে দুনিয়া খুব গরিব হয়ে যাবে।

নূরজাহান বুঝতে পারছিলেন, তাঁকে ধরে থাকা বাদশার বাঁ হাতখানি আপনা আপনি কাঁপছে। নিয়মিত আফিম। এবেলা ওবেলা মোট চার গুলি। সেই সঙ্গে সিরাজি, খোবানি, পিচ। তারপর তো আছেই দমপোক্ত, দুনিয়াজা—রসুইখানার নিত্যদিনের গরগরে সব রান্না। শাহীখানায় নিরামিষ সুখিয়ানার কোনো বালাই-ই নেই! সেই তুলনায় ঘোড়া দাবড়ানো, হাতির পিঠে বসে মাঠভাঙা—কোনোটাই ঘটে ওঠে না বাদশার—অনেকদিনই।

—আমার জন্যে আপনাকে থাকতেই হবে। তাজা, জওয়ান বাদশা চাই আমি। এই আমার মুনাসিব জাঁহাপনা। আমি যতদিন—ততদিন আপনার তাজগি, জওয়ানি ধরে রাখতে হবে—

আমি তো তাই থাকতে চাই নুরজাহান। বুড়াপা কে চায়! বেগম আমি শওসাল জিন্দা থাকতে চাই। জিন্দার মতো জিন্দা। তাজগি, জওয়ানির চেয়ে সুন্দর আর কী আছে?

—আপনি থাকলে এই আগ্রা দুর্গে আমি আজাদ। আপনি না থাকলে এই দুর্গ আমার কাছে কয়েদ।

—তা কেন বেগম? শাহজাদাদের কাছে তুমি বাদশা-বেগমের ইজ্জত পাবে—

নুরজাহান বেগম নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর প্রায় ফোঁস করে উঠলেন, খুর্রমকে সুবেদার করে পাঠানো হলো দক্ষিণে। তখনই তার মাথা গরম হয়ে গেল। কোনো কথা শুনতে চায় না। আপনি থাকতেই সে এমন বিগড়ে যায়—আপনি না থাকলে সে কী করতে পারে ভাবলে আমি শিউরে উঠি জাঁহাপনা।

—শাহজাদা পরভেজ কি তোমার হুকুমে তাকে শায়েস্তা করেনি? দু'দুবার দক্ষিণে তাড়া করে গেছে। সেখান থেকে তাড়িয়ে বাগী খুর্রমকে বাংলায় কোণঠাসা করেনি? সেখান থেকে তাড়া করে আবার দক্ষিণে—

—এখন শাহজাদা সবে দক্ষিণের সুবেদার। ইজফা পেয়ে চল্লিশ হাজার ঘোড়সওয়ারের মনসবদার। সাপের পাঁচ পা দেখতে কতক্ষণ!

—সে জন্যেই তো তোমার কথায় শাহজাদার আতালিক মহাবত খাঁকে বাংলায় সুবেদার করে পাঠালাম বেগম।

—বেয়াড়া শের মহাবত খাঁ জানবাজ লড়াকু। তার হাতে শাহজাদা পরভেজের চল্লিশ হাজার ঘোড়সওয়ারের তাগদ তুলে দিলে আগ্রা কি স্থির থাকতে পারতো আলা হজরত?

—তুমি আমার যোগ্য বেগম! একেবারে খাঁটি পরামর্শ দিয়েছিলে—

—তাহলে শুনুন আলমপনা—আমার পরামর্শ হলোঃ মহাবত খাঁকে বাংলা থেকে ডেকে পাঠান—

—কিন্তু এই তো সবে মহাবত বাংলায় গেল। এখুনি?

—হ্যাঁ। এখুনি। আমার খবর—সে বাংলা, বিহার, ওড়িশায় ঘোঁট পাকাচ্ছে। আশরফি মজুত করছে। লশকর জড়ো করছে—

—কিন্তু কী বলে ডাকবো?

—আপনি হিন্দুস্থানের বাদশা। আপনি তো ডাকতেই পারেন।

—তা পারি—

—লাখ লাখ আশরফির হিসেবে মিলছে না। তহবিলে গণ্ডগোল। এই বলে ডেকে পাঠান।

—দ্যাখো বেগম—আমীর মনসবদাররা কোনোদিনই খুঁটিনাটি হিসেব

রাখতে পারেন না। আর মহাবত তো পারবেই না। ওকে তো আমি কদিন চিনি না!

—সে জন্যেই তো ওকে ডেকে পাঠাতে পারেন। ডেকে পাঠাবার জন্যে এর চেয়ে ভালো কারণ আর কী থাকতে পারে?

বাইরে দূরে দুর্গের জানলা দিয়ে তাকালে বোঝা যায়—সন্ধেরাতের আগ্রা এখন জমজমাট। বাদশা জাহাঙ্গীর দূরে তাকিয়ে আলো—মানুষের আবছা চলাফেরা দেখতে পাচ্ছিলেন। শুনতে পাচ্ছিলেন নিচের মাণ্ডি থেকে উঠে আসা মানুষের কলরোল। ওরা সবাই কত সহজে চলাফেরা করে। ভালোবাসে। বিয়ে করে। বাবা হয়। অথচ আমি বাদশা হয়েও কোনোটা কি সেইভাবে পারছি!

নূরজাহান বেগম যেমন এসেছিলেন—তেমনই চলে যাচ্ছিলেন। বাদশা বলে উঠলেন, কোথায় যাচ্ছো? দাঁড়াও—

—কেন? এখন আপনি তো রুবায়-ই শুনবেন—মেয়েরা এসে কিঙ্গিনা বাজাবে—

—যেও না বেগম। বোসো। আজকের সন্ধেটা যেন আমার খোশরোজের সন্ধে।

নূরজাহান ফিরে এলেন। বাদশার সামনাসামনি এসে দাঁড়ালেন। জাহাঙ্গীর যখন শুধুই সেলিম ছিলেন—সেই কাঁচা বয়স থেকেই মানুষটিকে তিনি দেখে আসছেন। তাজা বয়সের সেই ঝলসানো হাসি—চোখের অনেকটাই এখন আর নেই। তবু কী এক সরল খুশিতে মুখখানা হেসে উঠেছে এইমাত্র।

বাদশা বললেন, নাসিক থেকে দূত এসেছিল—

—মানে?

—বাগী খুর্রম আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে।

—ওঃ!

—আর—তোমার কাছে সে করুণা ভিক্ষা করেছে—

—তাই বুঝি! আপনি কী করবেন ঠিক করলেন?

—হিন্দুস্থানের সেরা লড়াকু খুর্রম। একসময় চিতোরকে বশে এনেছে। মালিক অম্বরকে শায়েস্তা করেছে। মাসুম বাচ্চাদের নিয়ে কতদিন বনে জঙ্গলে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে ভাবো তো। একসময় তো সে শাহী পতাকা তুলে ধরেছিল। আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো—

.—হিন্দুস্থানের সেরা বেইমানকে ক্ষমা তো করবেনই জাঁহাপনা! বিলোচপুরে যদি মালব আর গুর্জরের ফৌজ তার সঙ্গে মিলতে পারতো—তাহলে আজ?

থতমত খেয়ে গেলেন বাদশা জাহাঙ্গীর। কী বলতে চাও বেগম? তোমার কাছে সে করুণা ভিক্ষা করেছে। এই দ্যাখো তার চিঠি—বলতে বলতে বাদশা কোমর থেকে ভাঁজ করা কাগজখানি বের করলেন। আজই নাসিক থেকে শাহজাদা খুর্রমের কাসীদ এসে দিলো—

—ও চিঠি আমি দেখবো না আলমপনা। করুণা আর ক্ষমার ফারাকটা কি? শুধু বলতে চাই—দু'বছরেরও বেশি হয়ে গেল—মনে হয় এইতো সেদিন বিলোচপুরের মাঠ-ঘাট খা খা রোদে পুড়ে যাচ্ছিল—সেদিন যদি বিলোচপুরে গুর্জর আর মালবের সুবেদাররা এসে আপনার পেয়ারের বাবা খুর্রমের সঙ্গে হাত মেলাতে পারতো—তাহলে আপনার সঙ্গে আমিও আজ কয়েদখানায়—

রাগে, ঘৃণায় বাদশা জাহাঙ্গীরের হাতের ভেতর শাহজাদা খুর্রমের চিঠিখানি দলা পাকিয়ে গেল! আমি কী করতে পারি বেগম?

—ইমানদারের সঙ্গে ক্ষমা চলে জাঁহাপনা। বেইমানকে করুণা করলে সে ভাববে—আমরা বুঝি ডরপোক্!

—তাহলে?

—মাসুম বাচ্চাদের তো কোনো দোষ নেই। আপনি রাওয়ালপিণ্ডি যাচ্ছেন কান্দাহার যাবার রাস্তা সরেজমিনে দেখতে। লিখে দিন—দারা, আওরঙ্গজেবকে রাওয়ালপিণ্ডির দুর্গে আপনার কাছে পাঠাক। কখন কি মতি হয় শাহজাদার বলা যায় না। ওরা দু'ভাই আপনার কাছে জামিন থাকবে। সুজাঙ্গীরের সঙ্গে ওরা থাকবেও ভালো।

—চমৎকার বেগম। চমৎকার! আমি এলাহাবাদের সুবেদার থাকতে আগ্রার দিকে ফৌজ নিয়ে এগোচ্ছিলাম। আব্বা হুজুর আকবর বাদশা শুধু বলে পাঠান—অল্প কিছু ফৌজ নিয়ে আগ্রায় এসো—নয়তো এলাহাবাদ ফিরে যাও।

—আলা হজরত। আকবর বাদশার কাল কবেই কেটে গেছে। খুর্রমকে আরও জানিয়ে দিন—আসিরগড়, রোহতাস্—আর আর যেসব দুর্গে তার ফৌজ এখনো লড়াই দিচ্ছে—বন্দুক নামিয়ে তাদের ধরা দিতে হবে।

বাদশা জাহাঙ্গীর এগিয়ে এসে নূরজাহান বেগমের কপালে আলতো করে চুমু খেলেন। তুমিই হিন্দুস্থানের উজিরে আজম হতে পারো বেগম!

—তার আর দরকার নেই! আমার নামে মোহর কাটাই হলো। মাণ্ডিতে গিয়ে তার নাম হয়ে গেল মেহের! মনে নেই জাঁহাপনা? এবার শেষ কথাটি লিখে দিন—খোদ খুর্রমকে বাদশার মোবারকে হাজির হতে হবে।

জাহাঙ্গীর পিছিয়ে এলেন। সোজা নূরজাহানের চোখে তাকিয়ে বললেন, একজন মরদকে তার ছেলে—বন্দুক—সব জমা দিতে বলার পর তাকে যদি হাজির হতে বলা হয়—তো সে মরদের আর থাকে কী বেগম?

—আপনি নিশ্চয় জানেন বাদশা—বাগী খুর্রম ইস্পাহানের বাদশা শাহ আব্বাসের কাছেও লোক পাঠিয়েছে— ?

জাহাঙ্গীর কোনো কথা বলতে পারলেন না। মাথা নিচু করে মেঝের গালিচায় তাকালেন।

—আপনার কানে একথাও এসেছে—খুর্রম বাদশা আব্বাসকে জানিয়েছে মদত পেলে সে ইস্পাহানের বাদশাদের হাতে আগ্রাকে তুলে দিতে পারে। সত্যি কি না?

—হ্যাঁ বেগম। সত্যি।

—এরপরেও তাহলে আপনি শাহজাদার মরদানি নিয়ে মাথা ঘামাবেন ?

জাহাঙ্গীর এবারও কোনো কথা বলতে পারলেন না।

—এক শাহজাদার ব্যাপারে আপনি এত অন্ধ ? আরেক শাহজাদার দিকে আপনি ফিরেও তাকান না !

জাহাঙ্গীর মুখ তুলে তাকালেন।

—বেইমানির পরেও এক শাহজাদাকে আপনি ক্ষমা করতে পারলে সবচেয়ে সুখী হন ! আরেক শাহজাদার দিকে তাকাবার সময়ই পান না। বাঃ ! চমৎকার একজন বাবা আপনি। বাগী খুর্রমকে ক্ষমা করে আপনি দুনিয়ার চোখে আকবর বাদশা হতে চান ? যেমন কিনা আপনার জওয়ানিতে আকবর বাদশার ক্ষমা পেয়েছিলেন।

—না বেগম। না—বলতে বলতে জাহাঙ্গীরের মনে পড়লো, বাগী শাহজাদা উজিরে আজমের দামাদ। কচি শাহজাদা বাদশা-বেগমের দামাদ। ভাই বোন যে-যার রাস্তা ধরে চলেছে। মাঝখান থেকে হিন্দুস্থান বিপন্ন হয়ে পড়ছে না তো ? এই ইরানিদের ঠিক ঠিক বুঝে ওঠা ভার। আজ যদি আমার পাশে শাহজাদা খসরু থাকতো !

—শারিয়ারও একজন শাহজাদা। তার শান-সওকতের জন্যে আপনি কোনোদিন কিছু করেছেন ?

—সে আমার ছোট ছেলে বেগম। তাকে আমি ভালোবাসি।

—ভালোবাসুন। কিন্তু সে তো আর ছোটটি নেই। সেও এখন একজন মরদ। শাহী ঠাটের সে-ও একজন হকদার। নয় কি জাঁহাপনা ?

বাদশা জাহাঙ্গীর কোনো জবাব দিতে পারলেন না।

নওরোজ উৎসবের দিন আগ্রায় অন্যবারের মতো মেলাও বসেছে। আকবর বাদশা জানতেন—ইনসানের জীবনে খোশরোজ না থাকলে জীবন শুকিয়ে যায়। খুশি মরে যায়। কাজের ইচ্ছা উবে যায়। তাই তিনি হিন্দুস্থানের দেওয়ালি, দশেরা যেমন মানাতেন—তেমনি মানাতেন শবেবরাতের রাত—মিলাদ শরিফ। তাছাড়াও ইস্পাহানের কিছু কিছু উৎসব মেলা তিনি এই হিন্দুস্থানে চালিয়ে দেন। ইনসান খুশিতে থাকুক। খুশিতে থাকলে তার মগজ থেকে নানান খোয়াব বেরোবে। খোয়াবই তো সব কাজের বীজ।

খোদ বাদশার হুকুমে শাহজাদা শারিয়ার আজ নওরোজের পয়লা দিনে শানদার সাজে সেজেছেন। গায়ে চীনা সাটিনের কাম্বাদার। নিচে ফ্রানসিসির বনাতের সুলতানি কুর্তা। কোমরের ডানদিকে কওতল তলোয়ার। যে-ঘোড়াটিতে বসে তিনি এখন আগ্রা দুর্গের আকবরি দরওয়াজা থেকে মোরি দরওয়াজার দিকে কয়েকদখানায় চলেছেন—তার গায়ে রঙিন আলপোষ, কাজাই, লাগাম। শাহজাদার মাথায় উষ্ণীষের সরবন্ধে বসানো ময়ূরের পালকটিও দুপুরের রোদে চকমক করে উঠলো।

দুর্গের ভেতর নিচের গেরস্থালির খোলা জানলায় বসে লাডলি বেগম সবই দেখতে পাচ্ছিলেন। দেখছিলেন—আর গর্বে তাঁর বুক ভরে উঠছিল। এমন সরল, নিষ্পাপ, সুন্দর মুখের মানুষটি আমারই শাহজাদা? বিশ্বাসই হয় না। তিনি এই জানলায় বসে শাহজাদা শারিয়ারের মুখের যেটুকু দেখতে পাচ্ছেন—তাতেই বুঝতে পারছেন—শাহজাদাগিরির শান-সওকতে মানুষটির কতখানি অনিচ্ছা।

গত রাতে লাডলি আর শারিয়ার যখন নওরোজের চাঁদ দেখতে দুর্গের খোলা চত্বরে এসে যমুনার আকাশে তাকিয়ে—নিচের আঙুরিবাগ থেকে তখন টগর, মালতী, হেনার গন্ধ বাতাসে চারিয়ে যাচ্ছিল। নিচে রাজধানী আগ্রায় উৎসবের আলো।

ঠিক এই সময় আম্মিজান এসে হাজির। যেন অন্ধকার কুঁদে ফুটে উঠেছিলেন বাদশা-বেগম-নুরজাহান। এসেই বললেন, একি সাজ তোমার? একদিন তুমি হিন্দুস্থানের বাদশা-বেগম হবে। সেই বুঝে তুমি ঘরের বাইরে বেরোবে লাডলি—

লাডলি এমন আচমকা আম্মিজানকে দেখে অবাক হয়েছিলেন। এই বিশাল—অতিকায় আগ্রা দুর্গে বাদশা-বেগম কখন যে কোথায় থাকেন—তা বুঝে ওঠা ভার। আম্মিজানের চলাফেরাও যেন পা টিপে টিপে—পাথরে তো কোনো শব্দ হয় না।

লাডলি শাহজাদা শারিয়ারের মুখ দেখে বুঝেছিলেন। অন্ধকারেও মনে হলো—শারিয়ারের সুন্দর মুখখানি কেমন কুঁচকে যাচ্ছে।

লাডলি বলেছিলেন, আম্মিজান আমাদের নিয়ে শুধু শুধু কেন টানা-হ্যাঁচড়া করছো। আমরা দিব্যি আছি।

প্রায় ধমকে উঠেছিলেন নুরজাহান বেগম। আম আতরাফ হয়ে থাকবার জন্যে আমার পেটে জন্মাওনি তুমি। একদিন বাদশা-বেগম হয়ে সারা হিন্দুস্থানে তুমি রোশনি দেবে। আর শারিয়ার—

শাহজাদা শারিয়ার যেন চমকে উঠেছিলেন। নিজের নামটা বাদশা-বেগমের মুখ থেকে বেরনো মাত্র শাহজাদা শারিয়ার ওই অন্ধকারেই নুরজাহান বেগমকে পর পর তিনবার কুর্নিশ করলেন।

—কাছাকাছি কোনো দাখিলা রাখোনি কেন? একজন হাজিরাও তো হাতের কাছে নেই। এই অন্ধকারে তোমাদের তো পাহারা থাকা দরকার—

শাহজাদা শারিয়ার যথেষ্ট বিনয় করেই বলেছিলেন, মুলুকে মালিকা—আমরা তো কোনোরকম দাখিলা-হাজিরা-পাহারা ছাড়াই এতদিন আগ্রা দুর্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি। যমুনার চরে শিকারে যাচ্ছি। মোতি মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায় করতে যাচ্ছি। কোনো অসুবিধে তো হয়নি। কে আমাদের ক্ষতি করবে! তেমন তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

—যারা ক্ষতি করে তাদের সহজে দেখা যায় না শাহজাদা শারিয়ার।

শারিয়ার চুপ করে ছিলেন। আম্মিজানের গলা শুনে লাডলি বেগমের মনে

হচ্ছিল—ওই গলার স্বরে শাহী হুকুমত ঘুমিয়ে আছে।

—তুমি একজন শাহজাদা। হিন্দুস্থানের বাদশা বেগনের দামাদ। তুমি আমার চোখের মণি শারিয়ার। আমার একমাত্র মেয়ে তোমার হাতে। এখন থেকে তুমি আর ওভাবে বিনা দাখিলা-হাজিরা—বিনা পাহারায় বেরোতে পারো না। যদি কোনো বিপদ নেমে আসে—

—কিসের বিপদ ?

—কিছুই তো বলা যায় না। একদিন তুমি হিন্দুস্থানের বাদশা হবে। হঠাৎ বিপদ হতে কতক্ষণ লাগে! তুমি সেই আগেকার শারিয়ার আর নও। হিন্দুস্থানের ভাবী বাদশা তুমি—

—না বলে অন্ধকারের ভেতর চেঁচিয়ে উঠেছিলেন শাহজাদা শারিয়ার সে চিৎকারে লাডলি বেগমও চমকে ওঠেন। গত রাতে অন্ধকারের ভেতর দুর্গের খোলা চত্বরে ফুটে ওঠা নূরজাহান বেগম কিন্তু একটুও ঘাবড়াননি। অন্তত আম্মিজানকে দেখে তাই মনে হয়েছিল লাডলির।

তখনো শাহজাদা শারিয়ার চেঁচিয়ে বলে যাচ্ছিলেন। আমি শাহজাদা শারিয়ার। আমার আব্বা হুজুর বাদশা জাহাঙ্গীর। আমার আম্মিজান কে ছিলেন—জানি না। কোনোদিন দেখিনি তাঁকে। তিনি এখন জন্নতবাসী, না জিন্দা ? তাও জানি না আমি। শুনেছি—আমার আম্মিজান একজন আম-আতরফ আওরত ছিলেন—

—তাতে কী যায় আসে শারিয়ার। চাঘতাই মুখলরাও তো একদিন পাহাড়ি রাস্তায় ঘোড়ার পিঠে গান গাইতে গাইতে বনপথে ঘুরে বেড়াতো। বাদশার বাদশা তৈমুর কী ছিলেন একসময় ? তাঁর তো শাহীয়ানা বানাতে কোথাও আটকায়নি ? তাঁর চেয়ে বড় বাদশা আজ অব্দি কে হতে পেরেছেন ?

চাপা শান্ত গলায় শাহজাদা শারিয়ার বলেছিলেন, আমি আর লাডলি আগ্রা দুর্গের এক কোণে যেমন পড়ে আছি—তাই থাকতে দিন আমাদের। আমরা সুখে আছি। আমাদের জন্যে কারও শান্তি নষ্ট হচ্ছে না বাদশা-বেগম—

—ওসব কথা যা বলেছো—আর কখনো বোলো না শারিয়ার। হিন্দুস্থানের ভাবী বাদশার মুখে অমন কথা মানায় না। কাল নওরোজের পয়লা দিন। বাদশার হুকুম—তাঁর হয়ে শাহজাদা শারিয়ার নওরোজের পয়লা দিনে কিছু কয়েদিকে আজাদ করে দেবেন। এটাই আগ্রার শাহী আদব—

দুর্গের এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় খুব শান-সওকতে মিছিল করে যাওয়া। শাহজাদা শারিয়ার বিরাট এক স্তম্ভের আড়ালে পড়ে যাওয়ায় লাডলি বেগম তাঁকে আর দেখতে পেলেন না।

শারিয়ার শুনেছেন—এই আগ্রা দুর্গেই বিরাট কয়েদখানা আছে। কিন্তু দেখেননি কোনোদিন। এমন ধরাচুড়ো পরে কোথাও যাওয়া শারিয়ারের ধাতে নেই।

নেহাৎ বাদশার হুকুম। এ হুকুম বাদশা-বেগম নিশ্চয় যোগাড় করেছেন।

তাঁর মনে হলো—তাগদের একটা আলাদা নেশা আছে। নয়তো এত বড় দুর্গে লাডলির আত্মিজান কোনো শব্দ না করে কেমন এ-চত্বর থেকে ও-চত্বরে চলে যান। হঠাৎ হাজির হন। হঠাৎ মিলিয়ে যান। কথা বলেন—অনেক ভেবে—চেপে চেপে—ফি-লবজে আলাদা একটা জোর দিয়ে—ফি-কথায় মাপসই ফাঁক রেখে।

মোরি দরওয়াজার পেছনেই যমুনা। এই দরওয়াজা আর হাতিশালার মাঝে সরু মতো ঢাকা রাস্তা। ভেতরটা অন্ধকার। ঘোড়া থেকে নেমে আগু পিছু পাহারার ভেতর শাহজাদা শারিয়ার এগোতে লাগলেন।

আচমকা মাথার ওপর দিয়ে বাদুড় উড়ে গেল। অজানা কী এক গন্ধ। শারিয়ারের মনে হলো—এ রাস্তা বোধহয় আর শেষ হবে না। সামান্য আলো আসছিল কোন্ ঘুলঘুলি দিয়ে। সামনের পাহারা পা দিয়ে কী একটা সরিয়ে দিলো। ফিনফিনে মখমলের মতো।

শাহজাদা দাঁড়িয়ে পড়তেই পাহারা খুবই সম্ভ্রমে মাথা নিচু করে বললো, ও কিছু নয়! সাপের খোলস—

—সাপ এখানে আসে—

—প্রায়ই আসে। পাশেই তো যমুনা।

—বিষ আছে?

—গত পূর্ণিমায় খোলস ফেলে গেছে। বিষ থাকতেও পারে—

একদম সামনে মশালচি। খানিক এগিয়ে সে মশালটা পাথরের দেওয়ালে ঘষে নিভিয়ে ফেলছিল। শাহজাদা শারিয়ার চেঁচিয়ে উঠলেন, নেভালে কেন?

—সামনেই তো আলো—

একটু এগিয়ে শারিয়ার চোখ বাঁধানো আলোর সামনে পড়ে গেলেন।

—এ কী?

পাহারা হাসলো। হুজুর ওই তো যমুনা। ওই তো আশমান!

শারিয়ার দেখলেন, সত্যিই তো। তাঁর বুঝতে কষ্ট হলো না—দুর্গ এমন ভাবেই তৈরি—দুর্গ চাতালের নিচেই যমুনার তীর ঘেঁষে কয়েদখানা। সেখানে আলোর কোনো অভাব নেই। কারণ, যমুনার জল সই সই কয়েদখানায় মেঝে। ভাঙা তীর ঘেঁষে বড় বড় জানলা।

কপিকল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গালপাট্টা সব চৌহান রাজপুত পাহারা টানা তক্তার পোল তুলে দিলো। আর অমনি—সে কী চিৎকার!

পায়ে বেড়ি। কারও বা কাঁধে কাঠের বিরাট তক্তা বসানো। সেটা নিয়ে তার শোয়া বসার উপায় নেই কোনো। ওই নিয়েই তাকে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। কুঁজো হয়ে। গালের দাড়ি বুকে। কোমরের শতছিন্ন কাপড় উরুতে বসে গেছে। তারই ভেতর কোড়া হাতে ভীষণ দেখতে সব তাতার। হাত থেমে নেই তাদের। সপাং। সপাং। শাহজাদার সামনে কয়েদীদের সযুত, সহবত মোতাবেক রাখতে গিয়ে তারা হিমশিম খাচ্ছিল।

কতজন কয়েদী হবে? তা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না শাহজাদা।

তাঁকে গিয়ে উল্টোদিকের দরওয়াজায় দাঁড়াতে হলো। শারিয়ার বুঝলেন, এ-পথেই ওদের আজাদ করা হয়ে থাকে।

শারিয়ার গিয়ে দাঁড়াতেই একসঙ্গে পণব, বাঁশি বেজে উঠলো। তিনি বুঝেই উঠতে পারলেন না, নক্কারখানা থেকে বাজনদাররা কখন তাঁর সঙ্গে এসেছে।

কাঁপিকলে পাথরের দেওয়াল খানিক ওপরে উঠলো। কয়েদীদের সে কী হুড়োহুড়ি। একজন বেশ বুড়ো—চোখ দুটি গম্ভীর—গায়ের এক সময়কার কুর্তা কোমর অব্দি নেমে ছিঁড়ে খুঁড়ে উধাও—এগিয়ে আসছিল। তাতার পাহারাদারের কোড়া খেয়ে পড়ে গেল।

বোটকা গন্ধ। তার ভেতরেই কাছেই কোথাও রান্নার আয়োজন থেকে চোখ জ্বালা করা ধোঁয়া। শাহজাদা থাকতে পারলেন না। এগিয়ে গিয়ে বুড়ো মতো মানুষটিকে টেনে তুললেন।

বুড়োর মুখে কোনো কথা নেই। চোখ জলে ভরে গেছে।

ব্যাপারটা অল্পক্ষণের। গুনে গুনে চব্বিশ জনকে বেরিয়ে যাবার দরজার সামনে এনে দাঁড় করানো হলো। বেশিরভাগই উলঙ্গ। গায়ে কারও কিছুই নেই। হাতে পায়ে বড় বড় নখ। বাকিরা জবাইখানার ভেড়ার চেয়েও করুণ স্বরে চিৎকার করে উঠলো।

শাহজাদা সেই ভিড়ে আর দাঁড়াতে পারলেন না। চোখ গম্ভীর বুড়োটিকে নিজেই এক ধাক্কায় খালাস কয়েদীদের ভেতর ঠেলে দিলেন। দিয়ে এক ছুটে যে-পথে এসেছিলেন—সেই অন্ধকার ঢাকা পথ ধরে মোরি দরওয়াজার দিকে ছুটে গেলেন।

যমুনার দিকে পিঠ ফেরানো আগ্রা দুর্গের মোরি দরওয়াজার কথাই শুধু আগ্রা জানে। এই দরজা দিয়ে হাতির নাদ, দুর্গের আবর্জনা নিত্যদিন বের করা হয়।

কিন্তু কয়েদী-আজাদ তক্তাপোলের কথা বিশেষ কেউ জানে না। যমুনার ভাঙা পাড়, কাশবন, বালিচর ভেঙে সদ্য আজাদ পঁচিশটি প্রায় উলঙ্গ মানুষ দুপুর দুপুর খোলা দুনিয়ায় বেরিয়ে এলো।

ছেঁড়া কুর্তা গায়ে গম্ভীর চোখ বুড়ো মানুষটি মাথা তুলে পেছনে তাকালো। আগ্রা দুর্গ। যমুনার দিককার ওই ছ-কোণা সামান-বুরুজটা তো আগে ছিল না। তাহলে আমি কয়েদ হবার পর তৈরি হয়েছে।

পেছন ফেরায় বুড়োর মাথা ঘুরে গেল। এই দুপুরেও শীত করছে। গায়ে জোর বলতে কিছু নেই। দুর্গের ওপাশেই রাজধানী আগ্রা। কিন্তু সেখানে তো যাওয়া যাবে না। কোমরের নিচে যে কিছুই নেই। সন্ধের সঙ্গে অন্ধকার আসুক। তখন যমুনার পাড় ধরে ধরে ওপারে যাওয়া যাবে।

বুড়ো সামনের দিকে তাকালো। আরে! অতগুলো উদোম মানুষ কোথায় গেল! বুড়ো একটু উঁচু হয়ে দাঁড়াতে গেল। পা কেঁপে গেল। নাঃ। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। দুর্গের ছায়া চরের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। তার

বাইরেই রোদে দূরে দূরে ঝুপড়ি। অনেকদিন এক জায়গায় কয়েদ থেকে থেকে পা তেমন সযুত নয় যে দুমদাম এগিয়ে যাওয়া যাবে। চোখেও খোলা দুনিয়ার এত আলো একসঙ্গে সইছে না। বুড়ো একটা ঢিবির ওপর বসে পড়লো। যমুনার জল—মাঝে মাঝে জাগা চর—তার ওপর আগ্রা দুর্গের ছায়া—এইসব সামনে রেখে প্রায় উলঙ্গ মানুষটি নিজেকে মনে করার চেষ্টা করতে লাগলো। আমি কে ? কে আমি ?

. কী খেয়াল হতে জলের কাছাকাছি নেমে গিয়ে নিজের মুখ দেখতে চেষ্টা করলো বুড়ো। কতদিন আরশির সামনে দাঁড়াইনি। নদীর জল বড় অস্থির। তাতে ছায়া দেখা যায় না। ভেঙে যায়।

আজ নওরোজের পয়লা দিন। উৎসব চলবে কয়েকদিন ধরে। রাতে তো রাজধানী আলোর মালায় সাজবে আজ অনেক ফুল চাই। বিকেল থেকে আগ্রার চবুতরা ফুলে ফুলে ভরে যাবে। এ ক'দিন দরও খুব চড়া।

মীনাক্ষী বিকেলের ফুলের পসরা গোছা গোছা করে সাজিয়ে রাখছিল। খানিক দূরে মীর সফি খুব মন দিয়ে চরের উঁচু জায়গায় বাঁশ আর কুড়িয়ে আনা কাঠ দিয়ে মাচান বানাচ্ছে। এই গরম আসছে এখন। কখন যে যমুনা ফুলে ফেঁপে উঠবে তা কেউ বলতে পারে না। বিশেষ করে পয়লা বর্ষার পর নদী বলকা দিয়ে ফুলে ওঠে। তখন ক'দিনের জন্যে ফুলটুল নিয়ে উঁচু জায়গায় গিয়ে উঠতে হয়। সে জন্যেই এই মাচান বানানো।

যতদূর দেখা যায়—ধু ধু চর। দূরে দূরে তরমুজ চাষীদের মাথা, পিঠ দেখা যায়। ওরা এখন ফল তুলতে ব্যস্ত। ফুটি, তরমুজ প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে। ফুলে, ফলে দূর দূর জায়গা থেকে মৌমাছি এসে বসছে। আবার উড়েও যাচ্ছে।

মীনাক্ষী আনমনে কুঁড়ির দশা বেলি ফুলের কয়েক থোকা তুলে কোঁচড়ে রাখতে যাবে—এমন সময় তাকে হাত ধরে কে টানলো। ভূত দেখলেও এতটা চমকাতো না মীনাক্ষী। মানুষ নয়। অথচ মানুষেরই মতো। প্রায় উলঙ্গ। গালভর্তি দাড়ি। বুকে কতকালের ময়লা। চোখ ঝুলে পড়েছে। এমন তিন চারজন পুরুষ তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। একজনের পিঠের চামড়ায় একটা কামিজ বসে গিয়ে ছিঁড়ে ঝুলছে।

এক ঝটকায় হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে মীনাক্ষী পড়িমড়ি করে দৌড় দিলো। বেলিফুলের আলে ভাগ করা সাদা মাটির ভেতর দিয়ে।

—সফি-ই-ই—

গলা চিরে গেল মীনাক্ষীর। ছুটতে ছুটতে সে পায়ে পা বেঁধে টগর সারির ভেতর হড়কে পড়ে গেল।

এমন ভয় পাওয়া চিৎকারে মীর সফি মাচানের ওপর থেকে ছুটে এলো। হাতে দা। মীনাক্ষী তখন মাটিতে পড়ে হাঁফাচ্ছে। আর বাকি চর জায়গা যেমন ছিল তেমনই আছে। সফি আস্তে মীনাক্ষীকে ধরে তুললো। কী হলো ?

মীনাক্ষী কোনো কথা না বলে সফির বুকে মাথা রেখে হু হু করে কেঁদে উঠলো।

—কী হয়েছে? বলবে তো—বলতে বলতে সামনে চোখ পড়লো সফির। জনা চারেক মানুষেরই মতো দেখতে লোক—কেউ হামাগুড়ি দিয়ে—কেউ বা দাঁড়িয়ে উঠতে উঠতে এগিয়ে আসছে।

সঙ্গে সঙ্গে সফি বাঁ হাতে মীনাক্ষীকে ধরে ডান হাতে দা উঁচু করলো।

—এক পা এগোলে মুণ্ডু নামিয়ে দেবো—

মানুষই হবে। গায়ে প্রায় কিছুই নেই। দাড়িতে, মাথার চুলে চোখ মুখ দেখা যায় না। ওরা থমকে দাঁড়ালো। চরে আশপাশে কেউ নেই। ততক্ষণে মীনাক্ষী নিজেকে সামলে নিয়েছে

—দা-খানা তেড়ে ধরো তো। আমি আসছি—বলেই মীনাক্ষীর হাতে লম্বা দা ধরিয়ে দিয়ে মীর সফি এক ছুটে ঝুপড়ির ভেতর ঢুকেই একটা বন্দুক হাতে বেরিয়ে এলো।

বন্দুকটা অনেকদিনের পুরনো। মীনাক্ষী জানে ওতে গুলি নেই। জৌনপুর ছেড়ে আসার সময় সফি ওটা যোগাড় করেছিল। সেই থেকে ঝুপড়ির কোণে পড়ে থাকে। রাতের অন্ধকার বেজি, গন্ধগোকুল, খটাশ তাড়াতে প্রায় লাঠির মতোই ওটার ব্যবহার হয়।

সেই বন্দুক বাগিয়ে পাকা ফৌজি ঢংয়ে এককালের আহেদি মীর সফি টান টান দাঁড়ালো। একটা একটা করে গুলি করে ফেলে দেবো এবার—

অমনি একেবারে সামনের দাড়িওয়ালা লোকটা—বয়স হয়েছে—একদম মাটিতে শুয়ে পড়ে কেঁদে কঁকিয়ে উঠলো। মেরো না। দয়া করে মেরো না—ভুল হয়ে গেছে—

বাকি তিনজনও মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে এগোতে কেঁদে উঠলো। যেন তিনটে জানোয়ার। মানুষ নয়। গলার স্বর অব্দি বুকের ভেতরের পাঁজর থেকে উঠে আসা কোনো যন্ত্রণা যেন। কথা হয়ে ফুটতে পারছে না।

দা হাতে মীনাক্ষী থমকে গেল। থমকে গেল মীর সফি। তাদের সামনে নিশ্চিত মৃত্যু জেনে ধরা দেওয়া চারটে জন্তু। মাটিতে পড়ে আছে।

পা হড়কে পড়ে যাওয়া মীনাক্ষীর ডান হাতের কনুই অনেকটা ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিল। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে মীনাক্ষী চেঁচিয়ে জানতে চাইলো, তোমরা কারা? কোত্থেকে এলে?

একেবারে পেছনে ঘাড়ে গর্দানে মানুষটা দাড়িতে মুখ ঢাকা, অল্পবয়সীই হবে—সামান্য মাথা তুলে বললো, আমরা আজই ছাড়া পেয়েছি। আমাদের মেরো না। একটু রহেম করো। খোদার কসম—

বন্দুক সরিয়ে নিয়ে লাঠির মতোই সেটার ওপর ভর দিয়ে মীর সফি জানতে চাইলো, কোথায় আটক ছিলে?

—দুর্গে। কয়েদখানায়।

এবার চারটি উলঙ্গ মানুষ একই সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। ওদের বুকের পাঁজর

আলাদা আলাদা দেখা যাচ্ছে। গায়ে তো প্রায় কিছুই নেই—সেজন্যে মীনাক্ষীর সামনে ওদের কোনো হায়া—বা হ্যাৎ ক্যাৎ নেই। যার চামড়ায় গায়ের কামিজ ছিঁড়ে বসে গেছে—সে পিঠ চুলকোতে গিয়ে বাঁ হাতের বড় বড় নখে কামিজের পচা খানিকটা তুলে ফেললো।

—কতদিন কয়েদ ছিলে?

সামনের বুড়োটার চোখ যেন ঝুলে পড়েছে। মাথাটি প্রায় সাদা। বুক অব্দি পাকা দাড়ির কয়েকটি এখনো কালো। কেমন ছন্ন চোখে সে শান্ত গলায় বললো, মনে নেই।—তারপর একটু থেমে বললো, বেমালুম ভুলে গেছি!—বলেই একগাল হাসলো। সরল হাসি। ওপর নিচে মিলিয়ে বড় জোর সাতআটটা দাঁত আছে মুখের ভেতর।

সফি জানতে চাইলো, দাঁত কি হলো!

বুড়োটা গম্ভীর হবার চেষ্টা করতে করতে বললো, বয়স তো হলো। ও জিনিস তো বসে থাকার নয়!

অল্পবয়সী মানুষটা আপত্তি করে উঠলো। না—মেরে উড়িয়ে দিয়েছে—

মীর সফি বললো, তোমরা তাহলে কয়েদি। তাই বলো। তা কোথায় যাবে?

সামনের সেই বুড়ো ধপাস করে মাটিতেই থেবড়ে বসে পড়লো। তা তো জানি না—

—সে কিরকম? তোমার বাড়ি ঘরদোর?

—ছিল! এখন কি আর আছে? এতদিন কি থাকে!

—কোথায় ধরেছিল তোমায়?

অনেকক্ষণ চুপ থেকে বুড়োটা বললো, বোধহয় ফতেপুর। না না—দেওরাসে। না ফতেপুরেই হবে—

—তাও মনে নেই তোমার!

—অনেকদিনের কথা তো। সব গুলিয়ে গেছে। হাতিতে হাওদায় বসে আকবর বাদশা যাচ্ছিলেন—

—আকবর বাদশা?

—হ্যাঁ। সেই জুলুসের ভেতর পড়ে যাই। আমার মেয়ের হাত ধরে যাচ্ছিলাম—বলতে বলতে বুড়ো মানুষটি অন্যমনস্ক হয়ে গেল। ঘোড়সওয়ার দু'পাশে কোড়া মারতে মারতে ছুটে এলো। বৃষ্টি হচ্ছিল। মেয়েটা হাত পিছলে কোথায় যে চলে গেল—

—তুমি?

—বাদশার যাবার রাস্তা থেকে আমাদের তুলে নিয়ে গেল কোতোয়াল। যেমন নিয়ে যায়!

মীর সফির বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। আমি নিজেও তো একসময় জাহাঙ্গীর বাদশার যাতায়াতের রাস্তা সাফ করে লোকজন তুলে নিয়ে গেছি।

সফি খুব আস্তে বললো, কবেই আকবর বাদশার কাল কেটে গেছে!

সেলিম জাহাঙ্গীরের বাদশাহীও বিশ বছর হয়ে গেল—

বুড়ো মানুষটি আগেকার সেই ছন্ন মতো চোখে প্রায় বিড়বিড় করে বললো, একবার ফাটকে ঢোকাবার পর ওরা তো আমাদের কথা ভুলে যায়!

—তা দেওরাস থেকে আগ্রা দুর্গে?

—ক'বছর আগে আমাদের মাঠ ঘাটের ভেতর দিয়ে কুচ করিয়ে রাজধানীতে আনলো। সাতদিন সাত রাত মাঠ ভেঙে তবে আসি। খাবার বলতে চানা। তা চানা চিবিয়ে তেষ্টা মেটাতে মাঠের ভেতর দীঘির পানি। আর হাঁটতে হাঁটতে ঢুলতে ঢুলতে চোখ বুজে নেওয়া খানিক খানিক। এসে পেঁছতেই তো পাথর ভাঙতে বসিয়েছিল। দুটো শীত দুটো বর্ষা স্রেফ পাথর ভেঙেছি। সেই পাথরেই তো দুর্গের ওই বুরুজ—

বুড়ো বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে যমুনার গায়ে আগ্রা দুর্গের পশ্চিম কোণের ছ'কোণা সামান বুরুজ দেখালো।

বেলা পড়ে আসছিল। আশমান দিয়ে একখানা ফিনফিনে মেঘ গোয়ালিয়র যাবার শাহী সড়কের ওপর দিয়ে দেওরাসের রাস্তা ধরলো। অতিকায়, গম্ভীর আগ্রা দুর্গ রোদ অনুযায়ী তারা ছায়া সরিয়ে নিয়ে এবার শের খাঁ-দের তরমুজ ক্ষেত ছাড়িয়ে আরো দূরে গিয়ে ফেললো। ওই দুর্গ এত শক্ত—এত বড়—কিছুতেই ভাঙা যায় না। ভাঙতে পারলে আর ছায়া পড়তো না।

ওই ছায়ার মতোই সফি আর মীনাক্ষীর মনের ভেতরটা আপনা আপনি গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল। কী একটা ব্যথায় দু'জনেরই বুক ভারি হয়ে এলো।

এই প্রায় উলঙ্গ মানুষ চারটি ফুলের সাদা আলে থেবড়ে বসেছে। মানুষেরই মতো। গায়ে কিছু নেই। পরনেও কিছু নেই। গাল ভর্তি দাড়ি। মাথা ভর্তি চুল। বহুকালের চান-না-করা গা হাত-পা ঝুলকালিতে দড়ি দড়ি। কারও চোখ ছন্ন। কারও বা নিভু নিভু। অল্পবয়সী মানুষটির চোখ মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছিল। গেরস্থর পোষা কুকুরও বাড়ির কর্তার কাছাকাছি অমন থেবড়ে বসে।

সফি দেখলো, মীনাক্ষীও কখন দা হাতে মাটিতে বসে পড়েছে। যেন কোনো বা আত্মীয় পরিজনসভা। সবাই মিলে মাটিতে বসে পড়েছে—কথা বলতে বলতে—কথা শুনতে শুনতে। সফির মনে হলো—এই চর জায়গায় বহুদিন কোন আওরত না দেখে দেখে শের খাঁ আর তার মানুষজন যেমন মীনাক্ষীকে ঘিরে একদিন কেমন ক্ষেপে উঠেছিল—ওরাও তেমনি আজাদ হয়েই যমুনার চরে গারদের বাইরে পয়লা আওরত মীনাক্ষীকে দেখে একই সঙ্গে হাত বাড়িয়ে ফেলেছিল।

মীনাক্ষী উঠে দাঁড়ালো। ফুলের গোছা নিয়ে আগ্রার চবুতরায় গিয়ে বসতে হবে। সফি হাতের জংধরা বন্দুকটা ছুঁড়ে ঝুপড়ির বারান্দায় ফেললো।

।। উনিশ ।।

নওরোজ, দশেরা, শবেবরাত, দেওয়ালি, মিলাদ শরিফের উৎসবের দিন ভোর থেকেই রাজধানী আগ্রা নানান্ ক্রিয়াকাণ্ডে জেগে ওঠে। বাদশা সেদিন হয়তো তোপখানায় সদ্য ভর্তি করা ফ্রানসিস্ গোলন্দাজদের নিশানা চাঁদমারি নিজের চোখে পরখ করতে আগ্রার বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। গোয়ালিয়র যাবার শাহী সড়কের গায়ে ফাঁকা প্রান্তরে এইসব বিদেশী গোলন্দাজের গোলা দাগা কতটা নির্ভুল—নিজের চোখে তা যাচাই করে শাহী তোপখানায় ওদের কাউকে মীর আতশ করে বসান। উজিরে আজম সেদিনই হয়তো মালবের আফিম ব্যাপারিদের দেওয়া দাওয়াতে শাহী মেহমান হিসেবে হাজির থাকেন। দুপুর দুপুর হয়তো পুণ্যদিন দেখে কিছু কয়েদীকে আজাদ করে দেওয়া হয়। রাতে আলো দিয়ে সাজানো হয় আগ্রা দুর্গ, বড় বড় হাভেলি।

শাহী উৎসবের এই তো রীত রিসালা। হয় বাদশা ফৌজি সালাম নেবেন। কিংবা কয়েদী আজাদি পাবে। কিন্তু কোতল পরওয়ানা রেহাই হবে। আতশবাজি ফাটবে। সন্ধ্যা হলে হাভেলিতে হাভেলিতে আলোর মালা জ্বলে উঠবে।

তাহলে আমাকে কে এক ধাক্কায় আজাদ কয়েদীদের সামিল করে দিলো? করেছিল বলেই তো আমি এখন যমুনার চরে বালির ঢিবিতে বসে খুলি হাওয়া ছিনা ভরে টানতে পারছি। নয়তো কোনোদিনই আর আগ্রা দুর্গের নিচে কয়েদখানা থেকে বেরোতে পারতাম না। ওখানে মরলে একদিন আমার লাশ যমুনায় ভাসিয়ে দেওয়া হতো।

কে হতে পারে? অল্প বয়স। বেশ সুন্দর চেহারা। এক ধাক্কায় আজাদ কয়েদীদের দঙ্গলের ভেতরে আমায় ঠেলে দিয়ে তাজা, সুন্দর, জওয়ান সেই ইনসান যে-পথে এসেছিল—সেই পথ দিয়েই কয়েদখানা থেকে ছুটে পালিয়ে গেল। কোনো শাহজাদাই হবে।

বালির ঢিবির ওপর বসা প্রায় নাঙ্গা সদ্য আজাদ বুড়ো মতো লোকটা এইসব ভাবতে ভাবতেই দেখতে পেল—রাজধানী আগ্রায় দুর্গের মাথার ওপর দিয়ে সন্ধ্যা নেমে আসছে। দূরে কোথাও আতশবাজি ফাটানোর আওয়াজ। একটু পরেই অন্ধকারে যমুনা মুছে যাবে।

দূরে দুর্গের বুরুজে বুরুজে আলোর মালা জ্বলে উঠছে। আজ তাহলে উৎসব কোনো। কোন্ উৎসব হতে পারে? বুড়ো লোকটির কিছুই মনে পড়লো না। সাল সন সবই গুলিয়ে ফেলেছে সে কয়েদে থাকতে থাকতে। কোন্ শাহজাদা কয়েদ থেকে আজাদ করে দিলো? কোন্ শাহজাদা?

শাহজাদা খসরু? উঁহু! তার এত কাঁচা চেহারা থাকতে পারে না এতদিন।

তাহলে? শাহজাদা পরভেজ? সে নয়। তাকে দেখলেই আমি চিনতে পারতাম।

তবে কি শাহজাদা খুর্‌রম ? না। এতদিনে তিনি তো তিরিশ পেরিয়ে গেছেন।

তাহলে এ কোন্ শাহজাদা ? শাহজাদা সেলিম বাদশা হতেই তো আমায় কয়েদ করা হলো। কতদিন কেটে গেছে জানি না। কতকাল ? কয়েদে একটানা অনেকদিন থাকলে কিছু বোঝা যায় না। ওখানে সাল সন—দিন রাত সব সমান লাগে।

গম্ভীর চোখের বুড়ো মানুষটি রাজধানীর দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বললো, আগ্রা ! তোমায় আমি চিনি। ভালো করেই চিনি।

এই কথা বলতে বলতে মানুষটি যমুনার ভাঙা পাড় ধরে অন্ধকারেই দিব্যি এগোতে লাগলো। একটু নামলেই যমুনার জল। একটু ওপরে উঠলেই রাজধানী আগ্রার কলকোলাহল।

এইভাবে হাঁটতে হাঁটতে মানুষটি একসময় রাজধানী ছাড়িয়ে দেহাতে এসে পড়লো। এবার সে একদম ভাঙা জায়গায় উঠে দেখলো—ছাই ছাই জ্যোৎস্নায় চরাচর ভেসে যাচ্ছে। একটা দুটো বাবলা গাছ। ঘাসে ঢাকা মাটি ফাটিয়ে পাথুরে ঢিবি। এ রাস্তা তো আমার চেনা। এক মঞ্জেল—দেড় মঞ্জেল হাটলেই ফতেপুর সিক্রি।

বহুদূরে একটা আলোর ফুটকি। এ রাজধানী তো আকবর বাদশা ফেলে চলে যান। এই পোড়ো শহরে কে আলো জ্বালবে ? ফকির দরবেশের আড্ডা হয়তো। কিংবা ঠ্যাঙাড়ে ঠগের আখড়া। এইসব সাত পাঁচ ভেবেই মানুষটি খুব সাবধানে এগোতে লাগলো। জোর বরাত যে, এখন শীত নেই। তবু উদোম অবস্থায় রীতিমত ঠাণ্ডাই লাগছিল।

এ পথও আমার চেনা। কতবার ঘোড়া ছুটিয়ে গেছি। এসেছি। ভাগ্যিস দিনের বেলা নয়। কিছু না হোক উট চরানি রাখালের সামনে দিয়েও তো এ অবস্থায় যাওয়া যেতো না। পেছন ফিরলো মানুষটি। রাজধানী আগ্রা একখানা জ্বলন্ত থালার মতো অন্ধকারের বুকে আলোয় আলো হয়ে বিঁধে আছে।

রাস্তা ধুলোয় ধুলো। খানিকটা নেমে নাবাল জায়গায় যেন কিসের চাষ। আবছা জ্যোৎস্নায় বোঝা যায় না। তার আলে আলে রাখাল কড়াই। কয়েক গোছা ছিঁড়ে নিয়ে খেতে লাগলো মানুষটি। আজই কয়েক থেকে আজাদ হওয়ার খানিক আগে যে খালাসি-খাওয়া জুটেছিল—তাতে না ছিল গোস্ত—না ছিল আধভাঙা গেঁহু। গচ্ছের হাড় আর গেঁহুর ছাঁট মেশানো একটা ট্যালটেলে ঝোল। তবে গরম গরম।

আলোর ফুটকিটা যতই কাছে চলে আসে ততই গা ছমছম করে ওঠে মানুষটির। একেবারে কাছাকাছি এসে সে বড় একটা আকন্দ ঝাড়ের আড়ালে দাঁড়ালো।

সামনেই পোড়ো শহরের একটা ভাঙা বাড়ির দাঁড়িয়ে থাকা খিলানের সামনে খোলা আশমানের নিচে দড়ির সামান্য চারপাইয়ে একটি মানুষ শুয়ে। পুরুষ মানুষই হবে। গায়ে একখানা সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা চাপা। মাথার কাছে

একটি বাতিদান। বাতির শিখাটি সর্বক্ষণ খোলা প্রান্তরের বাতাসের সঙ্গে হেলে দুলে—থেঁতলে যেতে যেতে যুঝে যাচ্ছে। আশপাশে কেউ নেই।

আকন্দ ঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পা টিপে টিপে লোকটি চারপাইয়ের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালো। একজন মানুষ। বেশ বয়স। চোখ বুজে পড়ে আছে। মাথা নিচু করে তার ধুকধুকি টের পাওয়ার চেষ্টা করলো। নাঃ। বোঝা যাচ্ছে না। এবার তার ডান হাতখানা টেনে তুললো। তুলে চারপাইয়ের ওপরে ছেড়ে দিতে হাতখানা একদম ধপাস করে পড়লো।

মুর্দা!—কথাটা মুখ থেকে বেরোতেই চারদিক তাকালো লোকটি। তারপর এক ঝটকায় চারপাইয়ের ওপর থেকে ঢাকা চাপার কাপড়খানি তুলে নিলো।

ওদিকে রাজধানী আগ্রা তখন আলোয়—পটকায়—শরবতে—আতরে রি রি করছিল। রাজা কি মাণ্ডি থেকে বোঁধবাঙ্গ ঘাট, যোগীপুরা থেকে বড় মসজিদ, লালচক থেকে চবুতরা—সবদিকে সব রাস্তায় মানুষ বেরিয়ে পড়েছে। রাজা-কি-মাণ্ডি আর শয়তানপুরার মাঝামাঝি কোঠাঘর থেকে গানেওয়ালিদের দাদরা-চৈতি বাতাসে মিশে সারা মহল্লাই যেন মাতোয়ারা। শাহী ফৌজ থেকে বড় ময়দানে টাট্টুর খেলা দেখাতে নেমেছে জানবাজ তুর্কি সওয়াররা। সেখানেই সবচেয়ে বড় ভিড়। তারপরেই ভিড় বড় মসজিদের সামনে। এ ভিড় মিশকিনদের। ওরা দুটো দাম-দামড়ির মুখ দেখে এদিন—পুণ্যার্থী মানুষ-জনের দানধ্যানে।

আজ চবুতরায় বসতে না বসতেই মীনাক্ষীর সব ফুল বিকিয়ে গেল। আরও ফুল থাকলে আরও বিক্রি হয়ে যেতো। দরও ভালো। এক ইরানি মনসবদার তো এক চাতালে যত বেলি আর চামেলি ছিল—একাই সব কিনে নিলেন। নিজে হাতির ওপর হাওদায় বসে নিচে দাঁড়ানো এক গোলামকে চোখের ইশারায় সব ফুল দেখিয়ে দিলেন। গোলাম গোছা গোছা করে ফুলগুলো তুলে নিলো। যতটা একসঙ্গে পারা যায়।

গলঘণ্ট বাজাতে বাজাতে মনসবদার আর তার সঙ্গী ঘোড়সওয়ারের পাহারার দল চলে যেতেই এক ঠোঁটকাটা ফুলওয়ালি মীনাক্ষীকে ঠ্যাকার দিয়ে বললো, তোর ফুলই তো সব তুলে নিলো পয়লা দফে—

মীনাক্ষী কোনো কথা বললো না।

সেই ফুলওয়ালি তখন হেসে চবুতরায় যেন গড়িয়ে পড়ে। হাসি থামিয়ে বললো, দেখিস! এত দেমাক ভালো নয় কিন্তু। এবার এসে মনসবদার তোকেই তুলে নিয়ে যাবে—

মীনাক্ষী চোখ বড় করে তাকালো। আরেকবার বল—

মীনাক্ষীর মুখ দেখে ফুলওয়ালি তখনো কিছু বোঝেনি। সে দিব্যি বললো, পুব মুলুকের মেয়ে তো—লোক দেখানি গমক দেমাক কিছু তো থাকবেই! আমরা সব বুঝি—বুঝিরে ভাই—

মীনাক্ষী প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লো। হাতে ছুরি। তোড়া বেঁধে গোলাপ

ডালের কাঁটা চেঁছে দেবার ছুরি।

সারা চবুতরা জুড়ে রাজধানীর আশপাশের চার দিককার মেয়েরা ফুল নিয়ে বসে। সেকেন্দ্রা, বিয়ানার ওদিককার মেয়েরা তো আছেই। যমুনার ওপার থেকেও অনেকে আসে। তারা সবাই একসঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠে দাঁড়ালো।

ঠোঁটকাটা ফুলওয়ালি বুঝতেই পারেনি—সে মীনাক্ষীর কোন্ জায়গায় ঘা দিয়ে বসে আছে। মনসবদার, মীর আতশ, মীর বকসি, রিসালদার—এইসব ফৌজি মানুষজন তার চোখে বিষ। ওরাই তাকে ব্রহ্মপুত্রের তীর থেকে যমুনার তীরে ভেসে পড়তে বাধ্য করেছে।

মীনাক্ষীর হাতের ছুরি ফুলওয়ালির বাঁ কাঁধের ওপর। সে মীনাক্ষীর চেয়ে বেশ ছোট হলেও মীনাক্ষী হাতি-ধরা ঘরদুয়ারি পাইকান ঘরের মেয়ে। তার তাগদ, জোস, দেমাক, ঝাঁঝ—সবটাই আর পাঁচজনের চেয়ে ঢের বেশি।

আরেকটু হলেই ছুরির ডগার ধারালো দিকটা ফুলওয়ালি মেয়েটার কাঁধে বসে যেতো। সফি একলাফে চবুতরায় উঠে মীনাক্ষীকে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল।

ফুলওয়ালি মেয়েটি তার গোকুলা ফুলের ডালটি কাঁখে নিয়ে লম্বা করে থুতু ফেললো। তারপর এলোমেলো পা ফেলে চবুতরা থেকে নামতে নামতে বললো, বয়স বসে নেই তোমার! অত দেমাগ ভালো নয়—

মীর সফির দু'হাতের শক্ত বাঁধনের ভেতর নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করলো মীনাক্ষী। পারলো না। চেঁচিয়ে উঠলো, আরে যা যা—

সন্ধ্যার আগ্রার পথচলতি মানুষজন এতক্ষণ চবুতরা ঘিরে বিনা খরচায় জেনানা লড়াই দেখছিল। থেমে যেতে মনমরা হয়ে সে-ভিড় ভেঙে গেল। ভাঙা ভিড়ের ভেতর মিশে যেতে যেতে সেই ঠোঁটকাটা ফুলওয়ালি চেঁচিয়ে উঠলো! আর কদ্দিন যোগন সেজে থাকবি? ওই দেড়েল আফগানটার সঙ্গে তোর আশনাই আমরা জানিরে জানি!

ঠিক তখনই মীর সফির দুই শক্ত হাতের সাঁড়াশির ভেতর মীনাক্ষী ছটফট করে উঠলো। নিজেকে ছাড়াতে না পেরে মীনাক্ষীর সব রাগ গিয়ে পড়লো সফির ওপর। ধরলে কেন? ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও বলছি—

সফি ছাড়লো না। আট ন সন হয়ে গেল সে মীনাক্ষীকে ভালো করেই চেনে। ছাড়া পেলে চবুতরায় গড়িয়ে পড়া ছুরিখানা কুড়িয়ে নিয়ে মীনাক্ষী এখুনি আগ্রার রাস্তা দিয়ে ওই ফুলওয়ালির পেছন পেছন তাড়া করে ছুটবে। দিশ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে।

সফি কষে একটা ঝাকুনি দিলো মীনাক্ষীকে। হচ্ছে কী? জ্ঞান হারিয়ে ফেলছো নাকি?

ভাঙা ভিড় আবার দলা পাকিয়ে উঠলো। এও তো মুফতের এক নাটক। পথ-চলতি মানুষজন আবার দাঁড়িয়ে পড়ছিল। তাদের বড় আশা—এখন যদি খোদ কোতোয়াল এখানে এসে পড়েন তো দিব্যি জমে ওঠে। ওরা কি মিঞা-বিবি? না আর কিছু? এরকম নানা জিজ্ঞাসা, হাসাহাসি, ফোড়নের ভেতর

মীর সফি মীনাক্ষীকে একরকম টানতে টানতেই কাছাকাছি লাট্টু শাহ দারোগা বাবার দরগাহর পেছনকার ব্যাগে এক চিনার গাছতলায় এনে ফেললো।

মীনাক্ষীর তখন আলুথালু দশা। সেই সঙ্গে ফুলওয়ালিটাকে ধরতে না পারার রাগে দপদপ করছিল।

মীর সফি দাঁতে দাঁত চেপে বললো, ভুলে যেও না—শাহী মনসবদার মির্জা ইউসুফ বেগের থাবা গলে তুমি হিন্দুস্থানের খোদ রাজধানীতে ঘুরে বেড়াচ্ছো।

—তাতে কী?

বড় বড় চোখে না বুঝতে পেরে মীনাক্ষী জানতে চাইলো। তার মুখে তাকিয়ে সফি মুগ্ধ হচ্ছিল। এত তেজ, এত সাহস এই জেনানার ভেতর—যে কিনা নিজের ঘরবাড়ি থেকে এতদূরে এসেও নিজের ওজন হারাতে রাজি নয়। বরং একটু এদিক ওদিক হলেই সে রাজধানীর খোলা চবুতরায় তোড়া বানাবার ছোরা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। •

আবার রাগও হলো সফির। এই জেনানা এমন বে-দিল দুনিয়ার কাছে সব ব্যাপারেই ইনসাফি চায়! ন্যায় কোথায় আছে? দুনিয়া চলছে—যে যতটুকু কেড়ে নিতে পারে—এই নিয়মে। আর সেখানে মীনাক্ষী চায় ন্যায়-নীতি-সাচ্চাই!

শান্ত গলায় মীর সফি বললো, তুমি ছিলে বাগী পাইক সনাতনের আওরত। ওদের হাত ফসকে বেরোতে না পারলে কবে বাঁদী হয়ে বিক্রী হয়ে যেতে! সে আফসোস কি শাহী মনসবদার ভুলতে পারে?

—এখনো মনে করে রেখেছে?

—রাখবে না? মনসবদার নিয়ে ফুলওয়ালি তোমাকে ফোড়ন কাটায় জ্বলে উঠলে। একেবারে চিরাগ যেন! কেন? না—এক মনসবদার তোমার খসম—তোমার বালবাচ্চা—তোমার দুনিয়া—বেবাক বরবাদ করে দিয়েছে বলেই তো তুমি ভুলতে পারোনি মীনা বাঈ—

লাট্টু শাহ দারোগা বাবার দরগাহে ফি সন্ধ্যায় কাওয়ালির আসর বসে। তারই তোড়জোড় চলছিল। মাঝে মাঝে ঢোলকে চাঁটি। ধূপের সঙ্গে লোবান মেশানো থাকায় সারা বাগে একটা লেবু লেবু গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। মীনাক্ষী সফির গায়ে ঘেঁষে বসলো। তারপর আস্তে বললো, তুমি কত সমঝদার। অথচ আমার চেয়ে ছোট তুমি। রাগ হলে মাথার ঠিক থাকে না—

মীর সফি তেমনই শান্ত গলায় বললো, মাথাটা ঠাণ্ডা রাখবে সব সময়। মনে রাখবে—হিন্দুস্থান নামে বিরাট এই দরিয়ায় আমরা এখনো ভেসে বেড়াচ্ছি।

মীনাক্ষী তার আফগান খসমের ডান বাহুতে নিজের মাথাটি ঠেকালো। নরম করে। হাতখানা রাখলো সফির ডান উরুতে, ময়লা শালোয়ারের ওপর। হাত রেখে বুঝলো—একজন শক্তসমর্থ ইনসানের উরু। যেন বা একটা দীঘল চিনার গাছের মাঝের আসল কাণ্ড। তুমি চবুতরায় আমায় বসিয়ে দিয়ে কোথায় থাকো। আমি যখনই বিপদ ডেকে আনি—দেখেছি, ঠিক তুমি ছুটে

আসো। সেবারে—

—তোমায় একা রেখে আমি স্বস্তি পাই না মীনা। আমি চবুতরার কাছাকাছিই থাকি। খুব দূর হলে লালচকের গায়ে হামামের পাশে ঘোরাঘুরি করি। মনে রেখো—আগে ধরা পড়লে—ফের না হয় তোমাকে বাঁদী বাজারে বেচে দিতো। কিন্তু এখন?

—এখন কী?

—এখন ধরা পড়লে তোমাকেও ফাঁসিতে লটকাবে।

—কেন?

—এখন তুমি শাহী আহেদির বিবি—যে আহেদি কিনা বাগী! এখন ধরা পড়লে আমাদের জোড়া ফাঁসি দেখতে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে মানুষজন জড়ো করা হবে।

দরগাহের বাগে এ-দিকটা খুব নির্জন। মীনাক্ষী দু'হাতে মীর সফিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো। এই আফগান মরদের পসিনায় আলাদা একটা পাহাড়ি ঝাঁঝ আছে—যে ঝাঁঝ মীনাক্ষী সারা আগ্রায় নানান্ ভিড়ের সামিল হয়েও কখনো কোথাও পায়নি।

মীনাক্ষীর হাতের বাঁধনে সময় থেমে থাকে না। দরগাহর ভেতরকার বাতিদানের আলো এসে বাগে ছড়িয়ে পড়েছে। সফি বললো, চলো—জুলুস দেখে আসি—

এক কথায় মীনাক্ষী উঠে দাঁড়ালো। কোমরের খেরিয়া থলেতে সদ্য সদ্য বেলি চামেলি বেচা নগদ দাম-দামড়ি আধেলা-পওয়া ঝনঝন করছে।

ওরা চবুতরার দিকটা এড়িয়ে বড় মসজিদের রাস্তা ধরলো। বাতাসে মগরেবের আজান। বড়দরের কোনো উজির নাজির হাতির পিঠে গাদেলায় বসে আগ্রা দুর্গে চলেছেন। তাঁর বড় হাতির দু'পাশে দুটি ছোট হাতি। মাথায় রঙিন ছাতা। হাতির শুঁড় আগাগোড়া রাঙানো। হাতির দু'পাশে পায়দল দুই সেপাই। আর আগে আগে তলোয়ার হাতে দুই ঘোড়সওয়ার। তাদের গোঁফ আর তলোয়ারের বাঁক একই রকমের।

মসজিদের সামনে মিশকিনরা এ ছবি দেখে খয়রাতের লোভে মাটিতে প্রায় শুয়ে পড়লো।

মীনাক্ষী বিড়বিড় করে বললো, কোথায় চলেছেন?

সফি বললো, নিশ্চয় বাদশার মবারকে যাবেন—

মীনাক্ষী বললো, এক একজন ইনসানকে ভগবান এত বেশি বেশি তাগদ দেয় কেন?

সফি গাদেলার ওপর মূর্তি সমান বসে থাকা বড় মানুষটির দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে বললো, এসব আমার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে—হাতির ওপর থেকে নামিয়ে মুণ্ডুটা যদি খসিয়ে দিতে পারতাম—

ওরা ঘুরতে ঘুরতে দেওয়ানি আমের সামনে এসে দাঁড়ালো। সেখানে আলোর নানান্ কেরামতি। জ্বলন্ত গোল আঙটার ভেতর দিয়ে তুর্কি

ঘোড়সওয়াররা তীরের মতো বেরিয়ে যাচ্ছে। আগুন তাদের ছুঁতে পারছে না। তাই দেখে আমজনতা আনন্দে বিস্ময়ে হাততালি দিয়ে উঠছে।

এক কালের বাঘা আহেদি মীর সফি মীনাক্ষীর কানের কাছে ফিসফিস করে বললো, জানো মীনা—একসময় এই ময়দানে আমিও নওরোজের রাতে এ-খেলা দেখাতাম—

সেই খেলা দেখতে দেখতে মীনাক্ষী বললো, এখন ভেবে দুঃখ হচ্ছে!

—কেন?

—কী ছিলে। আর কী হয়েছো! কোথায় ঘোড়া দাবড়ানো। হুকুমদারি। ভালো ভালো খানাপিনা। আর কোথায় বেলি চামেলির গোড়া কোপানো! ইঁদারা থেকে উটের টানা ভিস্তি ঘুরিয়ে চরের নালায় নালায় জল ছেঁচা! কী বলো?

—অনেক ভালো আছি মীনা। আহেদিগিরি, মনসবদারি মানেই তো ঘোড়ার পিঠে বসে হুকুমদারি, কওতল ওয়া গেরেফতারির খবরদারি, আগুন লাগানোর হামলাদারির! ওতে মন ভরে না—

ভিড়ের ভেতরেই মীনাক্ষী মুখ ঘুরিয়ে সফির মুখে তাকালো। কিসে ভরে?

—তা জানি না। তবে এই যে সারা বছর গাছের তোয়াজ করো। ফুল ফলাও। গোড়া খোঁচাও। ডাল ছাঁটো। আমি বসে বসে দেখি—আর তোমাকে পাই। তাতেই মনটা ভরভরাট হয়ে যায়। সন্ধ্যায় অন্ধকার হয়ে এলে সারা চর ঢাকা পড়ে যায়। আমার বুকের ভেতরটা তখন ভারি হয়ে মোচড় দিয়ে ওঠে—

মীনাক্ষী ফিক করে হেসে ফেললো।—খুব কবিতা হচ্ছে। শায়ের হয়ে যাবে নাকি!

ওরা দুজনে হাসতে হাসতে আগ্রার এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরতে লাগলো। বড়া হাভেলি মহল্লায় পর পর সব আমীর ওমরাহদের কুঠি। শাহী হেকিম, সিপাহশালার, মীর বকসি, মীর আতশ, মীর বহর, পাঁচ হাজারি সওয়ার থেকে সাত হাজারি সওয়ারের মনসবদারের সব কুঠি। অনেকটা জায়গা নিয়ে। ওদের হাভেলির সামনে কারও কারও বা নিজের নিজের হাতির জন্যে ঘর। সেখানে এই উৎসবের রাতে নানা রঙে রাঙানো উঁচু হাতি একা নিঃশব্দে আখের গোছা চিবিয়ে চলেছে। কোথাও বা কুকুরের দল—ছুটে ছুটে খেলছে। চিক ঝালানো ঢাকা বারান্দায় খানাপিনা, পেয়ালা পিরিচের আওয়াজ—হাসি-ঠাট্টার গমক। সারা মহল্লা জুড়ে চরম নিশ্চিন্ত জীবনের এক বিরাট ছবি।

রাত হয়ে গেছে। এবার ফেরা দরকার। মীনাক্ষীর পায়ে চোখ পড়লো সফির। হাটুরে ধুলোয় মাখামাখি। বাতাসে এখন যেন শীত। ঠিক এই সময়ে অন্ধকার হাঁটুজল নদী—তারপর বালি ভেঙে ঝুপড়িতে ফিরতে হবে। নিজের ওপর ঘেন্না এসে গেল সফির। আমরা আমাদের জন্যে এক জোড়া করে নাগরাও যোগাড় করতে পারিনি—যে পায়ে গলাবো! আর কিছু মানুষ দিব্যি হাভেলিতে বসে খাচ্ছে দাচ্ছে—হুকুম চালাচ্ছে। মুঘল শাহী মানেই তো

ইনসানের পর ইনসান মাটিতে পড়ে থাকবে। আর তার ওপর দিয়ে অল্প কিছু লোক হেঁটে যাবে—পাছে তাদের পায়ে দুনিয়ার ধুলো ময়লা লাগে। কয়েকজন লোক আয়েস করে বসে আছে গাড়িতে। আর সারা হিন্দুস্থান জোয়ালে কাঁধ দিয়ে সে-গাড়ি টেনে ঠেলে খাড়াই রাস্তা ভাঙছে।

চরে নেমে ওরা দেখলো—আবছা চাঁদের আলোয় ওদের ঝুপড়িটা কোথায় হারিয়ে গেছে। হাঁটুজল ভেঙে—পায়ের বালি ঝাড়তে ঝাড়তে মীর সফি এগোচ্ছিল। এগোতে এগোতে বললো, এই শাহীর শেকড়সমেত উপড়ে দিতে চাই ফৌজ। সে ফৌজ মুঘল শাহীর বে-ইনসাফির গোড়া ধরে জ্বালিয়ে দেবে—

মীনাক্ষী অন্ধকারে সফির মুখ দেখতে পেল না। আন্দাজে মুখের জায়গায় তাকিয়ে বললো, ফৌজ? ফৌজ কোথায় পাবে? কাদের নিয়ে ফৌজ?

সফি দাঁড়িয়ে পড়লো। হ্যাঁ। ফৌজ। আজকের ওই নাঙ্গা কয়েদীদের দিয়েই আমি ফৌজ গড়ে তুলবো মীনা—

—ওরা? ওদের নিয়ে ফৌজ?

—হ্যাঁ মীনা। ওরাই ভালো সেপাই হতে পারবে একদিন। ওরাই ভালো করে জানে—শাহী সরকার কী জিনিস। কোড়া, চাবুক খেয়ে খেয়ে ওরা ভালো করে বুঝতে পেরেছে এই শাহী মানে কী!

—কিন্তু ওরা তো জানেও না—কী করে ফৌজের মুখে দাঁড়িয়ে লড়তে হয়।

—তীরবাজি, বন্দুকবাজি, ঘোড়সওয়ারি—সব তালিম আমিই দিতে পারবো মীনা। তলোয়ার, কুড়োল—সবই শেখাবো। তারপর—বলতে বলতে সফি যেন চোখের সামনে এই আবছা অন্ধকারে তার হাতে তৈরি এক বিরাট ফৌজ দেখতে পেল।

ঝুপড়ির সামনে এসে মীনাক্ষী বললো, কিন্তু কই, ওরা কোথায়?

—চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে হয়তো। ভোর হলে এসে জড়ো হবে আবার। সারা হিন্দুস্থানের সব কয়েদীকে নিয়ে যেদিন তালিম দিতে পারবো মীনা—

পরদিন ভোরবেলা দেখা গেল—গম্ভীর চোখ নাঙ্গা সেই বুড়ো কয়েদীর কোমরে কাপড়—গায়ে সেই কাপড়েরই খুঁট মাথাটি ফটফটে সাদা। গাল ভর্তি দাড়িও সাদা। এখন এই সকালবেলায় পোড়ো রাজধানী—ফতেপুর সিক্রিতে ইনসান বলতে সে একা এখন আকবর বাদশার দশ-পঁচিশি খেলাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে ওই দেওয়ানি খাসে আকবর বাদশা কিছুদিন বসেছিলেন। বাদশার মসনদ ঘিরে মানী মানুষদের বসবাব জায়গাগুলোয় এই সকালবেলাতেই বাদুড় উড়ছে।

ওই যে বেলে পাথরে তৈরি মোহর কাটাই ঘর। কামান তৈরির জায়গা। সব দেখতে দেখতে দাঁড়িয়ে পড়লো গম্ভীর চোখ মানুষটি। তার মনে হতে লাগলো—হন্তা আর নিহতের ভেতর একই স্রোত বয়—তা হলো জীবন। এই রাজধানী আর বেঁচে নেই। আগ্রা এই ফতেপুর সিক্রিকে খুন করেছে। দুই

মঞ্জেল উজিয়েই আজকের রাজধানী আগ্রা—ফতেপুর সিক্রির ঘাতক আগ্রা আলোতে অন্ধকারে, উপহারে বঞ্চনায়, অত্যাচারে আহ্লাদে টগবগ করে ফুটছে। তার জিন্দা স্রোত এই পোড়ো রাজধানীর গায়ে এসে কখন আছড়ে পড়ে কে জানে! এখন তো এখানে সাপ আর ভিক্ষুকের আস্তানা।

গেরস্থ ঘরের প্রদীপ দূরের মুসাফিরকে টানে। বাদশার মুকুটের আলোয় তামাম দেশ আলো হয়। আকবর বাদশা সেই যে ফতেপুর সিক্রিকে ফেলে আগ্রার দুর্গে উঠে গেলেন—ইনসাফি, সাচ্চাই সব পড়ে থাকলো এই পোড়ো রাজধানীতে। বাদশাও চোখ বুজলেন—অমনি গোঁড়ামি, বে-ইনসাফি—সবই গিয়ে বাসা বাঁধলো আগ্রায়।

ওই তো সেই ঢাকা পথ—খোলা চত্বর; ওখানটায় সুফিরা দোলনায় বসে যোগে ডুবে যেতেন। কাপড়ের খুঁট গায়ে লোকটি দাঁড়িয়ে পড়লো। ভোরের আলোয় ফতেপুর সিক্রি ছাড়িয়ে দুটি বালহস্তী লেজ নাড়তে নাড়তে গম্ভীর চালে সেকেন্দ্রার দিকে চলেছে। দেখতে বড় সুন্দর লাগলো। কিন্তু হাতির মতো দামি জানোয়ার তো এমন বেওয়ারিশ ঘোরে না। কঠিন অসুখে পড়ে রোগ সারাবার আশায় বড় মানুষ—রইসি খানদান বন্দী গোলাম বাঁদি, পাখি, হাতি আজাদ করে দেয়। ওই দুটো বাচ্চা হাতি তেমন আজাদি পেয়ে বেরিয়ে পড়েছে হয়তো। তাদের সামনে এখন সেকেন্দ্রা।

মানুষটি হাঁটতে হাঁটতে সেই দুই বালহস্তীর পেছন পেছন চললো। সামনে সেকেন্দ্রা। সে বিড়বিড় করে বললো, তোমায় আমি চিনি সেকেন্দ্রা। আমার প্রথর কৈশোর—তাজা জওয়ানির দিনগুলো এই ফতেপুর সিক্রি—ওই সেকেন্দ্রায় কেটে গেছে।

গাছপালার ভেতর দিয়ে আকবর বাদশার সমাধি জেগে উঠলো সেকেন্দ্রার প্রান্তরে। দু'একটা ছাড়া উট এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওই তো লাল পাথরের সমাধি ঘিরে বিশাল তোরণ। কারুকাজ করা মর্মর-প্রাচীর। পাশেই ভাট ফুলের জঙ্গল।

পাঁচমহল সমাধির গম্বুজের নিচেই সাদা পাথরের ফুল। পাশে কালো পাথরের কাজ। চারদিকের রাস্তায় ছায়া দেবার গাছগুলো আছে। ঝরনা, কুয়ো—সবই বুজে গেছে। ডালিম—সাইপ্রাস বীথি ছিল এখানটায়। এখন আর নেই। কেউ দেখার নেই। আগ্রা ফিরেও তাকায় না। নিচেই অনুগত যমুনা বয়ে চলেছে।

উল্টোদিকের নহবতখানায় পাথুরে চত্বর ঝকঝক করছে। তার সামনে বিরাট বুলন্দ দরওয়াজা। লোকটির মনে হলো—এই রাজধানী আদৌ পোড়ো নয়। যেন কালই তৈরি হয়েছে। গতকালই আমি এখানে দাঁড়িয়ে শাহী হাতির পিঠে বসা আকবর বাদশাকে কুর্নিশ করেছি। তাঁকে দেখলে আমার মনটা আনন্দে ময়ূর হয়ে উঠতো।

বুলন্দ দরওয়াজার ডানদিকে ইবাদতখানা। উপাসনার জায়গায় পাথরের পদ্মটি এখনো আছে। ওখানে দাঁড়ালে আমার গৌতম বুদ্ধের কথা মনে

পড়তো। তৌহিদ-ই-ইলাহি। ঈশ্বর এক।

পাঁচমহল সমাধির তেতলায় দীন-ই-ইলাহির ভক্তরা বাদশার জন্যে আত্মসম্মান নিবেদন করতেন। আত্মসম্মান তো ইনসানের কাছে তার প্রাণের চেয়েও দামি। সমাধির চারতলায় পেঁছে আমরা দীন-ই-ইলাহের-বাদশার ধর্মের অনুগামী হতাম। আজ আর মুয়াজ্জিনের গলা শোনা যায় না এখানে। এক সময় শোনা যেতো—তৌহিদ-ই-ইলাহি। একমেবাদ্বিতীয়ম্। সমাধির পাঁচতলায় বাদশার জন্যে একটি বসার জায়গা ছিল। এখন কি আর আছে তা! ওখানে বসে বাদশা আকবর সারা ফতেপুর সিক্রির দিকে তাকাতেন।

গম্ভীর চোখের মানুষটি দেখতে পেল—বালহস্তী দুটি গম্ভীর চালে সেকেন্দ্রা ছাড়িয়ে দেহাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এবার গাঁয়ের মানুষ এমন বেওয়ারিশ দামি জিনিস পেয়ে হাতি দুটিকে নিশ্চয় বন্দী করবে। তারপর শুরু হয়ে যাবে ওদের দীর্ঘ বন্দী জীবন। ইনসান কোনো মুক্তজীবন দেখতে পারে না। সইতে পারে না।

মীর সফিব ঘুম ভাঙলো খুব ভোর ভোর। যমুনার চরে ভোর আসে খুব ভোরে। মীনাক্ষী এমনিতে খুব সকাল সকাল ওঠে। এই পুব দেশি জেনানা বিছানা ছেড়ে গেলে কী যেন হারায় সফি। মীনাক্ষীর গায়ের পুব দেশি গন্ধটা সারা ঝুপড়ি জুড়ে থাকে। ঝুপড়ির বাইরেই তো শিশির ভেজা বেলির গন্ধ। এক এক সময় সফির মনে হয়—এ বেলির গন্ধ? না, মীনাক্ষীর গায়ের গন্ধ?

সফি তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলো, মীনাক্ষী তো নেই। কোথায় গেল? কোথায় যেতে পারে? দূরে তরমুজ ক্ষেতে শেয়াল তাড়াতে জেবলে দেওয়া রাত বাতিগুলো শের খাঁর চাষীরা একটা করে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। বাতাসে শীত। আগ্রা দুর্গের বুরুজে সারি সারি জেবলে দেওয়া বাতির মালা নিভু নিভু। বাদশা নিশ্চয় এখন ঘুমোচ্ছেন। একটু বাদেই দুর্গের নক্কারখানায় সানাই বেজে উঠবে। সেটাই হলো হিন্দুস্থানের জেগে ওঠার নিশানা। দূরে মাছমারাদের টাঙানো জালে সূর্যের লাল সুতোগুলো এই মাত্র পেঁছলো।

বেলি-চামেলির মাদায় মাদায় ঘুরে মীনাক্ষীকে না পেয়ে সফি জলের দিকে গেল। যমুনা যমুনার মতোই বয়ে যাচ্ছিল। সফি জল এড়িয়ে গোলাপ-সেঁউতির চৌকোতে যাবে—এমন সময় দেখতে পেল—জলের কিনারায় ছায়া মতো কে বসে।

—তুমি? তুমি এখানে?

মীনাক্ষী কোনো কথা বললো না। আশমান থেকে ঝুলে থাকা শেষরাতের ঠাণ্ডা কুয়াশার সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়ে বসে আছে সে।

—ওখানে কেন?

এবারও মীনাক্ষী কিছু বললো না। শুধু হাত তুলে জলের দিক দেখলো। সেদিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো সফি। জায়গাটায় চর খানিকটা বাঁক নিয়ে

স্রোতের মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে। তাই ওখানে জলে ভেসে আসা সবই আটকে যায়। আটকে গিয়ে ভাসতে থাকে। স্রোতের সঙ্গে এক জায়গায় চরকি হয়ে ঘুরতে থাকে।

চার পাঁচটা লাশ চক্কর খেয়ে একই জায়গায় ঘুরছে। মানে ঘুরপাক খাচ্ছে। একটু ফাঁক পেলেই সেকেন্দ্রার দিকে ভেসে যাবে। সব ক'টা লাশই নাঙ্গা। ওরা গতকালই দুপুরে সবে আজাদ হয়ে মীনাক্ষীর বেলি বাগে এসে উঠেছিল।

সফি কোনো কথা বলতে পারলো না। মীনাক্ষী নিঃশব্দে কাঁদছিল। হঠাৎ চোখ মুছে বললো, এ নিশ্চয় শের খাঁয়ের কাজ।

সফি হ্যাঁ বা না কিছুই বললো না। শুধু বললো, সবাই বোধহয় বল্লমের চোট খাওয়া। বুক বরাবর কাঁধে রক্ত দেখো—

—নিশ্চয় শের খাঁ। নিশ্চয়—

—কেন বলতো মীনা ? কেন শের খাঁ ওদের খতম করলো ?

—আচমকা এতগুলো নাঙ্গা লোক দেখেই ঘাবড়ে গিয়ে টাঙ্গি, বল্লম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বোধহয়। কতকাল পরে ছাড়া পেয়েছিল হয়তো। বাড়ি ফিরতে পারলো না কেউ।

আলো ফুটে উঠতে এবার পরিষ্কার দেখা গেল—যমুনার পরিষ্কার নীল জলে তামাটে লাশগুলো চক্কর খেয়ে খেয়ে ধুয়ে যাচ্ছে।

এই একই সূর্যের আলোয় হিন্দুস্থানের পশ্চিম আশমানেও বেশ কয়েকটা পাহাড়ের মাথা কুয়াশা কাটিয়ে পরিষ্কার হয়ে উঠলো। তাদের ভেতর এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—সাতপুরা আর সাতানা পাহাড়ের চুড়ো। মঞ্জেলের পর মঞ্জেল জুড়ে এইসব পাহাড়ের মাথা আর তাদের নানান পাহাড়ি ঢেউ। সেইসব পাহাড়ের গা ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে প্রাগৈতিহাসিক জঙ্গল। জঙ্গলের বেহড়ের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে তাপ্তি, গিরনা, বোরি—আরও কত ছোট বড় সব নদী। এইসব নদীর তীরেই ছড়িয়ে রয়েছে আসিরগড়, বুরহানপুর, নাসিরাবাদ দুর্গ।

এই তিন দুর্গে নিজের ফৌজ বসিয়ে শাহজাদা খুর্রম আগ্রার লম্বা হাত ভোঁতা করে রেখেছেন এ তল্লাটে। তারপর নিজের তাঁবু ফেলেছেন নাসিকে। সাতানা পাহাড়ের পায়ের কাছে। তমসা থেকে লম্বা রাস্তা পিছু হটে এখন এই নাসিক খুর্রমের আস্তানা।

আচমকা যদি শাহী ফৌজ এসে হামলা করে, তাই সাতানা পাহাড়ের উঁচুতে তোপ সাজিয়েছেন শাহজাদা। ওখান থেকে গোলা এসে ওদের টুকরো টুকরো করে দেবে।

সেইসব জায়গায় গোলন্দাজদের চাঙ্গা রাখতেই শাহজাদা রাত থাকতে ঘোড়ার পিঠে পাহাড়ি পথে ওপরে উঠেছিলেন। ভোর ভোর নিচে নেমে আসার সময় নাসিকের কালো বুনো আঙুরের ঝোপে নিজের বড় ছেলে দারাশুকোর মুখোমুখি হলেন খুর্রম।

কিশোর দারার শরীরটি এখন বেশ লম্বা। একখানি পাথরের ওপর বসে সে লতানে আঙুর ঝোপের দিকে তাকিয়ে। সেখানে অজানা পাহাড়ি পাখির দল ছোট্ট ঠোঁটে আধপাকা আঙুর ফুটো করে রস শুষে নিতে গিয়ে মহা গণ্ডগোল পাকিয়ে বসে আছে।

কোনো শব্দ না করে শাহজাদা ঘোড়া থেকে নেমে ছেলের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাতেও কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই দারার। ভোরের শিশিরে তার গায়ের কাম্বাদার ভিজে উঠেছে। পায়ের নাগরাও শিশিরে ভিজে। সে একমনে পাখিদের দেখছিল।

—তোমার তো বন্দুক আছে। পাখির ঝাঁকে চাঁদমারি করে হাত পাকাও। নিশানা ঠিক হবে—

একটুও চমকালো না দারাশুকো। পাখিদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই শান্ত গলায় বললো, কেন আব্বা হুজুর? ওরা তো এই বেশ আছে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে। গুলির ছররায় যে সবাই উড়ে যাবে—

এমন কথা কখনো শোনেননি খুর্রম। শান্ত গলায় বললেন, এই দুনিয়ায় কেউ কাউকে ছাড়ে না। হয় তুমি গুলি করবে। না হয় তোমাকে কেউ গুলি করবে। যে আগে পারে—সে-ই ফতে-জং হয়। জয়ী হয়।

—সব কিছুই কি নিশানার জিনিস আব্বা হুজুর! বনের পাখি? পাহাড়ি ঝরনার ওই পাথর টপকানো? ভোরবেলার এই শিশির? বিকেল হলে সাতানা পাহাড়ের যে-ছায়া পড়ে—তাও?

দারার ঘুরে তাকানো বড় বড় চোখের মুখোমুখি হলেন খুর্রম। আরজুমন্দ বানুর চোখ বসানো যেন ও মুখে। আমার এই ছেলে কি বড় হয়ে জানবাজ লড়াকু হবে? না, শেষে রুমি, হাফেজকে নিয়ে পড়বে? থতমত খেয়ে খুর্রম বললেন, সে কথা বলিনি। তুমি বড় হয়ে উঠছো। তোমায় ঘোড়ার পিঠে ছুটতে হবে একদিন। তোমার পেয়ারের হাতি ফতেজং ডাগর হয়ে উঠছে। তাকে বশ করে তার পিঠে উঠে দাঁড়াবে একদিন। বন্দুক হাতে। সে বন্দুকের নিশানা হতে হবে একদম পাকা—

—ফতেজং খুব সুন্দর হয়ে উঠেছে আব্বা হুজুর। আমায় ঠিক চেনে। আমি বসতে বললে পা ভাঁজ করে বসবে। আমায় দেখে আনন্দে শুঁড় তুলে কাল ওই ঝরনার জল ছিটিয়ে দিচ্ছিল আমার মাথায়—

—ওকে খেয়াল রাখবে সবসময়। তোমার সঙ্গে সঙ্গে—তোমার সারা জিন্দেগি ধরে তোমার পাশে পাশে ফতেজং বড় হবে।

—আমি ওকে খুব ভালোবাসি আব্বা হুজুর।

—ও-ও তেমনি তোমাকে ভালোবাসবে। এখন তোমার কচি উমর। তুমি একদিন জওয়ান হবে দারা। দেখবে—তোমার পাশে পাশে ফতেজং কখন জওয়ান হয়ে উঠেছে।

পাখিরা কারও পরোয়া না করে আঙুর খাচ্ছিল। ছড়িয়ে ফেলছিল অসাবধানে। রোদ এখন আর তেমন নির্জন লাগছে না।

আব্বা হুজুরের একথায় সুলতান মহম্মদ দারাশুকো যেন দিনের আলোয় স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিলো জেগে জেগে। তার ফতেজং হঠাৎ কী করে যেন জওয়ান হয়ে উঠেছে। বিশাল উঁচু। বিশাল দুই দাঁত। হাসি হাসি দুই চোখে তার দিকে তাকিয়ে।

শাহজাদা খুর্‌রম ছেলেকে বললেন, জানো দারা—লড়াইয়ে আমরা মুঘলরা হাতিকে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগাতে পেরেছি। তাই হিন্দুস্থানের বাদশাহী আমাদের হাতে।

দারা ফের বড় বড় চোখে তার আব্বা হুজুরের মুখে তাকালো। লড়াইয়ে বারবার হটে এসেও আমার বাবা এখনো কত সুন্দর। হাঁটাচলায় যেন বা শাহনামার পাতা থেকে উঠে আসা কোনো বাদশা।

—আজ যে হিন্দুস্থান আমাদের পায়ের নিচে—সেজন্যে হাতি ছাড়াও তোপের কথা মনে রাখতে হবে। বাবর বাদশা তোপকে কাজে লাগিয়েছিলেন দারুণ—

দারাশুকো জানতে চাইলো, বাবর বাদশার পেয়ারের হাতির নাম কী ছিল?

—জানি না। তবে দাদাসাহেব—আকবর বাদশার পেয়ারের হাতিকে দেখেছি—ফিল-ই-ইলাহি। আর আব্বা হুজুর জাহাঙ্গীর বাদশার সবচেয়ে পেয়ারি হাতি—নূর-ই-ফিল।

—তাকে তো আগ্রা দুর্গের হাতিশালায় দেখেছি। কত উঁচু। আচ্ছা আব্বা হুজুর—আমরা ইনসান হয়ে জানোয়ারকে ভালোবাসতে পারি। ইনসানকে ভালোবাসতে পারি না কেন? হাতিকে ভালোবাসি। কিন্তু—

শাহজাদা খুর্‌রম কী বলবেন বুঝতে পারছিলেন না। দারা এখনো বালক বলা যায়। মগজদার। ভাবুক। দুনিয়া ধীরে ধীরে একদিন ওর সামনে পাপড়ি মেলে ফুটে উঠবে। ওকে আগামী দিনের ছবিলি এক ঝলক এখনই দেখালে দারা তার আবিষ্কারের আনন্দটুকুই হারাবে।

দারাকে আজ যেন কথায় পেয়েছে। ভোরবেলা সাতানা পাহাড়ের পারে এই বুনো আঙুরের ঝোপের সামনে ঝরনার বয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে শুনতে সে ইমানদারি, সাচ্চাই—সব কিছুর একটা হিসাব করে নিতে চায়।

—দাদা সাহেবকে তার আব্বা হুজুর—বাদশার বাদশা আকবর খুব ভালোবাসতেন।

—হ্যাঁ। যেন চোখে হারাতেন!

—ধাই মায়ের কাছে শুনেছি—আকবর বাদশা দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশাকে ভালোবেসে সেখু-বাবা বলে ডাকতেন।

—আমিই তোমার বয়সে নিজের কানে আকবর বাদশার সেই আদরের ডাক শুনেছি—এখনো যেন সে-ডাক আমার কানে বাজছে দারা।

—আপনাকেও তো দাদাসাহেব খুব ভালোবাসেন।

খুর্‌রম চুপ করে ছেলের মুখে তাকালেন। কোনো কথা বললেন না।

—জাহাঙ্গীর বাদশা আদর করে আপনাকে ডাকেন বাবা-খুর্‌রম। তাই না

আব্বা হুজুর? দাদা সাহেবের সেই আদরের ডাক আমিও হয়তো শুনে থাকবো—আগ্রা দুর্গে থাকতে—

—আগ্রা দুর্গের জন্যে তোমার মন কেমন করে?

আব্বা হুজুরের আচমকা এই কথায়—কোনো জবাব দিতে পারলো না দারাশুকো। সে তার বাবার মুখে তাকালো। আমি আব্বা হুজুরকে খুব ভালোবাসি। আব্বা হুজুরও আমায় খুব ভালোবাসেন। ওঁকেও তো দাদা-সাহেব খুব পেয়ার করেন। তাহলে? তাহলে তো আগ্রা দুর্গ ছেড়ে এসে এই বনে পাহাড়ে ঘুরতে আব্বা হুজুরের মন কেমন করে।

—আপনার কাছে কাছে থাকতে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে—

—তবু—

দারাশুকো গম্ভীর হয়ে বললো, আগ্রা দুর্গের ওপর থেকে নিচের নীল যমুনা দেখি না কতদিন।

শাহজাদা খুর্‌রম ছেলের মাথায় হাত রাখলেন। মন খারাপ করে—তাই না?

বলতে বলতে দারার কাঁধ শক্ত করে ধরলেন খুর্‌রম। একদিন আমরা আবার আগ্রা দুর্গে যাবো। আবার দুর্গের সামান বুরুজে দাঁড়িয়ে আমি আর তুমি অনেক নিচে যমুনার নীল জল দেখবো। কী বলো? খুশি তো!

সুলতান মহম্মদ দারাশুকো মাথা নাড়লো।

খুর্‌রম এবার নিজেই পাথরের ওপর বসলেন। বসে ছেলের মুখে তাকিয়ে বললেন, আগ্রা এখান থেকে অনেক দূরে। কোথায় যমুনা! আর কোথায় তাপ্তি! গিরনা! বোরি নদী!

—কেন? গিরনার জল তো ভালো আব্বা হুজুর। ফতেজং তো ওই জল খেয়ে ভালোই আছে। গিরনার জলে ফতেজং চান করে—খায়—

সে কথায় না গিয়ে শাহজাদা খুর্‌রম বললেন, আগ্রা থেকেও দূরে—আরও দূরে যদি কোথাও যেতে হয় তোমাকে? যাবে?

—কোথায় আব্বা হুজুর?

—রাওয়ালপিণ্ডিতে—তোমার দাদাসাহেব—জাহাঙ্গীর বাদশার কাছে।

—তিনি তো আগ্রা দুর্গে থাকেন।

—হিন্দুস্থানের বাদশা যেখানেই থাকুন—সে জায়গাই আগ্রা হয়ে যায় দারা। শীত পড়বে এবার। বেলা ছোট হয়ে আসছে। তোমার দাদাসাহেব এই শীত কাটাবেন রাওয়ালপিণ্ডি দুর্গে। কান্দাহার যাবার রাস্তা সযুত হলো কিনা সরেজমিনে তাই দেখতে যাচ্ছেন বাদশা—

—আপনি যাবেন তো সঙ্গে?

—না দারা। আমার হয়ে তুমি আর আওরঙ্গজেব রাওলপিণ্ডি যাবে। সেখানে বাদশার পেশকশে আমার হয়ে নজর দেবে—বাদশা জাহাঙ্গীরের দরবারকে একজন বেদৌলত শাহজাদার হয়ে ভেট রাখবে। পারবে না?

—আমাদের দাদাসাহেব—হিন্দুস্থানের বাদশা তো আপনারই আব্বা হুজুর। আপনি যাবেন না?

—এবার আমার যাওয়া হচ্ছে না দারা। তোমরা ঘরে এসো। কী? পারবে না?

দারাশুকো কোনো কথা বললো না। সে ঘাড় নেড়ে জানালো, পারবে। তার চোখ ফেটে জল এলো। পাছে আব্বা হুজুর দেখে ফেলেন—তাই ডান কাঁধ উঁচু করে ডান গাল মুছতে গেল। পারলো না।

খুর্রম নিজেই ছেলের চোখ মুছে দিলেন। নিজের দাদাসাহেবের কাছে যাবে। সেখানে তোমার ভাই সুলতান সুজাঙ্গীরের সঙ্গে তোমাদের দেখা হবে। আওরঙ্গজেবের তো তাকে বোধহয় মনেই নেই—

এবারও দারাশুকো কোনো কথা বললো না। আঙুর ঝোপ ছত্রাকার করে দিয়ে পাখির দল চলে গেছে। গাছপালায় ঢাকা বেহড়ের ভেতর থেকে শুধু জল বয়ে যাওয়ার একটানা শব্দ—কলকল, ছলছল।

সুলতান মহম্মদ দারাশুকো কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না—একজন ইনসান কেন তার আব্বা হুজুরের কাছে যেতে পারবে না। বাধা কোথায়? হোক না সেই আব্বা হুজুর বাদশা—হোক না সে ইনসান—সেই বাদশারই শাহজাদা। অনেকদিন আগে দারা ধাইমায়ের মুখে একটা কহানি শুনেছিল। এক বাদশার মোটে একটি শাহজাদা। বাদশা খুব জ্ঞানী, সাহসী, দয়ালু। তাঁর শাহজাদা ফৌজ নিয়ে এলো। বাদশার মসনদ দখল করবে। বাদশা বললেন, অল্প ফৌজ নিয়ে আমার কাছে এসো। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলবো। নয়তো তুমি তোমার ফৌজ নিয়ে ফিরে যাও।

সেই বাদশার এন্তেকাল এলো। তিনি মরবার আগে শাহজাদাকে দেখতে চান। না দেখে মরতে পারছেন না। বারবার শাহজাদার আদরের নাম ধরে ডাকছেন বাদশা। শাহজাদা চোখের জল রাখতে পারছেন না। কাঁদতে কাঁদতে বাদশার পায়ের কাছে গিয়ে বসলেন। বাদশা তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। আমীর ওমরাহরা চেয়েছিলেন—বাগী শাহজাদা নয়—তাঁর ছেলে বাদশা হোক। কিন্তু বাদশা মরে যাবার আগে বলে গেলেন—না শাহজাদাই আমার মসনদে বসবে। শাহজাদাই বাদশা হবে।

বাদশা চোখ বোজার আগে শাহজাদাকে বললেন, অজানা লোককে মসনদের কাছে আসতে দিও না। মানীকে মান দিও। গুপ্ত কথা কাউকে বলবে না।

বাদশা চোখ বুজলেন।

ধাই মায়ের কাছে এই কহানি শুনতে শুনতে দারা চোখে জল রাখতে পারতো না। সেই বাদশা—আকবর বাদশা। সেই শাহজাদা—আজকের বাদশা জাহাঙ্গীর।

সুলতান মহম্মদ দারাশুকোর মনে হলো, সেদিনকার বাগী শাহজাদা কি আজকের বাগী শাহজাদাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন না? হাজার হোক তিনি তো একজন আব্বা হুজুর।

॥ কুড়ি ॥

কাপড়ের খুঁটি গায়ে গম্ভীর চোখ মানুষটির কাছে এখন সারা হিন্দুস্থান নতুন লাগছে। গালের দাড়িতে দেহাত হিন্দুস্থানের ধুলো লেগে তা ছাই আর সাদা রঙের। সেকেন্দ্রা থেকে ফিরোজাবাদ। সেখান থেকে মৈনপুরি সরকার পায়ে হেঁটে তিনদিনে পার হলো মানুষটি। একটানা অনেকদিন কয়েদখানায় থেকে থেকে এখন হাঁটতে গেলে পা পড়ে এলোমেলো।

আগের দিন হলে সে বলে দিতে পারতো এই মৈনপুরি সরকারকে শাহী বন্দোবস্ত মতো কত পায়দল সেপাই, কত ঘোড়সওয়াও দিতে হয়। কত লক্ষ দাম রাজকর দিতে হয় তাও বলে দিতে পারতো মানুষটি। মৈনপুরির পরেই ফতেহাবাদ সরকার। আকবর বাদশার শাহী জমানার প্রথম চল্লিশ বছরে সারা হিন্দুস্থানে এমন একশো পাঁচটি সরকার ছিল। সেই একশো পাঁচ সরকারই ভাগ করে বারো সুবা তৈরি হয়। পরে শেষদিকে বেরার, খান্দেশ, আহম্মদনগর জুড়ে হিন্দুস্থান দাঁড়ায় মোট পনেরোটি সুবায়। ততদিনে আকবর বাদশার শরীর ভেঙে পড়েছে। তিনি মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। এলাহাবাদে সুবেদার শাহজাদা সেলিম রীতিমত অস্থির হয়ে পড়েছেন।

এদিকে যমুনার তীরে আগ্রা। ওদিকে উত্তরে মাথার ওপর সরকার ফতেহাবাদ। ফতেহাবাদের সদর হলো ফতেগড়। একদম গঙ্গার ওপর। সেখান থেকে গঙ্গা ধরে নিচে নামলে বড় জায়গা কনৌজ। ওখানকার টোলে চার চারটি বছর সংস্কৃত শিখেছিলাম।

ফতেগড়ে গঙ্গার বুক দিয়ে বাড়ি তৈরির ঘুটিং চুন যাচ্ছিল। পেছন পেছন কাঠের নৌকো। জানলা দরজা তৈরির কাঠ। শিশু, শাল, তুঁত, কুলগাছের গোলাই ভর্তি বড় বড় নৌকো এলাহাবাদের দিকে ভেসে চলেছে। তারই একখানায় জায়গা করে নিলো গম্ভীর চোখের এই বুড়ো মানুষটি।

পরেপর কাঠ আর ঘুটিং চুন বোঝাই নৌকো ভেসে চলেছে। লোকটির মনে হলো—এই তো ভাসন্ত হিন্দুস্থান। আমি হিন্দুস্থানের সঙ্গে ভেসে চলেছি। যে যমুনা আগ্রায় ফেলে এসেছি—তার সঙ্গে এলাহাবাদে গিয়ে আবার সঙ্গমে দেখা হবে।

কনৌজে ভিড়বার আগেই কাঠ আর চুনের নৌকোর সঙ্গে কয়েকখানা নীলের নৌকো এসে ভিড়লো। নৌকোর নীল ব্যাপারিদের কথায় টানে টোনে বুড়ো মানুষটি বুঝলো, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, আলিগঞ্জের মাঠ থেকে এসব নীল কেনা।

পাশাপাশি সব নৌকো। দিন রাত্তির একসঙ্গে ভেসে থাকা। তাই কাঠ, চুন, নীলের নৌকোর মানুষজনের সঙ্গে বুড়ো মানুষটির দিব্যি আলাপ পরিচয় হয়ে গেল।

ঘুটিং চুনের নৌকোর এক মাঝি বললো, একটা তো মানুষ আপনি। আর

রাঁধবেন বাড়বেন কেন ? আমাদের সঙ্গেই খাবেন—

বুড়ো মানুষটি হ্যাঁ বা না কিছুই বললো না। তার খাবার জোটাবার একটি দামও নেই সঙ্গে। এই ক'দিনে আগ্রা থেকে হাঁটাপথে এতটা পাড়ি দেওয়ার সময় যখনই কোনো মসজিদ পেয়েছে—তখনই ভিখারিদের সঙ্গে হাত পেতে বসে গেছে। যা দু'চারটে আধেলা, পওয়া, দামড়ি জুটেছে—তাই দিয়ে সরাইখানায় যা হোক কিছু কিনে খেয়ে পিত্তিরক্ষা চলেছে।

খাবার খুব সরল সিধে। যবের রুটি। কলাইয়ের ডাল। মাথার ওপর সূর্য। ডালে রুটি ভিজিয়ে খেতে খেতে বুড়ো মানুষটি দর জানতে চাইলো। কত করে মণ ?

—কিসের ? যবের ? এক মণ কিনতে আটটি দাম ধরে দিতে হয়—

—আমি একসময় চার দামে এক মণ যব কিনেছি—

—কতদিন আগে ? নিশ্চয় আকবর বাদশার সময়—

বুড়ো খেতে খেতে বললো, হ্যাঁ। তখন কলাই কিনতাম—এক মণ তিন দামে।

—এখন এক মণ কলাইয়ের দর সাত দাম। কবেই চলে গেছে আকবর বাদশার দিন। জাহাঙ্গীর বাদশার শাসনের এটা বিশ সন।

যবের রুটি কিছু মিষ্টি হয়। তাই ডালে ডুবিয়ে খেতে খেতে বুড়ো মানুষটি বললো, ওরে বাবা ! এত দাম ? তাহলে চাষীবাসী মানুষরা কী খাবে ? কিনবে কোত্থেকে ?

এক নীলের নৌকোর বড় মাঝি নীলের গোছায় জল ছিটোতে ছিটোতে বললো, কনৌজ, ফতেগড়ের মতো বড় জায়গায় মানুষের হাতে তবু দুটো পয়সা আছে। কিন্তু দেহাতে সাতখানা গাঁ খুঁজে আপনি একখানা আধেলা কিংবা পওয়া বের করতে পারবেন না।

—তাহলে তারা খাচ্ছে কী ?

—কন্দমূল, তেঁতুল, মুথাঘাসের বীজ খেয়ে টিকে আছে কোনোরকমে।

—নীল কিনলে কত করে ?

—গড়ে চব্বিশ টাকা মণ।

বুড়োর মনে পড়লো—আকবর বাদশার আমলেও তো আগ্রার গায়ে গজহস্তী গাঁয়ে এক মণ নীল কিনতে হলে চাষীকে দিতে হতো চব্বিশ টাকা। চল্লিশ দামে এক টাকা। বিশ সনের ওপর চাষীর দর সেই একই আছে ! আশ্চর্য !

একদিন বেলাবেলি এসে সব নৌকো ভিড়লো কনৌজের ঘাটে। ভিড়তেই নীলের নৌকোর ওপর ইংলিশস্তানের বেনিয়ান এসে দাঁড়ালো। বুড়ো চোখের সামনে দেখলো, গড়ে চব্বিশ টাকা মণ দরে কেনা নীল ইংলিশস্তানের বেনিয়ান কিনে নিলো ছত্রিশ টাকা মণ দরে। দুপুরের আগেই নৌকো খালি করে নীল নিয়ে তারা চলে গেল। এ নীল এলাহাবাদ, পাটনা হয়ে হুগলি দিয়ে ইংলিশস্তানে চলে যাবে।

বুড়ো দুপুরে খেতে পারলো না। এ তো দিনে ডাকাতি! এইভাবে হিন্দুস্থানের চাষী ফতুর হচ্ছে? শাহী দেওয়ানখানার হয়ে দেখার কেউ নেই? আশ্চর্য! মাঝখানে দালালদের নাফা চব্বিশ টাকায় বারো টাকা?

ঘুটিং চুন আর কাঠের নৌকো কিছু ব্যবসা করে সন্ধে সন্ধে এলাহাবাদ পাড়ি দেবে। দিশি দালালদের নীলের নৌকো ফিরে যাবে ফতেগড়। বিকেলের দিকে বুড়ো মানুষটাকে কচ কচ করে বড় একটা কনৌজি পেয়ারা খেতে দেখে এক নীল ব্যাপারি রেগে মেগে বললো, এই বুড়ো—তুমি তো বড় বেয়াড়া আছো—

ঘাবড়ে গেল গম্ভীর চোখ মানুষটি। কেন, কী করলাম?

—দুপুরে খেতে দিলাম। বললে খিদে নেই। আর এখন কষা পেয়ারা কচমচ করে খাচ্ছে?

—তখন খিদে ছিল না। এখন পেয়েছে—

—উঁহু! গোলমেলে লোক আছো তুমি। কোথাকার মানুষ তুমি?

—কেন? হিন্দুস্থানের—

—উঁহু। ঘর-গেরস্থি কোথায়?

—একসময় আগ্রায় ছিল।

—তা আমাদের সঙ্গে ভেসে বেড়াচ্ছো কেন?

—কাশী যাবার ইচ্ছে একবার। এভাবে যতটা যাওয়া যায়—

—তুমি বাবা লোক সুবিধের নও।

এবার বুড়ো যেন ক্ষেপে গেল। আচমকা বলে বসলো, তোমরাও লোক সুবিধের নয়।

—কেন? কেন? কী দেখলে আমাদের?

—চব্বিশ টাকায় কেনা নীল—বেচছো ছত্রিশ টাকায়—এ তো দিনে ডাকাতি!

নীলের নৌকোর অন্যসব লোকজন এবার বুড়োকে ঘিরে ধরলো। এক একজন এক এক কথা বলে। তাদের পায়ের চাপে নৌকোগুলো দুলছে। কনৌজে এক বয়সে সংস্কৃত পড়তে এসেছিল মানুষটি। আর এখন বুড়ো বয়সে সেই কনৌজেরই ঘাটে নীলের দালালদের মাঝে পড়ে গেছে সে।

ওরা বলছিল—আগ্রার খবর রাখো বুড়ো? উঠতে বসতে কর দিতে হয়। বিয়ে করতে কর। ফসল কাটতে কর। তশীলদার, ক্রোরী, ডিহিদার—সবার খরচ চালাতে খরচ-ই-দে যোগাতে হয়। তো চাষীর নীলের ওপর চড়া নাফা না তুললে আমাদের চলবে কোত্থেকে?

এতগুলো লোকের একরোখা কথার মুখে বুড়ো শান্ত গলায় বললো, একসময় তো আগ্রার খবর রাখতাম!

—সে তো তোমার আকবর বাদশার সময়! এখন বাদশা জাহাঙ্গীর—

—তা ওসব আবওয়াব কর তো বেআইনি।

—আমরাও তো তাই জানি। সেলিম জাহাঙ্গীর মসনদে বসে ফরমান জারি

করলেন—ওসব আবওয়াব নেওয়া বেআইনি। কিন্তু কাজে কম্মে কিছুই তো রদ হয়নি বুড়ো! বেআইনিই এখন আইনি।

সন্ধের দিকে নীলের সব নৌকো ফতেগড় ফিরে গেল।

কাঠের নৌকোয় একটা শিশুগাছের গোলাইয়ের ওপর বসেছিল বুড়ো। একপাল নৌকো রাত চিরে ভেসে চলেছে এলাহাবাদের দিকে। সারাদিন বকর বকরের পর তার আর কথা বলার ইচ্ছে নেই। বিশ বছরের মতো কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে আসার পর এখন দেখছে—সারা হিন্দুস্থানই পালটে গেছে।

শাহী দস্তুর-ই-আমিল-বেকাসে লেখা ছিলঃ দর জিরায়তে ওয়া ইমারত খুদ মশগুল ওয়া খুশওয়াকথ বাশান্দ ওয়া রেয়া ইয়রা দর কশথনে জিনসে কামাল রাগবৎ দেহাদ কে জমায়ে পরগণাৎ সাল বেসাল আফজুদান শওয়াদ।

চাষীদের সঙ্গে এমনভাবে বন্দোবস্ত করবে যে তারা নিশ্চিন্ত মনে ও নিরাপদ অবস্থায় বাড়িঘর ও বসবাসের উন্নতি করবে—খুশি থাকবে আর ব্যবসা বাণিজ্যের ফসল চাষ করতে উৎসাহী হবে। যার ফলে বছরের পর বছর পরগনার শাহী আদায় বাড়বে।

কতকাল আগে শেখা জিনিস আজও ভুলতে পারিনি। ওই সঙ্গেই শাহী দস্তুর-ই-আমিল-বেকাসে লেখা ছিলঃ কর দিতে অনিচ্ছুক চাষীদের এমন-ভাবেই শায়েস্তা করা উচিত যে—অন্য চাষীরা যেন আগে থেকেই সাবধান হতে পারে।

গঙ্গার দু'ধারে লোকালয়ের মানুষজন বোধহয় ঘুমিয়ে পড়লো। এখানে সেখানে দু'একটা আলোর ফুটকি। কনৌজের ঘাটে এতক্ষণে বোধহয় কোনো কথকতার আসর জমে উঠেছে। ওখানে থাকলে বেশি রাতে কথকতার প্রসাদী বাতাসা পেলে তার সঙ্গে জল খেয়ে পেটে কিল মেরে ঘাটেই ঘুমিয়ে পড়া যেতো।

এখন আকাশে পোকায় কাটা একখানি ক্ষয়াটে চাঁদ। দূরে দূরে ঢেউয়ের ঝিলিমিলির মাথায় মালটানা সব বজরা। তারা এই কাঠবোঝাই—ঘুটিং চুন বোঝাই নৌকোর মতোই পালে চলেছে। দল বেঁধে। নদী ডাকাতি নাকি এখন খুব হয়। আশ্চর্য! আগে তো—

আগের শাহী তো আরেক চালে চলতো। বড় খিদে পাচ্ছে। বুড়ো তার মনটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিতে চাইলো। আকবর বাদশা খাজানাখানার মদতেই শেরওয়ানি সাহেব তুহ্ফাৎ-ই-আকবর শাহী লেখেন।

তা তার গোড়াতেই তো শেরশাহের আমল নিয়ে পরিষ্কার লেখা ছিল—দেশের বাদশা হতে হলে শেরশাহের মতো গুণী হতে হবে। যে শেরশাহের হাতে মুঘল বাদশা হুমায়ুন নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন! কোনো ঢাকা চাপা ছিল না। মুঘলরা সবাই মনে মনে শেরশাহ হতে চায়। তাই তো দেখে আসছি আমি। শেরশাহের আদলে আকবর বাদশা কত গুণীজনকে যে খরচ খরচা চালাবার জন্যে নিষ্কর জমি দিয়ে মদত-ই-মায়েশ করেছেন তার লেখা জোখা নেই। বাদশা আকবর ভেতরে ভেতরে চাইতেন—শেরশাহ হবো। আবার এও

চাইতেন ভেতরে ভেতরে—আমাকে বাদশা হতে হয় তো অশোকের মতো বাদশা হতে হবে।

ভোর ভোর এ নৌকো পেঁছিবে ফতেপুর। তারপর আর ক'দিনের রাস্তা। সঙ্গমে গিয়ে এলাহাবাদ। সেখান থেকে তিনদিনের পাড়ি কাশী।

হিন্দুস্থান এক বিশাল দুনিয়া। এর এদিকে ওদিকে কত মানুষ কত দিকে পাড়ি দিচ্ছে। কেউ বা এখন তার অভিযানের মাঝামাঝি। কেউ বা স্রেফ শুরুতেই। দিনে রাতে সূর্য-চন্দ্রের আকাশ পাড়িই দুই রকমের। তাই সবাই খেয়াল রাখে না। আর কোন্ ইনসান কোনদিকে রওনা হলো—কতটা গেল—সে তার জায়গায় পেঁছিলো কি না—এত সবের খবর—তত্ত্বতাবাস কে রাখবে!

আগ্রা দুর্গে মোরি দরওয়াজা আর হাতিশালার মাঝামাঝি অন্ধকার ঢাকা-পথ দিয়ে দুর্গের চাতালের নিচে গিয়ে শাহজাদা শারিয়ার নওরোজের কয়েদী—আজাদির দিন অস্থির হয়ে অসহ্য অবস্থায় ওই গম্ভীর চোখ বুড়ো কয়েদীকে খালাস পাওয়া কয়েদীদের ভেতর ঠেলে না দিলে—এখন তাকে ফতেপুরের পথে নৌকোর ওপব দেখতে পাওয়া যেতো না। হয়তো জীবনের বাকি দিনগুলো তাকে দুর্গের নিচের কয়েদখানাতেই কাটিয়ে দিতে হতো।

বিশাল এই হিন্দুস্থানে বোবা আশমানের নিচে কে যে কখন কোথায় যাবে—কী ভাবে যাবে—কেউ তা বলতে পারে না—কেউ তার খেয়ালও রাখে না। শুধু হিন্দুস্থানে কেন? সারা দুনিয়াতেই তো তাই। আর চিরকালই তো তাই।

কিন্তু কোথাও কোথাও কেউ খবর রাখে।

গিরনা নদীকে রাতের আবছা জ্যোৎস্নায় চেনা যায় না। সাতানা পাহাড় বিশাল এক মণ্ডের মতো চাঁদের আলোয় ভোঁতা হয়ে জেগে আছে। আর কয় ঘড়ি পরে পাখির দল আঙুর খেতে এলে ভোর আসবে। তার আগে এখানে বোঝাই যায় না রাত আদৌ শেষ হবে কিনা।

এরকমই এক মুহূর্তে তাঁবুর ভেতর ঝোলানো সুখদোলায় মোচড় দিয়ে পাশ ফিরতে গেলেন শাহজাদা খুর্রম। ঘুম ভেঙে গেল। গুলালবার তাঁবু এমনিতে বড় হয়। দুই কোণে দুটি নিভু নিভু আগেনগারে গুগগুলের সঙ্গে লোবান পুড়ে পুড়ে বাতাসটাই লেবুগন্ধ।

—বেগম!

. কোনো জবাব পেলেন না খুর্রম। জাহানারা, রৌশনআরার পাশেই শিশু মুরাদ। কিন্তু ওদের আম্মিজান কোথায়? তড়াক করে উঠতেই খুর্রমের চোখে পড়লো, আরজুমন্দ বানু সাতানা পাহাড়ের দিককার চিলমন খেলাপ করে একদৃষ্টে অন্ধকারে তাকিয়ে।

কোনো কথা না বলে খুর্রম গিয়ে পাশে দাঁড়ালেন। সাতানা পাহাড়টাকে চাঁদের আবছা আলোয় সবুজ লাগছে। খুর্রম আরজুমন্দের পিঠে হাত রাখলেন। আমিই দায়ী—আমিই দায়ী বেগম—

আরজুমন্দ খানিকক্ষণ কোনো কথা বললেন না। তারপর খুব শান্ত গলায় জানতে চাইলেন, এতক্ষণে ওরা সাতানার পাহাড়ি রাস্তা পেরিয়ে গেছে?

—কখন! ভোর ভোর হাতির পিঠে দু'ভাই রওনা দিয়েছে। দশ মঞ্জেল পথ পেরোতে হাতির পক্ষে কতক্ষণ! তুমি চিন্তা কোরো না বেগম—

—এই পাহাড়ি রাস্তা। দু'পাশে বনজঙ্গল। তারপর গিরনা নদী ওদিকে নাকি পাগলাঝোরার চেয়েও ক্ষ্যাপা হয়ে ছুটেছে।

—হাতির পক্ষে কিছু নয় বেগম। দারার পেয়ারের হাতি ফতে-জং রয়েছে। চিন্তা কী বেগম—

—হাজার হোক হাতি জানোয়ার।

—ওকথা বোলো না আরজুমন্দ। হাতি খুব মগজদার জানোয়ার। দারা, আওরঙ্গজেবকে পিঠে নিয়ে যখন ভোর ভোর রওনা দিলো ফতে-জং—আমার তো মনে হলো ফতে-জং ফুর্তিতে রীতিমত ডগমগ। আব্বা হুজুর জাহাঙ্গীর বাদশার হাতি নুর-ই-ফিল অনেকটা এরকম। দাদাসাহেব আকবর বাদশার পেয়ারের হাতি ফিল-ই-ইলাহি—

কথা শেষ করতে পারলেন না শাহজাদা খুর্রম, আবছা অন্ধকারে এমন করেই ঘুরে তাকালেন আরজুমন্দ বানু। হাতিদের হাল-হকিকত শুনে কী করবো শাহজাদা। আমি মা। ভুলে যাবেন না—সুলতান মহম্মদ দারাশুকোর বয়স এখন মোটে দশ। সুলতান আওরঙ্গজেবের বয়স মোটে সাত। আমি চিন্তা করবো না তো কে করবে বলুন!

—আমি ওদের আব্বা হুজুর। ওরা বালক হলেও মুঘল। ওরা বালক হলেও সুলতান। আজ দু'বছরের ওপর ওরা পায়ে পায়ে হিন্দুস্থানকে চিনেছে। দেখেছে—লড়াই কাকে বলে। তোপ কীভাবে ছুটে যায়—ওরা নদী, পাহাড়, হাতি, ঘোড়ার সঙ্গে মিশে আছে বেগম—

আরজুমন্দ বানু আবারও শাহজাদা খুর্রমের চোখে চোখ রেখে মুখোমুখি দাঁড়ালেন। এবার বিখ্যাত সেই দু'চোখ দেখে মুখ নামিয়ে নিলেন খুর্রম। তিনি ভেবেছিলেন—বেগম কিছু বলবেন। আরজুমন্দ কিন্তু কিছুই বললেন না।

—সুলতানরা দু'ভাই যে তাদের দাদাসাহেব জাহাংগীর বাদশার মবারকে নজর পেশ করতে রাওয়ালপিণ্ডি যাচ্ছে—সেকথা হিন্দুস্থানের সুবায় সুবায় —চৌকিতে চৌকিতে খবর হয়ে গেছে বেগম।

তখনো আরজুমন্দ কোনো কথা বললেন না।

খুর্রম বললেন, ওদের সঙ্গে রয়েছে ওদের ধাই-মা। কয়েক রিসালা বাছাই ঘোড়সওয়ার। তিনশো বন্দুকচী। এছাড়া ধানুকীরা তো আছেই। আছে মোট ছ'ছটা হাতি।

বেগম আরজুমন্দ বানু খেলাপি চিলমন নামিয়ে দিলেন। এখন আর সাতানা পাহাড় দেখা যাচ্ছে না। যেন গভীর উদ্বেগের ওপরেই তিনি তাঁবুর পর্দা নামিয়ে দিলেন।

এবার শাহজাদা পুরো অন্ধকারে তার বেগমের মুখোমুখি ! কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না। তার ভেতরেই আরজুমন্দ প্রায় রিনরিনে গলায় জানতে চাইলেন, উচ্চাশা মানে কী শাহজাদা ?

এটা ঠাট্টা ? না, জিজ্ঞাসা ? তা ঠিক করতে পারলেন না খুর্‌রম। তিনি ঠাণ্ডা গলায় বললেন—জানি না বেগম। তবে বলতে পারো—উচ্চাশার অন্য নাম বেদৌলত খুর্‌রম !

কাছে ছুটে এসে শাহজাদার বুকে হাত রাখলেন আরজুমন্দ। ওকথা বলবেন না শাহজাদা। দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব, মুরাদের মতো চার চারটি ছেলে আপনার। আপনারই দুই মেয়ে জাহানারা, রৌশনআরা। এ দুনিয়ায় আপনার মতো দৌলতদার কে ?

—আমি বিরাট একটা খোয়াব দেখেছিলাম আরজুমন্দ।

—শাহজাদা আমার খোয়াব খুব ছোট। আমি মা। আমি স্বপ্ন দেখি আপনার ছেলেরা সুখে আছে। নিরাপদে আছে। দু'মাসের লম্বা রাস্তা পাড়ি দিচ্ছে—আপনার দুই ছেলে। ওরা নেহায়েত বালক। পাহাড়ি পথ। সামনে শীত। আমার খোয়াব না শেষে টুকরো টুকরো হয়ে যায়—

শাহজাদা এরপর কিছু বলতে পারলেন না। তিনি আরজুমন্দকে তাঁর বুকের ভেতর জড়িয়ে নিলেন। কোথায় আগ্রা দুর্গে সুখের ঘর ! আর কোথায় সাতানা পাহাড়ের পায়ের কাছে তাঁবুর ভেতর আশ্রয়। যা কিনা বিপদ বুঝলেই গুটিয়ে নিয়ে আবার পথে নামতে হবে।

খোয়াব যত বড় হয়—সে তার দাম ততখানি আদায় করে নেয়। দুশ্চিন্তা, কষ্ট, বিপদ মেনে নিয়ে সে দাম শুধে যেতে হয়।

ব্যবসাপত্তর করতে করতে ঘুটিং চুন আর কাঠের নৌকোগুলো একদিন কাশীর ব্যাপারি ঘাটে এসে ভিড়লো। এখন আর শুধু কাপড়ের খুঁটে গা ঢাকতে হয় না গম্ভীর চোখ সেই বুড়োকে। এলাহাবাদের ঘাটে তুলো ভরা একটি কাম্বাদার জুটেছে তার। নৌকো ভিড়তেই কাম্বাদারটি গায়ে দিয়ে সেই বুড়ো ঘাটে নামলো। নেমেই রাস্তার হাটুরে ভিড়ে সে মিলিয়ে গেল।

কাশীর অস্‌সী-গঙ্গা সঙ্গমে হেমন্তের আশমানে এখনই শীতের দু'একদল পাখিকে ভাসতে দেখা যাচ্ছে। গোপালমন্দির, প্রহ্লাদঘাট, সংকটমোচনে যেসব থুনথুনে বুড়োবুড়ি এসে বসে—তাদের কেউ কেউ বিকেল বেলায় দূরের ওই পাখির ঝাঁক দেখে বললো, এবার শীত জাঁকিয়ে আসছে। প্রহ্লাদঘাটের এক বুড়ো বললো, এই শীতটা যদি বাঁচি তো একশো পার করে দেবো।

সেই বুড়োর মুখোমুখি বসা অন্য এক বুড়ো রীতিমত ধমকে উঠলো। এ-বয়সে আর মিথ্যে কথা বোলো না। শ পেরিয়ে এসেছো বছর বিশেক হলো। আর বেঁচে কী করবে ! দেখার কি বাকি আছে কিছু ?

প্রথম বুড়ো একথায় কিছু মিইয়ে গেল। তার পাশে বসেছিল তুলোভরা কাম্বাদার গায়ে গম্ভীর চোখ সেই বুড়ো মানুষটি। তার দাড়িতে এখন সারা

হিন্দুস্থানের ধুলো। সেও দেখতে পেয়েছে—দূর আকাশে শীতের পাখি।

সেদিকে তাকাতে তাকাতে মানুষটি উঠে দাঁড়ালো। তারপর পায়ে পায়ে একে একে হনুমান ফাটক, গোপালমন্দির, সংকটমোচন ঘুরতে ঘুরতে ঠিক সন্ধের মুখে গম্ভীর চোখ মানুষটি তুলসীঘাটে এসে বসলো।

তুলসীঘাটের একদিকে তেল-সিঁদুর মাখানো বিরাট হনুমান মূর্তি। তার পাশে খানিকটা ফাঁক দিয়ে রামমন্দির। মন্দিরে তখন আরতি হচ্ছিল। মানুষটি ঘাটের চাতালে বসে অন্ধকারে একটু একটু করে গঙ্গা মুছে যেতে দেখছিল।

অনেকদিন পরে আজ সন্তকবি তুলসীদাস নিজে আরতি করছিলেন। পারার কথা নয়। বয়সের ভারে হাত কাঁপে। শরীরও ভালো নয়। নিত্যসঙ্গী বেণীমাধব তাই পাশে দাঁড়ানো।

আরতির শেষে তিলেখাজার প্রসাদ দেওয়া হলো। প্রসাদপ্রার্থী অনেকেই। গঙ্গার মাঝি যেমন আছে—তেমনি আছে কাশীর গৃহস্থজন আর শিবের কাছে চিরকালের মতো ফেলে যাওয়া সহায় সম্বলহীন কিছু বুড়োবুড়ি।

ওরা উঠে যেতে বেণীমাধব আরতির কোষাকুষি, ভোগের মেঠাই সব গুছিয়ে তুলছিল। কবিবর একা একাই মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে নামছেন। নামতে গিয়ে বাঁ পায়ের খড়ম খানিক হড়কে গেল। জায়গাটা অন্ধকার। মন্দিরের ভেতর প্রদীপের শিখা তখনো বাতাসের সঙ্গে অন্ধকার নিয়ে দাপাদাপি করছিল।

হা হা করে ছুটে আসতে গিয়ে বেণীমাধবের হাতের থালাখানা ঝনঝন শব্দ করে মেঝেতে নাচতে লাগলো। বেরিয়ে এসে বেণীমাধব দেখলো অশক্ত কবিকে আরেক দাড়িওয়ালা বুড়ো ঠিক সময়ে ধরে ফেলেছে। নয়তো হয়েছিল।

সামলে নিয়ে তুলসীদাস উঠে দাঁড়ালেন। বেণীমাধব তাঁর পাশে পাশে হেঁটে কবিকে নিয়ে গুহার মুখে এসে দাঁড়ালো। সেখানেও ওই দাড়িওয়ালা লোকটি এসে দাঁড়ানোতে কিছু অবাক হলেন তুলসীদাস। ভক্তজন মন্দিরের সিঁড়ি অব্দি আসে। এতদূর কখনো আসে না। তিনি কৃতজ্ঞ গলায় বললেন, আপনি না থাকলে আজ—

গম্ভীর চোখ বুড়ো মানুষটি কোনো কথা না বলে কবির সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে গুহায় নামতে লাগলো। এবার বেণীমাধব দাঁড়িয়ে পড়লো। কোথায় যাবেন আপনি?

গম্ভীর চোখ বুড়ো মানুষটি বললো, কেন? কবির সঙ্গে সঙ্গে কবির কাছেই যাচ্ছি। নিচে গিয়ে বসে কবিবরের সঙ্গে কথাবার্তা বলবো।

—সন্তজি এখন বিশ্রাম নেবেন। এই সময় কারও সঙ্গে কথা বলেন না—

—নাই বা বললেন। আমিই না হয় কথা বলে যাবো কবির সঙ্গে।

এমন বেয়াড়া অতিথি কখনো দেখেনি বেণীমাধব। খোদ কবি কিছু বলতে পারছিলেন না। ভদ্রতায় আটকাচ্ছিল। একটুক্ষণ আগে এই বুড়ো মানুষটি ছুটে এসে না ধরলে তিনি মন্দিরের সিঁড়িতে ভয়ংকর আছাড় খেতেন।

বেণীমাধব শেষ অস্ত্র ছাড়লো। আপনি বরং কাল সকালে আসুন—

সন্তকবি নিজেই লজ্জা পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, আঃ! বেণীমাধব—

ওর ভেতরেই গম্ভীর চোখের মানুষটি খুব শান্ত চোখে বেণীমাধবের মুখে তাকালো। তারপর গম্ভীর গলায় বললো, বিশ পঁচিশ বছর হয়ে গেল আমি আসিনি। আমি কি তাহলে চলে যাবো এখন ?

দাঁড়িয়ে পড়া তুলসীদাস কিছু অবাক হলেন। আপনি ?

—সারাদিন ঘুরে ঘুরে যাও বা আপনার হদিস পেলাম—তা এখন তো আমায় চলে যেতে বলা হচ্ছে। ঠিক আছে—কাল সকালেই আসবো।

—দাঁড়ান। সব মনে রাখতে পারি না আজকাল। বয়স হয়েছে—

—আমারও বয়স হয়েছে কবিবর—

—আসুন বসবেন।

—আপনি তো বিশ্রাম নেবেন এখন—

—আপনার সঙ্গে কথা বলাই আমার বিশ্রাম। আসুন। বেণীমাধব খেসখানা পেতে দাও।

দুজনে মুখোমুখি বসতে তুলসীদাস অসহায় শিশুর মতোই বললেন, আমি স্মৃতির কাছে পরাস্ত। দয়া করে এবার আপনার পরিচয় বলুন।

—আমিও এক কবি। আপনি বড়—আমি অতি নগণ্য। একদা সতসঈ লিখেছিলাম—

—ওঃ! আবদুর রহিম। আবদুর রহিম খানখানান। কতকাল পরে। কতকাল হয়ে গেল। আপনি শুধু কবি নন। আপনি রসিক কবি। মন্ত্রীও বটে—

—একসময় মন্ত্রী ছিলাম। মনে আছে তো আপনার!

—বাঃ। ভুলি কী করে? আপনার আব্বা হুজুর বৈরাম খাঁ। আপনার বাবাকে আকবর বাদশা মক্কা শরিফ যাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে আপনাকে মন্ত্রী করলেন। অযোধ্যায় থাকতে এসব কথা শুনেছিলাম। অনেকদিন আগে—

—তা আব্বা হুজুর তো মক্কায় পৌঁছতে পারেননি। পথেই খুন হলেন। পুরনো হিসেব মেটাতে এক পাঠান তাঁকে খুন করে। তার বাবা নাকি আমার বাবার হাতে খুন হয়েছিল।

—শুনেছিলাম। অনেকদিনের কথা তো।

—আগেকার লোদি-সৈয়দ রাজাদের ভাতিজারা তো কবে থেকেই বলে আসছে—মুঘলরা বেশিদিন টিঁকবে না। গেল গেল। তা একশো বছর তো টিঁকে গেল। আরও একশো বছর টিঁকলেও আশ্চর্য হবো না। বাবর-আকবরের বাঁধুনি!

—মহাকালের হিসেবে একশো বছর আবার সময় নাকি!

—সন্তজি। মানুষের জীবনে একশো বছর অনেক সময়। বলতে গেলে দুটো মানুষের জীবন।

—এতদিন কোথায় ছিলেন? দেখা পাইনি কেন?

—পাবেন কোত্থেকে! বিশ বছর মতো কয়েদ খাটলাম—

—আপনি! কেন?

—শুনে কী করবেন কবিবর? ছিলাম মন্ত্রী। আকবর বাদশার এন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে হলাম কয়েদি। দোষ আমারই। আকবর বাদশার জীবনের একেবারে শেষদিকে আমি, মানসিংহ আরও কয়েকজন আমীর মিলে বাদশাকে বললাম, শাহজাদা সেলিম বাগী হয়েছিলেন। আপনার পরে হিন্দুস্থানের মসনদে বসানো হোক সেলিমের বড় ছেলে খসরুকে। তাজা জওয়ান। তা আকবর বাদশা মনে মনে ঠিকই করে রেখেছিলেন, তাঁর পরে তাঁর মসনদে শাহজাদা সেলিমকেই বসাবেন। শেষ পর্যন্ত তাই-ই হলো। শাহজাদা সেলিম বাদশা হতেই আমি গ্রেফতার হলাম—

—অভিযোগ?

—শুনলে হাসবেন সন্তজি। রাফিজি। আমার বিরুদ্ধে রাফিজির অভিযোগ!

—কিরকম?

—কবিবর। আমি রামচরিতমানসের গান—কথকতা শুনতে ভালোবাসি। যেখানেই হতো—আমি শুনতে বসে যেতাম। আপনি তো জানেন। সেটাই হলো আমার অপরাধ। মুসলমান হয়ে হিন্দুর রামকথা শোনা? এর চেয়ে বড় রাফিজি আর কী হতে পারে! কথকতা শুনে আমার দু'চোখ দিয়ে জল গড়াতো। হিন্দুস্থানের এত বড় মহাকাব্য শোনাও যে আমার কাল হবে ভাবতে পারিনি। আমি যে আপনারই মতো বাদশা আকবরের আমলের মানুষ। আসলে বাদশাহীর জন্যে সুলতান খসরুর নাম সুপারিশ করেছিলাম কিনা! তাই—

—কতদিন হলো ছাড়া পেয়েছেন?

—এই তো—ক'দিন মাত্র। আগ্রা একবার কাউকে কয়েদে পাঠিয়ে তার কথা আর মনে রাখে না। বেমালুম ভুলে যায়। বিশ বছর পর আজাদ হয়েছি।

কবি তুলসীদাস চুপ করে তাকিয়েছিলেন। তাঁর চোখে জল এসে দাঁড়িয়েছে। জলের ফোঁটায় কবি আবদুর রহিম খানখানানের সাদা চুল দাড়ি সুদ্ধ মুখখানা আবছা হয়ে গিয়ে আস্ত একটা সাদা গোলমত জিনিস হয়ে পড়লো। এই মাথা তিনি একসময় দেখেছেন কালো ঢেউ খেলানো বাবরি চুলে ঢাকা। তুলসীদাস আস্তে বললেন, রামচরিত মানসের রস আস্বাদ করতে গিয়ে কবি আপনাকে বড় দাম দিতে হয়েছে। বিশ বছর কয়েদে—বিশ বছর—

—তাও তো ছাড়া পেতাম না। কয়েদখানাতেই চোখ বুজতে হতো একদিন। স্রেফ নসিব, কবিবর—স্রেফ নসিব—

কাশীর গঙ্গায় অনেক ঘাট। ঘাটে ঘাটে অনেক মন্দির। প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে নিত্য আরতি। নিত্য ভোগ। অন্ধকার গঙ্গার বুকে কাঁসার ঘণ্টার ধ্বনি গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। জলের দিককার খোলা জানলা দিয়ে তা যেন ঐকতান হয়ে সন্তজির বসার জায়গায় এসে পৌঁছচ্ছিল।

বহুদিন পরে দু'জনের দেখা। একজন সন্ত আবার কবি। অন্যজন কবি, রসিক, শাহী দস্তুরীতে পাকা—একদা মন্ত্রী—আবার দীর্ঘদিনের কয়েদিও বটে।

দূরে বসে ওদের দুজনকে দেখছিল—আর এসব ভাবছিল বেণীমাধব। ভাবছিল —আজ আমার কী সৌভাগ্য। আমি সন্ত তুলসীদাসের নিত্য সেবা করি। আবার এই এক রসিক কবিরও দেখা পেলাম। সবই তুলসীর কাছে থাকার ফল।

—কথা বলে মগজে চিন্তার সংঘর্ষ ঘটেনি বহুকাল। শাহী কয়েদখানা মানে তো দোজখ। এই বিশ বছর নতুন কিছু শুনিনি। মগজে চিন্তাভাবনার কথা নিয়ে অনেকদিন কোনো নাড়াচাড়া হয়নি সন্তজি। এখন কে কী ভাবছেন ? কোথায় কী হচ্ছে কিছুই জানি না—

এত বছর কয়েদে কাটিয়েও আবদুর রহিম তার জানার ইচ্ছা হারায়নি। রহিমের মুখে তাকিয়ে তুলসীদাস তার পিপাসু চোখ দুটি দেখতে পাচ্ছিলেন। বললেন, তেমন তো কিছু শুনিনি শিগগিরি। আমি শ্রীরামেই আছি দীর্ঘদিন—

—বন্ধ জানোয়ারের জীবন কেটেছে কয়েদে। না কিছু পড়েছি। না কিছু শুনেছি। গান শুনিনি বিশ বছর। মনে হয় বালি ভর্তি হয়ে মগজটাই পুরনো কুয়োর মতো বুজে গেছে। যে-কথা শুনলে মাথাটা কাজ করে—মগজের ভেতর নাড়াচাড়া হয়—তেমন কথা যে কতকাল শুনিনি—

—অনেকদিন আগে এমন একজন মানুষ দেখেছিলাম। তখন আমার বয়স কম ছিল। চল্লিশও হয়নি। অযোধ্যায় থাকি। রামচরিতমানসের বালকাণ্ডের পর অরণ্যকাণ্ড লিখছি। তখনই তাঁর নাম শুনি প্রথম।

—কার কথা বলছেন সন্তজি ?

—বাংলা মুলুকে গেছেন কখনো ?

—আকবর বাদশা তাঁর শেষ জীবনে আমায় একবার পাঠান। অনেক নদী। গঙ্গা ওখানে গিয়ে সাগরে পড়েছে—তামাম হিন্দুস্থান সেখানে গিয়ে ডুব দেয়। তীর্থ করে।

তুলসীদাস বললেন, আপনি পুণ্যবান !

—না। আমি সাগরসঙ্গমে যাইনি। ওপরের দিকে ঘুরেছি। তীর্থকর কতটা বসানো যায় শাহী হুকুমতে—তাই সরেজমিনে দেখে আসার জন্যে বাদশা আমায় পাঠান।

—তিনি ওখানকার কোটালিপাড়ার মানুষ। মধুসূদন সরস্বতী।

—নামটা চেনা লাগছে কবিবর। গিয়েও থাকতে পারি। অনেকদিন আগের কথা তো। সব মনে নেই। তবে কয়েকটা নদীর নাম ভুলিনি। মধুমতী। গড়াই। ঘাগর। বড়াল। একটা বিরাট বাঁওড় দেখেছিলাম। চারদিক জল থই থই। সেখানকার লোক বলতো—বন্যে বাঁওড়—

—কাশীতে এসে যখন কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড লিখছি—তখন তিনি এসে কয়েকদিন ছিলেন। আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। পিতৃতুল্য। মহাপণ্ডিত—আবার মহা রসিকও বটে। তাঁর সঙ্গে করা বললে চিন্তার প্রবল সংঘর্ষ হতো। সে সংঘর্ষে মনে হতো—যেন কোনো রসের স্বাদ পাচ্ছি। ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়—শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে মধুসূদন সরস্বতী লিখলেন—

অদ্বৈতসিদ্ধি। তা আমি ভক্তিমার্গের মানুষ। আমি অত গভীরে যাইনি। আমি তো শ্রীরামে।

বেণীমাধব অনেকক্ষণ উসখুস করছিলেন। এবার তিনি আর থাকতে পারলেন না। বলে উঠলেন, পণ্ডিত কিন্তু রসিক ছিলেন মধুসূদন। নয়তো সন্তজিকে নিয়ে একথা লিখতে পারেন ?—

আনন্দকাননে কাশ্যাং
চঙ্গম তুলসীতরু
কবিতা মঞ্জরী যস্য
রাম ভ্রমর ভূষিতা—

বেণীমাধবের দরাজ গলায় তুলসীদাসের গুহা গমগম করে উঠলো। কিন্তু কবিবর মাথা নিচু করলেন। আবদুর রহিম বুঝলেন, স্বাভাবিক সংকোচে তিনি লজ্জা পেয়েছেন। কেননা তাঁকে নিয়েই মধুসূদন সরস্বতী লিখেছেন।

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলতে পারলেন না। বাইরে কাছেই গঙ্গায় জল ভাঙার অবিরাম শব্দ। আবদুর রহিম চোখ তুলে দেখলেন, কবিবরের শরীর খুবই ভেঙে গেছে। তাঁর চেয়ে বেশ বড়ই হবেন তুলসীদাস। হিন্দুস্থানে গঙ্গার দুই তীরে যত কথকতা—যত গান—রামকথা—তার উৎস এই মানুষটি। এর দোহা, চৌপাঈ—মানুষের সুখদুঃখের জীবনে জড়িয়ে আছে। মহাকাব্যের মহামানুষ।

হঠাৎ আবদুর রহিম বলে বসলেন, হিন্দুস্থানের কথা কি কিছু ভাবছেন ?

—আমি কী ভাববো ? অশক্ত শরীর। দেশের দিন-কে-দিন যা হাল—তাতে চোখ বুজে আসে।

—চাল, ডাল, গেঁহু, বাজরা—সব আকাশ ছোঁয়া দর। এক মণ কড়াই কিনতে লাগে সাত দাম। আটা দশ দাম। সবচেয়ে নীরেস! তা একজন শাহী সেপাই খাবে কী ? মাস গেলে কয় তনখা মাইনে পায় সে ?

—আবদুর রহিম। সেপাই তো তবু মাইনে পায়। যে পায় না ? তার কী হবে ? চাষী, মুটে—তারা কী খাবে ?

—চাষীর কথা বলবেন না কবিবর। দালালরা তাদের ওপর দিনে ডাকাতি করছে। চব্বিশ টাকা মণ নীল কিনে সেই নীল ইংলিশস্তানের বেনিয়ানদের কাছে ছত্রিশ টাকায় বেচছে। মণকরা বারো টাকা নাফা। কেউ দেখার নেই— !

—ওসব ভেবে লাভ কী! আসল হিন্দুস্থানের সমাজের শরীরটা দেখুন। আওরতের কোনো জায়গাই নেই। কি হিন্দু—কি মুসলমান—দুই সমাজেই জেনানা যেন ফাটকে। যতদিন এ দশা না ঘুচবে—ততদিন দেশের মঙ্গল নেই রহিম।

আবদুর রহিম মনে করতে পারলেন না—মুসলমান সমাজে জেনানা কোথাও কি মরদের সমান—বা সঙ্গী। সারা হিন্দুস্থান যেন ঝুঁকে পড়েছে।

তুলসীদাস বললেন, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসার গ্রন্থখানি নেড়ে-চেড়ে দেখেছিলাম। বলছেন—তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে জেনানা মরদের সঙ্গে সমান

অধিকারী। ভার্যাহীন পুরুষ এক ডানার পাখি। এক চাকার রথ। এসব ভালো কথা। হয়ে থাকলে ভালো।

—কবিবর। শরীরটার দিকে নজর দিন এবার। হিন্দুস্থানের জন্যে আপনাকে আরও লিখতে হবে—গাইতে হবে।

জোরে হাসতে পারেন না তুলসীদাস আজকাল। হাসলে বুকে লাগে। স্থায়ী শ্লেষ্মা। বেণীমাধব দু'বেলা মধুর অনুপানে পানের রস ছেঁচে দেয়। মৃদু হেসে বললেন—

—না। আর নয় আবদুর রহিম। অনেক তো হলো। আমার কোনো খেদ নেই। কী দিয়েছি জানি না। পেয়েছি অনেক। এবার আমার মৌন হবার সময় এসেছে।

হাতি হিসেবে ফতে-জংয়ের বয়স বেশি নয়। তবে দারার দৌগুণী বয়স হবে। সুলতান মহম্মদ দারাশুকো হাঁটতে শিখেই এই ফতে-জংয়ের প্রেমে মাতোয়ারা। নাসিক থেকে রাওয়ালপিণ্ডি রওনা হবার সময় তার কথাতেই ফতে-জংয়ের গলঘণ্ট পালটানো হয়েছে। কানের পাশে দেওয়া হয়েছে তিব্বতি চামর।

এই লম্বা পথ পাড়ি দেওয়ার সময় নাসিকে বেলা ছিল কিছু লম্বা। এখন বেলা অনেক ছোট হয়ে এসেছে। ফতে-জংয়ের পিঠে গাদেল্লার কানাত ধরে দাঁড়ানো সুলতান আওরঙ্গজেব প্রায় অস্থির হয়ে বললো, আর তো পারা যায় না বড়েভাই। শুধু পাহাড় আর পাহাড়—রাওয়ালপিণ্ডি আর কতদূর ?

সুলতান দারাশুকো তখন ফতে-জংয়ের ভৈ আর মেঠের কাছ থেকে সামনের পাহাড়ের নাম জেনে নিচ্ছিল। আওরঙ্গজেবের কথা তার কানে ঢুকলো না।

—ওই পাহাড়টার নাম লণ্ডু। আর ওটা হলো গিয়ে সুগানা পাহাড়। এবার আমরা দুই পাহাড়ের ভেতর দিয়ে তিলপত্র পাহাড়ে গিয়ে উঠবো।

বড়েভাইয়ের এই জানার ইচ্ছে দেখে সুলতান আওরঙ্গজেব আরও চটে যাচ্ছিল। সে মনে মনে অনেকগুলো পাহাড়ের নাম আউড়ে গেল। পথে পড়েছে—সাতানা, সাতপুরা, শিবালিক। দূরে দেখা যায় পাহাড়ের মালা। ওটার নাম নাকি শিবালিক। রাওয়ালপিণ্ডি ছাড়িয়ে কান্দাহারের দিকে এগোতে পড়বে থল-চোটিয়াল পাহাড়। পাহাড় না বলে—বলা উচিত পাহাড়ের মালা। ফতে-জংয়ের ভৈ আজই সকালের দিকে বলছিল এসব কথা।

এখন দুপুর। পেছনের হাতিতে ধাই-মা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। দুপাশে —আগে পেছনে দু'থাক করে বাছাই ঘোড়সওয়ার। রিসালাদার দবির খাঁ জানালো, এসব জায়গা থেকেই গত পঞ্চাশ বছর ধরে অনেক পাথর গেছে আগ্রায়—কম পাথর তো লাগেনি আগ্রা দুর্গে ! এখনো লাগছে—

দারা শুনে অবাক হলো। এতদূর থেকে পাথর নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চারিদিক এত সুন্দর। পাহাড়ের গায়ে ঘন জঙ্গল। আকাশের মেঘ যেন সেই জঙ্গলের ওপর গা বুলিয়ে নিয়ে নিচে নামে। মাল পিঠে নিয়ে খচ্চরের দল

আগে আগে এগোচ্ছে। খচ্চরদের চোখে ঠুলি। পাছে খালি চোখে গভীর খাদ দেখে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। তাই।

দুনিয়ার শরীর এখানে পাথর। এত সুন্দর—বিশাল পাথরের শরীর। সেই শরীর খণ্ডে খণ্ডে কেটে নিয়ে যাওয়া কেন? কেটে নিয়ে গিয়ে কেন অমন বিরাট করে দুর্গ বানানো? নিজে তার ভেতরে নিরাপদে থাকবো বলে! রোদ, বৃষ্টি, ঠাণ্ডা, হামলা—কিছুই যাতে ছুঁতে না পারে! পাহাড়কে তো কেউ বাঁচায় না। সে তো একাই থাকে। পাহাড়কে কাটলে সে পাথর। না কাটলে সেই পাহাড়। ইনসানকে কাটলে সে কী?

আশমান ছোঁয়া উঁচু উঁচু চুড়োর আশপাশের জায়গা এখন নীলচে। বিকেলের সঙ্গে সঙ্গে হিম হয়ে আসবে বাতাস। তখন তাঁবুতে গিয়ে ঢোকা। হাতিদের গায়ে—ঘোড়াদের গায়ে গরম বনাত দিতে হয়েছে। দুই খুদে সুলতানের গায়ে লোমঅলা চামড়ার আঙরাখা। বাতাসের ভেতর—চোখে দেখা যায় না—হিমঠাণ্ডা ছুঁচ হয়ে চোখে মুখে বিঁধে যাচ্ছিল।

পাহাড়ের গা ধরে কোনোমতে এগিয়ে যাবার মতো এবড়ো খেবড়ো রাস্তা। ঘাড় তুলে ডান দিকে পাহাড় কত উঁচু দেখতে গিয়ে দারাশুকোর মাথা ঘুরে গেল। সে কোনোমতে গাদেলার কানাত ধরে চোখ বুজলো। নয়তো আওরঙ্গজেবের সামনেই গাদেলার ভেতর টাল খেয়ে পড়ে যেতো। বাঁ দিকে তাকাতে আরও ভয় হলো সুলতান দারার। গভীর খাদ। অনেক নিচে দাঁড়ানো জঙ্গলের গাছপালার ঝাপসা মাথা সেখানে। ঠাণ্ডা বাতাস সব কিছু ঝেঁটিয়ে ওই খাদে ফেলে দিতে চাইছে। নেহাৎ হাতি বলেই যেন তা হয়ে উঠছে না।

রিসালাদার দবির খাঁ বললেন, এবার আমরা বিতস্তার পাড়ে গিয়ে উঠবো।

—এসব পথ আপনার চেনা?

—বুড়ো রিসালাদারের চোখ দিয়ে যেন স্নেহ ঝরে পড়ছিল। তিনি খুদে সুলতান দারাশুকোর মুখে তাকিয়ে বললেন, হুজরত! তাজা জওয়ান বয়সে আকবর বাদশার পাহারায় ছিলাম। তখন যে কতবার আসতে হয়েছে এ-পথে। কাবুল প্রায়ই বিগড়ে যেতো। আকবর বাদশাও ছুটে ছুটে আসতেন এ-পথে। তিনি নিজেও ছিলেন জবরদস্ত ঘোড়সওয়ার—

—এই পথ কাবুলে গেছে?

—এটাই তো কাবুল যাওয়ার রাস্তা। বিতস্তা ডিঙিয়ে আমরা ওপারে চাকোথিতে গিয়ে উঠবো। সেখান থেকে রাওয়ালপিণ্ডি তো সামান্য রাস্তা। ওখান থেকে কাবুল যেতে পারেন। বাঁয়ে হেলে এগোলে হিরাটে গিয়ে উঠবেন।

সুলতান দারার জানার ইচ্ছে আর মেটে না। সে জানতে চাইলো, এ রাস্তা কি আকবর বাদশার বানানো?

হো হো করে হেসে উঠলেন দবির খাঁ। থেমে বললেন, না হুজরত। এ রাস্তা বানিয়েছেন বাদশাদের বাদশা—খোদাতালা! আমরা ইনসানরা শুধু এ-পথের এদিক ওদিক একটু আধটু ঘষে মেজে ঠিক রাখতে পারি!

এমন নির্জন ভয়ঙ্কর জায়গায় তো কেউ আসে না। ইনসান এ-পথের

হদিস পেল কোত্থেকে ?

অনেক দূরে নিচে দুই পাহাড়ের মাঝের রাস্তায় গাছপালার দিকে আঙুল দেখিয়ে দবির খাঁ বললেন, ওইসব ছোট ছোট পাহাড়ি গাঁয়ে ইনসান থাকে হজরত। ইউসুফজাই, বায়োজেদদের গাঁ। ওরা সব দারুণ ঘোড়সওয়ার। শাহী ফৌজে ভর্তি করা হয় ওদের।

—ওরাই আমাদের এ-পথ চিনিয়ে এনেছে ?

—না সুলতান। এ-পথ দিয়ে—খোদা জানেন কতদিন—রেশম, চুনী, মুক্তো, কস্তুরীর ব্যাপারিরা যাতায়াত করে। তাছাড়া—

সুলতান দারা রিসালাদার দবির খাঁয়ের মুখে তাকালো। বিকেল পড়ে আসবে খানিক বাদেই। বিকেল মানেই—আরও হিম—ঘন অন্ধকার। তারপর তো সারা রাতের বন্দীদশা তাঁবুতে! এখন পাহাড়ি পথের ডানদিকের কাঁটালতা, ঝোপে ঝোপে পাহাড়ি প্রজাপতির ওড়াউড়ি। রাত হলে এই বিশাল অন্ধকারে প্রজাপতিরা যে কোথায় যায় ? না, আশ্রয় পায় ? বা, মরেই যায় ?—তা ভেবেই পায় না দারাশুকো। এসব মনে করে করে তার ভেতরটা টনটন করে ওঠে। এই বিরাট দুনিয়া কী সুন্দর। কী নিষ্ঠুর। এক মধুর ব্যথায় তার বুক ভারি হয়ে আসে।

তাছাড়া এসব রাস্তা দিয়েই তো বাবর বাদশা এসেছেন। এসেছে—ঘোরি, লোদিরা।—বলতে বলতে দবির খাঁ দারাশুকোর মুখে তাকালেন। ভারি সুকুমার মুখশ্রী। এই দুমাসের টানা পথ চলতিতে একটুও বিরক্তি বা বায়না নেই বালক সুলতানের। তার ওপর খুবই মন দিয়ে সব শোনে দারাশুকো।

—এখানে হাওয়া কিছু কম। তাই না ?

—হজরত ঠিকই ধরেছেন। উঁচুতে উঠলে হাওয়া কমে যায়। আপনার কাঁচা উমরে কষ্ট হবে না। কিন্তু আমাদের—

ঘোড়া চলছিল দুলকি চালে। হাতি এগোচ্ছে আয়েসি ঢং-এ। পাহাড়ের গায়ে হাতির গলঘণ্ট, ঘোড়ার ঘুঙুরের শব্দ আছড়ে আছড়ে পড়ছিল। তার ভেতর সুলতান আওরঙ্গজেব ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, আজ রাতের খানা কী ?

রিসালাদার দবির খাঁ বললেন, দুম্বার টাটকা গোস্তের কাবাব, ফুল ময়দার পেস্তা রুটি, কাবুলি পিচ আর খোবানি।

চেঁচিয়ে উঠলো সুলতান আওরঙ্গজেব। বলেছি না রোজ রোজ দুম্বার কাবাব আর খেতে পারছি না। অসহ্য ! একঘেয়ে—

—হজরত কী করবো বলুন ? বর্বরী ছাগল—দাগমুণ্ডী ভেড়া যে ক'টা সঙ্গে আনা হয়েছিল—সব ফুরিয়ে গেছে। আর একটা দিন সময় দিন। বিতস্তার ওপারে চাকোথি পৌঁছেই আপনি হুনজা ভেড়ার গরম গরম মালখোবা পাবেন—

—আঃ! থামুন বলছি। এখুনি আবদারখানায় খবর দিন। আজ যেন দুম্বা না কাটে—।

বয়স্ক রিসালাদার দবির খাঁ একদম চুপ করে গেলেন। আওরঙ্গজেবের

চওড়া গলায় পেছনের হাতিতে ধাই-মায়ের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি এতক্ষণ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আগ্রা দুর্গের আঙুরিবাগের স্বপ্ন দেখছিলেন। আচমকা জেগে উঠেই দেখেন—দু'পাশে পাহাড়—সিধে উঠে গেছে আকাশে। চারদিক কেমন ছায়া ছায়া। বরফনীল আশমান। সবই অচেনা। যেন আরেক স্বপ্নে ঢুকে পড়েছেন তিনি।

সুলতান আওরঙ্গজেব পেছন ফিরে ধাই মায়ের মুখ দেখতে পেল। পেয়েই চেঁচিয়ে উঠলো, দুধ আছে—?

ধমকানিতে চমকে উঠলেন ধাই-মা। আস্তে বললেন, সকালে তো উটের দুধ যোগাড় হয়েছে খানিকটা—

সুলতান মহম্মদ দারাশুকো সবই দেখছিল। সবই শুনছিল। ধমক খাওয়া ধাই-মায়ের মুখখানা দেখে তারু খুব মায়া হলো। ফতে-জং থেমে নেই। ঘোড়ারাও একই চালে চলেছে। ঠিক এমন সময় পাথরের ঢাল ছুঁয়ে অনেক নিচে ঝকঝকে বিতস্তার জল চোখের সামনে ফুটে উঠলো। সেই সঙ্গে অবিরাম জল ভাঙার শব্দে সবার কান ভরে গেল।

আগে আগে আগাম একদল মুটে এসে তাঁবুর উদুঁ গেড়ে ফেলেছে। তাদের খচ্চরগুলোর মুখে মুখে এখন খাবার দেওয়া হবে। সবার সঙ্গে দারাও এসে বিতস্তার তীরে দাঁড়ালো। ওপারেই চাকোথি।

বহু নিচে ছবির মতোই বিতস্তা যেন আঁকা। রিসালাদার দাবির খাঁ বললেন, চাকোথি থেকে একটা রাস্তা রাওয়ালপিণ্ডি—অন্যটা মুরি। আর হজরত যদি স্রেফ উত্তরে যান তো পথে পড়বে—গিলগিট, হুনজা, স্কার্দু। হুনজার ভেড়ার গোস্ত মাখনের মতো। বে-খেয়াল হলেই কাবাব পুড়ে ছাই হয়ে যায় পলকে!

এসব কোনো কথাই সুলতান মহম্মদ দারাশুকোর কানে যাচ্ছিল না। সে মন দিয়ে অনেক নিচের বিতস্তাকে দেখছিল।

সুলতান আওরঙ্গজেব জানতে চাইলো, কাল ভোরে আমরা এ নদী পেরোবো কী করে?

—খানিক এগিয়ে শাহী ফৌজের চৌকি রয়েছে। সেখানে আগে ভাগে খবর করে সব ব্যবস্থা রাখা আছে হজরত। কোনো চিন্তা নেই। কোনো অসুবিধা নেই।

আওরঙ্গজেব একলাফে মাটিতে নামলো। নেমে কোনোদিকে না তাকিয়ে সিধে তাঁবুর ভেতর চলে গেল।

॥ একুশ ॥

আরে! এ তো গায় না। দ্যাখো বিবি—এ সিরিফ নাচে—! শুধু নাচে!—বলতে বলতে বিলাসখান বেশ বিরক্ত হয়েই তানপুরা নামিয়ে রাখেন।

বিবি মানে বাতের ব্যথায় কাবু এক আওরত। চারপাইয়ে বসা। বয়স হয়েছে। রাজা-কি-মাণ্ডিতে গানের গলা—পায়ের কাজের জন্যে একসময় খুব

নামডাক ছিল। তখন গওহর বাই বলতে বোঝাতো বেনারসি ঠুংরির চুটকিলা, আগ্রা-মথুরার কথকের পায়ের কাজ আর রূপ। এখন বিলাসখান ডাকেন বিবি। গওহর। কিংবা গওহর বিবি। গলির কাবাবওয়ালা বলে—গওহর বুড়ি।

মেঝেতে বনাতের ওপর ঘাগরা পরা বছর তিন চারের একটি মেয়ের এসব কথায় আদৌ কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সে দিব্যি নেচে চলেছে। আপন মনে। চোখের কাজ—পায়ের কাজ—হাতের ভাও শিশু তার মন মতো ঠিক করে ঠিক তালে মিলিয়ে দিচ্ছিল। পায়ের তালে।

গওহর বাই বললেন, ফিরে ধরুন তো মিঞা। দেখি বেটি গায় কিনা—এই বলে মেয়েটিকে ডাকলেন, এই রানাদিল—গাইবি না? তোর নানাসাহেব তো গেয়ে গেয়ে গলা ফাটিয়ে ফেললো!

তাতেও রানাদিল থামলো না। যেমন নাচছিল—তেমনি নাচতে লাগলো। গওহর বাই হাতে তাল দিচ্ছিলেন। পঞ্চম সওয়ারি—

ধিন তেরেকেটে থিনা কৎ
ধি ধি না ধি ধিনা তিনা তিনা
তেরে কেটে কিড়্নাক কত্তা
ধিধি নাধি ধিনা

মুখে মুখেও তাল বলছিলেন গওহর। আর মনে মনে শুনছিলেন—১-২/৩-৪/৫-৬/১-২-৩/৪-৫-৬। দশদরার খেদ।

গুনতে গুনতে গওহর বাই বলে উঠলেন, এই রানাদিল! কার গানের সঙ্গে নাচছিলি জানিস? মিঞা তানসেনের ব্যাটা বিলাসখানের গান কি তোর নাচের সঙ্গত? তুই কত বড় নাচিয়েরে! দেমাক দ্যাখো মেয়ের—

এবারে নাচ থামিয়ে রানাদিল অবাক হয়ে তাকালো। সিধে বিলাসখানের কোলে গিয়ে ধপ করে বসে পড়লো। নানাজান—তানসেন কে?

অবুঝ শিশুর মুখে তাকালেন বিলাসখান। কার মেয়ের কোথায় ঠিকানা আজ! মুখে বলে উঠলেন, ইয়া আল্লা! তেরি রেজা!

রানাদিল ফের জানতে চাইলো, তানসেন কে নানাজান?

—আমার আব্বা হুজুর। মশহুর গাইয়ে ছিলেন—। নাও এবার ধরো। আমি গাইছি। তুমি গলা মেলাবে। নানিজান হাতে তাল রাখবেন তোমার জন্যে—

বলতে বলতে বিলাসখান ফের হিন্দোলে গলা ছাড়লেন। একেবারে শুরুতে স্থায়ী—

খেলত ফাগ উমঙ্গ যব ব্রিজসুন্দর
ভোর মিল আয়ে-এ-এ

রানাদিল তার নানাজানের কোল ছেড়ে উঠলো না। গাইলো না গলা মিলিয়ে। তাল মিলিয়ে নাচলোও না। যেমন বসে ছিল—তেমনিই বসে থাকলো। সে তার নানাজনের গানের দোলায় যেন ভেসে যাচ্ছিল। বাইরে

আগ্রার রাস্তায় এই শীতের সকালে গাড়ি-ঘোড়া লোক-লশকরের কোনো বিরাম নেই। জানলার ফাঁকে আশমানের যেটুকু চোখে পড়ে—তাতে বোঝাই যায়—আজ আগ্রায় এখনো কুয়াশা কাটেনি।

অন্তরায় এসে বিলাসখানের গলা যেন আরও খেলতে লাগলো—

কোই করলিয়ে গুলাল কেশর
রংগ গাগর ভর ভর লাচয়ে—এ-এ

বিলাসখান শুনছিলেন—আর মনে মনে ভাবছিলেন গওহর বাই—এই তো সেদিন মেয়েটাকে কোলে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলেন বিলাসখান। এরই ভেতর কেমন সুন্দর হয়ে উঠেছে রানাদিল। আর কিছুকাল বাদে সবাই ওকে রানাদিল বানু বলে ডাকবে। ততদিন কি আমি থাকবো? থাকবেন বিলাসখান? কী হবে মেয়েটার তখন? ওর জন্যে তো আমাদের এখনো বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকা দরকার।

তখন বিলাসখানের গলায় ফিরে এসেছে—

খেলত ফাগ উমঙ্গ যব ব্রিজসুন্দর······

খট করে ব্রিজসুন্দর কথাটা মাথায় লাগলো গওহর বাইয়ের। তিনি আচমকাই বলে বসলেন, হিন্দোল গাইবেন তো আরও কত গান আছে মিঞা। এ গানটা ছাড়ুন।

খুব অবাক হয়ে তাকালেন বিলাসখান। আচমকাই তিনি থেমে গেছেন। জানতে চাইলেন, কেন? কী হলো গওহর?

—এই ব্রিজসুন্দর, ফাগ, গাগর, গুলাল—এসব কি এখন ভালো চোখে দেখা হয়? না, গাইতে বসে কেউ গায় আর?

—কী বলছো গওহর বিবি! এসব গান কতকালের তা জানো তুমি? নায়েক গোপাল, নায়েক বখসু—নায়েক ধন্ধু—ওঁরাও এসব গান গাইতেন।—আমি তো কোন্ ছার—! আব্বা হুজুর মিঞা তানসেন পয়দা হবার বহু আগে থেকে এসব গান গাওয়া হয়।

—গানের দোষ দিয়েছি আমি? সময়টা তো এখন কেমন তা জানেন মিঞা—ব্রিজসুন্দর টুন্দর না হয় কিছুকাল নাই-ই গাইলেন।

—গাইবো না কেন? কেন গাইবো না গওহর?

—শেখ আহম্মদ সিরহিন্দি মুজাদ্দিদের দল সব ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে। ওসব গান এখন আর ভালো চোখে দেখা হয় না মিঞা। আকবর বাদশার সেকাল তো আর নেই।

বিলাসখানেরও বয়স বসে নেই। রানাদিল কিছুই বুঝতে পারছিল না। তাকে আলতো করে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বিলাসখান গলির ওপর জানলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে বললেন, আকবর বাদশার আমল তো হিন্দুস্থানে চিরকালই ছিল গওহর। দিল্লির সুলতান কায়কোবাদের দরবারে এ গান একদিন শুনেছেন আমির খসরু। শুনে মুগ্ধ হয়েছেন খসরুর মতো ইনসান—যিনি একদিন বলেছিলেন—

অবধ শাম
সুবে বানারস—

—সবই বুঝলাম মিঞা। কিন্তু আপনি তো জানেন আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলাভিরা কতখানি কট্টর। ওরা মথুরায় কত্থকে হোরি নাচে নাক গলিয়েছে। কোন্‌দিন আপনার গানে না ফতোয়া দিয়ে বসে—আর এই মেয়েটাও বলিহারি!—বলতে বলতে রানাদিলের মুখে তাকান গওহর বাই। হ্যাঁরে, তোকে গাইতে বললে নাচিস কেন রে!

রানাদিল ছুটে এসে গওহরের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নানিজান—

ঠেলে, মিথ্যে রাগ দেখিয়ে গওহর তাকে সরিয়ে দেন। না, আমি তোর নানি নই।

দূরে সরে গিয়েও ফের পায়ের মল বাজিয়ে রানাদিল কাছে ছুটে আসে গওহরের। তুমি তাহলে কে আমার?

—কেউ নই।—বলে কী খেয়াল হতে বিলাসখানকে গওহর বাই বলে বসেন, আসলে আপনিই চান না ও গান শেখে—

—কেন?

—আপনিই তবে বারবার ওকে হারালো কি ছিঁড়লো—তবু পায়ের মল কিনে দেন কেন?

হো হো করে হেসে উঠলেন বিলাসখান। অমন লাল টুকটুকে পায়ে মল বাজিয়ে ফেরে—আমি না দেখে পারিনে গওহর। তুমিও তোমার নতুন বয়সে অমন ঝমঝম করে পা দাপিয়ে ঘুরতে।

—আর আপনি তখন দেখতেন!—বলেই গওহর ফের রাগের মিথ্যে মিথ্যে ভাব করে রানাদিলকে বলেন, আমরা তোমার কেউ নই!

নিরুপায় রানাদিল ঘরের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে পড়লো। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে—সে সত্যি সত্যিই বুঝতে পেরেছে—এই দুনিয়ায় তার কেউ নেই। সে অস্ফুটে বললো, আমি কে তাহলে?

—তুমি হিঁদু। হিঁদুর ঘরের মেয়ে। কনৌজ কি কাশীর কোনো চিত্‌পাবন বামুনের মেয়ে!

—সত্যি? —অবিশ্বাসের হাসি রানাদিলের ঠোঁটে। সব হারানোর দুঃখ দুই ফোঁটা জল হয় চোখে। তোমরা কী?

—আমরা মুসলমান। আগ্রার মুসলমান। তোমার বামুন আব্বাজান হয়তো কাশীর কোনো ছত্তরে মুফতে দুটি খেতে পেতো! আর চালাতে না পেরে তোমায় আমাদের কাছে ফেলে দিয়ে গেছে!

—সত্যি নানাজান? —রানাদিলের বুকের ভেতর থেকে কান্না উঠে এলেও এত কষ্ট হতো না বিলাসখানের। তিনি দু'হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, ডাহা মিথ্যা! ডাহা মিথ্যা দিদি—

রানাদিল ছুটে এসে সেই দুই হাতের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লো। রানাদিলের গলায় মালার সঙ্গে লটকানো তাবিজটা বিলাসখানের বুকে শক্ত মতো ঠেকলো।

তিনি জানেন, কবচে কী লেখা আছে। রানাদিল বড় হয়ে পড়তে শিখলে এক-দিন জানতে চাইবে, নানাজান, লছমি কে ? কার নাম ? বিলাসখান মনে মনে ঠিক করলেন, তার আগেই একদিন কবচটা সরিয়ে রাখলে চলবে। এখন তো থাকুক।

রানাদিলকে বুকে জাপটে ধরা বিলাসখানকে পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছিলেন গওহর। মিঞা তানসেনের বড় আওলাদ। গুণী মানুষের গুণী আওলাদ। ঘর-গেরস্থি থাকা সত্ত্বেও জওয়ানিতে পা দিয়েই এখানে আসা ধরেছিলেন বিলাসখান। মানুষটার মাথায় তখনকার সেই ঝুলনিয়া বাবরিতে এখন রুপোলি রঙ ধরেছে। গান শুনতে—গান গাইবার জন্যেই বিলাসখানের এখানে আসার শুরুয়াত। ওই পড়ে পাওয়া মেয়েটা আসা ইস্তক বিলাসখানের ঘর-গেরস্থি যেন এই রাজা-কি-মাণ্ডিতেই উঠে এসেছে।

—দরবারে যাবেন না মিঞা ?

বিলাসখান কোনো জবাব দিলেন না। মন-কাড়া মেয়েটা তার নিজের বানানো নাচের মুদ্রা দেখিয়ে তখন মানুষটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

—দরবারটা অভ্যেসে রাখবেন মিঞাসাহেব। দরবারে গেলে পাঁচজনের সঙ্গে দেখা হয়। পাঁচটা জিনিস শেখা হয়। পাঁচটা কেয়াবত শুনে গাইবার ইচ্ছে জাগে—

—বাদশাই এখানে নেই তো দরবারে যাবো কী ?

—নেই ? তো জাহাঙ্গীর বাদশা কোথায় ?

—রাওয়ালপিণ্ডিতেই কাটাবেন এ শীতটা—

—বাদশা নেই—কিন্তু আগ্রা আছে—এ তো ভাবাই যায় না। বিলাসখানের চেয়ে কিছু বড়ই হবেন গওহর বাই। কবে কোন্ সেই সেকালে নথ্-উতারনার পর নিদেন প্রায় বালিকা বয়সেই শয়তানপুরায় এক কোঠাঘরে এসে উঠতে হয়েছিল গওহরকে। সেসব দিন এখন ঝাপসা লাগে। তারপর একসময় এই বিলাসখানই তাঁকে লাগোয়া রাজা-কি-মাণ্ডির এ বাসাবাড়িতে এনে তুলেছিলেন। তারপর গানে, রেওয়াজে, নাচে, ঘর-গেরস্থিতে জওয়ানির দিনগুলো কবেই ফুরফুর করে উড়ে গেল। এ-গলি দিয়ে গওহর শাহী ফৌজকে কুচ করে গোয়ালিয়রের দিকে যেতে দেখেছেন। এই আগ্রাতেই গওহর দেখেছেন —দুটি দাম খসালে চাই কি সাতটা চালকুমড়ো কেনা যেতো। চালকুমড়োর মিঠাই বানাতেন তিনি একসময়। এখন বাজার যেন আগুন। এখন দুই দামে তিনটি চালকুমড়োও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। তবু আগ্রার মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে কোনো পসরা কিন্তু পড়ে থাকে না। যা-কিছু এনে বসো না কেন—ঠিক কেটে যাবে। লোকের হাতে দাম-দামড়িও হয়েছে অনেক। শুধু আমাদের মতো ইনসানেরই সবচেয়ে বিপদ। দুটো দাম কমাতে পারলে তবে খাওয়া। সামান্য খোলা জানলা দিয়ে আগ্রার আকাশের যেটুকু দেখতে পেলেন গওহর বাই—তা যেন তাঁর নিজেরই বুড়োপার মতোই মেঘে ঢাকা—ধোঁয়াটে।

ওদিকে খুব ভোর ভোর পাহাড়ি উজানে বিতস্তা পার হলেন রিসালাদার

দবির খাঁ। দারা আর আওরঙ্গজেবের মতো দু'দুজন খুদে সুলতানকে নিয়ে নাসিক থেকে এতটা পথ পাড়ি দেওয়া কম কথা নয়। বিতস্তার এপারে উঠে চাকোথির পাহাড়ি রাস্তা পার হতে ওদের বেশি সময় লাগলো না।

চকচকে পরিষ্কার রোদে ফতে-জং-এর পিঠে বসা দারাশুকো দেখতে পেল—ডান হাতি রাস্তাটা দূরে দুই পাহাড়ের ভেতর হারিয়ে গেছে। ওদিকে গেলে হুনজা পার হয়ে স্কার্দু যাওয়া যায়। বাঁ হাতের পথটা উঁচু ডাঙা জায়গা বেয়ে নিচে মুড়ির দিকে নেমেছে। ওরই গায়ে রাওয়ালপিণ্ডি দুর্গ।

সে-পথ ধরে নামতে নামতে দারাশুকো একবার স্কার্দু যাবার রাস্তার দিকে তাকালো। রাস্তা কোথায়! উঁচু উঁচু পাহাড়ের গা। সেখানে কিছু ঝুলন্ত ধোঁয়া দেখা যায় মাত্র। ওখানেও নাকি হিন্দুস্থানের ফৌজি চৌকি আছে। তাতো পাহারা থাকে। শাহী চালানো কী কঠিন। তার লম্বা হতে বনজঙ্গল পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে কত কত দূরে চলে যায়।

পেছনে ফেলে আসা বিতস্তারই উজানী ধারার জল পাহাড়ি নালায় আগাম ধরে রেখে রাওয়ালপিণ্ডি দুর্গকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখা হয়েছে। এসব কথা দারাশুকো অনেক আগেই জানে। নাসিকে আব্বা হুজুর তাকে দফে দফে রাওয়ালপিণ্ডির কথা এমন করেই বলেছেন—এখন যা-কিছু সে দেখতে পাচ্ছে—সবটাই যেন তার আগে-দেখা বলে মনে হচ্ছে।

চল্লিশ দামে হয় এক টাকা। সেরকম নয় টাকায় এক মোহর। তা প্রায় দু'লক্ষ টাকার হীরে মুক্ত তো আনা হয়েছেই। গিরনা নদীর তীরে ধরা একটা বড় বেজি আর সাতপুরার জঙ্গলের এক শিঙা একটা হরিণ। দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশা নানান কিসমের জানোয়ার রাখতে—পুষতেও ভালোবাসেন।

ঠাণ্ডা বাতাসের উড়ে যাবার দশা। মাথায় সূর্য। দারা আর আওরঙ্গজেব দুর্গের ভেতর ঢুকলো। পায়ের নিচে লম্বা পাথুরে চত্বর আর শেষ হয় না। ডান হাতে অনেক যত্নে বসানো চিনার গাছের রোগা রোগা ডালে শীতের পাহাড়ি বুলবুলির কিচির মিচির।

দারা আর আওরঙ্গজেব এগোচ্ছিল। ওদের আগে আগে সবচেয়ে সামনে দুই পাহারার হাতে এক শিঙা হরিণটা এগিয়ে চলেছে। তার পেছনেই তুরতুর করে চলেছে বেজিটা। তার পেছন পেছন ময়ূর জোড়া। এর পরেই দারা আর আওরঙ্গজেব। তাঁদের হাতে রুপোর থালায় চোখ ধাঁধানো কয়েকটি হীরে। খোরাসান আর বাদকশানের কিছু চুনী। সেই সঙ্গে কয়েকটি মুক্তো মেশানো।

বাদশা জাহাঙ্গীর বসে ছিলেন দরবারি চত্বরে। অনেকদূর থেকে কুর্নিশ করলো দুই খুদে সুলতান। তারপর চোখ তুলে তাকালো দারা। দেখে মনে হলো—এ-বাদশা যেন সে-বাদশা নন। বুড়োপা যেন আচমকাই ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে দাদাসাহেবের ওপর।

প্রথমে দারা—তারপর আওরঙ্গজেব পরপর দাদাসাহেবের কদমবুসি করলো। বাদশা জহাঙ্গীর আর বসে থাকতে পারলেন না। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাতে দুই সুলতানের মাথা বুকের কাছে টেনে নিলেন। তারপর কিছুটা

ঝুঁকে ওদের মাথার গন্ধ শুঁকলেন যেন। তাই মনে হলো দূরে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা দাখিলা, কাসীদদের।

তখন মীর সামান লোকজন নিয়ে বাদশার নজর থেকে পেশকশের হরিণ, বেজি, ময়ূর সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

দাদাসাহেবকে দারা আগেও দেখেছে। সে-দেখা সে ভোলেনি। এখনো সে ছবি তার স্পষ্ট মনে আছে। এক ফকিরের কথায় জাহাঙ্গীর বাদশার মুখখানা এক ঝলকে কেমন নিভু নিভু হয়ে উঠেছিল। এছাড়াও আগ্রা দুর্গে থাকার সময় দূর থেকে দাদাসাহেবকে দেখেছে কয়েকবার। এই মানুষটি আমাদেরই মতো ইনসান। আমাদেরই মতো দু'খানা হাত—দু'খানা পা। দাদাসাহেব আব্বা হুজুরের মতো লম্বাও নয়। অথচ এই মানুষের এত তাগদ? এত ফৌজ? হাতি ঘোড়া কামান? ইনসান কী করে বাদশা হয়? বাদশা হবার পরেও কি সে আর ইনসান থাকে? দারার রীতিমত সন্দেহ—বাদশা হাসলে সে হাসি নিশ্চয় আমাদের মতো নয়। সে হাসি এতই বড়—তা নিশ্চয় দু'পাশের কান পেরিয়ে মাথার পেছন দিকেও চলে যায়। তেমনি বাদশা রাগলে তাঁর চোখ লাল হতে হতে লাল হয়—শেষে তা রঙ পালটে নীল হয়ে যায়। বাদশা যে।

দাদাসাহেবের বুকের কাছে আওরঙ্গজেবের মাথা। সে বাদশার গা থেকে আতরের সুবাস পেল নাকে। এভাবে কোনোদিন তার বাদশা দেখা হয়নি। এই মানুষটিকে নিয়েই সারা হিন্দুস্থানে এত শোরগোল। আগ্রা কি রাওয়ালপিণ্ডি —যেখানেই থাকুন—তাঁর বসবার জায়গাটি কী সুন্দর। এর নাম মসনদ! মনে মনে সাবাসি দিলো আওরঙ্গজেব। এখানে থাকতে—যখন আশপাশে কেউ থাকবে না—একবার সে বসে দেখবে ওখানে।

হঠাৎ আওরঙ্গজেব চমকে উঠলো। উঁচু মসনদের পেছনে দাঁড়িয়ে তারই মতো একটি ছেলে। কিছু বড়ই হবে। ভারি সুন্দর দেখতে। চোখে চোখ পড়তে ছেলেটি হাসলো। তার গায়ের কাম্বাদার টুকটুকে লাল।

আওরঙ্গজেবও হাসলো।

ছেলেটি বললো, তুমি আওরঙ্গজেব? নিশ্চয় আওরঙ্গজেব।

—কী করে বুঝলে? আমায় তো খুব একটা দ্যাখোনি—

—তুমি সবচেয়ে সফেদ। দাদাসাহেব বলেছিলেন। ভাইদের মধ্যে তোমার গায়ের রং সবচেয়ে চড়া। চোখ কালো—। —বলতে বলতে ছেলেটি নিজেই বললো, আমি সুজা। সুলতান সুজাঙ্গীর।

—আগেই বুঝেছি। দাদাসাহেব খুব ভালোবাসেন তোমায়—?

—এই তো সবে এলে। দেখো—তোমাদেরও বাসবেন।

বাদশার পেছনে দাঁড়িয়ে—কিংবা পাশ থেকে কথা বলা ভীষণ বেতমিজি। কিন্তু সুলতান সুজাঙ্গীর কোনো তমিজেরই ধারে না। সে এ ক'বছর হিন্দুস্থানের বাদশার মসনদের আশপাশেই খেলাধুলো করতে করতে বড় হয়ে উঠছে। কখনো খোদ বাদশা—কখনো বা বাদশার পায়ের নাগরা কিংবা তাঁর গলার দামি মালা সুলতান সুজাঙ্গীরের খেলার জিনিস হয়ে উঠেছে।

সুজা বললো, ওটা বড়ে ভাই ? খুব লম্বা হয়ে গেছে তো এই ক'বছরে—

আওরঙগজেব কোনো কথা বললো না। চোখ নামিয়ে নিয়ে বুঝিয়ে দিলো, হ্যাঁ। ঠিকই বলেছো।

বাদশা জাহাঙগীর তখন সুলতান মহম্মদ দারাশুকোর সঙেগ কথা বলছিলেন। খুব জোরেও নয়। খুব আস্তেও নয়। কথাগুলো অনেকটা এইরকম—

—তোমার আব্বা হুজুর কিছু বলেছেন ?

দারা বললো, আলা হজরত। তিনি তাঁর হাজারো সেলাম দিতে বলেছেন আপনাকে। আব্বা হুজুরের একমাত্র মুনাসিব—হিন্দুস্থানের বাদশা সহি-সলামত থাকুন।

আর থাকতে পারলেন না জাহাঙগীর। অনেকক্ষণ তিনি বাদশার মুখোশটার ভেতর থেকে কথা বলছিলেন। কথা সাজাচ্ছিলেন। এবার তিনি সেই মুখোশ কেটে শুধু জাহাঙগীর হয়ে উঠতে থাকলেন। যেমন—

—খুর্‌রম নিজে কেমন আছে ? বাবা-খুর্‌রম ?

দারা এবার দাদাসাহেবের চোখে তাকাতে পারলো না। ভয় হলো তার। এবার বোধহয় বাদশার চোখ ফুটো হয়ে জল গড়াবে।

—কতদিন দেখি না খুর্‌রমকে—

মসনদ থেকে খানিক দূরে কোনো মূর্তির মতোই চোখের পলক না ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রিসালাদার দবির খাঁ। তিনি কোনোদিন এত কাছ থেকে বাদশাকে দেখেননি। ধাই মা এই মাত্র ছাদ ছোঁয়া গোল স্তম্ভের আড়ালে চলে গেলেন। দারা অনেক কষ্টে হিন্দুস্থানের সবচেয়ে বড় তাগদদার মানুষটির কান্নায় বুজে আসা চোখ মুখের দিকে তাকালো। বাদশার চোখে কি জল ? তার নিজের চোখে তো জল এসে গেল বলে।

—সে ভালো আছে তো ?

—আলা হজরত। আপনি একজন আব্বা হুজুর। আপনি তাঁকে ডেকে আনেন না কেন ?

—ডেকেছি দারা। ডেকেছি। সে আসে না। শুধু তার চিঠি আসে। চিঠি নিয়ে কাসীদ আসে। তার পেশকশ আসে। সে পেশকশ তোমরা নিয়ে আসো—

দারাশুকোর ভয় করছিল। তবু সে সাহস করে তার ছোট হাতখানি দিয়ে বাদশা জাহাঙগীরের অসহায় ভাবে ঝুলে পড়া বাঁ হাতখানির কবজি আলতো করে ধরলো। সে জানে না—সেকেন্দার কী ভাবে তাঁর আব্বা হুজুরের হাত ধরতেন। আদৌ কি কোনোদিন ধরেছিলেন ?

খানিক বাদেই দেখা গেল—থলচোটিয়াল, তিলপত্র—আরও নানান পাহাড়ের মালা চুড়ো জাগিয়ে পরিষ্কার রোদে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ছাই আর বাদামি রঙের গা বুঝি বা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়া কোনো অতিকায় ইয়াবু

ঘোড়ার পিঠ। ওদের সাক্ষী রেখে বাদশা জাহাঙ্গীর দস্তরখানায় বসেছেন। তাঁকে ঘিরে বসেছে তিন কচি সুলতান—দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব। দুর্গের আবদারখানা থেকে সুগন্ধে বাতাস চারানো নানা রকমের খাবার এনে সাজিয়ে দিচ্ছিল। এখানে সুখাদ্য বলতে হিমালয় থেকে উড়ে আসা পাখি। ওপারের আরও কঠিন শীতের দেশের পাখি।

আওরঙ্গজেব খেতে খেতে সুজাকে দেখছিল। বাদশার সামনে কেমন সহজ। অথচ সে নিজে সুজার আপন ছোট ভাই হয়েও বাদশার এত কাছাকাছি হওয়ায় খেতে খুব একটা স্বস্তি পাচ্ছিল না। তার মন বলছিল—কোনো একজনকে কোনো একজন আলাদা করে বেশি বেশি ভালোবাসে কেন? ছেলেদের কাছে আব্বা হুজুর তো বটগাছ। সবদিকে সমান ভাবে ছায়া দেবে। কিন্তু আমাদের আব্বা হুজুর তো বড়েভাইকে দেখলে নরম হয়ে পড়েন। সবার দিকে তো তিনি এমনটি হন না। ভালোবাসায় এমন হয় কেন? সুজাই বা দাদা-সাহেবের চোখে আর সবার চেয়ে আলাদা কেন? মানুষের ঘৃণাও কি এমন বেহিসেবিভাবে বিলি হয়? ভালোবাসায় ভাগীদার হয়। ঘৃণাতেও কি ভাগীদার থাকে? এরকম এলোমেলোভাবেই সুলতান আওরঙ্গজেব তার মাথার ভেতর কথাগুলো সাজাবার চেষ্টা করছিল। পুরোটা পারছিল না। কেননা, তার যা বয়স তাতে এভাবে সবটা কচি মগজে সিজিল মিছিল করে দাঁড় করানো যায় না। সে সুরুয়ার ভেতর থেকে বড় এক টুকরো মাংস খুঁজে বের করলো। করে তার আনন্দ হলো। এই শীতে গরম সুরুয়ার ভেতর সুসিদ্ধ মাংসের সন্ধান—যে কোনো অভিযানের মতোই—যাতে কিনা শেষমেশ কিছু পাওয়া যায়।

বাদশা জাহাঙ্গীর খুব একটা কিছু খাচ্ছিলেন না। বিশেষ করে দারা আর আওরঙ্গজেবের খিদে পাওয়ারই কথা। ভোর ভোর বিতস্তা পেরিয়ে ওরা এতটা এসেছে। ওদের দিকে কয়েকটা পাকা বাবাসেতি ফল এগিয়ে দিলেন বাদশা জাহাঙ্গীর। তাঁর মনে হলো, আমি তো একদিন চোখ বুজবো। হিন্দুস্থান পড়ে থাকবে। গাছপালার বয়স বাড়বে। ওরাও একদিন বড় হবে। সেদিন ওদের ভেতর কে মসনদে বসবে? কে তখনকার হিন্দুস্থানের বাদশা হবে? দারা? আওরঙ্গজেব? না, সুজা?

দারা চোখ তুলে দেখছিল চারদিক। দাদাসাহেবের এগিয়ে দেওয়া বাবাসেতিটা হাতে নিলো। নিতে নিতে দাদাসাহেবের মুখে তাকালো। হিন্দুস্থানের বাদশার মুখ এত নরম? অথচ ফৌজে, কামানে তাঁর যে শাহী ফুটে ওঠে তা কত কঠিন মনে হয়। যেন জাহাঙ্গীর শাহীর ভেতরে কোনো দিল নেই। আছে শুধু শায়েস্তা করার তাগদ। দোষ করলে শাস্তি দেবার হুকুম। অথচ দাদাসাহেবের এই মুখখানায় ক্ষমা আছে। মায়া আছে। দয়া আছে। লালচে কপালে কয়েকটি ভাঁজ। ভ্রুতে একটি দুটি রুপোলি রেখা। তারপরই এমন দুই ভাসা চোখ যার দিকে তাকিয়ে কোনো তল খুঁজে পায় না দারা।

হালকা চালে বাদশা জানতে চাইলেন, সুলতান মুরাদ কেমন আছেন ?

দারাশুকো দাদাসাহেবের মেজাজ বুঝে সেই চালেই বললো, ভালোই আছেন সুলতান মুরাদ ! তিনি কিছুদিন হলো হাঁটতে শিখেছেন।

—তোমরা জানো—আমারও এক ভাইয়ের নাম ছিল মুরাদ। অনেকদিন হলো সে আর নেই।

দারাশুকো হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সহবত মোতাবেক ঝুঁকে কুর্নিশ করলো বাদশাকে।—আলমপনা ! আমরা সুলতানরা চার ভাই—আপনার শাহজাদারাও চার ভাই !

বাদশা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। হ্যাঁ। ঠিকই বলেছো। শাহজাদারা চার ভাই-ই ছিল। এখন আর নেই—

এসব কথায় সুজার কোনো মন নেই। সে খুবই স্বচ্ছন্দে পসিন্দা কাবাবের একটা বড় টুকরো মুখে দিতে দিতে দেখলো, উপহার আনা সেই বেজিটা কখন ছাড়া পেয়ে দস্তরখানার কিনারায় এসে ঘুরঘুর করছে।

দূরে দাঁড়িয়ে থাকা দাখিলারা তা দেখে উসখুস করে উঠলো। কিন্তু ইশারা না পেলে তো তারা কাছে যেতে পারে না। সুলতান সুজাংগীর এক লাফে বেজিটাকে ধরতে ছুটলো। পেছন পেছন সুলতান আওরংগজেবও।

দারা অবাক হয়ে দেখলো—বাদশা জাহাংগীর যে দস্তরখানায় বসে—সেখানে কোনোরকম আড়ষ্ট না থেকেই দুই ভাই কেমন সহজভাবে একটা আধা-পোষ-মানানো বেজির পেছনে ছুটে যেতে পারে। সে ভয়ে ভয়ে বাদশার মুখে তাকালো। সেই চোখে।

সেখানে সুজা বা আওরংগজেবের ওই ছোটাছুটির কোনো দাগই পড়েনি। বাদশা যেন সোজাসুজি দূরে তিলপত্র পাহাড়ের চুড়োর দিকে তাকিয়ে আছেন। আবার এও মনে হলো দারার—আলা হজরত এখানে তো নেই-ই—ওখানেও নেই। আসলে তিনি চোখ খোলা রেখেও নিজের একেবারে ভেতরে ডুব দিতে পারেন। এরকম না হলে কি হিন্দুস্থানের বাদশা হওয়া যায়।

বেজির পেছনে ছুটতে ছুটতে সুজা এসে দরবারি চত্বরে হাজির হলো। সংগে আওরংগজেবও। বেজিটা ঠিক মসনদের নিচে সেঁধিয়ে পড়ায় সুজা ভারি মসনদ সরিয়ে দেখতে গেল।

তা দেখে আওরংগজেব রীতিমত ভয় পেল। কী হচ্ছে ভাইয়া—

সুজা তখনো মসনদ সরিয়ে তার নিচেটা দেখবার চেষ্টায় ব্যস্ত। আওরঙ্গজেব বেশ আতংকেই বললো, হচ্ছে কী ?

সুজা মসনদ একটুও নাড়াতে না পেরে আওরংগজেবের মুখে তাকালো। তাকিয়ে ছোট ভাইয়ের ভয় পাওয়া মুখ দেখে অবাক হলো। সে বেশ সহজ-ভাবেই জানতে চাইলো, না সরালে বেজিটাকে ধরবো কী করে ?

সুলতান আওরংগজেব বেশ দূর থেকেই আঙুল দিয়ে মসনদ দেখালো। দেখিয়ে বললো, বেজি ধরবে ঠিক আছে—কিন্তু তাই বলে— ?

অস্থির সুলতান সুজাংগীর কিছু বুঝতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলো—যা

বলার খুলে বলো ছোটে ভাই। নইলে বুঝবো কী করে?

—ওটা হিন্দুস্থানের বাদশার মসনদ ভাইয়া—

হেসে ফেললো সুজাঙ্গীর। তার চেয়ে বলো—ওটা হিন্দুস্থানের বাদশার বসবার জায়গা। এমন বসবার জায়গা সারা হিন্দুস্থানে অনেক ছড়িয়ে আছে। আগ্রা দুর্গে আছে। লাহোর দুর্গেও আছে। —একথা বলে সুজা সোজা হয়ে দাঁড়ালো। শাহী ব্যাপার স্যাপার—রীত রিসালায় অনেক দিন ধরে সড়গড়—এমন সহজ ভঙ্গিতে বললো, ছোটেভাই! বসবার জায়গা তখনই মসনদ হয়ে ওঠে—যখন ওখানে বসে হুকুমের মতো হুকুম দিতে পারেন বাদশা—তাগদের মতো তাগদ দেখাতে পারেন বাদশা। আসলে হুকুমের মতো হুকুম দিয়ে—তাগদের মতো তাগদ দেখিয়েই তো একজন ইনসান বাদশা হয়ে ওঠে। তাই না?

সঙ্গে সঙ্গে কিছুই বলে উঠতে পারলো না আওরঙ্গজেব। তার মুখে একথার পিঠে কথা জোগালো না। তার মনে পড়লো—সেই কবে থেকে সে আব্বা হুজুরের সঙ্গে বনে বনে—পথে-ঘাটে হাতির গাদেলায় শুয়ে বসে মাঠ ভাঙছে। শুধুই পিছু হটছে আব্বা হুজুরের সঙ্গে সঙ্গে। যদিও রিসালাদার দাবির খাঁ, মীর আতশ জুম্মন শেখ কথা বলার সময় তার নামের আগে সুলতান দিয়ে শুরু করেন—তবুও সে তো শাহী ব্যাপার স্যাপারে বড়েভাই সুলতান সুজাঙ্গীরের মতো সড়গড় নয়। বড়েভাই সেই কবে থেকে হিন্দুস্থানের বাদশার সঙ্গে ওঠে বসে—খায় দায়—। আর সে! পয়দায়িসেয় পর থেকে শাহী শান-সওকতের কতটুকুই বা দেখেছে! না, জেনেছে! দাদাসাহেবের ফৌজের তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেড়ানো ছাড়া আর কী-ই দেখার সুযোগ হয়েছে তার?

আওরঙ্গজেবের মুখ দেখে সুলতান সুজাঙ্গীরের যেন দয়া হলো। সে হেসে বললো, এসো ছোটে ভাই। এসো। এই আমি বসে দেখছি—বলে বাদশার মসনদে বসে পড়লো সুজা। বসেই উঠে দাঁড়ালো। এসো। তুমিও বসে দ্যাখো না একবার—আমার তো তেমন কিছুই লাগলো না!

আওরঙ্গজেব যেমন দূরে দাঁড়িয়েছিল—তেমনই থাকলো। এগিয়ে এসে বসলো না।

তখন সুজাঙ্গীর ফের মসনদে বসে পড়লো। বসে বললো, শুধু তো বসে দেখা! দ্যাখোই না ছোটে ভাই—কেমন লাগে!

দরবার চত্বরে বাইরের আলো এসে পড়েছে। তাতে আওরঙ্গজেবের মুখ বুক পরিষ্কার দেখা যায়। পায়ের জায়গাটা অন্ধকারে। সে প্রায় মৃগী রোগীর মতোই চেঁচিয়ে উঠলো—না। কিছুতেই না—

বলতে বলতে আওরঙ্গজেব দরবারি চত্বর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। পেছন পেছন সুজাও ছুটলো। ছোটে ভাই—

না ছুটে উপায় নেই সুজার। ছোটে ভাই তো এই দুর্গের অন্ধিসন্ধি—গলি, কুচোগলি—ঢাকাপথ—কিছুই চেনে না—জানে না। ছুটতে ছুটতে

কোথায় যে ঢুকে পড়বে! শেষে না হারিয়ে যায়। এতদিন পরে দু'দুটো ভাই পেয়ে সুজার বুকে আনন্দ ধরছিল না। ভাই পাওয়ার আলাদা একটা সুখ আছে। সে পাথুরে চত্বরের ওপর দিয়ে দোগুণী কদমে ছুটতে লাগলো। সারা রাওয়ালপিণ্ডি দুর্গ তার এখন আগাগোড়া চেনা।

বেলা একটু পড়তেই দেখা গেল—দুর্গের গায়ে বিতস্তার জলের নালার ওপর তক্তা পোল ফেলা হচ্ছে কপিকল ঘুরিয়ে। তারপরই গলঘণ্ট বাজিয়ে নূর-ই-ফিল বেরিয়ে এলো দুর্গের ভেতর থেকে। হাতির দু'পাশে বর্শা হাতে পায়দল চলেছে ভৈ আর মেঠ। হাতির পিঠে গাদেলার ভেতর দাঁড়িয়ে আছেন বাদশা জাহাঙ্গীর। তাঁকে ঘিরে গাদেলার কানাত ধরে দাঁড়ানো তিন সুলতান—দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব।

এখানে রোদ ঝকঝকে। শীত যেন খুব ছুঁচলো আর কঠিন। পাথুরে ঘরে রাখা আগেনগারের আগুন খুব তেজী। আর খাবার জল বেশ মিঠাজ। দুর্গে পা দিয়ে ইস্তক এসব নজরে এসেছে দারাশুকোর।

দূরের পাহাড়ের চুড়োগুলোর দিকে তাকিয়ে বাদশা বললেন, আমরা হুনজার রাস্তায় যাবো। গোলার চাঁদমারি হবে—

—তাহলে তো কানের দফা রফা হবে দাদাসাহেব!

জাহাঙ্গীর এবার সুজাঙ্গীরের মুখখানা দেখলেন। সামান্য হাসলেন। কিছু বললেন না।

দারা আর আওরঙ্গজেব গত দু'বছরের ওপর গোলাগুলির আওয়াজ শুনে শুনে কান পচিয়ে ফেলেছে। কিন্তু চাঁদমারি? নিশানা? এসব কোনোদিন দেখেনি। দারা রীতিমত অধীর বোধ করতে লাগলো। চাঁদমারি? না জানি সেটা কী জিনিস।

রাওয়ালপিণ্ডি দুর্গ থেকে বেরিয়ে হুনজা ঢালের দিকে পড়ে। নূর-ই-ফিল উঁচু নিচু পাহাড়ি ঢাল পেরোচ্ছিল যেন গড়িয়ে গড়িয়ে। এই তিন সুলতান হাতির পিঠে গাদেলার ভেতর চড়াই ভাঙবার সময় ঢলে ঢলে পড়ে। আবার উতরাই কাটিয়ে উঠতে গিয়ে সামনের দিকে বেদম ঝুঁকে পড়ে।

এমন এক জায়গায় এসে নূর-ই-ফিল থামলো—যার সামনে বিশাল ধোঁয়াটে গড়খাই—যা কিনা দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। যে দিগন্ত আবার পাহাড়ের পর পাহাড় দিয়ে তৈরি।

হাতি থেকে নেমেই দারা, আওরঙ্গজেব ওরা দেখলো—আগে ভাগে সব তৈরি করে রাখা আছে। পরপর তিনটে তোপ। তাদের মুখ হুনজার দিকবার পাহাড়ি জঙ্গলের দিকে। পালিশ কাঠের তক্তার ওপর সারি সারি গোলা।

বাদশা জাহাঙ্গীর গিয়ে দাঁড়াতেই ভারি সুন্দর দেখতে অন্যরকম চেহারার একজন মানুষ তিনবার ঝুঁকে কুর্নিশ করলো। তার পেছনে দাঁড়ানো সাত আটজন ফৌজি গোলাবারি ও বাদশাকে একই সঙ্গে কুর্নিশ করেই ভাগে ভাগে এক এক তোপে গিয়ে বসলো।

বাদশা বললেন, এলোপাথাড়ি গোলা ফেললে চলবে না মানুচ্চি—

মানুচ্চি সহবত মতো হেসে বললো, মুলুকে মালিক। আপনি নিশানা দেগে দিন। আমরা শুধু সেখানেই গোলা দাগবো।

সুলতান দারাশুকো এই নামটি অনেকবার নিজের কানে শুনেছে। শাহী তোপখানার মীর আতশ। এদেশি নয় বোঝাই যায়। আব্বা হুজুর কয়েকবার এই নামটা বলেছেন। হাঁটু অবধি চামড়ার জুতোয় পায়ের পটি ঢাকা পড়েছে। কোমরে কুর্তার ওপর লাল ফিতের বাঁধন। হাত ঢাকা ঢোলা জামার বুকের কাছটায় অনেকটা জুড়ে ঘাঘরা। পাহাড়ি বাতাসে বাদামি মুখের ওপর ঢেউ তোলা সোনালি চুল এসে এসে পড়ছিল। ইংলিশস্তানের লোক নয়। সে একবার আগ্রা দুর্গ থেকে ইংলিশস্তানের ইলচি টমাস সাহেবকে বেরোতে দেখেছে। তাদের গায়ের রঙ কেমন লালচে সাদা। তার ওপর এখানে সেখানে কালচে কালচে ফুটকি।

চারপাশের দুনিয়া শান্ত, ঠাণ্ডা। পাহাড়ের চড়াই-উতরাই ভেঙে এখানে সেখানে ভেড়ার পাল। তাদের পেছন পেছন রাখাল। ডানদিকে স্কাদুর ঢালে গোটা পাঁচেক দুম্বা চরে বেড়াচ্ছে। আর সামনেই পাহাড়ের পর পাহাড়। তাদের গা বেড়ে দাঁড়ানো কতকালের সব গাছ। গাছের মাথায় ধোঁয়া ধোঁয়া।

দাদাসাহেব বাদশা জাহাঙ্গীর এই ছবি আঁকা দুনিয়ার ভেতর সত্যিই যেন সব কিছুর মালিক। তাই তো মনে হলো সুলতান দারাশুকোর। এই পাহাড় —ওই গভীর গড়খাই, আসমান ছুঁয়ে দাঁড়ানো সব প্রাচীন প্রাচীন গাছ, তার ভেতর দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ বয়ে যাওয়া বিতস্তার রুপোলি ধারা—আর সবশেষে বিকেল হয়ে আসা নরম আলোয় শান্ত, ঘুমন্ত এই বিশাল চড়াই-উতরাই—সব কিছুই যেন দাদাসাহেবের আঙুলের ইশারায় এইমাত্র জেগে উঠলো। মুখে একটা চাপা হাসি—চোখ খোলা, অথচ কাউকেই যেন দেখছেন না, মাথার উষ্ণীষের পালক বাতাসে কাঁপছে—পেছনে দাঁড়ানো নুর-ই-ফিল বিশাল কোনো মূর্তি হয়ে চুপ করে আছে। ওঃ! আমাদের দাদাসাহেব এত সুন্দর! হায় খোদা! এমন সুন্দর ইনসানের সঙ্গে আব্বা হুজুর লড়াই করেন কেন?

বাদশা জাহাঙ্গীর তখন জানতে চাইলেন, তোপগুলোকে একদিন কান্দাহারের পথে জ্বলে উঠতে হবে মানুচ্চি—

—আমি জানি আলা হজরত। মীর বকসি আমায় বলেছেন।

দারাশুকো দেখলো, বাদশা জাহাঙ্গীরের চোখে যেন এইমাত্র ঝিলিক দিলো। তিনি মিহি বাতাসের ভেতর একবার যেন দাঁতে দাঁত ঘষলেন। তারপর বললেন, আব্বা হুজুর আকবর বাদশার আমলে একবার কান্দাহার দুর্গ হিন্দুস্থানের হাতে এসেছিল। সে অনেকদিন আগে—

মানুচ্চি চুপ করে তাকিয়ে আছেন। সুজা—আওরঙ্গজেব—দুজনই তাদের দাদাসাহেবের মুখে তাকিয়ে একদম চুপ করে আছে।

—হিরাট আমাদের। হেলমন্দ আমাদের। বলক্-বাদকশানের রাস্তায় হিন্দুস্থানের চৌকি। কিন্তু কান্দাহার দুর্গ—হিন্দুস্থানে পা রাখার দরজায়

কান্দাহার দুর্গ আমাদের হাতে নেই মানুচ্চি।

—ইস্পাহানের সফবি শাহ তাঁর ফৌজ বসিয়ে রেখেছেন সেখানে।

—ওখানে দুর্গের পাথুরে দেওয়াল ধসিয়ে দিতে চাই আমি। আমি চাই—দুর্গের দেওয়াল আমাদের তোপ দেগে গোলায় গোলায় খান খান করে দিতে। গোলার মুখে ওরা ছিন্ন ভিন্ন হলে হিন্দুস্থানের ফৌজ নদীর জলের মতো গলগল করে ঢুকে পড়বে। কান্দাহার দুর্গে চাঘতাই পতাকা ওড়াতে চাই মানুচ্চি—

সুলতান দারাশুকো দেখলো—দাদাসাহেব কয়েক লহমায় কেমন যেন পালটে গেছেন। উষ্ণীষের বাইরে কয়েকটি কাঁচাপাকা চুল। এই ঠাণ্ডা বাতাসেও অমন সুন্দর কপালে যেন পসিনা বিন্দু বিন্দু হয়ে ফুটে উঠেছে।

—তাই হবে বান্দাগান। নিশানায় আপনি আপনার তোপখানাকে কিছু কম পাবেন না—

—বেশ। দেখি এবার—ওই দু'টো পাহাড়ের মাঝখানে—দূরে নিচে ওই ধোঁয়াটে মতো ঝাঁকড়া গাছটার মাথাটা উড়িয়ে দাও তো—তবে বুঝবো তোমার নিশানা কতখানি—

সঙ্গে সঙ্গে মীর আতশ মানুচ্চি চেঁচিয়ে উঠলেন। বিষণ—এই বিষণ—

দারাশুকো দেখলো, ফৌজি গোলাবরদারদের ভেতর থেকে তাজা জোয়ান মতো একজন বেরিয়ে এসে আলগা হয়ে দাঁড়ালো। নাকের নিচে কচি গোঁফ। সরু কোমরের ওপর চওড়া বুক যেন বা গেঁথে তুলেছেন খোদা। পাহাড়ের বুকে দাঁড়ানো ওই গাছগুলোর মতোই বুঝি বা দীঘল। মাথা ভর্তি থোকা থোকা কালো চুল।

দাঁড়িয়েই বিষণ বাদশার দিকে তাকিয়ে সামান্য ঝুঁকে ফের সিধে হয়ে দাঁড়ালো।

মানুচ্চি ফৌজি হুকুমের গলায় চেঁচিয়ে উঠলো। গিনতি লাগাও—

অমনি বিষণ তোপ তিনটের দিকে পলকে ঘুরে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়েই চেঁচিয়ে উঠলো—

সঙ্গে সঙ্গে গোলাবরদাররা এক এক জন—এক এক রকম কাজ শুরু করে দিলো।

বিষণ নামে সেই তরতাজা ইনসান চেঁচিয়ে বলে যাচ্ছিল—

ইয়েক—

দো—

সে—

আর বাকি সেপাইদের কেউ বাচ্চা কোলে নেওয়ার মতো থাক থেকে গোলা তুলে নিয়ে নলের গোড়ায় বসিয়ে দিলো। একজন গোলার ফুটোয় তেল ঢাললো কয়েক ফোঁটা। আরেকজন পলতের ডগায় আগুন ধরালো। অন্যজন সেই পলতে তোপের ভেতর গুঁজে দিলো।

বিষণ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গিনতি করে চলেইছে। যে-ই সে 'দহ' বলে

থামলো—অমনি সারা পাহাড় কাঁপিয়ে চূড়ায় চূড়ায় যেন বিরাট একখানা মেঘ ভেঙে পড়লো।

তিন সুলতানই একসঙ্গে কেঁপে উঠলো। গত দু'সনের ওপর দারা আর আওরঙ্গজেব গোলাগুলির শব্দ অনেক শুনেছে। তবে দূর থেকে। এমন সামনে দাঁড়িয়ে গোলার কান ফাটানো আওয়াজ তাদের শুনতে হয়নি।

দূরে চরে ফেরা ঘরমুখো দুম্বা আর ভেড়ার দল সে আওয়াজে রীতিমত চমকে উঠলো। দারা দেখতে পাচ্ছিল—ওরা চড়াই বেয়ে এলোপাথাড়ি দৌড়তে শুরু করেছে। চরানি রাখালরা সামাল দিতে পারছে না।

মানুচ্চির মুখে তৃপ্তির হাসি। ওই দেখুন আলমপনা—

দারা, আওরঙ্গজেব, সুজা—সবাই দেখতে পেল—দাদাসাহেবের দেগে দেওয়া দূরের সেই ঝাঁকড়া গাছটার মাথা অনেকটাই সাফ হয়ে সেখানটায় তিলপত্র পাহাড়ের বাদামি গা হা'হা করছে।

দাদাসাহেব বাদশা জাহাঙ্গীরের মুখে কী এক আনন্দ জ্বল জ্বল করে উঠলো। সে আনন্দ চলকে পড়ে দাদাসাহেবের রাঙানো দাড়িকে আরও চকচকে করে তুলেছে। সুলতান দারাশুকোর মনে হলো—এমন শান্ত সুন্দর বিকেলে কী ভয়ঙ্কর কান্ড! অত বড় গাছটার মুন্ডুটাই উড়ে গেল।।

খুব সুখী সুখী চোখে বাদশা জানতে চাইলেন, এখান থেকে গোলার পাল্লা কতটা হবে?

—হুজরত। তা আধা মঞ্জেল তো বটেই—

—পাল্লা বাড়াও। পাল্লা বাড়াও—বলতে বলতে দাদাসাহেব নূর-ই-ফিলকে হাঁটু গেড়ে বসতে ইশারা করলেন। তিনি এবার ফিরবেন।

সন্ধে নামলো যেন বাঘ এলো। এক লাফে। একদম ঝুপ করে। সঙ্গে শীত। একেবারে হাড়ে গিয়ে কামড় দেয়। বিশাল আগেনগার থেকে কাঠের আগুন হাত খানেক ওপরে উঠে নাচছিল। তাতে পাথরের এই বিশাল ঘর আলোয় আলো। সেই সঙ্গে বাইরের শীত এখান থেকে পালাবার পথ পায়নি।

বাদশাকে ঘিরে বসে দারা, আওরঙ্গজেব, সুজা। এত কাছ থেকে দারা বা আওরঙ্গজেব কোনোদিন দাদাসাহেবকে দেখেনি। দারা—বিশেষ করে—যতই দাদাসাহেবকে দেখছে ততই সে কোনো তল পাচ্ছিল না।

এই খানিক আগে যে বাদশার চাঁদমারি নিশানার যাচাইয়ে পাহাড়ের গায়ে আস্ত একটা গাছের মুন্ডু উড়ে যায়—তোপের গোলায়—সেই বাদশাই খুব সাবধানে আলগোছে বেজিটাকে কোলে নিয়েছেন। পাছে মেঝেতে পাতা গালিচার বনাত থেকে পশম উঠে বেজির পায়ের নখে জড়িয়ে যায়। বাদশা বললেন, পশম একবার পায়ের নখে জড়ালে ও তো হাঁটতেই পারবে না। হুমড়ি খেয়েও পড়তে পারে—

এই বলে তিন সুলতানের দাদাসাহেব তাঁর সামনে রাখা একটা চীনা বড় রেকাবি থেকে একটা ছোট মাছ তুললেন।

দারা দেখলো, বাদশার লালচে আঙুলের ভেতর চকচকে সাদা মাছটা খাবি

খাচ্ছে। তাই দেখে বেজির লালচে বিন্দু বিন্দু দুই চোখ যেন জ্বলে উঠলো। সে খপ করে মাছটা মুখে নিয়েই জিভ এপাশ ওপাশ করে কপকপিয়ে খেতে লাগলো।

তাই দেখে বাদশা জাহাঙ্গীরের চোখে জল এসে গেল। আহারে! বড্ডো খিদে পেয়েছিল তো!

ওকথা বলতে বলতে বাদশা জাহাঙ্গীর চীনা রেকাবিটা বেজির মুখের কাছে এনে ধরলেন। বেজির মুখে পড়ে মাছগুলো উপুড়-চিৎ লাফাচ্ছে। আগেনগারের নাচিয়ে আগুনের শিখায় সে এক অদ্ভুত ছবি। দারা বুঝে উঠতে পারলো না—কাকে এখন বাঁচানো দরকার? বেজিটাকে? না, মাছগুলোকে? ওদের বোধহয় আজই ধরা হয়েছে বিতস্তার নালা থেকে।

মাছগুলোর বাঁচার চেষ্টা—আর বেজিকে তা খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে দাদাসাহেবের চেষ্টা, যত্নআত্তি, স্নেহমমতায় সুজা মুগ্ধ। মুগ্ধ আওরঙ্গজেব। দুই সুলতান প্রায় ঝুঁকে পড়লো তাদের দাদাসাহেবকে ঘিরে। দাদাসাহেবের চোখ চীনা রেকাবিতে।

সুলতান দারাশুকো এই ফাঁকে একা একা উঠে দাঁড়ালো। বিরাট খোলা জানলায় এসে সে দেখতে পেল—অন্ধকার বিশাল আকাশ কোটি কোটি কুচি তারার ভারে পাহাড়গুলোর মাথায় ভেঙে পড়েছে। কাল ভোরে আলো ফুটলে পাহাড়তলি থেকে যত ইচ্ছে তারা কুড়িয়ে আনা যায়। দারার মনে হলো—ওই অন্ধকার আশমান থেকে সবসময় কে যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। একথা মনে হতেই সে বুঝলো, তার সারা বুক এক অজানা ব্যথায় ভার হয়ে আসছে। অজান্তে তখন তার চোখে জল এসে দাঁড়ালো। তার আজকাল মনে হয়—ওই বিরাট ফাঁকা আশমানের কোথাও বিশাল একখানি মসনদে দুনিয়ার তাবৎ বাদশাদের বাদশা বসে আছেন। বসে বসে তিনি সবসময় আমার ওপর নজর রাখছেন। সুলতান দারাশুকো ঘরের ভেতর চোখ ফিরিয়ে দেখতে পেল—মাছের রেকাবির ওপর দাদাসাহেব আরও ঝুঁকে পড়েছেন। সেই সঙ্গে দু'জন সুলতানও। তাদের হাসির হররা, কথাবার্তা—একটার সঙ্গে আরেকটা মিশে যাচ্ছে। দারাশুকো তার গায়ের কাম্বাদারের গলাটা শক্ত করে এঁটে নিলো। শীত এখানে হাড়ে গিয়ে আঁচড় কাটে। সে বুঝেই উঠতে পারে না—যে বাদশা বেজির জন্যে কাঁদেন—সেই বাদশাই এক গোলায় একটা বড় গাছ খুন করেও সেদিকে একবার তাকান না। আমার আব্বা হুজুরও তো এই দাদাসাহেবের কোনো নিন্দেমন্দ করেন না কোনোদিন। তাহলে বাগী হন কেন আব্বা হুজুর? কেন? ভাবতে ভাবতে একাই দারাশুকো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে ফেলে। তারপর নিজের মনে মনেই বলে ওঠে—ওঃ! বুঝেছি। মসনদ—তুমিই কারণ! তুমিই কারণ মসনদ! তোমাকে ঘিরেই যে তাগদ। হুকুমত। শান-সওকত।

সময়ের রোজ বয়স বাড়ে। কিন্তু চেহারা পালটায় না। সেই আলো—সেই

একই ছায়া—এইসব দিয়েই তো সময়। অথচ ভেতরে ভেতরে ইনসানের ক্ষয় চলতেই থাকে। বয়স তাকে খায়। খায় বড় বড় লোভ। খোয়াব। কঠিনের ঘাড় মুচড়ে তাকে দুরন্ত শায়েস্তা করতে গিয়ে আমরা প্রাণের মধুটুকু খুইয়ে বসি।

এইসব ভাবতে ভাবতেই শাহজাদা খুর্‌রম আরজুমন্দ বানুকে দেখছিলেন। গুলালবার তাঁবুর হাতায় একজোড়া বিরাট শিশুগাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে। তাদের নাবি ডালে ঝোলানো সুখদোলায় জাহানারা রৌশনআরার মাঝখানে বসে মুরাদ—হাততালি দেবার চেষ্টা করছিল। খুর্‌রম বুঝলেন, হাতে তালি বাজানো ও এখনো শেখেনি। শেখার চেষ্টায় আছে। মুরাদ সবে তিনে পা দিয়েছে।

ওই চেষ্টা দেখে মুরাদের দুই পাশে দুই দিদি হেসে কুটিপাটি। আরজুমন্দ বানুর পিঠ, মাথার চুল নিয়ে বাতাসের ওড়াউড়ি শাহজাদা পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছিলেন। বেগম তাঁর ছেলেমেয়েদের দোল দিচ্ছেন দূরে দাঁড়িয়ে—শাহজাদার দিকে পেছন ফিরে।

আরজুমন্দ যেন সময়ের মতো। তাঁর চেহারা যেন আলোর মতোই। ছায়ার মতোই। একটুও পালটায়নি। গালের পাশ যেটুকু দেখতে পাচ্ছিলেন খুর্‌রম —তা তাঁর আগের মতোই লালি লালি লাগলো। উড়ে ওঠা চুল দেখলে এখনো শাহজাদার ভেতর আগের মতোই ঢেউ ওঠে। অথচ আরজুমন্দের বয়স তো বসে নেই।

শিশুগাছ দু'টোর ওপাশে জাহানারার ইয়াবু ঘোড়াটা মুখ তুলে তাকিয়ে। তার সামনে কাঁচা গমের শীষ উঁচু হয়ে পড়েই আছে। এরও অনেক পেছনে—দূরে সাতানা পাহাড়ের গা এই সাত সকালে মেঘের ছায়া পড়ে গম্ভীর মিশকালো দেখাচ্ছে।

শাহজাদা খুর্‌রম উঠে দাঁড়ালেন। পাশ দিয়ে যাবার সময় আরজুমন্দ বানু তাঁকে থামালেন। পরিষ্কার গলায় অভিযোগ আর নিষেধ মিশিয়ে একই সঙ্গে বললেন, আমরা সবাই আছি। এখন কোথায় যাবেন?

একসঙ্গে অনেক কথা মনে আসছিল শাহজাদার। যেমন—তুমি এত সুন্দরী কেন? তোমার কোনো তল পাই না কেন? অথচ তুমি তো বাইরে থেকে দেখতে দিব্যি সরল সহজ সিধে। আমি একাই কেন ক্ষয় হই? তুমি সময়ের মতো একই জায়গায় একই রকম থাকতে পারো। আমিই শুধু পিছলে পড়ে যাচ্ছি কেবলই।

মুখে খুর্‌রমের বেরিয়ে এলো একদম অন্য কথা। ফিল-ই-জংয়ের বেমারির কোনো ইলাজ হয়নি। হাতিকে তো হাতির মতোই রাখতে হবে। তাই যাচ্ছি—

—কোথায়?

—হাতি ইলাজে এক বৈদ্য এসেছে—

॥ বাইশ ॥

আগ্রা থেকে দিল্লি যাবার শাহী সড়কের দু'পাশে আকবর বাদশার আমলেই বড় বড় ছায়া ধরা গাছের চারা বসানো হয়েছিল। আসলে মুখে কোথাও স্বীকার না করলেও আকবর বাদশা শের শাহর ভালো ভালো কাজ নিজেও করতে ভালোবাসতেন। যেমন এই গাছ বসানো। দীঘি কাটানো। সুদূর বর্ধমানে পীর বহরামের মাজারের কাছেও তিনি দীঘি কাটান। তা বাদশার বসানো সেসব গাছ এখন রাস্তার দু'ধারে ছায়া দেয়। এখন এই হিন্দুস্থানি বর্ষায় সকাল সন্ধ্যায় সেসব গাছতলায় মেঘ-রৌদ্রের আলোছায়ার খেলায় ময়ূর এসে পেখম মেলে দাঁড়ায়। তাদের পায়ের নখে পথের লাল ধুলো ওড়ে। বর্ষা নেমে তা আবার মাটিতেই মিশিয়ে দেয়।

এই বর্ষা। এই শুকনো। তার ভেতর রাজধানী আগ্রার চবুতরায় বসে মীনাক্ষী তার ভিজে মালতী, সেঁউতি গুচ্ছের একটা হিল্লে করে ফেললো। বিয়ে-শাদি, ফুর্তির বেলায় ফুলের একদর। আবার গোরস্থানে জানাজার বেলায় ফুলের আরেক দর। এক জানাজায় কিছু কমা দামে সব ফুল ছেড়ে দিয়ে মীনাক্ষী সফির জন্যে বসে রইলো।

তার চোখের সামনে দিয়ে জলের মতো বয়ে যাচ্ছিল সারা আগ্রা। কত রকমের মানুষ। কত রকমের মুখ। তাদের মাথায় হরেক কিসিমের পাগড়ি, টুপি। কারও বা ন্যাড়া মাথায় শুধুই একটি টিকি। চবুতরার উল্টোদিকে গোকুলদাসের হালোয়াই মিঠাইতে এই রাতের বেলাতেও নীল ডুমো মাছির ভন ভন।

অন্যদিন সফি চলে আসে। আজ কী হলো? দেখা নেই। অথচ রাত বাড়ছে। এরপর ফিরতে বেশ কষ্ট হবে। পথ চলতি সব মুখই দেখে মীনাক্ষী। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। এর ভেতর যদি বিষ্ণু থাকতো। যদি লক্ষ্মীকে ফিরে পেতাম। ওরা এতদিনে বেশ বড়টি হয়েছে। দেখলে কি ওদের চিনতে পারবো? এসব কি ভুল ভাবছি। এতদিনে ওরা গোলাম বাঁদি হয়ে কোন্ মাণ্ডিতে বিক্রি হয়ে গেছে। বিষ্ণু হয়তো পাথরের খাদে পাথর ভাঙছে। লক্ষ্মী কোন্ হাভেলিতে ফাই-ফরমাশ খেটে খেটে শেষ হওয়ার যোগাড়। হয়তো বেঁচেই নেই।

সেই মানুষটাই বা কোথায় উবে গেল? সনাতনের চেহারা এখন ঝাপসা হয়ে এসেছে মীনাক্ষীর মনে। এক এক সময় মনে হয়—মাথার পাগড়ির ঢালের সঙ্গে তাল রেখে মানুষটার নাকের নিচের গোঁফও দু'পাশে ঢেউ তুলে পাকানো ছিল? না, গোঁফের দু'দিক নেতিয়ে দু'পাশে ঝুলে পড়তো? শুধু এই সামান্য ব্যাপারটাই সে ঠিক ঠিক মনে করতে পারে না ইদানীং। ধুমধুমার গড়, ঘরদুয়ারি পাইকান গাঁ-বসতি—সবই এখন আবছা হয়ে এসেছে মীনাক্ষীর মনে।

মানুষজন ভর্তি মাণ্ডির ভেতর হঠাৎ একটি বালহস্তী ক্ষেপে উঠলো।

যাচ্ছিল তার মা বিশাল এক শেরগির মাদি হাতির পাশে পাশে। বেশ ধীর চালে। বাচ্চা হাতিটির বয়স বড়জোর সাত আট। কোনো তুর্কি সেপাইয়ের পোষা উজবেক কুকুর জ্বালাতন করে থাকতে পারে। কিংবা পায়ের নিচে হয়তো বেখাপ্পা কোনো পাথর পড়েছে।

বালহস্তীটি হঠাৎ-ই শুঁড় তুলে সামনের ডান পা দিয়ে গোকুলদাসের মিঠাইয়ের জন্যে দাঁড়ানো খদ্দেরদের পেছন থেকে থেঁতলে দিতে গেল। ভরা বাজার জুড়ে হুড়োহুড়ি। মহা উঁচু শেরগির মাদি মা হাতিটি তখনো টের পায়নি—তার বাচ্চা বিগড়ে বসে আছে। কেননা—পিঠে হাওদা ভর্তি মানুষজন—মাথায় মাহুত বসিয়ে লম্বা পায়ে সে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। ছানার সঙ্গে মাও যদি খেপে ওঠে তো কেলেঙ্কারি।

বালহস্তীটি ঘুরে গিয়ে আচমকাই চবুতরার দিকে ছুটে এলো। সিধে একদম মীনাক্ষীর মুখোমুখি। তার উঠে দাঁড়াবারও সময় নেই। উপায়ও ছিল না। কেননা পা ভাঁজ করে ঠায় বসে থেকে হাঁটুতে খিল ধরেছিল বলে মীনাক্ষী থেবড়ে বসে ছিল। ওই দশায় আচমকা ওঠা যায় না।

মীনাক্ষী চোখ বুজলো। এতদিনে বুঝলাম—এইভাবে আমার মৃত্যু ছিল! এরকম একটা কিছু ভেবে নিয়ে সে মন শক্ত করলো এক পলকে। সারা দুনিয়া তখন তার চোখের নিচে চুপ করে আছে।

আরে! কিছুই তো হচ্ছে না। চোখ খুলতেই মীনাক্ষীর বুকটা ধক করে উঠলো। চবুতরার পাশ দিয়ে একজন মাঝবয়সী মানুষ ছুটে এসে এইমাত্র বালহস্তীর মাথায় গিয়ে লাফ দিয়ে পড়লো। পড়েই ডান হাত সে হাতির মুখের ভেতর ভরে দিলো।

সবই ঘটছিল চোখের পলকে। বালহস্তীটি ব্যথায় চিৎকার করে শুঁড় নামিয়ে পথ পালটে পালাবার পথ পায় না। সে তড়িঘড়ি মাথা ঝাঁকিয়ে লোকটাকে সেখান থেকে পেড়ে ফেলার চেষ্টা করতে করতেই দৌড়চ্ছে—যে-পথে তার মা খানিক এগিয়ে গেছে—সেই পথ ধরে।

ঠিক এমন সময়ে মীনাক্ষী দেখতে পেল বালহস্তীর মাথায় বসা লোকটিকে। মানুষটি হাতির ব্যাপারে করিৎকর্মা। ডানহাত মুখে ঢুকিয়ে কচি দাঁতের গোড়ায় ভীষণ জোরে টান দিতে দিতে ফাঁকা হয়ে যাওয়া রাস্তার দু'ধারে দাঁড়ানো মানুষজনের দিকে তাকিয়ে হাসছিল লোকটি। যেন এই কাজই সে দোবেলা করে থাকে—মুখের হাসির সঙ্গে এমনই একটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য মেশানো।

মীনাক্ষী তার বুকের ভেতর থেকে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো।—দাঁড়াও—বলতে বলতে সে মাণ্ডির ভাঙা ভিড়ের ভেতর লাফিয়ে পড়লো। পড়েই হাতির পেছনে ছুটতে গেল। তখন সে মনে মনে বলছিল, তাই বলো—তাই বলো—এমন করে হাতি আর কে ধরবে!—কে ধরতে পারে! আমরা যে হাতিধরা ঘরদুয়ারি পাইকান!

মীনাক্ষী যতই দৌড়াচ্ছিল—ততই পথচলতি মানুষের ভিড়ে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে সে পিছিয়ে পড়ছিল। আর বালহস্তীটি মানুষের ভিড় কাটিয়ে কাটিয়ে

এগিয়ে থাকা নিজের মাকে ধরে ফেলছিল। মীনাক্ষীর বুকের ভেতর নিঃশ্বাস নেওয়ার বাতাস ফুরিয়ে যায় যায়। সে যত ছোটে—ততই উল্টো ভিড় তাকে আটকে দেয়। মীনাক্ষী চিৎকার করছিল—দাঁড়াও—দাঁড়াও—যদি হারিয়ে যায়। যদি দেখা হয়। এরকম দুই উল্টো টানে তার চোখে জল এসে পড়লো। খুব জোরে ছোটাও যায় না। রাস্তার ঝামা বৃষ্টিতে ভিজে সপসপে—পেছল। কিছু উজবুক তো পথই দেবে না। তারা এক বগ্‌গায় হাঁটে।

ভিড় কাটিয়ে মীনাক্ষী যখন গোয়ালিয়র সড়কে পড়লো—তখন বালহস্তীটি বেশ দূরে। তবে স্পষ্ট দেখা যায়। তার মাথায় বা পিঠে কোনো মানুষ নেই। লোকটা যেন এক চমক দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। একবার ভাবলো হাতির পেছন পেছন যাবে। আশপাশে যদি থেকে থাকে মানুষটি। আবার ভাবলো—রাজধানীর বাইরে নির্জন শাহী সড়কে অতটা এগিয়ে গিয়ে যদি মানুষটিকে না পায় তো এত রাতে একা একা ফেরা কি ঠিক হবে? বিশেষ করে ইদানীং সড়ক তস্করি যা বেড়েছে—। যদিও তোড়া বাঁধার—তোড়া কাটার একখানা ছুরি সবসময় তার কোমরেই থাকে।

আরেক পশলা বৃষ্টি এসে পড়লো। ক'দিন ধরে বৃষ্টি এমন আসছে যাচ্ছে। যমুনার সবচেয়ে নিচু চরগুলো এখন জলের নিচে। ফের জেগে উঠবে সেই শীতের মাঝামাঝি। রাজধানীর এত আলো, এত মানুষজন, এত কেনাবেচার মাঝখানে গম্ভীর মুখে আগ্রা দুর্গ দাঁড়িয়ে। সেখানে যে ভেতরে কী হচ্ছে—বাইরে থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই। বাদশা আসে যায়। দুর্গ থাকে। থাকে তার পাহারা চৌকি।

এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই মীনাক্ষী অন্ধকার অতিকায় একটা খাতের সামনে এসে পড়লো। এর নাম যমুনা। কোথায় জল—কোথায় জাগা চর—তা সবটাই মুখস্ত মীনাক্ষীর। যেখানটায় মেরে ভাসিয়ে দেওয়া কয়েদীদের লাশ দেখতে পেয়েছিল—সেখানে এখন নিপাট ভালোমানুষের মতো খানিক জ্যোৎস্না মেখে বেলে জায়গা আর জল চকচক করছে।

ঝুপড়িতে ফিরতে ফিরতে মীনাক্ষী বুঝলো—কাল ভোর হতেই বেলির গোড়া থেকে জল বের করে দিতে হবে। নইলে সব পচে যাবে। ঘরের সামনে উঁচু মাটির বারান্দা জলে সপসপ করছে। এই বর্ষার পর ঝুপড়ির চাল বদলাতেই হবে। কত কাজ বাকি। কত কাজ করা দরকার। ঘরে ইঁদুরের গর্ত হয়েছে। সেগুলো না বোজালে শীতের মুখে সেখানে নির্ঘাৎ সাপের আস্তানা হবে।

কী হবে এসব করে? কার জন্যে করবো? প্রায় বিড়বিড় করে জলে ভেজা জায়গাতেই বসে পড়লো মীনাক্ষী। সফিই বা কোথায় গেল? এই আফগান ভূতটা মাঝে মাঝে নাগাড়ে তিন চারদিন কোনো কথা বলে না। আবার কথার তোড় এলো তো মহা বকতে শুরু করে দেয়। এক এক সময় আমাকে নিয়ে কী করবে তা ভেবেই পায় না! মীনাক্ষীর মনে পড়লো—এক একদিন মীর সফি এমন করে—যেন আমাকে পেয়ে ও আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে।

সারাটা জাগা চর এখন গঁড়ি গঁড়ি বৃষ্টি ভেজা অন্ধকারে মুছে গেছে। এর ভেতর শের খাঁয়ের চাষীরা, মাছমারার দল যে কোথায় তার হদিস করাই কঠিন। মানুষ কি মানুষকে পায়? না, পাশাপাশি একজন অন্যজনকে পাবার জন্যে জীবনভর ভোগে। ওই ফুল সুন্দর করে ফুটে ওঠার পর কদরদারের হাতে পড়ে একবেলাতেই আয়ু ফুরিয়ে ফেলে। সারা রাতের অন্ধকারকে কুচি কুচি করে ভোরবেলার আলো ফোটে। মানুষের মতো এমন দামি সুন্দর জিনিস যদি মানুষেরই খেয়ালে—লোভে—দাপটে সাবাড় হয়—ঘরবাড়ি মানুষজন হারায়—তাহলে কেন জন্মানো? কেন বাঁচা? বাঁচার চেষ্টায় খেটে খেটে মরা?

মুখে কিছু না দিয়ে ঝুপড়ির হুড়কো তুলে মীনাক্ষী শুয়ে পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এসে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

সামান্য কিছু আলো নিয়ে সারা রাজধানীতে আগ্রা দুর্গ যখন একা জেগে—সেই নিশুতি রাতে মীনাক্ষীর ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন হুড়কোয় আটকানো দরজায় পাথর ছুঁড়লো। সেরকমই তো শব্দটা।

উঠে বসে মীনাক্ষীর মনে পড়লো—আজ তো সফি ফেরেনি। তাহলে? রেড়ির শুকনো ডাল আর কাদা দিয়ে গাঁথা দেওয়ালের ফুটো দিয়ে অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। বাইরে যেন কার গলা। কিসের বাজনা।

ভারি অদ্ভুত মনে হলো মীনাক্ষীর। শের খাঁয়ের দল আবার এলো? এমন নিশুতি রাতে? শরাবে চুর চুর হয়ে বাজনা বাজিয়ে? কী বিপদ। ঠিক এই সময়—সফি নেই। কোথায় আটকে গেল মানুষটা। এমন তো করে না কোনোদিন।

হাত-কোদালটা হাতে নিয়ে দম বন্ধ করে খুব আলগোছে দরজার হুড়কোটা নামালো মীনাক্ষী। দোর একটু ফাঁক হতেই সফির গলায় ঝুপড়ি ভরে গেল।

মীনাক্ষী এক লাফে বাইরে এসে দেখে—শেষরাতের সাদা জ্যোৎস্নায় সারা চর হাসছে। সেই আলোয় আগ্রাও খানিক খানিক চোখে পড়ে। কী ব্যাপার? ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?

বেশ দূরে দাঁড়ানো মীর সফি—বেলা চামেলির কেয়ারি পেরিয়ে খোলা বালি জায়গায় রীতিমত নাচছে যেন। কাঁধে রবাব মতো কিছু একটা ঝোলানো। শালোয়ার-কামিজে অমন লম্বা লম্বা পায়ের নাচ এই নিশুতি রাতে দেখলে—সফিকে ভূত বলে মনে হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। সেই সঙ্গে গলা খুলে গান—তারের বাজনাটি বাজিয়ে বাজিয়ে—নাচতে নাচতেই দুলে চলেছে সফি—একদম একা—সাদা জ্যোৎস্নার ভেতর।

এসব দেখে রেগে থাকা যায় না। হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছিল মীনাক্ষী। তার ভেতরেই বললো, হয়েছে। এবার ঘরে এসো। বাঃ! চমৎকার। বেশ নাচোতো তুমি। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

একথায় সফির নাচ যেন বেড়ে গেল। লম্বা লম্বা হাত-পা বাজনার তালে এদিক ওদিক চালাচ্ছে। সেই তালে গলাও খুলে দিলো সফি—

হম মনী বর্ খীজদ্—ইনজী হাম তূয়ী-ই-ই

—এই দ্যাখো ! আবার কী গায় ! কিচ্ছু বুঝি নে—

নাচ নামিয়ে—বাজনা থামিয়ে সফি চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, সবই এখন 'তুমি' হয়ে গেছো—আমিও 'তুমি' হয়ে গেছি—

—বেশ ! হয়েছে। এবারে এসো। বৃষ্টিতে ভিজতে হবে না। আমি কি ছাই তোমাদের গান বুঝি ?

—এ আমাদের গান নয় মীনা বাঈ ! এ হলো গিয়ে ফারসি গান—

চুন্‌য়কী বাশদ্‌ হমী, ন বাশদ্‌ দূয়ী।
হম মনী বর্‌ খীজদ—ইনজা হাম তুয়ী !

—এখন সবই 'তুমি' হয়ে গেছো—আমিও 'তুমি' হয়ে গেছি।

শুনে মনটা ভরে যাচ্ছিল মীনাক্ষীর। খুশিতে গলায় ঝাঁঝ এসে গেল তার। বেশ গমক দিয়েই বললো, এবারে ঘরে এসো তো। রাত অনেক হয়েছে। —বলে মীনাক্ষী নিজের ভেতরে ভেতরে নিজেকেই যেন বললো, এত ভালোবাসো তুমি ?

—আরেকটা গান শোনো—আমীর খসরুর্‌ লেখা—

—আঃ ! এই নিশুতি রাতে জ্বালাবে তো দেখছি !

—শোনোই না—বলে গলা ছেড়ে গজল ধরলো সফি—

আশিক এ-ইয়ার অম
মারা বা মুসলমানি দর কার নিস্ত্‌।
হর রগ এ-মন তার গস্ত্‌
হাজ্জত এ-জুন্নার নিস্ত ।।

মীনাক্ষী চেঁচিয়ে উঠলো, কিচ্ছু বুঝি নে—

আমি তোমায় ভালোবেসে মুগ্ধ—মুসলমানিতে আমার আর কোনো দরকার নেই। আমার শরীরের সব শিরা তোমার হয়ে গেছে—

—থামো বলছি। থামো—বলে চেঁচিয়ে উঠলো মীনাক্ষী। সারা রাত কোত্থেকে শরাব গিলে আসা হলো ?

আন নিশান এ দীদ এ-হিন্দুস্থান বুবদ।
কি জহদ আজ খাব ও দেওয়ানা শব্‌দ ।।

—উঃ ! বলছি তো কিচ্ছু বুঝিনে তোমার গান—

—গান নয় মীনা—এ গান নয়। রুমির রুবায়-ই। কেউ হিন্দুস্থানের সিনার ভেতর তার দিলকে যদি দেখে থাকে তো তার পক্ষে আর ঘুমিয়ে থাকা সম্ভব নয়। সে ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠবে। একেবারে দিওয়ানা—আত্মভোলা হয়ে যাবে। —কী আশ্চর্য দেশ এই হিন্দুস্থান। তাই না মীনা ? তুমি এখানে থাকো। তাই হিন্দুস্থানকে আমার এত ভালো লাগে—

—একথাও তোমার রুমি লিখেছে নাকি !

—নাঃ। তোমার কথা আমিই যোগ করে নিলাম।

—কোথায় খেলে ?

—লাটু শাহ দারোগাবাবা চিস্তির দরগাহর পেছনে। যমুনার

ভাঙা পাড়ে—

—সেখানেও শরাবের ঠেক হয়েছে নাকি ?

—শরাবের নয় মীনা বাঈ। কবিতার। রুবায়-ইর। দোহার। চৌপাঈয়ের ঠেক। অনেক বুজুর্গ ইনসান আসেন। হাফেজ, রুমি, ফেরদৌসি, তুলসীদাস —সব শোনা যায়। চর্চা হয়। তা গান-গজলের সঙ্গে তো একটু শরাব থাকতেই পারে। কী বলো ?

—দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর মুয়াজ্জিনের মতো বাণী দিতে হবে না। ঘরে এসো। সারারাত তো খাওনি কিছুই।

হঠাৎ আবার মীর সফির হাতের আঙুলে রবাবের তার গেয়ে উঠলো। ঠাণ্ডা বাতাসে শেষরাতের সাদা জ্যোৎস্না যেন ফেঁপে ফুলে উঠছিল। হেলমন্দের তীরের সা-জোয়ান সফি এবার সত্যি সত্যিই আফগান ঢংয়ে নাচতে লাগলো। হেলে দুলে। বেঁকে চুরে।

নিচে নেমে সফির মুখোমুখি হলো মীনাক্ষী। এসব কী হচ্ছে শুনি ?

নাচতে নাচতেই সফি একবার ঝুঁকে বললো, বড় আনন্দ হচ্ছে আজ। কেন জানি না—

—থামবে ?

সেরকমই নাচতে নাচতে সফি একবার কাছে এলো মীনাক্ষীর। এসে নাচের তালেই বললো, তুমি আমার ধর্ম নেবে ?

—ধর্ম ?

নাচতে নাচতেই সফি বললো, হ্যাঁ। আমার ধর্ম। নেবে তুমি ?

—কিসের ধর্ম ? কী ধর্ম ? —সব গুলিয়ে যাচ্ছিল মীনাক্ষীর। সন্ধেরাতে বালহস্তীর পেছন পেছন ছোটা। শেষ রাতে উঠে এই তুমুল নাচ দেখা। কী বলবে বুঝতে পারছিল না মীনাক্ষী।

নাচতে নাচতেই রবাবে আঙুলের ঘা দিয়ে সফি বললো, ভালোবাসার ধর্ম। ভালোবাসার—

হো হো করে হেসে উঠলো মীনাক্ষী। ধ্যাৎ! সে আবার হয় নাকি ? ভালোবাসা দিয়ে ধর্ম হয় ? আমার তোমার ভালোবাসা দিয়ে ?

সফির নাচ—বাজানো আরও তুমুল হয়ে উঠলো একথায়।

তাই দেখে মীনাক্ষীর ভয় হলো। হাত-পা ভাঙবে দেখছি—

সফি গেয়ে উঠলো—

এক মুঙ্গ-কা দো ফান্দ্ হৈ
কুন জিয়াদা কুন কাম্ ।।

দীন দরবেশদের এ-গান মীনাক্ষী কনৌজে থাকতেই শুনেছে। গঙ্গার গা ধরে হাটে মাঠে ঘাটে একটু কান পাতলেই এ গান শোনা যায়। মানেটাও জানে। একটি মুগের দানার দুটি খোসা। একটা খোসা অন্য খোসাটার চেয়ে বড়ও নয়—কমও নয়।

লম্বা চাওড়া শরীরের সফি এতক্ষণ গাইছিল ফারসি গান। আওড়াচ্ছিল

ফারসি গজল, রুবায়-ই। শাহী দেওয়ানখানায় এই চর জায়গার কাগজপত্তর আনতে গিয়ে মীনাক্ষীকে অনেক ফারসি শুনতে হয়েছিল। শাহী দফতরে দফতরে ফারসি। বিশেষ বোঝে না মীনাক্ষী। গান-গজল-রুবায়-ই শুনতে কিন্তু মীনাক্ষীর ভালোই লাগে।

সফির গানের গলাটি ভরাট। এবার দীন দরবেশের গানটি চেনা আগ্রাই উর্দুতে হওয়ায় মীনাক্ষীর বেশ ভালো লাগলো। কিন্তু যেভাবে নাচছে—পড়লো বলে।—থামবে ?

মীনাক্ষীর এ-ধমকে কোনো কাজই হলো না। মীর সফি আবারও জানতে চাইলো—নাচতে নাচতেই—আমার ধর্ম নেবে ? আমার ধর্ম ?

মীনাক্ষী কোনো জবাব দিতে পারলো না। তার কান্না পাচ্ছিল! জীবন কত লম্বা হয়। সেই জীবন এমন মানুষ নিয়ে করতে হবে ? সফির জন্যে তার কষ্টও হচ্ছিল। শক্ত কিছুই পেটে পড়েনি নিশ্চয়। সে জানে ইদানীং আগ্রার মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে যোধপুর-বিকানিরের একটা শরাব খুব বিকোচ্ছে। নামটি তার—আশা। খুব কড়া। সেসব কিছু একটা খেয়ে ফিরেছে নিশ্চয়। মরদদের ভেতর এই শরাব খাওয়া এখন এক কেতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আলটপকা দৌড়ে গিয়ে সফিকে ধরে ফেললো মীনাক্ষী। খুব সময়মত ধরেছে। নইলে পড়েই যেতো। রাত-বিরেতে এভাবে ফিরলে কোনদিন ডুবে মরবে—

মীনাক্ষীর কাঁধে ভর দিয়ে এগোতে এগোতে কোনো কথাই বলতে পারলো না সফি। খানিকবাদে জ্যোৎস্না মুছে গিয়ে দিনের আলো আসবার আগে আকাশ খানিকক্ষণের জন্যে একদম অন্ধকার হয়ে যাবে। ঠিক ওই সময়টাতেই ঘুম থেকে উঠে মীনাক্ষী অন্যদিন মাঠের কাজে নেমে পড়ে।

আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়। আমার দু'একটা কথা শুনবে তো ? কী হয়েছে তোমার ? কী নেই তোমার ? —যে জন্যে ঠেকে গিয়ে বসতে হবে ? শরাব খেতে হবে ?

এবার মাথা তুললো সফি। এগোতে এগোতে বললো, আমির খসরু, রুমি, ফেরদৌসি শুনতেই যাওয়া—তারপর এমন জমে উঠলো—তখন আর না করতে পারিনি মীনা।

—তোমার তো কোনোদিন এ-বাই ছিল না ?

মীর সফির কাছে সবই স্বপ্ন লাগছিল। সে যে কী করে ফিরে এসেছে—অন্ধকারে যমুনার বুকে আলাদা করে চর জায়গায় পা ফেলতে পেরেছে—জলে ডোবেনি—এ-নিয়ে কাল রোদের আলোয় সে হয়তো ভাবতে বসবে। এখন তার কানের ভেতর মীনাক্ষীর কিছু কথা যাচ্ছিল—কিছু বেরিয়েও যাচ্ছিল। সে আবার নেচে উঠবে কি না—তাই ঠিক করতে পারছিল না। এ নাচ হিরাট, গজনী, কাবুলের মাঠে ঘাটে হামেশা দিন দুপুরে অনেকেই নাচে। এমন সময় মীনাক্ষীর ও-কথাটা তার কানে গেল—তোমার তো কোনোদিন এ-বাই ছিল না ?

—কিসের বাই ?

—এই ফারসি রুবায়-ই, গজলের—

—ওঃ কোত্থেকে হলো এ-বাই ? শুনবে মীনা বাঈ ? প্রথম আহেদি হয়ে যখন সাকেত ছাউনিতে ঢুকলাম—তখন সেখানে ইস্পাহান থেকে একটি ছেলে এলো। ভারি সুন্দর দেখতে। কথায় কথায় তার মুখে হাফেজ, রুমি, খসরু, ফেরদৌসি। সাকেতে সারাদিন নানান্ তালিমে কাটতো। সন্ধে হলে ছেলেটি আমির খসরুর গজল গাইতো। গাইতো রুমি। তাই শুনেই আমার মতো আফগানের ফারসিতে টান! সেই থেকেই ফারসিকে ভালোবাসি। সেই ছেলেটি কে জানো ?

মীনাক্ষীও দাঁড়িয়ে পড়লো। আমি জানবো কী করে ?

—তুমি তাকে ভীষণ চেনো।

—কে ?

—বেল্লাইতি বাজারঘানি! আমার কিছুকাল পরে আহেদি হয়।

নামটা শুনেই চমকে উঠলো মীনাক্ষী। ধুমধুমার গড় গুঁড়িয়ে দেবার জন্যে শাহী ফৌজের হামলার দিন এই সুশ্রী, নিষ্ঠুর আহেদির সঙ্গে তার—বলা যায় মৃত্যু দিয়ে জান-পহেচান হয়েছিল। বর্শার লোহার ছোবল দিয়ে বেল্লাইতি বাজারঘানি তাকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিতে চেয়েছিল। আহেদি মীর সফি সেদিন যদি এগিয়ে না আসতো—

—বিশেষ করে রুমির রুবায়-ই-তে কে আমায় ভাসিয়ে দিলো জানো ? শুনে অবাক হবে মীনা বাঈ। মনসবদার মির্জা ইউসুফ বেগ—। যে ক'দিন মানুষটার সঙ্গে ধুমধুমায় ছিলাম—রোজ রাত হলে ওর তাঁবুতে ডেকে পাঠাতো। গভীর রাত অব্দি রুমি, হাফেজ আওড়াতো—

—তুমিই বলেছিলে—লোকটা উজবেক—

—উজবেক হলেও লোকটা মনসবদার তো। মনসবদার, আহেদি, মীর আতশ, মীর বকসিদের ফারসি তো শিখতেই হয়। নয়তো কাজ চালাবে কী করে ? শাহী হুকুমত চলে ফারসিতে।

দিন ফুটে উঠছিল। সফিরও নেশা ফিকে হওয়ার দশা। কিন্তু নিজের চোখ ঘুমে ভেঙে আসছিল মীনাক্ষীর।

—উজবেক হলেও ইউসুফ বেগের মা ছিলেন তো হিন্দুস্থানি। রাওয়ালপিণ্ডিতে বোধহয় পয়দা হন। কাজকম্ম সবই হিন্দুস্থানে। ফারসিতে পড়াশুনো—ফারসিতে ওঠাবসা—

—লোক যত নিষ্ঠুর—তত দেখছি ফারসি রুবায়-ই ভালোবাসে!—বলতে বলতে মীনাক্ষীর চোখে জল এসে গেল।

—তা কেন ? —বলেই সফি তার মীনা বাঈকে জড়িয়ে ধরলো। রুবায়-ইর দোষ নেই বাঈ! দোষ ইনসানে! আমি তোমায় যত জোরেই জড়াই না কেন—তল পাই না। মনে হয় আরও বাকি আছে তোমার।

—আমার তো কিছু বাকি থাকে না—

এমন করেই একথা বললো মীনাক্ষী—এমন করেই তার দু' চোখের সাদার ভেতর ভোর রাতের ছানা কেটে ফুটে ওঠা আশমান ছায়া ফেললো—যাতে কিনা সফির বুকের ভেতরটা হা হা করে উঠলো। সে ভালো করে মীনা বাঈকে দেখলো। তারপর তার বুকে কান পেতে বললো, আমি অন্য ডাক শুনতে পাই বাঈ।

—কিসের ডাক?

—আমি না। অন্য কারও নাম ধরে সে ডাক—

ঘুম আসছিল। খিদে পাচ্ছে। ভোর ভোর ফুলের মাদা থেকে বর্ষার জমা জল কেটে বের করে দেওয়া দরকার। এক সঙ্গে এত সব কিছুর ভেতর মীনাক্ষী ঠিক বুঝতে পারছিল না—সফির কথাগুলো—ঠাট্টা? না, এমনি সাধারণ কথা? যে-কথায় কষ্ট লুকিয়ে থাকে। সে দু'হাত দিয়ে সফিকে পাল্টা জড়ালো। জড়িয়ে দেখলো এর শরীরটা এখনো অনেকদিন তাজা থাকবে। হাতের আঙুল লোহার শলা—লম্বা লম্বা। দুই গালে মাংস ঢাকা পুরুষালি দুই ঝিক। তার একটায় আলতো করে চুমু দিয়ে মীনাক্ষী বললো, ওমা! আর কার নাম ধরে ডাকবো?

—সে আমি জানি না—

মীনাক্ষী দেখলো, সফি গালে নেমে আসা চোখের জল বৃথাই লুকোবার চেষ্টা করছে।

—তোমার এত কষ্ট?—বলে নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না মীনাক্ষী। যত জোরে পারে সে সফিকে নিজের কাছে টেনে আনলো। সফির গা গরম লাগলো। তবু তা ভালো লাগলো মীনাক্ষীর। আস্ত, জিন্দা একজন ইনসান। তার গায়ের গন্ধের ঝাঁঝ মীনাক্ষীর ভীষণ ভালো লাগে। এই ঝাঁঝ সে আগ্রার মাণ্ডিতে ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে থেকে অন্য কোনো মরদের গা থেকে পায়নি। অল্পক্ষণের জন্যে দু'জনের শরীরেই খুব জোর এলো। একটু পরে আবার তারা যেমন ছিল তেমনই হয়ে গেল।

এবার ভোরের আলোয় সব দেখা যাচ্ছে। মীনাক্ষীর এখন একবারও মনে পড়লো না—কাল সন্ধে রাতে আগ্রায় চবুতরার সামনে বালহস্তীর মাথায় লাফিয়ে উঠে আসা কোন্ ইনসানের মুখ সে দেখতে পেয়েছে।

পাহাড়ে বৃষ্টি নামলে চারদিক পাল্টে যায়। সাতানা, সাতপুর—দুই পাহাড়েই এখন বৃষ্টির ধুন্ধুমার কাণ্ড চলছে। এক একটা বাজ পড়ছে—তাতে পাহাড়ের বুক ফেটে গিয়ে আশমানে বিজলির ছোবল। তাঁবুর ভেতরে বসে আরজুমন্দ বানুর হাজিরা মেয়েটি বলছিল, কী বলবো শাহজাদা বেগম—বড় বড় পাহাড়ি সাপ ভেসে এসে নিচের তুঁত গাছের ডালে বাসা বেঁধেছে—

বেগম আরজুমন্দ কিছু বললেন না। বাইরের ঝোড়ো বাতাসে এই ডোরাসানা মঞ্জেলের মতো বড় তাঁবুও যেন উড়ে যাবার দশা। ভেতরে সুখদোলায় ছোটভাই মুরাদকে নিয়ে দু'পাশে বসে তার দুই দিদি—জাহানারা

আর রোশনআরা। হাজিরার মুখের কথা ওরা দুই বোন যেন গিলছে। সব শুনলে ভয় পেয়ে যেতে পারে। তাই আরজুমন্দ বানু হাজিরার কথায় বিশেষ কান না দিয়ে তাকে থামিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন।

হাজিরা মেয়েটি থামবার নয়। সে বলে যাচ্ছিল—সাপ ছাড়াও কিছু পাহাড়ি হরিণ নেমে এসেছে। তাছাড়া কত রকমের পোকা। সেগুলো আমাদের হাতির গায়ে এসে বসছিল।

জাহানারা জানতে চাইলে, কেমন পোকা ?

—এই আটখানা করে পা আছে। সেরকমই কোনো পোকা ফিল-ই-জং-এর পেটে চলে গিয়েই তো সর্বনাশ।

রোশনআরা বললো, তাই তো আব্বা হুজুরের হাতি ফিল-ই-জং বসে পড়েছে দিদি—

বেগম আরজুমন্দ বানু আর দুসংবাদ শুনতে পারছিলেন না। শাহজাদা খুর্রম ইদানীং তাঁকে কিছু খুলে বলেন না। যতটা পারেন দূরে দূরে—তোপ জ্যান্ত রাখার ঘষামাজায়, সওয়ারদের ঘোড়দৌড় করিয়ে সযুত রাখায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখেন শাহজাদা। আরজুমন্দ বানু খুব মিষ্টি করে হাজিরা মেয়েটিকে বললেন, সুলতানকে আমার কোলে দাও তো—

হাজিরা গিয়ে দাঁড়াতেই সুলতান মুরাদ সুখদোলায় উঠে দাঁড়ালো। দু'হাত বাড়িয়ে সে উঠে এলো হাজিরার কোলে। সে জানে এখন সে যাবে কোথায়! তার মনের ইচ্ছে মতোই যেন হাজিরা তাকে নিয়ে শাহজাদা-বেগমের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

মুরাদ ঝাঁপ দিয়ে আরজুমন্দের কোলে যাবে—ঠিক এই সময় তাঁবুর গুলালবার থেকে হুকুমনামার মতো একখানা বড় লেফাফা উড়ে এসে আরজুমন্দের পায়ের কাছে পড়লো। জরুরি মনে করে হাজিরা সেখানা তুলে শাহজাদা বেগমের হাতে দিলো।

এ কাগজ আরজুমন্দের খুব চেনা। আব্বা হুজুর শাহী হুকুমনামা এমন কাগজেই পাঠান। যেসব হুকুমনামায় বাদশার পাঞ্জার ছাপ থাকে না—সেগুলোতেই শুধু আব্বা হুজুর উজিরে আজম আসফ খাঁ দস্তখত করে থাকেন। এ-কাগজ কি শাহজাদা দেখেছেন ?

গোটানো লম্বা তুলট কাগজ। খুলে পড়তে পড়তে এক জায়গায় চোখ আটকে গেল আরজুমন্দ বানুর।

তিন সুলতানের সময় তো সুন্দর কাটছে। সুলতান দারা তার পেয়ারের হাতি ফতে-জংয়ের পিঠে চড়ে খুব ভোর ভোর রাওয়ালপিণ্ডির ছাউনি ময়দানে চলে আসে। এসে এখানকার সবচেয়ে চঞ্চল টাট্টুকে বশ করে খুব সহজেই তার পিঠে চাপে। এদিক থেকে সুলতান আওরঙ্গজেব অনেক সতর্ক ও সাবধানী। যে টাট্টুতে চাপবে—তাকে বেছে বের করবার কাজ এখনো শেষ করতে পারেনি সুলতান।

তোমার তিন ছেলে আমার কাছে দামি আমানতের মতোই গচ্ছিত আছে। এ

নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণই নেই। আমি বুঝে উঠতে পারছি না—এটা ওটা অছিলা দেখিয়ে কেন তুমি নিজে এসে আগ্রায় বাদশার মবারকে সেলাম দিচ্ছো না। এভাবে একটা বছর ঘুরে গেল।

আরজুমন্দ হুকুমনামাটি ভাঁজ করে ফেললেন। তাঁর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো। এখন যদি আগ্রায় গিয়ে শাহজাদা খুর্রম খোদ হাজির হন তো শাহজাদা খসরুর নসিব তাঁর জন্যে স্থির হয়ে আছে। হয় অন্ধ হতে হবে তাঁকে—নয়তো নিজের মুণ্ডুটি দিয়ে দিতে হবে। গোয়ালিয়র দুর্গের অতিথি হতে হলে তো কথাই নেই। সেখানে উপরি পাওনা পাঁপর শরবত !

আরজুমন্দ বানুর হাত থেকে শাহী হুকুমনামাখানি পড়ে গেল। এত উদ্বেগ, দুশ্চিন্তার ভেতরেও একটা কথা জেনে খুব ভালো লাগতে লাগলো শাহজাদা বেগমের। তিন খুদে সুলতানের সময় ওখানে সুন্দর কাটছে। তোমাদের সঙ্গে আমার কি আর কোনোদিন দেখা হবে ! আমার তো মনে হয়—আর কোনোদিন তোমাদের দেখতে পাবো না। কারণ, তোমাদের আব্বা হুজুরের লড়াইয়ের পাঁয়তারা থেমে নেই। বরং বেড়েছে। জেনে রেখো—তাঁর সব লড়াইয়ের লক্ষ্য একজন—তিনি তোমাদের দাদাসাহেব—জাহাঙ্গীর বাদশা। তাঁর সব তোপের মুখ একই দিকে। যেদিকে রাজধানী আগ্রা।

বাইরে একটা বড়সড় বাজ সাতানা পাহাড়ের বুক ফাটিয়ে কড়কড় করে পড়লো।

সাতানা পাহাড়েরই অন্য পিঠে পাহাড়ি ঢলের আড়ালে শাহজাদা খুর্রমের হাতিদের রাখা হয়েছে। এখান থেকে নিচে তাকালে গিরনা নদীকে লাফিয়ে লাফিয়ে আসিরগড়ের দিকে নামতে দেখা যায়। দুনিয়া তৈরি হওয়ার সময় সাতানা পাহাড়ের এ-দিকটা খানিক গুহা খানিক যেন ঘর হয়েই তৈরি হয়। বর্ষায় যেমনি জোঁক—তেমনি সাপ—এদের হাত থেকে হাতির মতো লড়াইয়ের এমন দামি জিনিস বাঁচাতে হলে দরকার ছিল এমন একটি জায়গা খুঁজে বের করা।

শেরগির হাতিগুলো শাহজাদা খুর্রমের লড়াইয়ের মূল শক্তি। পালিয়ে বেড়ানো শাহজাদার লোক-লশকর, তোপ-কার্তুজ কমে এসেছে। কিন্তু কমেনি তাঁর জঙ্গী হাতির লড়াকু দাপট। এসব হাতির পান্ডার মাস মাইনেই এগারোশো দাম। এরকম শেরগির খুর্রমের এখানো তিরিশটি আছে। আরও দামি লড়াকু হাতি—মস্ত হাতি ছিল শাহজাদার সাতটি। এখন তা একটিতে এসে ঠেকেছে। সেই মস্ত হাতির চালিয়ের মাস মাইনে তেরশো কুড়ি দাম। শাহজাদার অবস্থা দেখে সে আগামী মাস থেকে শেরগির হাতির চালিয়েদের মতোই কিছু কমা দরে মাস মাইনে নেবে বলেছে।

শাহজাদা খুর্রম ঘোড়ার পিঠে ঝাঁকুনি খেতে খেতে পাহাড়ের আড়াল করা ঢালু পথটা ধরলেন। জোর বৃষ্টিতে দূরে সাতপুরা পাহাড়ের গায়ে প্রাচীন জঙ্গলও আবছা হয়ে এলো। নিজের প্রিয় ঘোড়ার গায়ের আলপোশ ছিঁড়ে গেছে। কাজাইয়ের অবস্থাও খুব খারাপ। কিন্তু কিছুই এখন বদলানো যাচ্ছে

না। দাম দামড়ির ভীষণ টান। যা-কিছু ছিল সব একত্র করে গত শীতের মুখে দারা আর আওরজেবের হাতে দিয়ে রাওয়ালপিণ্ডিতে বাদশার মবারকে নজরের জন্যে পাঠানো হয়েছে।

ঘোড়াটা শীতে কাঁপছিল। হয়তো এই বর্ষায় পায়ের ক্ষুরে এঁষো রোগ হয়ে থাকতে পারে। ঠোঁটের ওপর কয়েকটা ফুসকুড়ি দেখা দিয়েছে ক'দিন হলো। হয়তো ঘোড়াটার ভেতরে ভেতরে জ্বর হচ্ছে। কিন্তু বসিয়ে রাখার উপায় নেই। ঘোড়াও যে অনেক কমে গেছে।

শাহজাদা খুর্রম বৃষ্টিটা ধরে আসার জন্যে ঘোড়ার পিঠেই একটা পাহাড়ি খাঁজে দাঁড়িয়ে পড়লেন। একবার পা ফসকালে নিচের গভীরে ধোঁয়াটে খাদে পড়ে চিরকালের জন্যে হারিয়ে যেতে হবে। এখন চাষীবাড়ি চড়াও হয়েও এক দানা জওয়ার বা বজরা পাওয়া যাবে না। মাঠে মাঠে নাবি জায়গায় কাঁচ ধান। শাহজাদা ফৌজের মীর সামান কাল রাতে শাহাজাদাকে যা হিসেব দিয়েছে— তাতে দেখা যাচ্ছে ঃ এভাবে বসে বসে খেলে আর বড়জোর দু'মাসের খাবার আছে ভাঁড়ারে। অবশ্য বর্ষা ধরে এলে, শাহজাদা ঠিক করলেন, গাঁয়ে গাঁয়ে মুকদ্দমদের বাড়ি চড়াও হয়ে জওয়ার, গম, ভুট্টা টেনে বের করতে হবে। নইলে যে সারা শীত ফৌজ নিয়ে উপোসে কাটাতে হবে।

এখন হাতিগুলো নিয়ে ভালোয় ভালোয় বর্ষাটা কাটিয়ে দেওয়া যায়। ইয়া আল্লা! তেরি রেজা! একটা বেহেদর হাতির ক'দিন খুব শরীর খারাপ যাচ্ছে। লম্বা চওড়া হাতিটা দু'দিন কিছু খায়নি। ঘন কালো গায়ের চামড়ার কয়েক জায়গায় ফাটা ফাটা দাগ। চোখ ভীষণ হলুদ হয়েছে। এজন্যেই পাহাড়ের নিচে গাঁ থেকে হাতির বৈদ্য খুঁজে খুঁজে ডেকে আনা।

কোথায় আগ্রা দুর্গের ভেতর মেঝে ঢাকা গালিচার বনাতে ফিনফিনে গোড়ালির দামি চটি পায়ে চলাফেরা। আর কোথায় সাতানা পাহাড়ের খাঁজে পেছল পথে বৃষ্টি থামার জন্যে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা! এক এক সময় শাহজাদা খুর্রমের মনে হয়—এ আমি কী করেছি?

লম্বা চওড়া বেহেদর হাতিটার চোখ দুটো বড় বড়। কানের ওপর দুটি বড় বড় সাদা আঁচিল—যাকে কিনা কবিরা বলেন—গজমুক্তা। ক্ষেপলে এ হাতি দুর্ধর্ষ। তমসার তীরে এই বেহেদর হাতিরাই খুর্রমের পেছনে হটার সময় ঘাঁটি আগলে দাঁড়িয়ে থেকেছে পাথরের মতো। পিছিয়ে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছবার পর ওদের ফিরিয়ে নেওয়া হতো।

সাতানা পাহাড়ের এ জায়গাটা বাইরে থেকে দেখা যায় না। পাহাড় এখানে এক প্যাঁচে ঠিক উল্টো মোড় নিয়েছে। সেই মোড়েরই তলায় যেন পাথরের তাঁবু। মশালের আলোয় হাতিরা দাঁড়িয়ে। চিনি, ঘি, চাল, লংকা, গোলমরিচ পরিমাণ মতো দিতে না পারলেও শাহজাদা খুর্রম একটা ব্যবস্থা সবসময় চালু রেখেছেন। খিদে পেলেই ওরা যেন শুঁড়ের কাছে আখের গোছা পায়। অত বড় শরীরে এটা একটা চোখের তৃপ্তি—শুঁড় আর দাঁতের দরকারি কসরতের জন্যেও এটা জরুরি।

ঘোড়ার পিঠেই শাহজাদা হাতিদের কাছাকাছি হলেন। এখন একটা বেহেদর হাতি মারা যাওয়া মানে ঘোড়সওয়ার, পদাতী, বন্দুকচী—সবরকম সেপাইয়ের মনেই খারাপ দাগ কাটবে। হয়তো কেউ মনে করবে—এটাই খুর্রমের হেরে যাবার আগাম সঙ্কেত। অমনি রাতারাতি কিছু সেপাই ধরাচুড়ো ফেলে রেখে দেহাতের মানুষের সঙ্গে গিয়ে মিশে যাবে। দুর্ভাগার সঙ্গে কেউ থাকতে চায় না। সবাই চায় জয়।

এমন সময় পা ভর্তি কাদা মাখা একটা গেঁয়ো লোককে একজন রিসালাদার খুর্রমের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিলো। লোকটার মাথা ভর্তি কাঁচা পাকা চুল। কোমরে শক্ত করে বাঁধা কাপড়ের পটি। হাত দু'খানা শক্তসমর্থ। শাহজাদাকে দেখে লোকটা কুর্নিশ করলো।

শাহজাদা কোনো কথা বললেন না। চোখের ইশারায় রিসালাদারকে বুঝিয়ে দিলেন, ওকে অসুস্থ বেহেদরের কাছে নিয়ে যাও।

হাতির এই বৈদ্যকে দেখে শাহজাদার বিশেষ ভরসা হলো না। বেহেদর জাতের দুর্ধর্ষ হাতি যেন পাহাড় সমান উঁচু। তার সামনে হাতির এই বৈদ্য যেন বা পিঁপড়ে। ক'দিন ধরে বাইরে নাগাড়ে বৃষ্টি। তার ওপর এই বেহেদর যদি মারা যায় তো ফৌজের মন ভেঙে যাবে। একটা বেহেদরের মাটি নেওয়া মানে এ ফৌজের একখানা হাত চলে যাওয়া—

শাহজাদা খুর্রম দেখলেন—ওইটুকু মানুষটা দিব্যি বেহেদরের পেটের নিচে চলে গেল। খানিক পরে বেরিয়ে এসে লোকটি কাঁচা আখের সবুজ ডগা ছিঁড়ে নিয়ে শুঁড়ের সামনে ধরলো। অমনি বেহেদর হাতিটা সেই সবুজ পাতা শোঁ করে টেনে নিলো শুঁড় দিয়ে।

অতিকায় বেহেদরের কাছে তার ভৈ, মেঠ, মাহুত সবাই খুব সাবধানে চলাফেরা করে। কিন্তু ধরে আনা হাতির বৈদ্য বেহেদরের পেটের নিচে চলে যাচ্ছে—শুঁড়ের ডগায় আঙুল গুঁজে দিচ্ছে অবলীলায়—যেন ওরই পোষা পালা ওই বেহেদর।

খুর্রম দেখলেন, হাতিতে পাকাপোক্ত মানুষের মতোই লোকটা বেহেদরের শুঁড়ের ভেতর থেকে আখের ডগার পাতা টেনে বের করলো। করেই সিধে পাহাড়ের গা কেটে ঝোলানো দাউ দাউ মশালের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বার বার ভালো করে গন্ধ শুঁকলো পাতাটার। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আলোয় দেখলো পাতাটা। তারপর শাহজাদার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বেশ শব্দ করে বাতাসের গন্ধ নিতে লাগলো। নিতে নিতেই শাহজাদা খুর্রমকে ফের কুর্নিশ করলো। করে বললো, শাহজাদা আপনার সামনে আমার এই বাতাস থেকে শব্দ করে গন্ধ শোঁকা খুবই বে-তমিজি—তা আমি জানি—

খুর্রম তো চমকে উঠলেন। হাতির টোটকা করে এমন একজন গেঁয়ো বদ্যির মুখে কথার এমন বাঁধুনি? নিশ্চয় কোনো গুণী বৈদ্য। নসিবের চাকায় চাপা পড়ে ঘুরতে ঘুরতে সাতানার পাহাড়ি গাঁয়ে এসে পড়েছে। মনের ভাবটা যতখানি সম্ভব চেপে রেখে খুর্রম জানতে চাইলেন, দেখে কী মনে হলো?

বাঁচানো যাবে— ?

—আলবত যাবে শাহজাদা।—বলতে বলতে ওই অত বিরাট হাতির অসুখ-বিসুখের তোয়াক্কা না করে লোকটা তার শুঁড়েই হেলান দিলো—যেন কতকালের চেনা। তারপর বললো, হজরত। বাতাসে শুঁকে দেখুন। দেখুন। একটা গন্ধ পাচ্ছেন ?

শাহজাদা শুঁকে বললেন, হ্যাঁ—পাচ্ছি—

—কিসের গন্ধ বলুন তো ?

—বুঝতে পারছি না। তবে চেনা গন্ধ—

—কস্তুরীর মতো না !

—হ্যাঁ। তাই তো। পাহাড়ের এদিকটায় হরিণ আছে নাকি ?

—শাহজাদা মাফ করবেন। এ হরিণের কস্তুরী নয়। দেখুন এদিকে— দেখুন—

শাহজাদা দেখলেন, বিশাল বেহেদর হাতির বাঁ উরু বেয়ে পাটকিলে রংয়ের কী গড়াচ্ছে। লোকটি বলে উঠলো, খুব কাছে যাবেন না শাহজাদা। কাছে গেলে এই কস্তুরী গন্ধই শেষে উৎকট লাগবে। ও তো এখন মস্ত্ হয়ে আছে। তাই রগ ফেটে স্রাব হচ্ছে। বর্ষায় ওরা সঙ্গী খোঁজে শাহজাদা—

—সে ব্যবস্থা তো করাই আছে। এক একটি বেহেদরের জন্যে চার চারটি আলানসঙ্গী রাখা আছে—সব ক'টাই রাজতুম জাতের—ঠাণ্ডা, সুন্দরী। ওদের ডাকবো ?

—না, শাহজাদা। একসঙ্গে চার আলানসঙ্গী ! সেটা ভালো হবে না। বরং যে কোনো একজনকে ডেকে পাঠান।

শাহজাদা দেখলেন, বেহেদরের গায়ের গজঝম্প, মেঘডম্বুর—দুয়েরই অবস্থা বেশ খারাপ। এখুনি বদলাতে না পারলেও অন্তত কিছুটা রিপু করা দরকার। তিনি চোখের ইশারায় দূরে দাঁড়ানো ভৈ আর মেঠকে হুকুম করলেন। অমনি হাতির ভিড় থেকে একটি রাজতুম হাতিকে বের করে আনা হলো। তাকে দেখে বেশ লজ্জাবতীই লাগলো শাহজাদার।

রাজতুম যতই বেহেদরের কাছাকাছি হয়—ততই অত বড় বেহেদর হাতিটা যেন এ ক'দিনের সব অসুখবিসুখ এক পলকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চনমন করে ওঠে।

শাহজাদা খুর্রমের একটা বিপদ কাটলো। তিনি বেশ হালকা মেজাজেই জানতে চাইলেন, তোমার নাম কী ?

—হুজুর। সবাই ডাকে হাতি বলে। নয়তো পুরো নাম—সনাতন হাতি—

এরপর এই দুর্ধর্ষ বেহেদরের ইতিহাস একটু একটু করে যোগাড় করলো সনাতন হাতি। এখন বেহেদরকে বেশ সুন্দর লাগছে। সে রাজতুমকে আগাগোড়া আদর করছিল। শুঁড়ে গলা জড়িয়ে। সামনের বাঁ পা ভাঁজ করে তার ওপর সে রাজতুমকে বসানোর চেষ্টা করলো দু'বার। অত বড় হাতির সবটা আদর একা একা খাবার সাহস নেই রাজতুমের।

সনাতন হাতির হুকুমে তাড়াতাড়ি আধমণ মতো চালের কড়া প্রসাদ রেঁধে বেহেদরের সামনে ধরা হলো। এখন যে ওর খুব পরিশ্রম যাচ্ছে। বলতে হলো না। হাঘরে হাভাতের মতো সবটা খেয়ে নিলো বেহেদর।

ভৈ আর মেঠের সঙ্গে কথা বলে বেহেদরের কথা যা জানলো সনাতন হাতি—তা অনেকটা এরকম ঃ ওর রোজকার খাবার পাঁচসের চিনি, আধসের ঘি। এছাড়া লঙ্কা, গোলমরিচ, চাল তো আছেই। বেহেদরটির স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর। একবাব যা দেখে তা বিশ বছরেও ভোলে না। এমনিতে খুব ফুর্তিবাজ। একবার শরাব খাইয়ে দেবার পর সারাদিন একা একা নেচেছিল। এই জাতের হাতির বাচ্চা পয়দা হয় সাধারণত বর্ষার মুখে।

হঠাৎ হাতিগুলো একই সঙ্গে বেশ উসখুস করতে লাগলো। শাহজাদা খুর্রম কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। বেশ খানিকক্ষণ পরে পাহাড়তলি থেকে সুন্দর বাজনা উঠে আসতে লাগলো ওপরে।

চারদিক অন্ধকার করে আসা এই বৃষ্টির ভেতর—এই নিরাশার ভেতর কে অমন সুন্দর বাজনা বাজিয়ে—জুলুস বের করে ওপরে উঠে আসছে? কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না শাহজাদা খুর্রম।

॥ তেইশ ॥

সানাই আর পম্নবের সুন্দর যুগলবন্দী নিচের পাহাড়ি পথ থেকে ওপরের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল। সাতানা পাহাড়ের বিশাল গুহার ভেতর মশালের আলোয় সে বাজনা কানে যেতে হাতিরা পর্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো।

শাহাজাদা খুর্রম কিছু অবাক হলেন। এমন বাজনা বাজিয়ে কে বা কারা পাহাড়ি পথ ধরে ওপরে উঠে আসছে? এখানকারই কোনো পাহাড়ি বুনো রাজা? তাই বা কী করে হয়? বুনো রাজার জুলুসে তো সানাই বাজবে না। তবে কি হিন্দুদের কোনো ব্রতের দিন আজ? তাও তো না।

তাহলে?

ভারি সুন্দর সুরেলা গৎ। শুনলে দোলা লাগে ভেতরে। ভাটের দল গাইতে বাজাতে বেরিয়ে পড়েনি তো? তাই বা হয় কী করে? ওয়াতন-জায়গীরদারের পোষা জীব ওরা। জায়গীরদার বেরোলে ওরা বেরোবে। না-বেরোলে ওরা বেরোবে না।

বাজাতে বাজাতে মিছিল এবার পাহাড়ি ঘুর পথের মাথায় উঠে শাহজাদা খুর্রমের চোখে স্পষ্ট হলো। বোঝা যায়—পাকা বাজনদারও যেমন আছে—তেমনি আছে লড়াকুর দল। নয়তো অত ঘোড়া কেন? কেনই বা অত ঘোড়সওয়ার? আগ্রার কোনো নতুন চাল নয়তো?

বাদশা-বেগম নূরজাহানের বড় শখ—শাহজাদা খুর্রম আগ্রার দেওয়ানি-খাসে বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীরের মবারকে খোদ হাজির হোক। নইলে তাঁর খায়েশ যে পূর্ণ হয় না! বাদশা-বেগম নূরজাহানের স্বপ্ন—শাহজাদা খুর্রম

খোদ হাজির হয়ে বাদশার হুকুমে বন্দী হয়ে গোয়ালিয়র দুর্গের অন্ধকার কয়েদখানায় পড়ে পড়ে পচুক।

এখানে তেমন ঘোড়সওয়ার নেই। ওরা নিশ্চয় আগ্রার হয়ে আমায় জিন্দা পাকড়াও করতে এসেছে। কিন্তু এতটা পথ এলো কী করে? পথেই তো আসিরগড়ে—নয়তো নাসিরাবাদে আমার ফৌজ ওদের আটকাবে। আটকায়নি কেন? এসব ভেসে রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন শাহজাদা খুর্‌রম। তাঁর স্থির বিশ্বাস হলো—সুন্দর গৎ বাজিয়ে শাহী ফৌজের সাতানা পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠে আসা—রীতিমত বড় রকমের কোনো ছল।

—সনাতন—

—সনাতন হাতি তখন ফিল-ই-জংয়ের আলানসঙ্গী রাজতুম হাতিটিকে তাব নিজের জায়গায় নিয়ে যাচ্ছিল। সে ছুটে এলো, ডাকছেন শাহজাদা?

—এখুনি বেছে বেছে ছ'টা হাতি নিচে ছাড়তে হবে। পারবে? ওই দ্যাখো—

হাতি ছাড়া মানে হাতি লেলিয়ে দেওয়া। ঘি, চিনি, যব, আখ তো ওরা খায়ই। লড়াকু হাতিদের মেজাজ শরিফ রাখতে শাহজাদা খুর্‌রম শরাবের কোনো খামতি রাখেন না। দু'বছরের ওপর পিছু হটতে হটতে নাসিকে এসে ডেরা ডান্ডা ফেলার পর প্রায় শেষ কড়িটি পর্যন্ত কুড়িয়ে বাড়িয়ে নজর পাঠাতে হয়েছে বাদশার মবারকে—রাওয়ালপিণ্ডিতে। এরপর হাতিকে আগ্রাই শরাব খাওয়ানো কঠিন। তাই ওদের এখন দেওয়া হয় পাহাড়ি রর্কাস। সে রর্কাসতে বেশ কিছুক্ষণ ওরা রীতিমত মজিতে থাকে—একেবারে মাতোয়ারা।

সনাতন হাতি তাকিয়ে দেখলো। নানা রঙের পোশাকে একদল বাজনদার একেবারে সামনে—। তাদের পেছনে পেছন ঘোড়সওয়ার। আর দেখা যায় না। মাথার চুল আর গালের দাড়ি একাকার হয়ে গেছে সনাতনের। তাতে আবার জট। সেই জট চুলকে সনতান বললো, মাফ করবেন শাহজাদা। এভাবে হাতি ছাড়া খুব ভুল কাজ হবে—

—কেন? —বলে রাগে রাগে তাকালেন শাহজাদা খুর্‌রম।

—হাতি লড়াইয়ের এক আনমোল মোতি। মন মেজাজ তৈরি নেই—এ অবস্থায় ছাড়লে হাতিই ঘায়েল হবে শাহজাদা—

কী ভাবলেন শাহজাদা। তারপর বললেন, ওরা তো এগিয়ে আসছে। আটকাবে কী করে? ক'জন বা ঘোড়সওয়ার আছে আমাদের এখানে! যা করার এখুনি করতে হবে সনাতন—

—হজরত। আমি মোটে দুটি হাতি নেবো—

—এই যে বললে—হাতি ঘায়েল হতে পারে। মন-মেজাজ তৈরি নেই ওদের—

—হাতি ছাড়া হবে না শাহজাদা। হাতি পাথর কুড়িয়ে গড়িয়ে দেবে নিচে। তাতেই ওরা হটে যাবে। দেখুন কী করি—এখুনি দেখতে পাবেন হজরত।

শাহজাদা খুর্রম দেখলেন, মুহূর্তের ভেতর সনাতন হাতি হাতিদের পিঠের ওপর দিয়ে ফড়িং হয়ে লাফাতে লাফাতে একাই ঘন ঘন পিঠ বদল করে দুটো মাঝারি হাতিকে দল থেকে বের করে আনলো। এনে মোটা গলায় ওদের ভোলাতে গান ধরলো সনাতন। গানের একটা কথাও বুঝতে পারলেন না শাহজাদা। কিন্তু এটা বুঝলেন, গানের ভেতর একটা দোলা আছে। যে দোলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাতি দুটো তাদের শুঁড় ঝুলিয়ে দিয়ে এদিক ওদিক দুলতে লাগলো। সেই দোলার ভেতর বড় বড় পাথর শুঁড়ে জড়িয়ে জড়ো করা—করেই তা এক ধাক্কায় নিচে গড়িয়ে দেওয়া—সবই যেন সনাতন হাতির খেলা মাত্র। হাতি যেন ওর হাতে পোষা মাছি।

ঢালু পাহাড়ি পথ ধরে তখন পাথরের চাঙ্ শব্দ করে গড়াতে শুরু করেছে। সুন্দর গতে বাজানো সানাই, পন্নব, নাকাড়া একই সঙ্গে ঝং করে শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল। সেই সঙ্গে সওয়ারদের চিৎকার। ঘোড়ার পিছু হটা।

সাবাসি দেওয়ার চোখে তাকিয়ে সব দেখছিলেন শাহজাদা খুর্রম। হাতি ঘায়েল হওয়ার ভয় নেই—অথচ হাতিই দুশমনকে ঘায়েল করে দিচ্ছে। এত তাড়াতাড়ি অন্য কোনো রাস্তায় ওদের ওপরে উঠে আসা আটকানো যেতো না।

—ওই দেখুন শাহজাদা। ওই দেখুন—বলতে বলতে সনাতন হাতি দুটোকে থামালো।

খুর্রম মুখ তুলে দেখেন—বিরাট এক সাদা পতাকা তুলে ধরা হয়েছে ওপাশে। তার মানে আর দুশমনি নয়--

জন্য পঁচিশ তিরিশ যা ঘোড়সওয়ার ছিল আশপাশে—তারা সবাই এসে শাহজাদা খুর্রমকে ঘিরে দাঁড়ালো।

ধরা-বৃষ্টির ভেতর এক কচি ঘোড়সওয়ারের হাতে দুশমনি বন্ধ রাখায় পতাকা। তার পেছন পেছন সানাইওয়ালা। তারপর পন্নব বাজিয়ে। নাকাড়াওয়ালা। শেষে ঘোড়সওয়ারদের মাঝখানে যিনি ঘোড়ার পিঠে বসেই শাহজাদাকে সম্ভ্রমের কুর্নিশ জানালেন—তাঁকে দেখেই চিনতে পারলেন খুর্রম।

নিজেই ঘোড়া ছুটিয়ে নেমে এলেন শাহজাদা খুর্রম। আপনি খান-ই-খানান্ ?

ঘোড়া থেকে নেমে মাটিতে দাঁড়ালেন খান-ই-খানান্ মহাবত খাঁ। তারপর কুর্নিশ করে বললেন, শাহজাদা! বাগী শাহজাদা! বেদৌলত শাহজাদা! অনেক দুশমনি হয়েছে আপনার সঙ্গে শাহজাদা খুর্রম।

—ওসব কথা পরে বলবেন খান-ই-খানান্। আগে আপনার আরাম দরকার। কতদূর আগ্রা থেকে আসছেন—

মহাবত খাঁয়ের বয়স হয়েছে। নাগরা ভর্তি হয়ে পায়ের পাতা। দুই পায়েই পাকা চুল দেখা যায়। তামাম হিন্দুস্থান জানে—তিনি একজন বেয়াড়া বাঘ। তাঁকে বাগ মানানো যায় না। পোষ মানানোও যায় না। এমন মানুষ—যাঁর পেছনে বাদশার মর্জিতে লাখো লাখো সেপাই এসে দাঁড়াবে—তিনি কেন

হঠাৎ মধুর গৎ বাজানো বাজনদারদের সামনে নিয়ে সাদা পতাকা উড়িয়ে পাহাড়ি পথ ঠেলে ওপরে উঠে এলেন! আর আমার ফৌজের বাধা এড়িয়ে এতটা এগিয়ে এলেনই বা কী করে? সবই ভোজবাজির মতো লাগছিল শাহজাদা খুর্‌রমের।

—আপনি ভুল করছেন শাহজাদা।

খুর্‌রম ঘুরে তাকালেন। অজান্তে ডান হাত চলে গেল কোমরে। সেখানে ঝুলছে বিরছা কুড়োল। বন্ধু সাজিয়ে মৃত্যুর ফেরেস্তার মতো আজরাইল সমান এত বড় যোদ্ধা মহাবত খাঁকে পাঠাননি তো বাদশা-বেগম? খুর্‌রম মুখে বললেন, কী ভুল?

—শাহজাদা। আমি আর খান-ই-খানান্ নই—

—খান-ই-খানান্ নন? ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

মহাবত খাঁ এগিয়ে এসে খুর্‌রমের দু'খান হাত ধরলেন। আমি আপনার আব্বা হুজুরের জওয়ানি দিওয়ানি দিনের সঙ্গী।

—জানি।

—সেলিম যখন ইলাহাবাদে সুবেদার—

—তখন আপনি তার খান-ই-সামান ছিলেন। জানি—

—কিন্তু আর থাকা গেল না শাহজাদা। আমি আপনার ভাই শাহজাদা পরভেজের আতালিক হয়ে আপনার অনেক খোয়াবে বাদ সেধেছি—

—তাতে কী হয়েছে? শাহজাদারও কিছু খোয়াব—খোয়াবই থেকে যায়।

—জানেন নিশ্চয়—শাহজাদা পরভেজ আর নেই।

—নেই?

—হ্যা। শেষে তাঁর আতালিক ছিলেন খানজাহান লোদি। তিনিই বা কী করবেন! বাদশা-বেগম নুরজাহানের ইচ্ছেয় মনসবি বেড়ে চল্লিশ হাজার সওয়ার-ও হলো—আর অমনি ইজফা পেয়ে পেয়ে বেসামাল শাহজাদা পরভেজের আফিম দোগুণী—ভাং চৌগুণী হয়ে গেল— !

দু'জনই খানিকক্ষণ চুপচাপ। ওদের দু'জনের দিকে দু'তরফের ঘোড়সওয়াররা চোখের পলক না-ফেলে তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে আছে বাজনদারের দল। যেন চোখের ইশারা পেলেই আবার এখুনি সানাই, পন্নব, নাকাড়া, ঢোল—সব একসঙ্গে বেজে উঠল। আকাশ বুঝি কিছুটা ধরলো।

—আপনি এখন কোত্থেকে আসছেন? আগ্রা থেকে? আগ্রার খবর কী?

মহাবত খাঁ শাহজাদা খুর'মের দু'খানি হাত ধরলেন। শাহজাদা, আমি এখন আপনার ছায়ায় থাকতে চাই—

—ঠিক বুঝলাম না—

—আমি আগ্রায় থাকি না অনেকদিন শাহজাদা। আপনাকে তাড়া করে ফিরেছি দক্ষিণে। আবার দক্ষিণ থেকে পুবে। আবার দক্ষিণে। ওকথা থাক! এখন আগ্রা থেকে আসছিও না—

—তবে? কোত্থেকে আসছেন?

—পেশাওয়ার শাহজাদা।

—পেশাওয়ার ?

—হ্যাঁ শাহজাদা। পেশাওয়ার। আজ আমিও আপনারই মতো বাগী ! বেদৌলত ! বাদশা-বেগম নূরজাহানের মোহর-খোর পাঠান চরের দল আমার জন্যে পেশাওয়ারে ওত পেতে বসে ছিল। আমি কিছুই জানতাম না। বাদশা জাহাঙ্গীরের হুকুমে কাবুল রওনা দিলাম। পথে পেশাওয়ার গেছি। সেখানে দেখি এই অবস্থা। ওরা আমায় লাহোর অব্দি তাড়া করে এলো। তখনই ঠিক করেছি—আমি আপনার সঙ্গে হাত মেলাবো। আমার দুশমনের দুশমন—আমার দোস্ত। আপনি কি আমায় নেবেন শাহজাদা ?

—ওসব কথা পরে হবে। এখন আপনার আরাম দরকার। এই বাজনদারদের কোথায় পেলেন ?

—গিরনা নদী পেরোবার সময় দেখি এক শাদির বরাত যাচ্ছে—সঙ্গে ভারি সুন্দর বাজিয়ের এই দল। ভাবলাম—যাচ্ছি শাহজাদা খুর্রমের মবারকে। তার সঙ্গে দুশমনিই করে এসেছি এতকাল। এবার তার সঙ্গে দেখা হবে সানাইয়ের গতে— !

শাহজাদা খুর্রম মনে মনে তারিফ দিলেন লড়াকু মহাবত খাঁকে। এই হলো গিয়ে মহাবত খাঁ। দুশমনির সময় শের। অন্য সময় দিলখোলা, জাঁহাবাজ—আবার আপন ভোলাও বটে। মন বলেছে—অমনি শাদির বরাতের বাজনদারদের বেবাককে ধরে আনা !

শাহজাদা জানতে চাইলেন, আগ্রার খবর কী ?

—বাদশা-বেগম নূরজাহান হিন্দুস্থানের মসনদে বসাতে চান শাহজাদা শারিয়ারকে—

—তাই নাকি ! আর তাঁর ভাই উজিরে আজম আসফ খাঁ কী চাইছেন ?

—তিনি আপনার শ্বশুরও বটে ! মনে মনে তিনি কী চান তা আপনিই ভালো বুঝবেন ! তবে বাইরে তিনি যা বলছেন—তা হলো ঃ আমি ইনসাফির পক্ষে। আমি ন্যায়ের দিকে। শাহজাদা খসরুর বড় ছেলে দাওয়ার বকস্ হিন্দুস্থানের ভাবী বাদশা—

শাহজাদা খুর্রম ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলেন। কেন কাঁপলেন—তা তিনি জানেন না। চোখ তুলে দেখলেন—দাড়ি গোঁফের ভেতর দিয়ে সনাতন হাতি মুঘল শাহীর পয়লা সারির মনসবদার মহাবত খাঁকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।

•

আশমানে অনেক তসবিরই ফুটিয়ে তোলে মেঘ, আলো আর ছায়া। কিন্তু কোনো ছবিই পাকা নয়। আলো, ছায়া, মেঘ—সব সময় জায়গা বদলাচ্ছে। ইনসানের ভাব-ভালোবাসা, রাগ-ঘেন্না-নফরতিও বদলে বদলে যাচ্ছে। যমুনায় এখন আগ্রার আশমানের নীল ছায়া। ডুব দেবার আগে মীনাক্ষীর খচ করে মনে পড়লো—বছরের এই সময়টায় ব্রহ্মপুত্রের দু'পাড় ধরে কাশের পালক নুয়ে

পড়ে বাতাসের সঙ্গে। শীত আসার আগে আগে হলদে কুটুম পাখি নামে ঝোপে। তখনই ওদের মুখে শোনা যায়—খোকা হোক! খুকি হোক!

হায়রে! আমার খোকা খুকি কোথায় গেল। কোথায় গেল বিষ্ণু? কোথায় গেল লক্ষ্মী?

এমন সময় মীর সফির লম্বা ছায়া পড়লো জলে। তা দেখেই ভুস করে ডুব দিলো মীনাক্ষী।

চরের বালির ঢিবিতে পা ডুবিয়ে দাঁড়ানো সফি চেঁচিয়ে উঠলো, সকাল সকাল বেরোবে বলে নিজে চান করতে নামলে এখন?

—এই তো হয়ে গেল।—বলে তাড়াতাড়ি উঠে এলো মীনাক্ষী। জায়গাটায় জল কম। গভীরও নয়। তবে একটু পা হড়কালেই ঘূর্ণি টানে পড়ে যাওয়ার ভয়। এদিক থেকেই যমুনা চওড়া হয়ে ফতেপুর-সিক্রির দিকে বাঁক নিয়েছে।

কুয়াশা ছিঁড়ে ছিঁড়ে চর জায়গায় ভোরের রোদ উঠছিল। তার ভেতর একটু পরে মাথা মুছে ঝুপড়ি থেকে যখন মীনাক্ষী বেরিয়ে এলো—তখন তাকে দেখে বেশ অবাক হলো সফি। বললো, এই না তুমি মন্দিরে যাচ্ছিলে—তা—?

—কোথায়? বলেছি আমি—মন্দিরে যাবো?

—বলোনি। কিন্তু যেদিন ভোর ভোর চান করো সেদিনই তো আমি যোধাবাঈ ঘাট অব্দি দিয়ে আসি তোমায়! সেখান থেকে দিব্যি পায়দলে রাধারানীর মন্দিরে চলে যাও। আমি যোধাবাঈয়ে বসে থেকে থেকে তোমার হয়ে গেলে তোমায় নিয়ে ফিরি—। আজ না পরেছো শাড়ি—না দিয়েছো সিঁদুর কপালে—এই শালোয়ার কামিজে নিশ্চয় মন্দির যাচ্ছো না—

—নাঃ! যাচ্ছি না—

—তাহলে? তাহলে এই সাতসকালে চানটান সেরে কোথায় চললে?

—একটা নতুন জায়গায় যাবো—

—কোথায়?

—তুমি তো সঙ্গে থাকছো। দ্যাখোই না কোথায় যাই—

সফি এই ক'বছরে মীনাক্ষীর ধাত ভালো রকম বুঝে গেছে। তার চেয়ে দু'চার বছরের বড় এই জেনানা—কখনো এতই নরম সরম লাজুক—যে ভয় হয়—এই বুঝি ভেঙে গেল—কিংবা লজ্জায় মুছে গেল বুঝি। আবার কখনো মনে হয়—এত জেদ—এত তেজ নিয়ে একজন আওরতের সংসার করতে নামা উচিত নয়।

যমুনার ভাঙা পাড় ধরে দু'জন খানিকক্ষণ ধরে হেঁটে তে-বটতলার েখানটায় জলের কিনারায় বটের ঝুরি ধরে একদম ওপরে উঠে এলো। প্রথমে মীর সফি উঠলো। তারপর হাত বাড়িয়ে মীনাক্ষীকে সে ওপরে তুলে নিলো। নিচে শান্ত ঘুমন্ত যমুনা। কয়েক হাত ওপরে বাঁধানো রাস্তা, দোকান-পাট, শানদার হাভেলি, হরেক কিসিমের ব্যাপারি, খদ্দের, সাজানো হাতির মিছিল, মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টা, মসজিদ থেকে আজানের ডাক—সব মিলিয়ে আগ্রা

শুধুই হিন্দুস্থানের রাজধানী নয়—আগ্রা হলো গিয়ে জীবন্ত, ফুটন্ত এক জীবন।

সেই জীবনে এ-বছর যোগ হয়েছে সমরখন্দ থেকে আসা অঢেল শুকনো পিচ্, খোবানি, বাবাসেতির মতো ফল, হিরাটের তাজা দুম্বা, বল্ক-এর পাহাড়ি গাইয়ের চামড়ার তৈরি কাম্বাদার তাঁর ইস্পাহানের ঝুমুরওয়ালি নাচনেওয়ালি। আসবে না কেন? হিন্দুস্থানের বাতাসে তো মোহর-আশরফি ভাসে—

এর ভেতর মীনাক্ষী লম্বা পায়ে হেঁটে চলেছে আগে আগে—যেন গজনির কোনো আমীরের মেয়ে বেরিয়েছে—শালোয়ার-কামিজে টানটান চলা—কোমরের খাঁজ-এ পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে চোখ ভোলানো এক আশ্চর্য টুকরো দুলুনি। এখনো মীনাক্ষী বলেনি—সে এই সাতসকালে কোথায় যাচ্ছে।

পায়ে হেঁটে হেঁটে রাজধানী আগ্রার অনেকটাই এখন ওদের দু'জনের বেশ চেনা। যেমন চেনা হয়ে গিয়েছিল একসময়—কনৌজ—গঙ্গার গায়ে গায়ে কিছু শহর গঞ্জ জায়গা—যেখানে নসিবের খোঁচায় এই ক'বছর ওদের দুজনকে ঘুরতে হয়েছে।

—এ তো বড়ে মসজিদের রাস্তা—কোথায় যাবে মীনা বাঈ?

—যেখানে গিয়ে থামবো—দেখতেই পাবে।

মীর সফি দেখছিল—আজ জুম্মা বার—রাস্তার দু'ধারে ভালো ভালো হাভেলির সামনে মিশকিনরা এর ভেতরেই এসে বসে গেছে। আজ খয়রাত পাবার দিন।

খর খর হেঁটে মীনাক্ষী বড় মসজিদ পেরিয়ে গেল। তখনো সফি আন্দাজ করতে পারছিল না—কোথায় যাবে মীনাক্ষী। কোথায় যাচ্ছে মীনাক্ষী। বড়ে মসজিদের পর এদিকটায় আগ্রা নিজেকে মুছতে মুছতে একদম দেহাতে গিয়ে মিশে গেছে।

গুলমোহরের হলুদ পাপড়ি আর রেণু খসে খসে পড়ে ঘাস প্রায় ঢেকে ফেলেছে। সেখানেই ডান হাতে মস্ত এক হাভেলি। ভেতরে গাছপালায় ঢাকা সুন্দর ঘর বারান্দা—তাতে বড় বড় জানলা—জানলায় জানলায় পর্দা—বেনে ঘাসের ঢাকা চাপা—যা কিনা গরমে বাতাসের হলকা আটকায়।

মীনাক্ষী থামলো। তাকে থামতে দেখে মীর সফি অবাকই হলো। এখানে? কোথায় যাবে?

মীনাক্ষী কোনো কথা না বলে একটু পেছন ফিরে কোমরে গোঁজা খেরিয়া থলেটা বের করলো। তারপর থলে থেকে কয়েকটা আশরফি বের করে গুনতে শুরু করলো।

—কী হচ্ছে মীনা? কোথায় যাবে?

গুলমোহরের হলুদ পাপড়ি ঢাকা ঘাসজমির সামনে হাভেলিটা হাতের আঙুলে দেখিয়ে দিয়ে মুখে মুখে আশরফি গুনতে লাগলো মীনাক্ষী।

—ওটা তো আবদুল হক দেহেলভির হাভেলি—ওখানে কী দরকার তোমার?

হাসি হাসি মুখ করে মীনাক্ষী মনে মনে আশরফি গোনা না থামিয়ে বললো, সব তোমায় বলতে হবে ?

—হ্যাঁ। বলতে হবে। তুমি আমার বিবি। তোমার ভালো-মন্দ—বিপদ আপদ—সব কিছুই আমাকে দেখতে হয়—

—তাই বুঝি ! বলেই মীনাক্ষী বেশ সুরেলা গলায় বলে উঠলো—

লা এলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ—

—কী ব্যাপার ? —বেশ অবাকই হয় সফি।

—কোনো ব্যাপারই নয়। শুনে শুনে মুখস্ত হয়ে গেছে। ভারি সুন্দর সুর। মানেটা জেনে আরও ভালো লাগলো। আল্লা এক। তিনি ছাড়া আর কাউকে পুজো করার নেই। মোহাম্মদ তাঁর পাঠানো দূত—

—এত সব শিখলে কখন ? —বলতে বলতে এই জেদি জেনানার নতুন জেদ দেখে মায়ায়—ভালোবাসায় হেসে ফেললো সফি।

—এত দুঃখ কষ্টের ভেতর ফেরেস্তা মিকাইল আমাদের রুটি দিয়েছেন। পানি দিয়েছেন।

ভীষণ অবাক হয় সফি। ফেরেস্তাও জানো তুমি ?

—বাঃ ! জানবো না ? ফেরেস্তা তো আমাদের দেবতার মতোই। রামায়ণ-মহাভারতে অনেক আছেন ! যমের মতোই ফেরেস্তা আজরাইল জীবন নেন—বলতে বলতে মীনাক্ষীর মুখে কী এক বিশ্বাসের আলো ফুটে উঠলো। সে সুর করেই বললো, বিসমিল্লাহ রহমানে রহিম—

এবার মীর সফি ঘাবড়ে গেল। সে মীনাক্ষীর ডান হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি দিলো—কী হচ্ছে মীনা বাঈ ? কী হয়েছে তোমার ?

রাস্তা দিয়ে যারা এসে আবদুল হক দেহেলভির সামনে জড়ো হচ্ছিল—তাদের অনেকেই কিছু অবাক হয়ে ওদের দু'জনকে দেখছিল।

—কিছু হয়নি তো। আমি তোমার ধর্ম নেবো সফি—

—আমার ধর্ম ? ওঃ। —বলে হেসে ফেললো সফি। সে তো তুমি নিয়েই বসে আছো মীনা বাঈ ! আমায় কি ভালবাসো না তুমি ! সেটাই তো আমার ধর্ম মীনা—

—ওরকম নয়। আমি হিন্দু মেয়ে। আমার স্বামীর ধর্মই আমার ধর্ম। এখন এই হাভেলিতে যাবো। চান সেরে এসেছি—

—কেন ? কী হলো মীনা বাঈ !

—আমি কলমা পড়ে আজ মুসলমান হবো। তোমার ধর্মই আমার ধর্ম। সেজন্যেই আজ এখানে এসেছি—

হঠাৎ সফির মুখখানা পাথুরে হয়ে উঠলো। সে ভীষণ শক্ত করে মীনাক্ষীর ডান হাতখানা ধরলো। কী জন্যে তুমি এসেছো জানি মীনা বাঈ !

—কী জন্যে ?

—আখেরে কিছু গুছিয়ে নেবার ইচ্ছে হয়েছে—তাই ! কার ভালো লাগে শীতে রোদে, ঝড়ে জলে বেলি চামেলি ফোটাতে ? তাই নয়া মুসলমান হয়ে

দেওয়ানখানায় গিয়ে লাভের কাজ পাওয়া—ঘরে শুয়ে শুয়ে শাহী মেজরগলের আশরফিতে পায়ের ওপর পা তুলে দিন কাটানোর মতলব ? নয়া মুসলমান হয়ে মদত-ই-মায়েশে জমি চাও মুফতে। তাই না মীনা বাঈ ?

—ছি ! ছি ! সফি—তোমার মনটা বড় নিচু। আগ্রার কাছে আমি কোনোদিন কিছু চাই না। আমি চাই তোমার বিবি হিসেবে তোমারই ধর্ম নিতে—তোমার ভেতরে আরও মিশে যেতে—বলতে বলতে হু হু করে কেঁদে ফেললো মীনাক্ষী। সেই দশাতেই সে বলতে থাকলো, এক সময় আরেকজনের বউ ছিলাম আমি। তার ছেলেমেয়ের মা আমি। তার মুখখানা ভেসে উঠলে পাছে সেদিকে ভেসে যাই আবার—

—সনাতনকে দেখেছো নাকি ? দেখতে পেলে ?

হ্যাঁ বা না—কিছুই বললো না মীনাক্ষী। শুধু বললো, তাই আমি তোমায় শক্ত করে ধরতে চাই—

মীর সফি আর কিছু বলতে দিলো না মীনাক্ষীকে। একটা টাঙা যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। সেটাকে থামিয়ে মীনাক্ষীকে তুললো। তুলে পাশে বসলো। বিনে পয়সার তামাশা দেখতে লোক জমে যাচ্ছিল। মীনাক্ষীর পাশে বসে পরিষ্কার গলায় বললো, তুমি তো সত্যিই সনাতনের। আমি কে !

মীনাক্ষী চোখের জল মুছলো না। আড়াল আবডালের কথাও ভুলে গেল। সে ভীষণ জোরে সফির ডান হাতখানা নিজের দুই হাতে জড়িয়ে নিতে গেল। টাঙার পেছনে বসা এই আজব মিঞা-বিবিকে আগ্রা চোখ ভরে দেখতে লাগলো। বড়ে মসজিদ পেরিয়েই টাঙা ধাঁ করে বাঁক নিলো।

সফি তখন বিড়বিড় করে বলছিল, সারা হিন্দুস্থানে মুসলমান না বানিয়ে দেহেলভি সাহেব থামবেন না দেখছি ! যত্তো সব ! দেওয়ানখানাও হয়েছে তেমনি—

দুনিয়ার মজাটাই এমনি যে—কোনো কিছুই থেমে থাকে না। পোকায় কাটা বেগুন যেমন ভেতরে ভেতরে কুরে গিয়ে ক্ষয় হতেই থাকে—ভোরের আলোয় দুপুর দুপুর ছায়া মিশতেই থাকে—বয়স মেহেন্দি লাগানো হাতের আঙুলের ডগার মতোই লালচে-হলুদ হতেই থাকে—তেমনি গাছের ফল, গলার গান, ঠোঁটের হাসিও পাকতেই থাকে।

গওহর বাই চারপাইতে বসে রানাদিলের নাচের রেলা দেখছিলেন। দুটো শীত যেতে না যেতেই এতটুকু মেয়েটা কী কাজই না তুলেছে পায়ে। বাতে অসাড় নিজের পায়ের ওপর চড় মেরে তাল রাখছিলেন গওহর। মেঝের বনাতে ঘুঙুর পরা ছোট্ট পা সরে সরে যাচ্ছিল রানাদিলের। তবু কোনো ভুল নেই। তারিফের ভঙ্গিতে রানাদিলের মুখে তাকিয়ে গওহর বাই হাতে তাল রাখছিলেন।

—হ্যাঁরে রানা ! তোর পায়ে যে লখনউ গড়াগড়ি দিচ্ছে—চোখে জয়পুর !

ছ'সাত বছরের রানাদিল নানিজানের একথায় গর্বে, আনন্দে, রীতিমত

ডগমগ হয়ে নাচতে লাগলো দুলে দুলে। এইটুকু বয়সে বার বার শুনে একথা তার জানা—তার এই কথক নাচে পায়ের যা-কিছু কাজ—তা লখনউয়ে শেখানো হয়—আর চোখ মুখের ভাওয়ের যা-কিছু ঢং সবই জয়পুরের।

নাচের ভেতর রানাদিল কী এক ভয়ঙ্কর আনন্দ পায় তা সে বুঝিয়ে বলতে পারে না। তার ছোট্ট বুক, ছোট্ট শরীরটা নাচের তালে সাপের ফণা হয়ে দুলতে থাকে।

গওহর বাই মনে মনে হিসেব কষছিলেন। আর বছর দশেক বাদে এ মেয়ে নিয়ে তো গোলাগুলি চলবে। চাই কি শাহী ঘরানায় কোনো সুলতান কি শাহজাদা যদি আশিক হয়ে দাঁড়ায় তো কথাই নেই। তলোয়ারের ঝনঝনানি শুরু হয়ে যাবে। খুবসুরতিই না মেয়েটার বিপদ ডেকে আনে!

রানাদিলের এই দরবারি নাচের পাশে এখনকার এক নতুন ওঠা নাচের তুলনা টেনে দেখছিলেন গওহর। আহমদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা আগ্রার তাঁবে আসার পর থেকে নর্মদার ওপারের মন্দির ঘেঁষা নাচ—তার সঙ্গের তালগোল পাকানো ভাও—চোখের কাজ, ঢোলের বোল আগ্রায় জায়গা পাওয়ার চেষ্টা করে আসছে। ও নাচ গওহরের দু'চক্ষের বিষ। লখনউ, জয়পুর, কনৌজ, ফতেপুরের দিককার এই কথককে কোণঠাসা করতেই যেন নর্মদা পেরিয়ে ওই নাচের আগ্রায় এসে ঢোকা।

বেনারসি ঠুংরির চৈতি ঝনাতকার যেন পায়ের পাঁয়জোরে ঘুরে ঘুরে বেজে যাচ্ছিল রানাদিলের। এক একটা মোচড় দেয় বাঁয়ে—আর নানিজানের মুখে ফিরে তাকায় রানাদিল।

নাচের ঘূর্ণীতে একটা মাত্রা কোথায় পড়ে যেতে গওহর বাইয়ের কানে তাল কেটে গেল। অমনি তিনি হাতের কাছের ছিপটিখানা ছুঁড়ে মারলেন।

ছিপটি যে অমন করে দু'পায়ের ফাঁকে পড়ে জড়িয়ে যাবে—তা ভাবতে পারেননি গওহর বাই। রানাদিল উল্টে পড়তে পড়তে সামলে নিলো। যদি পড়ে যেতাম নানিজান—

—নাচতে শিখেই খুব ঢং শিখেছিস—

—কী?—বলে অবুঝ কান্নায় ভেঙে পড়লো রানাদিল। অভিমানেরও একটা রাগ থাকে। সেই রাগে দুম দুম করে পা ফেলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল রানাদিল।

গওহর তখন ডাকছেন, ওরে রানা আয়। আমি বুঝিনি। আর কখনো তোকে বকবো না—আমি কি উঠতে পারি—কোথায় গেলি?

আর কোথায়! রানাদিল রাজা-কি-মাণ্ডির এই দোতলা থেকে সিধে গিয়ে সকালবেলার আগ্রার রাস্তায় পড়লো। শীতের গোড়ায় এখন নানারকমের পশম নানান লোকের গায়ে। নানান রঙের। সেই রঙিন ভিড় রানাদিলকে ভাসিয়ে নিয়ে গলির বাইরে সদর রাস্তায় বেরিয়ে গেল। রানা কাঁদতে কাঁদতে অভিমানে এসে ভিড়ের ভেতর পড়েছিল। এখন সে হারিয়ে যাবার ভয়ে কেঁদে ককিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, নানিজান—ও নানিজান—

আশপাশে শ'খানেকের মতো এই ছোট ছোট মেয়ে যেন খেলতে নেমেছে। তাই মনে হয় দেখলে। তবে ভুল ভাঙে জনা সাত আট মরদ আর চার পাঁচ জনের মতো জেনানাকে দেখে। ওদের কারও হাতে ছিপটি—কেউ বা এই বাচ্চা মেয়েদের কানাতে কানাতে দাঁড়িয়ে রীতিমত পাহারা বজায় করে চলেছে। আবার ওরই ভেতর কেউ কেউ গোনাগুনতি করে মেয়েগুলো মিলিয়ে নিচ্ছিল।

ঠিক এমন সময় ভিড়ের ভেতর রে রে পড়ে গেল। একজন জেনানা তো চার পাঁচটি মেয়েকে নিয়ে পেছন দিককার নয়নজুলিতে নেমে গেল।

আগ্রার দিক থেকে ঘোড়ার ক্ষুরে খটাখট তুলে কয়েকজন ঘোড়সওয়ার দেখতে দেখতে এসে পড়লো। এক জেনানা তো কয়েকটা মেয়েকে নিয়ে একটা বড় গাছের গুঁড়ির নিচে ভাঙা মাটির ঢালে চলে যেতে যেতে বললো, ইস্! গাড়িগুলো যদি এসে যেতো—এখন? এখন কী হবে?

রানাদিল অবাক হয়ে দেখলো, তাকে দেখার কেউ নেই আশপাশে। সে অমনি বর্ষার জল বয়ে যাওয়ার একটা শুকনো গভীর নালায় নেমে পড়লো। নেমে দেখলো—তার আগেই ওখানে চার পাঁচটা মেয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। একজনের বাঁ পায়ের হাঁটু কেটে রক্ত পড়ছে। ওদের পাশে একজন জেনানা। রীতিমত চেঁচিয়ে সে ওদের বললো, চুপ করে পড়ে থাক্। নইলে দেওয়ানজি এসে নিয়ে যাবে তোদের—

এরকম ব্যাপার রানাদিল কোনোদিন দেখেনি। নালার ভেতর শুকনো পাথরে গাল পেতে পরপর মেয়ে ক'টা শুয়ে পড়ে আছে। ওরই ভেতর সেই জেনানা একখানা পা উদোম করে এগিয়ে দিলো সামনের দিকে। অমনি একটি মেয়ে শুয়ে শুয়েই সেই পা টিপতে লাগলো। বোধহয় নানিজানের মতোই ব্যথা হয় পায়ে। কোনো সময়ে গওহর বাইয়ের হাত-পা অল্পস্বল্প টিপে দিয়েছে রানাদিল।

এই নালাটা কত বড় কে জানে! মাথার ওপরটা দু'ধারের ঘাসে-বনফুলে ঢাকা পড়েছে। ভেতরটা শান্ত। ঠাণ্ডা। তার ভেতর কাঁদতে কাঁদতে পথ করে এগোতে লাগলো রানাদিল। নানিজান—তুমি কোথায়?

ওপরে তখন ঘোড়ার পিঠে বসে একটা লোক হাসিতে ফেটে পড়ছিল। তার হাসি খোলা মাঠেও শক্ত জিনিসের মতোই গড়িয়ে যাচ্ছিল। তোরা তাহলে এই দেওয়ান রাজারামকে বোকা বানাতে চাস? দিব্যি মুসাফিরি ঢং-এ রাজধানী আগ্রা পেরিয়ে এলি—

সেই লোকটা—যে-কিনা রানাদিলকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিয়েছিল ফের সে বললো, না হুজুর। একদম না। আপনার মতো মগজদার ইনসান শাহী হুকুমতে ক'জন আছেন?

—চুপ কর হারামজাদা। তুই বলতে চাস—এদের সবাইকে কিনেছিস শাহী ডাক থেকে!

—হ্যাঁ হুজুর—আগ্রার বাইরে—

—সাকেতে ফৌজি ছাউনি থেকে তো! সেখানে শাহী গোলাম-বাঁদির

মাণ্ডি থেকে—তাই বলবি তো ?

—ঠিক ধরেছেন হুজুর—সাকেতের ফৌজি মাণ্ডি থেকে—

—চুপ কর। যমুনার এপারে তুই বনমালী। লাহোর ছাড়িয়ে বিতস্তায় পৌঁছে গেলে এই তুই-ই হয়ে যাবি রুস্তম। তা এবার নিয়ে কতবার ধরা পড়লি আমার হাতে ?

—ইয়াদ নেই হুজুর।

—পিঠে কোড়া পড়লে সব মনে পড়ে যাবে। ফৌজি মাণ্ডিতে শুধুই মেয়ে বাঁদি কিনতে পেলি ! একটাও ছেলে পেলি না যে গোলাম করে বেচবি !

—মাণ্ডিতে না এলে কী করবো হুজুর ! পছন্দ মতো নিজেরা তো গড়িয়ে নিতে পারিনে।

—চুপ কর মিথ্যেবাদী। এর একটা মেয়েও কোনো মাণ্ডি থেকে কিনিসনি তুই।

—শাহী ডাক থেকে কেনা হুজুর—

—মেরে মুখ ভেঙে দেবো রুস্তম। ভালো করেই জানিস—সেই কবে আকবর বাদশা হুকুম দিয়ে গেছেন—শাহী হুকুমত—শাহী ডাক ছাড়া কেউ কোথাও কোনো ইনসানকে কিনতে বা বেচতে পারবে না। আকবর শাহীর পর জাহাঙ্গীর শাহীতেও সেই একই নিয়ম চলে আসছে।

—ওই মেয়েগুলোকেই পুছতাছ্ করে দেখুন না হুজুর। ওদের কাউকে তো জোর করে ধরে আনিনি। ওদের খেতে পরতে দিতে না পেরে ওদের বাবা মা-ই ওদের বেচে দিলো। আমরা না কিনলে অন্য কেউ কিনতো।

—তাই তুমি আর তোমার সাকরেদরা তামাম হিন্দুস্থান ঝেঁটিয়ে শুধু কচি কচি মেয়ে কিনে বেড়াচ্ছো। খেতে-পরতে না পাওয়া সব মেয়ে ! তাই কি না ?

হ্যাঁ বলতে গিয়েও থেমে গেল রুস্তম। এই দেওয়ান রাজারাম তার মুখের গ্রাস গলায় ঠাণ্ডা ঢুকিয়ে এখন বের করে নেবে। যেসব গাড়ি এসে মেয়ে-গুলোকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়তো—তাদের না আসাতেই এত বড় একটা বিপত্তি ঘটে যাচ্ছে। মহাজনরা গাড়ি পাঠাতে দেরি করলো কেন ?

—আগে আগ্রায় চলো বনমালী। সেখানে কোতোয়ালিতে আগে ঠিক হোক্—তুমি বনমালী ? না, রুস্তম !

—যা করার আপনি করুন হুজুর। কোতোয়ালিতে ঢোকাবেন না। ওরা পেলে আমায় মেরে ফেলবে হুজুর।

দেওয়ান রাজারামের চোখের ইশারায় তার ঘোড়সওয়াররা পলকে সারা মাঠে ছড়িয়ে পড়লো। আর এক একটা নিচু—নাবি জায়গা থেকে তারা এক এক জন করে জেনানাকে তুলে আনতে লাগলো। সবার সঙ্গেই দু'চারটি করে মেয়ে। ভয় পাওয়া—ধুলো মাথা—মুখে কারও কোনো হাসি নেই। যেকোনো একটু শব্দে ওদের চোখও কেঁপে উঠছিল।

—ছিঃ ! মেরে ফেলবে কেন ?

রুস্তম ছুটে এসে দেওয়ান রাজারামের ঘোড়ার সামনের দুই পায়ের মুখোমুখি দাঁড়ালো। পারলে সে ঘোড়ার ওই দুই পা-ই জড়িয়ে ধরে। হুজুর আগ্রা গিয়ে কাজ কী! আপনিই এখানে একটা বিচার করে দিন—

দিব্যি আগ্রা পেরিয়ে উত্তরে যাচ্ছিলে! আজ না ধরলে আর ধরাই হতো না তোমাকে—

এসবের কিছুই জানতে পেল না রানাদিল। সে শুকনো নালা ধরে হাঁটতে হাঁটতে একসময় ওপরে উঠে এলো। পরিষ্কার আলোয় মাজা আকাশ। রানাদিলের সামনেই আগ্রা। পেছনে অনেক দূরে মাঠ নেই। সে চোখের জল না মুছেই রাজধানীতে ঢুকলো।

॥ চব্বিশ ॥

ইয়েক—দো—সে—চহর—

এইভাবে জোরে জোরে চেঁচিয়ে বলছিল তোপখানার সেপাই বিষণ। নির্মেদ আরবি ঘোড়া যেন ছেলেটা। দাঁড়িয়ে আছে—একদম তুর্কি সমশের। বাঁকিয়ে এক কোপ দিলেই সমশেরের দু'পাশে দু'ভাগ হ'য় পড়ে যাবে দুশমন।

নূর-ই-ফিলের পিঠে গাদেলার ভেতর দাঁড়িয়ে দূরে বিষণকে দেখে তাই মনে হলো জাহাঙ্গীর বাদশার। শীতের দুপুরে পড়তি নরম রোদের ভেতর বিষণ তখন হেঁকে উঠলো—

পানজি—

আরও পাঁচঘর গুনে দহ-তে পেঁছিলে সামনে বসানো তোপ থেকে গোলা ছুটে যাবে খাদের ওপারের পাহাড়ে। সেসব পাহাড় এখান থেকে ধোঁয়াটে। বাদশা ওদের নাম জানেন। সুগনা, পাণ্ডু, তিলপত্র, থল-চোটিয়াল।

বিষণের গুনতির সঙ্গে সঙ্গে বাকি সেপাইরা এক এক জন এক একটা কাজ করে যাচ্ছিল। গোলা তুলে নিয়ে গিয়ে নলের গোড়ায় ভরে দেওয়া। পলতে ধরানোর চকমকি তৈরি রাখা। এই সব আর কি!

শীতের মুখে মুখে চারদিক শান্ত। স্থির। এখনই তিলপত্র পাহাড়ের চুড়োর কাছাকাছি বরফ জমে সাদা হাঁসুলি হয়ে আছে। রোদের ভেতরকার চোরা শীতে রাওয়ালপিণ্ডি দুর্গের পাথরও কুঁকড়ে মুচড়ে বুঝি বা হলুদ পারা।

বিষণ যে-ই চেঁচিয়ে উঠলো—দহ—

অমনি একটা গোলা সাঁই করে খাদের বুকের ওপর দিয়ে তিলপত্র পাহাড়ের দিকে ছুটে গেল। সেদিকে তাকিয়ে বাদশা জাহাঙ্গীর ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না—গোলাটা কোথায় পড়লো। কারণ, দূরে পাহাড়ের গায়ে গাছপালার মাথা ধোঁয়া ধোঁয়া। যেখানে গাছ নেই—পাহাড়ের গা সেখানটায় লালচে—দগদগে। তবে কি ওখানে গিয়ে গোলাটা পড়লো?

একথা জানতে চাইবেন বলে বাদশা জাহাঙ্গীর মীর আতশ মানুচ্চিকে চোখে খুঁজতে নিচে তাকাতেই অবাক হলেন।

কোথায় মানুচ্চি! তার বদলে বাদশার নূর-ই-ফিলের মতো বিশাল উঁচু এই শেরগির হাতির শুঁড়ের কয়েক হাতের ভেতর কে এক বে-আদব দাঁড়িয়ে। হাতির পিঠে যে হিন্দুস্থানের খোদ বাদশা দাঁড়িয়ে—সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। বরং যেন বেশ তেরিয়া হয়েই দাঁড়ানোর ভঙ্গি।

নূর-ই-ফিলের পিঠে দাঁড়ানো বাদশা জাহাঙ্গীর রীতিমত বিরক্ত হয়েই জানতে চাইলেন, কে তুমি?

নিচে দাঁড়ানো লোকটি মুখ তুলে ওপরে তাকালো। তাকিয়ে রীতিমত বেপরোয়া গলায় জানতে চাইলো, তুমি কে হে— ?

তোপের গোলাটা যেন উল্টোদিকের পাহাড় থেকে ছুটে এসে বাদশা জাহাঙ্গীরের বুকে লাগলো। তিনি নূর-ই-ফিলের পিঠ থেকে নিচের এই বেতমিজ লোকটিকে এবার ভালো করে দেখলেন। নীল চোখ, সাদা দাড়ি, কোমরবন্ধে তরোয়ালের খাপে রাখা ডানহাতের আঙুলে বড় একটা হীরে এই শীতের দুপুরেও জ্বলজ্বল করছে। বল্‌ক্‌ কিংবা বাদকশান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি কোনো কাপ্তেন রাজা হবে। নেমে দেখতে হয়।

বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীর নূর-ই-ফিলকে হাঁটু গেড়ে বসালেন। তারপর তার শুঁড় বেয়ে একলাফে নিচে নামলেন। নেমে একটু অবাকই হলেন। তাঁর মুখোমুখি যে-মানুষটি দাঁড়ানো—তাঁর মাথার উষ্ণীষ, গলায় হীরের মালা, গায়ের মুক্তো বসানো আঙরাখা, নীল চোখ, বাতাসের ভেতর গেঁথে থাকা বাঁকা চিবুক, চিবুকের সাদা দাড়ি—যে-মানুষটিকে তুলে ধরেছে—সে য্যায়সা-কো-ত্যায়সা কোনো ইনসান নয়। কেউকেটা যে তা ভুল হবারও নয়। জাহাঙ্গীর বাদশার একবার মনে হলো—সরেজমিনে সব দেখতে বেরিয়ে ইস্পাহানের সফবি কোনো শাহ পথ ভুলে এদিকে এসে পড়েননি তো!

তাই উপযুক্ত সম্মান দিতে তিনি সামান্য ঝুঁকে বললেন, এটা হিন্দুস্থান—

মানী ইনসান সঙ্গে সঙ্গে সামান্য হেসে বলে উঠলেন, সে তো বিলক্ষণ জানি!

—আপনি এখন হিন্দুস্থানের বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন—

—আগে বলতে হয় আলা হজরত! —চলতে বলতে এই মানী ইনসান কুর্নিশ করলেন। করে বললেন, আমি আপনার দাদাসাহেব হুমায়ুন বাদশার আব্বা হুজুর—

বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীরের চোখ জ্বলে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাঁটু গেড়ে বসে প্রথমে কদমবুসি করলেন। করে উঠে দাঁড়িয়ে তসলিম জানালেন। আপনি বাদশার বাদশা—বাবর বাদশা—আমার পরদাদা—! একটু খবর করে তো আসবেন। আপনার জন্যে আমি তৈরি থাকতে পারতাম তাহলে!

এত সব কথা বলেও বিশ্বাস হচ্ছিল না সেলিম জাহাঙ্গীরের। হিন্দুস্থানে

ঠিক একশো বছর আগে যে-মানুষটি চাঘতাই পতাকা বয়ে এনেছিলেন—তিনি এখন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। বাদশা বাবর। জাহাঙ্গীর বললেন, দাদাসাহেবের আব্বা হুজুর—পরদাদার সঙ্গে দেখা হওয়া বিরাট এক খুশ-নসিবি ব্যাপার—

বাবর বললেন, তোমার দাদাসাহেব হুমায়ুন একবার এন্তেকালের সামনে এসে দাঁড়ায়। ভারি বিমারি। বাঁচার কোনো আশা নেই। খোদার রহিমে হুমায়ুনকে সেবারে ফিরে পেলাম।

—জানি পরদাদা— !

—কোত্থেকে জানলে ?

—আব্বা হুজুর আকবর বাদশার মুখে শুনেছি সেকথা—

—ওঃ ! জালালুদ্দিন ! জালালুদ্দিন আকবরের খুব নাম শুনেছি—

—সে কী ? আপনি তাঁর দাদাসাহেব—তাঁকে দেখেনই নি আপনি ?

—না সেলিম। এ হাতি তোমার ?

—বলতে পারেন আপনারও। এই নূর-ই-ফিলকে আগ্রার কাছে বাগোয়ানের জঙ্গলে ধরা হয়।

—আমার আমলে আমরা ঘোড়াতেই চড়েছি বেশি। একটা কথা বলি সেলিম—

—হুকুম করুন পরদাদা। কোনোদিন ভাবিনি আপনার দেখা পাবো। আমার খুশনসিব যে—

—শোনো সেলিম। গোলা দাগার সময় হাতির কানে কিছু দিয়ে নেবে। নয়তো জানোয়ার তার কান হারাবে ওই আওয়াজে—

হো হো করে হেসে উঠলেন সেলিম। বললেন, এখন আর তার দরকার নেই পরদাদা। কবেই কেটে গেছে আপনাদের কাল !

—কী রকম ?

—নিশানা-চাঁদমারির মহড়া—আসল লড়াইতেও আজকাল সবসময় বারুদের গোলা দাগা হয় না পরদাদা—

—তাই নাকি ?

—আলা হজরত ! এখন বারুদ বাঁচাতে অনেক সময় পাথর কেটে বানানো গোলা দাগা হয়।

—কাজ হয় তাতে ?

—খুব হয় পরদাদা। আওয়াজ নেই বিশেষ—অথচ কাজও হয়।

বাদশা বাবর বললেন, আমাদের সময়ে তো এসব ছিল না।

বাদশা জাহাঙ্গীর দেখলেন, এই শীতের দুপুরেও রাওয়ালপিণ্ডি দুর্গের পেছনে নিশানা—চাঁদমারির মহড়ায় বাবর বাদশাকে ঘিরে যেন আলাদা ধরনের একরকমের আলো পড়েছে। হয়তো—ঠিক একশো বছর আগের আলো এইরকমই ছিল।

বাদশা বাবর জানতে চাইলেন, পাথরের এ গোলার কথা লিখে রেখে যাচ্ছো তো ? মুঘলশাহী এখনো অনেকদিন। তাদের তো গোলাগুলির

দরকার পড়বে—

—হ্যাঁ পরদাদা। তুজ্‌ক-ই-জাহাংগীরে সব কথা বলেছি আলা হজরত।

—ভালো। ভালো। বলে থাকলে ভালো। তা কোন্‌ ভাষায় বললে—

—কেন? ফারসিতে। ফারসি এখন সারা হিন্দুস্থানের শাহী লবজ—

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। পরদাদা। আপনার বাবরনামা লেখা হয়েছে চাঘতাই তুর্কিতে। তা এখন ক'জন বোঝে হিন্দুস্থানে! গজনীর এদিকে তো কেউ বুঝবে না। ওদিককার কথা আলাদা—। তবে আব্বা হুজুর আকবর বাদশা মুন্সী আবদুর রহিমকে দিয়ে যে ফারসি তর্জমা করান—সেটাই তো সবাই পড়ে।

—জালালুদ্দিন তাহলে তর্জমা করিয়েছিল। খুব কেয়াবত! খুব কেয়াবত জালালুদ্দিন!

নুর-ই-ফিল পর্যন্ত বাবর বাদশাকে দেখে মুগ্ধ। বাদশা সেলিম জাহাংগীরকে মাটিতে নামিয়ে দেবার জন্যে সেই যে পা ভাঁজ করে এক পা এগিয়ে দিয়ে বসেছিল—আর ওঠেনি। বাদশা সেলিম জাহাংগীর দেখলেন, নুর-ই-ফিল চোখ ফেরাতে পারছে না। পাথুরে জমিনে খানিকটা জায়গার ওপর একশো বছর আগের আলো। তার ভেতর পরদাদা—বাবর বাদশা দাঁড়িয়ে।

আজ খুবই খুশনসিবির দিন। নয়তো পরদাদা—বাবর বাদশার সঙ্গে দেখা হয়। সেলিম জাহাঙ্গীর তাঁর দাদাসাহেবের আব্বা হুজুর—পরদাদা বাবর বাদশার সামনে ফের কুর্নিশ করলেন। করে বললেন, আলা হজরত। আপনি দয়াপরবশ হয়ে যদি অধমের এই হাতিতে বসেন তো এই অকৃতীর জীবন কৃতকৃতার্থ হয়ে ওঠে—

বাবর বাদশা স্নেহভরে সেলিমের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। হেসে নুর-ই-ফিলের পিঠে বসানো গাদেলায় বসতে গেলেন। অমনি নুর-ই-ফিল বেমক্কা উঠে দাঁড়াতে গেল। বাদশা জাহাঙ্গীর ভয় পেয়ে ছুটে এলেন। একি বেতমিজি! পরদাদা বাবর বাদশা তো পড়ে যাবেন—

দেখতে দেখতে তাঁর চোখের সামনে নুর-ই-ফিল চার পা ভাঁজ করে—ভাঁজ খুলে উঠে দাঁড়াতে গেল। বাদশা জাহাঙ্গীর চোখ বুজে ফেললেন। এ কি অতিকায় হাতি? এ তো নুর-ই-ফিল নয়। এই বিশাল হাতি কোত্থেকে এলো?

ভয়ে তাঁর চোখ খুলে গেল। কে যেন বাদশাকে আলতো করে ধাক্কা দিচ্ছে। খুব আবছা মতো শুনতে পাচ্ছিলেন জাহাঙ্গীর।—আলা হজরত। আলা হজরত—

কে যেন তাঁকে ডাকছে।

বাদশা জাহাঙ্গীর কোনো সাড়া দিতে পারলেন না। পারছেন না সাড়া দিতে। তাঁর চোখের সামনে সেই বিরাট হাতি আরও বড় হয়ে উঠছে তখন। এ হাতিকে তো তিনি কোনোদিন চেনেন না। এ তো তাঁর পেয়ারের নুর-ই-ফিল নয়।

তাহলে ?

ওয়াকেনবীশ মির্জা রঘুনাথ ভয় পেয়ে গেল। আগ্রায় দেওয়ানখানায় জরুরি তলব পেয়ে রঘুনাথকে এই শীতের ভেতর কাশ্মীরে ছুটে আসতে হয়েছে। বাদশা জাহাঙ্গীর কখন কী বলেন—কখন তাঁর কী লিখিয়ে রাখার ইচ্ছে হয়—তার কোনো ঠিক নেই—সবই এখন তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরের পক্ষে জরুরি। তাই ওয়াকেনবীশ মির্জা রঘুনাথ কাশ্মীরে এই বনিহাল দুর্গে এসে বসে আছে আজ ক'দিন। দুর্গের জানলার বাইরে বরফ পড়ছিল আজ সকাল থেকেই।

কাল বাদশা কিছু কিছু কথা বলেছেন। সেসব লিখে নিয়েছে ওয়াকেনবীশ মির্জা রঘুনাথ। আজও দুপুরে জহুরের নামাজের পর থেকে বাদশা কিছু কিছু কথা বলছিলেন—আর চোখের ইশারায় রঘুনাথকে তা লিখে নিতে বলছিলেন। বাইরেটা তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে।

বলতে বলতে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েন বাদশা। কলম তুলে বসে ছিল মির্জা রঘুনাথ। সে অনেকদিনই বাদশার মুখের কথা তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরের জন্যে লিখে রাখে। বাদশা জাহাঙ্গীর বলতে বলতে এমন চোখ বোজেন। আবার চোখ খুলে বলতে শুরু করেন। কখনো বা চোখ বুজেও বলতে থাকেন। রঘুনাথ তখন লিখে নেয়।

বাদশা জাহাঙ্গীর ঘুমন্ত দশাতেই হঠাৎ ঢলে পড়লেন। কী করা উচিত এখন—গোড়ায় তা ঠিক করে উঠতে পারছিল না মির্জা রঘুনাথ। বনিহাল দুর্গটা দুই পাহাড়ের ভেতর সরু রাস্তার ওপর। বাইরে দিন দুপুরে আকাশ অন্ধকার করে অবিরাম বরফকুচি নেমে আসছে পাথরে। ঘরের কোণে আগেনগারে গুগগুলের সঙ্গে লোবানের লেবুগন্ধ। একজন হাজিরা বা দাখিলা নেই কাছাকাছি। মসনদের একদিকে ঘুমন্ত বাদশার ডান হাতখানা ঝুলে পড়েছে।

ভয় হলো মির্জা রঘুনাথের। ঘরে এখন শুধু সে—আর হিন্দুস্থানের বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীর। তাও তিনি ঘুমন্ত অবস্থায় এইমাত্র ঢলে পড়েছেন। কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হয়তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে খোয়াব দেখছিলেন। দেখতে দেখতে এইমাত্র ঢলে পড়লেন।

মির্জা রঘুনাথ সাহস করে উঠে দাঁড়ালো! তারপর ঘুমন্ত মানুষটির কাছাকাছি গিয়ে আস্তে ডাকতে লাগলো—

—আলা হজরত। আলা হজরত—

কোনো সাড়া নেই। একখানা হাত ধরলো মির্জা রঘুনাথ। ধরেই ছেড়ে দিলো। সে কোনোদিন কোনো বাদশার হাত ধরে দেখেনি। ভয় করছিল। তাই ধরেই ছেড়ে দেওয়া। আর অমনি সেলিম জাহাঙ্গীরের হাতখানা যেন খসে পড়লো।

এ-বছর শীত যেন হিমালয়ের গা থেকে নেমে হিন্দুস্থানের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে। আগ্রা, দিল্লি, কনৌজ, ফতেপুর, জৌনপুর, এলাহাবাদ,

বেনারস—সব জায়গাতেই রোদ না ওঠা অব্দি ধুনি জ্বালিয়ে বসতে হচ্ছে। রাতে তো কথাই নেই। শাহী সড়কের ওপর রাত পাহারার ফৌজি সেপাইরা দেহাতের দিকে এক একটা মরা ধরা গাছ দেখে আস্ত গাছটাতেই আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে—যাতে সারারাত আরামে আগুনের তাপ পোহানো যায়।

রাজধানী আগ্রার কাছাকাছি সবচেয়ে বড় ফৌজি ছাউনি—সাকেত। আগ্রা দুর্গে বসে বাদশা যে হিন্দুস্থান চালান—তা তাঁর হাতের কাছে এই সাকেতের তাগদেই। এই সাকেতেই জঙ্গী হাতির বিরাট পিলখানা। হাতিদের সেখানে রোজ ফজরের নামাজের পরেই কুচ করানো হয়। কুচ করানো হয়—ঘোড়াদেরও—ইরাকি, আরবি, ইরানি, তুর্কি, ইয়াবু—সব জাতের। সেই সঙ্গে বন্দুকচী, তীরবাজ, জানবাজ লড়াকুদের নানান্ কসরতের মহড়া হয়েই থাকে সাকেতে। এক একজন সারবান কয়েক কাতার করে উট নিয়ে ভোর ভোর সাকেত ছাউনি থেকে বেরিয়ে পড়ে। উটের দল দেহাতে সারাদিন ধরে কাঁটালতা খেয়ে খেয়ে আবার সন্ধেবেলা ছাউনিতে ফিরে আসে। এটাই মনসবদারদের হুকুম। শাহী ফৌজের জানোয়াররা তাতে হিন্দুস্থানের পথঘাট, গাঁ-গঞ্জের সঙ্গে মাখামাখি করে জান পহচান করে। পায়ের পেশী তেজি হয়।

এই সাকেতের একটা ইতিহাস আছে। লোদিরাই প্রথম তাদের ছাউনি বানাতে এক লপ্তে আশিখানা গাঁয়ের মানুষকে তুলে দিয়ে অন্য জায়গায় সরিয়ে দেয়। আশিখানা গাঁয়ের ভেতর সাকেতই সবচেয়ে বড় গাঁ। সেখানকার মাঠেই তোপখানার নিশানা-চাঁদমারি হয়ে থাকে। সাকেতের নামেই ছাউনির নাম। ওই মাঠেই আজ কুচকাওয়াজ।

তবে এ কুচকাওয়াজ কিছু অন্যরকম।

সেই কথাই বলছিলেন শাহী তোপখানার মীর আতশ মানুচ্চি। বলছিলেন, দ্যাখো আমরা সবাই হলাম গিয়ে মাস মাইনের গোলন্দাজ মাত্র।

কঠিন শীতে গলা অব্দি কাম্বাদার টেনে সেপাইরা দাঁড়িয়ে। পাঁচ থাক ছ থাক গোলন্দাজ সেপাইদের লম্বা সারি। তাদের ভেতর দাঁড়িয়ে টান টান দাঁড়ানো তরতাজা এক জোয়ান গোলন্দাজ মীর আতশের দিকে তাকিয়ে মাথা নামালো। নামিয়ে মনে মনে বললো, আপনার পায়ে মাথা নোয়াতে ইচ্ছে করে ধর্মবাপ!

মানুচ্চি তখন বলছিলেন, শাহী তনখা খেয়ে আমরা তো গদ্দারি করতে পারি না। একবার তন্‌খা খাবার পর গদিতে যিনিই থাকবেন আমরা তাঁরই ইয়ার—দোস্ত!

সেই সা-জোয়ান গোলন্দাজ মাটিতে পা ঠুকে বিড়বিড় করে বললো, ধর্মবাপ! আপনার তাঁবে সাড়ে তিনশো কামান। আপনি হুকুম দিলে আমরা গোলা দেগে রাজধানী আগ্রাকে দুনিয়ার মুখ থেকে গুঁড়িয়ে মুছে দিতে পারি। আর আপনি নিজেকে সামান্য গোলান্দাজদের সামিল করছেন!

আজ সারা সাকেত থমথম করছে। যে কোনো ছাউনিতে নিশানা-চাঁদমারি দেখে থাকেন খোদ বাদশা। ঘোড়সওয়ার, বন্দুকচীদের সালাম-কুর্নিশ নিয়ে

থাকেন বাদশা। বাদশা নিজেই সব দেখেশুনে চেহারা যাচাই করেন—ইয়াদদস্ত করে থাকেন।

আজ তার কিছু অন্যরকম হতে চলেছে।

মীর আতশ মানুচ্চি এবার সবাইকে বললেন, যে-যার জায়গায় যাও। কামান তৈরি রাখো। কুচকাওয়াজে সময়মত আসবে সবাই। তখন ফের দেখা হবে—

ছ'খানা তোপ নিয়ে একখানা রিসালা। সেই তোপ-রিসালাদার একজন হলো গিয়ে—বিষণ। এই বিষণের ভেতর সেই বিষণ বা বিষ্ণুকে খুঁজে বের করা কঠিন—যে কিনা আগ্রা দুর্গে নসরত খাঁয়ের হুকুম বরদার ছিল। সে বিষ্ণু শীতে কাঁপতো, খিদেয় কাঁদতো, কাবাব কিনতে গিয়ে দাম-দামড়ি হারিয়ে বসতো। হারিয়ে দোগুণী খাটুনি খেটে পাথর ভেঙে খোয়ানো দাম-দামড়ি যোগাড় করতো। সে বিষ্ণুই এখন মীর আতশ মানুচ্চির তোপ-রিসালাদার—বিষণ—টাটকা তাজা সেরা গোলন্দাজ।

সবার সঙ্গে তোপ-রিসালাদার বিষণও তার তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছিল। মীর-আতশ তাকে ডাকলেন। বিষণ—এদিকে এসো।

বিষণ ছাউনির কেতা-মাফিক হেঁটে এসে ঘুরে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়েই কুর্নিশ করলো। সামান্য ঝুঁকে।

মানুচ্চি বললেন, যা বলেছি তাই করবে—

—আপনার হুকুম পালিত হবে ধর্মবাপ—

ধমকে উঠলেন মানুচ্চি। কতবার বলেছি—এটা ফৌজি ছাউনি। এখানে কেউ কারও বাবা নয়—ছেলে নয়। সবাই এখানে শাহী হুকুমতের হুকুম-বরদার। তনখা-গোলাম।

—আপনি তো আমার এমনি আব্বা হুজুর নন। ধর্মবাপ!

—হ্যাঁ। গড ফাদার! কুচকাওয়াজে এসে সময়মত গোলা দাগবে।

—নিশ্চয় দাগবো ধর্মবাপ।

—দাগবে তো নিশ্চয়। কুর্নিশও জানাবে—

—ওটি পারবো না। আমায় ক্ষমা করুন।

ধমকে উঠলেন মানুচ্চি। ভুলে যেও না বিষণ—তোমায় প্রায় রাস্তা থেকে কিনে এনে গোলাবারুদে হাতেখড়ি দিয়েছি।

—একশোবার ধর্মবাপ।

—তাহলে যা বলছি তাই করবে। আমরা হলাম গিয়ে তনখা-খোর গোলাম। গদিতে যিনি—তিনিই আমাদের হুজুর।

—তাই বলে বাদশার জায়গায় কুর্নিশ নেবেন উজিরে আজম?

—কী আসে যায় তাতে বিষণ? যতদিন কেউ বাদশা না হয়ে বসেন—ততদিন যিনি সব দেখবেন শুনবেন—তাঁকেই তো মানবো আমরা।

—বাদশা নেই। বেশ। তাহলে বাদশা-বেগমকে কুর্নিশ জানাবো। নুরজাহান বেগম কী দোষ করলেন? তিনি তো ফৌজি কুর্নিশ নিতে পারেন।

তাঁর নামে তো একসময় মোহরও বেরিয়েছে—

—সেই মেহের!

—সে ধর্মবাপ আপনারা যা-ই বলুন। মোহর তো।

—দ্যাখো বিষণ। আমি বিদেশি। কে আগ্রায় মসনদে বসলো—তাতে আমার যায় আসে না। আমার তনখা, জায়গীরী বজায়—বহাল থাকলেই হলো। কিন্তু তুমি হিন্দুস্থানি। তাজা জওয়ান। এখনো অনেকদিন বাঁচবে—

—ধর্মবাপ—আপনিও অনেকদিন বাঁচবেন। ঈশ্বর করুন—

—থামো বাচাল। তোমাকে এখনো অনেকদিন আগ্রার শাহী হুকুম তামিল করতে হবে। কে গদিতে থাকলো—তা না দেখে—বরং দ্যাখো—কে হুকুম দেয়—তার সেই হুকুম তামিল করো। সেটাই তোমার পক্ষে ভালো হবে।

বিষণ কোনো কথা বললো না। সকালের কুয়াশা ছিঁড়ে রোদ উঠছিল ফালা ফালা করে। রাজধানীর বাইরেই মাঠে মাঠে এবার গেঁহুর ফলন খুব ভালো। অকালে গরম পড়ে গিয়ে দানা বেরিয়ে পড়েনি গমের।

দুপুর দুপুর বিরাট বেহেদর হাতির হাওদায় চেপে এলেন উজিরে আজম আসফ খাঁ। তাঁর পাশে পাশে সিপাহ সালার। সঙ্গে বাছা বাছা ঘোড়সওয়ার।

সারা ছাউনির চেহারা থমথমে। কোনো কোনো মনসবদার ঠিকই করতে পারছেন না—হাতি-ঘোড়া-উট-তোপ-বন্দুকচী-পদাতিক-ধানুকী নিয়ে কোন্‌-দিকে ঝুঁকবেন? কোন্‌দিকে শেষমেশ জয়ী হবে? কেউ বলতে পারছে না। সবাই চায় জয়ের হাত ধরে এগিয়ে যেতে।

দুটো পূর্ণিমা চলে গেল। বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীর আর নেই। বাদশা-বেগম নূরজাহানকে বাইরে কেউ দেখতে পায়নি। শাহজাদা খুর্রম এখন কোথায়? নাসিকে? আসিরগড়ে? নাসিরাবাদের দুর্গে? কেউ সঠিক বলতে পারে না। আগ্রার হামামে হামামে নানান গুজব। মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে শোনা যাচ্ছে—এতদিনকার বাগী বেদৌলত শাহজাদা খুর্রম এবার ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পড়লেন বলে।

নর্মদার তীরে কিছু ফৌজি ছাউনি নাকি শাহজাদা শারিয়ারকে বাদশা হিসেবে চায়। তাই তাঁর হয়ে নজর পাঠিয়েছে বাদশা-বেগম নূরজাহানের কাছে। কুলোক বলছে—এসবই বাদশা-বেগমের রটনা। আসলে তিনিই চান—শাহজাদা শারিয়ার মসনদে বসুন। কারণ, শারিয়ার তো তাঁর দামাদ।

আবার সাত হাজারি মনসবদার খানজাহান লোদি নাকি বলেছেন—এবার মসনদে বসবেন সুলতান দাওয়ার বকস্—শাহজাদা খসরুর ছেলে। আবার কেউ বলছে—খানজাহান লোদি তো অমন বলবেনই—তিনিই যে দাওয়ার বকসের নানাসাহেব!

হাতির পিঠে বসে সারাটা ছাউনির দিকে তাকিয়ে কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না উজিরে আজম আসফ খাঁ। বাইরে তিনি কিছুই বুঝতে দিতে চান না। তাঁর হাতির পেছন পেছন শাহী বাজনদার দল বাজিয়েই চলেছে।

আগ্রা দুর্গের শাহী নক্করখানার বাজনা।

উজিরে আজমকে অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে আসার কথা—ছাউনির ঘোড়সওয়ারদের। কিন্তু কোথায়? তাদের তো দেখা যাচ্ছে না। আসফ খাঁয়ের কপালে ভাঁজ পড়লো। ঠিক এই সময় তোপ গর্জে উঠলো। ভীষণ জোরে—

ইয়েক—

দো—

সে—

চহর—

পাঞ্জ—

উজিরে আজমের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। শাহী কানুনে উজিরে আজমের সম্মানে ষোলোবার গোলা দাগা হয়। গোলার শব্দ শুনে আসফ খাঁ বুঝতে পারলেন, তাঁরই সম্মানে দাগা হচ্ছে। হ্যাঁ। তাঁরই খাতিরে।

এখন দুপুর। জায়গাটা রাজধানীর গায়ে ফৌজি ছাউনি—সাকেত। আজম কিছু বলবেন বলে আজ এখানে এসেছেন। তিনি গোলার শব্দ গুনতে গুনতে যখন ষোলোর দিকে এগোচ্ছিলেন মনে মনে—তখনই তাঁর মন প্রশান্তিতে ভরে যাচ্ছিল। শাহী হুকুমতে বহাল থাকতে যত আনন্দ—ফস্ করে সেখান থেকে খসে পড়ার জন্যেও উদ্বেগ তত। খসে পড়া মানে—এই যেমন এখুনি কোনো বাগীর ছোঁড়া গুলিতে যদি জীবনটা যায়—তো তাকে খসে পড়াই বলে। যে কোনো দিক থেকেই যখন তখন মৃত্যু এসে হাজির হতে পারে। ফেরেস্তার সঙ্গে অকালে দেখা হোক—কে আর তা চায়!

উজিরে আজম এলেও সাকেত ছাউনি এতক্ষণ জানতো না—সে কোনদিকে চলবে। আগ্রা আছে। আগ্রা দুর্গ আছে। কিন্তু বাদশা নেই। যেন হৃদপিণ্ডই নেই। এই অবস্থায় সবই কেমন অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। এর ভেতর তোপ-রিসালাদার বিষণ উজিরে আজমের খাতিরে সালামি গোলা দেগে দিয়ে নিজের অজান্তেই উজিরে আজমের দিকে হাওয়া ঘুরিয়ে দিলো।

গোলার আওয়াজ শুনে গোড়াতেই সারবানদের তোয়াজে কয়েক কাতার বাছাই উট এসে সওয়ার সমেত সালাম দিতে দিতে উজিরে আজমের সামনে দিয়ে চলে গেল। এর পর সুন্দর সাজে সাজা হাতির দল। বেহেদর, শেরগির, রাজতুম। তাদের গলায় এক এক রকমের গলঘণ্ট। হাতির পেছনে এক এক মনসবদারের এক এক দল ঘোড়সওয়ার। সারা ছাউনির কুচ ময়দান একসময় জানোয়ার আর ইনসানে ভরে গেল। উজিরে আজম আসফ খাঁ বিরাট উঁচু শেরগির হাতির পিঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলেন—

বাদশা আসবেন। যাবেন। কিন্তু শাহী থাকবে। হুকুমত বহাল থাকবে। মুঘল শাহীর শেকড় ইনসাফিতে। বে-ইনসাফি আগ্রার সইবে না। শেষ কেয়ামতের দিনে বাদশা আর আম-আতরাফ ইনসানে কোনো ফারাক নেই। সেদিন সবাইকে ফেরেস্তা আস্রাফিলের বাজানো বাঁশি শুনতে হবে।

এই অব্দি বলে উজিরে আজমের গলা ভারি হয়ে এলো। তিনি বললেন, শাহী হুকুমতে কোনো বে-ইনসাফি বরদাস্ত করা হবে না। প্রত্যেক মনসবদারকে মনে রাখতে হবে—তিনি তাঁর ওয়াতনের মর্যাদা রাখবেন। সমশের নোয়াবেন না। একশো বছরের ওপর যে মুঘল শাহী গড়ে উঠেছে তার শেকড় কেটে দেওয়ার যে কোনো চেষ্টাই আমরা বানচাল করে দেবো।

চড় চড় করে রোদ উঠছিল। তাতে হিমেল হাওয়ার হিম কিন্তু কমলো না। সেপাইরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উজিরে আজমের কথা শুনছিল। শুনে এই ভেবে নিশ্চিন্ত হচ্ছিল—যাক! তাহলে এ মাসের মাইনেটা সময়মত পাওয়া যাবে।

সূর্যহীন দিন আর বাদশা ছাড়াই শাহী—একই দশা। আপনারা নিশ্চিত থাকুন—মসনদে যার ন্যায্য অধিকার—তিনি বঞ্চিত হবেন না। তিনিই বাদশা হবেন।

সব কথা সবাই শুনতে পাচ্ছিল না। ঘোড়ার পা ঠোকা। কামানের গাড়ির চাকার ঘরঘর। হাতির গলার গলঘণ্টের সুরেলা ঢেউ। ওর ভেতর যে যেমন পারছিল—বুঝে নিচ্ছিল। কিছু আন্দাজে, কিছু বা না বুঝে। তবে সবাই চাইছিল—একটা নিয়মনীতি থাকুক—যাতে কিনা সময়মত মাসের তনখাটা পাওয়া যায়। রাস্তায় বেরিয়ে ধড়ের ওপর থেকে মুণ্ডুটা যাতে না-হারাতে হয়।

আসফ খাঁ সাজিয়ে সাজিয়ে বলছিলেন।

বড় গাছ পড়লে মাটি কেঁপে ওঠে। পাখির বাসা ভেঙে পড়ে। বাদশা চলে গেলে এমনটি তো হবেই। তবু গেঁহুর গোলা লুট, মাণ্ডি থেকে বাজরার উধাও হয়ে যাওয়া আগ্রা কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। আমি আহেদিদের বিশেষ করে একটা কথা বলতে চাই। আপনারা খোদ বাদশার হাতে যাচাই বাছাই হওয়া জানবাজ ইনসান। শাহীর এই বিপদের দিনে আপনারা পাশে থাকুন। সুসময়ে ইজফা দিয়ে আপনাদের পুরস্কৃত করা হবে।

তোপ-রিসালাদার বিষণ একটা গজ-নল কামানের পাশে দাঁড়িয়েছিল। ছ'ছটা কামান পিছু তার মতো একজন করে রিসালাদার দাঁড়িয়ে। আর সবার সামনে দাঁড়িয়ে খোদ মীর আতশ মানুচ্চি। ঠাণ্ডা বাতাসের ভেতর—বিষণ দেখতে পাচ্ছিল—তার ধর্মবাপের সোনালি চুল বুকের ঘাগরা তোলা ঢোলা জামার মতোই ফুলে ফুলে উঠছে। একটা লোকের কথা শোনার জন্যে আমরা সবাই তনখা-গোলাম দাঁড়িয়ে আছি। একখানা ভারি সুন্দর মুখের কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। বিষণের মনে পড়লো—আগ্রা দুর্গে সামান বুরুজ তৈরির সময় নসরত খাঁ এক একদিন তাকে আধা তৈরি বুরুজে তুলে দিতো। দুিয়ে বলতো—যা ছুটে যা বুরুজ ধরে। দেখবি ডানদিকের বুরুজের সঙ্গে সমান সমান আছে কি না?

এইসব দেখতে দেখতেই একদিন বিষণ—তখনকার বিষ্ণু আচমকাই আগ্রা দুর্গের ছাদে এক খুবসুরত জোয়ানের সামনে গিয়ে পড়ে। ছিমছাম শায়ের ঢংয়ের ছিরি-ছাঁদ। ঢলোঢলো মুখখানি। নীলচে চোখ। মাথার বাবরির সঙ্গে

তাল রেখে যুৎসই একজোড়া গোঁফ। শাহজাদা শারিয়ার।

ভয় পেয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিল বিষণ। খোদ শাহজাদা তার কাছে এগিয়ে এসেছিলেন। সেই শেষ—সেই প্রথম। এরপর আর কোনোদিন তার আর কোনো শাহজাদার মুখোমুখি হওয়া হয়নি। আজ আবার হতে হবে। ভোর থেকেই তাই বুকটা ঢিপঢিপ করছে বিষণের।

বাদশা চলে যাবার পরই যেন শীতটা এ বছর বেশি পড়েছে। দুপুরের শেষদিকেই সূর্যের আলো শীতে কালচে হয়ে পড়ে। আগ্রা, দিল্লি, লাহোরে জোর গুজব—শাহজাদা খুর্রম এসে পড়লেন বলে। কেউ কেউ বলছে—এই যে মাণ্ডি থেকে গেঁহু বাজরা উধাও হয়ে যাচ্ছে—শাহজাদা খুর্রম এসে পড়লে আবার ওসব বাজারে এসে যাবে। আসলে দরকার চাবুক। কড়া হাতের চাবুক। হিন্দুস্থানের সেরা লড়াকু শাহজাদা খুর্রম মসনদে বসলেই এই অসহ্য শীত কমে যাবে—শয়তানপুরায় মেয়েদের ঘরে ঘরে বেলেল্লাপনার বহরটা কমবে—একদম বন্ধ হয়ে যাবে লুটপাট।

দুপুরে কখনো ঘরে খদ্দের বসায় না আগ্রাওয়ালি রেহানা। কিন্তু আজ এমনই মেঘ করে এলো—সঙ্গে শীতের বাতাস, ঝিরঝিরে বৃষ্টি—তারপর খদ্দের মরদটার ফৌজি দাঁড়ানো ভঙ্গি দেখে রেহানা তার মুখের ওপর দরজা একেবারে বন্ধ করে দিতে পারলো না।

একপাল্লা সামান্য ফাঁক করে সেখানে একটি চোখ রেখে—নিচের দিকে পাল্লার কাঠে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল ঘষতে ঘষতে রেহানা বললো, এই দুপুরবেলা কিন্তু গাইতে পারবো না—

কোঠাবাড়ির সিঁড়ির মুখে দাঁড়ানো মরদটা ডান দিকে হেলে জানালো, ঠিক আছে। তাই সই—

ভঙ্গিটা বেশ ভালো লাগলো রেহানার। সে এবার বললো, রাত না হলে আমি নাচি না কিন্তু।

মরদটা এবার বাঁ দিকে অনেকটা হেলে জানালো—ঠিক আছে। তাই সই—

বাঃ! এ তো শুধু হেলে যায়। দারুণ মরদ তো। ফৌজি ছাউনি থেকে মাঝে মধ্যে শয়তানপুরা—রাজা কি মাণ্ডিতে দুটো একটা মরদ এমন ছিটকে এসে পড়ে। দরজার দুই পাল্লা হাট করে রেহানা খপ করে মরদটার হাত ধরলো। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে ভেতরে টেনে আনলো তাকে।

ভেতরে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল বাজারঘানি। শাহী আহেদি বেলাইতি বাজারঘানি। এই সনেই ইজফা পেয়ে তার দেড়হাজারি মনসবদার হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। বাদশা জাহাঙ্গীর আচমকা চোখ বুজলেন বলে সব গোলমাল হয়ে গেল।

সামলে নিয়ে বাজারঘানি টান টান দাঁড়ালো। ছাউনিতে কোনো কুচকাওয়াজ নেই। হামলা বা শায়েস্তা করতেও যাওয়ার নেই কোথাও। তাই গা ঘামিয়ে গরম করতে রাজধানীতে এসে এক একদিন এক এক দিকে যাওয়া।

সেরকমই আজ রাজা-কি-মাণ্ডিতে পড়ে আগ্রাওয়ালি রেহানার কোঠাঘরে বেলাইতি বাজারঘানির এসে পড়া। হাজার হোক সে একজন খানদানি আহেদি। ঠাট, ঠমক, পোশাকি কেতা থেকে টুপ করে বেরিয়ে আসা বাজারঘানির পক্ষে সম্ভব নয়। সে গম্ভীর গলায় কিন্তু কিন্তু করে বললো, দরদস্তুর কিছুই করা হলো না—

রেহানা গম্ভীর মুখে বললো, যদি দরে না বনতো?

বাজারঘানি কোনো জবাব দিতে পারলো না।

—চুপ করে বসুন ওখানটায়—

এমনভাবে হুকুম তামিল করার মানুষ নয় বাজারঘানি। সে ঘরের পশ্চিম দিককার জানলায় গিয়ে দাঁড়ালো। বাঃ! এখান থেকে তো আগ্রা দুর্গের নক্কারখানা দেখা যায়—

—ওটা বুঝি নক্কারখানা!

এই গায়ে-পড়া চালাকির কথায় বিরক্ত হলো বাজারঘানি। সে গম্ভীর হয়ে বললো, তবে ওটা কী?

—কত যেন জানে! ওটা হলো গিয়ে বাদশার অন্দরমহলে যাওয়ার পথে হপ্তচৌকি। রাজপুত সেপাইরা পাহারায় থাকে ওখানে।

নিজে শাহী হুকুমতের একজন পাকা আহেদি হয়ে কী বলবে এই সামান্য গানেওয়ালিকে! বললেও তো বুঝবে না। আহেদিয়ানার একেবারে গোড়াকার তালিমে আগ্রা দুর্গের অন্ধিসন্ধিও পাখি পড়ার মতো শেখানো হয়। তামাম হিন্দুস্থানের তাগদের ফোয়ারা ওই আগ্রা দুর্গ। তাই ওখানটা একজন আহেদিকে ভালো করেই জানতে হয়।

—তাই বুঝি! জানলে কী করে?

—আগ্রায় থাকি আমরা—আমরা জানবো না তো কে জানবে!

বেলাইতি বাজারঘানি বুঝলো, এই গানেওয়ালিকে ঘাঁটিয়ে কোনো লাভ নেই। ও ওর মতো জানুক। কয়েক পূর্ণিমা হয়ে গেল—বাদশা জাহাঙ্গীরের এন্তেকালের পর হিন্দুস্থানের মসনদ খালি পড়ে আছে। গুজবে গুজবে আগ্রায় এখন কান পাতা দায়। এর ভেতর আজই উজিরে আজম সাকেত ছাউনিতে সালামি নিয়েছেন। কুচের পর বলেছেন, কোনো বে-ইনসাফি হবে না। ন্যায্য অধিকারীই মসনদে বসবেন। ন্যায্য অধিকার আসলে কার? বাদশার ছেলে বাদশা হবেন? না তাগদ যার সে-ই বাদশা হবে? খুর্রম? দাওয়ার বকস্? না, শারিয়ার?

বাজারঘানি আচমকাই বললেন, কে বাদশা হবেন—বলতে পারো?

রেহানার বুকটা ঢিপঢিপ করে উঠলো। এ বড় কঠিন কথা জানতে চাইছেন।

—কার হওয়া উচিত? খুর্রম? শারিয়ার? দাওয়ার বকস্?

—মিঞা সাহেব! এ তো আরও কঠিন কথা জানতে চাইছেন!

বাজারঘানি চাপা রসিকতায় টইটম্বুর রেহানার মুখখানি দেখে যেন মজে যাচ্ছিল। মুখে বললো, কেন? কেন?

—কেন ? বেশ তবে শুনুন। শাহজাদা খুর্‌রম হিন্দুস্থানের সেরা লড়াকু —জিন্দা শাহজাদাদের ভেতর এখন বয়সে সবচেয়ে বড়—কিন্তু তিনি তো বাদশার পয়লা বেটা নন।

—সুলতান দাওয়ার বকস্‌ ?

—হ্যাঁ। তিনি বাদশার সবচেয়ে বড় শাহজাদার ছেলে। কিন্তু দাওয়ার বকসের সেই শান-সওকত নেই—যা-কিনা একজন ভাবী বাদশার থাকে।

—তা তো শাহজাদা শারিয়ারেরও নেই।

—না থাকলেও শাহজাদা শারিয়ারের খুবসুরতি হিন্দুস্থানের মনে ধরবে। লাডলির মতো অতি সুন্দর বেগম যার—তাকেই তো বাদশা হলে মানায়! ওদের দুজনের জন্যে তামাম হিন্দুস্থানের মনে দিলচসপি—আদত রহমানি আছে।

—তাহলে তো শাহজাদা শারিয়ারেরই বাদশা হওয়া উচিত ?

—না মিঞা সাহেব। শাহজাদা শারিয়ারের লড়াই জেতার—লড়াই করার কোনো হিসাব নেই : কোনো জানবাজির কহানি তাকে ঘিরে গড়ে ওঠেনি। আমি আগ্রাওয়ালি রেহানা মনে করি, দুবলা হাতে হিন্দুস্থান শাসনের ভার দেওয়া যায় না।

—তাহলে কার হাতে আমরা হিন্দুস্থানের ভার দেবো ? তুমি কার হাতে হিন্দুস্থানকে দিতে চাও রেহানা ?

—তাইতো ঠিক করতে পারছি না। আপনি হিন্দুস্থানের ভার নিন না মিঞাসাহেব !

হো হো করে হেসে উঠলো বেলাইতি বাজারঘানি। ভালো বলেছো। এই নাও—

আগ্রাওয়ালি রেহানা সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে তার ওড়না পেতে দিলো মেঝের বনাতে। তাই-ই রীতি। ঝনাৎ শব্দ তুলে এক গোছে চার চারখানা মোহর পড়লো বেলাইতি বাজারঘানির হাত থেকে। কুর্নিশ করে তুলে নিতে নিতে রেহানা নিজেকে বললো, কত বড় রইস ? শুয়ে বসে ক'খানা কথা বলার জন্যে চার চারটে আস্ত সোনার মোহর ? লোকটা কি ফৌজি ঠিকাদার ? না। তাহলে তো ভুঁড়ি থাকতো। এমন পেটাই গঠনগাঠন যখন—তখন নিশ্চয় কোনো কাঁচা মনসবদার। হেসে উঠে দাঁড়ালো রেহানা।

—মসনদি দাবিদাওয়া—মসনদি ঝগড়া-কাজিয়ায় হিন্দুস্থানের মন জানা গেল তোমার মুখ দিয়ে।

—আমরা বাজারি গানেওয়ালি। আমাদের কানে সব কথা আসে মিঞাসাহেব—বলতে বলতে রেহানা উঠে গিয়ে বিকানিরি আশা নিয়ে এলো। আশা কিছু তেজী শরাব। গলা দিয়ে নামার সময় জ্বলতে জ্বলতে নামে। পেটে পড়লে মুর্দা জিন্দা হয়ে ওঠে। অনেকদিন পরে রেহানার মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি খেলতে শুরু করেছে। সে অনেকদিন এমন চওড়া বুক—সরু কোমরের খদ্দের পায়নি এ-ঘরে। সেই সঙ্গে মানুষটার চোখের ওপর ভারি ভ্রূ তার মন

কেড়ে নিয়েছে। নিজের হাতে আশা ঢেলে দিলো রেহানা। দিয়ে বললো, হুজুরত। নিশ্চয় আপনি শাহী তোপখানায় আছেন—

—সে-খবরে তোমার কী দরকার ?

—অপরাধ নেবেন না হুজুর। আপনি নিশ্চয় ফৌজি কাজে নর্মদার ওপারে ছিলেন কিছুদিন ?

—কী করে বুঝলে ?

—গলায় আপনার রুপোর বিদরি কাজের ওই মালা—আমাদের এইখানে যারা গোলকুণ্ডা থেকে এসে ঘুরে যায়—শুধু তাদের গলায় দেখেছি।

—ঠিক বলেছো ? —বলে রেহানাকে কাছে টানলো বাজারঘানি। রেহানা তার বুকে হেলান দিতে দিতে ভাবলো, এত তাড়াতাড়ি ! ধন্য আশা ! আশা তুমি ধন্য ! —তার মনের ভেতর তখন এই টানটান খদ্দেরের কুর্তা কামিজ ছাড়াই শুধু শরীরটা ঢেউ হয়ে পাথর হয়ে ভেসে উঠছিল।

বেলাইতি বাজারঘানি তখন নিজেকে বলছিল, বড় বেশি বোঝো তুমি। এ-মালা আগ্রার লালচকে কিনতে পাওয়া যায়।

রেহানার অনেকদিনের ইচ্ছে—এমন একজন পুরুষের হাতে সে আগাগোড়া ধরা দেয়। সেই ধরা দেওয়াকে আরও রঙিন করে তুলতেই রেহানা নিজেকে আলতো করে ছাড়িয়ে নিলো বাজারঘানির বুক থেকে। তারপর গেয়ে উঠলো—

ম্যায় ক্যা জানু
ম্যায় ক্যা জানুরে-এ-এ

রাগে বসানো কথা। ভেতরে একটা দোল আছে। সেই দোলের সঙ্গে ঘুঙুর বাঁধা পা ফেলে নেচে উঠতে যাচ্ছিল রেহানা।

ধমকে থামিয়ে দিলো বেলাইতি বাজারঘানি। হাসতে হাসতে বললো, এ কি গান হচ্ছে নাকি ! হিন্দুস্থানের বড় খারাপ সময় পড়েছে—

গান গিলে ফেলে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লো আগ্রাওয়ালি রেহানা। একেই মরদটা তার নিজের শরীর দিয়ে রেহানার ভেতরে ধিকিধিকি আগুন জেবলে দিয়েছে। অনেকদিন পরে তার আজ বিকেলে আবার মনে হচ্ছে—মরদে বড় টান। তেমন মরদ বড় টানে। চোরা টান—

তার ওপর আবার গান নিয়ে কথা ? এখন এ-জীবন রাখবে কোথায় রেহানা ! মাথা নিচু করে বললো, তবে কেমন ? নমুনা শুনি একটু— !

সংগে সংগে এক লাফ দিয়ে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো বেলাইতি বাজারঘানি। দাঁড়িয়েই একরকম সাধা গলায় চেঁচিয়ে উঠলো—

যেমনি ভরাট—তেমনি চওড়া বড় গলা। কিন্তু রীতিমত সুরেলা। কোনো কথারই মানে বুঝতে পারলো না রেহানা। কিন্তু টানটোন শুনে বুঝলো, নিশ্চয়ই ফারসি। ইস্পাহানের খাঁটি ফারসি। কেমন লম্বা কান মোচড়ানো টান দিয়ে এক এক গৎ গান শেষ হচ্ছে মরদটার গলায়। আর অমনি ঘরের মাঝখানটায় লাফিয়ে একপাক ঘুরে নিচ্ছে মরদটা—

—তুমি তাহলে ইরানি—একথা মনে আসতেই রেহানার অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়লো। এক ইরানি খদ্দের এসেছিল অনেকদিন আগে। তার গলার মালায় ছিল—তাবিজের মতো আস্ত একটা কস্তুরী। লোকটা খালি গা হতেই সারা ঘর ভুরভুর করে উঠেছিল কস্তুরী সুবাসে। এর বুকেও কস্তুরী আছে নাকি ?

আল নিশান এ-দীপ এ হিন্দুস্থান বুবদ
কি জহদ আজ··· ?—রুমী। রুমীর রুবায়-ই। কেমন— ?

আর আলাদা করে বাছা গেল না কথাগুলো। আশা তুমি ধন্য ! মনে মনে একথা বলে আবার খানিক ঢেলে দিলো রেহানা। বাজারঘানির গলায় গানের এক কথা আরেক কথায় লেপটে যাচ্ছিল। জড়িয়ে যাওয়া গলায়। শুনতে শুনতে রেহানা বুঝতে পারছিল—ভরাট গলা সুরেলা হলেই আশ্চর্য এক গান। তার মানে আলাদা করে বুঝলেও ক্ষতি নেই বিশেষ।

মরদটার গলায় কথা যেমন জড়িয়ে আসছিল—হাত-পায়ের নাচানাচিও সেই সঙ্গে কমে আসছিল। তাই-ই চাইছিল রেহানা। বাইরে শীতের বিকেল কড়া শীতে আরও অন্ধকার হয়ে এলো। রেহানা এমন করেই বেলাইতি বাজারঘানিকে দু'হাতে জড়ালো—যেন পেড়ে ফেলবে।

বাজারঘানি রেহানা সমেত মেঝেতে পাতা গালিচার বনাতে পড়তে পড়তে বললো, তোমরা বলে শুধুই গানেওয়ালি !

রেহানা কোনো কথা বলতে পারলো না। তার ঠোঁট কাঁপছিল। দুই চোখ যাকে বলে মদির হয়ে এসেছে। তাও তো আজ বিকেলের সুরমা টানার সুযোগই হয়নি। সে খুব কষ্ট করে বলতে পারলো, হ্যাঁ। তাই—

—রাত না হলে বলে নাচো না তুমি !

।। পঁচিশ ।।

আগ্রাওয়ালি রেহানার চোখ একদম অন্ধকার হয়ে গেল। সে কোনো জবাবই দিতে পারলো না। বড় কোনো জানোয়ারের মতোই সে বেলাইতি বাজারঘানির টুঁটি প্রায় কামড়ে ধরলো।

—আঃ করো কি ?—বলতে বলতে উঠে বসতে গেল বাজারঘানি। ভীষণ সুড়সুড়ি লাগছে যে—

উঠতে পারলো না বাজারঘানি। রেহানার গায়ে এই মাত্র ভীষণ জোর বেড়ে গেছে। এমন পাথর-টান মরদ সে শুধু খোয়াবেই পেয়েছে এতদিন। খোয়াবেই শুধু ইনসানের ভাবা শরীরটা—স্বপ্নের আদলটা নির্ভুল হয়ে দেখা দেয়। এখন যে এমন ধুলোর দুনিয়ায় সে খোয়াব এত সত্যি হয়ে উঠবে কে ভেবেছিল ?

হামলা-লড়াইয়ে এই আহেদি জীবন বেলাইতি বাজারঘানিকে অনেকবার মেয়েমানুষ লুট করতে হয়েছে। দেহাতে মেয়েমানুষ কয়েদ করে শায়েস্তা করার

নামে মাণ্ডিতে পাঠিয়ে দিয়েছে, বাঁদির বাজারে। তাতে দু'দশ আশরফি যা মিলেছে তা শখের জিনিস কিনতে গিয়ে আগ্রার বাজারে উড়িয়েও দিয়েছে। কিন্তু শাহী আহেদি বলেই হয়তো—কিংবা ভাবী মনসবদার বলেই কিনা তা বুকে হাত রেখে বলতে পারবে না বাজারঘানি—সে কোনোদিনই শুধুই ভোগ আহ্লাদে নিজে নিজে কোথাও এগিয়ে যায়নি। বা ধরাও দেয়নি। কোথায় একটা কঠিন নিয়ম এইরকম কোনো দশা থেকে তাকে সর্বদাই দূরে সরিয়ে রেখেছে। সেটা বোধহয় আহেদিয়ানার কঠিন নিয়ম মেনে চলার অদৃশ্য পরিণাম। কিংবা আহেদিয়ানার আলাদা দেমাকই এর কারণ।

—কী হচ্ছে ? অ্যাঁ।—বলতে বলতে কোমরের পটি সামলে নিলো বেলাইতি বাজারঘানি—আমি খেলাম আশা—আর তুমি—

—একটু দয়া করো। একটু দয়া করো—বলতে বলতে রেহানা বুঝতে পারছিল—সে নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারছে না। একজন জেনানা হয়ে এর চেয়ে বেশি কী আর বলতে পারে একজন মরদকে। বলতে বলতে তার বুকের ভেতর একটা কান্না দুমড়ে দুমড়ে উঠছিল। আমি কি অ্যাতোই খেলো —যে একজন মরদ আমাকে দেখে উথলে ওঠার বদলে গুটিয়ে যাবে ? এ কথা ভেবে যে কী ভীষণ কণ্ট হয়—তা আগে জানতো না রেহানা।

কোমরের পটিতে আবারও টান পড়ায় আহেদি স্বভাব মতো বাজারঘানি তড়াক করে উঠে বসলো। কোমরের পটির ভেতর একখানা কারাদ ছুরি সবসময় লুকিয়ে রাখে সে। বলা যায় না—কখন কী কাজে লাগে। রেহানা চায় কী ? তার ছুরিখানা ? কেন ? কী মতলবে ?

বেলাইতি বাজারঘানি ফৌজি স্বভাবে পাল্টা ঘা মারতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে গেল। রেহানার হাত তার কোমরে নয়। নাভির নিচে নেমে যাচ্ছিল। মুখের কথা জড়িয়ে এসেছে। তার বুকে মাথা, ঠোঁট, চোখ—সব ঘষতে ঘষতে বললো, একটু দয়া করো। দয়া করো। শুধু একবারটি—আমি যে আর পারছি না—মানিক আমার—

—নাঃ! ছাড়ো। এই না তোমরা শুধু গান শোনাও!—বলতে বলতে এক গড়ান খেয়ে পাকা আহেদি বাজারঘানি রেহানার হাত গলে বেরিয়ে গেল।

রেহানা দেখলো, মরদটা শুধু পাথর-টান তরতাজা নয়—রীতিমত কসরত জানা পাকা খেলোয়াড়ও বটে। মুখখানা ধারালো। জানলা গলে ঘরে ঢোকা শেষ বিকেলের আলোয় বার্বারি গোঁফ নিয়ে লোকটার তাকানোর ভঙ্গি তাকে যেন গেঁথে ফেললো। সে দু'হাত মেলে দিয়ে বাজারঘানির দিকে ঝাঁপ দিলো।

সরে গেলে রেহানা মেঝেতে পড়ে বেদম ব্যথা পেতো। তাই বাজারঘানি দু'হাতে ঠেকালো এই মস্ত আওরতকে। কী হচ্ছে ? অ্যাঁ—?

রেহানা দুঃখে—রাগে বাজারঘানির ডান হাত কামড়ে ধরলো।

সঙ্গে সঙ্গে বাজারঘানি ঝাঁকুনি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিলো।

—জানোয়ার!

—তাতো বলবেই। খেয়াল আছে—বাদশা নেই। নতুন বাদশা মসনদে

এখানো বসেননি। আর ঠিক এই সময় তোমার আশনাই বেড়ে গেছে!

—একবার পারো না—শুধু একবারটি—

—না। আমি একজন শাহী আহেদি। দেওয়ানখানায় জানাতে হচ্ছে সব। —বলতে বলতে বাজারঘানি দেখলো, রেহানার চোখের মদির তাকানো কাঠ কাঠ হয়ে এলো।

রেহানা একটুও ভয় পেল না যেন এ কথায়। সে শুধু থু থু ফেলার ভঙ্গিতে বললো, হুঃ!

বাজারঘানি বললো, বাদশার চল্লিশা কাটেনি এখনো। আর গানেওয়ালির ভেক ধরে তুমি খদ্দের পাকড়াচ্ছো?

ওকথায় কান না দিয়ে দু'হাত তুলে রেহানা হেসে বললো, এসো। গুলি মারো শাহী চল্লিশায়। একবারটি—এত সুন্দর মরদ হয়ে আজ আমায় একটু রহেম কর—

—না। বাজারি আওরত তুমি। শেষে বিমারি ধরুক!

—তবে দূর হ জানোয়ার! দূর হ—বলতে বলতে রেহানা হাতের কাছে যা পেল তাই ছুঁড়তে লাগলো বাজারঘানির দিকে। রুপোর বদনা। তামার পিকদানি। শুকনো আগেনগার। ওরে আমার আহেদিরে!

এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে বাজারঘানি মাথা বাঁকিয়ে সিঁড়ির ধাপে এসে পড়লো। এত বাড় ভালো নয়। দাঁড়াও—তোমায় মেরামতির ব্যবস্থা করছি—তিন কড়ির রাণ্ডির এত ঘমণ্ড?

—আরে যা যা। জানোয়ার কোথাকার! যাঃ! রাস্তায় পড়ে বেলাইতি বাজারঘানি দেখলো, আগ্রার মানুষের কোনোদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। যে-যার কাজে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এ ওকে ধাক্কা দিয়ে গুঁতো মেরে এগিয়ে চলেছে। কেউ খেয়ালই করছে না—বিয়ানার দিককার আকাশে একটি চাঁদ উঠে বসে আছে। হলুদ। আধখানা। শীতে আধ-খাওয়া।

নিজেকে নিজেই সে বললো, খুব সময়মত বেরিয়ে আসা গেছে। হাজার হোক আমি একজন আহেদি। আজ বাদে কাল আমার মনসবদার হওয়ার কথা। আমি কি এক গানেওয়ালির কথায় ওঠবোস করতে পারি!

শীতে আকাশে চাঁদের আলো কিছু ফ্যাকাশে লাগে। কিন্তু রাজধানীর দোকান পসারে সন্ধেরাতের আলো যেন চারদিক মাতিয়ে তুলেছে। এর ভেতর বেলাইতি বাজারঘানির চলাফেরা সর্বক্ষণ নজরে রাখা উচিত। সে পথচলতি মানুষের ভিড়ে মিশে গিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল গানেওয়ালি রেহানা আজ শের বনে আছে। আজ কি আর কাউকে গান শোনাতে পারবে!

আগ্রা দুর্গের ভেতর অভ্রের আলোগুলো এখন কিছুদিন হলো জ্বালানো হচ্ছে না। দুর্গের ভেতর ঢাকা-পথ, খোলা চত্বর, বড় বড় ঢাকা জায়গা এখন সন্ধের পর আলোর অভাবে ছায়া ছায়া।

সুলতান মহম্মদ দারাশুকো দেখতে পেল—দেওয়ানি খাসের গা দিয়ে ঢাকা পথের ওপর একটা কালো ছায়া কেমন চলকে উঠেই মিলিয়ে গেল। জায়গাটার আলো সামান্যই। এ ছায়া আসলে ছায়া নয়। মরহুম দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশার বেগম নূরজাহান কালো কাপড়ে গা ঢেকে চাতাল পার হয়ে গেলেন। রোজ দেখে দেখে একথা এখন জানে দারাশুকো।

মোতি মসজিদ, আকবরি দরওয়াজা পার হয়ে কালো কাপড়ে ঢাকা ছায়া-মূর্তি বাঁ দিকে পর পর তিনটে হপ্তচৌকি ফেলে একটা সরু ঢাকা পথে ঢুকে গেল। একটু পরেই দেখা গেল সামান্য আলোয় সেই ছায়ামূর্তি ঢাকা পথ থেকে বেরিয়ে শাহজাদা শারিয়ারের মহলে ঢুকে পড়লো।

মহল বলতে শাহজাদা শারিয়ার আর লাডলি বেগমের থাকার জায়গা। আগ্রা দুর্গের আন্দাজে এমন কিছু নয়। বলা যায়—অতি সাধারণ। কাছেই হাতিশালা আর মোরি দরওয়াজার মাঝখান দিয়ে আবার সরু রাস্তা। মনে হবে দু'পাশের পাথরের দেওয়াল চেপে ধরতে এগিয়ে আসছে।

কালো ছায়াটি ঘরে ঢুকেই মাথার ঢাকনা খুললেন। আমারই দেরি হয়ে গেল। এমন কখনো হয় না—

অল্প আলোয় ঘরের ভেতর শাহজাদা শারিয়ার বা লাডলি বেগম—কেউই কুর্নিশ করলো না। সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালো ওরা। কিন্তু ঘরের অন্য দিকে দু'জন মরদ যতটা পারে ঝুঁকে কুর্নিশ জানালো।

তাদের দিকে তাকিয়ে নূরজাহান বেগম বললেন, বাদশা নেই। কিন্তু তোমাদের এই নিমক-হালালি কোনোদিন ভুলবো না। সময়মত সুদিনে উপযুক্ত ইজফা পাবে—এখন এসো—আমরা হিন্দুস্থানের ভাবী বাদশাকে কুর্নিশ করি। কুর্নিশ করি ভাবী বাদশা-বেগমকে—

জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিল বেলাইতি বাজারঘানি। ঘরের কোণে দাঁড়িয়েছিল তোপ-রিসালাদার বিষণ। দু'জনই একসঙ্গে ঝুঁকে পড়ে কুর্নিশ করলো।

কুর্নিশের জবাবি ফিরিয়ে দিতে শাহজাদা শারিয়ার সামান্য ঝুঁকলো। লাডলি বেগম শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারলো না। বলে উঠলো, এসব কী হচ্ছে আম্মিজান—

নূরজাহান বেগম ধমকে উঠলেন—চুপ করো। কথা যা বলার আমিই বলছি—

বিষণ আজই প্রথম আগ্রা দুর্গের ভেতরে এসেছে। তাও তার আসা আহেদি বাজারঘানির কৃপায়। সে-ই সঙ্গে করে এনেছে। এই প্রথম বিষণ নূরজাহান বেগমকে এত কাছ থেকে দেখতে পেল। দেখে মনে হচ্ছিল—মানুষ নয়—স্বপ্নের মায়া দিয়ে বানানো মোম মোম মানুষ যেন। বাদশার বেগম এরকমই হয়ে থাকে।

শাহজাদা শারিয়ার কিছু বলতে চাইছিলেন। কিন্তু ভরসা করে বলে উঠতে পারলেন না। তাঁরই সামনে নূরজাহান বেগম মনসবদারি চালেই কথা বলে

যাচ্ছিলেন। বলছিলেন, আমার ঘোড়সওয়াররা ভোর রাতে রাজধানীর সব দরজায় দাঁড়িয়ে যাবে। বুলন্দ দরওয়াজায় অন্তত দুই রিসালা বাছাই ঘোড়সওয়ার নিয়ে রাত থাকতে এসে হাজির হবে। পারবে না ?

বেলাইতি বাজারঘানি ডান দিকে মাথা কাত করলো। খুব পারবো—

—আর তোপ রিসালাদার—

—মুলুকে মালিকা। আমার নাম বিষণ। আবার অনেকে আগে বলতো বিষ্ণু—

নুরজাহান বেগমের চোখ কেঁপে উঠলো। মনে মনে বললেন, নিতান্তই সাধারণ। আবার বাচালও বটে। মুখে বললেন, দুটো, নামই আমার মনে থাকবে। অন্তত ছয় জোড়া কামান থেকে একই সঙ্গে গোলা দাগতে দাগতে বেরিয়ে আসবে সাকেত ছাউনি থেকে। শেষ রাতে। আজই। পারবে না বিষ্ণু ?

তোপ-রিসালাদার বিষণ বললো, পারতেই হবে মুলুকে মালিকা—

—তোমাদের এই হালালি আমি কোনোদিন ভুলবো না।

লাডলি বেগম দেখতে পাচ্ছিল, শীতের হিমের ভেতর আকাশের হলুদ জ্যোৎস্না এসে আগ্রা দুর্গের চাতালে ছড়িয়ে পড়েছে। সে টেরও পায়নি—তোপ-রিসালাদার তরতাজা বিষণ একদৃষ্টে তার দিকের তাকিয়ে।

আসলে বিষণ থরথর করে কাঁপছিল। সে কোনোদিন ভাবতেও পারেনি—এত কাছ থেকে সে বাদশা-বেগম নুরজাহানের সঙ্গে কথা বলতে পারবে। দেখতে পাবে শাহজাদা শারিয়ার আর তাঁর বেগম লাডলিকে। ওঁরা তো যে সে লোক নন। যে কোনোদিন দেখা যাবে—এই শাহজাদাই আগ্রার মসনদে বাদশা হয়ে বসেছেন। সেই মানুষকে এত কাছে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করার সুযোগ হলো স্রেফ বেলাইতি বাজারঘানির মতো একজন শাহী আহেদির দয়ায়। বাজারঘানি তাকে বেছে না নিলে বিষণ তো কোনোদিনই এসব জায়গায়—এসব ইনসানের কাছাকাছি হতে পারতো না।

শাহজাদা শারিয়ার কী সুন্দর! এমন মানুষ হিন্দুস্থানের বাদশা হলে হিন্দুস্থানই বদলে যাবে। এইসব ভাবতে ভাবতেই বিষণ আবার কুর্নিশ করলো শাহজাদা শারিয়ারকে। এমন সুন্দর সময়। ঘরের বাইরেই চাতালে আকাশের জ্যোৎস্না! কোত্থেকে সেঁউতির সুবাস উঠে আসছে। বিষণ সাহস করে শারিয়ারের মুখে তাকালো।

তাকিয়ে অবাক হলো বিষণ। তার দিকে তাকিয়ে শাহজাদার অমন সুন্দর মুখে ভ্রু কুঁচকে গেল। ভয় পেয়ে চোখ নামিয়ে নিলো বিষণ। সে এক বড় আশায় এইমাত্র ভেতরে ভেতরে ভেসে উঠেছে। শাহজাদা শারিয়ার হিন্দুস্থানের বাদশা হওয়ার পর সে একটা ইজফাই চেয়ে নেবে—তাকে যদি শাহী তোপখানার মীর আতশ হতেও বলা হয়—তাতে সে রাজি হবে না। সে চাইবে—আমার মা বাবাকে খুঁজে বের করে দেওয়া হোক। ঢেঁড়া পিটিয়ে ঢোল সহরত করে আমার মা-বাবা দিদিকে খুঁজে বের করা হোক। এত বড় হিন্দুস্থানে কোথায় পাওয়া যাবে তাদের ? শাহী ক্ষমতাও তো কম নয়। ইচ্ছে থাকলেই তাদের

খংজে বের করতে পারে শাহী হুকুমত।

বাদশা-বেগম-নূরজাহানকে কুর্নিশ করে বেলাইতি বাজারঘানি বেরিয়ে পড়লো। সঙ্গে তোপ-রিসালাদার বিষণ। সবসময় এই ছোকরাকে সামলে নিয়ে চলতে হয় বাজারঘানিকে। একে বয়স কম—তার সব কাজেই প্রবল উৎসাহ। বিশেষ করে সে-কাজ যদি কঠিন হয়—খুবই বিপজ্জনক হয়। ছ'ছটা তোপের রিসালাদার। তাই হাতে রাখাও দরকার বিষণকে। চাই কি আরও দু'চারজন তোপ-রিসালাদারকে লেজে বাঁধিয়ে এদিকে নিয়ে আসতে পারে।

ওদের দুজনের পায়ের নিচে দুর্গের চাতাল আর শেষ হয় না! হেঁটে হেঁটে পা ব্যথা হয়ে গেল। দুজনই সব কাজ সেরে থাকে ঘোড়ার পিঠে বসে বসে। ঘোড়াই ওদের হয়ে হাঁটে। দৌড়োয়।

বাজারঘানির সবই সুন্দর মনে হচ্ছিল। সামনে এক বিরাট ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে। শাহজাদা শারিয়ার বাদশা হলে চাই কি এই আহেদি তখন রাজধানী আগ্রায় ফৌজি মীর বকসির দফতরে বড় কোনো আমলা হয়ে বসবে। তখন বেলাইতি বাজারঘানির কাছে ঘাগু সব মনসবদার ভালো জায়গায় বদলির জন্যে তদ্বির করতে আসবে। আজকের সন্ধেটাতেই যেন কী এক আলাদা কিছু আছে। আকাশে অমন হলুদ চাঁদ আগ্রা অনেকদিন দেখেনি। বাতাসে বেশ আরামের হিম। রাজা-কি-মাণ্ডির কোঠাঘরে রেহানার মতো গানেওয়ালির তার জন্যে কী দিওয়ানপনা! সব মিলিয়ে জীবন বড় সুন্দর মনে হতে লাগলো বেলাইতি বাজারঘানির। আজকাল সাকেত ছাউনির রসদ দেখাশুনোর জন্যে ভাঁড়ারে খেয়াল রাখতে মীর-ই-সামান তাকে কিছু কিছু ভার দিয়েছেন। সেই সুবাদে গেঁহু, ঘি, যব, গোস্ত, সোরা, সোহাগা, চামড়া কত কিসের ব্যাপারিদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে হয়। ফলে মাস গেলে তনখার আশরফিতে আর হাত দিতে হয় না বাজারঘানিকে। সব ব্যাপারি কিছু না কিছু ভেট নিয়ে কথা বলতে আসে। হুকুম, হামলা, আশরফি, আমোদ, আরাম, মৌজ দিয়েই জীবনটা ঠাসা। এখন কী করে এমন জীবনে বেশি দিন বেঁচে থাকা যায়—সেটাই ভাববার।

টানা তক্তাপোল পেরিয়ে দু'জনে দুর্গের তিন নম্বর হপ্তচৌকি পেরোবে পেরোবে। ডান দিকে একটু বেঁকে ক'ধাপ নামলেই বাজারঘানি আর বিষণের জন্যে ঘোড়া দাঁড়িয়ে। ওরা কিছু বুঝবার আগেই পায়ের নিচের একখানা তক্তা খুলে গেল।

জায়গাটা অন্ধকার মতো। দুজনই ফৌজি অভ্যেসে সঙ্গে সঙ্গে কোমরে হাত দিলো। কিন্তু কিছু করতে পারলো না। পায়ের নিচের পাটাতন সরে গেলে যেভাবে সবাই পড়ে যায়—ওরাও সেভাবে পড়লো। বেসামাল—চিৎপাত হয়ে। টানা তক্তাপোলের নিচে অন্ধকার—লাল মাটি। বাজারঘানি আবছামত টের পেল—কারা যেন ওৎ পেতে বসেই ছিল। ভীষণ ভারি কিছু দিয়ে তার মাথায় মারা হলো। সব মুছে গেল তার চোখের সামনে থেকে।

বিষণ পা হড়কে উপুড় হয়ে পড়েছিল। সে নোংরা পাঁক মাটিতে মুখ

ঘসড়ে উঠে বসার চেষ্টা করলো। পারলো না। শক্ত, ভারি মতো কী একটা মাথায় এসে লাগতে মুখ থুবড়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে সব ভুলে গেল বিষণ।

আগ্রা এসবের কিছুই জানতে পারলো না। যেমন জানলো না—শাহী উজিরে আজম আসফ খাঁয়ের দারুণ বিশ্বাসী শিশোদিয়া রাজপুত বাহিনীর তাগড়া তাগড়া ফৌজি সেপাই তখন নিঃশব্দে আগ্রা দুর্গের ঘরে ঘরে তল্লাশি আর দখল নিতে শুরু করেছে।

আঙুরিবাগের ঠিক ওপরেই অন্দরমহলের সবচেয়ে সাজানো নিজের বিশাল ঘরে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেলেন এতদিনকার বাদশা-বেগম নূরজাহান। তার মুখ থেকে শোকের কালো ওড়না সরে গেল। তিনি দেখতে চান—কে এই বেয়াদবির সাহস দেখালো?

—মাফ করবেন মুলুকে মালিকা—আপনি এখন শাহী হুকুমতের মেহমান—

নূরজাহান বুঝলেন, তিনি এখন বন্দিনী। শাহী কেতায় যাকে বলা হয় অতিথি। তিনি তাতার পাহারাদারনির মুখে তাকালেন। কোনো ভাবলেশ নেই সে-মুখে। ক্ষমতা যখন যেদিকে—এরা তখন সেদিকে। নূরজাহান বেগম নিজের ভেতর এক দারুণ ঝাঁকুনি খেয়ে বুঝলেন—বাদশাবিহীন বেগম আর সূর্যহীন দিন একদম এক। কোনো ফারাক নেই।

বাদশা-বেগম নূরজাহানের ঘরের সঙ্গেই ছোট ঘরখানার দরজা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের তিন প্রাণী অবাক হয়ে দোরে তাকালো। এইসময় তো বাদশা-বেগম আসেন না। কিছু ফেলে গেছেন হয়তো। তাই নিতেই আসা।

ভাইদের ভেতর বড় সুলতান মহম্মদ দারাশুকো শুয়ে শুয়ে খোলা জানলা দিয়ে রাতের আগ্রার আকাশে তাকিয়ে কী সব দেখছিল। সে-ই সবার আগে তড়াক করে উঠে বসলো।

—এসো। আমার কাছে এসো তোমরা—

দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব দেখলো, বাদশা বেগম নূরজাহান নয়—একদম অন্য রকমের একজন লোক দাঁড়িয়ে। দারা চিনতে পারলো। মাথায় শাহী উষ্ণীষ। কোমরবন্ধে তরোয়ালের খাপে চেনা মুক্তোটি জ্বলজ্বল করছে। সেই হাসি। নানাসাহেব আপনি?

দু'হাত বাড়িয়ে হাসতে হাসতে ঘরের ভেতর এগিয়ে এলেন আসফ খাঁ। কত বড়টি হয়ে গ্যাছো নানাভাই।

দারাশুকো ছুটে গিয়ে দু'হাতে কোমর জড়িয়ে ধরলো মানুষটির। তার দেখাদেখি সুলতান আওরঙ্গজেবও এগিয়ে এসেছে। আসেনি সুলতান সুজাঙ্গীর। সে ঘরের ভেতর ঝোলানো সুখদোলায় বসে যেমন দুলছিল—তেমনই দুলতে থাকলো। নানাসাহেব নামে এই বুড়োটে লোকটাকে বিলক্ষণ চেনে সে। কারণ দাদাসাহেব বাদশা জাহাঙ্গীর বেঁচে থাকতে এই লোকটাই

এসে সামনে কুর্নিশ, তসলিম জানাতো বাদশাকে। এই বুড়োটাই উজিরে আজম। দাদাসাহেবের কোলে বসে থাকার সময় অনেকবার দাদাসাহেবকে জানানো লোকটার কুর্নিশের ভাগ পেয়েছে সুজাঙ্গীর।

আসফ খাঁ সিধে সুখদোলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সুখদোলায় বাঁকা হয়ে বসা সুলতান সুজাঙ্গীরের মাথায় হাত রাখলেন। রেখে বললেন, সুলতান সুজাঙ্গীর! আমি তোমার আম্মিজানের আব্বা হুজুর। তুমি আমার সঙ্গে আসবে না?

গলার স্বরে কী যেন ছিল। সুজাঙ্গীর তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে বললো, কোথায় যাবেন?

—আমার সঙ্গে এলেই দেখতে পাবে।

সামনে শাহী উজিরে আজম। তাঁর পাশে পাশে তিন সুলতান। দারাশুকো? কিশোর প্রায়। সুজাঙ্গীর? কিছু ছোট। আরওঙ্গজেব? এখনো বালক।

আসফ খাঁ হাঁটতে হাঁটতে দেওয়ানি খাস পার হলেন। তিনি যেদিকেই পা ফেলেন—সেদিকেই মশালচীরা মশাল দিয়ে দেওয়ালে বসানো গিরিতে আলো ধরিয়ে দেয়। দেখতে দেখতে সারা দুর্গ আগের মতো ঝলমল করে উঠতে লাগলো।

দেওয়ানি খাস পেরিয়ে আসফ খাঁ যেই তাঁর দেওয়ানখানার কাছারির দিকে এগোলেন—আর অমনি জাহাঙ্গীর বাদশার এন্তেকালের পর এই প্রথম আবার নক্কারখানা থেকে সানাই, বাঁশি, ঢোল আর বাংলা দিগর একসঙ্গে বেজে উঠলো।

কিশোর-বালক সুলতানদেরও মনে হতে লাগলো, আগ্রা দুর্গ বুঝি আবার আগের মতোই জেগে উঠলো। উজিরে আজম নানাসাহেব আসফ খাঁ এসে দোর খোলার আগে অব্দি যেন—আগ্রা দুর্গের ওপর কিসের ওড়না পড়ে ছিল। নানাসাহেব এসে দাঁড়াতেই সে ওড়না খুশির বাতাসে উড়ে গেল। দেওয়ানখানায় উজিরে আজমের দীবানে গিয়ে বসলেন নানাসাহেব। তাঁর পাশে গিয়ে বসলো তিন খুদে সুলতান। এখানে সুলতানরা কখনো আসেনি। এটা আসলে শাহী উজিরে আজমের কাছারি।

আসফ খাঁ কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। শুরুও করেছিলেন এভাবে—সুলতান সুজাঙ্গীর। তোমার আম্মিজান তোমায় কতদিন দ্যাখেনি জানো। দেখলে—

ঠিক এমন সময় ক'জন ফৌজি রাজপুত মিলে তাগড়া মতো একজন লোককে পিঠমোড়া অবস্থায় এনে দাঁড় করালো। করিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে সবাই কুর্নিশ করে দাঁড়ালো। তারপর প্রায় একসঙ্গেই বললো, এই সেই লোক—

আসফ খাঁ লোকটির মুখে সিধে তাকালেন। তাকিয়ে বললেন, তাহলে তুমিই সেই লোক! কিন্তু আজ যে আমার বড় আনন্দের দিন—আজ তোমায় কী শাস্তি দেবো—?

পিছমোড়া অবস্থায় লোকটি বললো, হজরত। আগে আমাকে বাঁধন খুলে দিতে বলুন। দিলে একটু বসতে পারি। না বসলে মাথা ঘুরে পড়ে যাবো—

আসফ খাঁয়ের চোখের ইশারায় লোকটির হাত ঘুরিয়ে বাঁধা বাঁধন একজন ফৌজি রাজপুত এগিয়ে এসে খুলে দিলো। দিতেই লোকটি ধপাস করে বসে পড়লো। হুজুর, আমার কোনো দোষ নেই। বাদশা-বেগমের হুকুমে আমি সাকেতে দু'মাসের গেঁহু পাঠিয়েছি। না-পাঠালে গর্দান যায়। একসঙ্গে এত গেঁহু বাইরে পাঠালে রাজধানী যে শুকিয়ে যায়—তা খেয়াল করিনি।

হেসে ফেললেন উজিরে আজম। এটা কি কোনো কথা হলো! ফৌজি বনজারা চৌধুরীর গয়ানাথের ছেলে হয়ে একি কথা বললে! তোমার খেয়াল নেই —রাজধানীর কতটা গেঁহু থাকা দরকার ?

—হুজুর। এখন শীতের মরসুমে শাহী গোলায় গেঁহু ওঠে। চাষীরা গেঁহুতে খাজনা দেয়। ভেবেছিলাম—তাই টান পড়বে না।

—যাক গিয়ে। আজ আমার খুশির দিন। অনেককাল পরে আমার নানাভাইদের ফেরত পেলাম। তোমার আর গর্দান যাবে না। সাকেতের ছাউনিতেও একসঙ্গে দু'মাসের গেঁহু পাঠাতে হবে না আর। শুধু খেয়াল রাখবে— মিশকিনদের জন্যে খয়রাতির গেঁহু, বাজরা যেন সময়মত শাহী কাছারিতে এসে পৌঁছয়।

—সে আমার খেয়াল থাকবে। একবার বলে দিলেন—এ আমার আর ভুল হবার নয় হজরত—

—ওদের জন্যে গত পূর্ণিমায় গোস্ত সময়মত পৌঁছয়নি বলে হাঙ্গামা বেধে গিয়েছিল। শাহী আদবের নড়চড় হোক তা আমি চাই না—কল্পনাথ—

—আপনার মনের ইচ্ছাই এই অধমের খোয়াব—

সুলতান আওরঙ্গজেব এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। এবারও সে বললো না। সে এই ফৌজি বনজারা চৌধুরী কল্পনাথের দিকে তাকিয়েছিল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল—শাহী ব্যাপারের ব্যাপারীরা ইনসান হিসেবে কতটা নিচে নামতে পারে। কতটা ধুলো গায়ে মাখতে পারে। দাদাসাহেব বাদশা জাহাঙ্গীরের এন্তেকালের পর রাজধানী আগ্রার মাণ্ডিতে গেঁহুর টানের কথা— মিশকিনদের শাহী খয়রাতিতে খাওয়ানোর ব্যাপারে খামতির কথা আগ্রা দুর্গে বসে সেও শুনেছে। সেজন্যে দায়ী এই কল্পনাথ। দিব্যি ধুলো মেখে—মাটিতে লেপটে বসে ধুলোর সঙ্গে ধুলো হয়ে কারবার চালিয়ে যাচ্ছে।

উজিরে আজম আসফ খাঁ বললেন, বেশ। এখন যাও—

গায়ের ধুলো ঝেড়ে সাধারণ ভিখারির মতোই ফৌজি বনজারা চৌধুরী কল্পনাথ উঠে দাঁড়ালো। কে বলবে—শাহী ফৌজের রসদের একজন বড় সড় যোগানদার এই কল্পনাথ।

আসফ খাঁ এবার সুলতানদের দিকে ফিরলেন। সুলতান মহম্মদ দারাশুকো রীতিমত মাথা ধরে উঠেছে। শরীরের ধরতাই দেখলে বোঝা যায়—জোয়ান বয়সে বেশ দেখনসই লম্বা চওড়া মানুষ হবে। সেই তুলনায় সুজাঙ্গীর সামান্য

বেঁটে বলেই মনে হলো আসফ খাঁয়ের। তবে তিনজনের ভেতর সবচেয়ে ফর্সা—সুলতান আওরঙ্গজেব।

দেওয়ানখানায় কাছারিতে উঁচু দীবানের ওপর বসে উজিরে আজম। তিনি সুলতানদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এবার তোমাদের আম্মিজানের সঙ্গে দেখা হবে।

এ কথায় তিনজনই একসঙ্গে উজিরে আজমের দিকে খচ করে ফিরে তাকালো। দেওয়ালগিরির উজ্জ্বল শিখার ভেতর এই তিনজনও যেন তিনটি শিখা। আসফ খাঁয়ের একটা জিনিস খুবই ভালো লাগলো। মায়ের কথা বলতেই তিনজন একসঙ্গে ঘুরে তাকিয়েছে!

দারাশুকো চোখের পলক না ফেলে জানতে চাইলো, আম্মিজান এসেছেন নাকি?

—না! এখনো এসে পৌঁছয়নি। তবে এলো বলে।

—কবে আসবেন?

দারার এ কথায় কিশোর মনে মায়ের জন্যে অস্থির অবস্থা টের পেয়ে ভালোই লাগলো আসফ খাঁয়ের। তিনি হাসিমুখে সুলতানদের দিকে তাকালেন। ভীষণ তৃপ্তি মাখানো চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন তাদের। সে দৃষ্টিতে সামনে সবচেয়ে অসুবিধায় পড়লো সুজাঙ্গীর। সে জাহাঙ্গীর বাদশার কোলে বসে এই বুড়োটে লোকটার কুর্নিশেও ভাগ বসিয়েছে। আর এখন সেই বুড়োর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বসে থাকা রীতিমত অস্বস্তির।

আসফ খাঁ সুলতানদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের আম্মিজান আমায়ই মেয়ে!

এই প্রথম কথা বললো সুলতান আওরঙ্গজেব। হাসি হাসি মুখে সে বললো, জানি।

আসফ খাঁ ভালো করে দেখলেন সুলতান আওরঙ্গজেবকে। বেশ সুশ্রী আর সফেদ হয়ে উঠেছে তাঁর এই নাতি। মুখখানির গড়ন কাটা কাটা। গালের বাঁ দিক যেটুকু দেখা যাচ্ছে—তাতে মাথার চুল, আঁখি পল্লব, নাকের রেখাটি মিলিয়ে সবটুকু বড় সুশ্রী লাগলো আসফ খাঁয়ের। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বুকের ভেতরটা গুর গুর করে উঠলো। এদের ভেতর কে একদিন হিন্দুস্থানের বাদশা হবে? এদের ভেতর কে কে হিন্দুস্থানের বাদশা হতে পারবে না? তাদের মুণ্ডু কি গড়াগড়ি যাবে?

সুলতান মহম্মদ দারাশুকো বললো, নানাসাহেব। আমাদের আরও একটি ভাই আছে।

—মুরাদ বকস্। জানি। তিনি এখন তাঁর আম্মিজানের সঙ্গে নাসিক থেকে আগ্রার পথে। সেই খুদে সুলতানকে খাতির—আদাব জানাবো বলেই তো রাজধানী আগ্রায় বসে আছি!

ক'দিনের ভেতর দেখা গেল—আগ্রা, ফতেপুর, দিল্লির মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে

গেঁহু, বাজরা মিলছে বটে—তবে আগের চেয়ে কিনে আনতে অনেক বেশি দাম লাগছে। জামা মসজিদ, লালচক, চবুতরা—রাজধানীর যেখানে যেখানে আমআতরাফ ভিখারি, মিশকিন, আওয়ারা, দিওয়ানাদের শাহী খয়রাতিতে খেতে দেওয়া হয়—তাদের খাবার মালসায় গোস্তের টুকরো আর খুঁজে পাওয়ার দশাই থাকলো না।

বাদশা নেই—তা কয়েক পূর্ণিমা হয়ে গেল। কয়েকটা অমাবস্যা পেরিয়ে হিন্দুস্থান যেন আরও গম্ভীর হয়ে উঠলো। বাইরে থেকে আগ্রা দুর্গকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না। রোজ বিকেলে শীত এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাজধানীর ওপর। তার ভেতরেই দুর্গের বুরুজে অভ্রের আকাশপ্রদীপ ঠিকই জ্বলে। দুর্গের আকবরি দরওয়াজা, বুলন্দ দরওয়াজা—নানান্ হপ্তচৌকি—সব জায়গাতেই প্রহরে প্রহরে পাহারা বদলায়। বাদশা জাহাঙ্গীর চোখ বুজতেই দুর্গ ঘিরে আছে হাজার দশেক শিশোদিয়া রাজপুত ফৌজ—যারা কিনা উজিরে আজমের ভীষণ বিশ্বাসী।

শীত জাঁকিয়ে পড়ায় এ বছর গেঁহুর ফলনটাও বেশ ভালোই। এবার শীতটাও যেন অন্য বছরের চেয়ে কিছু লম্বা। অন্যবার আগে আগে গরম এসে পড়ায় গেঁহুর শীষে অকালে ফুল ফুটে গিয়ে ফলটা মার যায়।

এসব কথাই গোলায় বসে ভাবছিল কল্পনাথ চৌধুরী। শাহী ফৌজের রসদের আগাম যোগানদার, ঠিকাদার। পিতা ঃ ৺গয়ানাথ চৌধুরী। নিবাস ঃ বিয়ানা, আগ্রা। শীতের সকালের কাঁচা সোনা রোদে গোলার সামনের উঠোনে একটা পিপুল গাছের তলায় বসে কল্পনাথ রোদ পোহাচ্ছিল। আর বসে বসে দেখছিল গোলাজাত গেঁহুর বোরাগুলো রোদ ফিরিয়ে বসানো হচ্ছে কিনা। এখন ধরে রাখা গেঁহু বর্ষায় নাফা লোটে। সেই গেঁহু পোকামাকড় থেকে তো বাঁচানো দরকার।

খানিক বাদে রাজধানীর আশপাশের দেহাতি সব গাঁ থেকে কল্পনাথের দাদন খাওয়া চাষীরা গো-গাড়ি বোঝাই দিয়ে গেঁহু নিয়ে এসে এই গোলায় ভিড়বে। অন্য বছর আরও অনেক ভোর ভোর ওই সব গো-গাড়ি এসে যায়। এবার যেন ওদের আসাটা কিছু কম কম লাগে কল্পনাথের।

কাঁধের তুসখানা ভালো করে গলায় জড়িয়ে কল্পনাথ পিপুল গাছের মোটা গুঁড়িতে হেলান দিলো। বাবা গয়ানাথের হাতে তৈরি এই কল্পনাথ। সে দেশ-বিদেশের খবর রাখে। রাখে দুর্গের খবর। জল-ঝড়ের খবর। জানে মেঘের চরিত্র। বোঝে নানান্ দেশের মোহর-আশরফির লেনদেন।

বাদশা চোখ বোজার পর এতদিন কেটে গেল—এখনো একজন বাদশা বসলেন না রাজধানী আগ্রায় শাহী মসনদে। ফলে যা ঘটবার তাই ঘটেছে। মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে গুজবের শেষ নেই। এবেলা শাহজাদা খসরুর বড় আওলাদ দাওয়ার বকস বাদশা হন তো ওবেলা শাহজাদা শারিয়ার মসনদে বাদশা হয়ে বসেন! তারপর তো আছেই সেই এক কথা! শাহজাদা খুর্রম ঘোড়া ছুটিয়ে ধুলো উড়িয়ে রাজধানীতে ছুটে আসছেন। এই এলেন বলে।

সন্ধের পর লোকজন রাস্তায় থাকে না। কথকতা, গোলাম-হেনা, জঙ্গ-পেয়ার, কেচ্ছাকাহিনীর গানবাজনা সন্ধের পর ইদানীং আর বসে না। যে-যার বাড়ি ফিরে দোর বন্ধ করে চুপ করে থাকে সারা রাত। দাদন খাওয়া চাষীরা বলছিল, কী চাষী, কী গেরস্থবাড়ি—এমনকি আগ্রা—ফতেপুরের খুদে দোকান পসারিরাও মোহর-আশরফি মাটি খুঁড়ে পুঁতে রাখছে।

ঠিক নেই তো—কে এবার মসনদে বাদশা হয়ে বসবে। যে কোনো দিন লুটপাট শুরু হয়ে যেতে পারে। শাহী ফৌজের সময়মত তনখা না হলেই তো চিত্তির। রে রে করে সেপাইরা রাস্তাঘাটে বেরিয়ে পড়বে।

শাহী বনজারা কল্পনাথ চৌধুরীর মুন্সি হলো গিয়ে ফতেপুরিয়া এক কায়েত। সব ব্যাপারে সে খুব পিনিধানি। এমন শান্ত সুন্দর রোদ পোহানো ভোরবেলার সব খান খান করে দিয়ে মুন্সি চন্দ্রভান চেঁচিয়ে উঠলো, গেঁহুর বোরার ফাঁকে মুর্দা—

—সে কী? ওখানে কী করে গিয়ে লাশ পড়বে? বোরায় বোরায় ফাঁক থাকে তো সামান্যই। ফতেপুরি মুন্সিটাও বোকার ধাড়ি। যদি সত্যিই মুর্দা পড়ে থাকে তো বলার দরকার কী? মুর্দা দেখলে সাত সকালে কাজের মানুষজন ছুটি করে দেবে। একটা দিনই বসে বসে মজুরির দাম-দামড়ি—আপেলা পওয়া গুনতে হবে। গুণাগার দিতে হবে। কল্পনাথ উঠে দেখলো, গাদিমারা গেঁহুর বোরার ঠিক ফাঁকে নয়—বরং পাশে—মড়াইয়ের নিচে মাথার খানিকটা কালো চুল বেরিয়ে আছে। মাঝবয়সী মানুষ কল্পনাথ। শরীরখানা ওঠাবসায় দড়। দিব্যি উবু হয়ে চুলের মুঠি ধরে টান দিতেই—একটা মেয়েলি গলা কঁকিয়ে কেঁদে উঠলো।

—বেরিয়ে আয়। আয় বলছি।

মড়াইয়ের তলা থেকে ঘাগরা পরা একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো। ধুলোমাখা। গায়ের আঙরাখাটি ছেঁড়াখোঁড়া। মাথার চুলে জট পড়ার যোগাড়।

ধমকে উঠলো কল্পনাথ—তুই কে? অ্যাঁ। এখানে কী করতে—

বাজখাঁই গলার ধমকে কোনো কথাই বলতে পারছিল না মেয়েটি। দুই চোখভরে সে কাঁদতে লাগলো।

—কথা বলবি তো। নাম কী তোর?

অনেক কষ্টে মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বললো, রানাদিল—

ফতেপুরিয়া মুন্সি চন্দ্রভান বলে উঠলো, নামের তো বেশ বাহার দেখছি। তা ওখানে গিয়ে সেঁধোলি কী করে?

আবারও হাপুস চোখে কাঁদতে লাগলো মেয়েটি।

—কী করে গেলি ওখানে? বলবি তো। বোরা চাপা পড়ে মরিসনি এই তোর ভাগ্যি—

কাল রাতের কথা আর বলতে পারলো না রানাদিল। আজ ক'মাস ধরে সে রাজধানী আগ্রার দোকান-পসারের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজও সে তার নানাজান-নানিজানকে খুঁজে বের করতে পারেনি। আর হয়তো

পাবেও না কোনোদিন। এতবড় রাজধানীর কোথায় যে কে থাকে! সরাইখানায় সরাইখানায় পানি ঘেঁটে বাসনপত্তর ধোয়াধুয়ি করে রানাদিল এখন আগ্রার খানিক খানিক জায়গা চিনে ফেলেছে। এই ক'মাসে রানাদিলের দুনিয়া দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একভাগে পড়ে শীত তাড়ানো চুলোর আগুন—মাংসের ক্বাথ, কাবাব, আঙুর, পিচ, বাবাসোতি ফল। আরেক ভাগে পড়ে শীত, অন্ধকার, ভয়, খিদে, ধমক, চড়-চাপড়, ছুটে পালানো।

কাল রাতে জমজমাট দোকানপাটের ভেতর সে যখন সন্ধে সন্ধে যমুনার কাছাকাছি বিরাট এক সরাইখানায় চুলোর গা থেকে নাসিরি পরোটা আর পসিন্দা কাবাব খদ্দেরদের হাতে হাতে ধরিয়ে দিচ্ছিল—তখন চুলোর দপদপানো আগুনের শিখায় প্রথম সেই দুটো চোখ দেখতে পায় রানাদিল।

একজন লালাচোখা, ইয়া গোঁফওয়ালা লোক তার দিকে চোখে হেসে তাকিয়ে ছিল। হাতের কাবাব-পরোটা হাতেই ঠাণ্ডা হচ্ছিল তার। মাত্র দু'দিন হলো রানাদিল ওই সরাইয়ে ভর্তি হয়েছিল। ওখানে ধোয়াধুয়ির পাট দেখতে তারই মতো জনা ছ'সাত ছেলেমেয়ে সারাদিন কাজ করে। রানাদিলকে দেওয়া হয়েছিল—খদ্দেরদের হাতে হাতে খাবার ধরিয়ে দেওয়ার কাজ। লোকটার চোখের বাইরে চলে যাবার জন্যে রানাদিল এক ফাঁকে সরাইখানার ডানদিক দিয়ে শুকনো ফলের দোকানে ঢুকে পড়েছিল। খানিক এগিয়ে দেখে—সে লোকটা তার পিছু ছাড়েনি। তখনই ভয়ে রানাদিলের বুক শুকিয়ে আসে। এখন ছোট ছোট পায়ে সে ভিড়ের ভেতর দিয়ে ছুটে ছুটে নিরাপদ জায়গা ঠিক খুঁজে বের করে ফেলতে পারে। রোদে ছায়া, বৃষ্টিতে মাথার ওপর আড়াল, ঠাণ্ডায় গা-গরমের চুলোর কোল—সে ঠিক যোগাড় করে ফেলতে পারে। কী রকম দোকানপাট-সরাইখানায় কী রকমের খাবারদাবার—ঘুমোনোর জায়গাই বা কী রকম—তার একটা আন্দাজ রানাদিল এই বয়সেই করতে পারে এখন। খাবে কম—খাটবে বেশি, জিনিসের খাঁই কম—এমন কুচোকাঁচা পেলে কোন্ দোকানি পসারিই বা ফেরায়! না, ছাড়ে?

মুন্সি চন্দ্রভান আবারও জানতে চাইলো, কী করে সেঁধোলি ওখানে বলবি তো—

রানাদিল কাঁদতে কাঁদতে বললো, শীতের চোটে থাকতে পারিনি। গোলা খোলা পেয়ে ওখানে গিয়ে শুয়ে পড়ি।

—তখন আমরা কোথায়?

উঠোনের চারপাই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে রানাদিল বললো, তুসে মাথা ঢেকে ওখানে বসে বসে কথা বলছিলে—

চৌধুরী কল্পনাথ হাসতে হাসতে জানতে চাইলো, ভয় করেনি? এতবড় গোলা। তার ভেতর একা একা ঘুমিয়ে পড়তে পারলি?

মাথা নাড়লো রানাদিল। শেষে বললো, শুয়েই ঘুম এসে গেল।

—আর আমি চুল ধরে টানলে তবে ঘুম ভাঙলো!

রানাদিল কোনো কথা না বলে হেসে ফেললো।

কল্পনাথের কী হলো কে জানে! সে তার মুন্সিকে বললো, ওকে রেখে দাও। গোলায় ঝাটপাট দেবে। ইঁদুর দেখলে তাড়াবে—

—এসব কুচোকাঁচা বড্ড চোর হয়, হুজুর—

—হলে দেখা যাবে'খন।

—ভয়ডর পেয়ে শেষে রাতবিরেতে কী এক কেলেঙ্কারি না করে বসে—

—ভয়ডর? তা থাকলে তো মেয়েটার! না না ওকে রেখে দাও চন্দ্রভান—বলে রানাদিলের দিকে তাকালো চৌধুরী কল্পনাথ, এই তোর কে আছে রে?

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো রানাদিল।

—তোর মা বাবা কোথায়?

এবারও কোনো জবাব দিতে পারলো না রানাদিল।

—তুই হিঁদু? না, মুসলমান?

চুপ করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ ছল ছল করে উঠলো রানাদিলের। সে খুব আস্তে বললো, আমার নানাজান আছে—

—কোথায়? বলবি তো!

—সে জানি না—বলে ফুটে ওঠা হাসি মুখ থেকে মুছে নিলো রানাদিল।

—বাঃ! —বলে চুপ করে গেল চৌধুরী কল্পনাথ। তাকে যেন হঠাৎ এক বন্ধ দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঠিক এই সময় ভোরবেলার ঝকঝকে রোদের ভেতর বোরায় বোরায় গম বোঝাই দিয়ে গো-গাড়িগুলো এসে গোলার সামনে ভিড়তে শুরু করে দিলো! সিসল গাছের মোটা বাকলে বোনা বোরার রং শুকিয়ে কালচে মতো—তার ভেতর সোনালি গম বুঝিবা আসল নয়—ছবি আঁকা এমনই ফুটে উঠেছে—একদম জীবন্ত। গাড়ির তাগড়া তাগড়া বলদের পায়ের খুর ঘন কালো। তার নিচে রাস্তার ধুলো ঘোর লাল। কল্পনাথের চোখের সামনে সব এখন রঙিন। তার ভেতর সুরে একদম মিলছে না—শুধু রানাদিল।

ঠিক এরকমই সময়ে আগ্রা থেকে অনেক দূরে—আরও কঠিন শীতের ভেতর—আরও অনেক নদী, পাহাড়, গাছপালা পেরিয়ে এমনই ঝকঝকে রোদের ভেতর একটা খয়েরি পাথরের দুর্গ চকমক করছিল।

দুর্গ, প্রাসাদ, ঘরবাড়ি যেমন হয়—এখানেও তাই—বেশ উঁচু জায়গায় গেঁথে তোলা। মুলতান, পেশাওয়ার হয়ে কান্দাহার যাবার রাস্তার ওপরেই এই দুর্গ। দূরে দূরে উঁচু নিচু ডাঙায় দুম্বা, ভেড়া চরাতে এসে রাখালরা এই দুর্গ দেখিয়ে বলে—লাহোরি কোঠি।

আসলে কাবুল, কান্দাহার, হিরাট যাবার পথে মুঘল তাগদের চিহ্ন এই লাহোর দুর্গ। দুর্গের পাথুরে গাঁথুনি ঘিরে যে নালা—তা সব সময় ভরে রাখা হয়, রাভির জলে দিয়ে। এখন শীত বলে নালায় জল প্রায় নেই। জায়গায় জায়গায় জলের ভেতর থেকে নালার লাল-নীল পাথর দেখা যায়।

ময়ূর, সিংহ, কাকাতুয়া, কুমির—সবকিছুই এই দুর্গে আছে। বাদশা

জাহাঙ্গীর এসব ভালোবাসতেন। তিনিই এক এক দুর্গে একে একে এদের রেখে গেছেন। পেশাওয়ারমুখো দোতলার পশ্চিমি চত্বরে রোদের দিকে পিঠ দিয়ে এক মহিলা ময়ূরের ডাকে চমকে চমকে উঠছিলেন। তিনি জানেন, ময়ূর বড় শীতকাতুরে। এই দুর্গের কোথায় কী আছে তাও তিনি ভালোভাবে জানেন। অনেকবার তাঁকে আসতে হয়েছে এখানে। বাদশা জাহাঙ্গীরের সঙ্গে। এসে থাকতেও হয়েছে একটানা। দুর্গের জলাধারে কুমির এখন রোদ পোহাচ্ছে। সে ডাকে না। সিংহ খাঁচায়। সে ডাকে না। ঝিমোয়। কাকাতুয়াগুলো কি আছে? সবই বাদশার এক এক সময়ের খেয়াল। ডাকে শুধু ময়ূর। ওরা শীতে বড় কাহিল হয়ে পড়ে। ময়ূরের এই নিরুপায়, কর্কশ গলা দুর্গের পাথর চিরে চিরে বসে যাচ্ছিল। পাথর যেন বা কারও কণ্ঠ ধরে রাখার জন্যে পেতে দেওয়া পিঠ।

আবারও ডেকে উঠলো ময়ূর। আর পারলেন না মহিলা। তাঁরই নিজের পিঠে যেন সে-ডাক চিরে বসে যাচ্ছে। হাতের কাছে রেশমি ডোরিতে টান দিলেন। সে ডোরি পাথরের অলিন্দ দিয়ে কত দূর চলে গেছে—জানার কোনো উপায় নেই। চারদিক স্তব্ধ। মাথার ওপর পরিষ্কার আকাশ। নিচে পরিষ্কার পাহাড়ি বাতাস। কোথাও কোনো অসুবিধা রাখা হয়নি মহিলার জন্যে। একটু বাদে হাজিরা বাঁদি এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো।

—ময়ূরটাকে থামাও। কিছু খেতে দাও।

—খাবারের অভাব নেই।

—তাহলে?

—কেউ বুঝতে পারছে না—কেন ও অমন করে ডাকছে—

—আমি একবার দেখবো। বোধহয় শীত করছে ওর। কিছু দিযে ঢেকে দেওয়া দরকার ময়ূরটাকে—

বাঁদি বললো, আপনি তো যেতে পারবেন না। হুকুম নেই—

—এ জন্যেও হুকুম লাগবে! —বলে একটু হাসলেন মহিলা। তারপর বললেন, কে হুকুম দেবে?

—এখন তো কেউ হুকুম দিতে পারবে না—

—বাঃ: —ভীষণ অবাকই হলেন মহিলা। তাঁর বাঁ গালে পিছন থেকে রোদ এসে পড়ায় লাল হয়ে উঠছে। তিনি উসখুস করে উঠলেন। এমন বেয়াদব বাঁদি কখনো তিনি দেখেননি। খুব শান্ত গলায় তিনি জানতে চাইলেন, হুকুম নেই? আবার কেউ হুকুমও দিতে পারবে না এখন? তাহলে?

বাঁদি এবার অনেক বেশি ঝুঁকে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো। তারপর বললো, অপরাধ নেবেন না আমার কথায়। যা হুকুম—তাই আপনাকে জানলাম। হিন্দুস্থানে শুধু বাদশাই আপনাকে হুকুম দিতে পারেন। তা কে বাদশা হবেন —তাই-ই তো এখনো ঠিক হয়নি আগ্রায়।

মহিলা শান্ত চোখে বাঁদির মুখে তাকালেন, সরল সাদাসিধে মুখ। এদিককার পাহাড়ি ইউসুফজাই ঘরের মেয়েই হবে বাঁদিটি। ওর কোনো দোষ

নেই। আগ্রার দেওয়ানখানা থেকে যেমন হুকুম এসেছে—ও তাই তাই করে চলেছে।

উঃ! অসহ্য। ময়ূরটা আবারও ডেকে উঠলো। নূরজাহান বেগম ঘুরে বসলেন এবারে—যাতে ও ডাক কানে না পৌঁছয়। তিনি বুঝলেন, এই হুকুম কে দিয়েছে। কে দিতে পারে। তিনি নিশ্চিত হলেন—যে এই হুকুম দিয়েছে—সে-ই হিন্দুস্থানের বাদশা হবে। হলে—নিশ্চয় তাঁকে ময়ূরের কাছে যেতে দেওয়ার হুকুম পাওয়া যাবে।

।। ছাব্বিশ ।।

নাসিক থেকে সুলতান মহম্মদ দারাশুকো আর সুলতান আওরঙ্গজেবকে রাওয়ালপিণ্ডি পাঠাতে হয়েছিল—তা দু'বছরেরও বেশি হয়ে গেল। শাহজাদা খুররম যাতে আর হামলা লড়াই চালাতে না পারেন—সেজন্যে তাঁর এই দুই ছেলে—কচি দুই সুলতান জামিন হিসেবে গচ্ছিত ছিল বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীরের কাছে—রাওয়ালপিণ্ডি দুর্গে।

সেদিন দুই সুলতানকে নিরাপদে রাওয়ালপিণ্ডি দুর্গে পৌঁছে দিয়েছিলেন যে রিসালাদার দবির খাঁ—সেই দবির খাঁ আজ লাহোর দুর্গের সর্বেসর্বা। হিন্দুস্থানে যে সেপাই সময়ের ওপর নজর রেখে সময়মত ঝাঁপিয়ে পড়ে—সময় বুঝে কুর্নিশ করতে পারে—নসিব তো তারই দিকে।

রাভি নদীর জল দিয়ে ভরাট করা নালায় ঘেরা লাহোর দুর্গে ডান হাত জানে না বাঁ হাতের খবর। ডানদিকের অলিন্দে যখন আকাশের মেঘ দেখে ময়ূর পেখম মেলে ধরে—ঠিক তখনই বাঁ দিকের পাতাল ঘরেই হয়তো দামি কয়েদীর চোখে আকন্দর আঠা মাখানো হয়—যাতে কিনা সে আর কোনোদিন যেন কিছু দেখতে না পায়।

এ-বছর শীতে হিন্দুস্থান কাবু। গঙ্গা বাঁয়ে রেখে শের শাহর বানানো সড়ক-ই-আজম ধরে দিনে দিনে উটের কাফেলা যায় মুলতান, পেশাওয়ারের দিকে। সন্ধে হতেই সব সুনসান। খাইবারের দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা উট আর ঘোড়া সইতে পারে না বলেই জানোয়ারদের মাথা থেকে সূক্ষ্ম পশমের ওড়না ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

এখন দুপুরবেলা। দুর্গের বাইরে দুম্বাগুলোকে রোদ পোহাতে ছাড়া হয়েছে। বেলা পড়তেই আবদারখানার লোকজন ওদের তুলে নিয়ে যাবে। গোস্তের নিত্য রসদ দুম্বা ছাড়া কে যোগাবে এখানে!

লাহোর দুর্গের শিকদার-ই-শিকদারান দবির খাঁ বাদশা-বেগম নূরজাহানের মুখোমুখি হলেন। বিশাল খোলা চত্বরে ধারালো একখানা ঝকঝকে তলোয়ারের মতোই নূরজাহান বেগম রোদের ভেতর চকচক করছিলেন। চোখ থমথমে। বোঝাই যায় রাতে ঘুম হয়নি। বিরাট আঁখি পল্লবের ছায়া যেন পড়েছে মুখে। সেই মুখ ঘিরে কালো চুলের ঢাল। সে মুখে পাতলা রেশমি আড়ালের জালি।

শিকদার-ই-শিকদারান দবির খাঁ কুর্নিশ করতেই ফিরে তাকালেন নূরজাহান বেগম। কিন্তু কোনো কথা বললেন না।

—মুল্লুকে মালিকা। আশা করি ভালো ঘুম হয়েছে।

—চেষ্টার তো কসুর করিনি। কিন্তু ঘুম আসেনি আদৌ—!

—কী করতে পারি হুকুম করুন বাদশা-বেগম—

সবটাই ঠাট্টা বলে মনে হলো নূরজাহান বেগমের। সে বাদশাই আর নেই—তো তিনি কী করে আর বাদশা-বেগম থাকেন? কী করেই বা এখনো তিনি মুল্লুকে মালিকা থাকেন? কয়েদ হবার পর আগ্রা থেকে লাহোর—এই টানা রাস্তা তাঁকে আনা হয়েছে ইংলিশস্তানের ইলচি টমাস সাহেবের ভেট দেওয়া আট ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে। রাতের অন্ধকারে শীতের ভেতর লাহোর দুর্গের সামনে এসে নামলে এই দবির খাঁ-ই তাঁকে পুরোদস্তুর সালামি জানিয়ে দুর্গের নালা-পোলের এপারে নিয়ে এসেছেন। কোনটা হয়রানি—কোনটা অপমান—কোনটা সযুত আইনি মোতাবেক হলো—তা এখন গুলিয়ে যাচ্ছে নূরজাহান বেগমের। এ দুর্গও তাঁর চেনা। বহুবার বাদশার সঙ্গে এখানে এসেছেন।

নূরজাহান বললেন, না, এখন আর হুকুম নয়। আপনাকে তো আমি চিনি দবির—

—বিলক্ষণ চেনেন।

—আপনি তো আগ্রা দুর্গের হপ্তচৌকির বদলি সেপাই ছিলেন।

—হ্যাঁ মুল্লুকে মালিকা। সবই আপনার রহিমে—

—সেখান থেকে আমিই আপনাকে শাহজাদা খুর্রমের ঘোড়সওয়ারদলে ভর্তি করাই। শাহজাদা তখনো বাগী হননি। নর্মদা পেরিয়ে খুর্রমের ওপর নজর রাখতে—হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনিই ছিলেন আমার কাসীদ।

—ওসব পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ কী! ওসব বিলকুল ভুলে যান বাদশা-বেগম!

—তা তো যাবোই। কিন্তু আমি যে ভুলতে পারছি না দবির খাঁ—আমার দেওয়া ইজফার জোরে আপনি শাহজাদা খুর্রমের ঘোড়সওয়ার দলে রিসালাদার হলেন। হয়ে আমাকেই ভুলে গেলেন! ভুলে গেলেন—আপনি আমারই কাসীদ, গুপ্ত খবরের কাসীদানা করে আপনি আমারই হুকুমে ফি-পূর্ণিমায় তনখার সঙ্গে আলাদা করে আশরফি পেতেন বছরের পর বছর।

· —আমি আমার পুরনো মুনিবের সামনে দাঁড়িয়ে। যা হুকুম করবেন—তাই তামিল হবে। আমি নিমক হারাম নই বাদশা-বেগম—

—শেষ যা শুনেছিলাম—মহম্মদ দারাশুকো আর আওরঙ্গজেব—দুই সুলতানকে বাদশার মবারকে গচ্ছিত করে আসতে আপনিই নাসিক থেকে রাওয়ালপিণ্ডি যান—

—ঠিকই শুনেছেন মুল্লুকে মালিকা।

—ততদিনে দুনিয়ার দশ-পঁচিশি খেলায় আপনি আপনার জায়গা ঠিক

চিনে নিয়েছেন দবির খাঁ! ছিঃ! ছিঃ! খোদাতালার এই দুনিয়ায় কি ইনসাফি উঠে যাবে? ফেরেস্তারা কি ইনসানের ওপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন? এককালের পোষা কাসীদ—এককালের হপ্তচৌকির রাত পাহারার মামুলি সব সেপাইরা কি সবাই হিন্দুস্থানের দুর্গে দুর্গে শিকদার-ই-শিকদারান হয়ে বসবে!

বেগম নূরজাহানের কথার শেষদিকটা হুলে ভর্তি ছিল। দুম্বার গোস্তের মালঘোবার সঙ্গে দুর্গের আবদারখানা থেকে আজ দুপুরের নাস্তায়—দবির খাঁকে দেওয়া হয়েছিল রেকাবি ভর্তি ছোট পাকা আঙুর। সেই সঙ্গে দইয়ে মাখা নার্সিরি পরোটা। গলা ভেজাতে বিকানিরের তেজী আশা। নিশ্চিন্ত নিরাপদ এমন জীবনে দুর্গস্বারী করে শীতের আরামের দুপুরে কার বা ভালো লাগে অমন গা-জ্বালানো কথা শুনতে! বাদশা-বেগমের কথাগুলো টং করে মাথায় গিয়ে লাগলো দবির খাঁয়ের। এখন যে তিনি একজন রীতিমত মানী ইনসান। সবাই চেনে। লাহোরের মতো জায়গায় দুর্গস্বারী।

—বর্ধমান থেকে আগ্রাও তো কম রাস্তা নয় বাদশা-বেগম! সবটাই কি ইনসাফি?

-বেতমিজ।

—কে না ওপরের ধাপে উঠতে চায়? আমরা উঠলেই বে-ইনসাফির চর্চা হয়। বড় ঘরের বেলায় তো এসব কথা ওঠে না। ফৌজদারনি থেকে বাদশা-বেগমে ইজফা পেলে কে কথা তোলে! কার এত সাহস?

নূরজাহান বেগম নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। ছাইসুদ্ধ রাতের ঠাণ্ডা আগেনগারটা তুলেই ছুঁড়ে মারলেন। নানা অবস্থার নায়ক—কিংবা বলা ভালো—নানা দুরবস্থার শিকার দবির খাঁ সময়মত নিজের মাথাটি সামান্য সরিয়ে নিলেন।

উল্টোদিকের নিরেট পাথুরে দেওয়ালে পড়ে আগেনগারটা শব্দ করে মেঝেতে পড়লো। নিচু হয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে জায়গামত রাখলেন দবির খাঁ। রেখে বললেন, সারা হিন্দুস্থানের সবচেয়ে মানী মেহমান আপনি এখন! আর কী ছুঁড়ে মারবেন বলুন। আমি নিজে এগিয়ে দিচ্ছি—

উল্টোদিকে দাঁড়ানো নূরজাহান বেগম কোনো কথা বললেন না। তিনি যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন—তেমনি রইলেন।

শিকদার-ই-শিকদারান দবির খাঁ দেখলেন, কালো চোখ থেকে সাদা জল কালো কামিজের ওপর পড়ছে।

তখন দবির খাঁ বললেন, আপনি হুকুম করুন। আপনার সব অসুবিধা দূর করতে সেসব হুকুম এখুনি তামিল হবে মুলুকে মালিকা—

নূরজাহান চোখ তুলে চাইলেন। ভালো করে দেখলেন দবির খাঁকে। তাঁরই এককালের খিদমদগার। দয়াপ্রার্থী। মুখে হাসি ফুটে উঠলো বেগমের। তিনি বললেন, আমি চাই আজাদি। আমায় আজাদ করে দেওয়া হোক—

দবির খাঁ চত্বর মুখে দাঁড়িয়ে দুর্গের পেছনে দূরে পাহাড়ের গা দেখতে

পাচ্ছিলেন। গত বর্ষায় ধুয়ে যাওয়া পাহাড়ের গা পড়ন্ত শীতের বেলার রোদে লাল দগদগে।

—তা হয় না মুলুকে মালিকা। আজাদি আমার এক্তিয়ারের বাইরে। বাকি যা চাইবেন—তার সব আমি দিতে পারি।

নুরজাহান বেগমের মুখখানা নিভে আসছিল।

তখন লাহোর দুর্গের শিকদার-ই-শিকদারান দবির খাঁ বলে চলেছেন, আপনি ওই পাহাড়ের ছায়ায় গিয়ে বসতে পারেন। আপনার শাহী গাড়ি সব সময় এখানে মজুদ আছে।

আপনি ইচ্ছে করলে শাহী খাজনাখানার জন্যে চুনী মুক্তো যা এখানে এসে জমা হয়—তারপর আগ্রা যায়—তা সব যাচাই বাছাই করে দিতে পারেন—

কিংবা, আপনি তো শালিমার বাগের গোলাপ চাষ দেখতে পারেন। সিরাজের গোলাপ, ইস্পাহানের গোলাপের পাশাপাশি আমরা লখনউ, জৌনপুরের গোলাপ ফোটাচ্ছি—একই মাটিতে। আপনি ঘুরে দেখতে পারেন—

এ কথাতেও যখন বাদশা-বেগম কোনো কথা বললেন না—তখন দবির খাঁ নিতান্ত অসাবধানতাবশে বলে বসলেন, আপনার দামাদের দেখাশুনো করতে পারেন তো—

—কে?

—শাহজাদা শারিয়ার—

—কোথায় সে?

—লাহোর দুর্গে তিনিও একজন মেহমান।

ধক করে উঠলো নুরজাহান বেগমের বুকের ভেতরটা। তিনি খুব নিরুপায় হয়েই জানতে চাইলেন, শাহজাদা বেগম? লাডলি বেগম? সে কোথায়?

—তিনি যেমন ছিলেন—আগ্রা দুর্গেই আছেন। আপনি দামাদকে দেখবেন? যদি তাঁর কিছুর দরকার থাকে। বলা তো যায় না।—অবশ্য এমন মেহমানের জন্যে আমরা কোনো ত্রুটি রাখি না। দেখবেন? দেখবেন আপনার দামাদকে?

নুরজাহান বেগম মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। প্রায় অস্ফুটে বললেন, নাঃ!

· ঠিক তখন লাহোর দুর্গের বড় ঢাকা পথ দিয়ে দু'জন তাজা জোয়ানকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। একজনের এখনো তেইশ হয়নি! দীঘল—শায়ের ঢং-এর চেহারা। অন্যজনের কিছু ভারি কাঁধ। চওড়া বুক। মোটা গোঁফ। কালো কুচকুচে ভ্রূ। তাঁর পা ফেলার ভঙ্গিতে খোদ বিশ্বাস যেন পায়ের নিচে পড়ে ছিটকে ছিটকে যাচ্ছিল।

চওড়া বুক তাজা জোয়ান সুলতান দাওয়ার বকস্। তাঁর পাশে পাশে ছুটে ছুটে যিনি হাঁটছিলেন—তিনি শাহজাদা শারিয়ার। দু'জনেরই পায়ে

শেকল। পিছমোড়া করে হাত বাঁধা। ওঁদের দুজনকে ঘিরে জনা বারো হাট্টাকাট্টা জবরদস্ত বাছা সেপাই। সবার হাতেই খাপ খোলা তলোয়ার।

এগোতে এগোতে সুলতান দাওয়ার বকস্ বললেন, আর যাই হোক—আমাকে নিশ্চয় পপির শরবত দেওয়া হবে না।

শাহজাদা শারিয়ার অত ভারি শেকল বয়ে বয়ে অমন জোরে হাঁটতে পারছিলেন না। বাঁদিকে একটু ঝুঁকে পড়ে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, সে কি আমাদের ইচ্ছায় হবে!

সুলতান দাওয়ার বকস্ বেশ জোরেই কথা বলেন। সব কথায় তাঁর শরীরের জোর ফুটে ওঠে। তিনি খোলা গলায় বললেন, চাচা হুজুরকে তো বিনতি পাঠিয়েছি—আর যাই হোক আমায় যেন পপির শববত না দেওয়া হয়। আফিমের ওই বিষ গিলে সব ভুলে মেরে সারাজীবন বেঁচে থাকার চেয়ে আমায় সিংহের খাঁচায় ফেলে দিলেও আমার কোনো আপত্তি নেই—

শাহজাদা শারিয়ার ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলেন। বললেন, সিংহের খাঁচায়?

—হ্যাঁ। চাচা হুজুর শাহজাদা খুর্রমকে তাই বলে বিনতি জানিয়েছি। সিংহের মুখোমুখি হলে তো লড়াই করে মরতে পারবো। দুনিয়ার কোনো সিংহই আমায় এক থাবায় কাবু করতে পারবে না। মরবার আগে সিংহকেও আমি রীতিমত ঘায়েল করে যাবো।

হাঁটতে হাঁটতেই পাহারার সেপাইরা ওঁদের কথা শুনছিল। কিন্তু কিছু বলছিল না। শীতের নির্জন দুপুরে পাথুরে দেওয়াল সাক্ষী রেখে এই দুই কয়েদী লম্বা পা ফেলে এগোচ্ছিল। ওঁরা সাধারণ কয়েদী নয়। একজন শাহজাদা। অন্যজন সুলতান।

লম্বা লম্বা ঢাকা পথ এবার ডানদিকে বাঁক নিতেই পাহারা সেপাইরা সম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে গেল।

শাহজাদা শারিয়ারের বুকটা কেঁপে উঠলো। তাঁর এখুনি মরে যাবার ইচ্ছে নেই কোনো। কিন্তু শাহী ঘরানায় নিজের ইচ্ছেয় চলা যায় না। তিনি বুঝতে পারছিলেন—এই লাহোর দুর্গের কোথাও তাঁদের জন্যে মৃত্যু ওত পেতে বসে আছে। সেপাইদের দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে শাহজাদা ভয়ঙ্কর ভয়ে বলে বসলেন, এখানেই সিংহের খাঁচা?

একজন সেপাই সঙ্গে সঙ্গে সামান্য হেসে বললো, নাঃ! স্রেফ জল-সিংহ! —বলতে বলতে সে শাহজাদা, সুলতান—দুজনেরই পায়ের শেকল হাতের কড়া চাবি দিয়ে খুলে দিলো।

তার খোলা শেষ হতে না হতে সুলতান দাওয়ার বকস্ আর শাহজাদা শারিয়ারের পায়ের নিচের পাটাতন মতো জায়গাটা মুহূর্তে বসে গেল।

শারিয়ার আর দাওয়ার বকস্ কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখলেন, ওঁরা নিচে পড়ে গেছেন। আর মাথার ওপর ঢাকা-পাথর মেঝে আবার বুজে গেল।

নিচেটা অন্ধকার। স্যাঁতসেঁতে। সেখানে দাঁড়িয়ে ওপরে তাকিয়ে বোঝা গেল—এভাবেই এ-দুর্গে পাথর সরিয়ে আচমকা কাউকে কয়েদ করা হয়। চেনা আজাদি থেকে হঠাৎই এভাবে কয়েদী করা যায়।

দাওয়ার বকসের গলার স্বরে তখনো উৎসাহ নিভে যায়নি। তিনি গমগম করে কথা বলে উঠলেন। ওই যে ঘুলঘুলি—ওখান থেকে আলো আসা মুছে যাবে খানিক বাদে। সন্ধে হতে বিশেষ বাকি নেই—

শাহজাদা শারিয়ার তখনো যেন আজাদ দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক হারাননি। সেই ভাবেই জানতে চাইলেন, কেন? এ-ঘরে বাতিদান দিয়ে যাবে না?

এ-সময় বাঁকা হাসি হাসলেন সুলতান দাওয়ার বকস্। ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে ঘরে আলো বলতে বিশেষ কিছুই আর ছিল না। বিদ্রূপে মুচড়ে আসা তাঁর মুখখানি কোনোরকমে দেখতে পেলেন শারিয়ার। তখনো পেশীতে, গলার স্বরে, বড় মুখখানার জেগে ওঠা চোয়ালে সব জোশ্, তেজ ধরে রাখতে পারছিলেন না সুলতান দাওয়ার বকস্। তিনি বলে উঠলেন, আমাদের গায়ের গরম কাম্বাদার সেই কখন খুলে নিলো!

কথাগুলোর ভেতরকার মানে শাহজাদা শারিয়ার ধরতে পারলেন না। তিনি আন্দাজে বললেন, দুর্গের বাইরেই ঠাণ্ডা বাতাস। ভেতরে তো তেমন শীত নেই। কাম্বাদার গায়ে না থাকায় শীত তো করছে না—

—তাই বলে শাহী ঘরানার মানুষজনের গা থেকে গরম জামাকাপড় খুলে নেবে! কখন খুলে নেয়!

দাওয়ার বকসের একথারও ইঙ্গিত ধরে উঠতে পারলেন না শাহজাদা শারিয়ার। তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না—আজাদ দুনিয়ার শেষ কাজ কোনটি? কোনটিই বা কয়েদী জীবনের পয়লা কাজ?

সুলতান দাওয়ার বকস্ সমান ভরাট গলায় বলে উঠলেন, কখন বা কয়েদীর বেড়ি-বাঁধন খুলে দেওয়া হয়?

শাহজাদা শারিয়ার বলতে যাচ্ছিলেন, আজাদ করে দেবার আগে—

দাওয়ার বকস্ নিজে থেকেই বলে উঠলেন, খোদ মওত-এর সামনে ঠেলে দেবার ঠিক আগে! সব ইনসানই মওত-এর সামনে দাঁড়ায় আজাদ হয়ে—মওতের সামনে দাঁড়ায় চিরকালের জন্যে আজাদ হতে—!

কথাগুলোর ভেতরকার মানে যতই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল—ততই নিজের চারপাশে তাকাচ্ছিলেন শাহজাদা শারিয়ার। পায়ের নিচে মেঝে ঠিক নয়—স্যাঁতসেঁতে ভিজে পাথর—এবড়ো খেবড়ো। ঘরটা কত বড় বোঝা যায় না। আলো মুছে এলো প্রায়। বাইরে এখন নিশ্চয় শীতের ছোট দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে। দেওয়াল কাছেও হতে পারে। দূরেও হতে পারে। এখানেই তাহলে মরতে হবে? কখন? কী ভাবে? ঘরখানা তো দুর্গের পাতালে? এটাই তাহলে গুমঘর? তাহলে আগেকার সব মুর্দা কোথায়? এইসব সাত পাঁচ মনে আসতেই শাহজাদা শারিয়ার কুঁকড়ে গেলেন। দাঁড়াতে দাঁড়াতে পা ধরে এসেছে। অথচ বসার উপায় নেই কোথাও। কোথায় বসবেন? খানিক গড়িয়ে নেবারও কোনো

উপায় নেই এখানে। কোনো ইনসান দুর্গের এই পাতাল ঘরে এসে একবার পৌঁছলে—তার জন্য বাইরের আজাদ দুনিয়া আর ওসব ভাবে না। বসা, শোওয়া, ঘুমোনো—ওসব এ-ঘরের জন্যে ভাবাই হয় না। শাহজাদা শারিয়ার এগোতে পারছিলেন না—পিছোতেও পারছিলেন না।

তিনি শান্ত গলায় বললেন, সুলতান! ভারি অদ্ভুত সময়ে আমরা দুজন এক জায়গায় হয়েছি।

দাওয়ার বকসের মুখ দেখা গেল না। তিনি কোনো জবাব দিলেন না।

শাহজাদা শারিয়ার বললেন, আগ্রা দুর্গে বন্দী হওয়ার সময় বুঝতে পেরেছি—হিন্দুস্থানে বড় একটা কিছু ঘটতে চলেছে।

এবারও সুলতান দাওয়ার বকস্ কিছু বললেন না।

শারিয়ার বললেন, আমরা কাছাকাছি বয়সের মানুষ। অথচ আপনি যতটাই সাহসী—লড়াকু—জানবাজ—আমি ততটাই না-লায়েক, আম-আতরাফ, ডরপোক্—জান-কাঙাল! আমি আপনার চাচা—

—কে? —সুলতান দাওয়ার বকস্ যেন গর্জে উঠলেন।

—আমি আপনার আব্বা হুজুর মরহুম শাহজাদা খসরুর সবচেয়ে ছোট ভাই শাহজাদা শারিয়ার—

—ওই নামে আমার আব্বা হুজুর শাহজাদা খসরুর কোনো ভাই নেই—

অন্ধকার হাতড়ে শাহজাদা শারিয়ার নিরুপায়ের গলায় বলে উঠলেন, মরহুম শাহজাদা খসরু আমার বড়ে ভাই--

—আব্বা হুজুর যাঁদের বড়েভাই—তাঁরা হলেন মরহুম শাহজাদা পরভেজ, শাহজাদা খুর্রম—

—আমি ওঁদেরও সবচেয়ে ছোটে ভাই!

সুলতান দাওয়ার বকস্ বাইরে ওপরে আজাদ দুনিয়ার কেতা মাফিক অভিজাত গলায় বলে উঠলেন, কোথায়! আমি তো জানি না। আমি জানি আব্বা হুজুরের ভাই—পরভেজ। তিনি আর নেই। আমি জানি আব্বা হুজুরের ভাই খুর্রম। তিনিই হিন্দুস্থানের বাদশা হতে চলেছেন। তাঁর হুকুমেই এই লাহোর দুর্গে আমাদের কুরবানি দিয়ে অকালে বকরি ঈদ মানানো হচ্ছে! আমার কুরবানির পর শাহজাদা খুর্রম ছাড়া তৈমুর বংশে আর কেউ থাকবেন না—যিনি আগ্রার মসনদের হকদার হতে পারেন! তবু বলবো খুর্রম—খুর্রম! হিন্দুস্থানের সেরা লড়াকু। তিনিই বাদশা হওয়ার লায়েক। তিনি বৈ আর তো কোনো ভাই নেই আব্বা হুজুরের—

শাহজাদা শারিয়ার বুঝলেন, মওতের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও এই দাম্ভিক জওয়ান কিছুতেই তাঁকে চাচা বলে মেনে নেবে না। আবছা অন্ধকার পাতালে তখনো সুলতান দাওয়ার বকসের জোরালো গলার রেশ মিলিয়ে যায়নি।

শেষ চেষ্টার মতো শারিয়ার বললেন, আমিই শাহজাদা খুর্রমের পরের ভাই। আমি তাঁর শেষ ভাই—শাহজাদা শারিয়ার।

—আমি জানি না—

এই অন্ধ দম্ভের সামনে শাহজাদা শারিয়ার ফেটে পড়লেন। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, মরহুম বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীরের চার ছেলে—

—তাই নাকি! আমি তো জানতাম তিন ছেলে।

—না। চার ছেলে। আমিই বাদশার সেই ছোট ছেলে। শেষ ছেলে। আমি আপনার চাচা হুজুর।

—তাই নাকি? আমি জানি না। আমি চিনি না।

এবার শাহজাদা শারিয়ার অন্ধকার পাতালে চেঁচিয়ে গলা চিরে ফেললেন। —মরহুম বাদশা নুরুদ্দিন মহম্মদ সেলিম জাহাঙ্গীর আমার আব্বা হুজুর। তিনি আমার জন্ম দিয়েছেন।

—হ্যাঁ! আপনি বাদশা নুরুদ্দিন মহম্মদ সেলিম জাহাঙ্গীরের বেজন্মা!

এরপর দুজনের কেউ কারও গলা আর শুনতে পেলেন না। ওপরের দুনিয়ার আলো ঢুকছে বলে পাতাল ঘরের যে-জায়গাটাকে ঘুলঘুলি ভাবা গিয়েছিল—সেখান থেকেই তখন তোড়ে জল ঢুকছিল। রাভি নদীর জল। যে-জল দিয়ে লাহোর দুর্গ ঘেরা নালা ভরাট থাকে।

অন্ধকার। নিরেট। তার ভেতর হাড় কাঁপানো ঠান্ডা জল পাতাল ঘরের মেঝে ভরে ফেলে ওপরে উঠছিল তাড়াতাড়ি। পাথরের ছাদ ছোঁবে। তার ভেতর সমবয়সী সাহসী অভিজাত সুলতান আর ভীরু না-লায়েক শাহজাদা —কে কী করছিলেন—তা জানতে চাওয়ার মতো কৌতূহল সারা লাহোর দুর্গে এখন একজনেরও নেই।

পেশাওয়ার যাবার সড়ক-ই-আজম এখন অন্ধকারে মুছে গেছে। দুর্গের ভেতর আগেনগারের নরম গরম পা বেয়ে কোমরে উঠছিল দাবির খাঁয়ের। তিনি দুই মুসাফিরের তারের বাজনা শুনছিলেন। সামনে আগুনে ঝলসানো পাহাড় টপকানো শীতের দেশের পাখির পাঁজর। বাইরের শীত এখানে ঢোকে না।

একজন সেপাই এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো।

—সব ঠিকমত হয়েছে?

সেপাই আবার কুর্নিশ করলো। ঠিক যেমনটি বলেছিলেন—চিনার গাছ-তলায় কবরও খুঁড়ে রাখা হয়েছে।

তারের বাজনা শুনতে শুনতে সমে এসে ফেরতা তাল দিলেন লাহোর দুর্গের শিকদার-ই-শিকদারান দাবির খাঁ। দিয়ে সেই ঝোঁকেই বললেন, তাহলে আর দেরি করা কেন? দুজনকে পাশাপাশি শুইয়ে দাও—

বলে ফের বাজনার সুরে ডুবে গেলেন দাবির খাঁ। এখন তাঁর সামনে শুধুই সুসময়—ইজফা—আশরফি। শুধু সময়কে ঠিক সময়ে ধরতে পারা চাই।

সেই রাতেই চিনার গাছতলায় অন্ধকারে একজন সাহসী অভিজাত সুলতানের পাশে একজন ভীরু না-লায়েক শাহজাদা ঘুমিয়ে পড়লেন।

লাহোর, মুলতান, পেশাওয়ার, খাইবার, কাবুল, হিরাট, কান্দাহারের শীত কম বেশি পাথুরে শীত। যেখানকার পাথর যেমন—সেখানকার শীত তেমন। সারাদিন ধরে পাথর যতটা তাপ টানে ততটাই উগরে দেয় সন্ধের পর—ধীরে ধীরে।

আগ্রা, জৌনপুর, ফতেপুর, কনৌজ, মথুরা, বৃন্দাবনের শীত আরেক রকমের। শাহী ফৌজি বনজারা চৌধুরী কল্পনাথের তো তাই মনে হয়। রাজধানী আগ্রার শহরতলি এই বিয়ানা মহল্লায় নিজের গোলায় বসে মুন্সি চন্দ্রভানের সঙ্গে তিনি হিসাব-নিকাশ করছিলেন। রোজিনাদার গো-গাড়ি, উটের-গাড়ি, খচ্চরের গাড়ির গাড়োয়ানরা যে-যার দাম, দামড়ির হিসেব বুঝে নিয়ে এই খানিক আগে চলে গেছে। এতক্ষণে তাদের বয়েল গাড়ির জানোয়াররা গলঘণ্ট বাজিয়ে দেহাতের পথ ধরেছে।

একসময় হিসেব কষতে কষতে মুন্সি চন্দ্রভানও ঢুলতে লাগলো। তখন কল্পনাথ বললেন, উঠে গিয়ে চোখে জল দিয়ে এসো—

লজ্জা পেয়ে চন্দ্রভান নিজেই চোখ ভালো করে ডলে আফিং আর তুঁতের বিক্রিবাটার হিসেব দেখতে লাগলো। দেখতে দেখতে রোকড় হিসেবে ফারসিতে একটা বড় অঙ্ক দেখে লাফ দিয়ে উঠলো। অ্যাতোটা আফিং কোথায় বিক্রি হলো কর্তা?

একথার কোনো জবাব না দিয়ে কল্পনাথ মোটা গলায় বললেন, ভুল করছো মুন্সি—ও হিসাব ইস্পাহানের ফারসিতে লেখা—তুমি ঠিক বুঝতে পারোনি—

—কিন্তু কর্তা—

—আজ এসো। তোমার ঘুম পাচ্ছে। হিন্দুস্থানের ফারসিতে লেখা হিসেব ধরতে যত সুবিধে—ইস্পাহান বা সিরাজের ফারসি হিসেবে তত সুবিধে নেই—

—কিন্তু কর্তা—

—আজকের মতো এসো চন্দ্রভান।

মুন্সি চন্দ্রভান কিন্তু কিন্তু করে চলেই গেল। চলে যেতেই কল্পনাথ অবাক হলেন। ইস্পাহানের সঙ্গে চৌধুরী কল্পনাথ গুপ্ত ব্যবসা চালিয়ে থাকেন। আফিং, তুঁত, নীল—কখনো বা তামাক, কাগজও পাঠিয়ে থাকেন কল্পনাথ। ইরানি ঘোড়ার কারবারিরা এদেশে ঘোড়া বেচতে এসে আফিং, তুঁত—এইসব কিনে নিয়ে যায়। সেরকমই কোনো বড় চালানের কথা কী করে যেন ওই খাতায় উঠে গেছে।

খাতা বন্ধ করে কল্পনাথ তাঁর গোলার পেছন দিককার কাঠের দোর ঢাকুনি-গুলো নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলেন। এখন ভেতর বাড়িতেই সবাই। এসময়টায় কেউ নেই এদিকে। একটা ঢাকুনি খুলে চাপ দিতেই অনেকগুলো ইস্পাহানি মোহর বেরিয়ে পড়লো।

তাড়াতাড়ি সেগুলো কুড়িয়ে আবার দোর ঢাকুনির ভেতর গুঁজে দিলেন কল্পনাথ। এখানেই তাঁর আফিংয়ের কারবারের—তুঁতের কারবারের নাফা

তিনি লুকিয়ে রাখেন। মুঘল শাহীতে আশরফি করা সোজা। কিন্তু রাখা বড় কঠিন। কেননা যত বড়ই হও না কেন—যত ধনপতিই হও না কেন—তোমার মৃত্যুর পর তোমার তাবত বিষয় আশয়ের হকদার হলেন গিয়ে খোদ বাদশা। লুকিয়ে ছড়িয়ে না রাখতে পারলে সব আশরফির মালিক হয়ে যাবেন শাহেনশা। তাই-ই হিন্দুস্থানের দস্তুর। সেইজন্যেই কল্পনাথ এত সাবধানী। হিসেবটা ইস্পাহানের ফারসিতে আভাসে ইঙ্গিতে টোকা থাকে।

ইংলিশস্তানের আশরফি, ইরানি আশরফি—কী নেই কল্পনাথের কাছে। চোখ কান খোলা রেখে তিনি যেমন আগ্রার শাহী হুকুমতকে রসদ যোগান—তেমনি ভিনদেশি ব্যাপারিদের চাহিদা টানের দিকে নজর রাখতে পারলে সামান্য সামান্য চোরা-গোপ্তা যোগান দিয়েই ভালো কামাতে পারেন। তাই সময়ে সময়ে এটা ওটা ভালো খেলেও কল্পনাথের মাথায়।

ইরান থেকে হিন্দুস্থানে যেমন ভালো জাতের ঘোড়া এসেছে—এসেছে সিরাজের গোলাপ, মদ, ইস্পাহানের আতর—তেমনি এসেছে ফারসি রুবায়-ই। তবু আদি ফারসি বলে কিছু থেকে গেছে এখনো ইস্পাহানে। সেই ফারসিই কল্পনাথের ভরসা—যাতে কিনা আভাসে সংকেতে বড় বড় চালানগুলো লিখে রাখা বায়।

—কে ? কে ওখানে ?

ফস করে একটা ছায়া সরে গেল। কল্পনাথ তাঁর হাতের গুপ্তিখানা শক্ত করে ধরে পা টিপে টিপে এগোতে লাগলেন। এইসময় এখানে কে হতে পারে ? সব জেনে গেছে তাহলে ? এমনকি ভিনদেশি আশরফির হদিসও। এবার সুলুকসন্ধান শাহী দেওয়ানখানার কাছারিতে পেঁ।ছে দিলেই হলো।

গত দু'তিনমাস ধরে বড় সুসময় যাচ্ছে। আগ্রা দুর্গ ঘিরে গুজবের পর গুজব। কেননা, বাদশা জাহাঙ্গীরের মসনদ আজও খালি পড়ে আছে। সারা হিন্দুস্থানের মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে অবস্থা একটাই—কী হয় ? কে হয় ? এই ফাঁকে ফৌজি ঠিকাদার চৌধুরী কল্পনাথ দু'হাতে কামিয়েছেন। ছাউনিতে ছাউনিতে নিরেস মাল এক নম্বর বলে গছিয়ে দিয়েছেন। কিছু পেয়ে মনসবদাররাও না করেননি। এই তো ক'দিন আগে পৌষ সংক্রান্তির ক'দিন পর জোর গুজব উঠলো ইস্পাহানের সফবি শাহ আগ্রার দিকে ছুটে আসছেন। অমনি তিনদিনের জন্যে বাজার থেকে দু'তিনটে ছোট ছোট জিনিস সরিয়ে রাখেন চৌধুরী কল্পনাথ। সৈন্ধব লবণ আর সাদা জিরে। আগে থেকে অনেকটা ধরা ছিল। চারদিনের মাথায় ছেড়ে দিতে কল্পনাথের কপাল হেসে উঠলো।

—কে রে ? কে দৌড়য় ?—বলতে বলতে হাতবাতিটা তুলে ধরে অবাক হলেন কল্পনাথ। আরে ! রানাদিল যে—বলতে বলতে হাতের গুপ্তিটা ছুঁড়লেন কল্পনাথ। যে একবার ভিনদেশি আশরফি রাখার জায়গাটা দেখে ফেলেছে—তাকে বাঁচিয়ে রাখা ঠিক হবে না।

সারাদিন ঝাটপাট দিয়ে গোলার কোণে ঘুমিয়ে পড়েছিল রানাদিল। এরকমই ঘুমিয়ে পড়ে থাকে রানাদিল প্রায়ই। খাবার জলের সুরাই ভরে রাখা।

যেখানটায় গণেশ বসানো—সেখানে খানিক জায়গা জুড়ে গোবর লেপা—ওজন কাঁটার চারদিক ঝাটপাট দেওয়া ছাড়াও চৌধুরী কল্পনাথের মেজাজ শরিফ থাকলে তাঁকে নেচেও দেখাতে হয় রানাদিলকে। দরকার মতো জিলিপিও কিনে আনতে হয় কল্পনাথের জন্যে। জিলিপি-মালাই কল্পনাথের প্রিয় খাবার। কাছের থেকে দেখে কল্পনাথকে সে চিনে ফেলেছে। আচমকা জেগে উঠে সবই এখন দেখতে পেয়েছে রানাদিল। আর ছোট্ট মাথায় কী চিন্তা এসেছে কে জানে! সব দেখেই সে দৌড়তে শুরু করে দিয়েছে। গোলায় থেকে থেকে সে এখন কল্পনাথের চোখ চেনে। সময়মত উবু হয়ে বসে পড়লো রানাদিল। মাথার ওপর দিয়ে গুপ্তিটা ছুটে বেরিয়ে গেল।

ছুটতে ছুটতে কাছে এসে কল্পনাথ দেখলেন, কোথায় কে! ধারে কাছেও রানাদিল নেই। গোলার বাইরে বিয়ানার রাস্তাটা আগাগোড়া অন্ধকার। সেই সঙ্গে হাড়কাঁপানো শীত। অতটুকু মেয়েটা গেল কোথায়! কুট্টনির খপ্পরে পড়লে বিক্রি হয়ে হিরাট কান্দাহারের ব্যাপারীদের হাতে গিয়ে পড়বে। পড়লে পড়ুক! নয়তো কোনোদিন আগ্রার কোনো মাণ্ডিতে ভুস্ করে ভেসে উঠবে। কল্পনাথ জানেন, এরা হারায় না। মরে না। কিছুদিন ডুব দিয়ে থেকে আবার ভেসে ওঠে।

পরদিন ভোরে রাজধানী আগ্রার বাইরে দিল্লি যাবার সড়ক ধরে রানাদিল যাচ্ছিল। উল্টোদিক থেকে উত্তুরে বাতাসের ঠাণ্ডা ঝাপটা এসে তার মাথার চুল উড়িয়ে নিয়ে যাবার যোগাড়। অ্যাতটুকু মানুষ—অথচ তার দু'ধার দিয়ে উটের কাতার চলেছে। বিশাল উঁচু উঁচু সব উট। সারা হিন্দুস্থানে রানাদিলের জন্যে থিতু হয়ে থাকবার মতো কোনো জায়গাই কি নেই?

নানাজান। নানিজান। তোমরা কোথায় আছো? আমি যে কিছুতেই তোমাদের খুঁজে পাচ্ছি না—

চোখ ছোট হয়ে এলো রানাদিলের। ঢেউ তোলা উঁচু নিচু মাঠগুলো ভাব ভালোবাসা করে বিশাল আশমানের নিচে প্রান্তর হয়ে পড়ে আছে। পাঁশুটে দুর্বায় ঢাকা সে সব মাঠের ভেতর আকন্দ ফুলের জঙ্গল। সাদা সব ফুলে ফুলে বুনো মাছি। তাদের একটা নেশা ধরানো মিষ্টি গন্ধ। রানাদিল বিরাট একটা পাকুড় গাছের নিচে এসে দাঁড়ালো। এখান থেকে চারদিক দেখা যায়। জায়গাটায় মাঠটা ঢেউ তুলে ওপরে উঠে গেছে। ওখান থেকে দেখতে পেল দূরে সাদা পাথরের আধখানা মতো গোল জেগে আছে। কোনো মসজিদ। মন্দিরও হতে পারে। সড়কের দু'ধারের মাঠে চাপ ধরে লালচে গম ফলে আছে। কোথাও কোথাও বা রেশমি যব। আবার কিছু এগিয়ে টান টান অড়হরের জঙ্গল। বিরাট একটা বাবলা গাছের ডাল থেকে একটা ফিঙে পাখি ডান হাতেই ছোলা ফলে থাকা মাঠে ঝাঁপ খেয়ে নামলো।

ঠিক এমনি সময় আগ্রার দিক থেকে মাঠের নিচু ঢাল ধরে আটটা ঘোড়ার মাথা ওপরে উঠে এলো। দেখতে দেখতে তাদের পেছনে ভারি সুন্দর একখানা

গাড়ি। সে-গাড়িতে খুব সেজে বসা এক বুড়ো। বুড়োকে ঘিরে খুব সুন্দর তিনটে ছেলে। বুড়োর মতো ওদের মাথাতেও জরির পাগড়ি। একপাশ থেকে চার ঘোড়ার দাবনা ঘামে ভিজে উঠেছে।

ভীষণ জোরে গাড়িটা ছুটে চলেছে। বাঁক নিয়ে ঘোড়াগুলো মুখের ফেনা তুলে ছুটে চললো। গাড়িটা ঘিরে চারদিকে কয়েক থাক ঘোড়সওয়ার। পুরো দলটা ছুটে চলে গেল দূরে আধখানা মতো জেগে থাকা পাথরের সাদা গোলের দিকে।

আট ঘোড়ার গাড়ি আর তাকে ঘিরে একদল ঘোড়সওয়ারের ছুটন্ত ঝোঁকে পথের পাশের পাকুড়তলায় ঘোঁট পাকানো এক দল ময়ূর ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। ওরা ভয় পেয়েছে। অতগুলো ঘোড়া একসঙ্গে এমন শব্দ করে তো ছুটে যায় না। বিশেষ করে এমন নির্জন জায়গায়।

—অনেক ময়ূর তো এখানে—

সুলতান সুজাঙ্গীরের একথায় বুড়ো মতো মানুষটি বললেন, আগে এই সেকেন্দ্রা কত সাজানো থাকতো। আকবর বাদশা গোলাপ বসিয়ে বসিয়ে চারদিক রঙিন করে রাখতেন। কত দেশের গোলাপ—

সুলতান দারাশুকো জানতে চাইলো, আপনি তখন দেখেছেন নানাসাহেব?

উজিরে আজম আসফ খাঁ বললেন, আমার তখন তাজা জওয়ানি। তোমাদের আম্মিজান বেশ ছোট। তখন আরজুমন্দকে নিয়ে এখানে এসেছি। ওই যে কোয়েল নদী দেখলে পথে—তাতে জল দেখেছি তখন। সার দিয়ে কোয়েলের তীরে পাইনের বন ছিল।

—পরদাদা আকবর বাদশা জায়গাটা খুব ভালোবাসতেন?

আসফ খাঁ বললেন, তিনি চেয়েছিলেন—এই সেকেন্দ্রা হবে চাঘতাই বংশের সমাধিবাগ। তৈমুরের বংশের সবাই মৃত্যুর পর এখানে ঘুমিয়ে থাকবেন।

সুলতান আওরঙ্গজেব আস্তে বললো, রাজধানী আগ্রা থেকে আমরা বোধহয় এক মঞ্জেল মতো এসেছি—

ওদের নানাসাহেব খুব খুশি হয়ে বললেন, ঠিক বলেছো। আগ্রা থেকে দিল্লির পথে সেকেন্দ্রা ঠিক এক মঞ্জেলের পথ। —বলতে বলতে আসফ খাঁ তাঁর মেয়ের ঘরের ছেলে আওরঙ্গজেবের গলার কাছটায় পশমি কাম্বাদার কিছুটা উঁচু করে টেনে দিলেন। যা ঠাণ্ডা পড়েছে—

একখানা শাহী গাড়ি যেমন বেগে ছুটতে পারে—চারদিক কাঁপিয়ে—শব্দ করে—ঠিক তেমন করেই আটঘোড়া সারা গা ঘামিয়ে গাড়িটা নিয়ে ছুটছিল। চারদিক নির্জন। তার ভেতর এই শব্দ দূরের দিগন্তে গড়িয়ে যাচ্ছিল।

—তোমাদের পরদাদা বাদশা জালালুদ্দিন আকবর এই সমাধির জায়গার নাম রেখেছিলেন—বেহসত্ বাগ। সেকেন্দর শাহ লোদির নামে জায়গার নাম হয়েছিল সেকেন্দ্রা। সেখানে রাজপুতানার পাথর আনিয়ে তিনি গড়লেন ফোয়ারা, আকবরি দরওয়াজা, বেহসত্ বাগ্। ওই বাগের ভেতর তিনি ঘুমিয়ে

আছেন। ঘুমিয়ে আছেন তাঁর দু'পাশে দুই মেয়ে।

ঘোড়াগুলো পা ঠকাঠক করে বিরাট এক তোরণের সামনে এসে দাঁড়ালো। শ্বেতপাথরের বিশাল তোরণ। একজোড়া বড় হাতি দিব্যি যাতায়াত করতে পারে সেই তোরণ দিয়ে।

সুলতান সুজাঙ্গীর বললো, আকবরি দরওয়াজা ?

গাড়ি থেকে নামতে নামতে আসফ খাঁ বললেন, উঁহু। এ হলো গিয়ে জাহাঙ্গীরি দরওয়াজা। তোমাদের দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশার হুকুমে শ্বেতপাথর দিয়ে পরে এই দরওয়াজা তৈরি হয়েছে।

সুলতান মহম্মদ দারাশুকো দেখলো, জাহাঙ্গীরি দরওয়াজার গা দিয়ে বিশাল এক কালো বন। সাপ থাকতে পারে। কত কী থাকতে পারে ওখানে। মানুষজনের চলাফেরা নেই কতদিন এদিকে। জাহাঙ্গীরি দরওয়াজা দিয়ে খানিক এগিয়ে অনেক ছোট আরেকটি দরওয়াজা। লাল পাথরের। ওটাই নিশ্চয় আকবরি দরওয়াজা।

আগে থেকেই অনেক ফৌজি মানুষজন ওখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। সুলতানরা একে একে গাড়ি থেকে নামলো। আর ফৌজি মানুষজন দফে দফে ঝুঁকে পড়ে সুলতানদের কুর্নিশ করতে লাগলো।

উজিরে আজম আসফ খাঁ বললেন, আজ এখানে তোমাদের মা—তোমাদের আম্মিজান আসবে—

সুলতান দারাশুকো বলে উঠলো, আম্মিজান আসবেন! সত্যি?

—হ্যাঁ। আমার মেয়ে আরজুমন্দ তিন বছর হতে চললো তোমাদের দুজনকে দেখেনি—দেখেনি সুলতান সুজাঙ্গীরকে আরও কত বছর—

সুলতান সুজাঙ্গীর জানতে চাইলো, আম্মিজান আসবেন ?

—হ্যাঁ। তাকে তোমার মনে আছে ?

নানাসাহেবের একথায় বছর বারোর সুলতান সুজাঙ্গীর মনে করার চেষ্টা করলো, তার নিজের মা—মানে এই নানা সাহেবের মেয়ে দেখতে কেমন ছিল ? বিশেষ কিছুই তার মনে পড়লো না। বরং মনে পড়লো, দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশার কোলে বসে এই সামনে দাঁড়ানো নানাসাহেবের বাজানো সেলাম সে কতটা পেয়েছে—দাদাসাহেবের সঙ্গে ভাগাভাগি করে। সুজাঙ্গীর সামান্য হাসলো। সম্পূর্ণ আন্দাজে—

উজিরে আজম আসফ খাঁ বললেন, তোমাদের এতদিন ধরে দেখতে না পেয়ে তোমাদের মা পাগল হয়ে আছে—

সুলতান আওরঙ্গজেব জানতে চাইলো, আম্মিজান তো আমাদের আগ্রায় দেখতে পেতেন। কেন শুধু শুধু এতটা এলাম আমরা ?

হো হো করে হেসে উঠলেন আসফ খাঁ। হাসি থামিয়ে বললেন, তোমাদের আম্মিজান—আমার মেয়ে সেই আরজুমন্দ—এখন হিন্দুস্থানের বাদশার বেগম। তিনি এখন বেগম মমতাজমহল—

অবাক হয়ে তাকালো সুলতান মহম্মদ দারাশুকো। তাতে আগ্রায় দেখা

হওয়ায় বাধা কোথায় নানাসাহেব ?

—গুনে-গেঁথে দেখা গেছে—আজ রাজধানী আগ্রায় যাওয়া খুব শুভ নয়। তাই তোমাদের নিয়ে আমি পথে আগ্রা ফেলে সেকেন্দ্রায় এসেছি। রাজধানী যাওয়ার পথে ভুরাসানা মঞ্জেল তাঁবু পড়েছে বিরাট। সেখানে বিকেলে তোমাদের মায়ের সঙ্গে দেখা হবে—

দারার আর তর সইছিল না। কখন বিকেল হবে। এখনো যে অনেক দেরি। মা জিনিসটার ঠিক কোনো আন্দাজ নেই সুজার। সে মা বলতে বোঝে—বড় বড় চোখ, লম্বা চুল, ওড়নায় ঢাকা একখানি মুখ। নরম। নির্জন। কিন্তু সুন্দর।

সুলতান আওরঙ্গজেব বললো, ততক্ষণ আমরা ঘুরে ঘুরে দেখি।

আকবর বাদশার সমাধি লাল পাথরের। সেই সমাধি ঘিরে তোরণ। কারুকাজ করা। পাশেই শ্বেতপাথরের প্রাচীর। এ নিশ্চয় দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশার হুকুমে তৈরি। সুলতান দারাশুকোর মনে হলো—পরদাদা আকবর বাদশা চেয়েছিলেন—মৃত্যুর পরেও তৈমুরের বংশের সবাই এক জায়গায় থাকুক। তাই সমাধির জায়গার নাম দিয়েছিলেন বেহস্ত্ বাগ। চেয়েছিলেন এ বাগান স্বর্গ হয়ে উঠুক। সেই বাগে বসেছিল দুনিয়ার সেরা সেরা গোলাপ। বছর তেরোর সুলতান দাবার মনে হচ্ছিল—এখানে শীতের বাতাসে যে পাথুরে ধুলো সর্বক্ষণ উড়ে বেড়াচ্ছে—তা আসলে পরদাদা বাদশা জালালুদ্দিন আকবরের খোয়াব—বেহস্ত্ বাগের রেণু রেণু ধুলো—স্বপ্নের গুঁড়ো। এক একটা শাহী—কত বড় খোয়াব। ভাবলে মাথা ঘুরে যায়। সেই সব স্বপ্নের বাকি অবশেষ এইসব তোরণ। পাথরের কারুকাজ।

হাঁটতে হাঁটতে সুলতান দারাশুকো আকবর বাদশার সমাধির সামনে এসে দাঁড়ালো। শ্বেতপাথরে কুঁদে আঁকা শতদল পদ্ম। নীল রঙে রাঙানো জমিনে সোনালি পদ্ম। শীতের সকালের ঝকঝকে রোদে যেন এইমাত্র ফুটে উঠেছে।

দারার আবছা মনে পড়ছিল—সেই কোন্ শিশুবয়সে সে আর দিদি জাহানারা যেন একবার এদিকে এসেছিল। তখন সে খুব ছোট ছিল। চারদিকে পড়ে থাকা একটা ফাঁকা—ভাঙা শহর। তবে কি সেটা ছিল ফতেপুর সিক্রি ? ঠিক মনে নেই দারার। সব আবছা মনে পড়ে। সে ছিল বড় সুখের দিন। সে ছিল বড় সুখের সময়। এরকমই ঘোড়ায় টানা গাড়িতে আসা হয়েছিল। সে আর দিদি বসেছিল পাশাপাশি। মুখোমুখি বসেছিলেন আব্বা হুজুর আর আম্মিজান।

আজই বিকেলে আম্মিজানকে দেখতে পাবো। কতদিন পরে। কতদিন দেখি না।

।। সাতাশ ।।

বরগা এক বিরাট তাঁবু। এর নিচে কিছু কম দশ হাজার লোক দাঁড়াতে পারে। এখন সে তাঁবুর নিচে দাঁড়িয়ে মাত্র একজন। তাঁর পেছনে দূরে রাজধানী আগ্রা কলকোলাহল নিয়ে চাপা আক্ষেপের মতো জেগে আছে। তাঁর সামনে দূরে সেকেন্দ্রায় আকবর বাদশার সাধের বেহেসত্ বাগ।

এত বড় তাঁবুর নিচে একা দাঁড়িয়ে মমতাজমহল কোনো এক জায়গায় তাঁর চোখ স্থির রাখতে পারছিলেন না। তাঁবুর নিচে খসখসের চাল। তাঁবুর সঙ্গেও খসখস আর বেনা বুনে জুড়ে দেওয়া রয়েছে। তা ঢাকতে ভালো কিংখাপ আর মখমল এঁকে দেওয়া হয়েছে। আরজুমন্দ বানুর মাথার ওপর লাল মুলতানি বনাত। রেশমের দড়ি দিয়ে চারদিক টান টান করে বাঁধা।

মমতাজমহল আর স্থির থাকতে পারছিলেন না। এই ক'বছর টানা জঙ্গলে জঙ্গলে তাঁবুতে থেকেও তিনি খুব অস্থির হয়ে পড়তে দেননি নিজেকে। কিন্তু আজ এখন এই শীতের পড়ন্ত বিকেলে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছিলেন না। এখনো এসে পৌঁছলো না ওরা?

বরগা তাঁবুর এক দিককার দেওয়াল কাঠের। সেখানে কয়েকজন তাতার হাজিরা দাঁড়িয়ে। এরা সবাই এসেছে আগ্রা দুর্গ থেকে। ওদের কেউ-ই বুঝতে পারছিল না—নতুন বাদশা-বেগম অমন এদিক ওদিক চেয়ে খানিক এগিয়ে যাচ্ছেন কেন? কেনই বা আবার পিছিয়ে আসছেন? মমতাজমহলের পায়ের নিচে পাতা গালীম জায়গায় জায়গায় কুঁচকে যাচ্ছিল। সেইসব কোঁচকানো জায়গার এদিকে ওদিকে অবহেলায় পড়ে আছে কয়েকটি উঁচু উঁচু ফ্রানসিসি তাকিয়া। রাজধানীর যে কোনো রইস ওমরাহ ওদের দেখলেই চিনতে পারবেন। এসব তাকিয়া স্পেনে—তুরস্কে মুর সওদাগররা একসময় ব্যবহার করতো।

ঠিক এইসময় সবাই দেখতে পেল—সাদা সাদা আট ঘোড়ায় টানা একটি গাড়ি ভীষণ জোরে ছুটে আসছে। ধুলো উড়িয়ে। তার চারদিকে সমান বেগে ছুটন্ত ঘোড়সওয়ারদের পাহারা। এবার বাদশা-বেগমের নিভে আসা মুখ জ্বলে উঠলো। চলন্ত গাড়িতে একটি কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা মাথাকে ঘিরে তিনটি কালো কচি মাথা দুলতে দুলতে বরগা তাঁবুর দিকে নিমেষে ছুটে এলো।

বেগম আরজুমন্দ বানু নিজেই ছুটে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। পাহারাদার তাতার মেয়েরাই তাঁকে বাধা দিলো। ওরা জানে, বাদশা-বেগম কোন্ অবস্থায় কতটা এগিয়ে যেতে পারেন। আদৌ এগোবেন কিনা তাও ওরাই ঠিক করে থাকে।

রাশ টানতে ঘোড়াগুলো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চনমন করতে লাগলো। ঘেমে নেয়ে উঠেছে। গাড়ি থেকে প্রথমে নামলেন উজিরে আজম আসফ খাঁ। নেমে বাদশা-বেগমকে কুর্নিশ করলেন। তারপর একে একে নেমে এলো—তিন সুলতান—মহম্মদ দারাশুকো. সুজাঙ্গীর, আওরঙ্গজেব।

সুলতান দারাশুকো আম্মিজানকে দেখে চমকে উঠলো। নাসিকে দু'বছরেরও আগে শেষ দেখে আসা সেই আম্মিজান তো ইনি নন। কী দামি ওড়না—তেমনি জলুস গায়ের আঙরাখার, পায়ের চটিতে হীরে বসানো—তার ওপর মাথায় ছোট্টমত মুকুট—এ কী দশা হয়েছে আম্মিজানের?

দারার লজ্জা করছিল। কেমন যেন অচেনা আম্মিজান।

মমতাজমহল ছুটে এসে দারার মাথাটি বুকে চেপে ধরলেন। কোনো কথা বলতে পারলেন না। দারা টের পেল—আম্মিজানের চোখের জল ফোঁটা হয়ে তার মাথায় পড়লো।

তখন বাজিয়েরা তাঁবুর গুলালবারের পেছন থেকে বেরিয়ে এসে বাজাতে শুরু করে দিলো। বাংলা দিগর ঢোলের সঙ্গে বাঁশি। সেই সঙ্গে সানাই। মমতাজমহল চোখের জল রাখতে পারলেন না। তিনি ছুটে ছুটে এক এক ছেলের মাথা নিজের বুকের ভেতর টেনে নেন তো—সেই সেই সুলতান মাথা সরিয়ে অবাক হয়ে নিজের অচেনা আম্মিজানের মুখে তাকায়। আর বাদশা-বেগম এগিয়ে গিয়ে ছেলেদের মাথায় ঝুঁকে পড়ে ঘ্রাণ নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। পুরোটা পারেন না। দারার মাথার গন্ধ শুকতে গিয়ে দারা পিছলে যায়—আওরঙ্গজেব তো শুরু থেকেই দূরে দূরে থাকার চেষ্টা করে আসছে। সুলতান সুজাঙ্গীর এই আজব গোল্লা-ছুট খেলায় যেন বাইরে দাঁড়ানো কোনো দর্শক।

মমতাজমহল এবার আর কোনো ঝুঁকি নিলেন না। তিনি ছুটে গিয়ে সুজাঙ্গীরকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। আমি তোমারও আম্মিজান—বলতে বলতে আরজুমন্দ বানুর চোখ জলে ভেসে গেল। সুজাঙ্গীর চোখ ফিরিয়ে নিলো। সে এসব দৃশ্য সইতে পারে না সে মনে মনে বললো, মা বুঝি এইরকম হয়।

সুলতান সুজাঙ্গীর কোনো বাধা দিলো না। কোন্ ফাঁকে মমতাজমহলের মাথা থেকে হিন্দুস্থানের বাদশা-বেগমের মুক্তো বসানো মুকুটখানি পায়ের নিচে গালীমে পড়ে গেছে। সুলতান আওরঙ্গজেব তা কুড়িয়ে নিয়ে আম্মিজানের চোখের সামনে ধরলো। তা দেখেও ভ্রূক্ষেপ করলেন না মমতাজমহল। তিনি যেন হারিয়ে যাওয়া ছেলেদের আর হারাতে চান না।

সুজাঙ্গীরের দম বন্ধ হয়ে আসছিল আম্মিজানের বুকের ভেতর। সে এই ক'মাস নিতান্তই একা একা সব বুঝে ওঠার চেষ্টা করে আসছে। দাদাসাহেব বাদশা নুরুদ্দিন মহম্মদ সেলিম জাহাঙ্গীর চোখ বুজতেই তার দুনিয়া এক ঝোঁকে আগাগোড়া বদলে গেছে। কোথায় সেই হাতির গাদেলায় বসে দাদা-সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গ থেকে বেরিয়ে প্রান্তরে প্রান্তরে মাঠভাঙা? কোথায় বা ময়ূরদের খাওয়ানো? তোপখানার নিশানা-চাঁদমারি? দাদাসাহেবের কোলে বসে যাদের কুর্নিশের ভাগ পেয়েছে সে—এখন তাদের কুর্নিশ জানাতে হচ্ছে সুলতান সুজাঙ্গীরকে।

—আম্মিজান? আজ আমরা আগ্রায় যাবো না?

দারাশুকোর একথায় মমতাজমহল বললেন, না। আজ যাত্রা শুভ নয় কাল, তোমাদের আগ্রায় দেখা হবে—তোমাদের আব্বা হুজুর বাদশা শাহজাহানের সঙ্গে—

আব্বা হুজুর এখন বাদশা। একথা মনে মনে বললো দারা। আম্মিজান এখন বাদশা-বেগম। একথাও মনে মনে শুধু নিজের জন্যে বললো দারাশুকো। সে বাদশা-বেগম হিসেবে দেখেছে নুরজাহান বেগমকে। কী তাকানো। কী হুকুমদারি। কী চলাফেরা! নিজের বুকের ভেতর কেঁদে উঠলো দারা। ও আম্মিজান—তুমি পারবে না—কিছুতেই পারবে না অমন বাদশা-বেগমদারি। সে কি যে সে কাজ।

বাইরের পৃথিবীতে তখন আগ্রার দিক থেকে বহু মানুষের গলার স্বর দলা পাকিয়ে ভেসে আসছিল। সূর্য ঢলে পড়েছে যমুনার দিকে। ফতেপুর সিক্রির দিকে চলেছে উটের পাল। এক ঝাঁক ফিঙে উড়ে গেল সেকেন্দ্রার দিকে। পাখিগুলো কি দিল্লি যাবে! কী এক অদ্ভুত ভার হয়ে আসা অন্ধকারে বুক ভরে যাচ্ছিল দারার—যা কিনা সে বুঝিয়ে বলতে পারে না। সে যেন চাঘতাই শাহীর বিকেলবেলায় দাঁড়ানো। এখনই বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর—যে যার প্রিয় ঘোড়া বা হাতির পিঠে চেপে সামনে এসে দাঁড়াবেন। এসে কৈফিয়ৎ চাইবেন—তোমরা আমাদের হিন্দুস্থানের এ কী করতে চলেছে? কে তোমাদের এসব করার হুকুম দিলো?

ঠিক এমন সময় বরগা তাঁবুর গুলালবার কাঠের দেওয়ালের পাশ থেকে যে বেরিয়ে এলো—তাকে দেখে তিন সুলতানই অবাক। দারা চেঁচিয়ে উঠলো, জাহানারা আপা—

জাহানারা ছুটে এসে দারার হাত ধরলো। কী বড় হয়ে গ্যাছো—বলতে বলতে সে সুলতান দারাশুকোর মুখে তাকালো। গোঁফ দাড়ির ফিকে রেখা। বড় সড় পুরুষমানুষ হয়ে ওঠার আভাস।

সুজাঙ্গীর, আওরঙ্গজেব—দুজনই কাছে এসে দাঁড়ালো। আপা—

জাহানারার মনটা খুশিতে ভরে উঠলো। তুমিই সুজাঙ্গীর। কতদিন পরে দেখছি বলতো—তুমি তো আওরঙ্গজেব—

সুজাঙ্গীর, কিছুই বলতে পারলো না। সে অবাক হয়ে এই নারীর দিকে তাকালো। এই বয়সের সুন্দরী কোনো নিজের মানুষকে সে দাদাসাহেবের কাছে পিঠে কোনোদিন দেখেনি। নামটা জানা ছিল। অবাক হয়ে ভাবলো, এত সুন্দর আমার দিদি?

সবই দেখছিলেন মমতাজমহল। দেখে দেখে তাঁর পিপাসা মিটছিল না। কতদিন ওদের নিয়ে একই জায়গায় একই সুখদোলায় দোলা হয়নি। ওরা আমারই ছেলে। এবার আরজুমন্দ বানু এগিয়ে গিয়ে আলাদা করে সুলতান আওরঙ্গজেবের হাত ধরলেন। আওরঙ্গজেব অবাক হলো না। অস্বস্তিতে হাতও ছাড়িয়ে নিলো না। কিন্তু কোনোরকম আবেগ বেরিয়ে পড়ে পাছে—সেইজন্যেই যেন সাধারণভাবে নিজের হাতখানা বাদশা-বেগমের হাতের ভেতর

ঝুলিয়ে রাখলো মাত্র।

—আমি তোমার মা—

সুলতান আওরঙ্গজেব আস্তে বললো, সেকথা সারা হিন্দুস্থান জানে আম্মিজান—

থমকে গেলেন আরজুমন্দ বানু। আজ কতদিন ধরে এই দিনটির জন্যে তিনি বসে আছেন। কবে দেখা হবে ছেলেদের সঙ্গে? আর সেই ছেলে—মাত্র দশ বছর বয়সের আওরঙ্গজেব—তার ভেতর কি কোনো ওঠা পড়া নেই? কোনো ঢেউ নেই? ছেলের কোনো কষ্ট হয় না মায়ের জন্যে? মুঘল রক্ত কি এইরকম?

ছেলের মুখে তাকালেন মমতাজমহল। আওরঙ্গজেব চার ছেলের ভেতর বেশ ফর্সাই বলা যায়। চোখ জোড়া ভাবুক। মুখ দেখে মনের থই পাওয়া ভার। জোড়া ভ্রূ। এই দুনিয়ায় বাতাসের ভেতর—আলোর ভেতর মুখখানি কুঁদে বসে গেছে। আরজুমন্দ জানতে চাইলেন, দাদাসাহেবের জন্যে কষ্ট হয়?

বালক আওরঙ্গজেব খচ করে ঘুরে তাকালেন। একজন বাদশা তো নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। তিনি কি অন্য কারও দিকে তাকান যে—তাঁর জন্যে আবার কষ্ট হবে!

—তোমার আব্বা হুজুর প্রায় মাস খানেক হলো—হিন্দুস্থানের বাদশা। তোমাদের দেখবার জন্যে কাল দেওয়ানি আমের দরবারে আসবেন।

আব্বা হুজুর বাদশা—তাই আসবেন শাহজাদাদের দেখতে! শাহজাদারা যাবে বাদশাকে দেখতে!

কেন? একজন বাবা তো তাঁর ছেলেদের দেখতে চাইতে পারেন। ছেলেদেরও তো বাবাকে দেখার ইচ্ছে হতে পারে—

ঘন কালো চোখ জোড়া তুলে মায়ের মুখে তাকালো আওরঙ্গজেব। তারপর খুব শান্ত গলায় বললো, আম্মিজান। আপনি এখন বাদশা-বেগম। যখন শুধুই আম্মিজান ছিলেন—তখন কি ছেলেদের সঙ্গে দেখা করতে এত বড় করে বরগা তাঁবু গাড়তে হয়েছিল কোনোদিন মাঠের ভেতর?

থরথর করে কেঁপে উঠলেন মমতাজমহল। খানিক দূরে তাঁবুর শুরুয়াতে গালীমের ওপর উজিরে আজম দাঁড়িয়ে। মেয়ে আরজুমন্দ বানু তার ছেলেদের সঙ্গে অনেকদিন পরে একজায়গায় হয়েছে—তাই দেখে একা একাই আনন্দে আটখানা। তিনি মেয়ের কাছাকাছি আসতে পারছেন না। কারণ, আরজুমন্দ এখন বাদশা-বেগম—মমতাজমহল। হুকুম, ইজাজত ছাড়া শাহী মানুষজনের কাছাকাছি হওয়া যায় না। যা করা যায়—তা হলো কুর্নিশ। তসলিম। তাও দূর থেকে! উজিরে আজম তাই একটি কথাও শুনতে পাচ্ছিলেন না। সবই দেখছিলেন। শুনছিলেন নক্কারখানার বাজনদারদের বাঁশি, সানাই আর ঢোল।

শাহজাদী জাহানারা এক হাতে ধরেছে দারাকে। আরেক হাতে তার সুজা।

সুজার কাছে দিদি জিনিসটাই নতুন। সে অবাক হয়ে এই সুন্দরী মেয়েটিকে দেখছিল। কী স্বচ্ছন্দ। দারার সঙ্গে কথাবার্তায় কী সহজ। অথচ

আমি তো কোনো কথা বলতে পারছি না আপার সঙ্গে। নিজের ভেতরে লজ্জায়—ভীষণ হীন বোধ করতে লাগলো সুজাঙ্গীর।

নিজের সেজো ছেলের মুখে তাকালেন মমতাজমহল। খুব সাবধানে জানতে চাইলেন, এতদিন তো বাদশা-বেগম নুরজাহানকে দেখেছো ?

—খুব বেশি দেখিনি আম্মিজান। তিনি তো সবসময় ব্যস্ত থাকতেন।

—তাঁর সঙ্গে কথা বলেছো ?

—তিনি ডেকে পাঠালে গেছি। না-ডাকলে কি বাদশা-বেগমের কাছে যাওয়া যায় ?

এই বিশাল প্রান্তরে সন্ধ্যা হয় হয়। শীতের ধুলো মাখা ঘোড়াদের পায়ের দাপাদাপি। ছেলের কথা ক'টি মা আরজুমন্দের বুকের ভেতর ঢুকে পড়ে পাথর হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলো।

বাদশা বেগম আর একটিও কথা না বলে ঘুরে দাঁড়ালেন। তাই দেখে শাহজাদী জাহানারা ছুটে এলো।

—আমরা এখনি যাবো—

—এখুনি আম্মিজান ?

—হ্যাঁ। এখুনি—

দেখতে দেখতে বাদশা-বেগমকে নিয়ে আটঘোড়ার শাহী গাড়ি রাজধানী আগ্রার পথ ধরলো। এই গাড়িটি নুরজাহান বেগম আগ্রার বাইরে বেরোলে ব্যবহার করতেন।

সুলতান দারাশুকো অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়েছিল। আম্মিজান চলে গেলেন। সঙ্গে চলে গেল জাহানারা আপা। দিদি এই দু'বছরে কত বদলে গেছে।

সুলতান সুজাঙ্গীর নিচু হয়ে গালীম থেকে একটা কি কুড়িয়ে তুললো। মুক্তো ? না, এমনি পাথর ? সে জিনিসটা হাতে নিয়ে ঠিক করলো—কাল দেখা হলে আম্মিজানের হাতে দেবে। নিশ্চয় পায়ের চটি থেকে খুলে পড়েছে।

উজিরে আজম আসফ খাঁ ঠিক বুঝতে পারেননি—আচমকা কী হয়ে গেল। একজন উজিরে আজম হয়ে তিনি এসব কথা কচি সুলতানদের কাছে জানতে চাইতে পারেন না। আবার নানাসাহেব হিসেবেও এসব কথা তোলা যায় না। কিন্তু তাঁর মন বললো, কিছু একটা হয়েছে। তিনি সোজা সুলতান আওরঙ্গজেবের কাছাকাছি গেলেন। আরজুমন্দ তো শেষ কথা বলছিল আওরঙ্গজেবের সঙ্গেই।

যাওয়া মাত্র আওরঙ্গজেব জানতে চাইলেন, নানাসাহেব। একটা তুর্কি ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাজধানী কতক্ষণে যাওয়া যায়— ?

—কে যাবে তাই বুঝে !

এসব কথা সুলতান মহম্মদ দারাশুকোর কানে ভেঙে ভেঙে আসছিল। বাদশা বেগম গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে পাহারা ঘোড়সওয়াররাও দূরের বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেছে। খানিকবাদে গোয়ালিয়রের দিনকর শাহী সড়ক অন্ধকারে

মিশে যাবে। চিরকালের এই মুহূর্তটি কিসের ভারে যেন দারার বুকের ভেতর একদম চেপে বসে যাচ্ছে। আম্মিজান ছিলেন মা। হয়ে গেছেন বাদশা-বেগম। টান টান হেঁটে গিয়ে যখন গাড়িতে উঠলেন—মাথার উপর মুকুটখানি টলটল করে কাঁপছিল। বাদশা-বেগম থাকতে নূরজাহান বেগমের মাথার এ মুকুট কখনো দেখেনি দারা।

আশমানের নিচে এক এক জায়গা ঘিরে মানুষজন বসতি করে। ভিড় করে। ব্যবসা করে। সে জায়গায় তাগদ জন্মায়। রাজধানী হয়। এমনই এক জায়গা—আগ্রা। সেখানে দুর্গে পরদিন ভিন্ন চেহারা।

সেলিম জাহাঙ্গীর মারা যাবার পর রাজধানী আগ্রা আজ নয় বাদশা শাহজাহানের খাতিরে নতুন করে সেজেছে। দুপুরে জহুরের নামাজের পর আগ্রা দুর্গে দেওয়ানি আমের দরবারি চত্বর খুলে দেওয়া হয়েছে। হুড়হুড় করে রাস্তার মানুষ ঢুকে পড়ছে আগ্রা দুর্গে। কোনো বাধা নেই। তবে দুয়ারে দুয়ারে গম্ভীর মুখে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে পাহারাদার সওয়ারি। কোনো ঘোড়া চিকন কালো কুমৈতি—কোনোটি বা পাকা তালের কিয়াই রঙের সওয়ারদের মাথায় কলগীদার দস্তার বা পাগড়ি। তারাও নানা জাতের যেমন—রাজপুত, পাঠান, সৈয়দ, ইরানি, তুর্কি, তাতার, মুঘল। কোনো সওয়ারের চোখা নাক—তো অন্য সওয়ারের ভোঁতা ঠোঁট।

এই ভিড়ের ভেতর দলা পাকিয়ে ধাক্কা খেয়ে দেওয়ানি আমের দরবারে অনেকের সঙ্গে চলে এসেছে আগ্রাওয়ালি রেহানা। নয়া বাদশা খুর্রম ক'দিন হলো শাহজাহান নাম নিয়ে মসনদে বসেছেন। আজ তিনি ঝরোকায় দাঁড়িয়ে দর্শন দেবেন। শুধু দর্শন নয়—মরহুম সেলিম জাহাঙ্গীরের কাছে গচ্ছিত রাখা বালক সুলতানদের ফেরত পাবেন তিনি। এই ফেরত পাওয়া দেখতেই রেহানার আসা। সে এই দু' আড়াই বছর সমানে খোদার বরকতে মোনাজাত জানিয়ে এসেছে।—দোহাই আল্লা! বাবার লড়াই-হামলায় কাঁচ সুলতানদের যেন কোনো অনিষ্ট না হয়। ওরা যেন ভালোয় ভালোয় ওদের মা আরজুমন্দ বানুর কাছে ফিরে যেতে পারে। আজ সেই ফিরে পাওয়া দেখতেই রেহানার আসা।

আগ্রা দুর্গে কোনো সিঁড়ি নেই। সিঁড়ি থাকলে হাতি ওপরে উঠতে পারে না। সবই ঢাল। ঢাল বেয়ে হাতি ওঠে। ইনসান ওঠে। ঘোড়া ওঠে। নামে। সিঁড়ি শুধু মাচান বুরুজে ওঠার জন্য। সেই সব সিঁড়ি খুব ঘোরানো। যা বেয়ে বেয়ে পাহারার বন্দুকচীরা চৌকিতে উঠে গিয়ে ওপরে দাঁড়ায়।

. বাদশা শাহজাহান দর্শন ঝরোকায় গিয়ে দাঁড়াবেন বলে আকবরি মহল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। সামনে পড়লেন আরজুমন্দ বানু।

—এ কি? মমতাজমহল? তুমি গিয়ে চিকে বসবে না? আজকের দেওয়ানি আমের দরবার তো তোমারই ছেলেদের নিয়ে—

আরজুমন্দ একটিও কথা না বলে দাঁড়িয়ে থাকলেন। বাদশা শাহজাহানকে এখুনি উঠতে হবে। দুর্গের চারদিক আজ খুলে দেওয়া হয়েছে। আকবরি দরওয়াজা, খিজরি দরওয়াজা, হাতি পোল—সব আজ খোলা। তবে সব

জায়গাতেই পাহারা দাঁড়ানো। সব দিক থেকে আগ্রার মানুষ ভেঙে পড়েছে আজ দুর্গে।

—কী হয়েছে মমতাজমহল?

—আমি আরজুমন্দ। ওই নামে আমায় ডাকবেন না—

—কেন? কী হলো?—বলতে বলতে এগিয়ে এসে আরজুমন্দের হাত ধরলেন শাহজাহান। সে হাত শক্ত। কিছু গরম মনে হলো আরজুমন্দের। তিনি জানেন—তাঁর স্বামী লড়াকু, তেজী, তাগদদার। বাদশা হবার জন্যে এই মানুষটি গত ক'বছর ধরে হিন্দুস্থানের মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

—খোদাবন্দ। আপনি বাদশা হতে চেয়েছিলেন। ক'দিন হলো তাই হয়েছেন। সারা জাঁহানের শাহ আপনি এখন। আপনি এখন শাহজাহান। কিন্তু আমাকে আরজুমন্দ হয়েই থাকতে দিন।

—কেন মমতাজমহল? আমি তো তোমার সেই খুর্রমই আছি।

—আমি আরজুমন্দই থাকতে চাই।

—কিন্তু তুমি তো এখন হিন্দুস্থানের বাদশা-বেগম।

—আমি আপনার শুধু বেগম হয়ে থাকতে চাই। অত বড় ভার আমি সইতে পারবো না। আমি আমার ছেলেদের হারাতে পারবো না।—বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন মমতাজমহল। সেই গলাতেই কান্না চেপে আরজুমন্দ বানু বললেন, আপনি আমার এই খেতাবি মমতাজমহল নামটাও ফেরত নিন আলা হজরত।

—ছেলেদের হারাবে কেন! এখন ওরা হিন্দুস্থানের শাহজাদা।

—খোদাবন্দ! আপনার আব্বা হুজুরের পর মসনদে বসতে গিয়ে ক'জন শাহজাদা পিছিয়ে পড়েছেন? তাঁরা আজ কোথায়?

হো হো করে হেসে উঠলেন বাদশা শাহজাহান। বললেন মুঘল শাহীতে একটা কথা আছে মমতাজ। ইয়া তখত্ ইয়া তাবুদ। এমন তো হয়েই থাকে। কাউকে না কাউকে তো মুণ্ডু হারাতেই হবে!

—আলা হজরত আমি অত শত বুঝি না। আমি বুঝি—আমি একজন মা। আমি আমাদের ছেলেদের আম্মিজান হয়ে থাকতেই সবচেয়ে ভালোবাসি। আপনি আমার মাথার ওই মুকুট ফেরত নিন—

বাদশা শাহজাহান দেখলেন—ঘরের কোণে নীল পাথরের ওপর ছোট্ট মুকুটখানি একা একা জ্বলজ্বল করছে। সেদিকে তাকিয়ে বললেন, সে দেখা যাবে'খন মমতাজমহল। আমি এখন দর্শন ঝরোকায় গিয়ে দাঁড়াবো। আমি চাই বাদশা-বেগম হিসেবে তুমি সব দেখবে। তোমার সুখসানের দীবানে বসে। চিকের আড়ালে।

দেওয়ানি আমের ঢাকা চত্বরে মানী মানুষের ভিড়। বনাতে বসেছেন বড় বড় শাহী মানুষজন। ওপরের দিকের মনসবদাররা। বড় বড় রাজপুত ওয়াতন-জায়গীরদার। তাছাড়া রয়েছেন ইংলিশস্তান, ফ্রান্সিস ইলচি-

মশাইরা। ঢাকা চত্বরের পরেই খোলা চত্বর। সেখানে শীতের দুপুরে ঘেঁষা-ঘেঁষির ভেতর বসে আগ্রাওয়ালি রেহানা বিস্ময়ে—আনন্দে দু'চোখ ভরে কাঁদছিল। খোদা তার মোনাজাত রেখেছেন।

তার চোখের সামনে দিয়ে এই মাত্র উজিরে আজম আসফ খাঁ তিন কচি সুলতানকে সঙ্গে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন। ওইতো মহম্মদ দারাশুকো। মাথার সরবন্দে ময়ূরের পালক। তার পাশে সুলতান সুজাঙ্গীর। আওরঙ্গজেবও সুলতান বটে—কিন্তু নেহায়েত বালক। সবচেয়ে ফর্সা। মুখ দেখে রেহানার মনে হলো—বোধহয় জোড়া ভ্রু।

তিন সুলতান তাদের নানাসাহেবের সঙ্গে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করছে। রেহানা চোখের জল রাখতে পারলো না। যাক্! ওরা তাহলে ভালো আছে। কী কচি বয়সেই না ওরা ওদের বেদৌলত বাগী আব্বাহুজুরের সঙ্গে হিন্দুস্থানের জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে।

রেহানার চোখে পলক পড়ছে না। বাদশা শাহজাহান দর্শন ঝরোকা থেকে বেরিয়ে আসছেন। কী করবেন? কী করতে পারেন বেরিয়ে এসে এখন? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

কী তেজী টাটকা বাদশা। পা ফেলার ভঙ্গিতে রেহানা চমকে গেল। শাহজাহান এগিয়ে এসে সুলতান মহম্মদ দারাশুকোকে জড়িয়ে ধরলেন।

দারা অবাক হয়ে নিজের আব্বা হুজুরকে দেখছিল। এ তো চেনাই যায় না। এই কি সেই নাসিকের জঙ্গলের আব্বা হুজুর? এই কি সেই তমসার উজানে পিছু হটা শাহজাদা খুর্‌রম?

কী ঝকঝকে। সুন্দর। গায়ের দামি ঝলমলে কাম্বাদারে কত না মুক্তো বসানো। গলার মালায় হীরে ঝলমল করে উঠছে। কানের কুণ্ডলীতে ঝকমকানো চুনী।

ঠিক তখনই উজিরে আজম আসফ খাঁ নিচু হয়ে বাদশার কমদবুসি করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিরাট জমায়েত থেকে একটা চাপা আওয়াজ উঠলো। এর মানে কী? রেহানা ঠিক করতে পারলো না। প্রশংসা? নিন্দা? সায় জানানো?

মহম্মদ দারাশুকো তখন বিশাল থালায় করে বাদশার নজরে কিছু চুনী, কয়েকটি হীরে ধরলো। আর সঙ্গে সঙ্গে ফিনফিনে রুপোর পাতের নিশার মুঠো মুঠো করে সেই থালা থেকে তুলে সুলতান সুজাঙ্গীর বাদশা শাহজাহানের ওপর উড়িয়ে দিলো।

এ দৃশ্য জীবনে একবারই দেখা যায়। রেহানার বুক ঢিপঢিপ করছিল। এখন যতদিন বাঁচবে ততদিন রাজা-কি-মাণ্ডির গালগল্পে সে বাদশার মবারকে আজকের এই নজর-নিশারের কথা পড়তে পারবে।

বাদশা শাহজাহান উঠে দাঁড়ালেন। বিশাল এক সোনার থালায় থরে থরে আশরফি। মোহর। কে যেন চেঁচিয়ে বললো, শাহজাদা মহম্মদ দারাশুকোকে এই দু'লক্ষ টাকা বাদশার তরফে বকশিস—

বকশিশ কথাটা তো ফিরে ফিরে দেওয়ানি আমের ঢাকা ছাদ থেকে চত্বরে গড়িয়ে পড়ছিল। বারবার। এমন সময় শাহী হুকুম আবার শোনা গেল—

শাহজাদা দারাশুকো আজ থেকে হাজার টাকার রোজিনাদার।

খোলা চত্বর, ঢাকা চত্বর—সব জায়গায় সব রকমের মানুষ এই তেরো বছর বয়সের কিশোরের মুখে তাকিয়ে। দারাশুকোর বয়স হিন্দুস্থানে সবার জানা। কারণ, শাহজাদা খুর্রমের প্রথম ছেলে কবে জন্মালো তা না জেনে থাকতে পারে না হিন্দুস্থান। রেহানাই মনে মনে হিসেব কষে বুঝলো, শাহজাদা দারার তেরো হতে এখনো দু'মাস বাকি।

মহম্মদ দারাশুকো এখন থেকে রোজ হাতখরচা পাবেন দিনে হাজার টাকা। ভিড়ের ভেতর এক ঘাগু রইস ফিস ফিস করে তার সঙ্গীকে বললো, হাজার টাকার রোজিনাদার তো দিনে শয়তানপুরার পওয়াভর কিনে ফেলতে পারে!

তার সঙ্গী একথায় একমত হতে পারলো না। সে বললো, ইস্পাহানের ভালো আতর, বাদকশানের চুনী বসানো একটা ভালো হার—কোনোটাই হাজার টাকায় কেনা যায় না—হাজার টাকায় হবার নয়—

দেওয়ানি আমের এই বিশাল জমায়েতে প্রায় সবারই চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। ওলন্দাজ ইলচি এগিয়ে এসে বাদশা শাহজাহানের সামনে অনেকটা ঝুঁকে পড়ে কুর্নিশ করলো। তারপর তার বিদেশী সঙ্গী খাঁচায় ভরা বিরাট লেজওয়ালা এক পাখি বাদশার মবারকে পেশ করলো।

এর পরই শুরু হয়ে গেল মবারকে নজর পেশ করার বহর। হাপুর গেঁহুদানা সজ্জন সঙ্ঘের তরফে তাজা বাদশাকে দেওয়া হলো একখানি চুনী। প্রায় রাজহাঁসের ডিমের মতোই বড়। এসবে কোনো দৃষ্টি ছিল না একজনের। সে মহম্মদ দারাশুকো। সে কিছুতেই শাহী মসনদ থেকে চোখ সরাতে পারছিল না। এই মসনদ নজর পায়। এই মসনদ হুকুম দেয়। এই মসনদ খালি থাকলে হিন্দুস্থান দুলতে থাকে। মাত্র কিছুদিন আগে ওখানে বসতেন দাদাসাহেব। সেই মানুষটি আর নেই। দারার মনে পড়ছিল রাওয়ালপিণ্ডি দুর্গের কথা। সেখানে আব্বা হুজুরের পাঠানো বেজিকে কী যত্ন করে দাদাসাহেব মাছ খাওয়াতেন। অথচ তাঁরই হুকুমে তাবড় তাবড় গাছ গোলা খেয়ে মুণ্ডু হারায়। বাদশাদের ওই মসনদ কী খায়? ওই মসনদে বসে এক এক হুকুমে এক এক বাদশা হিন্দুস্থানের নসিব পালটে দিয়েছেন। হ্যাঁ হয়েছে না।

সারা আগ্রা দুর্গ লম্বায় এক পওয়া মঞ্জেল হবে। যমুনার ধরা জলের নালা কানায় কানায় থাকে বলে দুর্গের ঘেরাও দেওয়ালের পা দেখা যায় না। খাড়াই উঠে যাওয়া দেওয়ালের চওড়া জায়গায় জায়গায় চৌকি—সেখানে পাহারা। সেখানে দেওয়ালের বুকের ভেতর দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। নয়তো বাকি দুর্গে কোথাও সিঁড়ি বা তার ধাপের বালাই-ই নেই। আছে যা তা হলো—ঢাল। ঢাল বেয়ে ওঠা। ঢাল বেয়েই নামা। এ তো ধুমধুমার গড় নয়!—যে মাটি, বাঁশ আর কাঠ দিয়ে গড়ে তোলা হবে! এইসব সাত পাঁচ

ভাবতে ভাবতেই কাঁচা পাকা চাপদাড়ির ভেতর একটা লোক হাসলো।

ক'দিন ধরে সারাটা দুর্গ চষে ফেলেছে সনাতন হাতি। আকবরি দরওয়াজা, বাঁদিকে একখানা কালো পাথরের খড়ির দাঁড়া টেনে সে হিসেব রেখেছে। এখন পর্যন্ত তেইশটা দাঁড়া টেনেছে সে সেখানে। তার মানে তেইশটি দিন হলো তার এই দুর্গে আসা। শাহী মসনদে বসে শাহজাদা খুর্রম বাদশা শাহজাহান হবার পর তেইশ দিন কেটেছে মোটে।

সেই নাসিক থেকেই সনাতন শাহজাদা খুর্রমের সঙ্গী। তাঁর হাতির দেখাশুনো করতেই সনাতনের থাকা। এই দুর্গে এসে শাহজাদা হয়েছেন বাদশা। আজ সুলতান দারাশুকো হলেন শাহজাদা। হাজার টাকার রোজিনাদার। আর আমি ? ছিলাম হাতি। হয়েছিও হাতি ! মোরি দরওয়াজার গায়ে শাহী পিলখানা এখন আমার আস্তানা। শাহী হাতিদের দেখাশুনো আমার ওপর। আমি এখন সর্-ই-ফিলগির।

আগ্রা দুর্গে এই শাহী পিলখানায় হাতিদের বিরাট চত্বরে যমুনার জল থেকে শীতের বিকেলের আলো যেটুকু এসেছিল তা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে এখন।

শেরগির, বেহেদর, রাজতুম—নানান জাতের হাতি এখন তাদের প্রিয় আখের গোছা নিয়ে পড়েছে। জায়গাটা জুড়ে নানান জিনিসের মিলমিশ গন্ধ। আখের রসে পাথুরে চত্বর ভিজে গেছে। সেখানে তার সঙ্গে মিশেছে ঘি, চিনি, যবের গন্ধ। সেই সঙ্গে মাছির ভনভনানি। সর-ই-ফিলগিব সনাতন হাতির তাঁবে এখন জনা আশি ভৈ আর মেঠ। তারা এতগুলো হাতির নাদ আর পেচ্ছাপ পরিষ্কার করতে করতেই হিমশিম খাচ্ছিল। নাদ যমুনায় ফেলে দেবার উপায় নেই। মোরি দরওয়াজায় জমিয়ে রাখতে হচ্ছে। দুর্গের কাপ্তান কোন্ ঠিকাদারকে এই নাদের বহর বিক্রি করে থাকে। তাকে এড়িয়ে চলার উপায় নেই সনাতনের। বাদশা তাকে বিশ্বাস করেন। তাই হাতিদের হাল হকিকত বাদশাকে জানানোই তার কাজ। কোনো হাতির বিমারি হলো কিনা—কোন হাতি মসত্ হতে পারে—হলে তার আলানসঙ্গী হাতিকে কী ভাবে কাছাকাছি রাখতে হবে—সবই সনাতন হাতির দেখার কথা।

এত বড় দুর্গ। এর কোনো থই পায় না সনাতন। সে এবার সন্ধ্যার মুখে মুখে মোরি দরওয়াজায় দাঁড়িয়ে পিলখানা—আঙুরিবাগ—দেওয়ানি আম, মোতি মসজিদ, সামানবুরুজে চৌপহর পাহারা, নক্কারখানায় বাজনদারদের গাল ফুলিয়ে সানাই বাজানো—সবকিছুর একটা মাপ নিতে চেষ্টা করে মনে মনে। আর মনে মনে ভেতরে ভেতরে কেঁপে ওঠে। এতবড় বিশাল অজগর সমান এমন শাহী কাণ্ডকারখানার সঙ্গে ধুমধুমার সনাতন পাইক কি একা একা পেরে উঠবে ? পারা কি সম্ভব ?

মোরি দরওয়াজা থেকে ভেতরের পিলখানা আলোর উল্টোদিকে আবছা লাগে। অনেক উঁচুতে হাতিদের মাথা অস্পষ্ট। এখনো বাতিদানের পলতেয় আগুনের ফুলকি ফেলে আলো জ্বালা হয়নি। আগেনগারে ধুনোর সঙ্গে

লোবান মিশিয়ে ধোঁয়া দেওয়া বাকি। সনাতন হাতি দেখলো—আবছা মতো কে এসে পিলখানার সামনে দাঁড়ালো।

দূর থেকে তাকে চিনতে না পেরে সনাতন হুঁশিয়ারি দিয়ে উঠলো, কে ওখানে ? কে ?

পিলখানার সামনে দাঁড়ানো মানুষটি কোনো জবাব দিলো না। তাতে সনাতন হাতির বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠলো। কে হতে পারে ? কার অ্যাতো সাহস ?

সে ছুটে এসে থমকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে কুর্নিশ করলো। আপনি আসবেন জানতাম না আলা হজরত।

—হিন্দুস্থানের বাদশা তার নিজের হাতি দেখতে আসতে অনুমতি নেবেন নাকি !

—খোদাবন্দ ! আপনি অন্নদাতা। নিমকের মালিক। ধন, মান, ইজ্জত, ধর্ম—সবই আপনার হাতে। আপনি আসবেন জানলে আমি আরও তৈরি থাকতে পারি—

—তোমার হুঁশিয়ারি দেখে ভালো লাগলো সনাতন। হাতি বশ করতে শিখলে কোত্থেকে ?

—হজরত। কাছাকাছি বাগোয়ানের জঙ্গলে এক সময়ে হাতি ধরেছি। নারোয়ার জঙ্গলেও গেছি—

বাগী হওয়ার পর শাহজাদার জীবনে বাদশা শাহজাহান ভালো করে হিন্দুস্হান দেখেছেন। দেখেছেন নর্মদার চোরা স্রোত। কালাহাণ্ডির বাঘ ডাকা জঙ্গল। রাজমহলের পাহাড়। তমসার বাঁক। সাতানা পাহাড়ের পায়ে আঙুরের ক্ষেতে কুটি কুট পাখির ঝাঁক। বাদশার এখন মনে হলো—তাঁর সব দেখার ভেতর সেরা দেখা এই সনাতন হাতি—যে কিনা এখন তাঁরই হুকুমে শাহী সর-ই-ফিলিগর। হাতির সঙ্গে লেপটে থাকা এমন ইনসান বাদশার চোখে পড়েনি। এখনো সেই হেরে যাওয়া লড়াইয়ে পাগলা হাতি জটাজুটের সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে এগিয়ে আসা কিছুতেই ভুলতে পারেন না বাদশা।

তিনি দেখছিলেন—সনাতন কেমন স্বচ্ছন্দে পিলখানার ভেতর উঁচু উঁচু হাতিদের পায়ের পাশ দিয়ে—পেটের তলা দিয়ে চলাফেরা করে চলেছে। যেন নিজের লাগানো ফল বাগিচায় ঘুরে বেড়াচ্ছে মানুষটা।

বাদশা দেখছিলেন আর বুঝতে পারছিলেন—গাছের গুঁড়ির মতো পা নিয়ে দাঁড়ানো এইসব হাতি তাঁরই তাগদের ফোয়ারা। আজই মমতাজমহল জানতে চাইছিলেন, ওই শাহী মসনদে ক'জন শাহজাদা পৌঁছতে পারেননি।

আরজুমন্দ বানুর কথাগুলোর ওজন এবার বাদশা শাহজাহান একা একা বোঝার চেষ্টা করলেন। পিলখানায় দাঁড়ানো হাতিদের সামনে। বড়ে ভাই শাহজাদা খসরু নেই। সে তো অনেকদিন হলো নেই। শাহজাদা পরভেজ নেই। অসময়ে চলে গেল। নেই শারিয়ার। সেও একজন শাহজাদা

হয়ে উঠেছিল।

পুরো জওয়ানিতে ভেসে ওঠা বাদশা আচমকা ভয় পেয়েও উঠলেন। আলো? আলো কোথায়?

দু'জন ভৈ ছুটতে ছুটতে এসে সামনের বাতিদানে আগুনের ফুলকি দিয়ে আলো ধরিয়ে দিলো। আছাঁকা অভ্র বাতি। তাই ফুটে উঠে ফট ফট করে শব্দ হলো।

আলো পরিষ্কার হতে বাদশা নিজে নিজেই মনে করলেন, দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব, মুরাদ—কে বাদশা হবে? কে মসনদে পৌঁছবে? কে কে পারবে না?

যমুনা এখন শীতের আঁধারে মুছে গেছে।

হিন্দুস্থানে এক এক জায়গায় এক এক রকমের ভোর হয়। আগ্রার ভোর বোঝা যায় রাজধানীর মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে মাখখনকা গোলি আর মিছরির ডেলার বিক্রি দেখে। সরাইখানায় কাকের ঝাঁক নেমে আসে বাসি শাহী কাবাব ফেলে দিলে কাড়াকাড়ি করে খাবে বলে।

এখন কনকনে শীতে ভালো করে রোদ ওঠেনি। মোটা সুফী পশমের ঢোলা জামা গায়ে একজন আওরত এই এত ভোরে গোলাপ চারার শেকড় খুবলে দিতে দিতে উল্টোদিকের ডাল হ্রদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সূর্য ওঠা দেখবেন।

আকাশ লাল করে সূর্য উঠছিল। এই কাকভোরে ডাল হ্রদের বুকে কোনো শিকারা নেই। সারাটা হ্রদ জমে গিয়ে সাদা। দু'চারটে যা শিকারা—সেসব টেনে নলখাগড়ার ভেতর ডাঙায় তোলা।

আলো যত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—উল্টোদিকের আকাশে নানান পাহাড়ের বরফঢাকা মুণ্ডু ততই চিকচিক করে ওঠে। লাল হয়ে রক্তচক্ষু সূর্য আকাশে উঠে পড়তেই থাক থাক উঠে যাওয়া নিশাত বাগ পরিষ্কার হয়ে এবার দেখা দিলো। ছেঁড়া কাগজের মতোই কয়েকটা গোলাপ ঝুলে আছে। বেশির ভাগই বরফের কামড়ে ছিন্নভিন্ন। গাছের গোড়াগুলোও বরফে ঢাকা। তার ভেতর দু'চারটে গোলাপের গোড়া খানিক আগে খোন্তা দিয়ে খোঁচানোর ফলে খানিক মাটি বেরিয়ে।

এমন সময় দেখা গেল, নিশাত বাগের উঁচু ধাপ ধরে এক খুনখুনে বুড়ো নেমে আসছে। আসতে আসতে ওই সূর্যমুখী আওরতকে দেখে তাড়াতাড়ি নেমে এলো। এসেই কুর্নিশ করলো।

—মুলুকে মালিকা এত ঠাণ্ডায় উঠে এসেছেন কেন?

সেকথায় কান না দিয়ে আওরত বললেন, ও নামে ডাকবে না। দ্যাখো দ্যাখো—আজ কতদিন পরে সূর্য দেখা দিলো—

বুড়ো লোকটি সূর্য দেখার চেষ্টা করলো। পারলো না। এ বয়সে চোখে সেরকম জোর থাকার কথা নয়। সে কুঁজো হয়ে বাগানে পড়ে থাকা বসার

একটা কাঠের দস্তর ওই আওরতের সামনে এনে রাখলো। কতক্ষণ দাঁড়াবেন। এবার বসুন—

—না মালিক নায়েব। আমায় ঘুরে ঘুরে মেহনত করে চলে ফিরে বেড়াতে হবে। নয়তো বসে থেকে থেকে একদিন একদম বসে যাবো—

তাই বলে জাড়ার সময় গোলাপ নিড়োবেন? ঠাণ্ডায় বাদশা-বেগম হাতের আঙুলগুলো যাবে—

—বলেছি না ও নামে ডাকবে না।

—নিশাতবাগের এই ধাপওয়ারি গোলাপ বসানো আপনারই। বছর বছর আপনি এসে এ বাগ বানিয়ে তুলেছেন। এ বাগে বসন্ত-বাহার আপনারই ছেড়ে দেওয়া ইস্পাহানি বুলবুলি পাখির দল। আমি তো আপনাকে মুলুকে মালিকা বলেই জানি—

নুরজাহান বেগম ভালো করে তাঁকালেন মালিক নায়েবের মুখে। আকবর বাদশার আমলে ফৌজি ছিল। আগ্রা থেকে এদিকটায় হামলায় এসে আর ফিরে যায়নি। ওসব ভুলে যাও। আচ্ছা রাজৌরি কোন্ দিকটায়?

হো হো করে হেসে উঠলো মালিক নায়েব। এক সন হয়ে গেল এসেছেন—এখনো পুব পশ্চিম সড়গড় হলো না দেখছি!

—কী করে ঠিক হবে মালিক নায়েব! তোমাদের কাশ্মীর তো শুধুই পাহাড় আর পাহাড়—যেদিকে তাকাও পাহাড়।

—বেগম সাহেবা! পুবের ওই তিন পাহাড় পেরোলেই তো রাজৌরি। বরফ সরে গেলে একবার যাবেন'খন।

সেদিকটায় তাকালেন নুরজাহান। বেশ কয়েকদিন পরে রোদ উঠে আজ পাহাড়ে পাহাড়ে আলো উপচে পড়েছে। তাঁর মনে পড়লো—একজন পিচ ফল খেতে খুব ভালবাসতো। ওই রাজৌরি থেকেই তাঁর লাশ ফিরে এসেছিল। দূরে বরফ ঢাকা তিনটে পাহাড়ের মাথা এখন রোদে ঝকঝক করছে।

এবার সারা নিশাত বাগ কুয়াশা ছেঁড়া রোদে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সে রোদ দেখে মালিক নায়েব বললো, খোদা মেহেরবান। আজ কতদিন পরে রোদ পোহানো যাবে—

—অত আশা করতে নেই মালিক নায়েব। কখন মেঘ এসে আবার না সব ঢেকে ফেলে।

মালিক নায়েব নুরজাহান বেগমের মুখে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলো। হিন্দুস্থানের বাদশা জাহাঙ্গীরের বেওয়া শীতের ভোরে মোটা সুফী পশমের জামা গায়ে গোলাপের গোড়া খোঁচাতে বাগে নেমে আসেন! এদিককার ফৌজদারও ঠিকমত লকড়ি, রসদ পাঠায় না নিশাত বাগে। এখানে সারাদিন যে আগুন জ্বালাতে হয়। নুরজাহান বেগমকে আগ্রা কি ভুলে গেল? হাতের অমন নাজুক আঙুলগুলো বরফের কামড়ে না জখম হয়।

বাদশা-বেগম তখন ধাপ ভেঙে ওপরে উঠছেন। যাবেন একদম চুড়োয়—যেখানে নাচঘর—সেখানে। রোদে নুরজাহানের মুখের একফালি জ্বলে

উঠলো। মালিক নায়েব মনে মনে বললো, নিশাত বাগের জিন্দা গোলাপ।

কেন যে সব সময় ও মুখ ঢেকে রাখেন মুলুকে মালিকা। শরীরের জন্যে খুলি হাওয়াও তো চাই। নয়তো পাথর চাপা ঘাস হয়ে যাবে একদিন। বলবে বলবে করেও একথা বলতে পারেনি মালিক নায়েব। যদি বে-আদবি হয়ে যায়? যদি বে-তমিজি দেখায়?

নুরজাহান যেমন ধাপ ভেঙে ওপরে উঠছেন। তাঁর পায়ের চটিতে মাটি মাখা বরফ তুলো জড়িয়ে গেছে। তখন তখনই মালিক নায়েব তাড়াতাড়ি ওপরে উঠতে লাগলো। নাচঘরের হাতায় গরম পানি, আরামের কেদারা এগিয়ে দিতে হবে এবার। বাদশা-বেগম গিয়ে বসবেন। বসে গরম পানিতে পা ডোবাবেন।

অনেকটা জায়গা নিয়ে নাচঘর। একেবারে মাথায়। সেখান থেকে পুরো ডাল হ্রদের মুখ দেখতে পেলেন নুরজাহান বেগম। একদম সাদা বরফ এখন। এই বরফ গললে নিশাত বাগও ফুলে ফুলে হেসে উঠবে। এক এক ধাপে এক এক রঙের গোলাপ। এখন ওদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে শুধু। বরফ সরিয়ে—গোড়া খুঁচিয়ে। দরকার মতো মরা ডাল ছেঁটে দিয়ে।

অনেক চিন্তা এখন বাদশা-বেগমের। বসন্তের আগে কয়েকটা ফোয়ারা ঠিক করানো দরকার। দরকার আরও কিছু গোলাপ চারা। বুড়ো গাছ তো কিছু মরে যাচ্ছেই। সেখানে এখুনি বদলি গোলাপ চারা বসানো দরকার। নয়তো সামনের বসন্তে ওসব জায়গা ন্যাড়া ন্যাড়া লাগবে।

পাশেই মালিক নায়েবকে দেখতে পেয়ে নুরজাহান জানতে চাইলেন, আগ্রা কোন্ দিকে?

—দক্ষিণে বাদশা-বেগম—

এবার আর কোনোরকম শোধরানোর চেষ্টা করলেন না নুরজাহান। অনেকদিনের অভ্যেস যাবে কোথায়? এই নিশাত বাগে যেদিন তিনি ইস্পাহানি বুলবুলি এনে উড়িয়ে দিয়েছিলেন—সেদিন নাচঘরের ওই চাতালে দাঁড়িয়ে মানুষটা হাততালি দিয়ে বলে উঠেছিল—বেগম! হিন্দুস্থানকে তুমি পাখিও উপহার দিলে!

আগ্রার দিকে তাকিয়েও চোখের সামনে শুধুই পাহাড়। চোখ নামিয়ে নিলেন নুরজাহান, এই সময় আগ্রা দুর্গে নক্কারখানা থেকে সানাই বেজে উঠতো। দুর্গের আবদারখানা থেকে সুসিদ্ধ দুম্বা গোস্তের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়তো। নিজের মহলে আমি তখন সুখদোলায় দুলতে দুলতে অঙ্গিরার রসে ঠোঁট ভেজাতাম।

সুখের স্বপ্ন ভেঙে গেল নুরজাহান বেগমের। এখানে শীত হাড়ে গিয়ে পৌঁছয়। তিনি ঠিক করলেন, বাদশা শাহজাহানকে একখানা খত লিখবেন।

শাহী গোলাপের বংশরক্ষা করার জন্যে আমায় ভার দিয়েছেন আলা হজরত! কিন্তু গোলাপের আগে আমি নিজেই যে খতম হয়ে যেতে চলেছি। ডাল হ্রদের তীরে নিশাত বাগে এ শীত অসহ্য। হিন্দুস্থানের শাহী এত বড়। কত নাম তার। এই শাহী কি আগুন জ্বালাবার জন্যে আমায় বেশি করে কিছু

লকড়ি পাঠাতে পারে না ?

মনে মনে চিঠির মুসাবিদা করে একসময় থেমে গেলেন নুরজাহান। লিখে কোনো লাভ নেই। ফৌজদার এ চিঠি আগ্রায় পাঠাবেনই না। ছিঁড়ে ফেলবে।

॥ আঠাশ ॥

সুবে বাংলার খালিফেতাবাদ সরকারে পঁয়ত্রিশটি মহল। মোট রাজস্ব ৫৪০২১৮০ দাম। খালিফেতাবাদ সরকার মুঘল ফৌজে একশোর মতো ঘোড়সওয়ার ছাড়াও ১৫১৫০ জন পদাতিক পাঠিয়ে থাকে। এই সরকারের দুটি নামি মহল হলোঃ তালুক নর্মোদিয় ভট্টাচার্য আর তালুক সরিপথ কবিরাজ। নর্মোদিয় ভট্টাচার্য তালুকের সম্বচ্ছরের খাজনা ১৩৮৬০ দাম। সরিপথ কবিরাজ তালুকের খাজনা ৮৬৭৫ দাম।

নর্মোদিয় ভট্টাচার্য তালুকের ভুরীশ্রেষ্ঠ গাঁ থেকে সুতো যায় সরিপথ কবিরাজ তালুকের খুরুট গাঁয়ে তাঁতীদের হাতে। সেখানকার ঘন বুনটের কাপড়ের চাহিদা সারা হিন্দুস্থানে। যেমন জমি—তেমনি পাড়। গঙ্গার গায়ে হাওড়া থেকে আর্মানি বণিকরা সেই কাপড় কিনতে ফি-বছর খুরুটে এসে থাকে। মিহি সুতোর ঘন জমির কাপড় নিয়ে তারা লাসা তো যায়-ই—কখনো কখনো কাপড় থেকে গেলে সিংকিয়াংয়ের কাশগড় অব্দিও যায়।

একটু খোঁজ নিলেই জানা যাবে এই পুরো ব্যবসাটা দাঁড়িয়ে আছে নর্মোদিয় ভট্টাচার্য তালুকের গঙ্গাধর ভট্টের মহাজনি আশরফিতে। গঙ্গাধর ভট্টাচার্যর বসতবাড়ি ভুরীশ্রেষ্ঠ গাঁয়ে। তারই দামদামড়ির জোরে ভুরীশ্রেষ্ঠ গাঁয়ের সুতোর এত রমরমা। তিনি সুতো বোঝেন। বোঝেন তুলো। তাঁরই পরামর্শে বিশেষ পাক দিয়ে ওই সুতো তৈরি হয়।

সুবে বাংলায় তাই এককথায় বলা হয় গঙ্গো ভট্টর সুতো।

আগ্রার জবানীতে এখন সুবে বঙ্গালে বর্ষা যাচ্ছে। ঘোর বর্ষা। এই বর্ষার ভেতর গঙ্গো ভট্ট দেহ রেখেছেন। চৌদিকে তাঁর নামডাক। পরিণত বয়সেই তিনি চোখ বুজেছেন। তিনি সুতো ছাড়াও আর যে জিনিস ভালো বুঝেছেন—কিনেছেন—তা হলোঃ রমণীরত্ন। ফলে তাঁর এই ব্যস্ত জীবনে গঙ্গো ভট্টকে অনেক বিয়ে করতে হয়েছে।

শেষবার তিনি বিয়ে করেছেন বছর দশেক আগে। তখন তিনি ছিলেন সত্তরের ওপর। গঙ্গো ভট্টর শেষ দুই বউ এসেছিল ন'দশ বছর বয়সে। তারা পিঠোপিঠি দুই বোন। এখন তারা ডাগর হয়ে বেওয়া হলো। ভুরসুট গাঁয়ের মানুষ এই দুই বোনকে নাম ধরেই ডাকে। কেননা—তারা বিয়ে হয়ে এসে এই ভুরসুট গাঁয়ের বকুলতলাতেই আর পাঁচটি মেয়ের সঙ্গে এক্কা দোক্কা খেলতো। কেননা, স্বামী গঙ্গো ভট্ট বয়সে যেমনই বড়—তেমনই রাশভারি আর মহাজনি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন বলে শেষের এই দুই বউকে খেলে বেড়াতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই আলাপি আর গোলাপিকে নিয়ে আজ ভুরসুটে মহা

শোরগোল। তারা ডাগর হয়ে উঠলো আর সন্ন্যাস এসে নিয়ে গেল গঙ্গো ভট্টকে। কেউ কেউ দুঃখ করে বললো, আহারে! ওরা জানলোই না গঙ্গো ভট্ট কী মানুষ ছিলেন!

ভুরীশ্রেষ্ঠ লোকমুখে হয়েছে ভুরসুট। তেমনি গাঁয়ের প্রাচীন নদীটি বেত্রক্ষুধা লোকমুখে ঘুরে ঘুরে হয়েছে বেতস। সেই বেতস নদী গিয়ে পড়েছে সরস্বতী নদীতে। সরস্বতী পড়েছে রূপনারায়ণে। হাওড়ার গায়ে গঙ্গা বেয়ে নৌকো রূপনারায়ণে ঢোকে। সেখান থেকে দূর দেশের নৌকো সরস্বতী হয়ে বেতসেও ঢুকে পড়ে।

ঘোর বর্ষার ভেতর বেতসের বুকে বহরি নৌকোয় বসে কাসিম খাঁ দেখলেন—ঢাক ঢোল পিটিয়ে দুটি হিন্দু মেয়েকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাদের পেছন পেছন দলে দলে মানুষ। দূরে চিতা সবে জ্বলে উঠলো। ওঃ! তাহলে এ হলো গিয়ে হিন্দুর রুদ্রভূমি। হতভাগিনীরা সতী হচ্ছে। হিন্দুদের যে কী সব অসম্ভব ব্যাপারে আহ্লাদ হয়!

কাসিম্ খাঁ যে সে মানুষ নন। সরকার খালিফেতাবাদের ফৌজদার। তিনি এসব দৃশ্য দেখতে পারেন না। আকবর বাদশা চেষ্টা করেও সতী হওয়া বন্ধ করতে পারেনি। বাদশা শাহজাহানের হুকুমঃ হিন্দুর ঘরোয়া মামলায় শাহী ফৌজ বা আমলা যেন শুধু শুধু নাক না গলায়।

বর্ষায় বেতসের বুকে নৌকো দুলছে। যত বড় ফোঁটায় আকাশ গজরাচ্ছিল—তার সঙ্গে তাল দিয়ে ডাঙায় ঢোল কাঁসি বাজছিল। সঙ্গে এলোপাথাড়ি বাতাস। তাতে সদ্য ধরনো চিতার আগুন থেঁতলে গিয়েও ঠেলে উঠলো।

আর অমনি কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগে ঢালাও সিঁদুর মাথা মাথা নিয়ে দুই বোন—আলাপি আর গোলাপি—তীর বেগে ছুটে গিয়ে বেতসে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। সারাটা ভিড় থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তাদের চোখের সামনে ঘন বর্ষার পর্দা প্রায়।

ওরা সাঁতরে এগিয়ে আসছিল। ফৌজদার কাসিম খাঁ বিপদ গুনলেন। তিনি শাহী মাঝিদের বললেন, দাঁড় বাও। এখুনি আমরা এখন থেকে সরে যাবো।

হুকুম এক জিনিস। আর কাজ হওয়া আরেক জিনিস। দাঁড়ি মাঝিরা হাজার হোক মানুষ তো। চোখের সামনে প্রাণভয়ে পালিয়ে আসা অল্পবয়সী দুটি বউ। তারা সাঁতরে নৌকোয় উঠে আশ্রয় চাইছে। আশ্রয় না পেলে ডুবে যাবে—নয়তো গাঁয়ের সাঁতারুরা ঝাঁপিয়ে পড়লে তাদের হাতে ধরা পড়বে। পড়লে ডাঙার ওই দাউ দাউ আগুনই হবে ওদের আশ্রয়।

মাঝিদের হাত চলছিল না। হঠাৎ ওঠা বাতাসও বন্ধু নয়। আলাপি জল খাচ্ছিল। গোলাপি তলিয়ে যাচ্ছিল। ঘোর বর্ষায় খানিক দূরের ডাঙা প্রায় মুছে যাচ্ছে। কাসিম খাঁ ফৌজদারি ঢঙে পরপর দুটি হুকুম দিলেন।

ওদের তুলে নাও।

হাওড়ায় ফিরবো। পাল খাটাও।

পাল খাটানোর সঙ্গে সঙ্গে কাসিম খাঁয়ের বহর নৌকো উল্টো বাতাসের সঙ্গী হয়ে সরস্বতীর দিকে ফিরে চললো। ডাঙার ভুরসুটের মানুষজন কিছু বুঝে ওঠার আগেই কাসিম খাঁ তাদের নাগালের বাইরে চলে এলেন। এসেও তাঁর স্বস্তি নেই। এ-খবর তো চাপা থাকার নয়। সুবেদার ঢাকায়। সুবেদারের কাছে নালিশ তো যাবেই। বঙ্গালে জুলকাদ আর জুলহাজ—বর্ষার এই দুটি মাসে জোঁক, কুমির, সাপ আর বিপদ হাত ধরাধরি করে চলে একেবারে।

পুরো ব্যাপারটাই ঘটলো মেঘে ঢাকা দুপুরে—ঘোর বর্ষার ভেতর। কাসিম খাঁয়ের নৌকো যখন সরস্বতী ফেলে রূপনারায়ণে ঢুকবে—তখন আকাশের মাঝখানে একখানি চাঁদ এসে দাঁড়িয়েছে। একফোঁটা বৃষ্টি নেই কোথাও। বাতাস ঠাণ্ডা। দু'পাশের গাঁ অন্ধকারে ডুবে গেছে। দূরে দূরে ঘর-গেরস্থালির আলোর ফুটকি মাত্র।

ফৌজদারের হুকুম হলো পারে ভেড়াও। ওদের এবার ডাঙায় ছেড়ে দাও—

আলাপি আর গোলাপি এই হুকুম শুনে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

কাসিম খাঁ হায়দরাবাদি। গত তিন বছরে বঙ্গাল মুলুকে এসে যে ক'টি বাংলা কথা শিখেছেন—তার একটিও এই কান্নার ভেতর তিনি খুঁজে পেলেন না। একজন মাঝির কাছে জানতে চাইলে, কী বলছে? কাঁদে কেন?

মাঝি বললো, ভয় পেয়ে কাঁদছে। বলছে—এখন ডাঙায় ছেড়ে দিলে বাঘে খাবে।

কাসিম খাঁ হেসে উঠলেন। বোকা বানাচ্ছে আমাকে! এদিকে বাঘ কোথায়? যাও ছেড়ে দিয়ে এসো।

মাঝি বললো, ডাঙায় অনেক রকমের বাঘ থাকে হুজুর। কাল ভোরে আলো ফুটলে ছেড়ে দেওয়া যাবে।

কাসিম খাঁ বেশ অল্প বয়সেই ফৌজদার হয়েছেন। যে হিন্দুস্থানে বাদশারই এখনো চল্লিশ হয়নি—সেখানে খালিফেতাবাদ সরকারের ফৌজদারের বয়স যে তিরিশের নিচেই হবে—তাতে আর আশ্চর্যের কী! তিনি মাঝির কথা শুনে চুপ করে গেলেন। মন দিয়ে চাঁদকে দেখলেন। হলুদ। প্রায় গোল। আশমান জুড়ে মেঘের ছেঁড়া ছেঁড়া মায়া। নিচের দুনিয়ায় রূপনারায়ণের জলের চেহারা নির্দোষ—যেমন বয়ে যায় রোজ—তেমনই যাচ্ছে। খোদাতালার এসব জিনিস পালটানো যায় না। মাঝে মধ্যে ইনসান আরেক ইনসানের নসিব সামান্য কিছু পালটাতে পারে। যেমন কিনা আমি এখন ওই দুই সতীকে ডাঙায় নামিয়ে দিলাম না।

নৌকা এবার সাঁকরাইলের পথ ধরলো। কাল ভোর ভোর হাওড়া পৌঁছনো যাবে।

জুলকাদ মাসের এমন ভিজে সন্ধ্যায় রাজধানী আগ্রার আকাশেও সেই একই হলুদ চাঁদ। গোল। তার চারদিকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাওয়া মেঘ। আগ্রা

দুর্গে শাহী দেওয়ানখানার কাছারিবাড়ি থেকে টিকাইত গোস্বামী এইমাত্র বেরোলেন। বেরিয়ে তিনি আকাশের দিকে দুই হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, জয় গৌর। জয় গৌর।

কপালে তাঁর চন্দনের তিলক। গলায় কণ্ঠী। পায়ে কাঠের গাজিয়াবাদি বিনামা। পাথুরে চত্বরে পড়ে তা খটাং খটাং শব্দ তুলছে। গায়ে তাঁর চুনোটি অঙ্গরক্ষা। তার ওপর একখানি লেবু রঙের চাদর ফেলা আছে সবসময়। রাজধানী শহরে আসার জন্যে টিকাইত গোঁসাইয়ের এই বেশ!

তিনি হাতিপোল পেরিয়ে রাজধানীর যোগীপুরার পথ ধরলেন। গলায় গুন গুন করে গানও এলো তাঁর। ভালো করে শুনলে বোঝা যায়—তালটি হলো—আড়ঠেকা ঃ কালেংড়া—

দু'পাশে পথচলিত মানুষের কাইমাই। তার ভেতর দিয়ে টিকাইত গোঁসাই গুনগুন করে গাইতে গাইতে চলেছেন।

তেমন কান থাকলে পরিষ্কার শোনা যেতো, তিনি গাইছেন—নিজের ভাবে বিভোর হয়ে গেয়ে চলেছেন মাত্র দুটি চরণ।

চৈতন্য লীলায় ব্যাস
দাস বৃন্দাবন
তাঁর আজ্ঞায় করি তাঁর
উচ্ছিষ্ট চর্বণ

একসময় দেখা গেল যোগীপুরার শেষ প্রান্তে এসে টিকাইত গোঁসাই ডাকঘোড়ার আস্তানার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তখন সামনের পিপুল গাছটির ভেতর দিয়ে তেরছা করে তাকালে আশমানের চাঁদকে দেখা যায়। গোঁসাইজি বুঝলেন, বৃন্দাবন পৌঁছতে পৌঁছতে ভোর হয়ে যাবে।

হাওড়ায় ঘুসুড়ির কাছাকাছি এসে ফৌজদার কাসিম খাঁয়ের ঘুম ভেঙে গেল। ভোরবেলার নদীতে অনেক সময় পাখি এসে নৌকোয় বসে কিচির মিচির জুড়ে দেয়। কিন্তু এ তো পাখির ডাক নয়।

কান পেতে শুনে কাসিম খাঁ বুঝলেন, সদ্য বেওয়া সতী বউ দুটি কাঁদছে। প্রায় গুনগুন করে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সব মনে পড়ে গেল। এখন এই ভোর ভোর সামান্য আলোয় ওদের ডাঙায় ছেড়ে দেওয়া দরকার।

হঠাৎ কাসিম খাঁয়ের মনে পড়লো, সরকার খালিফেতাবাদের তরফে নয়া বাদশা শাহজাহানের মবারকে তো কিছুই পাঠানো হয়নি। তেমন কি পাঠানো যায় ভেবেই ঠিক করতে পারেননি কাসিম খাঁ।

মাঝিদের ভেতর কালকের সন্ধের সেই লোকটি এসে বললো, না ভেড়াই এবার? ওদের ছেড়ে দিতে হবে—

কাসিম খাঁ বললেন, না। এখন দরকার নেই—

মাঝি ফৌজদারের মুখে তাকালো। তাকিয়ে একা একা হাসলো। আওরতের কাঁদুনি তাহলে দুনিয়ায় সবচেয়ে জোরদার জিনিস। এই মাঝিই

আলাপি গোলাপিকে কাল বেশি রাতে পরামর্শ দিয়েছিল—ভোর না হতে ফ‍ুঁপিয়ে ফ‍ুঁপিয়ে কাঁদবে। ফৌজদারের বয়স কম। চাইকি তোমাদের মনে ধরে যেতে পারে—

মাঝি এ পরামর্শ না ভেবে দেয়নি। ডাগর বয়সের এক জোড়া বেওয়া। ডাঙায় পড়তেই চিল শকুনেরা ছোঁ দেবে। তারপর তো আছে ফিরিঙ্গি পর্তুগিজরা।

ভোররাতে ডাক ঘোড়ার গাড়ি থেকে টিকাইত গোঁসাই নামলেন। তখনো গ‍ুনগ‍ুন করে সেই গান তাঁর গলায়। একই স‍ুরে। গতকাল সন্ধে থেকে তিনি এই এক গানে বিভোর হয়ে আছেন। গানের বাণীর শেষে নিজেই তিনি ম‍ুখে এই বলে তাল দিচ্ছিলেন—তাঝ্-ঝিম্, তাঝ্-ঝিম্।

ডাক ঘোড়ার দল বৃন্দাবন ফেলে গোকুলের পথ ধরলো। কাছেই। সেখানে ঘোড়াবদল হবে। তারপর গাড়ি যাবে মথ‍ুরা হয়ে দিল্লি। শাহী কাগজপত্র ছাড়াও আম জনতার চিঠিচাপাটি, স‍ুবেদার ফৌজদারদের দলিল-দস্তাবেজও এই ডাক ঘোড়ার গাড়ি হিন্দ‍ুস্থানের এক সরকার থেকে আরেক সরকারে নিয়ে যায়।

বর্ষার ভোরে লাল ধ‍ুলো উড়িয়ে পিপ‍ুলতলায় দ‍ুই ময়‍ূর ঠোঁটে ঠোঁট বাধিয়ে ঝগড়া করছিল। ওদের খামচাখামচির বিষয় একটি বড় জাতের মেঠো কেন্নো।

এ-দৃশ্য দেখে টিকাইত গোঁসাই একা একাই হেসে ফেললেন। তোমাদের রক্ষা করতে আগ্রা দ‍ুর্গের দেওয়ানখানায় অ্যাতো ছ‍ুটোছ‍ুটি। আর তোমরা নিজেরাই প্রাণীহত্যা করছো? এমন স‍ুন্দর সকালবেলায়?

বৃন্দাবনের গোঁসাই আখড়ায় তখন ভোরের আরতি শ‍ুর‍ু হয়ে গেছে। ঠান্ডা বাতাসে করতাল, বাঁশির আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ছিল। ডম্ফ, রবাবও থেমে নেই। আখড়ার হাতায় অনেকটা জমি জ‍ুড়ে আমের বাগান। আম পেড়ে নেবার পর গাছগ‍ুলোর এখন নিঃস্ব দশা। গাছতলায় নিঃশঙ্ক ময়‍ূরের পাশে নারোয়া থেকে ধরে এনে ছেড়ে দেওয়া গ‍ুটি আটেক হরিণ। এ গাছ থেকে সে গাছে হন‍ুমানের দোল খাওয়া।

বাজনা থামতে বড় গোঁসাই এসে বারান্দায় বসলেন। নবদ্বীপের মান‍ুষ। অদ্বৈত মহাপ্রভুর হাত ধরে বালক বয়সে এদেশে চলে আসা। এখন হাঁটাচলা কমে এসেছে। নিত্য আরতিতে যোগ দেন। তাঁকে গিয়ে ঢিপ করে একটা প্রণাম করে টিকাইত গোঁসাই বললেন, যা যা চাওয়া হয়েছিল—সবই পাওয়া গেছে—

কিছ‍ু ব‍ুঝতে না পেরে বড় গোঁসাই চোখ তুলে চাইলেন। সে দৃষ্টি ঘোলা। এখন ওঁকে যেখানে বসিয়ে রাখা হয় সেখান থেকে নিজে উঠে চলে ফিরে বেড়াতে পারেন না। খ‍ুব শান্ত গলায় জানতে চাইলেন, কিসের কী?

টিকাইত মাঝবয়সী। খাটিয়ে গঠনগাঠন। তিনি বললেন, দেওয়ানখানায় এত দিনকার হাঁটাহাঁটি এবার সার্থক হলো।

বড় গোঁসাই হেসে বললেন, তবে হয়েছে তাহলে ? জয় গৌর !

—জয় গৌর ! যা যা চেয়েছিলাম আমরা—সবই হলো। সেই বাদশা জাহাঙ্গীরের আমল থেকে বলে আসছিলাম আমরা—তা, কেউ কানেই তুলছিল না।

বড় গোঁসাই জানতে চাইলেন, হাভেলি কিনতে পারবো ? এখনই তো আমাদের জায়গার সঙ্কুলান হয় না—

—সব পারা যাবে। আখড়া বানানো যাবে।

—ময়ূর মারা বারণ হয়েছে ?

—এ তল্লাটে এখন ময়ূর মারা—হরিণ মারা বারণ হয়ে গেছে।

—বাঃ ! জয় গৌর ! জয় গৌর !

—দক্ষিণে যাবার আগে খোদ বাদশার পাঞ্জার ছাপ দিয়ে দেওয়া হয়েছে ফরমানে। এই দেখুন—

—আবার দক্ষিণে ? আমি কি ছাই দেখতে পাই ! ও তুমি দ্যাখোগে টিকাইত। বলতে বলতে বড় গোঁসাইয়ের মনে পড়লো কৃষ্ণদাস কবিরাজের কথা। আজ যদি তিনি থাকতেন। কী খুশিই না হতেন।

ছবির মতো সবই ভেসে উঠছিল তাঁর মনে। সুবে বঙ্গালের সেই কোন্ সুদূর ঝামটপুর গাঁ থেকে চলে এসেছিলেন কৃষ্ণদাস। এই আখড়াতে বসেই লিখলেন—প্রভুর অন্তলীলা। সারাক্ষণ মনে মনে প্রভুতেই থাকতেন। সেই মানুষের চোখের সামনে আশ্রমের বাইরের মানুষজন এসে হামলা করতো। ময়ূর মারতো। হরিণ মারতো। এতদিনে সেসব বন্ধ হলো। যাক্।

বর্ষার সকালবেলা বৃন্দাবনে বড় সুন্দর। বোঝাই যায় না এই শাহী হিন্দুস্থানে কোনো শোক তাপ, অশান্তি আছে। কিন্তু তা তো হবার নয়। দুনিয়া পয়দা হবার দিন থেকে ওপর ওপর আলো হাসে—আর তলায় তলায় অন্ধকার ফেনিয়ে ওঠে।

বাদশার মনসবী ফৌজ আছে। আছে নিজের শাহী ফৌজ। তাছাড়া আছে সারা দেশ জুড়ে কয়েক লক্ষ সেপাইয়ের জংলী ফৌজ। জমিদারান্ ফৌজ। তবু শান্তি থাকে কই !

ডাঙা জায়গায় বাদশার হুকুমতের হাত যতটা জোরালো—জোলো জায়গায় ততটা নয়। যেখানেই বড় দরিয়ার কালো জল হিন্দুস্থানের খাঁড়িতে ঢুকেছে—সেখানেই ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ব্যবসা বাণিজ্যের নাম করে একদল ফিরিঙ্গি ঢুকেছে—ডিঙি করে—পালতোলা বহরি নৌকোয় চড়ে—যাদের স্বভাবচরিত্র, কাণ্ড কারখানা সবটাই ব্যবসা বাণিজ্যের মোতাবেক—একথা বলা যায় না। এরা ওলন্দাজ নয়। ইংলিশস্তানিও নয়। নয় ফ্রানসিসি। এরা পর্তুগিজ। হিন্দুস্থানে এরা আসছে তা হয়ে গেল শ'খানেক বছরের ওপর।

সরকার খালিফেতাবাদের ফৌজদার কাসিম খাঁ ঘোর বর্ষার ভেতর গঙ্গো ভট্টের সদ্য বেওয়া আলাপি গোলাপিকে নৌকোয় আশ্রয় দেবার পর বেত্রক্ষুধা

নদীর বুক থেকে সরস্বতী হয়ে যে-পথে-রূপনারায়ণে ফিরে এসেছিলেন, সেই পথ ধরেই খান বারো ছিপ ঠিক উল্টোমুখো বেয়ে ভুরীশ্রেষ্ঠ গাঁয়ের রুদ্রভূমিতে গিয়ে ভিড়লো। সরকার খালিফেতাবাদের মহল—তালুক নর্মোদয় ভট্টাচার্য রীতিমত স্বচ্ছল বলা যায়। বিশেষ করে ভুরীশ্রেষ্ঠ গাঁয়ের তো কথাই নেই। তার ঘরে ঘরে মিহি সুতোর কাটুনি। তা এই ভুরসুট গাঁয়ের মহাজন মানুষ গঙ্গো ভট্ট অল্পদিন হলো চোখ বুজেছেন। তাই এবার বর্ষার পর ভুরসুটের মানুষ যাত্রা নামায়নি। কালীপুজোতে গেরস্থ বাড়ির বউ ঝি-রা চোদ্দো শাকের ব্যঞ্জন রাঁধলেও সেই ভাবে আতশবাজি পোড়ায়নি। আজ হাট বসেছিল ভুরসুটের তেমাথানি থেকে প্রায় রুদ্রভূমি অব্দি। হরেক পসরার লম্বা হাট।

সে-হাট এই সন্ধেবেলা ভাঙো ভাঙো। শ্মশানে যাত্রী বলতে মাত্র একটি দল। তারা কাঠ সাজিয়ে একটি বাচ্চা ছেলের মড়া তাতে শুইয়ে দেবে—শ্মশানের পা ধরে হাটের মানুষ ফিরছিল—ঠিক এই সময় ছিপগুলো এসে ভিড়লো। বারোখানা ছিপ। ফি-ছিপে আটজন করে ফিরিঙ্গি। লালচে মুখে অন্ধকার হাসি।

পাখি, খরগোশ বা হাঁস যেভাবে বেড় দিয়ে ধরা হয়—ঠিক সেইভাবেই পর্তুগিজরা ভুরসুটের হাট ফেরত মানুষজন ধরতে লাগলো। জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে এক জায়গায় জমা করতে লাগলো।

ভুরসুটের শ্মশান বা রুদ্রভূমি মুহূর্তে হয়ে উঠলো ফিরিঙ্গিদের মালখানা। চিতার সাজানো কাঠ তুলে নিয়ে ওরা সুবিধামত মশাল জ্বালিয়ে নিচ্ছিল। ওদের হাত ফসকে যে যেদিকে পারে পালাচ্ছিল। যেন জালে পড়া মাছের ঝাঁক। জাল এখানে—কোড়া। হাত-বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজে তরাসে ছোটাছুটি।

ভুরসুট কিন্তু খুব সুবিধে করতে পারলো না। পর্তুগিজরা তৈরি হয়েই এসেছিল। জালে পড়া ভুরসুটের মানুষজন এবার রুদ্রভূমির গায়ে বিশাল একখানা বজরাকে ভিড়তে দেখলো। তাতে রঙিন পাল। পাটাতনে ঝলমলানো অভ্রের বাতিদান বজরাকে যেন বিয়ের আসর করে তুলেছে।

এ বজরা সুবে বঙ্গালের গাঁ দেশের মানুষজন চেনে। দেখেই তো ধরা পড়া মরদরা গম্ভীর হয়ে গেল। মেয়েরা ডুকরে কেঁদে উঠলো। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা তাকিয়ে থাকলো।

এইসব ফিরিঙ্গি ছিপ বাংলার খাঁড়িতে খাঁড়িতে দু'পাশের গাঁ বসতিতে ছোঁ মেরে বেড়ায়। শাহী সেপাই সান্ত্রীর তাড়া খেয়ে ডাঙায় উঠে ফিরিঙ্গিরা লুকোয়।

সারা দেশ তো পাহারা দিয়ে রাখা যায় না। তাই পর্তুগিজরাও ঝোপ বুঝে কোপ মারে। তার মানে ছোঁ মারে।

ভুরসুটে আজ এই শীতের সন্ধ্যায় পর্তুগিজদের আদায় উশুল ভালোই। নগদে মালপানি ছাড়াও ষোলোজন মরদ ধরা পড়েছে। কমবয়সী আওরত সাতজন। নাবালক ছেলেমেয়ে পাঁচটি। হামলাদার পর্তুগিজদের পাণ্ডা

রডরিগো সালাজার মাথার অবাধ্য বাদামি বাবরি একখানি লাল রেশমি কাপড়ে বেঁধে কোড়া হাতে দাঁড়ালো। তার সামনেই লুটের মানুষগুলোকে গুনতি করে বজরায় তোলা হচ্ছিল।

আগ্রার শাহী হুকুমে হিন্দুস্থানের মানুষ দফে দফে কর দেয়। এক সুবা থেকে আরেক সুবায় যেতে গেলেও কর দেওয়া আছে। আগুন জেলে রান্নাবাড়ি করলেও কর দিতে হয়। মুস্তাজিদ, কানুনগো, ক্রোরি, তশীলদার— যারা আর কি হিন্দুস্থানের গাঁয়ে গাঁয়ে শাহী কর আদায় উশুল করে—তাদের খরচ খরচা, খানাপিনা, গান বাজনার শখ থাকলে তার খরচও চালাতে হয় মহল্লার চাষীবাসি মানুষকেই। সে জন্যে খরচ-ই-দে বলে এক কিসমের কর বেঁধে দিয়েছে আগ্রার শাহী দেওয়ানখানা।

এই পর্তুগিজরা তশীলদারদের ওপর এক কাঠি। লুটপাটের পর রডরিগো সালজার হুকুম দিলো, গাঁওকর কে আছো বেরিয়ে এসো—

ভুরসুট গাঁয়ের গাঁওকর গঙ্গো ভট্ট বংশেরই যাদব ভট্ট। বয়স হয়েছে। এদের ফিরিঙ্গিরা নেয় না। বয়স হলে ছুঁয়ে দেখে না। কেননা, বুড়ো মানুষ বিকোয় না। যাদব কাঁপতে কাঁদতে সামনে এসে দাঁড়ালে হুকুম হলো—এই হাটের হপ্তাওয়ারি রাহাদারি মাসে একবার করে রূপনারায়ণের মুখে এসে পেঁছে দিতে হবে। আমাদের ছিপ এসে দাঁড়াবে—

যাদব ভট্ট অনেক কষ্টে সাহস করে বললো, শাহী রাহাদারি তো আমরা দিয়ে থাকি—

আলো ঝলমলানো বজরায় মরদদের সঙ্গে আওরত, বালবাচ্চাদের গাদিয়ে তোলায় ওদের শীত তত লাগছিল না। কিন্তু এখুনি চিরকালের মতো ভুরসুট থেকে কোথায় নিয়ে যাবে—তার কোনো ঠিক নেই—কোন্ অজানা জায়গায় বেচে দেবে—এই কথা মনে আসতেই মেয়েরা চিৎকার করে কাঁদছিল। সেই কান্নায় বুড়ো গুঁড়োর সারা ভুরসুট বোবা হয়ে গেল।

—ওসব বুঝি না। হপ্তাওয়ারি তিনশো দাম—মাস গেলে বারোশো দাম আমাদের ছিপে পেঁছনো চাই—

—কিন্তু--বলে থেমে গেল যাদব ভট্ট।

রডরিগো মাটিতে কোড়া ঝেড়ে বললো, নয়তো হপ্তায় হপ্তায় আমরা আসবো। সেটা কি ভালো হবে!

—ভুরসুটের সুতোর জন্যে আমরা তো একবার কাটুনি কর দিয়েই থাকি।

—সুতোর হিসেব এর ভেতর আসে কী করে?—বলতে বলতে রডরিগো সালাজার যেন চটে উঠলো। ও হিসেব তো আলাদা—

নিরুপায় যাদব বললো, আমরা কতদিকে যোগাবো? মানুষের জান তো একটাই—

সঙ্গে সঙ্গে রডরিগোর হাতের কোড়া বোম্বেটেদের ধরে রাখা মশালের আলোয় ঝলসে উঠলো। চামড়ার পাকানো কোড়া। যাদব ভট্ট মাটিতে পড়ে গেল। তার আশপাশে হাটবারের কয়েকজন ব্যাপারি। সবাই বুড়ো সুড়ো।

তারাই হাতে ধরে তুললো যাদব ভট্টকে। ব্যথায়, অপমানে, শীতে নিরুপায় যাদব কারও দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারলো না।

শীতের সন্ধেয় ভাঙা হাটে শ্মশানের গায়ে ফিরিঙ্গি পর্তুগিজেরা ভুরসুট গাঁয়ের সাক্ষাৎ মৃত্যু হয়ে দেখা দিয়েছে। মশালের আলোর বাইরে বাঁশঝাড়ের গোড়ায়, আসশ্যাওড়ার ঝোপে এখানে সেখানে আরও কিছু মানুষ ঘাপটি মেরে বসা। কারও মেয়ে, কারও স্বামী, কারও বা বউ এই খানিক আগে পর্তুগিজ বজরায় চালান হয়ে গেছে।

সেই বজরা এখন সামান্য ঢেউ তুলে মাঝনদীর দিকে এগোচ্ছে। ছিপে ছিপে পর্তুগিজরা লগি ঠেলে মুহূর্তে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গেল। ডাঙায় দাঁড়িয়ে মেয়ে হারানো, বউ হারানো, স্বামী হারানো মানুষজন নিরুপায় চোখে দেখলো, বজরার আলো নিভিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

অন্ধকারের ভেতর ভাসন্ত কান্নার রোল নিয়ে বজরা তার পথে চলতে লাগলো। সেই সঙ্গে ফিরিঙ্গিদের হাসির হররা—বোঝা যায় না এমন ভাষায় কিছু কথার টুকরো টাকরা অন্ধকার বেত্রক্ষুধার বুকে ছড়িয়ে যেতে লাগলো।

সেই অন্ধকারেই ভুরসুটের কে যেন বললো, বাদশার হুকুমে আছে—কোনো শাসন নেই।

—আরেকজন বললো,—

রডরিগোর ছিপ।
কাসিম খাঁয়ের টিপ!

কেউ কারও মুখ কিন্তু দেখতে পেল না। নদী এখানে আঁধারে পাথার। কারও কিছু করার নেই। বজরার লাদাই হওয়া মানুষজনের কান্নাকাটিও আর শোনা যাচ্ছে না। সুবে বঙ্গালের সরকার খালিফেতাবাদের মহলে মহলে এখন সব গাঁ-বসতিই এভাবে পড়ে আছে। পড়ে থাকে।

॥ উনত্রিশ ॥

সরকার খালিফেতাবাদের ফৌজদার নদীপথের ঝুঁকি নিলেন না। নিজের চোখে দু'জন জিন্দা বেওয়া ইনসানকে আগুনে ঝাঁপ দিতে সতী হতে দেখা যায় না। আবার ওদের বাঁচালে পর শাহী দেওয়ানখানায় তালুক নর্মোদয় ভট্টাচার্যের ভুরসুট গাঁ থেকে নালিশ যায়। কী করা যায়?

লাঠি না ভেঙে সাপ মারার জন্যে ফৌজদার কাসিম খাঁ মাথা থেকে এক বুদ্ধি বের করলেন। বাদশা শাহজাহান জিন্দা ভেট বড় পছন্দ করেন।

বর্ধমানের ফৌজদারকে সংক্ষেপে আগাম চিঠি পাঠালেন ঘোড়া ডাকে। বাদশার ঘর গেরস্থালির জন্যে দুজন খিদমতগারনি যাচ্ছে। দেখবেন আগ্রার ঘোড়াডাকে যেন ব্যবস্থা হয়।

এই চিঠির সঙ্গে সঙ্গে ফৌজদার কাসিম খাঁ আগ্রার দেওয়ানখানায় লম্বা চিঠি ধরিয়ে দিলেন। আলাপি গোলাপি যেমনই বুদ্ধিমতী—তেমনই বঙ্গালের

যা-কিছু গুণপনা সবই ওদের মধ্যে আছে। বাদশা-বেগম যদি খিদমতগারির জন্যে ওদের রাখেন তো ওরা বর্তে যায়। ওরা বিনীত, ভদ্র। খুব মনোযোগী সেবিকা হয়ে থাকে।

এক শীতের সকালে ঘুসুড়ি, খুরুট, বাঁকড়া, গোলদিঘি হয়ে ডাঙায় ডাঙায় আলাপি গোলাপি গঙ্গার গা ধরে বর্ধমানের পথে চললো। সেখান থেকে ঘোড়াডাক ধরে যাবে আগ্রা।

গঙ্গো ভট্টের এই দুই বেওয়া মাত্র অল্পদিন আগে সতী হতে যাচ্ছিল। সময় মতো বেতসের জলে ঝাঁপিয়ে না পড়লে দুই বোনকেই গঙ্গো ভট্টের পাশে জ্বলন্ত চিতায় জ্যান্ত শুতে হতো।

সে বড় সুখের হতো না। এই কথাই দু'বোন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল। শীতের দুপুর। জায়গাটা গঙ্গার কাছেই। জিরাট বলাগড়। সুবে বঙ্গালের বড় বড় মাল্লাই নৌকো এখানেই কারিগররা বছরের পর বছর বানিয়ে আসছে। ঘোড়ায় টানা গাড়িতে বসে আলাপি দেখলো গঙ্গার বুকে বিরাট চড়ায় কারা যেন কলাই কড়াই মাড়াচ্ছে গরু দিয়ে। দেখে বলে বসলো, কতকাল বড়ি দিয়ে কলাই শাক খাওয়া হয় না—

গোলাপি বললো, বেতসের পাড়ে সেদিন চিরকালের মতো কলাই শাক খাওয়া হয়ে যাচ্ছিল!

এই ভাষাতেই ওরা ওদের সতী হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকে নিজেদের মধ্যে ইদানীং বলে থাকে। সতী হওয়াকে ওরা কখনো বলে—কলাই শাক খাওয়া—কখনো কুলের অম্বল খাওয়া বলে সতী হওয়া বোঝায়।

কাছাকাছি বুনো মসজিদে জহুরের নামাজের তোড়জোড় দেখতে পেয়ে সঙ্গী ঘোড়সওয়াররা বিশাল এক আমবাগানের ভেতর ঘোড়া বেঁধে রেখে দল বেঁধে নামাজ পড়তে গেল।

শীতের দুপুর। বাতাসের সঙ্গে শুকনো আমপাতা খড়খড় করে উড়ছিল। আলাপি আর গোলাপি দেখলো, সারা আমবাগান সুনসান। সবাই সামনের মসজিদে গিয়ে ঢুকছে। এ মসজিদ প্রায় বনের মধ্যে বলে আশপাশে সবাই বলে থাকে বুনো মসজিদ। ভুরসুটে থাকতে গঙ্গো ভট্টের ঘর করার সময় আলাপি গোলাপিও এ মসজিদের নাম শুনেছে। জল পড়া, তাবিজদারির জন্যেও এই মসজিদ আশপাশের বিশ পঞ্চাশ মঞ্জেলের ভেতরে সব গাঁয়ের মানুষের কাছে বেশ পরিচিত।

· গাড়ি থেকে নেমে আলাপি বললো, আয় বোন—পাড়ে গিয়ে দাঁড়াই। এখন তো কেউ নেই।—

পাড় মানে গঙ্গার ভেঙে যাওয়া আধ-খাবলা তীর। তার অনেক—অনেক নিচে শীতের শান্ত নদী। সে নদীর বুক জুড়ে চড়া। চড়ার গা ধরে খান কয়েক ছিপ যাচ্ছিল। ওপর থেকে বোঝা যায় না—কারা যায় ছিপে।

বোঝারও উপায় নেই আলাদা করে। শ'খানেক বছর হয়ে গেল ফিরিঙ্গি পর্তুগিজরা ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে এই সুরে বঙ্গালে। তারা ভাত খায়। খালি

গায়ে আঁটল পেতে খাঁড়িতে মাছ ধরে। হাটুরে সন্ধেবেলা অন্ধকারে বসে এমনভাবেই কথা বলবে যেন এদেশেরই মানুষ। নদীর গায়ে গাঁ-গঞ্জ ওদের নখদর্পণে। সুবিধেমত মানুষ লুট করে ধরে নিয়ে গিয়ে দরিয়া পার করে দিয়ে দূর দূর দেশে বেচে দিতেও দড় !

আলাপি আর গোলাপির কী খেয়াল হলো—ভাঙা পাড় ধরে নিচে নামতে লাগলো। গোলাপির ইচ্ছে গঙ্গার জলে হাত ডুবিয়ে দেখবে। আলাপি ঠিক করলো মাথায় কয়েক আঁজলা জল দিয়ে শরীরটা ঠান্ডা করবে।

বেশি নিচে ওদের নামতে হলো না। ছিপে যাচ্ছিল বর্ণচোরা কয়েকজন পর্তুগিজ। তারা মাথা তুলে দু'বোনকে দেখতে পেল। অল্প খাটুনিতে মোটা দাঁও মারার রাস্তা—মানুষ লুট। বিশেষত মেয়েমানুষ। ওরা দিশি মানুষের ভঙ্গিতে মাছ ধরার ভান করে ওৎ পেতে থাকলো। এমনিতেই রোদে পোড়া খালি গা দেখে হঠাৎ করে ওদের চেনার উপায় নেই।

শুধু খিদমদগারি পাঠালে হয় না। ফৌজদার কাসিম খাঁ ওদের সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠিয়েছে। কথায় আছে—সাজলে নারী। হাজার হোক হিন্দুস্থানের শাহেনশার ঘর-গেরস্থালি। সেখানে চোখে সয় এমন ইনসানই তো খিদমত খাটার সুযোগ পাবে।

সতী হয়ে পড়ার দিন থেকে ফৌজদারের আশ্রয়ে চলে এসে আলাপি গোলাপির জীবন যেন ফের শুরু হয়েছে। কোথায় ভুরসুট! আর কোথায় রাজধানী আগ্রা ! তাও আবার শাহী ঘরগেরস্থালির জন্যে বাছাই হয়ে যাওয়া। আগুনে জ্যান্ত দগ্ধে মরার জায়গায় যেন বরাত খুলে যাওয়া।

ঘাগরা পরে ওড়না দুলিয়ে এবড়ো খেবড়ো ভাঙা নদী-পাড় ধরে আলাপি নামছিল সবার আগে। তার পেছন পেছন গোলাপি। আর খানিক এগোলেই নদীর জল ছোঁয়া যায়। আঁজলায় তুলে মাথায়ও দেওয়া যায়।

ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই এমন শান্ত অলস শীতের দুপুরে দুই বোনের চোখের সামনে অচমকাই সারা আকাশ যেন ঘুলিয়ে উঠলো। যারা মাছ ধরছিল পিঠ ফিরে—তারা ঘুরে দাঁড়িয়ে পাঁক ভেঙে ধেয়ে এলো। ওদের মুখে হাসি। তা যেন মৃত্যু। দুই বোনকে পাঁজাকোলে কাড়াকাড়ি করে ওরা তুলে নিলো। আলাপি বাবা গো—! —বলে চেঁচিয়ে উঠলো। গোলাপি সে সুযোগও পেল না। এক ফিরিঙ্গি তার হাঁ-মুখে কোমরের স্কার্ফ গুঁজে দিলো।

ডাঙায় ঘোড়সওয়াররা গাড়ি ফাঁকা দেখে পাড়ের দিকে ছুটে এলো। আলাপি ওদের চ্যাংদোলার ভেতর নিচু থেকে শুধু তিনটে ঘোড়ার মাথা দেখতে পেল। সওয়ারদের একজনের চেঁচিয়ে ওঠা মুখ। তার মাথার পাগড়ি। কিন্তু কোনো কথা শুনতে পেল না আলাপি। কেননা, তখন তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

এমনই শীতের দুপুরে আগ্রা দুর্গকে বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝার

উপায় নেই। জমজমাট রাজধানীর হৃৎপিণ্ড এই আগ্রা দুর্গ। তাকে ঘিরে শান বাঁধানো গভীর নালায় যমুনার জল। সে জলের ওপর দিকে দুর্গে ঢোকার টানা তক্তা পোল। পোলের গোড়ায় খাড়া দাঁড়িয়ে রুক্ষ মুখের জবরদস্ত রাজপুত সেপাই।

এসব পেরিয়ে বাদশা-শাহজাহানের অন্দরমহল। দুর্গের শুরুতেই আগেকার আকবরি মহলের অনেকটাই এখন শাহী দেওয়ানখানার কাছারি খেয়ে নিয়েছে। সাবেক জাহাঙ্গির মহলকে আরও বড় করেছেন বাদশা শাহজাহান। গালিচা বনাত এমন করেই পাতা হয়েছে মেঝেতে যাতে কিনা শাহী মহলের কারও পায়ের বোগদাদি চটির তলা না আটকে যায়। বিশাল চত্বরের ভেতরকার স্তম্ভগুলোতে নতুন পাথর উঠেছে।

খোদ বাদশা তাঁর দীবানে বসে। মাথায় রাজছত্র। দু'পাশে চামরধারী। তাঁর চোখের সামনে খোলা চত্বরের বাইরেই ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছিল নিচের আঙুরিবাগের নানান ফুলের সুবাস।

বাদশা শাহাজাহান জন্মকুণ্ডলী আঁকা একখানি বড় কাগজ মেলে ধরলো।

তাঁর উল্টোদিকে বসে থাকা মানুষটি বললেন, জন্মকুণ্ডলীটি কার?

—আমার বড় ছেলে সুলতান মহম্মদ দারাশুকোর। কোষ্ঠীও অছে: দেখাবো?

দাড়ি-গোঁফে মুখ ঢাকা মানুষটি একবার হাসলেন।—শাহেনশা! আমি ইস্পাহানের সামান্য মুসাফির!

—পীর রাফাসজানি। আপনি সামান্য মুসাফির নন। দেশে দেশে ঘুরে আপনার সাধনা। আপনার সিদ্ধি।

—আমি দীন পীর রাফাসজানি। আমার জন্মকুণ্ডলী লাগে না। লাগে না কোষ্ঠী। আমার যা কিছু বিচার—মুখ দেখেই করি। আপনি সুলতানদের ডাকুন।

খানিক বাদেই একে একে সুলতানরা এসে দাঁড়ালো। তাদের ভেতর মহম্মদ দারাশুকোই সবচেয়ে দীঘল। চিবুকের দু'পাশে ফিকে মতো প্রথম যৌবন-রেখা। তাতে মুখশ্রী আরও শুদ্ধ আর খোলতাই দেখালো। তাঁর মুখখানি খুঁটিয়ে দেখে পীর রাফাসজানি কিছু ভারি চেহারার আরেক কিশোরের মুখে তাকালেন। সে মুখ থেকে পীরের মুখের ওপর তাচ্ছিল্য ঝরে পড়লো।

বাদশা যেন চিনতে সুবিধার জন্যে পীরকে বললেন, সুলতান সুজাঙ্গীর।

পীর রাফাসজানি সে তাচ্ছিল্য গায়ে না মেখে সুলতান সুজাঙ্গীরের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন। ইনি?

—সুলতান আওরঙ্গজেব—

কিশোরের মুখ থেকে পীর রাফাসজানি চোখ সরাতে পারছিলেন না। রীতিমত সুশ্রী মুখে ঘন কালো জোড়া ভ্রূ। আওরঙ্গজেবের লালচে ফর্সা রং গায়ের চুনোটি আঙরাখার লালচে আভার সঙ্গে মিশে গেছে। মাথা ভর্তি মেঘ কালো চুলের ঢাল।

পীর রাফাসজানি ঘুরে ফিরে সুলতান সুজাশগীরকে চোখে পা থেকে মাথা অব্দি জরিপ করে নিলেন।

বাদশা শাহজাহানের গলার কাছে জিভটা এসে ডেলা পাকিয়ে উঠলো। তিনি হিন্দুস্থানের বাদশার উপযুক্ত গম্ভীর ভাব বজায় রেখে শান্ত গলায় বললেন, কিছু বলবেন?

পীর রাফাসজানি সে কথায় না গিয়ে হাসিমুখে সুলতান মুরাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, খুদে সুলতান দেখছি জাঁহাবাজ লড়াকু হবেন—

পাঁচ বছরের মুরাদ বকস তার সামনের স্তম্ভে বসানো একটি বাদাকশানি স্ফটিক কচি আঙুলে বৃথাই খুঁটে তোলার চেষ্টা করছিল। তার এদিকে কোনো মন নেই। কে বাদশা—কে পীর—তার জানার কোনো আগ্রহই থাকার কথা নয়। বয়স আন্দাজে চওড়া বুক—তাগড়া দু'খানি হাত।

বাদশা শাহজাহান হেসে বললেন,' সে তো এখনই টের পাওয়া যাচ্ছে— !

পীর রাফাসজানি বললেন, চার সুলতানই বয়সকালে নামি দামি মানুষ হবেন।

—এ আর নতুন কথা কী বললেন! বাদশাজাদারা কি ভুঁইচাপা ঘাসের নসিব নিয়ে জন্মান ?।

এসব কথায় চার সুলতানের কেউই কোনো আগ্রহ বোধ করছিল না। পীর সাহেব দেখলেন, সুলতান আওরঙ্গজেব তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। সে দৃষ্টি কাউকে পুরোপুরি গেঁথে তুলে নির্দিষ্ট করে না। কেননা, একই সঙ্গে মনে হলো সদ্য কিশোর আওরঙ্গজেব দূরের দেওয়ালেও তাকিয়ে আছেন। এই সামান্য বয়সে এমন নজর গায়েবি কেন? বুঝে উঠতে পারছিলেন না পীর রাফাসজানি। তিনি আস্তে করে বললেন, ওদের এখানে আর আটকে রাখা কেন?

পীর সাহেবের ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলেন বাদশা শাহজাহান। তিনি কিছু বলার আগেই সুলতানরা যেমন এসেছিল—তেমনই চলে গেল। রয়ে গেল শুধু মুরাদ বকস্। সে তখনো স্তম্ভে বসানো স্ফটিকটি খুঁটে তোলার চেষ্টা করছিল।

পীরের ঠোঁটে উঠে আসা কথাগুলো শোনার জন্যে হিন্দুস্থানের বাদশা অধীর হয়ে উঠেছিলেন। সাধু-সন্ন্যাসী-পীর-ফকিরের কথায় মুঘল শাহীর গভীর আগ্রহ চিরকালের—বিশ্বাস অনেকদিনের। প্রথম যৌবনেই শাহজাদা খুর্রম নজুমীর, গণৎকারদের কথা ফেলতে পারেননি। ওদের ছক, সামুদ্রিক বিচারের সব কিছুতেই বিশ্বাস বাদশার। সুলতানরা চলে যেতেই বাদশা পীর রাফাসজানির মুখে তাকালেন। কী দেখলেন?

রাফাসজানির কপাল কুঁচকে গেল। তিনি আস্তে আস্তে প্রায় দৈববাণীর ঢংয়ে বললেন, খোদাবন্দ! সবচেয়ে গোরা সুলতানের জন্যেই তৈমুর খানদানি একদিন খতম হবে--

বাদশা শাহজাহান একথা শুনে ভেতরকার শেকড় অব্দি থরথর করে কেঁপে উঠলেন। ঠিক তখনই পাঁচ বছরের মুরাদ স্ফটিকটি টেনে তোলার চেষ্টা করতে

গিয়ে স্ফটিক ফসকে মেঝের বনাতে গড়িয়ে পড়লো। পড়েই মুরাদ উঠে দাঁড়ালো।

এই জেদি বালককে সাবাসি দিয়ে বলে উঠলেন পীর, বাঃ! খুব—

—বাদশা গম্ভীর গলায় বললেন, আপনি ঠিক দেখেছেন?

—আমি তো তাই দেখলাম আলা হজরত –

এরপর শাহজাহান আর কিছু জানতে চাইতে ভয় পেলেন। আগামী দিনের পেটের ভেতর কোথায় কোন্ বিপদ ঘাপটি মেরে বসে আছে কে বলতে পারে! হিন্দুস্থানের সেরা জানবাজ লড়াকু বাদশা হয়ে দেখছেন—কয়েকটি জিনিসের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না। যেমনঃ বদনাম। কানাকানি। গুজব। আর আগামীদিন।

তিনি দীবান ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিশাল খোলা জানলায় গিয়ে যমুনার মুখোমুখি হলেন। শীতের নদী। হিন্দুস্থানের বাদশাহীর পয়লা সাক্ষী। একদিন লোদিদের তাগদ এই নদী দেখেছে। লোদিরা আর নেই। আগ্রায় তাদের শুরু করা এই দুর্গ আরও বড় হয়েছে। যমুনাও আছে। কিসে একটা শাহী দুনিয়া থেকে একদম লোপাট হয়ে যায়?

শীতকালের আকাশে কোনো মেঘে নেই। নিচের যমুনার চরে ছবির মতো ঘর-গেরস্থালির ঝুপড়ি, চাষবাস, জল। হঠাৎ বাদশা দেখলেন, দেওয়ানি খাসের ঠিক নিচেই হায়াত বকস্ বাগে সুলতান দারাশুকো সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে কোন্ না কোন্ দিওয়ান সুর করে বলছে। সব কথা বোঝা যায় না এত উঁচু থেকে।

বাদশা শাহজাহান দেখলেন, বিশাল আগ্রা দুর্গের বিরাট উঁচু দেওয়ালের জায়গায় জায়গায় আরও উঁচু সমান বুরুজের ভেতর ছবির মতোই পাহারা-সেপাই গোয়ালিয়র থেকে ছুটে আসা রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুশমন এলেই নিচের ঘোড়সওয়ারদের জানান দেবে। জল ভর্তি নালার ওপর টানা তক্তাপোল তুলে দেওয়া হবে। হামলার জন্যে লড়াকু হাতি তৈরি করা হবে। তারপর জোয়ারের জলের মতোই হাতির দঙ্গল সিধে দুশমনদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদের পেছনে থাকবে বাছাই বাছাই ঘোড়সওয়ার। আর দুর্গের ওপর থেকে তখন ভারি গোলা গিয়ে পড়বে দুশমনদের ওপর।

অ্যাতো করেও কি মুঘল শাহী রাখা যাবে! খানদানের ভেতরেই যদি সাপ থাকে। যদি ভেতর থেকেই দংশায়!

হঠাৎ বাদশার চোখে পড়লো—দু'টি গভীর গাঢ় চোখ নিতান্ত নির্দোষ ভঙ্গিতে তাঁরই দিকে তাকিয়ে।

শাহজাহান ভালো করে তাকালেন। হায়াত বকস বাগের একটি চিনার গাছের নিচে আওরঙ্গজেব দাঁড়িয়ে। সবুজ পাতায় ছায়ায় সফেদ সুলতান। ছেলেদের ভেতর সুলতান আওরঙ্গজেবই সবচেয়ে গোরা। সেই তুলনায় দারার গায়ের রং কিছু চাপা।

বাদশা দেখলেন, এগারো বারো বছরের আওরঙ্গজেব যেন কিছুটা

অন্যমনস্ক ! বোধহয় কিছু ভাবছে । কিন্তু তার চোখ এদিকেই । শাহজাহানের মনে হলো—হয়তো কাছে গেলে দেখতে পাবো—ওই দুই চোখ আলাদা করে আমাকে দেখছে না । সব কিছুর ভেতর হিন্দুস্থানের বাদশাকেও সামিল করে নিয়ে আওরঙ্গজেব তাকিয়ে আছে ।

বাদশার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, সাপ ! সাদা সাপ !

নিচে মহম্মদ দারাশুকো তখন সুরেলা গলায় বলে উঠলো, বলো তো ? এই দিওয়ানটি কার ? কে লিখেছেন ?

ফোয়ারার জলে ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে সুলতান সুজাঙ্গীর এতক্ষণ পাপড়ি ভাসিয়ে দিচ্ছিল । তা থামিয়ে সে একবার বললো, কার বড়ে ভাই ?

দারাশুকো ফের হাসলো । তবে আবার বলছি । শোনো ভালো করে । তারপর বলবে কোন্ কবি লিখেছেন ?

এবারও সুলতান সুজাঙ্গীর ঠিক ধরতে পারলো না । সে আন্দাজে বললো, রুমি ? হাফেজ ?

—উঁহু !

—সাদি ? ঠিক বুঝতে পারছি না বড়ে ভাই—

—উঁহু ।

—তাহলে বড়ে ভাই এ দিওয়ান বড় কঠিন ! তুমি খুলে বললে বুঝতে পারবো—

সুরেলা গলায় প্রায় গেয়ে উঠলো দারা । সুজা অবাক হয়ে বড়ে ভাইয়ের মুখে তাকিয়ে । কী সুন্দর দেখতে বড়ে ভাই । ওই চিনার গাছের মতোই সিধে—সবল । তারপর এমন সুন্দর গান আসছে ওই শরীর থেকেই । বড়ে ভাই আমার চেয়ে মাত্র এক বছরের বড়—

দারাশুকো গান থামিয়ে বললো, কবি এখানে বলছেন—

> পানি কখনো হিমানির বদন ঢাকতে পারে না
> বড় জোর ফেলে যায় সামান্য দাগ
> অথচ পানিতেই হিমানি ভাসে !
> আবার হিমানির মাঝেই থাকে পানি !

—ইস ! এ দিওয়ান যদি আব্বা হুজুর বাদশার দরবারে বিলাসখান সুর করে গাইতেন—চারদিকে সাবাসি পড়ে যেতো বড়ে ভাই—

দারা চাপা হাসিতে মুখ ভাসিয়ে বললো, এখন তো বিলাসখান দরবারে আর আসেনই না । বয়স হলো । বরং লাল খাঁ গাইতে পারতেন—

এতক্ষণ যে কোনো কথা বলেনি—সে হলো সুলতান আওরঙ্গজেব । দিব্যি এগিয়ে এসে সে বললো, কী এমন দিওয়ান ! এর চেয়ে অনেক ভালো দিওয়ান আমি পড়েছি—

দারাশুকো হাসতে হাসতে বললো, ঠিকই তো । থাকতেই পারে—বলেই নিজেকে শুধরে নিলো দারাশুকো, আছেই তো ।

সুলতান আওরঙ্গজেব তখন বলে চলেছে, এমন হেঁয়ালি ভরা দিওয়ান যে

কিছু বোঝাই যায় না। হিমানিতে পানি! পানিতে হিমানি!

বড়ে ভাই দারাশুকোর মুখখানি একটু আগে হাসিতে ভাসছিল। এবার তা যেন নিভে এলো। সে মাথা নিচু করে বললো, ঠিকই বলেছো ছোটেভাই! যে শুনবে—তারই যদি ভালো না লাগে তো সে দিওয়ান—দিওয়ানই নয়।

—আমি বলবো বড়ে ভাই—এ দিওয়ান কার?

—জানা থাকলে বলবে—

—আমি জানি বড়ে ভাই!

—জানলে বলো।

—সুলতান মহম্মদ দারাশুকোই এই দিওয়ানের তাখাল্লুম! বড়ে ভাই যে দিওয়ানা হয়ে আশমানের দিকে তাকিয়ে থাকে—দিওয়ান লেখে তা আমি জানি। কিন্তু এসব লিখে কী হয়!

একজন খাঁটি কবি—একজন সাচ্চা তাখাল্লুমের মতোই সুলতান মহম্মদ দারাশুকো প্রায় মাটিতে মিশে গিয়ে এতক্ষণ সব মেনে নিচ্ছিল। বিশেষ করে কথাগুলো যদি বলে কোনো ছোটে ভাই। আর দিওয়ানের লেখক যদি হয় কোনো বড়ে ভাই। কিন্তু সুলতান আওরঙ্গজেব যেই বললো, এসব লিখে কী হয়!—অমনি দারাশুকো যেন জ্বলে উঠলো। তার চোখ যেন বড় হয়ে গেল। মুখে রক্ত উঠে আসার লালি।

দারাশুকো বললো, বড় বড় শাহী মুছে যায় দুনিয়া থেকে। কিন্তু থাকে একটি দিওয়ান। একটি রুবায়-ই। খিলজিরা নেই। নেই লোদিরা। আছেন আমির খসরু। রয়েছেন জালালুদ্দিন রুমি। হাফেজ। আত্তার।

সুলতান আওরঙ্গজেবও ছাড়বার পাত্র নয়। সে দিব্যি বলে দিলো—ওঁরা আছেন কেতাবে! দিওয়ানা মানুষের পাগলামিতে!

—বলো ছোটে ভাই বেহস্তের পাগলামিতে। জ্ঞানী গুণী ইনসানের মগজে।

—মগজ নয় বড়ে ভাই। খোয়াবে! স্রেফ খোয়াবে! আর শাহী তাগদ, জোস কি মুছে যাবার জিনিস? এই তো হিন্দুস্থানে মুঘল তাগদের সবচেয়ে বড় দাগ—এই আগ্রা দুর্গ বড়ে ভাই? এ কি মুছে যাবার জিনিস? আমির খসরুর দিওয়া...—রুমির রুবায়-ই কি আগ্রা দুর্গের চেয়েও টেকসই?

হো হো করে হেসে উঠলো দারাশুকো। সে হাসিতে আওরঙ্গজেবের দুই ভ্রূ কুঁচকে গেল। তখন সুলতান দারা বললো, ভুলে যেও না ছোটে ভাই—লোদি তাগদের নিশানা ছিল এই দুর্গ একদিন। সে তাগদ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল বলেই তো আকবর বাদশার হুকুমে এই পেল্লাই দুর্গ ফের গড়ে উঠেছে। আমরা সামান্য ইনসান। আমরা শুধু মোনাজাত করে বলতে পারি—খোদা না করেন—

এই অব্দি বলে সুলতান দারা চুপ করে গেল। আর বললে বলতে হতো—মুঘল শাহীও একদিন হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে—যেমন কিনা সব শাহীর গতি হয়। কিন্তু সেই অব্দি কে বলতে চায়!

সুলতান আওরঙ্গজেব বললো, থামলে কেন বড়ে ভাই ? বলো ! বলে ফেলো —তোমার আসল ইচ্ছেটা কী !

দারাশুকো ওসব কথায় না গিয়ে বললো, হ্যাঁ, শাহী একদিন হাওয়ায় মিলিয়ে যায়—সব শাহীর তাগদও একদিন ফুরিয়ে যায়। কোনো চিহ্ন তার থাকে না। কিন্তু থেকে যায়—

সুলতান সুজাঙ্গীর এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সে দুই ভাইয়ের এই চাপান-উতোরের তলায় তলায় এক চাপা ঘূর্ণীর দমবন্ধ দশা টের পেয়ে অস্বস্তি বোধ করছিল। তা থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যেই যেন বলে উঠলো, কী বড়ে ভাই ? কী থাকে ?

—বড় কাজ। বড় কাজ সহজে মুছে যায় না। শের শাহ নেই। রাস্তার দু'ধারে তাঁর বসানো গাছগুলো বড় হয়ে আজও মুসাফিরকে ছায়া দেয়। পাখিরা সেসব গাছে বাসা বেঁধে থাকে। তাঁর বানানো রাস্তা দিয়ে আজও ঘোড়া ডাক যায় মহলে মহলে। তাঁর খোঁড়া দীঘির পানি খেয়ে ইনসান জানোয়ার —সবাই তৃষ্ণা মেটায়—

পাকা তর্কবাজের মতোই আওরঙ্গজেব মুখিয়ে উঠলো ; সে বললো, খোদ খোদা এই দুনিয়া তৈরি করেছেন ? ইনসানের মাথায় ছায়া, তৃষ্ণায় পানির ব্যবস্থা তাঁরই করা। শের শাহ কিছু খোদকারি করেছেন মাত্র ! অত বড় করে দেখার কিছু নয়।

মুঘল শাহীতে কেউ খোলাখুলি শের শাহর প্রশংসা করেন না। কারণ, ইতিহাস। দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশার দাদা সাহেব হুমায়ুন বাদশাকে এই শের শাহই এক সময় দেশছাড়া করেছিলেন। তাই তাঁকে নিয়ে মাতামাতি সবারই না-পসন্দ। সেকথা সুলতান দারাশুকোর অজানা নয়। বিশেষ করে খানিক আগে আওরঙ্গজেব যখন বলছিল—থামলে কেন বড়ে ভাই ? বলো। বলে ফেলো—তোমার আসল ইচ্ছেটা কী ! তখনই সুলতান দারাশুকো একই সঙ্গে খুব অবাক হয়েছে—আবার ভেতরে ভেতরে কিসের এক অজানা গন্ধ পেয়ে কেঁপে উঠেছে। তাই সে চুপ করে গেল।

কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারলো না। দারার ভেতরকার আরেক দারা যেন ভেতরে ভেতরে বলে উঠলো, মানীর মান—গুণীর গুণ চাপা থাকার নয়। না বলতে পেরে তারই যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

সে বলে উঠলো, ছোটে ভাই ! শের শাহর কাজকর্ম খোদার ওপর খোদকারি বলে হালকা করা চলে না। ভুলে যেও না—খোদ আকবর বাদশার ইচ্ছায় আব্বাস শেরওয়ানি তুহ্ফাৎ-ই-আকবর-শাহী লেখেন। তার গোড়ার দিকটা তো আগাগোড়াই শের শাহর জিন্দানামা ! এক বাদশা আরেক বাদশার গুণগান করতে পিছপাও হননি কিন্তু !

—আমি পড়িনি বড়ে ভাই—

—আমিও পড়িনি। মক্তবে দৈলভী সাহেব যা বলেছেন তাই তোমায় বললাম। তবে একটা কথা বলি ছোটে ভাই—গাছ, দীঘি, রাস্তা, দুর্গ আরও

কত কি বানিয়ে গেছেন দুনিয়ার বড় বড় বাদশা। কিন্তু সেসবও একদিন মুছে যায়। তাঁদের বিশাল বিশাল কীর্তি থেকে যায় ফকির দরবেশের গানে গানে —দু'একটি কথায়। কিন্তু তেমন দিওয়ান—তেমন রুবায়-ই থাকে আরও অনেকদিন। কোথায় গেল খিলজিরা? খুঁজেও পাবে না। কিতু আমির খসরু তো আজও আছেন—

—ওসব কথা এখনকার মতো থাক বড়ে ভাই—বলে এগিয়ে এলো সুলতান সুজাঙ্গীর। বরং তোমার দিওয়ানটিই গেয়ে শোনাও। ওই যে কী যেন— —হিমানি পানি—

সুলতান আওরঙ্গজেব কোনো কথা বললো না। তার চোখ মুখ দেখে সুলতান দারা ধরতে পারলো না—ছোটে ভাইয়ের মাথায় তার কথাগুলো গেছে কিনা।

।। তিরিশ ।।

বাদশা শাহজাহান শীত কমতেই রাজধানী আগ্রার কাছাকাছি নারোয়ার জঙ্গলে শিকারে গেছেন। নারোয়া—বাগোয়ান—এসব জঙ্গল রাজধানী থেকে এতই কাছে—বাদশা এবেলা ওবেলা তুখোড় ঘোড়সওয়ারের হাতে চিঠি পাঠিয়ে শাহী চালাচ্ছেন আজ ক'দিন। বাদশা শিকারে গেছেন বলে তো দেওয়ানখানার কাছারি থেমে থাকতে পারে না।

এখন সকালবেলা। শাহী সড়ক চলে গেছে মুলতানের দিকে। সেখান থেকে দেহাতের ভেতর পাঁচ ছ' মঞ্জেল ঢুকে গিয়ে তবে নারোয়া। ওখানে বুনো হাতিও আসে।

শাহী তাঁবে সরোঠায় বসিয়ে যমুনার জল ঠাণ্ডা করে খাবার জল তুলে রাখা হচ্ছিল। জঙ্গলের প্রান্তে এদিকে ওদিকে ময়ূরের ছড়াছড়ি। ঘোড়সওয়াদের কেউ কেউ ঘোড়া চান করাচ্ছে। বাদশা শাহজাহান ধুলো মাখা ঘোড়া একদম দেখতে পারেন না। একটু আগে তিনি সমরখন্দী তরমুজের লালরসে ফুল ময়দার রুটি ভিজিয়ে নাস্তা করেছেন। সঙ্গে ছিল হিমালয়ের ওপর থেকে উড়ে আসা হাঁসের ভাজা মাংস আর পদ্মমধু। তাঁর বাম বাহুতে একটি পোষা শিকারী বাজ বসে। বাদশার চোখের আরামের জন্যে শাহী তাঁবুর হাতায় তিনটি শিশু হরিণ ছেড়ে রাখা হয়েছে। তারা চরে চরে ঘাসে মুখ দিচ্ছিল।

এমন সময় বাদশা হুকুম দিলেন—পোষা দুটো শিকারী চিতা ছেড়ে দেওয়া হোক। ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে বুনো গুলবাঘ ধরবে। সঙ্গে থাক সাতজন বন্দুকচী।

সব হুকুমই বাদশা শাহজাহান দিচ্ছিলেন তখত-রওয়ানে বসে। বাদশা রাজধানীর বাইরে যখন যেখানে যান—সঙ্গে যায় তাঁর মসনদ। রাজধানীর বাইরে গেলে এই মসনদই হয়ে যায় তখত-রওয়ান।

চিতাগুলো উপহার এসেছিল রণোথম্ভরের জঙ্গল থেকে। সেখানকার রাজার উপহার। তাদের খাইয়ে—না-খাইয়ে—খেলা দিয়ে তবে শিকারী করে তোলা হয়েছে। এখন ওরা পোষ মানা শিকারী চিতা।

হঠাৎ বাদশার কানে বন্দুকের নল ফেটে যাওয়ার শব্দ এসে পৌঁছলো। বাদশা বসে থাকার পাত্র নন। তিনি নিজেই তাঁর পেয়ারের ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে রিসালা-ছুট কয়েকজন ঘোড়সওয়ার বাদশার সঙ্গ নিলো।

কাছেই একটা পিপুল গাছের গা দিয়ে কাঁটাঝোপের ভেতর শিকারী চিতা দুটির একটি হামলা চালায়। তাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে একটি কেঁদোমত গুলবাঘ লাফিয়ে ছিটকে চলে এসেছিল এদিকে। তাতে ঘাবড়ে গিয়ে এক বন্দুকচী মাটিতে শুয়ে পড়ে বন্দুক চালায়।

তারই নল ফেটে গিয়ে বিপত্তি। শোওয়া অবস্থায় নল ফেটে নিশানা তো বরবাদ হয়েইছে—এমনকি তার লম্বা দাড়িতেও আগুন ধরে যায়। সঙ্গী-সাথীরা এই মাত্র তার দাড়ির আগুন থাবা দিয়ে নিভিয়েছে।

ফাটা কার্তুজ আর টুটা নল নিয়ে বাদশা শাহজাহান তাঁবুতে ফিরে তখত-রওয়ানে ফের বসলেন। কার্তুজটি শাহী কারখানায় আগ্রা দুর্গের কারিগররা বানিয়েছে। বন্দুকের নল এসেছে জৌনপুরের কারিগরদের ঘর থেকে। দুটি জিনিসই বাদশা ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর হুকুম হলো ঃ আগ্রা থেকে উজির সাদুল্লা খাঁকে তলব করো।

এবার সেই দাড়িতে আগুন ধরে যাওয়া বন্দুকচীর ডাক পড়লো। বন্দুকচী জোরাবর খাঁ তো কাঁপতে কাঁপতে বাদশার সামনে এসে দাঁড়ালো। তার ভয় এত কষ্টে জোটানো বন্দুকচীর কাজটা না আনাড়ি অপবাদে হারাতে হয়।

—কতদিন এ-কাজ করছো ?

ঝুঁকে তসলিম জানিয়ে জোরাবর বললো, আলা হজরত। তিন সন হয়ে গেল।

—তুমি সাকেত ছাউনিতে আছো ?

—না বন্দেগান। আমি আগ্রা দুর্গে হপ্তচৌকির পাহারায় থাকি।

—এর আগে কোথায় ছিলে ?

—খোদাবন্দ ! আসিরগড় দুর্গে আপনার কাছেই ছিলাম। বলেই গড়গড় করে জোরাবর খাঁ বলতে লাগলো, কর্তুজের তামায় ভালো মতো পান দেওয়া না থাকলে এমন বিপদ তো হবেই—

বাদশা শাহজাহান ভালো করে তাকালেন বন্দুকচীর মুখে। সে দৃষ্টি জোরাবরের মুখ ফুটো করে একদম হাড়ে গিয়ে পৌঁছতেই তার যেন শীত করতে লাগলো।

—তোমরা কী ?

—আলা হজরত ! আমি একজন সাচ্চা মুঘল।

—মুঘল কখনো নিশানা হারায় না। কার্তুজ ফসকায় না তার। নিষ্কর্মা

না-লায়েকেরই দাড়িতে আগুন ধরে যায়—

খুবই ভয় পেল জোরাবর খাঁ। সে কী বলতে যাচ্ছিল। বাদশা তাকে ধমকে বলে উঠলেন, মুঘল তৈমুরের বংশ হিন্দুস্থানে শও সন হয়ে গেল সীমানা বাড়িয়েই চলেছে। তাদের তো কোনোদিন দাড়িতে আগুন ধরে যায়নি? সাচ্চা মুঘল তো এগিয়েই যাবে—

সবটুকু সাহস একত্র করে জোরাবর খাঁ বুক শক্ত করে বললো, আমারও দাদাসাহেব চাঘতাই মুঘল ছিলেন। আকবর বাদশার ডাকে হিন্দুস্থানে এসে শাহী ফৌজের জানবাজ ঘোড়সওয়ার হন। এখন মুঘল শাহীর উমর শও সন পার হয়ে গেছে। মুঘলের সেই খাতির হিন্দুস্থানে আর নেই।

—কেন? কেন?

—খোদাবন্দ! কেন আবার! নতুন নতুন মুঘলরা আলাদা খাতির পায়। তারপর তারা আস্তে আস্তে এ-দেশে হিন্দুস্থানি হয়ে যায়। শাদিশুদা বালবাচ্চাওয়ালা ঘরেলু ইনসান হয়ে গেলে কেউ আর তাকে পোঁছে না!

—কী রকম?

—আমার দাদাসাহেব আকবর বাদশার গুর্জর-হামলায় ছিলেন। বাহাদুরি দাখিল করে খেতাব পান। জায়গির পান। তাঁর এন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে জায়গির, শান-সওকত সবই বাদশার হয়ে গেল! তাঁর আওলাদ—আমার আব্বা হুজুর ভাগ্যিস দেওয়ানখানায় অনেক কষ্টে একটা কাজ পান। নইলে ভুখা মরতে হতো। আমি তাঁর বেটা। আমি শাহী ফৌজে বন্দুকচী হয়ে তামাম হিন্দুস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কাল হপ্তচৌকি, পরশু আসিরগড়, আজ বাদশার শিকার খেলায় জমিনে শুয়ে পড়ে বন্দুকচী।

—তুমি বলছো কার্তুজে তামা ভালোমত পান দেওয়া হয়নি—

—আমার তো তাই মনে হয় আলা হজরত। নইলে নল ফেটে গিয়ে আগুন ধরে যাবে কেন?

—বেশ। সেজন্যেই আমি উজির সাদুল্লা খাঁকে ডেকে পাঠিয়েছি।

তখত-রওয়ানে থাকতে থাকতেই বাদশাকে অনেক শাহী কাজকর্মও সারতে হয়। বাদশাই হিন্দুস্থানে জানমানের মালিক। কখনো কখনো বাদশা দেহাতের কাছাকাছি গেলে সেখানকার বড় বড় বিষয়-আশয়ের জটিল জটও তাঁকে খুলতে হয়। সবই নিজের চোখে দেখে শিখুক বলেই শাহজাদা দারাশুকোকে সঙ্গে করে এনেছেন বাদশা শাহজাহান।

শাহী খাস তেপনচির সঙ্গে শাহজাদা দারাশুকো এবার বাদশার মবারকে হাজির হলেন। নিজের বড়ছেলেকে দেখে শাহজাহানের বুক ভরে উঠলো। শাহী তাঁবুর কানাতে আশমানের সূর্য আলো ফেলেছে। সেই রোদের ভেতর দাঁড়িয়ে শাহজাদা দারাশুকো। ভোমরা কালো দাড়ির মৃদু রেখার ভেতর তরুণ মুখখানি জ্বলজ্বল করছে।

আমির-ওমরাহ, মনসবদার, জায়গিরদার, বেনিয়ান-বনজারা অব্দি ঠেলে ওঠা হিন্দুস্থানে যেমন কঠিন—তেমনই কঠিন মৃত্যুর পর এইসব মানী মানুষের

আশরফি, মোহর, জায়গা জমি তাদের ছেলেমেয়ে বউ বিবিদের হাতে রাখা। কেননা, হিন্দুস্থানে বাদশা সব কিছুর মালিক। একজন আমির মারা গেলে তার বিষয়সম্পত্তিও চলে যায় বাদশার হাতে। আজ আমিরের আওরত—কাল আমির চোখ বুজলে সেই আওরতেরই ফকিরের দশা। আমির বেঁচে থাকতে থাকতে ছেলেপেলেদের বসিয়ে দিয়ে না গেলে তাদের তো ভিখারির দশা।

তালুক দৌলতপুর কাছাকাছি। সেখানকার তুঁতের কারবারি বেনিয়ান ঈশ্বরদাসের বউ লছমিদাসী হাজির। ঈশ্বরদাস মরে যাবার সময় দু'লক্ষ টাকা রেখে যায়। লছমিদাসী সে-টাকার কথা কাউকে বলেনি। ঈশ্বরদাসের প্রথম পক্ষের মা মরা ছেলে লাল্লুদাস খবরটা পেয়ে সৎমা লছমিদাসীর কাছে টাকার ভাগ চেয়েছিল। লছমিদাসী ভাগ না দিয়ে লাল্লুকে ফিরিয়ে দেয়। লাল্লুদাস পুরো ব্যাপারটা শাহী নজরে এনেছে।

শাহী তেপনচির পাশে দাঁড়িয়ে শাহজাদা দারাশুকো পুরো মামলা বাদশার মবারকে তুলে ধরলেন।

এবার লছমীদাসী এসে দাঁড়াতেই বাদশার হুকুম হলোঃ এক লক্ষ টাকা শাহী মবারকে জমা দাও। লাল্লুদাসকে দাও পঞ্চাশ হাজার টাকা।

ব্যস্! মামলার এখানেই নিষ্পত্তি।

কিন্তু লছমীদাসী ঘোমটার ভেতর থেকে জানতে চাইলো, আলা হজরত! লাল্লু না হয় মরহুম বেনিয়ান ঈশ্বরদাসের লেড়কা বলেই আপনি তাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে বললেন। খুবই সদবিচার হয়েছে বলবো। কিন্তু বাদশাও কি লাল্লুদাসের মতোই বেনিয়ান ঈশ্বরদাসের আত্মীয়? মরহুম ঈশ্বরদাসের কে হন বাদশা?

বেনিয়ান ঈশ্বরদাসের বেওয়া লছমীদাসীর জিজ্ঞসা খুবই সরল সিধে। কিন্তু এইরকম জিজ্ঞাসায় হিন্দুস্থানের বাদশার ভিরমি খাওয়ার অবস্থা। কে এক ঈশ্বরদাস কী করে খোদ হিন্দুস্থানের বাদশার রিস্তেদার হয়? বসন্তের শুরুতে এমন সোনালি সকালে যখন সব ঠিকঠাক চলছে—তখন এমন সরল আবার এমন কূট জিজ্ঞাসা কোত্থেকে আসে?

সারা দিনটাই বুঝি মাঠে মারা যায়। বাদশা শাহজাহান হুকুম দিলেনঃ ও দু'লক্ষ টাকা নিয়ে বেওয়া লছমীদাসী বিদায় হোক!

এ হুকুম যেন অনেকটাই ইনসানিয়াত ঘেঁষা। তাই আগের হুকুমের চেয়ে এই হুকুম অনেক ভালো লাগলো শাহজাদা দারাশুকোর। শাহী তাম্বুর দরবার কিছু ফাঁকা হতেই শাহজাদা দারা বাদশার কাছাকাছি হলেন।—আব্বা হুজুর—

শাহজাহান ফিরে তাকালেন।

—আমির নায়েক নাম খাঁয়ের কথা মনে পড়ছে আমার—

—জিন্দা পেলে তার জিন্দা গোরের হুকুম দিতাম বেটা।

—তার আগে আব্বা হুজুর শাহী কানুন বদলানো উচিত।

—কেন?

—আলা হজরত! আপনার নিশ্চয় মনে আছে—আমির নায়েক নাম খাঁ এন্তেকালের অল্পদিন আগে তার আশরফি, জায়গা জমি সব কিছু বউ ছেলেদের বিলি করে দেয়। এন্তেকালের পর দেখা গেল তার সিন্দুকে রেখে গেছে—কিছু পুরনো লোহা, ছেঁড়া জুতো আর পোকায় কাটা কাগজপত্তর! কেন?

—আমাকে—হিন্দুস্থানের বাদশাকে বে-ইজ্জত করতে!

—না খোদাবন্দ। আমি বলবো যে-কানুনে একজন বেনিয়ান মারা যেতে তার বেওয়া বে-সাহারা হয়ে যায়—সেই কানুনকেই বেইজ্জত করতে চেয়েছিল আমির নায়েক নাম খাঁ।

ঘুরে বসলেন বাদশা। তুমি কী বলতে চাইছো শাহজাদা?

—বাদশা আম জনতার জান মাল মানের জিম্মেদারি করবেন। কিন্তু তা যেন গায়েব না করেন। এই গায়েবি যতদিন হিন্দুস্থানে থাকবে ততদিন কেউ সুখী হতে পারে না আব্বা হুজুর।

—এ কানুন বহুকালের শাহজাদা।

—এখন নতুন কাল এসেছে আব্বা হুজুর। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার সবই যদি আপনি কেড়ে নেন তো আমার বড় হওয়ার—বেড়ে ওঠার চেষ্টার ইচ্ছেই তো মরে যাবে খোদাবন্দ। হিন্দুস্থানের বড় হওয়ার রাস্তাই বন্ধ হয়ে যাবে।

আরও কথা এগোতো। কিন্তু সুদূর সুবে বঙ্গাল থেকে সরকার খালিফেতাবাদের ফৌজদার কাসিম খাঁ এসে পড়ায় শাহজাদা দারাশুকো থেমে পড়লেন। শাহজাদা দেখলেন, পোশাকে আশাকে চেহারা ছবিতে দূরের দূরের সুবায় সামান্য ফৌজদাররাও যতটা সযুত—নিয়মকানুন রক্ষায় যতটা কানুন মোতাবেক চলেন—সেই তুলনায় রাজধানী থেকে ইলাহাবাদ অব্দি তাবত ফৌজদারের একজনকেও এমন পাওয়া যাবে না।

ফৌজদার কাসিম খাঁ একদম শাহী দস্তুর-ই-বেকাশ-আসল অনুযায়ী ঝুঁকে গোড়ায় সালাম জানালেন। তারপর তসলিম সেরে একটি খেরিয়া থলে ঝেড়ে বাদশার মবারকে দশ দশটি মোহর নজর পেশ করলেন। একখানি রুপোর রেকাবিতে।

এরপর ফৌজদার কাসিম খাঁ যা বলতে লাগলেন—তাতে আস্তে আস্তে সারাটা সকালই যেন অন্ধকার হয়ে এলো। মুলতানের দিকের সড়ক ধরে ঠিক উল্টো মুখে রাজধানী আগ্রা। সেদিকে ঘড়ি ঘড়ি ঘোড়সওয়ার ছুটে যাচ্ছে রাজধানী—আবার ফিরেও আসছে ঘড়ি ঘড়ি। নারোয়ার জঙ্গলের মুখে বসে খোদ বাদশা হিন্দুস্থানের নাড়ী ধরে আছেন। সেই সব ঘোড়াদের রওনা হওয়া—ফিরে আসার শব্দ ক্ষুরের আওয়াজেই বোঝা যায়। বাদশার কানেও তো যাচ্ছিল। সেই সব শুনতে শুনতে শাহজাহানের মুখ গম্ভীর হয়ে এলো।

ফৌজদার কাসিম খাঁ বলছিলেন—

হাটবারে হাটবারে নদী নালা দিয়ে ফিরিঙ্গি পর্তুগিজরা ছিপ বেয়ে দেহাতে গিয়ে হাজির হয়। যত পারে মানুষজন ধরে নিয়ে গিয়ে সিধে বন্দর আব্বাসে

গিয়ে ওঠে। সেখানে ইস্পাহানের ব্যাপারীদের কাছে সেসব মানুষ বেচে দেয়।

—ওদের ঘাঁটি কোথায় ?

—ভাগীরথীতে। মহাল হাজিনগর, মহাল ভাটপাড়ার ঠিক উল্টোদিকে। নদীর ওপারে। শাহী ঘরানার জন্যে দু'জন বাঁদি পাঠিয়েছিলাম। তাদেরও তুলে নিয়ে গেছে।

—আমাদের ঘোড়সওয়াররা কি ঘুমোচ্ছিল ?

—ওরা তখন জহুরের নামাজ আদায় করছিল—হজরত !

—ওদের কুঠি, চৌকি সব গুঁড়িয়ে দেবে। ছিপ, বজরা যা আছে ফিরিঙ্গিদের —সব ডুবিয়ে দেওয়া চাই। তবে আমার সামনে হাজির হবে। যাও—

ঠিক এইসময় রাজধানী আগ্রার যোগীপুরা মহল্লা ছাড়িয়ে উজির সাদুল্লা খাঁ আসছিলেন। তাঁর আগে আগে সেপাইরা রাস্তা সাফ করতে করতে এগোচ্ছিল। উজির সাদুল্লা খাঁ একজন রোজিনাদার। নিত্যদিনের রোজিনাভাতায় তাঁর চলে। আশা রাখেন—এই শীতেই বাদশার জন্মদিনে তুলাপুরুষদানের উৎসবে মনসবী খেতাব পেয়ে যাবেন। কী এমন দরকার পড়লো যে বাদশা তাঁকে সেই নারোয়ার জঙ্গলের গায়ে তাঁবুতে তলব করলেন ?

আগে আগে এগোনো এক সেপাইয়ের সঙ্গে পাঠান এক ভিস্তির খিটিমিটি বেধে গেল। সেপাইটি রাজপুত। সে কোমর থেকে কোড়া বের করে যেই চাবকাতে যাবে অমনি পাঠান ভিস্তি চেঁচিয়ে উঠলো, থাম মোগলদের কুকুর। কার গায়ে কোড়া তুলছিস জানিস ?

—কে ? কোথাকার বাদশা তুই ?

—ভুলে যাসনে এই হিন্দুস্থানে আমরা পাঠানরাই সাড়ে তিনশো বছর বাদশা ছিলাম।

—ওরে আমার বাদশার জাতভাইরে ! নে এখন পথ ছাড়—

পাঠান ভিস্তিও কম যায় না। সে তার জল ভর্তি ভিস্তিটা পিঠ থেকে নামিয়ে দিব্যি টেটিয়া ঢঙে বললো, তোদের মোগলদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। কান্দাহার তো হাত ছাড়া হয়েই আছে। এবার দেখবি আমরা আবার ফিরে এসেছি।

কথা আরও এগোতো। কিন্তু উজির সাদুল্লা খাঁকে নিয়ে হাতি প্রায় ওদের গায়ের ওপর এসে পড়লো। পাঠান ভিস্তি মুখ খারাপ করে লাফিয়ে রাস্তার বাইরে গিয়ে পড়লো। নইলে হাতির পায়ের নিচে থেঁতলে যেতে হতো।

গলঘণ্ট বাজতে বাজাতে উজির সাদুল্লা খাঁয়ের হাতি রাজধানী আগ্রার শহরতলি পার হচ্ছিল। শহর ছাড়িয়ে গিয়ে তিনি ঘোড়ায় বসবেন। কেননা, তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার।

আজ সাদুল্লা খাঁয়ের বেরোবার ইচ্ছে ছিল না। ইউনানি মতে ছক বিচার করে গণতকার আগেই স্থির করে দিয়েছিলেন—আজ কেনাকাটার পক্ষে—বিশেষ করে কেউ যদি গোলাম বা বাঁদি কেনেন তো খুবই শুভক্ষণ—দুপুরের

পর কিন্তু সূর্যাস্তের আগে। কিন্তু ওইসময়টায় তো সাদুল্লা খাঁকে বাদশা শাহজাহানের দরবারে হাজির থাকতে হবে। অথচ আগে থেকে গোলাম ব্যাপারীদের সঙ্গে ঠিক হয়ে আছে—তারা যেন ওইসময়ের ভেতর জনা তিনেক জোয়ান দেখে হাবসি গোলাম নিয়ে আসে। গোলামদের হাতে পায়ে কোনো খুঁত থাকলে চলবে না। নাক, কান, চোখ থাকা চাই। বোবা, কালা হলে চলবে না। একদম সরেস জিনিস চাই। কেনার পর ভুগতে রাজি নন উজির সাদুল্লা খাঁ। তাই গোলাম কেনার ব্যাপারে তিনি নিজের ছকটি যাচাই করে নিয়ে কেনাকাটার সময়ও স্থির করে রেখেছিলেন।

বাদশা শাহজাহানের বিকেলের দরবারে এসে হাজির হলেন উজির সাদুল্লা খাঁ। এসেই তসলিম করে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে বাদশা তাঁকে বিশেষ সময় দিলেন না।

বন্দুকচীর ফেটে যাওয়া কার্তুজটি একটি থালায় করে একজন দাখিলা সাদুল্লা খাঁয়ের সামনে ধরতেই বাদশা তখত-রওয়ানে বসা অবস্থাতেই বললেন, আমাদের কার্তুজ এখন ফেটে যাচ্ছে কেন ?

একটু থতমত খেয়ে সাদুল্লা খাঁ নিজেকে সামলে নিলেন। খুব শান্ত গলায় বললেন, আজকাল ফৌজে তো নানারকম লোক ধরে এনে ভর্তি করা হচ্ছে। আনাড়ির হাতে পড়লে যা হয় !

তখনো সাদুল্লা খাঁ জানেন না—কী অবস্থায় কার্তুজটির এই দশা হয়েছে। তিনি আন্দাজ পাবার জন্যে নারোয়ার জঙ্গলের গায়ে বাদশা শাহজাহানের তখত-রওয়ান ঘিরে এই বিকেলবেলার দরবারে ভালো করে তাকালেন। বাদশার দরবারের বাইরেই তাঁবুর কানাত ধরে হরিণশিশুর ছোটাছুটি। পোষা বাজ-পাখিটি শাহজাদা দারাশুকোর বাম উরুতে এসে বসেছে। বাদশা শাহজাহানের বিশাল কাঁধের পেছনে দেখা যাচ্ছিল দূরে ঘাসের ওপর শিকারী চিতা তিনটি লম্বা জিভ ঝুলিয়ে রক্ত চাটছে পরম আনন্দে। তাদের সামনে বিরাট একটা গুলবাঘের লাশ। লাশের পেটটা খোলা। সেখানে বিকেলের আলোয় চকচকে রক্ত। গুলবাঘের কালচে লোমে ঢাকা লাশ থেকে জায়গায় জায়গায় মাংস বেরিয়ে পড়েছে। উজির সাদুল্লা খাঁ চোখ ফিরিয়ে নিলেন। নেওয়ার সময় মনে হলো শিকারী চিতাদের পাহারা মিশকালো হাবসি গোলামরা ভীষণ সাদা দাঁতে এদিকে তাকিয়েই হাসছে।

—বন্দুকচী মোটেই আনাড়ি নয়। আগ্রা দুর্গে হপ্তচৌকির পাহারায় থাকে। তার আগে আসিরগড়ের দুর্গে ছিল—

বাদশার ঝোঁক কোনদিকে বুঝে ফেললেন সাদুল্লা খাঁ। বললেন, আজকাল তো ভালো তামা আসছে না—

—বলুন ভালো করে পান দেওয়া হচ্ছে না তামায়—

—বন্দেগান ! তামা সীসা ভালো হলে পানও ভালো হয়।

—কেন ? বানোয়ারিতে মাষা কষে দেখা হয় না।

—আলা হজরত ! হিন্দুস্থানে তামা, সীসা বাইরে থেকে আনতে হয়।

এদেশে তামা সীসার খনি নেই। বাইরে থেকে কিনতে হয়।

—তো দেখে কেনা যায় না?

—যেতো। দেখে শুনে বাজিয়ে কেনা যেতো। যদি আমরা সোনা দিয়ে কিনতাম হজরত! তাই তামায় সীসায় ভালো মতো খাদ থেকেই যায়। হিন্দুস্থান যা-কিছু কেনে দাম দেয় বদলি জিনিস দিয়ে। সোনা দিয়ে কিছু কেনা তো শাহী হুকুমেই বারণ।

—কেন? কেন?

সাদুল্লা খাঁ মনে মনে বললেন, সবই জেনে বাদশা এমন না-জানার ভাব করে কী লাভ! শাহজাহান মনে মনে বলছিলেন, আমদানি করতে গিয়ে বিদেশি খনি থেকে উপুরি কী জুটছে তা তো জানার উপায় নেই কোনো!

—সেই একই কারণ খোদাবন্দ! হিন্দুস্থানে কোনো সোনার খনি নেই।

বাদশার মুখখানি গম্ভীর হয়ে এলো। আমরা কী কী কিনে থাকি?

—তামা সীসা তো আছেই শাহেনশা। লবঙ্গ, দারুচিনি, জায়ফলও কিনতে হয় হিন্দুস্থানকে। শুধু আরবি ঘোড়াই কিনতে হয় বছরে পঁচিশ হাজার। এছাড়াও বন্দর আব্বাস হয়ে তুর্কি, ইরাকি ঘোড়া আসে হিন্দুস্থানে। আসে নাশপাতি, আঙুর, হাবসি গোলাম-বাঁদি।

সারা দরবারে কোনো শব্দ নেই। ওর ভেতরেই উজির সাদুল্লা খাঁয়ের তীক্ষ্ম গলা ভেসে উঠলো; ফ্রানসিসি দেশ থেকে আমরা কিনি বনাত—

মাথা নিচু হয়ে আসছিল বাদশা শাহজাহানের। আমাদের সারা দিনের দরকারে হিন্দুস্থানকে বাইরে থেকে কত জিনিস কিনতে হয়। অথচ হিন্দুস্থান কত বড় দেশ। শাহজাদা দারা কি এই কথাই আজ অন্যভাবে বললো? হিন্দুস্থানের বড় হয়ে ওঠার পক্ষে রাস্তাটা কোথায় যেন আটকে যাচ্ছে। সেকাল আর নেই। এখন নতুন কাল এসেছে আব্বা হুজুর। তাই তো বলছিল শাহজাদা দারাশুকো।

বাদশা চাপা গলায় বললেন, হিন্দুস্থান থেকেও তো অনেকে অনেক জিনিস কেনে—

—হজরত! সে কথা তো নিশ্চয়ই। আমাদের কাপড়, চিনি, শাল, জুতো, নীল, তুঁতে, খচ্চরের পিঠে চড়ে লাসা, গর্জনি, সমরখন্দ, তুর্কিস্তানে তো যাচ্ছেই—জাহাজ বোঝাই হয়ে যাচ্ছে দুনিয়ার বন্দরে বন্দরে।

একথার সবই জানেন বাদশা শাহজাহান। তবু যেন এই প্রথম শুনলেন এমন ভঙ্গিতে তখত-রওয়ানে উঠে বসলেন। শাহজাদা দারার মুখখানি জ্বলজ্বল করে উঠেছে।

সাদুল্লা খাঁ বললেন, আমাদের কাপড়ের দাম, নীলের দাম—যা-ই কিনুক না কেউ—তাকে দাম দিতে হয় সোনায়। তাই তো সারা দুনিয়ায় যেখানে যত সোনা আছে—শেষ অব্দি তা এই হিন্দুস্থানে এসে জমা হচ্ছে। সোনার খনি না থাকলেও হিন্দুস্হানে মজুত সোনা এখন সবচেয়ে বেশি আলমপনা।

—এখন থেকে সোনা দিয়ে দেখেশুনে সাচ্চা তামা—সাচ্চা সীসা কেনা

হবে। হিন্দুস্থানের কার্তুজ ফেটে বন্দুকচীরা আর জখম হবে না—

তাঁবুর বাইরে হাবসি গোলামদের পাহারায় শিকারী চিতারা নারোয়ার জঙ্গল ঘেঁষে দাঁড়ানো। চোখ ওদের জঙ্গলের কিছুতেই হবে। গলায় বাঁধা মোটা চামড়ার বাঁধুনি গোলামদের চওড়া চওড়া হাতের থাবার ভেতর। এ ছবি দেখতে দেখতে শাহজাদা দারাশুকো যেন আরেক ছবি দেখতে পাচ্ছিলেন। অরিস্টটুর চোখেও দেখা জিনিসের আরেক ছবি ফুটে উঠতো। তিনি জলের ধারে দাঁড়ানো গাছের চেহারা দেখতে দেখতে জলে পড়ে থাকা গাছের ছায়াকে আরও স্পষ্ট করে দেখতে পেতেন। বলেওছিলেন তিনি—এই ছায়াই আসলের চেয়ে আরও প্রবল—আরও প্রধান। দেখা জগৎ—দেখা দুনিয়ার পাশে অদেখা জগৎ—অদেখা দুনিয়াকেও বড় করে দেখেছেন অরিস্টটু—আফলাতুন। শাহজাদা দারাশুকোর মনে হচ্ছিল—দুনিয়ার লাগাম ছাড়া, বাঁধভাঙা তাগদ ওই শিকারী চিতারা। আর সেই তাগদের মুখের লাগাম ওই অতিকায় হাবসি গোলামের দল।

খানিক বাদে সন্ধে হয়ে আসছিল। বাতাসে আবিরের মতোই দেহাতি ধুলো। শীতের শেষে এই জামাদা সানি মাসটি জুড়ে দেহাতে সারাদিন ধরে—সকাল সন্ধে বড় সুন্দর বাতাস দেয়। পিপুল, গুলমোহর, খিরিশ—বড় বড় গাছের মাথা নিয়ে বাতাসের মাতামাতি তো চলেই—ছোট ছোট ভুঁইঘেষা গাছপালা নিয়েও বাতাসের যা চলছে—তাকে শাহজাদার একরকম লুটোপুটিই মনে হচ্ছিল।

।। একত্রিশ ।।

বাদশা শাহজাহান গরমের দিনে ছোটখাটো শিকার সফরে বেরনো বা ফেরার সময়টা সবসময় বেছে নেন—খুব ভোর ভোর—নয়তো সন্ধের পর। সন্ধে-বেলায় এখন হিন্দুস্থানের আকাশ দু'দিকের দিগন্ত অন্ধকার দিয়ে মুছে ফেলে তারায় তারায় থমথম করছে। ঘোড়সওয়ার পাহারার ঘেরাটোপের ভেতর বাদশার গাড়ি ছুটছে এমনই জোরে যেন কোনোদিনই আর থামবে না। আসলে বাদশা তড়িঘড়ি রাজধানী ফিরতে চান। তাঁর মুখোমুখি বসে আছেন শাহজাদা দারাশুকো। দাখিলারা শিকারী চিতা, হরিণ, বাজপাখি নিয়ে পেছন পেছন আসছিল। রাস্তার দু'ধারে হিন্দুস্থানের দেহাতি গাঁ-গঞ্জ ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা বোঝার উপায় নেই কোনো।

দারা অবাক হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন, খোদার এত বড় দুনিয়ায় সামান্য কয়েকজন ইনসান তাগদের লাগাম ধরে থাকে! বাদশার হুকুমে গাড়ি ছুটছে যেন দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে। সামান্য একখানি পাথর চাকার নিচে পড়লে বাদশা সমেত আস্ত গাড়িখানাই উল্টে পাল্টে ছেঁচড়ে গিয়ে পড়বে মুখ থুবড়ে। আর অমনি সারা হিন্দুস্থান নড়বড় করতে থাকবে—যেমন হয়েছিল কিছুদিন—দাদাসাহেব চোখ বুজতেই। আসলে আমরা নিভে

যাওয়ার আগে অব্দি সমানে জ্বলতে চাই। এই জ্বলে ওঠার রোশনাই ইনসানের তাগদ। কিংবা জেগে থাকাই তাগদ। সেই তাগদের ওপর চাঁদের আলো, এই বিরাট আশমানি অন্ধকারই হলো প্রলেপ—যা কিনা তার বিশাল, গম্ভীর, স্নিগ্ধ, কখনো হাসি হাসি চেহারা তুলে ধরে তাগদকে বলে—তোমার চেয়ে বড় অনেক জিনিস আছে দুনিয়ায়। তাদের দেখে বসে থাকো। একথা মুসাফির বোঝেন। বোঝেন পীর ফকির সন্ন্যাসী দরবেশরাও। বোঝেন না শুধু বাদশারা। তাই একই মসনদে লুকিয়ে থাকে একের পর এক শাহী হুকুমতের গোরস্থান। খিলজি, লোদি, সৈয়দরা এসেছেন যেমন—চলেও গেছেন তেমনি।

রাতের ঠাণ্ডা বাতাস খোলা গাড়িতে বসে সবটাই চোখে মুখে লাগছিল। আঃ! কী আরাম। তারায় ভেসে যাওয়া আকাশ দেখতে দেখতে একটু আগে শাহজাদা দারাশুকোর বুকটা ভারি হয়ে উঠছিল। কিসের জন্যে কেন জানি মনটা আকুলি বিকুলি করে ওঠে মাঝে মাঝে। এই আকুলি বিকুলির কোনো কারণ বের করতে পারেননি শাহজাদা।

অন্ধকারে মাঝে মাঝে জ্যোৎস্নার আভাস। সেখানে গাড়িতে মুখোমুখি বসে থাকা দুজনই পলকের জন্যে অন্যের মুখ দেখতে পাচ্ছিলেন। একটি মুখ নবীন। তিনি এই দুনিয়ায় বেশিদিন আসেননি। তাঁর চোখের জায়গায় দেখার পিপাসা—বুকের জায়গায় শুধুই আশা আর মন জুড়ে দীন দুনিয়ার মালিকের ওপর ভীষণ ভরসা। অন্যজন বেশ কিছুকাল হলো এই এখানে এসেছেন। এখন তিনি যেখানে—সেখানে আসতে তাঁকে অনেক অমিল অঙ্ক তাগদে, সাহসে, ষড়যন্ত্রে মেলাতে হয়েছে। নয়তো শাহী তাঁর হয় না।

বাদশা শাহজাহান বললেন, এই হিন্দুস্থান বড় সুন্দর। তাই না—

শাহজাদা দারা নিজের আব্বাহুজুরের মুখখানা খুঁজলেন অন্ধকারে। তারপর অস্ফুটে বললেন, বড় সুন্দর আব্বাহুজুর। বড় সুন্দর—

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। গাড়ি ছুটছে ঘূর্ণী ঝড়ের মতোই। অন্ধকারে ঘোড়ার পায়ের শব্দ ছিটকে পাশের নাবাল জমিতে গিয়ে পড়ছে।

—আজকের আগ্রা দুর্গ—আজকের শাহী দরবার, ফৌজ, নৌবারা দেখে কেউ ভাবতেই পারবে না—এ দেশে আমাদের শুরুয়াত ছিল কী সামান্য! মাত্র শও সনে মুঘলরা হিন্দুস্থানে কোত্থেকে কোথায় এসে পৌঁছেছে তা ভাবাই যায় না। খোদ তৈমুর এসে দেখলে ভীষণ অবাক হতেন।

বাদশা শাহজাহানকে আজ কথায় পেয়েছে। খানিক চুপ থেকে তিনি আবার মুখ খুললেন। জানো শাহজাদা—আজ দুনিয়ার সেনা হিন্দুস্থান টেনে আনছে। হিন্দুস্থানের চিনি, কাপড়, শরাব, নীল কিনতে হলে সোনায় কিনতে হবে। হিন্দুস্থান যখন তার দরকারি সীসা, তামাক, ঘোড়া, বনাত কেনে—তখন সে সোনা বের করে না—দেয় বদলি জিনিস। আকবর বাদশার এই কানুনে আজ হিন্দুস্থানে দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি সোনা মজুত। তুর্কিস্তান ইশাহি গোলাম কিনে আনছে সোনা দিয়ে। সেই সোনা দিয়ে

বাইরের দুনিয়া কিনছে হিন্দুস্থানি জিনিস। আমরা মুঘলরা হিন্দুস্থানকে নিয়ে চলেছি—আল্লার রহেমে—এক সুনহেরা রাস্তায়—ওই যে আশমানের তারা দেখছো—ওরাই আমাদের দিক দেখায়—ওদের দেখেই আমরা চলি!

শাহজাদা দারাশুকোর মনে একসঙ্গে অনেক কথা উঠে আসছিল। কিন্তু তিনি সেসব কথার একটিও বলতে পারলেন না। তাঁর মন বলছিল—জুম্মাবারে মুফতে শাহী খানা খাবার জন্যে কোত্থেকে পিল পিল করে অ্যাতো মিসকিন এসে হাজির হয়? এই কি সোনালি রাস্তা? হিন্দুস্থানের কাপড়, চিনি, কাগজ, শরাব সোনা আনছে ঠিকই—কিন্তু তাহলে এত গরিবি কেন আব্বা-হুজুর?

বাদশার গাড়ি যখন আগ্রায় ঢুকলো তখন সারা রাজধানী ঘুমিয়ে পড়েছে। শাহজাহান দেখলেন—শাহজাদা দারাশুকোও ঘুমে ঢুলছেন। তিনি নিজের হাতে ছেলের পিঠের গদি ঠিক করে দিতে গেলেন। শাহজাদা তড়াক করে সিধে হয়ে বসলেন। সামনের মানুষটি যে একইসঙ্গে আব্বাহুজুর—আবার হিন্দুস্থানের বাদশা।

গাড়ি থেকে নামার সময় বাদশার নিজেরই মনে হলো—আগ্রা দুর্গ কত বড়। কী বিশাল। এখন পাহারার ঘোড়সওয়ারের দল ছাড়া আশপাশে কেউ নেই। অন্যসময় হলে বাদশাকে দেখার জন্যে ভিড় উপচে পড়তো। সওয়ারদের সে ভিড় সামলাতে কোড়া চালাতে হতো। এখন চারদিক সুনসান। বাদশা বেশ সহজেই খানিকটা এগিয়ে গেলেন হেঁটে। তারপর মাথা তুলে দেখে তাঁর মনে হলো—এই দুর্গ রাজধানী আগ্রার ভেতর যেন আরেক শহর। তিনি শাহজাদা দারাকে বললেন, এত বড় দুর্গ—দুর্গের মাথার অমন সামান বুরুজ কি ইংলিশস্তানের শাহ চার্লসের আছে? ফ্রানসিসি দেশে শাহ লুইয়ের কি এমন দুর্গ আছে যেখানে খুব সহজেই ঢাল বেয়ে একশো হাতি ওঠানামা করতে পারে? পর্তুগালের শাহ জনের কি এমন দুর্গ আছে যেখানে দেওয়ানি খাসের মতো চত্বরে দশ হাজার মানুষ এসে বাদশার মবারকে নজর পেশ করতে পারে! ইস্পাহানের সফাবি শাহীর যে এমন দুর্গ নেই তা আমি হিন্দুস্থানের বাদশা শাহজাহান ভালো করেই জানি।

এইসব বলে পরম পরিতৃপ্ত একজন বাদশা এখন এই গভীর রাতে খুবই খুশি মনে তাঁর দুর্গে ঢুকলেন। তাঁর আগে আগে যে ছায়াটি পড়ছে—তা তাঁরই ছেলের। শাহজাদা দারাশুকো পাহারার সওয়ারদের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে এগোচ্ছিলেন। অন্যসময় তিনি ঘোড়ার পিঠেই দুর্গের আকবরি মহল অব্দি গিয়ে তারপর ঘোড়া থেকে নামেন। কিন্তু এখন যে হিন্দুস্থানের বাদশা নিজেই দুর্গে হেঁটে ঢুকছেন।

হিন্দুস্থানের কোথায় ক'টি নদী—ক'টি পাহাড়—বা, নানান জঙ্গলের কোনটা কত গহীন—কে তার খবর রাখে! আশমানের নিচে গাছপালা নদীনালা নিয়ে দুনিয়াটা পড়ে থাকে। তাতে জানোয়ার আর ইনসানে

কতকালের লড়াই ! কে রাজা হবে ? কে কার মাথায় বসবে ?

এরকম দুনিয়ায় মানুষ তো মায়া মমতা ভাব ভালোবাসা ভুলে গিয়ে আরও পাবো—আরও খাবোতে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। যে কোনো উপায়ে সে আরও সুখের অধিকার চায়।

লিসবোঁয়া নদীর তীরে রাজধানী লিসবনে বসে রাজা জন অস্থির হয়ে পড়েছেন। একদিকে দেশের ভেতর লড়াই হামলা চলেইছে। দশ এগারো বছর হয়ে গেল শান্তির দেখা নেই। ওদিকে হিন্দুস্থানে যেসব ডাকাবুকো অভিযাত্রী পর্তুগিজ গিয়েছিল তিন বছর আগে তাদের কোনো খবর নেই প্রায় বছর খানেক। হিন্দুস্থানের পশ্চিম দিকটায় রাজা জনের দুর্গ গড়ে উঠেছে। কুঠি বসেছে। বসতিও হয়েছে। গির্জাও চলছে বেশ কিছু বছর। একশো বছরের ওপর তাঁর প্রজারা দরিয়া পাড়ি দিয়ে হিন্দুস্থানে যাচ্ছে। কিন্তু বড় আফসোস হিন্দুস্থানের পুবে তেমন করে শেকড় নামানো গেল না আজও। লিসবনের প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে দূরে লিসবোঁয়া নদীর বুক দেখা যায়। এখন শীতকাল। মুর বণিকরা লাল হলুদ পাল খাটিয়ে নদীর বুকে বেড়াচ্ছে। এই বিদেশীরা এদেশে ভেড়ার মাংস বেচে পর্তুগালকে ফতুর করে দিচ্ছে।

রাজা জন অনেক আশা করে ওদের পাঠিয়েছিলেন হিন্দুস্থানের পুবে। রেশম, নীল, তুঁত, সুতো আনতে পারলে ফেরার পথে দেশে দেশে সেসব বেচে সোনা নিয়ে ফেরার কথা ওদের। ব্যাপারীদের। কিন্তু ফিরছে না কেন ওরা ? একসময় রাজা জনের মনে পড়লো—লম্বা দরিয়া পাড়িতে ডাকাবুকো লোকও দরকার হয়। তাহলে ? তাহলে ওরাই কি ?

ভাস্কো-দা-গামার অভিযান থেকেই কয়েদখানা খুলে কিছু দাগী ঘুঘু কয়েদীকে জাহাজে নেওয়া হয়ে থাকে। তেমন তেমন কয়েদী হিন্দুস্থানের পুবে নেমে কোনো গোলমাল পাকায়নি তো ? কাপ্তেনকে তো বারবার বলে দেওয়া হয়েছিল—তেমন হলে ওদের যেন সাবাড় করে দেওয়া হয় ! দরিয়া জুড়ে মৌসুমী বাতাসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, পাল খাটিয়ে এইসব অভিযান শেষমেৰ অজানা ডাঙায় গিয়ে ভেড়ে।

ওরা কি কাপ্তেনকে দরিয়ায় ঠেলে ফেলে দিয়ে বাগী হলো ? না, সুবিধা বুঝে নিজেরাই ব্যাপারী হয়ে বসলো ? রাজা জন এই শীতের দুপুরে কিছু বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। এই করে কি পর্তুগালকে বড় করা যায় ! হয়তো গরমের মুখে মুখে দরিয়া পার হয়ে খবর আসবে—শেষ অভিযানের বাগী নাবিকরা নিজেরাই ব্যবসা খুলেছে। হিন্দুস্থানের হুগোলিম থেকে ওরা বন্দর আব্বাস অব্দি রেশম তুঁতে এনে দুনিয়ার ব্যাপারীদের সঙ্গে কারবার করে আবার হুগোলিমেই ফিরে যায়। অথচ বড় বড় দরিয়া পাড়ির সব অভিযানই পর্তুগালের রাজা জনের নামে ! আমারই নামে !

হাতের কাছে কেউ নেই এখন। জন একাই পোর্টের চীনে মাটির মোটাসোটা পাত্রটি কাত করলেন। এবার কাউকে ডাকা দরকার। সঙ্গে লাল বুক তরমুজ খেয়ে থাকেন রাজা জন। অসময়ের এসব তরমুজ আসে লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে।

মুর ব্যাপারিদের কৃপায়। কয়েকশো বছর তাঁবে রেখে ওরা পর্তুগালকে রীতিমত নাবালক করে রেখেছে।

হিন্দুস্থানের পুবে পর্তুগিজদের হুগোলিম ঘাঁটি—তার আশপাশের এলাকা গঙ্গার দু'পারের মানুষজনের মুখে হুগলি। ইলাহাবাদমুখো বজরায় ভাসলে বাঁহাতে পড়ে হুগলি। ক্যাওটা। মহল জিরাত বলাগড়। মহল বিনোদপুর। আর নদীর ডান হাতে পড়ে মহল হাজিনগর, মহল ভাটপাড়া। নদীর দু'পাড়ের মহলের সবগুলোই সরকার খালিফেতাবাদের ভেতর। যার ফৌজদার কাসিম খাঁ।

তিরিশের নিচে বয়স এই হায়দরাবাদি কাসিম খাঁ নর্মদা দেখেছেন। দেখেছেন গোদাবরী। কাবেরী। এখন এই কিছুকাল দেখছেন গঙ্গা—যা কিনা নানা এলাকায় কখনো মুলে, কখনো শাখায় বাঁকায়।—কখনো ভাগীরথী—কখনো হুগলি হয়ে বয়ে চলেছে হিন্দুস্থানের পুব দিকটায়—বড় দরিয়ায় পড়ার ঠিক আগে আগে। ফৌজদার হিসেবে উপস্থিত তিনি নদীর নাম সনাক্ত করতে বেরননি। খোদ বাদশা শাহজাহানের হুকুমে ফৌজদার কাসিম খাঁ সুবে বঙ্গালের দেহাতে, গাড়িতে গাড়িতে লুটেরা ফিরিঙ্গিদের শায়েস্তা করতে বেরিয়েছেন।

সকাল থেকে হুগোলিম, বলাগড়, ক্যাওটা—যেখানে যেখানে ওই ফিরিঙ্গিদের আড্ডা—সেখানে সেখানে ডাঙায় সেপাই ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। আম আতরাফ দেহাতি মানুষের ঢঙে। আর জলে মাছমারা সেজে ছিপে ছিপে বন্দুকচী, জানবাজ সেপাই নিয়ে অপেক্ষা করে আছেন কাসিম খাঁ। হিন্দুস্থানের বুকে বসে হিন্দুস্থানের বাদশা-বেগমের ঘরগেরস্থির জন্যে পাঠানো বাঁদি তুলে নিয়ে নিয়ে যাওয়া—

শীতে সূর্য ঢলে বেশ আগে। আকাশ হিমেল বাতাসের ভেতর লাল হয়ে এলো। নদীর গায়ে অমেকটা জায়গা ফাঁকা রেখে কয়েক বছর হলো ইশাহি গির্জা উঠেছে। দিন থাকতেই কে যেন অভ্রের বাতিদান বসিয়ে দিয়ে গেল। নদীপথে রাতে রাতে যাওয়া আসার সময় ইশাহি গির্জার ওই আলো ফৌজদার কাসিম খাঁয়েরও চোখে পড়েছে।

সন্ধ্যার মুখে মুখে বোঝা যায় না এমন ভাষায় গির্জার ভেতর গান শুরু হলো। ফৌজদার বুঝলেন, দুশমনের ওপর আচমকা হামলার এটাই সবচেয়ে ভালো সময়। কাসিম খাঁ তার নৌকার লাল কালির লাগানো ধ্বজ তুলে দিলেন। মানে—হামলা—

মা মেরির পুতুলের সামনে বেদিতে ধুনো জ্বলছিল। তা সুগন্ধী করে তোলার জন্যে রডারিগো লোবানের খোঁজে গির্জার বড় দরজা পেরিয়ে নদীর দিকের চত্বরে এসে দাঁড়িয়েছিল। বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। আশপাশে সবেদা, সরি আমের গাছ। সেদিক থেকে ধপ্ করে কী পড়ার শব্দ এলো কানে। তারপরেই সে দেখলো নদী থেকে কতকগুলো অন্ধকার উঠে আসছে।

সঙ্গে সঙ্গে রডারিগো সালাজার ছুটে গির্জার ভেতর ঢুকে পড়লো।

একসঙ্গে এতজন ফিরিঙ্গি এমন অগোছালো অবস্থায় পাওয়া যাবে তা আশা করেননি ফৌজদার কাসিম খাঁ। যে কোনো বাধা থেঁতলে সমান করে দেবার জন্যেই সাততাড়াতাড়ি ডাঙায় বসানো তোপ থেকে প্রথম গোলাটি এসে পড়লো গির্জার বাইরে বাঁধানো চত্বরে। বিকট শব্দ করে। তখন হাজিনগর মুখো খেয়ার মানুষজন ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়ানোয় না প্রায় উল্টে যায়।

ডাঙায় উঠে খোলা তলোয়ার হাতে কাসিম খাঁ চেঁচিয়ে উঠলেন, হামলা—

সারাদিন ডাঙায় ঘাপটি মেরে থাকা সেপাইরা এরই ভেতর যে যার মতো মশাল জ্বালিয়ে নিয়েছে। কাসিম খাঁ বুঝলেন, এবার পায়ে পায়ে চারদিক থেকে স্রেফ এগিয়ে যাওয়া। মাঝে মধ্যে তোপ দেগে দু'একটা গোলা। তাতে গির্জার সদর নিশ্চয় ধসে পড়বে। তিনি চেঁচিয়ে নারা দিলেন, আল্লা-হু-আকবর— !

শ'তিনেক ফৌজি গলা একসঙ্গে বলে উঠলো, আল্লা হু আকবর !

গির্জার ভেতরে ভেতরে ওপরে ওঠার ধাপ বেয়ে কয়েকজন ফিরিঙ্গি ওপরে উঠে গেল। তারপরই দেখা গেল—যেন আশমান থেকে জ্বলন্ত আগুন পড়ছে। মাথা ঢাকা একজন শাহী ফৌজির উষ্ণীষে আগুনই ধরে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা ঢাকা টেনে ছিঁড়ে ফেলা হলো।

বোঝা গেল, অস্ত্র বলতে প্রায় কিছুই নেই গির্জার ভেতর। নয়তো কখনো বেদির ধুনোর আগুন ঢিবি করে নিচে ফেলা হয় ! তবু সাবধানী মানুষ কাসিম খাঁ। তিনি বারুদঠাসা গোলা না দেগে তোপ থেকে পাথরের গোলা দাগার হুকুম দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে বেলদারদের জুতসই করে কাটা পাথরের একটা গোলমত গোলা ধাঁই করে গির্জার সদর দরজা ধসিয়ে ভেতরে গিয়ে পড়লো। আর অমনি ভেতর থেকে চিৎকার।

ফৌজদার কাসিম খাঁয়ের মনে পড়লো বাদশা শাহজাহানের কথাগুলো। জমিনে গুঁড়িয়ে দিতে হবে—

ছবিটা মনে ভেসে উঠছিল। যতই স্পষ্ট হচ্ছিল—ততই হায়দরাবাদি এই তাজা লড়াকুর মনে রাগ ফুঁসে উঠছিল। এই ফিরিঙ্গি পর্তুগিজ বোম্বেটেদের জন্যেই বাদশার সামনে লজ্জায় তার মাথা কাটা গেল। এরাই আলাপি গোলাপিকে তুলে নিয়ে গিয়ে কোথায় বেচে দিয়েছে কে জানে ! ফৌজদার মনে মনে বলে উঠলেন, তোমাদের বন্দর ! তোমাদের হুগোলিম এবার ধুলোয় মিশিয়ে দেবো। বলতে বলতে তিনি আবারও খোলা তলোয়ারে অদৃশ্য বাতাস কেটে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন : হামলা !

ফৌজদারের ছিপে ছিপে সবই আনা হয়েছে। একদল লশকর লম্বা মই ঘাড়ে নিয়ে গির্জার পেছন দিকটায় চলে গেল। এ গির্জা যতখানি গির্জা—ঠিক ততখানিই দুর্গ। সরস্বতী, কুন্তী, বেহুলা, হুগলি, আমোদর দিয়ে এই বোম্বেটেরা সুবে বঙ্গালের দেহাতে দেহাতে ঢুকে পড়ে। সুবিধামত লুটপাট করে বলাগড় পেরিয়ে সাতগাঁয়ে গিয়ে সব জমা করে। সেখান থেকেই সব কিছু

ওরা চালিয়ে থাকে।

মই বেয়ে ওঠা লশকরদের একজনকে গির্জার উঁচু ঘুলঘুলি থেকে বর্শায় গেঁথে নিচে ফেলে দিলো ফিরিঙ্গিরা। এরপরেই শাহী হামলা দৌগুণী বেড়ে গেল। কাছে-পিঠে কোথায় যেন হিন্দুরা নামগান করছে। এই হামলায় তাদের কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। খোলকরতাল দিব্যি বেজে চলেছে।

গির্জার ভেতর কী করে যেন একটা বন্দুক যোগাড় করে ফেলেছে রডারিগো সালাজার। সে জানে বাইরে বেরিয়ে এসে ধরা দেওয়া মানে ফৌজদারের সেপাইদের হাতে দু'টুকরো হওয়া। সে এক বুদ্ধি বের করলো। উপাসনার জন্যে যে চারজন ইশাহি ফিরিঙ্গি সাধু জড় হয়েছিলেন—তাঁদের পেছন দিকে গিয়ে খুনখুনে সবচেয়ে বুড়ো সাধুর পিঠে গিয়ে সে বন্দুকের নল ঠেকালো। —এগিয়ে চলো। এগিয়ে চলো বলছি—

তখনো গির্জার ভেতর অভ্রের বাতিদানটি নেভেনি। সেই আলোয় সাধু চারজন প্রায় একসঙ্গে কেঁদে উঠলেন। যিশুর নামে বলো আমরা কোথায় যাবো?

রডারিগো সালাজারের হাতে বিশেষ সময় নেই। বাইরে থেকে মই বেয়ে ওঠা শাহী লশকরদের সহজ শিকার কাবু করার রক্তহিম হাসি ঠাট্টা, গালাগাল, মুখ খারাবি—সবই ঘুলঘুলি দিয়ে রডারিগোর কানে আসছিল। মতলবটা তার এইরকম: ইশাহি সাধুদের এগিয়ে দিয়ে ফৌজদারকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে নিশ্চল করে ফেলতে পারলে সেই ফাঁকে সে অন্ধকারে মিশে যাবে। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে একবার নদীতে পৌঁছতে পারলে ছিপ তো সেখানে ভাসছেই!

গির্জার ভেতর অন্য যারা দাঁড়িয়ে তারা তখনো রডারিগোকে বুঝে উঠতে পারেনি। আবার একটা গোলা এসে বিকট শব্দ করে বাঁধানো চত্বরে ফাটলো। সঙ্গে সঙ্গে সারাটা গির্জা যেন দুলে উঠলো। রডারিগো বন্দুকের নল দিয়ে আবার পিঠে ধাক্কা দিলো।

সবচেয়ে বুড়ো সাধুটি কেঁদে উঠলো। কোথায় নিয়ে চলেছো আমাদের? রাজা জনের নামে বলো—

জাহান্নামে!—বলে বাতিদানটা এক সাধুর হাতে জোর করে ধরিয়ে দিলো। দিতে দিতে বললো, ফরাসডাঙা, কৈকালার মিহি সুতোর কাপড়ের কারবার করার সময় তো যিশুর নাম মনে পড়ে না!

· চারজনের এক সাধু বেঁকে দাঁড়ালেন। সেরকম সন্ন্যাসী আমরা নই।

তাঁর পিঠে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে এক ধাক্কা দিলো রডারিগো সালাজার। দিয়ে বললো, সে দেখা যাবে এখন! শুদ্ধ সাধুর কি কখনো বিপদ হয়! না বিপদকে সে ডরায়!

দড়াম করে সদর দরজা খুলে যেতেই ফৌজদার কাসিম খাঁ অবাক হলেন। এত তাড়াতাড়ি বশ মানলো?

তাঁর অবাক হওয়ার আরও বাকি ছিল। ভীষণ বুড়ো চার সাধু। লম্বা

ফিনফিনে আলখাল্লা গায়ে। একজনের হাতের বাতিদানের আলোয় তাদের এই অন্ধকারের ভেতর জিন বলেই মনে হলো তাঁর।

খুনখুনে বুড়ো সাধু কাঁপতে কাঁপতে বললেন, মহান মুঘল আকবর বাদশার আমল থেকে আমরা এদেশে আছি। এমন বিপদে কখনো পড়িনি।

ফৌজদার কাসিম খাঁ ওঁদের পেছনে তাকালেন। তাকিয়ে বললেন, বাকি সব কোথায়?

—আমরা কিছুই জানি না। আজই বিকেলে উপাসনার জন্যে সাতগাঁ থেকে আমাদের আনা হয়েছে এখানে—

হাতের ইশারায় গির্জা ঘিরে ফেলার হুকুম দিয়ে কাসিম খাঁ হাসলেন। তা কী করে হয়? ওদের বেরিয়ে আসতে বলুন—

ততক্ষণে তোপ দাগা থেমেছে। থেমেছে বন্দুকচীরাও।

চার সাধুই প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠলেন। আমরা জানি যিশুকে। যিশুর জন্যেই আমাদের এখানে আসা।

আপনাদের দেশ হিন্দুস্থান থেকে লবণ, সিল্ক, সোরা কিনে নিয়ে যায়—একথাটা নিশ্চয় জানেন।

খুনখুনে বুড়ো সাধু ডানদিকে মাথা হেলালেন।

—আরও জানেন নিশ্চয়—এই ব্যবসা করে আপনাদের জাতভাইরা খুশি নয়!

কোনো কথা বললেন না সাধুরা।

কাসিম খাঁ বললেন, ব্যবসা করতে এসে আপনারা হিন্দুস্থানের দেহাতে দেহাতে খাজনা চালু করেছেন—

—আমরা নই। আমরা নই।

—ওই হলো। আপনাদের ভাইবেরাদারদের আরও কীর্তির কথা শুনুন। লুটপাট চালাচ্ছেন—

—আমরা নই ফৌজদার সাহেব—

—সামান্য জিনিসপত্তর লুটেই থেমে থাকেনি আপনাদের জাত ভাইয়েরা! তারা মানুষ লুট করে নিয়ে গিয়ে দরিয়া পেরিয়ে বেচে দিয়ে আসছে। এ দেশটা—এই হিন্দুস্হান তাহলে কাদের? আপনাদের? না, আমাদের?

রাগে ফৌজদার কাসিম খাঁ থরথর করে কাঁপছিলেন। বিশাল অন্ধকারে সামান্য আলোর ভেতর চারজন সাধুই কোনো কথা বললেন না। তাঁদের দাড়ি, মাথার ঢাকনা, কোটরে প্রায় হারিয়ে যাওয়া নীল চোখের মণিগুলো এই আলোয় চকচক করছে।

বুড়ো খুনখুনে সাধু অনেকক্ষণ পরে বললেন, আমরা এসেছিলাম—। থেমে গেলেন সন্ন্যাসী। আজকাল সব মনে রাখতে পারি না। আমি এসেছিলাম আমার যৌবনে। মনে পড়ে আমার প্রথম যৌবনে আমি যখন মহান মুঘলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম—

ফৌজদার কাসিম খাঁয়ের রাগ, কঠিন চেহারা এক পলকে মিলিয়ে গেল।

তিনি প্রায় গলে গিয়ে বললেন, আপনি আকবর বাদশাকে দেখেছেন ?

—হ্যাঁ।

—সত্যি ?

—আমি মিথ্যা বলছি না ফৌজদারসাহেব। হিন্দুস্থানের বাদশা হলেও তাঁর নাম দরিয়া পেরিয়ে এদেশে আসার আগেই আমরা শুনেছিলাম। আকবর বাদশার কাছে অতি সহজেই যাওয়া যেতো। আমরা কিছুই জানতাম না। সটান তাঁর সামনে গিয়ে হাজির হতে তিনি একটি কথাই জানতে চেয়েছিলেন—

—কী ?

—আমরা হিন্দুস্থানে ধর্ম প্রচার করবো কি না ? বলেছিলাম—

কাসিম খাঁয়ের যেন তর সইছিল না। অস্থির হয়ে বললেন, কী ?

—বলেছিলাম—না, আমরা ধর্ম প্রচার করতে আসিনি। এসেছি বাণিজ্য করতে—

হো হো করে হেসে উঠলেন যুবা বয়সী ফৌজদার। অন্ধকারে সে হাসি ভাঙা গির্জার ভেতরে ঢুকে গমগম করে উঠলো। মূর্তির মতো বন্দুক, বর্শা, মশাল হাতে নিশ্চল দাঁড়ানো লশকরদের চোখের পাতা সে হাসিতে একটুও কাঁপলো না। হাসি থামিয়ে কাসিম খাঁ বললেন, মহান মুঘল—আকবর বাদশাকে দেওয়া কথা আপনারা রেখেছেন। আবার রাখেনওনি !

এক সাধু অবাক হয়ে বললেন, কী রকম ?

—আপনারা এদেশে ধর্মে আছেন—বাণিজ্যেও আছেন !

সাধুরা কেউ কোনো কথা বলতে পারলেন না কিছুক্ষণ। অনেক পরে সেই বুড়ো খুনখুনে সাধু বললেন, ধর্ম বলুন—বাণিজ্য বলুন—সবই সময়ের ইচ্ছা—কালের অভিলাষ—সামান্য মানুষের এক্তিয়ারের বাইরে।

রডারিগো এতক্ষণে জলের ধারে এসে পৌঁছলো।

।। বত্রিশ ।।

বাদশা থেকে ভিখারি—সবাই যখন আগ্রায় ঘুমিয়ে পড়ে—তখনো একজন মানুষ ঘুমোয় না। রাত যত বাড়ে ততই দেখা যায় সনাতন হাতির যেন কাজ বেড়ে গেছে। পিলখানায় সে এটা সরায়—ওটা গোছায়—হাতির শুঁড়ের ভেতর হাত গলিয়ে দেয়। সন্ধে রাতে দেখা যাচ্ছিল—যমুনার ওপারে চাঁদ এসে দাঁড়িয়েছে আশমানে। তখনই সনাতন হাতি দেখলো, একটা গাভিন হাতি কেমন দুর্বল হয়ে পড়েছে। হুকুম দিতেই সে পা ভাঁজ করে বসতে পারছে না। হুকুম দিতেই সে উঠে দাঁড়াতে পারছে না। সময় নিচ্ছে। গাভিন দশায় এমন দুর্বল হয়ে পড়ার মানে পেটের বাচ্চাটি মাদী।

আরেকটু বেশি রাতে দেখা গেল, সনাতন উঁচু বেহেদর হাতির পেটের তলা দিয়ে দিব্যি ঘোরাফেরা করছে।

খচ করে মনে পড়লো সনাতনের—তখন কি মীনাক্ষী গাভিন ছিল ! উঃ !

তাই যদি হয়ে থাকে তো কোন্ অজানা ঘরে বাঁদি হয়ে গিয়ে প্রাণটাই খুইয়ে বসে আছে নিশ্চয়। কিংবা বেঁচে থাকলেও পেটের বাচ্চাটি নিশ্চয় বাঁচাতে পারেনি। তখন কি মীনাক্ষী গাভিন ছিল?

হাতিশালায় হাতিদের মতোই আগ্রা দুর্গের দেওয়াল। বিরাট, ছাই ছাই পাথরের। তাতে মাথা কুটলেও মীনাক্ষী ফিরে আসছে না। একখানা পাথরে ঘা দিয়ে দেখলো সনাতন। নিজের হাতখানাই ফিরে এলো। এই এত বড় শাহীর কোথায় আমি ঘা দেবো? কী আছে আমার! কী দিয়ে দেবো?

রাত বাড়তে সনাতন হাতি ঘুরে ঘুরে পিলখানার আনাচে কানাচে ঘুমিয়ে পড়া ভৈ আর মেঠদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। নিশুতি রাতে এক একজন ভৈ মুখখোলা জানোয়ারের মতোই মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস টানছে। খুব নিশ্চিন্তে সবাই এখন ঘুমোচ্ছে। এরা বেশিরভাগই জাতিতে গোন্দ।

আগ্রা দুর্গকে সবাই নিশ্চিন্ত ভাবে। এখানে দুশমন আসবে কী করে? এসে পৌঁছবে কী করে? তার আগেই তো সাবাড় হয়ে যাবে। সনাতন একবার ভাবলো, শাহী হাতিশালার ভৈ-গুলোকে একসঙ্গে সাবাড় করে দিলে তো শাহী ফৌজই অকেজো হয়ে যাবে। হাতি নিজেই চলন্ত এক লড়াই। বড় বড় লড়াকুও তাকে ডরায়।

সব হাতি বসে গেলেও বাদশার রয়েছে কয়েক লক্ষ ঘোড়সওয়ার। ওরে বাব্বা! এই এত ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে আমি পারবো কী করে? আমি যে একা। একদম একা। সে নিরুপায় হয়ে লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে দুর্গের মাথার ওপরকার আকাশে তাকালো। দুর্গের এক এক দিককার সামানবুরুজ সিধে উঠে গিয়ে আকাশে বিঁধেছে। এ দুর্গ ফাটিয়ে চৌচির করে ফেলা যায় না?

সনাতন জানে আজ রাতটা ঘুমোবার নয়। অবশ্য বেশিরভাগ রাতই কাটে তার না-ঘুমিয়ে। আবছা আলোর ভেতর দুর্গের গলিতে গলিতে—ঢাকা বা খোলা চত্বরে চত্বরে—আঙুরিবাগে, হায়াত বকস্ বাগের নিশীথে ফোয়ারার পাশ দিয়ে পায়ে হেঁটে হেঁটে। এই দুর্গের ফাঁক-ফোকর জানতে একটি জীবন যথেষ্ট নয়। একটা শহরের মতো বিরাট এই দুর্গে যেমন থাকে হাতি, সিংহ, ময়ূর, চিতা—তেমনি থাকে বাদশা, বেগম, শাহজাদা, শাহাজাদীরা। গভীর রাতে একা দুর্গময় ঘুরে ঘুরে সনাতনের বিশ্বাস হয়েছে—আরও কেউ কেউ থাকে এখানে—যাদের সাদা চোখে দেখা যায় না। হাতিদের জন্যে বরাদ্দ শরাব থেকে খানিকটা নিয়ে যেদিন গলায় ঢেলে বুকটা ঠাণ্ডা করে সনাতন—শুধু সেদিন আবছামত কাউকে কাউকে দেখতে পায় সে। অন্যদিন তাদের দেখতে না পেলেও তাদের নিঃশ্বাস, পাশ ফেরার হাড় মড়মড়ি সনাতনের কানে এসেছে।

সারাটা পিলখানা তার তাঁবে হলেও সনাতন এতদিনে অন্দরমহলে যাবার চোরাগোপ্তা কোনো রাস্তাই খুঁজে পায়নি। অথচ বাদশা শাহজাহান যখন ইচ্ছে হয় তখনই কড়া পাহারা বসানো সদর-গলি এড়িয়ে দিব্যি কয়েক লহমায় এখানে এসে হাজির হন—আবার দরকার মতো নিমেষে মিলিয়ে গিয়ে কোন্ পথ দিয়ে যে দেওয়ানি খাসে গিয়ে উদয় হন—তা অনেক চেষ্টা করেও বের

করতে পারেনি সনাতন।

দুর্ধর্ষ দুই মুন্ড হাতি অন্ধকারের ভেতর মিশে গিয়ে মহা আনন্দে তাদের লম্বা শুঁড় শরাবের গোল গলা বিশাল কলসিতে নামিয়ে দিয়েছে। এখন আলো থাকলে দেখা যেতো—ওদের চোখ হলদে হয়ে আছে। সনাতন একটা হাত-বাটি ডুবিয়ে দুই শুঁড়ের মাঝখান থেকে অনেকটা তুলে নিলো।

সারাটা জায়গায় খাবারের গন্ধ। অন্ধকার বাতাসে হাতির মজুদ খাবারের মিঠা মদিরা থেকে যব, চিনি, ঘি—সব কিছুরই সুবাস পাওয়া যায়। জেদে—কী এক অন্ধ রাগে দু'হাতে দুই বিশাল শুঁড় টেনে তুলে কলসির বাইরে ফেলে দিলো সনাতন। অত বড় হাতি দুটো যেন তার খেলার পুতুল। তারপর বাটি ডুবিয়ে পরপর তিনবার চোঁ চোঁ করে অনেকটা খেয়ে ফেললো।

ইনসানের চেয়ে হাতির মতো বড় জানোয়ারের জান অনেক কড়া। তাই তার শবাবও অনেক কড়া। সনাতন দেখলো পিলখানার পর মোরি দরওয়াজার দিক থেকে এই নিশুতি রাতের একরকমের শুকনো জোৎস্না পাথুরে চত্বরে পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। দবওয়াজা দিয়ে তখন শীতের ঠান্ডা বাতাস পাঠাচ্ছিল নিচের যমুনা।

সারি সারি হাতি দাঁড়ানো পিলখানাব ভেতরটা খানিক গুমট। সনাতন হাতিব দুই কান, গলা, চাঁদি একটু ঠান্ডা বাতাসের ছোঁয়ার জন্যে আঁকুপাকু কবে উঠলো। সে ছুটে সেই ঠান্ডা হিম বাতাসের ভেতর গিয়ে দাঁড়াবে বলে যেই পা তুলেছে—অমনি দেখলো, যমুনার অন্ধকাব বুক থেকে উঠে মোরি দবওয়াজা দিয়ে কে যেন জ্যোৎস্নার ভেতরে এসে দাঁড়াচ্ছে।

এই সব্বোনাশ! এখন বাদশা শাহজাহান? তাও এই পথে?

সনাতন হাতির মাথার ভেতরে অত চড়া নেশা পলকে চন চন করে ঠেলে উঠেছে। সে নিজেকে খুব কষ্ট করে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে ঝুঁকে পড়ে তসলিম জানালো। আলা হজরত! আপনি এমন সময়ে আসবেন জানলে বাতিদানগুলো জেবলে রাখতাম—

—থাক। আলোর কোনো দরকার নেই।

—দেখবেন। সাবধানে পা ফেলবেন—

—এই তো আশমানের জ্যোৎস্না পড়েছে। এই আলোই যথেষ্ট!

—বেতমিজ হাতিগুলো আলমপনা রাত বাড়লে জায়গা বদলে বদলে ঘোবে তো—তাই।

. —আমাব পিলখানা আমায় চেনাচ্ছো! তুমি কে হে বেযাদব ছোকরা?

সনাতন চড়া নেশার ভেতরেও ঘাবড়ে গেল। হিন্দুস্থানের বাদশা শাহজাহান যে এমন বেভুল মানুষ তা তো জানা ছিল না। খোদাবন্দ আমি আপনার পিলখানার না-স্নায়েক সনাতন—

—কোন্ সনাতন?

আরও ঘাবড়ে গেল সনাতন। আলমপনা আপনিই আমাকে মীর-ই-পিলখানা করে বসিয়েছিলেন—

—আমি ?

এবার অবাক হয়ে সনাতন হাতি দেখলো. জ্যোৎস্নার ভেতর তার চেয়েও অনেক বেশি অবাক হয়ে হিন্দুস্থানের বাদশা দাঁড়িয়ে। বাদশার গায়ে সাদা চুনৌটি আঙরাখার ওপর বসানো একটা চুনী জ্যোৎস্নায় পাল্টা আলো ঠিকরে দিচ্ছে। বাদশার নিচের দিকটাও সাদা মতো—আবছা হয়ে জ্যোৎস্নায় মিশে আছে।

সনাতন কী বলতে যাচ্ছিল। ঠিক তখনই গমগম করে উঠলো হিন্দুস্থানের বাদশার গলা। আমি হিন্দুস্হানের বাদশা নুরুদ্দিন মহম্মদ জাঁহাগীর—আমি তো তোমাকে কখনো—

এবার সত্যিই ঘাবড়ে গেল সনাতন। তার নেশা চটে যাবার যোগাড়। এই নিশুতি রাতে বাদশা জাহাঙ্গীর ? তার সব গুলিয়ে গেল ! সে অবিশ্বাসের চোখে বাদশাকে ভালো করে দেখলো। কখনো এই বাদশাকে সে এত কাছ থেকে দেখেনি। হ্যাঁ। সত্যিই জাহাঙ্গীর বাদশা। তাহলে এতদিন যাঁকে বাদশা বলে জেনে এসেছি—তিনি আদৌ বাদশা নন। সত্যিই কি জেগেছি ? না স্বপ্নে দেখেছি ? কিংবা হয়তো এখনই আসলে স্বপ্নটা দেখছি !

সব দলা পাকিয়ে গেল সনাতন হাতির মাথায়। কী এক জাগন্ত খোয়াবে যেন সে ভাসছে। ঝুঁকে পড়ে ফের তসলিম জানিয়ে সনাতন বললো, খোদাপরস্ত ! আপনি আমায় চিনবেন কী করে ? আপনি আমাদের জান-মাল-মানের জিম্মেদার—তামাম হিন্দুস্হানের বাদশা। আর আমি ব্রহ্মপুত্রের তীর ঘেঁষা সামান্য দেহাতি ইনসান। আপনি আমাদের পাঠানো হাতিদের কেনেন—

এবার জ্যোৎস্নার ভেতর বাদশা জাহাঙ্গীরের চোখ মুখ অনেক সহজ লাগলো সনাতনের। সে ফের সাহস করে বলে ফেললো, আমরা হলাম গিয়ে বাদশার হাতি ধরা ঘরদুয়ারি পাইক—

—ওঃ ! বুঝেছি। বাবা খুররমের আমদানি তুমি। বা বেশ। তা আমার জটাজুট কোথায় ?

—জটাজুটের বয়স হয়েছে হুজরত। বুড়োপার সঙ্গে কে লড়াই করবে !

—আব্বা হুজুর আকবর বাদশার আমলে জটাজুট শাহী পিলখানায় ভর্তি হয়েছিল। অনেক লড়াইয়ের বাহাদুর আমার জটাজুট—

—দেখবেন আসুন। এখন চলাফেরা কমে গেছে।

—কেন ? কেন ? —বলতে বলতে জাহাংগীর বাদশা সনাতন হাতির পেছন পেছন পিলখানায় ঢুকলেন। সারি সারি হাতি দাঁড়িয়ে। সনাতন এগোচ্ছে। তার পেছনেই বাদশা জাহাংগীর। ফিরে তাকাবার সাহস হচ্ছে না সনাতনের। বাদশার গরম নিঃশ্বাস তার পিঠে এসে পড়ছে। হাজার হোক মুঘল নিঃশ্বাস। হাতিরা অনেকদিন পরে তাদের চেনা বাদশাকে দেখেই যেন এই নিশুতি রাতে আহ্লাদে বেশ শব্দ করেই তাদের কান লটপট করতে লাগলো।

—দক্ষিণে খান্দেশের লড়াইয়ে গিয়ে জটাজুট চোট পায়। তারপরই থেকেই বসে গেছে আলমপনা—

হাঁটতে হাঁটতেই বাদশা বললেন, খান্দেশে লড়াই ? কোথায় ? আমি তো কিছুই জানি না। উজিরে আজম আসফ খাঁ তো কিছুই জানায়নি আমায়—

—এই যে জটাজুট খোদাবন্দ—

জাহাঙ্গীর বাদশা গম্ভীর হয়ে অন্ধকারে মিশে থাকা জটাজুটের সামনে দাঁড়ালেন। বাদশাকেও আর দেখতে পাচ্ছে না সনাতন। মনে হলো জাহাঙ্গীর বাদশা জটাজুটের শুঁড়ে হাত রাখলেন। ওপরে তাকিয়ে সনাতন দেখলো, বহু লড়াইয়ের বাহাদুর লড়াকু বিরাট জটাজুটের দুটি চোখ অন্ধকারের ভেতর নীল হয়ে জ্বলছে। দূরে বাইরে যমুনার বুকে হাড়কাঁপানো হিমেল বাতাসের একটানা সরসর—সরসর আওয়াজ।

বাদশা জাহাঙ্গীর অস্ফুটে বললেন, বড়ে দিওয়ানা হাঁথি—বলে খানিক থেমে থাকলেন বাদশা। তারপর জানতে চাইলেন, ওকে শরাব দিচ্ছো তো—

—হ্যাঁ। খোদাবন্দ। তবে আমি মীর-ই-পিলখানা হবার পর এখন নাম কিনেছে দুটো হাতি—

—কোথায় ? কে ? কে ?

—সুরতসুন্দর আর সুধাকর। ওই দেখুন।

একটু দূরে আলাদা দুই হাতি দাঁড়িয়ে। তাদের দু'পাশে খানিক পেছনে মাথা পিছু চারটি করে হাতি দাঁড়ানো। পেছনের হাতিগুলোকেই আগে দেখলেন জাহাঙ্গীর বাদশা। তারপর বলে উঠলেন, বাঃ! ঠিকই করেছো। চারটি করে আলানসঙ্গী রাখার হুকুম আমি অনেকদিন আগেই দিয়েছি সনাতন। ইনসানের মতো জানোয়ারের মনমেজাজও কিসে শরিফ থাকে তা লক্ষ্য রাখতে হয়। শরাব—সাথী থাকবে তবে না জং-কি-ময়দানে ফুর্তিতে লড়াই দেবে।

সুধাকর শুঁড় তুলে বাদশাকে তসলিম জানালো। সুরতসুন্দর যেমন দাঁড়িয়েছিল—সেইভাবে দাঁড়িয়ে থেকেই জৌনপুরি আখের গোছা ছিবড়ে করে ফেলতে লাগলো। আখের রসের আরাম তার দুই চোখে—আলো থাকলে দেখানো যেতো বাদশাকে।

সনাতন হাতির খুবই ভালো লাগছিল। হাতির এমন সমঝদার কালে ভদ্রে পাওয়া যায়। তাও তিনি আবার একজন বাদশা। একবার সনাতনের মনে হলো—তাহলে ভুল শুনেছি। বাদশা জাহাঙ্গীর তো বেঁচে আছেন। বেশ বহাল তবিয়তেই বেঁচে আছেন। আর মানুষটিও তো বেশ। আগে কখনো সে জাহাঙ্গীরকে দেখেনি। একবার মনে হলো বাদশার ঘাড়-গর্দান রীতিমত চওড়া।

সনাতনেরও যেন ফুর্তি লেগে গেল। সে আগে আগে যাচ্ছিল আর হাতির জহুরির মতোই গলায় বলছিল, আলমপনা! কুনকি হাতি দিয়ে হাতি ধরেছি কত। আমাদের ওদিকেই তো হাতি। বড় শান্ত জানোয়ার। কয়েদ হয়েও কোনো হাতি কিন্তু কুনকির ওপর চড়াও হয় না।

বলতে বলতে সনাতন এগোচ্ছিল। তার পেছন পেছন বাদশা জাহাঙ্গীর।

আমি মীর-ই-পিলখানা হবার পর এই হাতিটাকে তীর ছোঁড়া শিখিয়েছি।

—বাঃ! চমৎকার। এটা তো বেহেদের হাতি। কানে সাদা আঁচিল দেখছি তাহলে তো একেবারে গজমানিক!

—ওই চারটে মুণ্ডহাতি। শুনেছি বাগোয়ার জঙ্গল থেকে আপনিই আনিয়েছিলেন খোদাবন্দ।

—ওরা খুবই দুর্ধর্ষ হয় সনাতন।

—তাই তো ওদের খাবার অন্যের চেয়ে বেশি। তবে ঘিয়ের বহর কমিয়ে দিয়েছি হুজরত। নইলে ভীষণ মুটিয়ে যায় যে—

এক সারি ঘুরে সনাতন দুসরা সারির প্রথম ছ'টা হাতির শুঁড়ে সেতারের তারে বোলানোর মতোই হাত বুলিয়ে নিলো। ছাই ছাই ফিকে রঙের গা। বছরও ঘোরেনি এই মুরগা হাতিরা শাহী পিলখানায় ভর্তি হয়েছে।

এর পরেই পড়লো পাঁশুটে রংয়ের বেশ কয়েকটা হাতি। সনাতন বললো, এরা মীর ঘরানার জানোয়ার। ভালোই পোষ মেনে এসেছে।

এবার ওদের সামনে পড়লো পিলখানার সবচেয়ে বয়স্ক তিন হাতি। দেখেই বাদশা বললেন, রাজতুম হাতি। আমার জন্মের আগের জানোয়ার। এদের ঘরানাই বনেদি। ফিজুল কোনো হাঁকডাক নেই এই হাতির। আব্বা হুজুরের আমলে তো ওদের কোনো আলানসঙ্গী থাকতো না। আমি মসনদে বসতে ওরা বংশে বেড়েছে—

একথায় বাদশার ওপর শ্রদ্ধায় মনটা ভরে গেল সনাতনের। এত কাজের ভেতরেও বাদশা তো সব খবর রাখেন হাতিদের।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লো সনাতন। সেই সারির শুরুতে বেশ দূরে আবছা মতো বাদশা জাহাঙ্গীর দাঁড়িয়ে। পরিষ্কার দেখা যায় না বাদশার মুখখানা। সেদিকে তাকিয়ে সনাতন বললো, আলা হুজরত! এই হাতিটাকে দেখুন। বেশ মুটিয়েছে। নিশ্চয় মন্দা বাচ্চা দেবে—

এরপরের বাঁকেই পিলখানায় জন্মানো তিন তিনটে বালহস্তী যে যার মায়ের পেট চুঁসিয়ে দুধ খাচ্ছিল। নিঃশব্দে। আশপাশের ভৈ আর মেঠরা ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে। হাতিদের পায়ের কাছে দুর্গের কয়েদখানার দিক থেকে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। মাঝে মাঝে পাশেরই সিংহের ঘর থেকে অস্বস্তির গর্জন। এ ছবি দেখতে বাদশা জাহাঙ্গীর দাঁড়িয়ে পড়লেন। তা দেখে সনাতনেরও মনে হলো ঃ আহারে! কী ছবি!

—বাচ্চাগুলো কেলরা হয়ে দাঁড়াতে আর কতদিন লাগবে?

মনে মনে বাদশাকে তারিফ করে সনাতন বললো। এখন তো ওদের বয়স মোটে পাঁচ। খোদাবন্দ। কেলরা হয়ে দাঁড়াতে আরও পঁচিশ সন লাগবে—ততদিনে আমরা কেউ থাকবো না—

বাদশা জাহাঙ্গীর সেকথায় না গিয়ে বললেন, আমি জওয়ান বয়সে কাছাকাছি বাগোয়ান, নারোয়ার জঙ্গলে হাতি ধরাতাম। সুবে ইলাহাবাদের রতনপুর, নন্দপুর, শিরগোমার জঙ্গলে আব্বা হুজুর আকবর বাদশা হাতি

ধরতেন একসময়। আমি তখন ছোট—মক্তবে পড়ি। বড় হয়ে আমি হোসেঙ্গাবাদের জঙ্গলে হাতি ধরেছি—মালবের বিজয়গড়ে, হরিগড়ে, ত্রিহুত জঙ্গলে একসময় অনেক হাতি ধরা হতো। সুবে বঙ্গালের সাতগাঁয়ের দক্ষিণে ভালো জাতের হাতি থাকে।

চৌথা সারির হাতিদের কিছু এলোমেলো লাগলো সনাতনের। যদিও ওদের পেছন দিকটা ঢালু করে তৈরি বলেই পেচ্ছাপ গিয়ে যমুনায় পড়ে—তবু নাদে, মাছিতে জায়গাটা অসহ্য মনে হলো। সে কোমরে লটকানো ছিপটি নিয়ে হাতিদের দারোগাকে খুঁজলো। কোথায়' আশ পাশে কেউ নেই! শেষ রাতে হাতিদের জন্যে দুধে চালে কড়া প্রসাদ চাপানো হয়। নিশ্চয় সেখানে গিয়ে বসে আছে লোকটা। খাওয়া দাওয়ায় ভীষণ লালচ।

হাতির মতো এতবড় শান্ত জানোয়ার নিয়ে কার না মেতে থাকতে ভালো লাগে! সেই কবে ধুমধুমার গড় গুঁড়িয়ে দেবার পর সনাতন পথে পথেই আছে। পয়লা তাড়া খেয়ে ভাগ্যিস এক ভবঘুরে মিশকিনের আশ্রয় জুটেছিল। নয়তো সেদিনই মির্জা ইউসুফ বেগের সেপাইদের হাতে কোতল হতে হতো। তারপর নিজেই সে ভবঘুরে হয়ে ঘুরতে ঘুরতে নাসিকে—সেখান থেকে এই আগ্রায়। ভাবলো একবার বাদশাকে বলবে—বন্দেগান! শুধু আপনার জন্যেই আজ আমি এই পিলখানায়! এখন আমি সনাতন হাতি! হাতিই আমার ধ্যানজ্ঞান। নিবাস—আগ্রা। সাকিন—আগ্রা দুর্গ।

বুক ঠুকে কথাটা বলেই ফেলবে বলে বাদশার দিকে ফিরে দাঁড়ালো সনাতন। চৌথা সারির শুরুতে দাঁড়িয়ে বাদশা জাহাঙ্গীর। এবার তাঁর মুখখানা স্পষ্ট হলো সনাতনের কাছে। লালচে গাল। মাথার উষ্ণীষের ওপর হীরে বসানো সরবন্ধ। সুরমা টানা চোখ জোড়া তারই দিকে পলক না ফেলে তাকানো।

কী এক সুড়সুড়িতে ভীষণ অস্বস্তিতে পড়লো সনাতন। বাদশার চোখের সামনে কেঁপে ওঠাও ভীষণ বেতমিজি। সে বাঁ হাতখানা পেছনে পাঠিয়ে সুড়সুড়ির জায়গাটা খুঁজতে গেল।

অমনি সনাতনের চোখ খুলে গেল। যমুনার দিককার ঘুলঘুলি দিয়ে ফিকে আলো পিলখানায় এসে পড়েছে। ভোর হচ্ছে। তার বুকের ওপর দিয়ে জটাজুট পরম স্নেহে ভারি শুঁড় আলতো করে বোলাচ্ছে। তার মানে—সকাল হলো। ওঠো এবার।

তড়াক করে উঠে বসলো সনাতন। চারিদিকে তাকালো। কোথায় বাদশা! কোথায় জাহাঙ্গীর! চারপাশে শুধু হাতির পর হাতি। চাতালের দিকে তাঁদের চারখানা করে পা। দাঁড়িয়ে উঠে একা একাই হাসলো সনাতন। ইদানীং প্রায়ই এমন এখানে ওখানে ঢলে পড়ে থাকে সনাতন। সারারাত। সামান্য খেলেও। দাঁড়িয়ে দেখলো, অশক্ত জটাজুটের চোখ দুটি ভোরের প্রথম আলোতেও যেন কাল রাতের মতোই নীল হয়ে জ্বলছে।

বাদশা শাহজাহান তখন দুর্গের গোয়ালিয়রের দিককার সামান বুরুজের সামনে দাঁড়িয়ে। আকাশের সব ক'টি তারা তখনো মুছে যায়নি। এইমাত্র তারা দেখে দেখে শাহী নজমুল ফৌজের হামলা চালানোর সময়টা ঠিক করে বাদশাকে সাহেত দিয়েছেন। শাহী ফৌজ তো যে কোনো সময়ে হামলা চালাতে পারে না।

বাদশা শাহজাহান এবার নিচে নামতে লাগলেন। তাঁর কপালে তিন থাক ভাঁজ। আবার দক্ষিণে—আবার? হিন্দুস্থানের হৃৎপিণ্ড আগ্রা হলেও তার নসিব যেন দক্ষিণেই। বেপরোয়া পাঠান মনসবদার খানজাহান লোদি দক্ষিণের খান্দেশ, বেরার, তেলিঙ্গানা, দৌলতাবাদে নিজের নামে খাজনা আদায় করছে। আগ্রাকে কোনো পরোয়াই নেই। কয়েকবার ডেকে পাঠানো হলেও লোদির তাতে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।

দুর্গকে ঘিরে চওড়া পাঁচিল। সেই পাঁচিলের ভেতর দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সিঁড়ি নেমেছে। দুর্গ চাতালে পৌঁছবার আগে খানিক জায়গা প্রায় অন্ধকার। বাদশা শাহজাহান এই সময়টায় তাঁর পাশে শাহজাদা দারার কাঁধে হাত রাখলেন। প্রায়ান্ধকার আবছা জায়গায় নিজের ছেলের শরীরের মতো ওম্‌ওয়ালা জিনিস আর হয় না—বিশেষ করে এই শীতে সারাটা শেষ রাতে আশমানের নিচে তারা দেখে—তারা গুনে কাটাবার পর।

—শাহজাদা। তুমি এবার আবার পাশে থাকবে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বাদশার এই গলা চওড়া দেওয়ালের ভেতর গমগম করে উঠলো। সে আওয়াজে হুকুমের সঙ্গে গভীর বিশ্বাস মিশে ছিল। শাহজাদা নিজের পিঠে হিন্দুস্থানের বাদশার হাতের ভার টের পাচ্ছিলেন। তাঁর নিজের এখনো পনেরো হয়নি। বাদশার জন্মদিন সারা হিন্দুস্থান জানে। সেদিনটা শাহী উৎসবের দিন। খেতাব, খেলাত বিলির দিন। অংকটা মনে মনে হিসেব করে শাহজাদা বুঝতে পারেন আব্বা হুজুর শাহেনশা শাহজাহান সবে সাঁইত্রিশ পেরিয়েছেন। সিঁড়ি দিয়ে নামছেন যেন পাগলা কোনো জলের ঢল। পা ফেলার ভেতর তাগদ, জোস্ ঠিকরে উঠছে। গভীর বিশ্বাস জাগানো গলা। নানা লড়াইয়ে পোড় খাওয়া মানুষ এই বাদশা। তাঁর পিঠের ওপর সেই বাদশার হাতখানি রাখার ভেতর যেমন একজন আব্বা হুজুরকে টের পাচ্ছিলেন শাহজাদা—তেমনি টের পাচ্ছিলেন হিন্দুস্থানের সেরা লড়াকুর হাতের তাগদ, ওজন, কঠিন হুকুম আর ভালোবাসা।

আশমানের তারা দেখে দেখে শাহী নজমুল ফৌজি হামলার সময়টা—চলাফেরার দিকবিদিক ঠিক করে দেবার পরেই যেন লড়াইয়ের আধখানা জেতা হয়ে গেছে। সেইরকমই হাবভাব বাদশার। সেইরকমই তৃপ্তি গলায়।

—তুমি আমার পহেলা আওলাদ। কিছুকাল দরবারে বসলে। দরবারের রীত রিসালা দেখলেন শাহজাদা—

দারাশুকো সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

—খোদার রহেম—তোমার মতো ছেলে পেয়েছি। এবার চাই জং-কি-

ময়দানে তুমি তোমার আব্বা হুজুরের পাশে থাকবে। দেখবে—দুশমনকে কী করে খতম করতে হয়। দুশমনের শেষ রাখতে নেই। আমরা চাঘতাই মুঘল। আমাদের খুনের ইশারা—দুশমনকে সাবাড় করো—তার পর বিশ্রাম নাও।

শীতে সারারাত মেঘ হয় না। আশমান পরিষ্কার আলোয় চকমক করে। হিন্দুস্থানে আগ্রা দুর্গ থেকে এই সময় বাদশা শিকারে বেরিয়ে যান। আব নয়তো যান লড়াইয়ে। শাহী লাল তাঁবু পড়েছে প্রান্তরের ভেতর। দূরে একটা দীঘি দেখা যায়। তার ওপর শীত ভোরের ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশা। দীঘির ওপারেই শাহেনশা শাহজাহানের বাদশাহী তাঁবু। ভোর না হতেই চারদিকের বাতাসে ঘোড়ার ক্ষুরের এলোমেলো আওয়াজ।

শাহজাদা দারাশুকো বুঝলেন, এবার পাঠান মনসবদার খানজাহান লোদির সঙ্গে বাদশা তাঁর হিসেবের খাতা একদম পরিষ্কার করে ফেলবেন। এই লোদি নামটির সঙ্গে বালক বয়স থেকেই শাহজাদা মহম্মদ দারাশুকো পরিচিত। পাঠান শাহীর সময়েই তো আজকের এই চমকদার—আলিসান দুর্গের ছোট করে শুরুয়াত হয়েছিল। আগ্রা থেকে দিল্লি যাওয়ার রাস্তার মাঝে মধ্যে জঙ্গলে ঢেকে যাওয়া বহু দুর্গের কঙ্কাল চোখে পড়ে। সেসব ভগ্নস্তূপ একসময়কার লোদি শাহীর স্মৃতি। তাগদের চিহ্ন।

আব্বা হুজুর যখন আগ্রার বিরুদ্ধে বাগী হলেন—তখন তাঁকে সিধে শায়েস্তা করতে দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশা তো এই খানজাহান লোদিকেই পাঠিয়েছিলেন। এই পাঠান কি সেদিনকার খুর্রমকে কিছুতেই বাদশা হিসেবে মেনে নিতে পারছেন না? যে কোনো শাহীতে তো তাগদের ঘুঁটি শতরঞ্জ খেলার ঘুঁটির মতোই হামেশা পালটে পালটে যায়। পালটে যাওয়া মৌসমে পাঠান খানজাহান লোদি কি কিছুতেই সাবেক দুশমনি ভুলতে পারছেন না?

এইসব ভাবতে ভাবতেই তরতাজা শাহজাদা দীঘিটা বাঁয়ে ফেলে ঘোড়সওয়ারদের বরগা তাঁবু পেরোলেন। কোনো লড়াইতেই লড়াইয়ের সেরা লড়াকুকে একেবারে সামনে আনা হয় না। দূরে কোনো নদী আছে নিশ্চয়। দাখিলারা কাল রাতেই বলছিল—এক মঞ্জেলের ভেতরেই নর্মদা। তাই ভোরের আকাশের একদিকটায় যেন বেশি আলো। বাতাসেও জলজ শ্যাওলার গন্ধ যেন পাচ্ছিলেন শাহজাদা।

এবার তিনি শাহী ফৌজের সবচেয়ে বড় তাগদ—হাতিদের সামনে এসে পড়লেন। এদের একেবারে সামনে না এনে মীর-ই-পিলখানা জঙ্গলের আড়াল খুঁজে নিয়েছে। কম করেও প্রায় চল্লিশটা হাতি। সারি সারি দাঁড়িয়ে। শাহজাদা দারাশুকো দেখলেন মীর-ই-পিলখানা ভৈ আর মেঠদের নিয়ে এক এলাহি কাণ্ড সামলাচ্ছে।

সে এক ছবি। ছবির মতো ছবি। ঘোর কালো উঁচু উঁচু বিরাট জানোয়ার। তাদের অনবরত খাওয়ানো চলছে। না খেতে দিয়ে হাতির গায়ে হাত দেওয়া যায় না। খানিক এগিয়ে শাহজাদা দেখলেন, গোটা ছয়েক বাছাই বেহেদর

জাতের বিশাল জঙ্গী হাতির আলাদা করে তোয়াজ চলছে। তার মানে আজই হামলা হবে।

হঠাৎ একটা খুব মিষ্টি গন্ধ নাকে এলো শাহজাদার। কাছে পিঠের দেহাত তো সব খাঁ খাঁ করছে। যে-পথ দিয়ে ফৌজ যায়—তার দু'ধারে মানুষ সরে যায় তাই দেখেন আমাদের শাহজাদা। শীত প্রায় শেষ। খানিক বাদে রোদের তাপ মালুম হবে। তিনি একটা জিনিস ভেবে পাচ্ছেন না। তাগদের জোরে অবস্থা পালটানো যায়। কিন্তু দুনিয়া যেমন আছে তেমনি থাকবে। এই জঙ্গল, এই প্রান্তর, ওই আশমান, ইনসানের লড়াই কাজিয়ার হারজিতের কাছে কখনোই মাথা নোয়ায় না। তবে কেন এত লোক-লশকর নিয়ে খুন জখম করে হার বা জিতকে ডেকে আনা?

শাহজাদাকে দেখে সনাতন হাতি ঝুঁকে তসলিম করলো।

—এই মিষ্টি গন্ধ কিসের?

—আপনি পেয়েছেন তাহলে!

—এ তো শরাবের গন্ধ নয়।

—না শাহজাদা। শরাবের গন্ধ নয়। খুব চিন্তায় ছিলাম। লড়াকু হাতিদের সুরুয়ার মাল-মশলা কোথায় পাবো। তা খোদাই সব ব্যবস্থা করে দিলেন। এখন আর আমার কোনো চিন্তা নেই!

—এ কিসের গন্ধ?

—আপনি কি কখনো রুদ্রভূমির কাছাকাছি যাননি?

—রুদ্রভূমি?

—শাহজাদা, হিন্দুর রুদ্রভূমি হলো গিয়ে শ্মশান। শ্মশানের কাছে গেলে এ গন্ধ পাওয়া যায়। আশা করি এবার বুঝতে পেরেছেন!

তবুও বুঝতে না পেরে দারাশুকো তাকাতেই মীর-ই-পিলখানা সনাতন হাতি হাসতে হাসতে বললো, এ হলো গিয়ে মহামাংসের গন্ধ।

—মহামাংস?

—হ্যাঁ শাহজাদা। মহামাংস। ইনসানের গোস্ত। কাল লোদিদের দুটো কাসীদ ধরা পড়েছিল। রাতে ফাঁসি দেবার পর তাদের তাজা লাশ দিয়ে এখন সুরুয়া তৈরি হচ্ছে। শরাবের সংগে এই সুরুয়া খেলে হাতি খুব বাহাদুর জংদার হয়ে ওঠে।

শাহজাদা মহম্মদ দারাশুকো বহু কষ্টে কোমরের মসলিন দিয়ে নিজের নাক চেপে ধরলেন। তাঁর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। মাথাও ঘুরছে।

॥ তেত্রিশ ॥

পাশাপাশি দুই হাতি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে।

একটি হাতি অন্যটির চেয়ে বেশি উঁচু। গায়ের রং ঘোর কালো। শীতকালের সন্ধে রাতে অকাল বৃষ্টিতে মশালের দাপানো শিখা মুছে যাওয়ার

যোগাড়। তাতেও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে হাতিটির দু'টি চোখই হলুদ বর্ণ। ডান কানের পাশে একটি বড় মতো আঁচিল। এই হাতিটির নাম ফিল-ই-ফতে। বেহেদর জাতের হাতি। শাহেনশা শাহজাহানের পেয়ারের হাতি।

পাশের হাতিটিকে দেখে মনে হবে ফিল-ই-ফতেরই ছেলে। বয়সও কম। ছাই ছাই গা। গলঘণ্টাটি ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে সামান্য দুলতেই ঢং ঢিম—এইসব আওয়াজ হচ্ছিল। এর নাম ফতে জং। শাহজাদা দারাশুকোর পেয়ারের হাতি। বয়সে সে মালিকের চেয়ে দু'চার বছরের বড়ই হবে। বলা যায় এখন ফতে জংয়ের লড়াই হামলার বয়স—যাকে বলে হাতি-ঘেঁষা ভাষায় ওর এখন কেলরা দশা।

জায়গাটা মালভূমি মতো। চারদিকে বড় বড় গাছের আড়াল। ডানদিকে বিশাল এক হাওড়। যাকে বলা যায় জলাভূমি। সারি সারি মশালের আলোয় তার সামান্যই দেখা যাচ্ছে। আর সামনে বিরাট এক অন্ধকার। ওখানে শীতের নর্মদা বুক ভরে অকালের এই বৃষ্টি খাচ্ছিল।

বৃষ্টিতে, খরায়, রাতে, দিনে হিন্দুস্থানের বাদশার কাজ কখনো থেমে থাকে না। শাহেনশা শাহজাহান তাঁর শাহী লাল তাঁবুর হাতায় দাঁড়িয়ে। বাদশা নিজেই হিন্দুস্থানের সেরা লড়াকু। তাঁর নিজেরই এখন মোটে সাঁইত্রিশ। নীল মুঘল চোখ সদাসতর্ক। এদিক ওদিক তিনি লক্ষ্য রাখছেন—বাঘেরই মতো। লাল গালে মশালের আলো বাড়তি লালি ঢেলে দিচ্ছিল।

বাদশার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁরই বড় ছেলে শাহজাদা মহম্মদ দারাশুকো। যেন বা বাদশাকে আলোকিত করার জন্যে তিনি আরেকটি বাড়তি মশাল। এই উজ্জ্বল মশালটির চোদ্দ বছর বয়স পূর্ণ হয়েছে গত ২৯শে সফর—হিজরি ১০২৪।

বাবা ও ছেলের সামনে দিয়ে ইউসুফজাই ফৌজি সেপাইদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আশপাশের দেহাত থেকে ধরে আনা খালি গা, লেংটি পরা গাঁয়ের মানুষজন হাতে ঠেলে—ঘাড়ে রশি জোয়ালের মতো টেনে কামানের ভারি ভারি গাড়িগুলো নর্মদার তীরে উঁচু তক্তাঘাটে তুলে দিচ্ছিল। বিশাল বিশাল ভেলায় চড়ে ওগুলো ওপারে যাবে। কারও থামবার উপায় নেই। থামলেই তাজা বয়সেই দু'জন আহেদি জলে ভেজা পিঠগুলোর ওপর ঘোড়ায় বসেই সাঁই সাঁই কোড়া মারছিল। দারা দেখলো, কোড়া খেয়েই দাড়িওয়ালা একজন দেহাতি মানুষ থর থর করে কেঁপে উঠে বসে পড়লো। বসতে না বসতেই ভিজে মাটিতে লোকটা গড়িয়ে পড়লো।

শাহজাদা দারা আর থাকতে পারলেন না। তিনি ছুটে গিয়ে তাঁবুর বাইরে বৃষ্টির ভেতর ঝুঁকে লোকটির কাঁধ ধরলেন। পিঠে কোনো মাংস নেই। শুধু হাড়। তার ভিজে শরীরটা শাহজাদার হাত থেকে পিছলে ফের মাটিতে পড়ে গেল।

এমন কখনোই ঘটে না। কোনো শাহজাদা কখনোই কোনো আম-আতরাফ মানুষকে ছুঁয়ে দেখেন না। এমন বেনজির ঘটনায় ঘোড়ার পিঠে বসা দুই

আহেদিও ঘাবড়ে গেল। তারা কোড়া মারা ভুলে গেল।

কামানের গাড়িগুলো যেমন যাচ্ছিল—তেমন আর তাদের এগোনো হলো না। সব কটা থেমে গেল। বাদশা শাহজাহান আর থাকতে পারলেন না। তিনি লাল তাঁবুর হাতার বাইরে বেরিয়ে এসে নিজের ছেলের পিঠে হাত রাখলেন।

শাহজাদা চমকে ফিরে তাকালেন। এ হাত তাঁর চেনা।

—তোমার আবেগ কিছু বেশি। এ জন্যে শাহী ফৌজ তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না দারা—

—একজন ইনসান এভাবে মার খেয়ে ভিজে মাটিতে পড়ে থাকবে আব্বা হুজুর?

শাহজাহান বাঁ হাত তুলে কামানের গাড়িগুলোকে ফের এগোবার হুকুম দিয়ে বললেন, শাহী কাজের চেয়ে কোনো ইনসান বড় নয় শাহজাদা! হিন্দুস্থানকে নিরাপদ করতে—হিন্দুস্থানকে মজবুত করতেই আমি আগ্রা দুর্গ ছেড়ে দক্ষিণে এতদূর এসেছি। সেই কাজ কি একজন সামান্য ইনসানের জন্যে থেমে থাকবে?

অনেক কথা একসঙ্গে মনে আসছিল দারাশুকোর। কিন্তু কোনো কথাই তিনি বলতে পারলেন না। তখন তাঁর চোখের সামনে শীতের ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটার ভেতর বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে দেহাতি মানুষগুলো একদম জানোয়ার হয়ে কামানের গাড়ি ঠেলছিল। গাড়ির চাকা কাদায় মাখামাখি। একজন খালি গা মানুষের ডান কাঁধে কোড়া বসে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়লো।

শাহজাদা দারা আর দাঁড়াতে পারলেন না। তিনি একছুটে চিলমন সরিয়ে তাঁবুর ভেতর ঢুকে গেলেন। ভেতরটা তখন নীল আলোয় নরম করে রাখা ছিল। শাহী স্কন্ধাবার তাঁবুর মূল উদুর্ থেকে সুবিধামত সুখদোলা ঝোলানো। তাতে গিয়ে বসে পড়লেন শাহজাদা।

তাঁবুর বাইরে দুনিয়া একরকম। ভেতরে আরেকরকম। এখানে বসেই শাহজাদা শুনতে পেলেন—আল্লাহু আকবর!

তার মানে ইরানি ফৌজের সেপাইরা ভেলায় চড়ে অন্ধকার নর্মদা পার হচ্ছে। শুখা দেশের ইরানি ইনসান সব রুটির জন্যে হিন্দুস্থানের ফৌজে ভর্তি হয়েছে। ওই আল্লাহু আকবর!—কি খোদাতালায় বিশ্বাস থেকে জিকির দেওয়া? না, প্রাণভয়ে? কিংবা, লড়াইয়ের জন্যে বুক শক্ত করতে? সত্যি! আল্লাকে নিয়ে মানুষ তার দরকারে কতরকমে ব্যবহার করে।

—একি? শাহজাদা তুমি এখানে বসে আছো?

দারা উঠে দাঁড়ালেন। আব্বা হুজুর—

তাঁর কথা শেষ হতে পারলো না! বাদশা বললেন, তুমি আগ্রার বাইরে এসেছো বাদশার সঙ্গে—লড়াই দেখতে। সাত হাজারি মনসবদার খানজাহান লোদি বিজাপুরকে নিয়ে ঘোঁট পাকাতে চলেছে। শাহী ফৌজ বাজপাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কলিজাটুকু তুলে নেবে। বাগী হওয়ার সাধ

চিরকালের মতো ঘুচিয়ে দেবে। আমি চেয়েছিলাম লড়াইয়ের সব ক'টা ধাপ তুমি নিজের চোখে দ্যাখো—

—আমি তো সব দেখছি আলা হজরত !

—খান্দেশ, বেরার, তেলিঙ্গানা, দৌলতাবাদ পথে পড়েছে। সবই তুমি দেখেছো। খানজাহান লোদি দক্ষিণে আমাদের চৌষট্টিটা দুর্গের ধারকাছ দিয়েও ঘেঁষবে না। জানে সেখানে মজবুত চৌকি রয়েছে। কিন্তু—

বলতে বলতে শাহেনশা শাহজাহান দেখলেন, তাঁর ছেলে নিজের ভেতর কিসে যেন মগ্ন হয়ে পড়েছেন। চোখের দৃষ্টি তম্গত। তিনি দারার চোখের সামনে হাত নাড়লেন অদৃশ্য বাতাসে।

শাহজাদা চমকে সিধে হয়ে দাঁড়ালেন। আমি সবই শুনেছি আলমপনা। আপনি দৌলতাবাদ বলাতে সেখানকার ছবি আমার চোখে ভেসে উঠেছিল এক লহমায়—

বাদশা খুশি হয়ে বললেন, বাঃ ! এই তো চাই। হিন্দুস্থানের ভবিষ্যতের বড় যোদ্ধা হবে তুমি। বড় যোদ্ধা—বড় সেনাপতি মনে মনে আগাম ছবি আঁকতে পারে জং-কি-ময়দানের। তুমিও একদিন পারবে দারা—

—দৌলতাবাদের সেতুগুলো খানজাহান লোদি উড়িয়ে দিয়েছিল।

—আমরা কীভাবে সেই সব সেতু ফের বানিয়ে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলেছি—তাও তুমি এ ক'দিনে দেখতে পেলে শাহজাদা।

—এখনো তো দক্ষিণে দশটা দুর্গ আমাদের হাতে নেই।

—সে-সব দুর্গই শাহী ফৌজ এবার কব্জা করবে। সেই হামলায় তুমি তোমার আব্বা হুজুর হিন্দুস্হানের বাদশাকে দেখতে পাবে এবারে—

—এটা আমার সৌভাগ্য আলমপনা।

—দক্ষিণে সম্বচ্ছরের শাহী মাল গুজারি পাঁচ কোটি টাকা। খানজাহান লোদির জন্যে তাও হাসিল হয়নি গত তিন সন। এরপর কি আগ্রা চুপ করে থাকতে পারে ?

শাহজাদা দারাশুকো বুঝতে পারলেন না—এখানে বাদশার কথার পিঠে কী কথা বলবেন ! তিনি চুপ করেই থাকলেন।

—আগ্রা থেকে গোয়ালিয়র হয়ে আসার পথে উত্তর-পূবে আমরা যমুনা পেরিয়েছি। এখন আমরা নর্মদা পার হয়ে যাবো কাল ভোরের আগে। কোনো ঝড়জল শাহী ফৌজের পথ আটকাতে পারবে না। শীত আমাদের সঙ্গী এখন। বড় অভিযানের সুসময় সর্বদাই শীত।

বলতে বলতে বাদশার মুখ জ্বলজ্বল করে উঠছিল। যেন তিনি নিজেই এখন সমুদ্রসমান কোনো অভিযানের ঢেউয়ের ডগায় উঠছেন—আবার ঢেউ গুঁড়িয়ে যেতেই নেমে যাচ্ছেন। উত্তেজনার চুড়োয় থাকতেই যেন বাদশা ভালোবাসেন।

—কাইমুর পাহাড় পেছনে ফেলে—পশ্চিমে মালবের মালভূমিকে রেখে দিনরাত কুচ করে আমরা তিনদিনে বেতোয়া নদীর এপারে চলে এসেছি।

—আপনি রয়েছেন বলেই সব সম্ভব হয়েছে আব্বা হুজুর।

—তোমাকেও একদিন এই হিন্দুস্থানকে মজবুত করে তোলার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ফৌজ, কামান, হাতির দঙ্গল—সব তোমার মগজে থাকবে। তুমি আগাম ছবিগুলি ভেবে নিয়ে আগামী দিনের হামলা সাজাবে শাহজাদা—

দারাশুকো এক দৃষ্টিতে হিন্দুস্হানের বাদশার চোখে তাকাবার চেষ্টা করলেন। কয়েক পলকের জন্যে ওই দুই চোখে চোখ রাখা যায়। দারার নিজের চোখ যেন ঝলসে গেল। তিনি তাঁর দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন। আব্বা হুজুর যেন যুদ্ধের দামামার কবি। লড়াইয়ে ওই দুই চোখ নাচে।

—তুমি হিন্দুস্হানের পহেলা শাহজাদা। তুমি একজন চাঘতাই মুঘল। তোমাদের শাহী কান্দাহার থেকে কামরূপ অব্দি একটানা দাঁড়িয়ে আছে। একদিন এই শাহী কাশ্মীর থেকে নেমে দক্ষিণে তাপ্তি, নর্মদা, গোদাবরী, কাবেরী ছাড়িয়ে যাবে—। সেদিন আর বেশিদূরে নয় শাহজাদা—

এবার ছেলেকে কিছু চাঙ্গা লাগলো শাহেনশা শাহজাহানের। তিনি স্নেহের মলম মাখানো হুকুম দিলেন, তোমার এবার আশমানের নিচে এসে দাঁড়ানো দরকার। বৃষ্টি নেই। আকাশেও তারা ফুটি ফুটি। এখন নজুমীর আসবেন। আশমানের তারা দেখে তিনি ফৌজি কুচের রাস্তা বাতলাবেন। বলে দেবেন হামলার সঠিক সুসময়—

শাহজাদা দারাশুকোর নিজের আব্বা হুজুরকে হিন্দুস্হানের বাদশা মনে হচ্ছিল না। তিনি যে সারা হিন্দুস্হানের তাবত ইনসানের জান, মাল, মানের জিম্মাদার—তাও মনে হচ্ছিল না। বরং তাঁর নিজের আব্বা হুজুরকে মনে হলো—লড়াই, সংঘর্ষ, জানবাজি হামলার শায়ের এই মানুষটি।

একরকম অনিচ্ছাতেই শাহজাদা দারাশুকো গুটি গুটি পায়ে বাদশার পেছন পেছন তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালেন। হিমের বাতাস ঝড়জলকে কোথায় তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। অন্ধকার আকাশ—ফুটো হয়ে তারা জেগে উঠছে। এমনকি জ্যোৎস্নার ফিকে আলোও এখানে ওখানে।

মাঝরাতের প্রায় এক প্রহর পরে দেখা গেল, গায়ে মাথায় মোটা সুফি পশমের টোগা চাপিয়ে তিনজন মানুষ বারবার আকাশে তাকাচ্ছেন। আবার বাতিদানের সামনে ফেলে রাখা কাগজে তাকিয়ে তার ওপর কী সব রেখা টানছেন ওঁদেরই একজন।

শাহী নজুমীর দারার খাঁ বড় জ্যোতিষী। তিনি আশমানে তাকালে তাঁর ছুঁচলো দাড়ি ঠাণ্ডা বাতাসে দু'ভাগ হয়ে ওড়ে। তিনি বললেন, এখন ওই রোহিণী তারাটি মেষ থেকে বৃষ হয়ে মিথুনের দিকে চলেছে। আশমানে চাঁদ থাকতে থাকতে খুব ভোরে রোহিণী যখন মিথুনকে পার হবার তোড়জোড় করবে—ঠিক তখন—এই অব্দি বলে দারার খাঁ হিন্দুস্হানের বাদশার মুখে তাকালেন।

বাদশা শাহজাহান কৃতজ্ঞ চোখে দুই হাতের মাঝের দু'টি করে আঙুলের ডগা নিজের দুই চোখে ছোঁয়ালেন। তারপর পাশেই দাঁড়ানো নিজের পয়লা শাহজাদার পিঠে বাঁ হাতখানি রাখলেন। রেখে বললেন, মিথুনকে পেরিয়ে যাবার পর রোহিণী কেমন ?

নজুমীর দারার খাঁ ওই অন্ধকার শীতের ভেতরেও মাথার ওপর থেকে সুফি টোগাটা খুলে ফেললেন। তারপর যেন ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়ে মগজটা চনমনে করে নিয়ে বললেন, তখন তো চাদ্দিকে আলো ফুটে যাবে আলা হুজরত—

—তবু ?

—তখন তো দিনের আলোয় রোহিণীকে আর দেখা যাবে না।

—তবু সময়টা তখন কেমন ?

শাহী কেতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এইসব নজুমীর, জ্যোতিষী, ইউনানি ছকদার ভালো করেই জানেন—হিন্দুস্থানের বাদশারা ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনোরকম দ্বিধা একদম পছন্দ করেন না। দারার খাঁ ধাঁ করে বলে দিলেন, সময়টা তখন বাদশার পক্ষে শুভ নয়—

ঘুমে শাহজাদা দারাশুকোর চোখ ভেঙে আসছিল। একসময় আব্বা হুজুর যখন দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশার মনসবদারদের তাড়া খেয়ে হিন্দুস্থানের একদিক থেকে আরেকদিকে বনজঙ্গল ভেঙে, নদীনালা পেরিয়ে আড়াল খুঁজছিলেন—আশ্রয় পেয়ে দম ফেলার সময় নিচ্ছিলেন তখনো শাহজাদা লড়াইয়ের এই শায়েরের সঙ্গী ছিলেন। তখন অবশ্য আজকের এই শাহজাদা নেহায়েত বালক—সুলতান দারাশুকো! তখন পাশে থাকতেন আম্মিজান। হাতির পিঠে গাদেলার ভেতর দাঁড়িয়ে নিশুতি রাতে কতদিন আশমানের চাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। দেখা হয়েছে গরমের বিকেলে দূর থেকে বিরাট প্রান্তরে পড়ে থাকা সুদূর সাতপুরা পাহাড়ের ছায়ার সঙ্গে, কানে এসেছে গিরনা নদীর জল ছলছল, আঙুরের থোকা ঠোকরানো ভীষণ সুখী সব কুচি পাখির ঝাঁকের কিঁচির মিচির।

আর আজ ? এই শীতের রাতে ?

ভৈ আর ঠেরা মিলে পাশাপাশি দাঁড়ানো দুই অসম হাতি—ফতে জং আর ফিল-ই-ফতের পিঠ আচ্ছা করে মুছে শুকনো করে ফেললো। বাবা আর ছেলে যে যার হাতিতে উঠে বসতেই বিশাল বিশাল চারপায়ে ওরা নর্মদার উঁচু তক্তাঘাটে গিয়ে দাঁড়ালো। অন্ধকারে এই ছবি দেখলে সাত হাজারি মনসবদার খানজাহান লোদির বুকের রক্ত হিম হয়ে যেতো।

দু'পাশের জঙ্গলের বিশাল বিশাল বেশ কিছু গাছ সাবাড় করে তবে ওই ভেলাগুলি তৈরি হয়েছে এই ক'দিনে। নর্মদাকে এখন দেখা যায়। বাদশা বা শাহজাদা—কেউই তাদের হাতি থেকে নামলেন না। ভেলা সযুত রাখতে তার দু'ধারে হালকা নৌকোয় ভীষণ ওজনে ভারি কাঠের লগি ঠেসান দিয়ে রাখা; পাছে হাতি নামতেই ভেলা দুলে ওঠে।

ওই শীতে—অমন অন্ধকারে—হাতি সমেত ভেলায় উঠতে উঠতে

শাহেনশা শাহজাহান বললেন, মনে রাখবে শাহজাদা আগ্রা তার ইজ্জত হাতে আজ দক্ষিণে এসেছে। হিন্দুস্থানের বাদশা কখনো তাঁর বাগী মনসবদারকে বরদাস্ত করেন না।

শাহজাদা দারা দেখছিলেন, তারার ভারে আশমান যেন এখুনি অন্ধকার নর্মদার বুকে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। আর সেই অন্ধকার আশমান থেকে কে যেন শুধু তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছে। শুধু তাঁকেই দেখে চলেছে। শাহজাদা চোখ খুলতেই দেখেন, কোথায় কে! কেউ নেই তো। অথচ চোখ নামালেই মনে হয়—এই বুঝি খুব মন দিয়ে কে তাঁকে দেখছে। কে সে? সে কে?

ভেলা ভেসে পড়েছে। দু'ধারের নৌকোয় নৌকোয় নৌবারার জবরদস্ত সব লশকর। ফতে-জং আর ফিল-ই-ফতের ভৈ মেঠ আর সারবান মিলিয়ে জনা বিশেক মানুষ দুই হাতির পায়ে পায়ে ভেলায় দাঁড়িয়ে।

বাদশা শাহজাহান ঠিক তখনই বললেন, মনে রাখবে—আমাদের কেউ সবসময় দেখছে—

অন্ধকারে তারা ভরা আশমানের নিচে নর্মদার বুকে ভাসতে ভাসতে ফতে-জংয়ের পিঠে বসা শাহজাদা দারাশুকো চমকে উঠলেন। হিন্দুস্থানের বাদশার গলায় যেন কোনো ফেরেস্তা ভর করেছেন। নয়তো আব্বা হুজুর তাঁর মনের কথা জানবেন কী করে?

দারা অন্ধকারে শাহজাহানের মুখে তাকালেন। সেই অন্ধকার জায়গায় দু'টি চোখ মাত্র জ্বল জ্বল করে উঠলো। ওই তাহলে আব্বা হুজুরের সেই বিখ্যাত দুই নীল চোখ। বাকি কিছুই দেখা যাচ্ছে না। নর্মদার বুকে ঠাণ্ডা হিম বাতাস। দারা চেঁচিয়ে উঠলেন, কে সে? সে কে?—আব্বা হুজুর?

—লড়াইয়ে হামলায় গলা খাটো করতেও শিখতে হয় শাহজাদা! বলা যায় না বাগী মনসবদার খানজাহান লোদি যদি নর্মদার তীরে নিশানদার কাসীদ পাঠিয়ে থাকে! তারা তো তোমার গলার আওয়াজ শুনেই গুলি চালাতে পারে—

শাহজাদা দারার কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। সে আবারও চেঁচিয়ে জানতে চাইলো, কে সে? সে কে?

—আস্তে দারা। আস্তে। অত চেঁচিয়ো না। তোমার আওয়াজ শুনে অন্ধকারের ভেতর থেকে দুশমনের কাসীদ লুকিয়ে থেকে থাকলে—তোমাকে তো পাবেই—হিন্দুস্থানের বাদশাকেও নিশানার ভেতর পেয়ে যাবে—

শাহজাদা দারা থতমত খেয়ে শান্ত হলেন। খুবই চাপা গলায় নিজের অস্থির দশা লুকিয়ে রেখে জানতে চাইলেন, আলা হজরত! সে কে?

—মনে রেখো কান্দাহার দুর্গ আজও আমাদের গলার কাঁটা। যদি কোনোদিন ওই পথে হিন্দুস্থানে হামলা হয় তো সবচেয়ে আগে কান্দাহার সুস্থির হওয়া দরকার—

দারা রীতিমত হতাশ হলেন। তিনি এতক্ষণ ভাবছিলেন—ওই অন্ধকার

আশমান তারার ভারে কী এক অজানা ব্যথায় যেন ভেঙে পড়তে চায়—আর সেই আশমান থেকেই কে যেন সর্বসময় তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। দুই চোখ ভরে তাঁকে সে দেখে। কে সে? তাকে বুঝি আব্বা হুজুর জানেন। হাজার হোক হিন্দুস্থানের বাদশা তো আব্বা হুজুর। তাগদের ফোয়ারা। মগজদার ইনসান। তাঁর জানার শেষ নেই। তিনি জানলেও জানতে পারেন। কিন্তু হায়! এ তিনি কী বলছেন!

শাহেনশা শাহজাহান তখন বলছিলেন, মনে রাখবে—কান্দাহার ইস্পাহানের সফাবি শাহীর কাছেও গলার কাঁটা। ওই পথেই হিন্দুস্থানের ফৌজ যদি ইস্পাহানে ঢুকে পড়ে—এই হলো গিয়ে সফাবিদের ভাবনা—

শাহজাদা দারাশুকোর কানে কিছুই যাচ্ছিল না। তিনি দেখছিলেন—আশমানে বড় মতো একটা তারা যেন বেশ বেগেই উত্তর থেকে দক্ষিণে চলেছে। ওটাই কি রোহিণী? তাহলে মিথুন কোথায়? পেরিয়ে যায়নি তো?

বাদশা শাহজাহান দেখলেন, নর্মদার এদিকটায় বেশ স্রোত। নেহাত হাতি আছে বলেই ভেলা তেমন দুলছে না। তিনি বেশ আবেগে বলতে থাকলেন, মনে রাখবে শাহজাদা—ইস্পাহানের সফাবি শাহ সব সময় আমাদের দেখছে—

কথাটা কানে যেতে শাহজাদা মনে মনে বললেন, আমি কী ভাবছিলাম! আর আব্বা হুজুর কী ভাবছেন! কোনো মিল নেই। বিসমিল্লা!

শাহেনশা শাহজাহান তখনো বলছিলেন, আমরা এমন কিছু করতে পারি না—আসলে আগ্রার পক্ষে এমন কিছু মানায় না যাতে কিনা ইস্পাহানের সফাবি শাহর হাসি পায়। ইস্পাহান আমাদের চালে ভুল হলে হাসবে—

শাহজাদা দারাশুকোর কিছুই কানে যাচ্ছিল না। নর্মদা তার নিজের মতোই বয়ে চলেছিল। বাদশার হাতি ফিল-ই-ফতে যখন এপারের ডাঙায় পা রাখলো—তখনো একদল রাজপুতের বড় এক রিসালা সবে ভেলায় উঠছে।

শাহেনশা শাহজাহান আশমানে তাকিয়ে রোহিণীকে খুঁজতে লাগলেন। এখনো নিশ্চয় মিথুনের কাছাকাছি পেঁছয়নি। এবার তিনি শাহজাদা দারাকে নিয়ে তুর্কি, ইউসুফজাই, জংলী—নানান জাতের সেপাইয়ের দঙ্গল তাড়াতাড়ি পেরিয়ে তোপখানার মীর আতশের দিকে এগোতে লাগলেন। নর্মদার এপাশেই দক্ষিণের নসিব ঠিক হবে। খানজাহান লোদি যেন কোমরবন্ধ বাঁধার সময়টুকুও না পায়।

শীত কাটিয়ে আগ্রা বসন্তের মুখোমুখি হয়—ঠিক এই সময়টায় যখন দেখা যায় যমুনার চর নানা রঙের ফুলের চাষে রঙিন হয়ে উঠেছে—আর দুর্গের হায়াত বকসু বাগ, আঙুরি বাগ, মহতাব বাগ মৌমাছির গুনগুনানিতে সুরেলা হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে মহতাব বাগের সব ফুলই সাদা। কেন না রাতে আগ্রার আশমানে চাঁদ উঠলে মহতাব বাগ অন্য চেহারা পায়।

শীতের পর এমন সুন্দর হেসে ওঠা আগ্রাকে পেছনে ফেলে আট আটটি ঘোড়ায় টানা শাহী গাড়ি এইমাত্র আকবর বাদশার পোড়ো রাজধানী ফতেপুর সিক্রি বুলন্দ দরওয়াজা পেরিয়ে নহবতখানার দিকে মোড় নিলো। গাড়িতে

বসে শাহজাদী জাহানারা। গাড়ির দু'পাশে সমান তালে ছুটছে আটজন করে তুর্কি ঘোড়সওয়ার। সময়টা বিকেল। আজকাল বড় তাড়াতাড়ি চাঁদ আশমানে এসে পড়ে। দিন থাকতেই প্রথমে ফিকে গোলমত জলছাপ। তারপর তা স্পষ্ট হলুদ হয়ে ওঠে সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে। রাজধানী থেকে দু-মঞ্জেল রাস্তা যেন পলকে পার হয়ে এলো শাহজাদীর গাড়ি। ইবাদতখানার সামনে এসে জাহানারা ঘেরা পর্দার বাইরে হাত বাড়িয়ে সামান্য তুললেন। ছুটন্ত গাড়ি খানিক এগিয়ে অনেক কষ্টে থামলো। কালো রঙের পেছল দাবনা থির থির করে কাঁপিয়ে ঘোড়ারা নিজেদের সংযত, নিশ্চল করে ফেললো।

শাহজাদীর মাথা থেকে পা অব্দি ঢাকা। চটির ডগা দেখা যায় কি যায় না। দু'জন ঘোড়সওয়ার মুহূর্তে ঘোড়া থেকে নেমে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে সামান্য ঝুঁকলো—তারপর শাহজাদীর সঙ্গী হওয়ার অনুমতি চাইলো।

বাঁ হাতে তাদের নিষেধ করে খুব তাড়াতাড়ি শাহজাদী ইবাদতখানার খোলা চত্বর পেরিয়ে পাথরে খোদাই গৌতম বুদ্ধের সামনে এসে দাঁড়ালেন। এবার মুখের ওড়না সরাতে জাহানারাকে পুরোপুরি দেখা গেল। বিশাল দুই ঘন কালো চোখ। কিন্তু মাথার চুল কিছু লাগেচে। গালের ঝিক সামান্য উঁচু হওয়ায় সেই দুই চোখ খুলেছে। তিনি চাপা অথচ তীক্ষ্ণ গলায় ডাকলেন, দারা—শাহজাদা দারা—

প্রতিধ্বনি ফিরে এলো। অন্য কোনো সাড়া নেই।

শাহজাদী জাহানারা ফের ডাকলেন, শাহজাদা দারা—তুমি কোথায়—?

এবারও কোনো সাড়া নেই। শাহজাদী জাহানারা প্রায় দৌড়ে দৌড়ে এক চত্বর থেকে আরেক চত্বরে তাঁর ভাইকে খুঁজতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতেই তিনি গুন গুন করে গাইছিলেন। সাদির রুবায়-ই। লাল খাঁয়ের সুরে বসানো। সব কথা ধরা যায় না। আভিরীতে বসানো কথাগুলোর শেষটা অনেকটা এরকম—

আজ খবাব ও দেওয়ানা—আ—আ শবদ্

সেই কলিটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতে গাইতে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লেন শাহজাদী জাহানারা। মাত্র ক'দিন হলো তাঁর ষোলো পূর্ণ হয়েছে। কালো চোখের ওপর সরু দুই ভ্রু কখনো জাহানারার ভেতরকার ভাবনার সঙ্গী হয়ে কুঁচকে যাচ্ছে—আবার ছাই ছাই পাথুরে দেওয়ালে বেয়ে ওঠা অযত্নের লতাপাতা দেখেও কুঁচকে যাচ্ছিল।

সারা হিন্দুস্থানের নানান্ পাহাড়ের পাথর কাটাই হয়ে এই ফতেপুর সিক্রি—তার নহবতখানা, ইবাদতখানা, দেওয়ানি আম—সব কিছু গড়া হয়েছিল। সবই আজ পোড়ো। তার ভেতর একমাত্র জিন্দা ইনসান শাহজাদী জাহানারা। তিনি যেখান থেকে যাচ্ছেন—সেখানেই যেন পাথরে পাথরে প্রাণ, রূপ, সৌরভ নেচে উঠছে।

শাহজাদী একা একাই বলে উঠলেন, দারা! আজ তোমায় একটা কথা বলতে এসেছিলাম—

তাঁর কথা শেষ না হতেই পাথরের খোলা চত্বরে একটা বুড়ো দোয়েল এসে বসলো। সেদিকে তাকিয়ে জাহানারা বললেন, ছোটে ভাই। তুমি এখানে একা একা চলে আসো তা আমি জানি। জেনেই আমি এখানে এসেছিলাম। এখানেই শুধু এখানেই তোমাকে আমার সেকথা বলতে পারতাম—

এরপর দেখা গেল ইবাদতখানার গৌতমী দেওয়ালের কুলুঙ্গির দিকে চোখ পড়েছে শাহজাদীর। সেখানে দেওয়াল জোড়া ধ্যানী গৌতম বুদ্ধের বাঁ দিকে পাথর কুঁদে তৈরি বিশাল এক পদ্ম। পদ্মের পাশেই কুলুঙ্গি। একটু সিঁড়ি ভেঙে সেখানে পৌঁছে গেলেন জাহানারা। যা ভেবেছিলেন তিনি, ঠিক তাই।

এখানেই কাছাকাছি শাহজাদা দারা ছিলেন। হয়তো আজই সকালের দিকে দারা এসেছিলেন এখানে।

কুলুঙ্গিতে চামড়ার খাপে একখানি কারাদ ছুরি। দেখে মনে মনে শাহজাদী বললেন, এ ছুরি ছোটে ভাইয়ের! একটু হাসলেন শাহজাদী। বড় অন্যমনস্ক। পাশেই পড়ে রয়েছে ছোটমত একটি বীণা। এই বীণাও জাহানারা চেনেন। এবার কিছু বললেন না তিনি। শুধু হাসলেন। একা একা। তারপর ছুরি আর বীণা নিজের বোরখার ভেতর তুলে নিলেন।

॥ চৌত্রিশ ॥

গজনির সুলতান মামুদ হিন্দুস্থানে যে রক্তধারা বইয়েছিলেন তার চিহ্ন আজও দেশ থেকে মুছে যায়নি ··

আগ্রা দুর্গের ভেতরে শাহজাদাদের পড়াশুনোর মক্তবের লাগোয়া বিশাল ঘরে বসে শাহজাদা দারাশুকো আনসারির লেখা গজনির সুলতান মামুদের হিন্দুস্থান অভিযানের কাব্য পড়ছিলেন। মনে মনে হিসেব করে দেখলেন, এখন থেকে প্রায় ছ'শো তিরিশ বছর আগের কথা। সেই অভিযানের দরুন আজও হিন্দুস্থানের গায়ে খুনের দাগ। হিন্দুস্থানের আশমান আজও লাল মেঘে ঢাকা।

মক্তবে আবদুল রসিদ দৈলেমিসাহেব তাঁকে সিকস্তা লিপিতে তালিম দিতেন। সেই জন্যই আজ শাহজাদার ফারসি হাতের লেখা এত ভালো। ঠিক ছবির মতো। দৈলেমিসাহেব পুরনো জিনিস খুঁজে খুঁজে পড়তে ভালোবাসতেন। তিনিই শাহজাদা দারাকে নিয়ে একবার এক শীতের দুপুরে ফতেপুর সিক্রিতে যান। কার কাছে যেন তিনি শুনেছিলেন—ওই পোড়ো রাজধানীতে আকবর বাদশার যোগাড় করা দামি দামি পুঁথিপত্র তখনো কিছু পড়ে আছে। হিন্দুস্থানে কে আর ওসবের খোঁজ রাখে—কদরই বা কে করে! সব নাকি খোয়া যায়নি।

সেখানেই অন্যসব পুঁথিপত্রের সঙ্গে আনসারির কাব্যখানি পাওয়া যায়। আর যা-কিছু সেদিন পাওয়া গিয়েছিল—সবই এখন আগ্রা দুর্গে শাহজাদাদের মক্তবের পাশে এই বিশাল ঘরে ঝাড়াই-বাছাই করে খোদ আবদুল রসিদ

দৈলেমিসাহেব গুছিয়ে রেখেছেন। এখানে বিরাট জানলার পাশে বসে এক একখানি পুঁথি আনিয়ে পড়তে পড়তে এক একটা দুপুর কোথা থেকে কেটে যায় শাহজাদা দারাশুকোর। নিচে তাকিয়ে দেখেন—যমুনার জলে আগ্রার বিখ্যাত সন্ধ্যা কখন নেমে এসেছে।

দৈলেমিসাহেবের সঙ্গে সেদিন দুপুরে ফতেপুর সিক্রিতে গিয়ে দারা দেখেছিলেন—দেওয়ানি খাস ছাড়িয়ে মোহর কাটাই ঘর। তারপর আকবরাবাদ প্রাসাদ। ইবাদতখানা। শেষে একশোর ওপর যন্ত্রশালা। সেখানে শতরঞ্জের জন্যে রেশমের ওপর সোনারুপোর সুতোয় ঝালর তৈরি হতো। ভারি সুন্দর লিপিতে বই লেখা হতো ওখানে। আকবার বাদশাকে না-দেখিয়ে কোনো বইতে ছবি আঁকা হতো না।

তারপরেই বাদশার পুঁথিপত্র, বইয়ের সংগ্রহ। দৈলেমিসাহেব তো অমন পোড়ো জায়গায় সুন্দর কারুকাজ করা পাণ্ডুলিপি তৈমুরের জিন্দানামা বা মালফুজাত-ই-তৈমুরা দেখে অবাক। শাহজাদা দারাশুকো শুনেছেন, ওসব আকবর বাদশা ইস্পাহান থেকে হিন্দুস্থানে নিয়ে আসেন। হিন্দুস্হান তো বটেই—ইস্পাহান, আরব, গ্রিস, প্যালেস্টাইনের নানান জায়গা থেকে আকবর বাদশা কবিতা আর দর্শনের নানান পুঁথি সংগ্রহ করে এনে ওখানে রেখেছিলেন। সেসব দেখতে দেখতে দৈলেমিসাহেবের চোখ বড় বড় হয়ে যাচ্ছিল। দেখতে দেখতে তিনি বলেছিলেন, এত পুঁথি আকবর বাদশার আগে কোনো বাদশা সংগ্রহ করতে পারেননি। পরেও কোনো বাদশা পারবেন না! ওর ভেতর তৈমুরের জীবনী ও বিধান—জিন্দানামা-ই-তৈমুর কিংবা মালফুজাত-ই-তৈমুরা—পাতায় পাতায় কী সুন্দর কারুকাজ—পরদাদাসাহেব আকবর বাদশার পুঁথি বলেই শাহজাদা দারাশুকো তা নিজের জন্যে আলাদা করে রেখেছেন।

দৈলেমিসাহেব তো দারাকে আদর করে বলতেনই ছোটে আকবর! এই আপনার পড়াশুনোর ঘর শাহজাদা। এখানে বসে পড়তে পড়তে এমন সুন্দর দুই চোখ যখন ভারি হয়ে আসবে—তখন জানলা দিয়ে যমুনার বুকে তাকাবেন,—

এখন বসন্তের পড়ন্ত বেলা। পড়তে পড়তে চোখ সত্যিই ভারি হয়ে এসেছিল। যমুনার বুক থেকে চোখ সরিয়ে আবার আনসারিতে নামিয়ে আনলেন শাহজাদা দারাশুকো। আনসারি লিখেছেন—কনৌজ, মথুরা তো বটেই—সুলতান মামুদ গঙ্গার তীরে থানেশ্বরের সুন্দর বসতিগুলো ধ্বংস করেছিলেন—কারণ সেগুলো ছিল হিন্দুর তীর্থক্ষেত্র। তিনি দেবমূর্তিগুলো গজনিতে ঢোকার পথের ধুলোয় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন—কারণ, দেবতা ছিল হিন্দুস্হানের শৌর্যের প্রতীক।…বিস্তৃত ভূমিতে দুশমনের খুন আরও কতকাল বয়ে যাবে! যে মা ভয়ে আওলাদের খুনে রাঙা জং-কি-ময়দান দেখেছেন—তিনি ফের মা হতে রাজি হবেন না। আজও গজনিতে উটের পায়ের রেখা খুনে রাঙানো, গজনিবাসীর তরবারিও খুনে রাঙানো।

বুজুর্গরা চিন্তিত, মেয়েরা কাঁদছে—কে আমাদের বাঁচাবে? ইনসানের দিলের ভেতর বসে আছে জঙ্গলের খতরনক্ শের।

শাহজাদা দারাশুকো পড়তে পড়তে চোখ বুজে ফেললেন। তাঁর সামনে সবুজ তরমুজ, সোনালি আঙুর পড়ে আছে। পড়ে আছে শুকনো খেজুর, খোবানি, রসে টসটসে পিচ আর বাদাম। কিছুই ছুঁয়ে দেখা হয়নি শাহজাদার।

ঠিক এমন সময় সেখানে এসে ঢুকলেন শাহজাদী জাহানারা। ঢুকেই দারাশুকোকে এভাবে চোখ বুজে বসে থাকতে দেখে কাছে এগিয়ে এলেন জাহানারা।—কী পড়ছো ছোটে ভাই?

এই কণ্ঠস্বর বড় প্রিয় শাহজাদার। দু'জনে পিঠোপিঠি ভাইবোন। দারা চোখ খুললেন। বাজি! এখন এলে?

—এই তো। এইমাত্র। কী পড়ছিলে?

—বাজি। তুমি আনসারি আগেই পড়েছো। সুলতান মামুদ সোমনাথের মন্দির থেকেই দু'কোটি টাকা লুঠ করেছিল।

জাহানারা স্থির হয়ে ভাইয়ের চোখে তাকালেন। আম্মিজানের মতোই কালো জোড়া ভ্রূ পেয়েছে দারা।

—আলবিরুনির মতো বুজুরকু সুলতান মামুদের গজনিতে তিষ্ঠোতে পারলেন না। তিনি হিন্দুস্থানে চলে এসেছিলেন বাজি। এদেশে এসে লিখলেন তহকীক্-ই-হিন্দ। সে সময়কার হিন্দুদের কথা বলতে গিয়ে আলবিরুনি বারবার ভগবদ্গীতার কথা বলেছেন। বাজি!

—উঁ—

তুমি প্রায়ই নল-দময়ন্তীর গল্পটা বলে থাকো। তুমি নিশ্চয়ই ভগবদ্গীতা পড়েছো—

—না ভাইয়া। আলবিরুনি গজনিতে তিষ্ঠোতে না পেরে হিন্দুস্থানে চলে এসেছিলেন। আমার বুজুরকু ছোটেভাই দক্ষিণে খান্দেশে তিষ্ঠোতে না পেরে আগ্রায় ফিরে এলো!

—ওই লড়াই আমার ভালো লাগে না বাজি—আব্বা হুজুরের হুকুমে বলিন্ত থেকে পাথরের গোলা ছোঁড়া হচ্ছে অবিরাম। বাগী মনসবদার খানজাহান লোদির বন্দুকচী, ঘোড়সওয়ারদের ভেতর সে গোলা গিয়ে পড়তেই ইনসান, জানোয়ার দুইই মরণযন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠছে—আমি আর থাকতে পারিনি খান্দেশে—থাকতে পারিনি দৌলতাবাদে।

—তা চলবে কেন ভাই! তুমি বাদশা শাহজাহানের পয়লা শাহজাদা। তোমাকে তো জং-কি ময়দানের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। এই করেই তো মুঘল শাহী শও সন পার করে দিলো। তৈমুর বলতেন—

—তৈমুর অনেক কথাই বলেছেন। কে মেনেছে বাজি! আজ থেকে দু'শো তিরিশ বছর আগে তৈমুর দিল্লি অব্দি এসে ফিরে যান। সুলতান মামুদের ঠিক চারশো বছর পরে তিনি এই অভিযান করেন। তৈমুর খোয়াব দেখতেন—দুনিয়া জুড়ে মুঘল শাহী চালাবে তাঁরই বংশধরেরা। তাই সমরখন্দের সবচেয়ে

সুন্দর কানিবুল বাগে নিজে দাঁড়িয়ে মহা ধুমধামে ছয় নাতির একই সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। বুঝলে বাজি—মালফুজাত-ই-তৈমুরায় তিনি বলছেন—আমার স্বার্থে আমি আমার রিস্তেদারি বা দানধ্যানের সম্মান নষ্ট করিনি। রিস্তেদারদের খতম বা কয়েদ করার হুকুম দিইনি।

শাহজাদী জাহানারা অবাক হয়ে দারাশুকোর মুখ দেখছিলেন। এ কোন দারা ? কত পালটে গেছে ভাইয়া। সত্যি সত্যিই বুজুরকু হয়ে উঠেছে দারা। এত অল্পবয়সে এত পড়াশুনো ? যেন অনেককিছু দেখতে পায় ভাইয়া। সেই দেখার আলো চোখেমুখে ফুটে উঠেছে।

—তৈমুরের এ-বিধান কোন মুঘল মেনেছি বাজি ! একটা বিরাট গাছ তৈমুর থেকে গড়ে উঠেছে। তার শাখা-প্রশাখা কি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ?

—ওমা ! ওকথা বলছো কেন ভাইয়া ?

—সেই প্রকাণ্ড গাছটি কি দুনিয়ার বুক থেকে মুছে যাবে? তার ফলগুলো কি নিষ্ফলা হয়ে যাবে বাজি ? এজন্যেই কি বাবর বাদশা হিন্দুস্থানে এসেছিলেন ?

তখন তখনই শাহজাদী জাহানারা কিছু বলতে পারলেন না।

শাহজাদা দারাশুকো তখন বলে চলেছেন, তৈমুরের রাজ্য ফরঘনা থেকে পালিয়ে এসে বাবর তখনকার হিন্দুস্থানের বাদশা ইব্রাহিম লোদিকে হারিয়ে দিয়ে বাদশা হলেন। হেরে যেতে যেতে বাবর তাঁর সোনারুপোর কাজ করা সুরাপাত্র ছুঁড়ে ফেলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আর সুরা ছোঁবো না। তুজুক-ই-বাবরিতে আছে—অমনি তাঁর হতাশ হয়ে পড়া মাত্র তিনশোর মতো ঘোড়সওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিল, আমরাও আর সুরা ছোঁবো না। নতুন জেদে তাদের বুক ভরে উঠলো। কোরান ছুঁয়ে তারা বললো, জয় নয়তো মৃত্যু। আল্লা হু আকবর বলে তারা বিরাট রাজপুত ফৌজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। বাবর বাদশা জয়ী হলেন। কিন্তু এই জন্যে ?

শাহজাদী জাহানারা ঠিক বুঝতে পারলেন না তাঁর ছোটে ভাই শাহজাদা দারাকে। বললেন, কী জন্যে ?

তৈমুর বলেছিলেন, আমার রিস্তেদারদের খতম বা কয়েদ করার হুকুম দেবো না। কে মেনেছে সে কথা বাজি ? কে মেনেছে ? পরদাদাসাহেব আকবর বাদশার অনুরোধে বাবরের মেয়ে গুলবদন তাঁর ভাই বাদশা হুমায়ুনের জীবনী লিখেছেন।—হুমায়ুননামা। ওই তো রয়েছে—পড়ে দেখো—

বাবর বাদশা চেয়েছিলেন হুমায়ুন মসনদে বসুন। তা তৈমুরের বিধান মেনে সে কথা কি বাবর বাদশার অন্য ছেলেরা শুনেছিলেন ? আকবর বাদশা চেয়েছিলেন শাহজাদা সেলিম মসনদে বসুন। সেখানেও কি তৈমুরের বিধান নিয়ে টালবাহনা হয়নি বাজি ? আকবর বাদশার আমীর ওমরাহরা বেঁকে বসেননি ? সেলিম বাদশা জাহাঙ্গীর হতেই শাহজাদা খসরুকে অন্ধ হতে হয়নি !

শাহজাদী জাহানারা তাঁরা ভাইয়ার চোখে আর তাকাতে পারছিলেন না।

তিনি চোখ সরিয়ে যমুনার বুকে তাকালেন। সেখানে এখন অন্ধকার। চর জায়গা ঝুপড়ি ঝুগ্গিগির ঘর গেরস্থালিতে এখানে ওখানে চর্বি জ্বালানো আলোর শিখা। এতদূর—এত উঁচু থেকে সে শিখার আশপাশের মানুষকে চেনা বা বোঝা যায় না। বরং তাদের অশরীরী ভাবতেই ভালো লাগে। সে ভাবনায় ভয় আছে। আছে রোমাঞ্চ। কোথায় যমুনার বুকে অন্ধকারে বুনো বাতাস! আর কোথায় বা আগ্রা দুর্গের আলো জ্বালা পাথর পালিশ নিরাপদ আরামের ঘর! অবশ্য অন্ধকার সব জায়গায় যেখানে যেমন পারে—যতটা পারে সারা চরাচরে নির্বিচারে ঢুকে যাচ্ছিল।

শাহজাদী জাহানারা বললেন, জানি ভাই! হুমায়ুনের সঙ্গে তাঁর ভাইদের—কামরান, আসকারি, হিন্দালের যুদ্ধ হয়েছিল। কামরান সবাইকে বিশ্বাস করিয়েছিলেন—তিনি স্বয়ং দরবেশ। হুমায়ুনকে হটিয়ে তিনি মসনদে বসতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেননি। বাদশা হুমায়ুন কামরানের চোখ উপড়ে নেন—কারণ, কামরান চাঘ্তাই মুঘলকে খুন করেন। শিশু আকবরকে চুরি করলেও মির্জা আসকারি ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি আকবরকে ভালোবেসে নিজের কাছে রেখেছিলেন। আর মির্জা হিন্দাল তো বাদশা হুমায়ুনের জন্যে জানটাই দিলেন।

বলতে বলতে জাহানারা থেমে পড়লেন। হিন্দুস্থানের ইতিহাস, হিন্দুস্থানের নসিব—সবই স্রেফ লড়াইয়ের কাহিনী। যেন বা বিশ্বাসঘাতকতার পুরাণ। একবার তো কামরান শিশু আকবরকে চুরি করে নিয়ে জ্বলন্ত কাবুল শহরের মুখে বসিয়ে দিয়ে হুমায়ুনকে বলে পাঠিয়েছিলেন, তোপ দাগা বন্ধ করো—নয়তো ছেলেকে হারাতে হবে।

আবার শাহজাদা দারাশুকোর গলা গম গম করে উঠলো। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে যমুনার দিককার বিশাল খোলা ঢাকা পথের সামনে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখোমুখি যমুনা। অন্ধকারে ঢাকা যেন বা কোনো জ্বালামুখী থেকে কথাগুলো একটানা বেরিয়ে আসতে লাগলো।

…আকবর বাদশার আমলে মনীষী বললে শেখ মুবারককে বাদ দেবার উপায় নেই। তাঁর বড় ছেলে ফৈজি বাদশার সভাকবি। আর ছোট ছেলে আবুল ফজল হিন্দুস্থানের উজিরে আজম—পাঁচ হাজারি মনসবদার। শাহজাদা সেলিম তাঁকে সহ্য করতে পারতেন না। আবুল ফজল দক্ষিণে জয়ী হয়ে আগ্রায় ফিরছেন। গোয়ালিয়রের কাছে নারোয়ার জঙ্গলের খানিক দূরে শাহজাদা সেলিম ফাঁদ পাতলেন। বুন্দেলার রাজা বীর সিংহ তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আবুল ফজলের কাটামুণ্ডু সেলিমকে উপহার পাঠালেন। আকবর বাদশা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, সেলিম যদি বাদশা হতেই চায় তো আবুল ফজলকে না মেরে আমায় খুন করলো না কেন?

…জাহাঙ্গীর হবার আগে সেলিম ওখানেই থেমে থাকেননি! বুঝলে বাজি! তুমিও জানো—আমিও জানি—আকবর বাদশা বেঁচে থাকতেই সেলিম এই আগ্রা দুর্গে ফৌজ নিয়ে ঢুকতে চেষ্টা করেননি? এলাহাবাদে ফিরে গিয়ে

নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন।

আকবর বাদশা লিখে পাঠালেন ঃ তুমি যদি বশে থাকো তাহলে তোমাকে চিরদিন যেমন ভালোবেসেছি—তেমনি ভালোবাসবো।

বাগী জেনেও সেলিমকে আকবর ক্ষমা করলেন। আর আমাদের আব্বাহুজুর! শাহজাদা খুর্রম তো খোলাখুলিই বাগী হলেন। তাঁকে শায়েস্তা করতে করতেই বাদশা জাহাঙ্গীরের সময় ফুরিয়ে গেল! সঙ্গে সঙ্গে সব ল্যাঠা চুকে গেল। কিন্তু বাজি, তুমি কি বলতে পারো?

· কোন সে অসুখ যাতে কিনা এক রাতের ভেতরেই শাহজাদা খসরুর এন্তেকাল হয়?

···শাহজাদা শারিয়ার কোথায় গেলেন? কেউ কি আর তাঁকে দেখতে পেয়েছে?

···কোথায় উবে গেলেন সুলতান দাওয়ার বক্স? তাঁকে আর দেখেছো তুমি? আমার এসব হিসেব কে মিলিয়ে দেবে? কে দেবে?

শাহজাদা দারাশুকোর গলা বুজে গেল। তিনি খোলা অলিন্দ দিয়ে নিচে তাকালেন। যমুনার তীর ধরে প্রায়ই আলাদা একটা বাজার বসে। রাজধানী আগ্রার শাহী চকগুলো পাকা বনেদি ব্যাপারীদের দখলে। সেখানে ছোটখাটো ব্যাপারীর জায়গা পাওয়া কঠিন। কিছুকাল ধরে সন্ধে সন্ধে গরমের দিনে আলো জেবলে কামার কুমোর চাষীরা যে-যার জিনিস নিয়ে এসে বসছে। খদ্দেরের তো অভাব নেই। রাজধানীতেই ছ'লাখ লোক থাকে। তাছাড়া কাজেকর্মে বাইরে থেকে আরও লাখখানেক লোক রোজ আসে। তারাও ঘরে ফেরার সময় এই সন্ধে বাজার থেকে কেনাকাটা করে। জিনিসপত্তরও নাকি খাস আগ্রার দরের চেয়ে কিছুটা সস্তা ওখানে।

ওপর থেকে দারা দেখলেন—চারদিক অন্ধকার—শুধু সন্ধে বাজারের কয়েকজন ব্যাপারীর জেবলে নেওয়া মশালের আলোর ঘাগরার ঘূর্ণী তুলে একটা মেয়ে নাচছে—হ্যাঁ, মেয়েই মনে হলো দারার। অনেক উঁচু থেকে শাহজাদা দেখলেন যেন, ঘাগরা পরানো একটা লম্বা কাঠি ঘুরে ঘুরে নাচছে। এত উঁচুতে সবকিছু কানে পেঁছয় না। বোঝাই যায়—নিচে মানুষজন সেই নাচের তালে তালি বাজাচ্ছে। একসঙ্গে অনেকে। আর সেই তালে কাঠিটা ঘুরছে।

শাহজাদী জাহানারা পাশে এসে দাঁড়ালেন। দারা বললেন, একটা মেয়ে। তাই না?

জাহানারা সেদিক থেকে চোখ না সরিয়ে বললেন, হ্যাঁ। মেয়ে। আমার হাজিরা কোয়েল সেদিন বলছিল, ওর নাম রানাদিল। বেশ নাকি নাচে। মেয়েটা নাকি রাজধানীর বাজারে—ব্যাপারীদের পটিতে পটিতেও নেচে বেড়ায়—।

—শুধু নাচলে কি পেট ভরে!

—নেচেই হয়তো খানা জোটায় ভাইয়া।

—হবে।

এবার জাহানারা বললেন, রাজধানীর কোতোয়াল কি জেগে ঘুমোয়?

একদম রাজধানীর বুকে বসে খুলি ময়দানে মাইফেল ? এদের কয়েদ করলে পারে।

শাহজাদা দারা হেসে ফেললেন। তা তুমি বলতে পারো বাজি !

—কেন ? কেন ভাইয়া ?

—বাদশা শাহজাহানের পাঞ্জা, মোহর তোমারই কাছে থাকে। সুরাট বন্দরের শুল্ক তোমার তাম্বুল খরচার জন্যে বাদশা বেঁধে দিয়েছেন। ইস্পাহান, ইংলিশস্তানের ইলচিরা এলে ওই আগ্রা দুর্গের বুলন্দ দরওয়াজায় দাঁড়িয়ে তুমি তাঁদের দেওয়ানি খাসে নিয়ে যাও। উমর কয়েদ ! ফাঁসি ! এসব কথা তোমার মুখেই সাজে !

—আহা ! হিন্দুস্থানে কে না জানে বাদশা শাহজাহানের চোখের মণি—ভাই তুমি—শুধু তুমিই শাহজাদা দারাশুকো। ভালো কথা। তোমার কিছু হারিয়েছে ?

দারা অবাক হয়ে তাকালেন। মনে করার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, কই ? কিছু মনে পড়ছে না তো।

জাহানারা কোমরের রেশমি বন্ধনীর ভেতর থেকে খস্ করে কারাদ ছুরি-খানা বের করে বললেন, এটা কার ?

—কোথায় পেলে বাজি ?

—যেখানে পাবার ! ফতেপুর সিক্রিতে। পোড়ো ইবাদতখানায়। বীণা ফেলে এসেছিলে। সেটা তোমার মহলে পাঠিয়ে দিয়েছি।

দাবা চুপ করে ছিলেন। জাহানারা বললেন, বীণা না হয় বুঝলাম। নির্জনে একা একা বাজাচ্ছিলে। কিন্তু ছুরি কেন ভাই ?

শাহজাদা কোনো কথা বললেন না।

শাহজাদী বললেন, কী রাগ বাজাচ্ছিলে জানতে ইচ্ছে করে।

চোখের পলক না ফেলে শাহজাদা বললেন, হমীর নট—

—সে তো সকালে বাজায়। তাই না ?

—হ্যাঁ।

—অত সকালে ছুরি সঙ্গে ছিল কেন ভাই ?

এবারও চোখের পলক না ফেলে শাহজাদা বললেন, খুদকুশি করবো ভেবেছিলাম—

—কেন—ও ? বলে চেঁচিয়ে উঠে নিজের ছোটভাইয়ের একেবারে কাছে চলে এলেন শাহজাদী। কী হয়েছে দারা ? তোমার সামনে এত সুন্দর জীবন। শাহী জমানায় তুমিই পয়লা শাহজাদা। আত্মঘাতী হবার ইচ্ছা কেন ভাই ?

—এ জীবন দিয়ে কী হবে বাজি ? কেন এ জীবন ? মালফুজাত-ই-তৈমুরা পড়ে দেখো। পড়ে দেখো গজনির সুলতান মামুদকে নিয়ে আনসারির কাব্য। সবই ঘোড়সওয়ার, তলোয়ার, খুনের ইতিহাস। প্রাণ বাঁচাতে ইনসান জানোয়ার একসঙ্গে ছুটছে। আমরা কি এজন্যে দুনিয়ায় এসেছি ? এক এক সময় মনে হয় এই জগদ্দল আগ্রা দুর্গ হিন্দুস্থানের বুকের ওপর চেপে বসে আছে। এ

জীবন জীবন নয়। বরং এ জীবনের ওপারে যে জীবন সেটাই আসল! সেখানেই চলে যাবো বাজি—

জাহানারা আরও এগিয়ে এসে দারার মাথার হাত বুলিয়ে দিলেন। দিয়ে বললেন, কাল তুমি আর আমি একসঙ্গে যমুনার চরে বেড়াতে যাবো ভাই। বীণা সঙ্গে নিও। আমায় হম্বীর নট বাজিয়ে শোনাবে—

—আমি যাবো না।

—তুমি তোমার বাজিকে ভালোবাসো না?

দারার চোখ ছল ছল করে উঠলো।

—জানো ভাই, তোমায় একটা কথা বলতে এসেছিলাম আজ—

দারা বুক শক্ত করে দাঁড়ালো। কী কথা? কী কথা বাজি?

শাহজাদী বাইরের আশমানে তাকালেন। তারা ফুটি ফুটি। সূর্য ডুবেছে অনেকক্ষণ। বাতাস মৃদুগতি। তাতে আঙুরিবাগের ফুলের সুবাস। দেওয়ানি আমের দিক থেকে করতাল, বাঁশির সুর খানিক আগে থেমেছে। সন্ধ্যার আকাশে এখনো যেন তা ভাসছে।

জাহানারা যেন নিজের ভেতরে তলিয়ে গিয়ে বললেন, আমি দুলেরার নাম দিয়েছি 'রাজা'!

দারা চমকে উঠলেন। মনে মনে বললেন, তিনি তো শাদিশুদা মানুষ। তারপর শান্ত গলায় বললেন, বাজি—তুমি আব্বা হুজুরের খুব বিশ্বস্ত রাজপুত সামন্ত বুন্দীরাজ ছত্রশালের কথা বলছো?

সন্ধ্যার অন্ধকারে সারা রাজধানীর আলোর রেণু বাতাসে উড়ে এসে যেন দুর্গের গায়ে জন্মানো আগাছা লতার জীর্ণ পাতার শিয়রে সোনার মুকুট পরিয়ে দিচ্ছিল।

নিজের ভেতরে তাকিয়েই জাহানারা বলতে লাগলেন, যেদিন দেওয়ানি আমের দরবারে আমার রাজা প্রথম বাদশা শাহজাহানকে কুর্নিশ করছিলেন—সেদিন আমার বয়স আরও এক বছর কম ছিল। চোখের সামনে দিয়ে ঘোড়সওয়ারের দল চলে গেল। বাঁশির সুর, করতালের ধ্বনি শান্ত। চারদিক নিস্তব্ধ। আমি মহলের ঝরোখার পাশে দাঁড়িয়ে আছি। ওই আমার 'রাজা' ধীর পায়ে মসনদের দিকে এগিয়ে চলেছেন। আমার মনে হচ্ছিল—আমার শরীরে রক্তের স্রোত থেমে গেছে। এ কি নিষাদরাজ নল? রাজা নল কি আবার ধুলো ময়লার এই দুনিয়ায় ফিরে এসেছেন? তাঁর চোখে জ্যোতি—তাতে দূরের কোনো খোয়াব মিহি করে মাখানো। তাঁর শরীরে ক্ষত্রিয় বীরের মর্যাদা লেগে আছে।

যে মুহূর্তে চারণ তার বীণার সুরে মৃত্যুর গানের ঝঙ্কার তোলে—রাজপুত অমনি তার কালো ঘোড়াকে যুদ্ধের জন্যে এগিয়ে আনে। দময়ন্তী যেমন একদিন দেবতাদের ছেড়ে নলকে বরণ করেছিলেন—আমিও আমার ভেতরে তেমনি এই রাজপুতের কাছে নিজেকে তুলে দিলাম।

বাজি জাহানারার কথা শুনতে শুনতে শাহজাদা দারার কোনো খেয়াল

ছিল না। যেন কবিতার ভেতর ভেসে চলেছেন। তাঁর দিদি শাহজাদী জাহানারা তখন বলছিলেন, প্রথম দেখাতেই আমি তাঁকে আমার হৃদয়ের পুজো এগিয়ে দিলাম।

দারা তখনো দেখলেন, বাজি নিজের ভেতরে তাকিয়ে আছেন। চোখ খোলা। কিন্তু সামনের কিছুতেই সে দৃষ্টি নেই। মাথা ভর্তি চুল দু'কাঁধে নেমে দুই বাহুমূলকে আলাদা এক মনোরম ভঙ্গি যেন ধার দিয়েছে। ছোট তীক্ষ্ন নাক—কিন্তু এক থরথরানো আবেগে নাকের পাটা তখনো সামান্য কাঁপছে।

দারা আর থাকতে পারলেন না। এক থোকা পিচ এগিয়ে ধরলেন, খাবে বাজি ?

—নাঃ। তুমি খাও ভাই—

তখনো শাহজাদীর মুখে একই সঙ্গে ঝলসানো সুখ আর হাসি। ঠিক এই সময়ে দারার কী মনে পড়ে গেল। তিনি বলে উঠলেন, কিন্তু বাজি—আব্বা হুজুর বাদশা শাহজাহান যে অন্য ভাবে ভাবছেন—

চমকে উঠলেন শাহজাদী। কী ?

—দরবারে আমার যা কানে এসেছে—

—কী ?

—আমীরদের কানাকানিতে যা উঠে আসে—

—বলো ভাই বলো—জাহানারা অস্থির হয়ে উঠলেন।

—আব্বা হুজুর চান—হিন্দুস্থানকে আরও মজবুত করতে—কাশ্মীরের উত্তরে বলুক্, বাদাকশানে শাহী যাতে আরও জোরদার হয়—তাই বাদশা তোমার দু'খানি হাত বলুকের আমির নজবত খানের হাতেই দিতে চান।

আগেরই মতো হেসে শাহজাদী শান্ত গলায় বললেন, কিন্তু ভাই—আমার 'রাজা' যে বুন্দেলা—

—আকবর বাদশার বিধান ভুলে গেলে বাজি !

—ভুলিনি দারা। পাথরের ওই দেওয়ালের মতো কঠিন নসিব আমার সামনে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে। আকবর বাদশার বিধান—মুঘল শাহজাদীর বিয়ে হবে না—

ভাই বোন দু'জনেই তাঁদের পরদাদা সাহেবের এই বিধানের ভেতরকার মানে জানেন। তাঁর বিধানে মুঘল শাহজাদীদের চিরকুমারী হয়ে থাকার কথা। তিনি জানতেন, শাহী মসনদের জন্যে এমনিতেই ছেলেতে ছেলেতে তাগদের পাঞ্জা কষাকষি হয়ে যায়। বনিবনা হয় না। কূট বুদ্ধির লড়াইও হয়ে যায়। ছেলের ঘরের ছেলেদের ভেতরেও এর সবই বর্তায়। তারপরেও যদি মেয়ের ঘরের নাতিরা এই আসরে নামে তো অশান্তি, অনর্থের শেষ থাকবে না। সেসব মাথায় রেখেই এই বিধান।

রাত এখনো নবীন। রাজধানীর কলরোল দুর্গের এত উঁচু চত্বরে, ঘরেও উঠে আসছিল। সবই জিন্দা মানুষের কথাবার্তা। পাথুরে সড়কে ঘোড়ার

পায়ের শব্দ। গাড়ির যাতায়াত। তবে তা থেকে একটি বর্ণও বেছে আলাদা করে বের করার উপায় নেই। সবটা মিলিয়ে একটা মহা হই হই। শাহজাদা দারার মনে হলো—ইনসানের এই বিরাট কিচিরমিচিরের ভেতর তাদের খোয়াব, লালচ, রাগ, ভালোবাসা কত কি মিশে আছে। সেই সঙ্গে মিশে আছে নানান্ চালে বেচতে বসা ফুলওয়ালিদের জুঁই, গোলাপের সুবাস।

হিন্দুস্থানের হৃৎপিণ্ড এই আগ্রা দুর্গ। তাকে ঘিরেই রাজধানী। এই দুর্গের শাহী অন্দরমহলে থাকেন বাদশা। তিনি একটি মাত্র ইনসান। তাঁর তাগদের ফোয়ারা ঘিরেই যত লাবণ্য, যত শাসন, যত উচ্ছ্বাস, আশা, স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ।

কোনো মানুষই তার মনের মতো দুনিয়াকে পায় না। কমজোরিরা পায় না বলে হাত গুটিয়ে নিরাশার ভেতরও বসে থাকে। তাগদদার যা দু'একজন তারা দুনিয়ার ঘাড় মুচড়ে তাদের খোয়াব মোতাবেক সব কিছু বানিয়ে নিতে চায়। বানাতে গিয়ে বেশিরভাগই হাত পা ভেঙে পড়ে। সামান্য দু'একজন জয়ী হয়। দুনিয়াটা আসলে এক বিরাট পরাজয়।

শাহজাদা দারা তাঁর সামনে দাঁড়ানো শাহজাদী জাহানারার মুখে তাকিয়ে বুঝলেন, বাজি জেগে জেগে খোয়াব দেখছেন। খোয়াবেই ভাসছেন। বুন্দেলার রাজা ছত্রশালের বড় ছেলে আছে। সে তার বাবার মতোই সাহসী, সুন্দর। তবে ছত্রশাল লড়াকু তো বটেই—ভালো গাইয়েও তিনি।

আমি বাদশা হলে এখনি বাজির দু'খানি হাত রাজা ছত্রশালের হাতে মিলিয়ে দিতাম! আসলে গাছটাই আসল? না, জলে গাছের ছায়াই আসল? রাজা ছত্রশালই আসল? না, তাঁকে ঘিরে দেখা দিবাস্বপ্নই আসল?

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

আকবরশাহী আমল থেকেই হাতি পিছু রোজকার বরাদ্দ চার সের ঘি, পাঁচ সের চিনি, লবঙ্গ গোলমরিচ দিয়ে আধমণ দুধে আধসেদ্ধ আধমণ চালের কড়া প্রসাদ। তাছাড়াও শীতের দু'মাস রোজ তিনশো গাছি আখ চিবিয়ে এক একটা হাতি তাগদদার হয়ে ওঠে।

এ তো গেল দাদাসাহেব আকবর বাদশার ব্যবস্থা। আমার আব্বা হুজুর জাহাঙ্গীর বাদশা হাতিদের মাথা পিছু চারটি করে আলানসঙ্গী হিসেবে চারটি হাতি যোগাবার হুকুম দেন। সে হুকুম আমিও বহাল রেখেছি। ওদের নিয়মিত শরাব খাইয়ে ফুর্তিতে রাখতে আব্বা হুজুর যে হুকুম দিয়ে গেছেন—তাও আমি বহাল রেখেছি!

এইসব কথা আগ্রা দুর্গের ভেতরে মচ্ছি ভবনে দাঁড়িয়ে হিন্দুস্থানের বাদশা শাহজাহান ভাবছিলেন। সময়টা এখন দুপুর। আগ্রা দুর্গের দিওয়ানখানার কাছারি এখন উমেদারে ছয়লাপ। দুর্গের উঁচু বুরুজে বুরুজে পাহারাদার রাজপুত সেপাই মূর্তি প্রায় দাঁড়িয়ে।

মচ্ছিভবনের ফোয়ারাগুলো পাথরের সুড়ঙ্গ দিয়ে টেনে আনা যমুনার জল ছড়িয়ে যাচ্ছিল। পাশেই ধরে রাখা জলে লাল নীল মাছ খেলে বেড়াচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে বাদশা তাঁর মনের ভেতরকার চিন্তাগুলো আবার জোড়া দিতে শুরু করলেন।

ফাঁসির আসামীর তাজা লাশের সুরুয়া খাইয়ে ইনসানি গোস্তে জঙ্গী হাতিদের লালচ বাড়িয়ে দিয়েছি আমি। লড়াইয়ের আগে ওই সুরুয়ার লোভ দেখিয়ে হাতিদের জং-কি ময়দানে নামানো হয়। নামানোর সময় আমারই পাকা হুকুম মোতাবেক জঙ্গী হাতির সামনের এক পায়ের সঙ্গে পেছনের এক পা মোটা শেকলে আড়াআড়ি ভাবে বেঁধে বের করার কথা। তা না করে উপায় বা কী! ওরকম না করলে সামলানোই কঠিন।

এ হুকুম তো মীর-ই-ফিল সনাতনের না জানার কথা নয়। এই অব্দি ভেবে কাছের লাল মাছটার মুখ বরাবর খানিকটা মশল্লাদার খাবার ছড়িয়ে দিলেন বাদশা শাহজাহান। অমনি গপ্ করে তা খেয়ে নিলো।

সঙ্গে সঙ্গে বাদশার সেই ভীষণ ছবি মনে পড়ে গেল। পায়ে কোনো শেকল নেই। দুই দাঁতে দু'পাশে ধারালো খঞ্জর বাঁধা। একটা শাহী জঙ্গী হাতি তাঁরই দিকে ছুটে আসছে। সামনের দিকে শাহী হারবলের ঘোড়সওয়াররা খানজাহান লোদির তোপখানা দখলের জন্যে মরিয়া হয়ে ঘোড়ার পেটে পায়ের ঘা দিয়ে এগোচ্ছে। আর ঠিক এইসময়।

এসব কয়েকমাস আগের কথা। তখন বাদশা দৌলতাবাদের কাছাকাছি। বর্ষার শেষ। তবু আকাশ অন্ধকার করে এসেছিল সেদিন। সাক্ষাৎ মৃত্যুই যেন ছুটে আসছিল। লোদিকে শায়েস্তা করার পর এখন আয়েসে আরামে পুরনো ছবিগুলো জোড়া দিয়ে মনে মনে পুরো চেহারাটা আঁকার চেষ্টা করতে গিয়ে কী একটা খটকা লাগলো বাদশা শাহজাহানের মনে।

সেদিন জং-কি ময়দানে শাহী হারবলের পেছন থেকে নিজেদেরই একটা আনসান গোলা এসে হাতিটার সামনে না পড়লে ও জানোয়ার হিন্দুস্থানের বাদশাকে নির্ঘাৎ থেঁতলে দিয়ে চলে যেতো।

অল্পের জন্যে বাদশা শাহজাহান বেঁচে যান। এটা কি তাহলে মীর-ই-ফিলের গাফিলতি? না, ইচ্ছে করেই—

বাদশার একবার মনে হলো, ইস্পাহানের সফবি শাহীর কাছ থেকে ইনাম পাওয়ার লালচে সনাতন হাতি কোনো ইস্পাহানি কাসীদ নয়তো?

তা না হলে জঙ্গী হাতির পায়ে জং-কি ময়দানে শেকল ছিল না কেন? এমন তো হওয়ার কথা নয়। আবার একথাও বাদশা শাহজাহানের মনে এলো, দুশমন খানজাহান লোদির কাছ থেকে ইনামের লোভে পড়ে সনাতন ওই সুরুয়া পাগল জঙ্গী হাতি ছেড়ে দিয়েছিল কি? ইনসানি গোস্ত এক মস্ত নেশা। আবার পাওয়ার লোভে লোভে জঙ্গী হাতিগুলো লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন ওদের দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। তাই হয়তো খোদ বাদশার দিকেই ছুটে আসছিল। তাহলেও পায়ের শেকল থাকবে না কেন? দাপিয়ে ছুটে আসছিল।

তাতেই শেকল ছিঁড়ে গিয়েছিল কি ? তাহলে তো দাপানো পায়ের সঙ্গে ছেঁড়া শেকলের ঝনঝনানি কানে আসতো। এসেছিল কি ?

ঠিক মনে করতে পারলেন না বাদশা শাহজাহান। তিনি দেখলেন দূরে দূরে পাহারার সেপাইরা দাঁড়িয়ে। একবার ভাবলেন—মীর-ই-ফিল সনাতন হাতিকে ডেকে পাঠাই। বুক অব্দি ঢালাও দাড়ি। মাথায় বিশাল বাবরি। চোখের ওপর ঝুলে পড়া কাঁচা-পাকা ভ্রূ। মাথাটি বাবরি সমেত লাল বনাতের কাপড়ে সবসময় বাঁধা থাকে। তার ভেতর সনাতনের খুদে খুদে চোখের খুব সামান্য ছাড়া মুখের প্রায় কিছুই দেখা যায় না। মানুষটার আসল মুখখানা দেখার জন্যে হাজামকে ডাকা দরকার। ভেবেই বাদশা একজন দাখিলাকে ইশারায় ডাকলেন।

হুকুম তামিলে দাখিলা ছুটে আসছিল। বাদশা নিজেই হাত তুলে তাকে থামালেন। এখন থাক—

বাদশার মনে পড়লো, এখন তো শাহজাদী জাহানারার বিয়ানার দিকে যাওয়ার কথা। রাজধানীর কাছেপিঠে এসব যাওয়া আসায় শাহজাদা-শাহজাদীরা হাতিতেই যাতায়াত করে থাকে। সেসব হাতির চলাচলে খোদ মাহুতের জায়গা নিয়ে থাকে মীর-ই-ফিল সনাতন হাতি। তাই তাকে তো এখন পাওয়া যাবে না। বাদশা নিজেই নিজের মন থেকে খটকাটা তাড়াবার চেষ্টা করলেন।

সূর্য এবার পশ্চিমে ঢলবে। আগ্রা দুর্গের হাতিপোল দিয়ে শাহজাদী জাহানারা আসছিলেন। আগে আগে প্রতিহারের দল ঘোড়া হাঁকিয়ে 'দূর বাশ্' চিৎকার ছেড়ে রাস্তা খালি করে চলেছে। প্রতিহার ঘোড়সওয়ারদের পেছন পেছন হাতির পিঠে ভারি সুন্দর দেখতে বাছাই সব আফগান সেপাই—তাদের হাতে সোনা রং সূর্য আঁকা তৈমুর খানদানের পতাকা উড়ছে। তাদেরই পরে হাতির পিঠে দুন্দুভি, ভেরি, পণব, বিষাণ, দামামা, ঢোল, সানাই বাজাতে বাজাতে চলেছে বাজনদারের দল। হাতিদের এই হারবলের পেছন পেছন চলেছে খোজা দেহরক্ষীরা। তাদের মাঝখানে এক মাতঙ্গিনীর পিঠে খোদ শাহজাদী জাহানারা। আর তার পেছন পেছন এক শান্তশিষ্ট রাজতুম হাতিতে বসে সনাতন হাতি। দাড়িতে, বাবরিতে, মাথার পাগড়িতে তার মুখ প্রায় দেখাই যায় না। অথচ মীর-ই-ফিল হিসেবে এতগুলো হাতি বাগে রাখতেই শাহজাদীর সঙ্গী হতে হয়েছে তাকে।

ক'বছর হলো ইংলিশস্তানের ইলচি টমাস সাহেব সেই যে দেশে গেছেন আর ফেরেননি। তাঁর জায়গায় থেকে গিয়েছিলেন তাঁরই দেখাশুনোর এক ইংলিশস্তানি হেকিম। গোব্রিয়েল ব্রাউটন। বাদশা শাহজাহানের দেওয়ানি খাসের দরবারে মাঝবয়সী এই হেকিম মাঝে মাঝেই এসে থাকেন। বাদশার ভায়রাভাই খলিলুল্লা খাঁয়ের ঘর সংসারও আগ্রা দুর্গেই। তাঁরই বিবি বেশ কিছুদিন ধরে বিছানা থেকে উঠতে পারছিলেন না। কমজোর শরীর। সঙ্গে

হাঁপ ধরা কাশি। শাহজাদী জাহানারার আম্মিজান বাদশা-বেগম মমতাজ মহলের বড় আদরের ছোটবোন। ব্রাউটন সাহেবের দাওয়াইয়ে শাহজাদীর মাসি চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন। অথচ দিশি ইউনানি হেকিমের এতদিন মাসির রোগটাই ঠিকমত ধরতে পারেননি।

জাহানারা বিদেশী ইলচিদের দেখাশুনো করে থাকেন। সেপাই থেকে আহেদি, আহেদি থেকে মনসবদারে ইজফা দেওয়ার সময় সিপাহশালার তাঁরই সঙ্গে পরামর্শ করে নেন। কাউকে জায়গিরদারি দেওয়ার সময়েও জাহানারা বেগমের কথাই এখন হিন্দুস্থানে শেষ কথা।

তা শাহজাদীর বড় ইচ্ছে—আগ্রাতে ব্রাউটন সাহেবের মতো ধন্বন্তরী হেকিম থাকতে তিনি একবার বিয়ানায় শাহী এতিমখানা নিজের চোখে ঘুরে দেখুন। এতিমখানার বাসিন্দাদের ইলাজের জন্যে কী করা যায় তার একটা ভালো রাস্তা নিশ্চয় গেব্রিয়েল ব্রাউটন বাতলাতে পারবেন। এ জন্যেই আজ শাহজাদীর এই বিয়ানা যাত্রা। রাজধানী আগ্রার ঠিক বাইরে বিয়ানার খুলি ময়দানে বিশাল এক পিপুল গাছের ছায়ায় হেকিম ব্রাউটনের অপেক্ষা করার কথা।

শাহজাদীর হাতির মিছিল দেখতে রাস্তায় দূরে দূরে আম আতরাফ মানুষ জনের ভিড়। কিছু নয়—তারা শুধু দেখাতে চায়। হাতির পিঠে তুলোভরা গাদেলার দু'পাশে সোনালি সুতোর কাজ করা লাল বনাত দুলছে। হাওদার সামনে পিছনে ঝালরদার আকবর শাহী চৌরাসি। লেজে সাদা চামর। হাতির জঘন দেশের দু'ধারে দুই ভৈ-এর জন্যে রাখা দুটি রেশমি দড়ির ঝুলা যমুনার দিক থেকে রাজধানীতে ভেসে আসা বাতাসে দুলছিল।

রাজধানীর মানুষজন চোখ বড় করে দেখছিল শাহজাদীর মাতঙ্গিনীর শুঁড় কপাল থেকে খুন-খারাবি সিঁদুরে রাঙানো। দুই কানে সাদাকালো চামরির কানপাশা। দেখে দেখে জনতার আর আশ মেটে না। কোড়া মেরে হটিয়ে দিলেও তারা আবার এগিয়ে আসে। রুপোর বিরাট গলঘণ্টের গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি সবকিছুকে একটা ভারি বনেদি ময়ামে মেখে ফেলেছে—যা কিনা পথচলতি মানুষজনের কাছে বিরাট এক আগ্রহের কারণ—সারা ছবিটাই যেন বা সাধারণ মানুষজনের চোখের পিপাসার জল।

মাত্র কয়েকদিন আগে দেওয়ানি-খাসে এসেছিলেন গেব্রিয়েল ব্রাউটন। ঝরোখার আড়ালে দাঁড়িয়ে খলিলুল্লা খাঁয়ের বেগমের শরীর এখন কেমন তাই ডক্তারসাহেবকে জানাচ্ছিলেন শাহজাদী। তখন কথায় কথায় জন কোম্পানির কথা উঠলো। উঠলো ইংলিশস্তানের শাহীর কথা। তখন এই ইংলিশস্তানি হেকিম ব্রাউটন সাহেব তাঁর খানদানের পরিচয় দেন। খুবই খানদানি ঘরের ইনসান এই বিদেশী হেকিম। ইংলিশস্তানের শাহ চার্লস শিকার থেকে ফেরার পর তাঁর বাঁ পায়ের জুতো খোলার অধিকার ব্রাউটন খানদানির একেবারে নিজের।

তখনই হিন্দুস্থানের সঙ্গে জন কোম্পানির ব্যবসার কথা ওঠে। হেকিম ব্রাউটন বলছিলেন, বছর ত্রিশেক আগে ইংলিশস্তানে হিন্দুস্থানের মরিচের দাম

খুবই বেড়ে গিয়েছিল। তখন নাকি সওয়াশো ইংলিশস্তানি একজোট হয়ে হিন্দুস্হানের সঙ্গে ব্যবসার জন্যে এই কোম্পানির পত্তন করেন।

কিসের থেকে কী হয়! শাহী সড়কে কৃষ্ণচূড়া গাছগুলো লাল হয়ে ফেটে পড়েছে। জাহানারা বেগম মনের ভেতর হাফিজ আওড়াচ্ছিলেন। কবি হাফিজ জানতে চেয়েছিলেন জগতের অর্থ। খুঁজেছিলেন, দুনিয়ার আসল ইচ্ছেটা কী? খায়েস?

নসীমে-সুবহ সআদত···

হে পয়মন্ত সকালের হাওয়া···

শাহজাদীর সব ভাবনা ছিঁড়ে গেল। তাঁর হাতির পেছনে পিকদানি বয়ে আসছিল একটি তাতার মেয়ে। রাস্তায় কোড়া খেয়ে একজন পথচলতি মানুষ প্রায় তার ওপর এসে পড়লো। আর অমনি রাজতুম হাতিটি থেকে মীর-ই-ফিল সনাতন প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কোড়া খাওয়া লোকটাকে সরাতে গেল।

জাহানারা বেগম এসব দেখতে পারেন না। চোখ সরিয়ে নিলেন। অথচ তাঁকে দেখতে গিয়েই তো পথচলতি মানুষের এই হয়রানি, লাঞ্ছনা। এ জন্যে তাঁর একরকম গর্ব হয়। আবার কষ্টও হয়।

শাহজাদীর রূপসজ্জা দূরের কথা—তাঁর নখের ডগাও দেখার সুযোগ নেই কোনো। তাই নিয়ে কারও তসবির বানানোর বুকের পাটা নেই সারা হিন্দুস্থানে। জাহানারা তাঁর আব্বা হুজুরের দেওয়া পাঁচ লাখ টাকার একশো তিরিশ মুক্তোদানার দস্তবন্দে তাকালেন—তখন শাহজাদীর গায়ে কোন্ না পঁচানব্বই লাখ টাকার জহরত মালিকের মনোযোগ না পেয়ে যেন নিষ্প্রভ হয়ে উঠলো।

কাছেই বিয়ানা। নিয়মমত শাহজাদীকে পিঠে নিয়ে মাতঙ্গিনী একা পিপুল গাছের দিকে এগোলো। ওই দেখা যায়—গাছের ছায়ার ভেতর একটা কালো ঘোড়া থেকে লালচে রংয়ের ইংলিশস্তানি হেকিম ব্রাউটন নামছেন। এবার তিনি শাহজাদীকে কুর্নিশ করবেন। তসলিম জানাবেন।

সামনেই শাহী এতিমখানা।

সনাতন হাতি ভৈ আর মেঠদের হাতি সামলানোর হুকুম দিয়ে কোড়া খাওয়া সেই লোকটাকে রাস্তার নাবি থেকে টেনে তুললো।

—হাতির জুলুস দেখার এত শখ তো দূরে দাঁড়ালে পারো।

লোকটা কোনো কথা বললো না। তার ডান চোখের ওপর দিয়ে ডান গালে কোড়া বসে গিয়ে রক্ত পড়ছিল। মীর-ই-ফিল হিসেবে অনেক জিনিসই সনাতনকে ঢুলিতে রাখতে হয়। সে খানিকটা আরক এনে কাটা জায়গার দু'পাশ মুছে দিয়ে বললো, কোথায় থাকো?

এবার লোকটি খুব কষ্টে কোনোরকমে বললো, যমুনার চরে—

লোকটিকে ভালো করে দেখে সনাতন জানতে চাইলো, কী করা হয়?

—ফুল বিকোই—

—ওঃ! চরে ফুল চাষ করো।

লোকটি মাথা নেড়ে জানালো, হ্যাঁ।

—তা এতদূর মরতে এসেছিলে কেন! তুমি নিশ্চয় আফগান।

এবার লোকটি হেসে ফেললো সামান্য। কী করে বুঝলে?

—তোমার চেহারা তবিয়ত তাই বলে।—এখানে একটু থেমে সনাতন হাতি বললো, শাহী ফৌজের ইস্পাহানি, তুর্কি, চাঘতাই, বাদকশানি, আফগান সেপাই আর ঘোড়া দেখতে দেখতে চোখ পচে গেল ভাই! তা তোমায় চিনবো না! এমন দাড়ি, চওড়া কাঁধ, বাবরি—হাতে একটা রবাব ধরিয়ে দিলেই ছবিটা পুরো হয়—

সনাতনের এই বেরাদরি কথাবার্তার ওম পেয়ে লোকটি হেসে উঠলো। আমি মীর সফি—তুমি?

—আমিও একজন মীর। তবে মীর-ই-ফিল! শাহী হাতিদের দেখভাল আমার কাজ।

—ওরে বাবা! তুমি তো ভারি ওজনদার ইনসান। দোষ করে থাকলে মাফ করে দাও ভাই। আর কখনো শাহী জুলুস দেখতে রাস্তায় দাঁড়াবো না।

—ও কথা বোলো না। 'দূর বাশ্' হাঁকতে হাঁকতে যে ঘোড়-সওয়াররা ছোটে তাদের মাথায় যদি কিছু থাকে। কোনোদিকে না তাকিয়ে এমন কোড়া মারে—যেন হিন্দুস্থানটাই ওদের।—বলতে বলতে সনাতন তার হাতিতে ফিরে যাচ্ছিল।

সফি বললো, আবার তোমার দেখা পাই কী করে?

—কী হবে দেখা করে?

—হিন্দুস্থানে শাহী কাজে এমন কোন্ নফর আছে, যে কিনা নিজের হাতি থেকে নেমে আমার মতো আম আতরাফ ইনসানকে আরক দিয়ে ইলাজ করে—

—ও কিছু নয়। একদিন দুর্গে এসো। তোমায় শাহী পিলখানা ঘুরিয়ে দেখাবো।

একজন আহেদি হিসেবে আগ্রা দুর্গ আঁতিপাঁতি করে জানা মীর সফি নিতান্ত আনপড়ের মতোই বললো, আমায় ঢুকতে দেবে কেন কেল্লায়?

—সে দেখা যাবে 'খন। যমুনার দিকে মোরি দরওয়াজায় এসে দাঁড়াতে পারবে তো। ওখান থেকে তোমায় আমি কেল্লায় ঢুকিয়ে নেবো। ওর কাছেই তো পিলখানা।

মীর সফির কেটে যাওয়া মুখ চোখ একটু আগে ব্যথায় অপমানে জ্বলে যাচ্ছিল। মোরি দরওয়াজার কাছেই যে পিলখানা, বাঘ, সিংহ, ময়ূরদের ঘর—তাও অজানা নয়। তবু মোরি দরওয়াজার কথা শুনে সেও যেন লাফিয়ে উঠলো। বললো, মোরি দরওয়াজা থেকে সিধে ভাঙা পাড় ধরে নদীর চরে নামলে কয়েক জায়গায় যমুনা ডিঙিয়ে আমাদের ফুলচাষ—আমাদের ঝুপড়ি।

—তাই নাকি? রোজ ওদিকে রাতের বেলায় দূরে দূরে আলোর ফুটকি দেখি। কোনো কোনোদিন মশালও জ্বলে—

—সস্তার চর্বির মশাল জ্বালি শেষরাতে। গোলাপছড়ির কাঁচা মুল

ঠুকরে তুলে ফেলে খরগোশ—তাই—।—বলেই সফি অবাক হয়ে বললো, তখন তো বেশ রাত থাকে। তখনি জেগে যাও ভাই ?

—হাতির তো হাজারো খেজমত। ঘুমোই আর কতটুকু !

—কেল্লায় তো থাকো। কোনো চিন্তা নেই তোমার। একদিন আমাদের ঝুপড়িতে আসবে ?

—যাওয়া যাবে 'খন।

—এলে আন্দাজ পাবে হিন্দুস্থানের মানুষ কী ভাবে থাকে।

—যাবো। নিশ্চয় যাবো। তার আগে তুমি একদিন পিলখানা ঘুরে যাও। যখন আসবে একটা কিছু নিয়ে এসো। খানিকটা ঘি দিয়ে দেবো।

—ও বাবা। তা পারবো না ভাই।

—শাহী হাতির রোজখোরাকি থেকে খানিকটা ঘি সরিয়ে নিলে কে বুঝবে সফি !

সফি কথাটার ওপর চুল দাড়িতে ঢাকা মুখের ভেতর সনাতনের চোখ দু'টি এমন এক ঝোঁক দিলো যা কিনা কোড়া খাওয়া মীর সফির বুকের ভেতর গিয়ে গভীর হয়ে বাজলো। সে কোনো কথা না বলে মীর-ই-ফিল মানুষটির দিকে তাকিয়ে থাকলো। সনাতন তখন তার রাজতুম হাতির কাছে গিয়ে শুঁড়ে হাত বোলাতে শুরু করেছে। দূরে দেখা যায় শাহী এতিমখানার দিকে একজন ফিরিঙ্গি আগে আগে হেঁটে যাচ্ছে। অনেকটা দূরে পেছনে শাহজাদী জাহানারা বেগন। পা থেকে মাথা—কিছুই তাঁর দেখা যায় না। পিপুল গাছের ছায়ায় একপাল হাতি। ভৈ আর মেঠের দল তাদের তদারকিতে হিমশিম খাবার দশা।

যদিও বর্ষা এখনো বেশ দূরে—তবু ইদানীং বিকেলের দিকে আগ্রার আকাশে মেঘ দেখা দিচ্ছে। রাজধানীর খয়রাতপুরা, যোগীপুরার বুড়ো মানুষরা বলছেন, ও আসলে মেঘ নয়। আঁধি !

সেকথা শুনে রাজধানীর ছেলে-ছোকরারা মুচকি হেসে বলছে, বুড়ো হলে চোখে ছানি পড়ে ! তাই মেঘ চেনা যায় না—

আঁধি হোক—আর মেঘই হোক—কড়া রোদের হাত থেকে বাঁচোয়া। সন্ধের অনেক আগে থেকেই সারা রাজধানীর বুকে একটা ছায়া পড়ে আসে। সেরকমই এক ছায়ার নিচে ফুরফুরে বাতাসের ভেতর যমুনার ঠিক ওপরে, আঙুরিবাগে বেলি, জুঁই থির থির করে কাঁপছে। ফোয়ারাগুলোর ঠেলে ওঠা জলের ডগা ভেঙে ভেঙে আবার নিচের জলে গিয়েই মিশে যাচ্ছে। তবে আজ এই বিকেলে আঙুরিবাগে বেলি জুঁইয়ের চেয়ে অনেক দামি দামি ফুলের মেলা বসেছে। ফুলগুলি একই গাছের। নাম আলাদা আলাদা। যেমন—

দারাশুকো। উজ্জ্বল দুই চোখের নিচে কচি দুর্বার মতোই দাড়ির রেখা প্রায় কালো হয়ে দু'গাল ঢেকে ফেলেছে। বয়স ষোলো।

সুজাঙ্গীর। ঢলো ঢলো চোখ। প্রায় একইরকম দাড়ি। তবে গোঁফ তাকে কিছুটা আলাদা করেছে। বয়স পনেরো।

রোশনআরা। বাগের বেলির মতোই সফেদ। তীক্ষ্ণ চোখ। বাঁ হাতের আঙুলের দস্তবন্দে একটি হিরে আলো পড়লেই ঝিকিয়ে উঠছে। পায়ের চটিতে একটি করে মুক্তো বসানো। বাদলাকিনারি ওড়নায় মুখের বাঁ পাশ ঢাকা। বয়স চোদ্দো।

আওরঙ্গজেব। শাহজাদা শাহজাদীদের ভেতর সবচেয়ে সফেদ। ঘন কালো চোখ। জোড়া ভ্রূ। দু'চোখের দৃষ্টি ভেতর দিকে তলিয়ে যাওয়া। হাতে কোনো আঙুলে কোনো দস্তবন্দ নেই। হীরে মুক্তো তো দূরের কথা। পরনের পোশাক বলতে সাধারণ আকবরী ডোরিয়া। ওপরে কুর্তি। ডোরিয়ায় পা ঢাকা পড়ে যাওয়ায় বোঝা যাচ্ছে না চটিটি কেমন। বয়স তেরো।

মুরাদ বকস্। তেজি ঠেলে ওঠা শরীর গুজরাতি ঝলমলে মখমলের চুনোটি আঙরাখায় ঢাকা। কোমরবন্ধে সোনালি খাপ থেকে একখানি বিরছা সমশেরের বাঁট উঁকি দিচ্ছে। গায়ের রংটি চাপা। গালের ঝিক কিছু উঁচু। কিন্তু ওপরের ঠোঁট নিচের ঠোঁটকে দাবিয়ে রাখতে চাইছে। বয়স সাত।

এরা সবাই শাহী খাজানাখানার রোজিনাদার। দারাশুকো দিনে পান হাজার টাকা। সুজাঙ্গীর পান সাতশো টাকা। আর আওরঙ্গজেব পাঁচশো টাকা।

ওদের মাঝখানে একটি সাইপ্রেস গাছের নিচে বিশাল এক তুর্কি দস্তাখারের ওপর সোনালি আঙুরের টাল। তার পাশেই কিছু কাবুলি পিচ। শাহজাদা সুজাঙ্গীর একটা একটা করে পিচ তুলছে আর ঠোঁট সামান্য ফাঁক করে নিজের হাঁ-মুখে ঠেলে ভেতরে পাঠাচ্ছে।

বালক মুরাদ বকস আচমকা কোমরের বিরছা সমশের বের করেই তার সামনের ফোয়ারা ঠেলে ওঠা জলের ডগার দু'ধারেই কোপ বসাতে লাগলো। যেন বালক ওই উদ্ধত জলকে দু'টুকরো করে ফেলতে চায়।

তা দেখে দারাশুকো হো হো করে হেসে উঠলেন। হচ্ছেটা কী?

মুরাদ বকস্ ফিরেও তাকালো না। সে সমান জেদে ফোয়ারার জলের ঠেলে ওঠা ডগায় কোপ বসিয়ে যেতে লাগলো। মুরাদের চোখ বড় হয়ে উঠেছে। ওপরের ঠোঁট নিচের ঠোঁটকে আরও দাপটে চেপে ধরলো।

শাহজাদা দারাশুকো চেঁচিয়ে বললেন, ছোটে ভাই। বরফের গায়ে কোনো দাগ পড়ে না। বরফ জলে হয়—জলেই মিলিয়ে যায়। তুমি থামবে?

মুরাদ বকস্ তবুও থামলো না। সে সমান জেদে জলের ডগা কুপিয়ে দু'টুকরো করে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলো।

তখন দারাশুকো ফের হাসতে হাসতেই বললেন, জলকে কাটা যায় না ভাই। কেন শুধু শুধু হয়রান হচ্ছো? শোনো।

মুরাদ বকস্ তবুও থামলো না।

তখন দারাশুকো গম্ভীর মুখে বললেন, বাতাসকেও কাটা যায় না ছোটে ভাই। এবার নিশ্চয় তুমি থামবে।

মুরাদ বকস্ তখনো জলের ওপর সমশেরের কোপ বসিয়ে চলেছে।

শাহজাদা সুজাঙ্গীর সেদিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে বললো, কোপাক না। থামতে বলছো কেন বড়ে ভাই। হয়রান হয়ে নিজেই একসময় থামবে!

দারাশুকো সুজাঙ্গীরের মুখে তাকালেন। ওর হাত থেকে সমশের ছিটকে পড়তে পারে। দামাল ঝোঁকে মুরাদ নিজেও জলে গিয়ে পড়তে পারে।

—তাতে ভাবনার কি বড়ে ভাই? না হয় ব্যথা পাবে। কিন্তু সমশের খাপে থাকবে সারাদিন—অথচ তার কোনো ব্যবহার হবে না?

দারাশুকো কোনো কথা বলতে পারলেন না। তিনি অবাক হয়ে চুপ করে গেলেন। ঠিক তখনই শাহজাদা আওরঙ্গজেব সোজাসুজি দারাশুকোর মুখে তাকালো। তাকিয়ে বললো, তুমি ঠিক জানো বড়ে ভাই? জলকে কাটা যায় না? বাতাসকে টুকরো করা যায় না?

—না। যায় না ছোটে ভাই। আলোকেও টুকরো করা অসম্ভব।

—একথা তুমি জানলে কী করে? •

দারাশুকো সুজাঙ্গীরের কথার চেয়েও আওরঙ্গজেবের কথায় বেশি অবাক হলেন। বুকের কোন্ গভীর একটা ব্যথা পাক খেয়ে উঠলো তাঁর। একটু থতমত খেয়ে গাঢ় শান্ত গলায় নিজের ছোটভাই শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে বললেন, আমার শ্বাস-প্রশ্বাসকে যেমন জানি—ঠিক তেমনই জানি।

ছোটবোন রৌশনআরা আচমকা জানতে চাইলো, শ্বাস-প্রশ্বাসকে কি দেখেছো বড়ে ভাই!

—দেখা যায় না রৌশন। বোঝা যায়। যেমন কিনা জলে দাগ টানা যায়—কিন্তু দাগ পড়ে না।—এই অব্দি বলে দারাশুকো আওরঙ্গজেবের দিকে তাকালেন। তাঁর মনে পড়লো, ছোটেভাই আওরঙ্গজেব তো সাকিম মুস্তাদ খানের কাজে মক্তবে পড়াশুনো করে। মুস্তাদ খান দেখার বাইরের জগতে কোনোদিনই সাঁতরাননি। এবার দারাশুকো বললেন—

হাফেজ ইন খির্কা কি দারি তু বির্বিনি ফয়দা—

আমার এই খির্কা যদি টেনে খুলে ফেলো তাহলে দেখবে ভেতরে রয়েছে—

দারাশুকোর আর এগোনো হলো না। আওরঙ্গজেব রীতিমত উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, একি বড়ে ভাই? তোমার মুখে আমার প্রিয় কবি হাফেজ?

—হাফেজ সবার কবি আওরঙ্গজেব। তিনি সিদ্ধাই সুফী ছিলেন।

—কিন্তু তুমি তো হাফেজ, সাদিকে তেমন করে বলো না কোনোদিন। তোমার প্রিয় তো রুমিই।

—হ্যাঁ। জালালুদ্দিন রুমি। তাঁর জায়গা কেবল পয়গম্বরেরই নিচে—

মন চী গোয়েম ওসফ এ আন আলি জনাব
নিস্ত পয়ঘম-বর লেক দারদ কিতাব

—এই মহাপুরুষের কথা আর কী বলবো! তিনি পয়গম্বর নন কিন্তু পয়গম্বরের যা কাজ, গুরু-গ্রন্থ দান, তা তিনি করে গেছেন আওরঙ্গজেব—

শাহজাদা সুজাঙ্গীরের হাতের আঙুল দস্তাখারে রাখা সোনালি আঙুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার দুই চোখ আঙুরিবাগ থেকে দেওয়ানি খাসে যাবার

ঢাকা পথের ওপর। সেই পথ দিয়ে জনা কয় ইরানি বাঁদি বারবার ওপরে উঠে যাচ্ছিল। আবার খানিকবাদেই তারা নেমে আসছিল। সেদিকে এক পলক তাকিয়েই রোশনআরা মুখ ঘুরিয়ে নিলো। তার যেন মনে হলো—সোনালি কোমরবন্ধে ঝোলানো সেঁউতি মালাওয়ালি মেয়েটি একবার শাহজাদা সুজাঙ্গীরের মুখে তাকিয়ে হাসলো। সে-হাসিতে শাহজাদার চোখ জোড়া টান টান হয়ে উঠলো।

আওরঙ্গজেব বললেন, আমি কবিতায় বিশ্বাস করি না বড়ে ভাই।

—তাহলে তোমার হাফেজে বিশ্বাস নেই বলো।

—তা কেন?

—বলো সাদিতেও তোমার বিশ্বাস নেই—

—সাদি, হাফেজ আমার খুব প্রিয় কবি। তবু এই তাগদের দুনিয়ায় কী করে মামুলি কবিতায় বিশ্বাস রাখতে পারি?

—কবিতা সব বাস্তবের মূলে আছে। যেমন কিনা এই আগ্রা দুর্গের বিশাল কঠিন পাথরের বীজে রয়েছে স্বপ্নালু কল্পনার একটি কবিতা। কবিতাই এই জগতের বীজ আওরঙ্গজেব।

—ওসব ধোঁয়াটে কথা আমি বুঝতে পারি না বড়ে ভাই।

—তুমি তৌহিদ বোঝো। আল্লা এক বোঝো। বোঝো হাফেজ। তো কবিতাও বুঝবে—

ঠিক তখন আগ্রার আকাশে নীল আশমানের জমিতে একটি গোল হলুদ চাঁদের আবছা জলছাপ পড়েছে সবে। এই এখন যদি শাহজাদাদের কেউ আঙুরিবাগের সামান থেকে নিচে যমুনার বুকে তাকাতেন—তো দেখতে পেতেন—নিচে, অনেক নিচে আবছা হয়ে যাওয়া চাষ জায়গার ভেতর দিয়ে বুঝিবা দুটি ছায়ামূর্তি চলছে। দূর থেকে তাদের আলাদা করে চেনা যায় না।

সনাতন হাতি তখন চর জায়গার ভেতর মাঝে মাঝেই হাঁটু ডোবানো যমুনার জল ভাঙছিল। তার আগে আগে মীর সফি।

আর আঙুরিবাগে ফোয়ারার ঠেলে ওঠা জলের ডগা অনেক চেষ্টা করেও সমশেরের কোপে দু'টুকরো করতে না পেরে শাহজাদা বালক মুরাদ বকস বাগের মাটিতেই হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পড়লো।।

।। ছত্রিশ ।।

ইদানীং মীর সফির খুব ঘুরে বেড়াবার বাই হয়েছে। এমনিতে চর জায়গায় জুঁই বেলির মালা বানানো বা গোলাপ ছড়ির কচি মূল খরগোশদের দাঁত থেকে বাঁচাতে শেষ রাতে চর্বির মশাল জ্বালাতে তার কোনো গাফিলতি নেই। ফুল ফলালেই হয় না। সেগুলো সুন্দর করে তোড়া বেঁধে—মালায় গেঁথে রাজধানীর লালচকে সুন্দর করে সাজিয়ে বসতে হয়। তবে না সেসব ভালো

দামে বিকোবে। সে জন্যে মীনাক্ষী ভালো করে চুল বেঁধে খোঁপায় বেলির গাজরা ঝুলিয়ে নেয়। ফুলের পসরা সমেত সেই মীনাক্ষীকে সফি লালচকে পেঁছেও দেয় সময়মত। কিন্তু তারপরেই শুরু হয়ে যায়—সফির ঘোরাঘুরি। এমন ভাবেই সে আগ্রার পথে পথে ঘোরে যেন বা আগ্রা কোনো বিশাল দেশ। এক একদিন রাজধানীর এক এক দিক আবিষ্কার করে ফেরে। রাতে মীনাক্ষীকে নিয়ে ফেরার পথে সেসব আবিষ্কারের কথা বলে। অন্ধকার যমুনার বুক ভেঙে এগোবার সময় মীনাক্ষী সেসব আবিষ্কারের কথা শোনে। কিছুই তার কানে যায় না। কানে যায় শুধু সফির চওড়া পুরুষালী গলা। তাতে তার কান ভরে যায়। কোন তিব্বতি হেকিম জড়িবুটি নিয়ে কোথায় বসেছে। তার ইলাজে নাকি পুরনো পাগলামিও সেরে যাচ্ছে।

শুনতে শুনতে ওড়নায় মুখ চেপে অন্ধকারের ভেতরেই দুই চোখে আশমানের বিজলি হেনে মীনাক্ষী বলেছিল, চলো না দেখিয়ে আসবে—

থতমত খেয়ে সফি বলেছিল, কার জন্যে ?

—কেন! তোমাকে দেখুন তিনি ভালো করে। চাই কি ইলাজে সেরে উঠতেও পারো।

—আমি ? আমার কী হয়েছে ?

—ওই যে—পুরনো যে-রোগটা বলছিলে।

হো হো করে হেসে উঠেছিল মীর সফি।

—উঁহু হেসো না। পাগলরা জানেই না—তারা পাগল।

—আমি তো তোমার জন্যে পাগল।

মীনাক্ষী ব্রহ্মপুত্রের তীরে ঘরদুয়ারি পাইকান ঘরের মেয়ে। বিয়ে হয়েছিল। ঘরসংসার হয়েছিল। ছেলেমেয়ে হয়েছিল। বর্ষা বানে জলে ভিজে বুনো লতাটির মতোই ধাঁ ধাঁ করে বেড়ে উঠেছিল। তারপর এ-ঘাট সে-ঘাট হয়ে সে এই ক'বছরে যমুনার চরে ফুলচাষী হয়ে—রাজধানীর লালচকে ফুলওয়ালী হয়ে প্রায় মাঝবয়সে পেঁছে এখন আরেক রকমের আওরত হয়ে উঠেছে।—গম্ভীর, ভারি দুই চোখ, মাথার কালো চুলে বেশ কিছুটা রুপোলি ছটা। তাতে রাজধানীর পথ দিয়ে যাওয়ার সময় বেলির সাদা গাজরা ঝুলে পড়ে। ঠোঁট দু'খানি বিলকুলি পানে রাঙিয়ে মীনাক্ষী যখন হাতির পিঠে বসা সন্ধ্যার সফরি কোনো ইরানি মনসবদার বা রাজপুত জায়গিরদারের দিকে চোখে তুলে তাকায়—তখন সওয়ারি বড়মানুষটি ফুল নিয়ে দর কষাকষি বেবাক ভুলে বসে।

সেই মীনাক্ষীকে আগ্রা-সফরি মীর সফি এক একদিন কোনো বা পুরনো মকবরা আবিষ্কারের কথা বলে। কোনোদিন বা বলে লাট্টু শাহ দারোগা বাবা চিসতির মাজার-শরিফের কথা। আবার কোনোদিন বলে নতুন দেখা কোনো সুফী সিদ্ধাইয়ের কথা। তেমন মানুষ পেলে সঙ্গে করে নিয়েও আসে। সিধে যমুনার চরে তরমুজ চাষের লাগোয়া এই ঝুপড়িতে। একদিন তো এক ঢ্যাঙা বুড়োকে নিয়ে হাজির সফি। সে নাকি বৈরাম খাঁয়ের খাস নকিব ছিল। বয়স

বলে দেড়শোর মতো। মুখের ভেতর সবকটি দাঁত কিন্তু মজুত। মীনাক্ষী আধখানা তরমুজ কেটে দিতে দিব্যি উড়িয়ে দিলো কয়েক লহমায়। বৈরাম খাঁয়ের খাস নকিবই বটে।

কাঁটা ঝোপের ডাল দিয়ে বানানো কেওয়াড়ি খুলেই সফি চেঁচিয়ে বললো, কাকে নিয়ে এসেছি দ্যাখো—

অন্যদিন এর অনেক আগে সফির সঙ্গে ফুলের পসরা নিয়ে মীনাক্ষী আগ্রার পথে বেরিয়ে পড়ে। আজ দুপুরের পর থেকেই সফিকে না দেখে—এই আসে—এই ফিরে এলো বলে বসে থেকে মীনাক্ষী একাই বেরিয়ে পড়বে বলে এতক্ষণ গোলাপ তোড়াগুলো বেঁধেছে।

এখন আবার কাকে নিয়ে এলো? সফির গলা পেয়ে একথা ভাবতে ভাবতে চালি ঢাকা বারান্দা থেকে মীনাক্ষী মাটিতে নেমেই দাঁড়িয়ে পড়লো। সফির পাশে লাল বনাতি কাপড়ে বাবরি ঘিরে বাঁধা এক বুড়ো দাঁড়িয়ে। সন্ধ্যা রাতের মেটে জ্যোৎস্নায় লোকটাকে পাকানো লাঠির মতোই দেখাচ্ছে। ওপরের কামিজটি অন্ধকারে মিশে গেছে। নিচের রঙিন ডোরিয়া পায়ের সঙ্গে আঁটোসাটো। দাড়িতে মুখের প্রায় সবটাই ঢাকা।

—মীনাবাঈ। ইনিই শাহী মীর-ই-ফিল।

মীনাক্ষী ওড়না দিয়ে যতটা পারে নিজের মুখ ঢেকে নিলো। কোন কিসিমের চিড়িয়া এনে সফি হাজির করলো তার ঠিক কী! সবাইকে মীনাক্ষী তার এ মুখ দেখাতে চায় না। যমুনার গায়েই হিন্দুস্থানের রাজধানী আগ্রা। সেখানে ডাকু লুটেরা থেকে দরবেশ সন্ন্যাসী সবই ঘুরে বেড়ায়। যাকে তাকে সে চট করে কাছাকাছি আসতে দিতে চায় না।

—সেদিন ইনিই হাতি থেকে নেমে এসে আমায় তুলে ধরেছিলেন।

একথায় মীনাক্ষী সামান্য ঝুঁকে মেহমানের ওপর থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে এলো। সফির কোড়া খাওয়া মুখখানা এখনো পুরোপুরি সেরে ওঠেনি। বাঁচোয়া যে কেটে যাওয়া জায়গাটার অনেকটাই এখন দাড়ির নিচে চাপা পড়ে আছে।

চরের ঘাসের মোটা পাতি দিয়ে বোনা খোলপেখানা উঠোনে পেতে দিলো মীনাক্ষী। তাতে বসতে বসতে সনাতন বেশ অবাক কিন্তু চাপা গলাতেই বললো, তোমার আওরত বাঈ হয় কী করে?

মীর সফি তেমনই চাপা গলায় হাসতে হাসতে বললো, মীনাকে আমি যখন যেমন ইচ্ছে হয়—বাঈ, বানু বলে ডাকি। আমার আওরতের মতো বিবি হয় না—

সনাতন তখনো তার খটকা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। একজন মুসলমানের বিবি কী করে বাঈ হয়? সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না। যদি সে আওরত বিয়ের আগে হিন্দু থেকেও থাকে তো বিয়ে করার পর সে আওরতকে তার খসম তো বানু বলেই ডাকবে। একই নিঃশ্বাসে তো বানু, বাঈ ডাক আসার কথা নয়। সন্ধে রাতে ফাল্গুনের বাতাসে চর জায়গা,

পাতিঘাস, চাপা চামেলি—সবই আবছা জ্যোৎস্নায় দুলছে। সেই সঙ্গে নিজের খটকায় পড়ে যতরকমের সন্দেহ হতে পারে—তাদের ভেতর মনে মনে দুলতে লাগলো সনাতন হাতি। দুলতে দুলতেই তার মনে পড়লো বাদশা শাহজাহানের হুকুমনামা। শাহেনশা এ ব্যাপারে খুব পরিষ্কার। যেসব হিন্দু মুসলমান মেয়ে বিয়ে করেছে—তাদের হয় ধর্মত্যাগ করতে হবে—নয়তো সেই মেয়েটিকে তালাক দিতে হবে। শাহী ইচ্ছাই হুকুম হয়ে বেরিয়ে আসে সামনে দাঁড়ানো ওই আগ্রা দুর্গ থেকে। সেই কেল্লার পাশে থেকেও আলা হজরতের হুকুমের ধার ধারে না এরা! নিতান্তই আনপড় এই ফুলওয়ালি মিঞা-বিবি।

হাপুরের বড়দানা ছোলা ভেজানো ছিল। আর আছে খান্দেশি গুড়। বড় একটা তরমুজ দিয়ে গিয়েছিল পাশের ওরা। সেটা কেটে দু'খানা করে রুটি আর পেঁয়াজের সঙ্গে ওসব দিয়ে মেহমানের জন্যে সামনে সাজিয়ে এনে ধরলো মীনাক্ষী।

—এই অবেলায় কিছু আর খাবো না।

সনাতনের গলার স্বর শুনে ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলো মীনা বাঈ। এ তো আগ্রা-দিল্লি-জৌনপুর-ফতেপুরি খাড়িবোলি বলা গলা নয়। এমনকি ইলাহাবাদি টান টোনের ধারও ধারে না এ-গলা। তবে কি সুবে বঙ্গালের ওদিককার মানুষ এই মীর-ই-ফিল? মীনাক্ষীর ভেতরে চাপা পড়া একটা নদী, মানুষজন, সাবেক রিস্তেদারি—সব—সব একসঙ্গে এক ঝলক আলোর মতোই ঝলসে উঠলো। সে চালির নিচে বারান্দায় উঠে গেল। গিয়ে ফুলের ডালি সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

তা দেখে মীর সফি চেঁচিয়ে বললো, আজ থাকুক মীনা বানু। রোজই তো ফুলওয়ালি মীনা বাঈ আগ্রার লালচকে যায়—আজ না হয় থাকলো। আমি রাতে সব খুলে জল ছিটিয়ে রাখবো'খন।

—নাঃ! ঘুরে আসি। সেঁউতিগুলো নেতিয়ে যাচ্ছে।

খোল পেতে বসা মীর সফি সুখী গেরস্থ গলায় আবারও চেঁচিয়ে বললো, থাক না মীনাক্ষী। ক'টা ফুল বৈ তো নয়। একদিন না হয় থাকলো। এমন মেহমান রোজ রোজ আসেন না—

এই পুবদেশি মানুষটির সামনে মীনাক্ষী তার গলা তুলতে চায় না। তার নিজের গলাতেও পুবী টানটোন একদম মুছে যায়নি। যদিও সে হাবেভাবে কুর্তি ডোরিয়ায় নিপাট আগ্রাওয়ালি এখন। তবু—

মীর-ই-ফিল সনাতন হাতি এতক্ষণ একটুখানি খান্দেশি গুড় নেড়েচেড়ে দেখছিল। কিছুই মুখে তোলেনি। সফির গলায় মীনাক্ষী ডাকা তার বুকের ভেতর দিয়ে এক দমকা বাতাসের ঝড় তুলে দিলো। সামনের তরমুজ চাষের মাঠ আবছা মেটে জ্যোৎস্নায় এতক্ষণ অস্পষ্ট ছিল। এই মাত্র সেখানে মশাল জ্বলে উঠলো। আর সেই সঙ্গে ঢোলের চড়া বোল। বসে বসেই মীর সফি কী দেখে বলে উঠলো, আবার ওরা নাচনেওয়ালি ভাড়া করে এনেছে—

সে কথায় সনাতন যন্ত্রের মতোই আপনা আপনি বলে উঠলো, এ-বছর

তরমুজটা ভালোই ফলেছে তাহলে—কী বলো ?

অনেক কথাই একসঙ্গে মনের ভেতরে উঠে আসছে সফির। কোন কথা আগে বলবে ? সামনে বর্ষা। ভিজে ভিজে নেতিয়ে গিয়ে কী ভাবে যে ফুলচারার মন্দা বাঁচাতে হয়—তা যদি মীর-ই-ফিল একবার দেখতেন ! কী ভাবে যে মাটির কেঁচো হয়ে মাটিতেই মিশে থেকে ওরা তরমুজ ফলায় তা যদি এই মানী মেহমান একবার নিজের চোখে দেখতেন ! সারা হিন্দুস্থানটাই রুটির জন্যে ওই অতিকায় আগ্রা দুর্গের পাথরের নিচে সবসময় পেষাই হচ্ছে। একথা বলতে গিয়ে মীর সফির চিন্তার সুতোগুলো লাগোয়া তরমুজ চাষের ঝুপড়ি থেকে মানুষজনের বেপরোয়া ফুর্তির হইহল্লা, ঢোলকের চাঁটি আর নাচনেওয়ালির ঘুঙুরের বোলে ছিঁড়েখুঁড়ে গেল। সেই সঙ্গে নিজেদের উঠোনে গেঁথে বসানো সস্তা চর্বির মশালের দাউ দাউ আগুনটা একবার একদিক দিন করে অন্যদিক একদম অন্ধকার করে দিচ্ছিল। তাতেই আরও বেশি করে এলোমেলো হয়ে গিয়ে সফি বলে বসলো, তরমুজটা খান। খুব মিঠাজ। গজনি, কাবুল হয়ে এ-তরমুজের দানা আফগানরাই এক সময় আগ্রায় এনেছিল—

কথাটায় বনেদিয়ানা ছিল। ছিল ইতিহাস ? সে সবের ধার না ধেরে সনাতন বলে বসলো, তুমিও তো পুবী তরমুজ আগ্রা ঘরানাতেই রেখেছে ! আগ্রাই ডোরিয়া, আগ্রাই কুর্তি ! কিন্তু গঙ্গা শেষ হবার পর যে চলন বলন—তা যাবে কোথায় ?

মীনাক্ষীর তো নয়ই—সফিরও ইচ্ছে নয়—তার মীনা বানু অসলিয়ত ইয়াদদস্তে চেনা পহচানের দাগ পড়ে যায়। কবে কোন কালে সফি একজন বাছাই শাহী আহেদি ছিল; ছিল মীনাক্ষী ঘরদুয়ারি পাইকানঘরের বউ। আজ সে সব-পরিচয় ধোঁয়াটে। সফি কয়েদ হলে বাগী আহেদি হিসাবে তার কপালে জুটবে সাজা। মীনা বাঈয়ের পুরনো পরিচয় বেরিয়ে পড়লে শাহী হুকুমে সফিকে হয় ইসলাম ছাড়তে হবে—নয়তো ছাড়তে হবে মীনা বানুকে। তার চেয়ে এই যেমন আছে এই তো অনেক ভালো।

মীনাক্ষী মশালের দাউ দাউ আগুনটার কাছে গিয়ে সস্তার চর্বি আরও খানিকটা ঢেলে দিচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে সনাতন মীনা বাঈয়ের মুখ—চিবুক তোলা ভঙ্গি দেখে ভীষণ চমকে উঠলো। সে প্রায় উঠে দাঁড়াচ্ছিল।

ঠিক সেই সময় একই সঙ্গে দু'রকম কাণ্ড ঘটলো।

মীর সফি ঘোর কৃতজ্ঞ গেরস্থর মতোই মানী মেহমান সনাতনের হাত দু'খানি ধরে জোর করে বসিয়ে দিলো। এখন উঠবেন কী ! এই তো সবে সন্ধে। চরের বাতাস উঠবে এবার। বেলি চামেলির খুশবু চারিয়ে যাবে—চাঁদ উঠে আসবে দুর্গের মাথায়—

মশালের আগুনে চর্বির দানা পুট পুট শব্দ করে ফাটছিল। সেটা উসকে সরল করে দিতে দিতে মীনা বাঈ ভয় পাওয়া গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, এইরে নাচনেওয়ালি মেয়েটার ঘাগরায় মাতালগুলো যে আগুন দিয়ে দিলো।

আঁতকে ওঠা মীনা বানুর মুখে তাকিয়ে সফি বসে বসেই বললো, আরে

না না গুল মহম্মদ সেয়ানা চাষী। দ্যাখোগে নাচনেওয়ালির ঘাগরা ভরে জোনাকি বসিয়ে দিচ্ছে।—একথা বলতে বলতে মীর-ই-ফিলের দিকে তাকিয়ে বললো, ওই এক খেলা ওদের! আওরত একদম টেকে না ওদের নসিবে! তাই—

ঘোর লাগা চোখে সনাতন বাবরি আর দাড়ির জঙ্গলের ভেতর থেকে সুদূর গলায় কথা বলে উঠলো। সে স্বর শাহী মীর-ই-ফিলকে মানায় না। সফির কানেও ক্ষীণ শোনালো সে গলা।

সনাতন জানতে চাইলো, কেন? কেন?

—টেকে না তো। মরে যায়। চর জায়গায় গরমে বেশি গরম। শীতে বেশি শীত। এখানকার জল সয় না। হয়তো পালিয়ে গেল। কিংবা একটা আওরত নিয়ে পাঁচটা মরদে কাজিয়া বেধে যায় সময় সময়! তারপর—

—তারপর কী?

—তারপর ধরুন—ওদেরই ভেতর কোনো একটা মরদকে ভালো লেগে গেল তার—দিলচসপি হলো তো তাকে নিয়েই আওরতটা গায়েব হয়ে গেল। এই বিরাট হিন্দুস্হানে একবার গায়েব হলে কে কাকে খুঁজে পায়!

—তা সত্যি।

ঠিক তখন অন্ধকার ঘাসবন, হাঁটু ডোবা বালি বালি যমুনা ভেঙে রানাদিল দৌড়চ্ছে। পড়ি মরি করে। আগান বাগান ভেঙে। আর তাকে দেখতে না পেয়ে ফুর্তিবাজ মাতাল গুলমহম্মদ আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা এলোপাথাড়ি নদীর চরে ছড়িয়ে পড়ছিল। ফুর্তিতে, বাতাসে, নেশায়, ঢোলের চাঁটিতে আর এলোপাথাড়ি দৌড়ে ছুটে পালানো রানাদিলের ঘুঙুরের ছড়ানো বোলের ভেতর কে যেন একবার বলেও উঠলো, নগদ পাঁচ আশরফির মুজরো মাঙনা নাকি!

অন্য কে একজন দমফাটা হাসিতে ভুর ভুর করে বলতে লাগলো, জোনাকিগুলোকে মশালের আগুনের ফুলকি ভেবেই না অমন ডরালো—যেন আগুন ধরে গেছে ঘাগরায়!

যারা বলছিল—যারা শুনছিল—কেউই কারোর মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। মশালের আগুন এতবড় চরে আর কতটুকু আলো করতে পারে!

আগ্রা দুর্গে শাহজাদাদের মক্তবের লাগোয়া ঢাকা বারান্দায় অভ্রের উজ্জ্বল বাতিদানের আলোয় বিরাট তুজুক-ই-বাবরি খুলে বসেছিলেন শাহজাদা মহম্মদ দারাশুকো। বাঁ দিকে নাস্তালিক লিপিতে লেখা বাবর বাদশার জীবনের বাছা বাছা ঘটনা। শিকারে বাদশা বাবর। অসামান্য রূপসী খাদেজা বেগমের সামনে শাহেনশা বাবর। ডানদিকের পাতায় সেই সব ঘটনা ছবিতে এঁকে রেখে গেছেন তখনকার এক একজন নামি তসবিরওয়ালা। এক একটি ছবি দেখেন দারাশুকো—আর চুপ করে ভাবতে থাকেন—একশো বছর আগে বাদশা এমন ছিলেন। হিন্দুস্হান এমন ছিল। সময় জিনিসটা কী অদ্ভুত। একটা সময় কেটে গেল—তার ভেতর হারিয়ে যায় তখনকার সুখ, আহ্লাদ, ক্ষোভ, কলরোল।

তুজুক-ই-বাবরির ডানহাতের এক পাতায় পড়লো সুরদাসের আঁকা বিরাট একখানি ছবি। সবুজ একটি সাইপ্রেস গাছের নিচে ব্যাপারীরা আখরোট ওজন করছে। উট দাঁড়িয়ে। ওজন হয়ে গেলে আখরোটের বোঝা উটের পিঠে চেপে বাজারে চলে যাবে।

আরেকখানি ছবি। এঁকেছেন প্রেম। খাজা সি ইয়ারান-এ একটি জলাধারের সামনে বাবর বাদশা দাঁড়িয়ে। বাদশার চিবুকে চাঘতাই দাড়ি। চোখে তীক্ষ্ম চাউনি। জলাধারের কাজকর্ম খুঁটিয়ে দেখছেন। তৃষ্ণার জল। চাষের জল ধরে রাখার ব্যবস্থা ঠিকঠাক হয়েছে কি না। বাবরের মুখখানি সব মিলিয়ে মোলায়েম লাগলো দারার। খাজা সি ইয়ারানের এই জলাধার আজও তেমনি আছে। কাবুলের কাছাকাছি।

একটা তীক্ষ্ম চিৎকারে শাহজাদা দারাশুকো চমকে উঠে ঢাকা চত্বরের খোলা সামান-অলিন্দে এসে দাঁড়ালেন। নিচেই অন্ধকার যমুনার বালি বালি বুক। পাতি ঘাস। হাঁটুডোবা জল। কে কোথায়!

ফিরে আসবেন শাহজাদা। আবার সেই চিৎকার।

—বাঁচাও! কে আছো বাঁচাও—

দারা ঘুরে দাঁড়ালেন। মোরি দরওয়াজার কাছাকাছি নিচেই যমুনার জোলো জোলো বেলে জায়গার ভেতর এক জেনানা পড়ি মরি করে দৌড়ে এসে যেন বা আছড়ে পড়লো। এত উঁচু থেকে বোঝা যায় না কিছু। তাকে ঘিরে কুচি কুচি আলোর ফুলকিগুলো অন্ধকারে এই মাত্র হারিয়ে গেল।

শাহজাদা দারাশুকো থাকতে পারলেন না। মোরি দরওয়াজায় যেতে পিলখানার ভৈ আর মেঠরা তো অবাক। এই সময় শাহজাদা দারা কোথায় চললেন। তারা ছুটে তাঁর পেছন নিচ্ছিল। ছুটন্ত শাহজাদা হাত তুলে ওদের এগোতে নিষেধ করলেন।

কিন্তু দরওয়াজার পাহারা রাজপুত সেপাই শাহজাদাকে দেখেই সঙ্গী হয়ে পড়লো তাঁর। দারা অন্ধকার যমুনার পাড়ে পৌঁছে তাকেও এগোতে নিষেধ করলেন। তাঁর প্রথম যৌবনের তাজা সাহসী শরীরটা অন্ধকারে এমন একটা অভিযানের স্বাদ একাই পেতে চায়।

একা এমন সময়ে অন্ধকারে শাহজাদা কখনো বেরোননি। তিনি আন্দাজি পায়ে সড়সড় করে পিছলে একদম যমুনার বুকে নেমে পড়লেন।

রানাদিল কাছাকাছি একটা কিছুর পড়ে যাওয়ার শব্দ পেয়েই কোমর থেকে তার লুকোনো ছুরিখানা বের করে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ঘামতে লাগলো। যাকে সে মশালের ফুলকি ছড়িয়ে ঘাগরায় আগুন লেগে যাওয়া ভেবেছিল—এখন তা আর নেই। হাতের ডলুনিতে কয়েকটা জোনাকি উঠে আসায় তার ভুলও ভেঙেছে এই অন্ধকারে। অন্ধকারে কী একটা নড়ে উঠলো।

অমনি রানাদিল ফোঁস করে উঠলো। আর এক পা এগোলেই এই ছুরি বসিয়ে দেবো বললাম—যত্তো সব মাতাল! মুজরো নেবার সময় তোমাদের বলিনি? কী!

শাহজাদা দারা তো অবাক। কোনো জেনানা যে এমনভাবে কথা বলতে পারে তা একদম স্বপ্নের বাইরে ছিল শাহজাদার কাছে। তিনি অন্ধকারে খেয়াল রেখে বললেন, তুমি কে ?

—ন্যাকামি রাখো ! আমি কে ভালো করেই জানো তোমরা। নাচনেওয়ালি রানাদিলকে চেনে না আগ্রায় কে আছে গো এমন ! চেনো বলেই তো পাগল হয়ে উঠেছিলে সবাই। আগে জানলে এমন জায়গায় মুজরো নেয় কেউ ? যত্তোসব—। তুমি সেই ঢ্যাঙা মাতালটা তো। বুঝেছি। ঢোলে বেদম চাঁটি দিচ্ছিলে সারাক্ষণ—

শাহজাদা দারাশুকো টের পেলেন—এই সেই রানাদিল—যে কিনা রাজধানী আগ্রার মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে ব্যাপারিদের পসরার ফাঁকে ফাঁকে অলিতে গলিতে নেচে বেড়ায়। ঘুঙুরের বোল তুলে যমুনার তীর ঘেঁষা সন্ধ্যাবাজারেও নাচের আসর বসায়—যা কিনা নিজের চোখে দেখে—কিছুটা হাজিরা কোয়েলের মুখে শুনে বাজি শাহজাদী জাহানারা বেদম চটে আছেন।

—আমি শাহজাদা দারা—

—হুঃ ! সন্ধের পর অন্ধকারে আগ্রার সবাই ওই একটা নামই বলে থাকে ! আর এক পা এগোলেই মুণ্ডু নামিয়ে দেবো। আসলে তুমি কে বলো তো ? যে আমায় মুজরো করে এনেছিল তার গলা তো এত ওজনদার ছিল না—

দারাশুকোর এমন ভাষা—এমন কথা শোনার কোনো অভ্যেসই নেই। তিনি ফের বললেন, আমি শাহজাদা মহম্মদ দারাশুকো—। তুমি ?

আমি যে রানাদিল তা তো ভালো করেই জানো। ন্যাকামি রাখো। আসলে কে তুমি ? সেই ঢ্যাঙা মাতালটাই এসেছে তাহলে—

—কী ? মাতাল ? আমি ? অসলিয়ত বলো—যাই বলো—আমিই মহম্মদ দারাশুকো—। বলতে বলতে দারা এগোচ্ছিলেন। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিলেন না।

—সেই জালি মাতালটাই তাহলে এসেছে—বলতে বলতে রানাদিল পায়ে পায়ে পেছন দিকে এগোচ্ছিল। এক সময় পিছিয়ে যাওয়া শাহজাদার পিঠে এসে তার পিঠ ঠেকতেই সে চেঁচিয়ে উঠলো, কে ?

ছোরা তোলা হাতখানা আটকাতেই শাহজাদা দারা ঘুরে গিয়ে তোলা হাত সমেত রানাদিলকে মুখোমুখি জড়িয়ে ধরলেন। ছোরা আটকাতে এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না শাহজাদার।

তখনই পাহারার রাজপুত সেপাই হাত-বাতি ঝুলিয়ে ভাঙা পাড় ধরে সড় সড় করে চর জায়গায় এসে নামলো। শাহজাদা দেখলেন অনেক উঁচুতে আগ্রা দুর্গের আকবরি দরওয়াজার মাথায় সামান-বুরুজে পাহারা-সেপাইও আলো বদলের সময় নেমে পড়লো। তাহলে কি এত নিচে আমাদের দিকে ওখান থেকেও কিছু নজরে পড়লো !

জলজ্যান্ত জবরদস্ত রাজপুত সেপাই দেখে রানাদিল মুহূর্তে হাতের ছুরি ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো ! এ যে সেপাই—

রাজপুত পাহারাদার তখন কোমর থেকে ঝুঁকে পড়ে শাহজাদাকে কুর্নিশ করতে শুরু করেছে। রানাদিল শাহজাদা দারার পেছনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখছিল—অমন দশাসই সেপাই কোমর থেকে প্রায় দু'ভাঁজ হয়ে তার সামনের ইনসানকে রীতিমত সিজ্দা জানাচ্ছে।

এবার রানাদিল একটু সাবধান হলো। এই খানিক আগে এই মানুষটি তার ছুরি বাগানো হাতখানা সামলাতে তাকে আচমকা মুখোমুখি জড়িয়ে ধরেছিল অন্ধকারে। রানাদিল সেপাই দেখেই ভয়ে এক পাক খেয়ে এই মানুষটিরই পিঠের আড়ালে গিয়ে ছুঁয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইনি আসলে কে তাহলে ? একথা ভাবতে গিয়ে রানাদিল একটু দূরে সরে দাঁড়ালো।

যেসব গলা হুকুম দিয়ে থাকে—তেমন মাজা গলা বেরিয়ে এলো শাহজাদা দারাশুকোর মুখ থেকে। এক্ষুণি বাতি নেভাও। চৌকিতে গিয়ে পাহারায় দাঁড়াও—

রাজপুত সেপাইটি বিপুল এক ফুঁয়ে জোরালো বাতিদানের শিখাটি নিভিয়ে দিলো।

যমুনার চরে এখন ভারি সুন্দর বাতাস উঠেছে। মীর সফির কথায় সায় দিয়ে—তা সত্যি !—বলেও নিজের ভেতরে সনাতন হাতি টের পাচ্ছিল—ভেতরকার হাড়, পেশী কী এক অসম্ভব ভূমিকম্পে শিরায় শিরায় জড়িয়ে গিয়ে মহা অনর্থ জুড়ে দিয়েছে। শাহী মীর-ই-ফিল হয়েও পথচলতি ভিড়ের কোড়া খাওয়া মানুষের মতো লোকের বাড়ি সনাতনের এই প্রথম আসা। সেও একসময় এমন গেরস্থ মানুষ ছিল। তখন সে কোনোদিনও ভাবতে পারেনি—দিনগুলো কাটবে পিলখানায়। হাতির ভৈ আর মেঠদের চরিয়ে। রাতগুলো কেটে যাবে আলো আঁধারির ঝাপসা মতো ছবির ভেতর দিয়ে। কখনো হাতির শরাবে ভাগ বসিয়ে। কখনো বা রাজধানী আগ্রার শয়তানপুরায় শেষরাতে এ ঠেক সে ঠেকে তলানি চেখে চেখে।

মীর-ই-ফিল মশালের পাশে দাঁড়ানো মীনা বানুর মুখে তাকালো। মীনা বানু ঠিক কোনোদিকে তাকিয়ে নেই। তার পেছনেই বিশাল শরীর নিয়ে অতিকায় আগ্রা দুর্গ দাঁড়িয়ে। দুর্গের এখানে সেখানে আলো। বেশির ভাগটাই অন্ধকার। মুঘল তাগদের এই বিষ কেল্লা শেকড়সুদ্ধু কে উপড়ে ফেলতে পারে তা জানে না সনাতন। শাহী আসে। শাহী যায়। যেতে যেতেও কয়েকশো বছর। তখন আমি থাকবো না। ততদিনে মাটির এ-শরীরটা মাটিতেই মিশে যাবে। তার আগে আমি তো আমার কিছুই ফিরে পাবো না। আমাদের ঘরদুয়ারি পাইকান গেরস্থালি চিরদিনের মতো ধুলোয় মিশে গেল। যেমন যায় এক একটা শাহী তাগদের জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে। মীর-ই-ফিল সনাতন হাতি নিজের মনে মনেই বললো, ডোরিয়া, কুর্তি, ওড়নায় ফুলওয়ালি মীনা বানু এখন তুমি মীর সফির বেগম। বেগম সাহেবা কি বলতে পারেন—

শাহজাদা বিষ্ণু এখন কোথায় ? শাহজাদা কত বড়টি হয়েছে ? একবার কি তাকে দেখা যায় ? শাহজাদী লক্ষ্মীই বা এখন কোথায় ! কত বড়টি হয়েছে ? একবার কি তাকে দেখা যায় ? তুমি যে বেঁচে আছো—ভাবিইনি। বুকের ভেতরটা মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে গেল সনাতনের।

মীনাক্ষী ভুল করে একবারের জন্যেও বাবরি আর দাড়িতে ঢাকা মুখ-মাথার ভেতর বসানো সনাতন হাতির চোখে তাকালো না। সনাতনের মনে হলো মীনা বানু কিছুই দেখছে না। আশমানে চোখ রেখে যেন আগ্রার কররেখা পড়তে চেষ্টা করছে।

দেখতে দেখতে রাজধানী আগ্রার বিখ্যাত বর্ষা এসে গেল। ঝামা পাথরে বানানো শাহী সড়কে ঘোড়ারা যত্ন করে পা ফেলতে পারে না। তাই কাইমাখা রাস্তায় ওরা বারবার পা ঠোকে। সজুত হয়ে দাঁড়াবে বলে। কিন্তু সওয়ার পিঠে নিয়ে ছোটার সময় ওদের পা পড়ে নির্ভুল। সারা হিন্দুস্থান জুড়ে যে শব্দ—পথে ঘাটে—রাজধানীতে সবসময় পাওয়া যায় তা হলো ঘোড়ার পা ঠোকার শব্দ। কখনো দুলকি চালে। কখনো বা জলতরঙ্গ আর ডুগি তবলায় যুগলবন্দী লহরায়। এই আওয়াজ তামাম হিন্দুস্থানের সঙ্গী। এর পরেই সবচেয়ে যা আম জনতার সঙ্গে পরিচিত তা হলো আম। ঘোর বর্ষার ভেতর দেহাত থেকে হরেক নামের আমের টুকরি এসে জমেছে রাজধানীর মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে। মনসবদার খাচ্ছেন—খাচ্ছেন দিওয়ানখানার বড় আমলা। মরসুমের শেষদিকে মিশকিনরা খাবে—খাবে গরু-বাছুরের দল।

দেখতে দেখতে মাঠঘাট একদিন শুকিয়ে এলো। মাঠে মাঠে নাবি জাঙালে দেওয়া ধান পেকে উঠতেই পূর্ণিমার শেষ রাতে সাঁই সাঁই শব্দ তুলে টিয়ার ঝাঁক নেমে পড়ে। আজানের সুরে ভোর ফুটে ওঠার আগেই ওরা বাগোয়ানের জঙ্গলের দিকে উড়ে যায়। সেখানে মরসুমের শেষ জাম পেকে ঝরে পড়ছে। গাছের নিচে জানোয়ার, অভাবী মানুষজন সেই পাকা জাম খেয়ে পেট ভরায়। আর গাছের ডালে বসে টিয়ারা বেছে বেছে খায়।

শীতের মুখে এবার সস্তার পশমের লম্বা খির্কা গায়ে সুফী দরবেশরা রাজধানীর রাস্তায় দেখা দিলো। সামনেই বাদশা শাহজাহানের ওজন-ই-কমরী উৎসব। আশমানের চাঁদ মোতাবেক শাহেনশার জন্মতিথি। বছরের গোড়ার দিকে গেছে নওরোজ। তারপর সূর্য মোতাবেক বাদশার ওজন-ই-শামসী হলো। এবার এলো ওজন-ই-কমরী। এই তিন উৎসবে বছরে মোট তিনবার মনসব, খেতাব, ইজফার তালিকা বেরোয়। কোনো আহেদি পেল মনসবদারি। রোজিনাদার হলেন মনসবদার। কারও বা জুটলো খান-ই-খানান খেতাব। কেউ বা পেল জায়গির। আবার কেউ পেল রাহাদারি। রাস্তার দেখাশুনো থেকে খাজনা।

দেওয়ান-ই-খাসের ঢাকা চত্বরের বাইরে আশমানের নিচে বেশ কিছু ঘিয়ে রঙের তাগড়া দাগমুণ্ডী ভেড়া, কালো কুচকুচে বর্বারি ছাগল আর চন্দনা পাখি

দেখাশুনো করছে একজন দাখিলা। গুনলে দেখা যাবে ভেড়া, ছাগল, পাখি—সবই আটত্রিশটি করে আছে। আজ বাদশা শাহজাহানের আটত্রিশ বছর বয়স হলো।

সেই সুবাদে ভেড়া, ছাগল, পাখিগুলোকে নিজের হাতে বাঁধন খুলে দিলেন বাদশা। ফতেহাবাদ থেকে কয়েকজন চাষী নতুন পোশাক পরে এসেছে। ভেড়া ছাগলগুলো তাদের দিয়ে চন্দনা পাখিগুলোকে উড়িয়ে দেওয়া হলো। তারা উড়তে উড়তে উঁচুতে হাতিপোল দরওয়াজা বরাবর দুর্গের সামান বুরুজে গিয়ে বসলো। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শাহী নজুমীর গুনেগেঁথে বললেন, বাদশার পক্ষে এটা খুব সৌভাগ্যের লক্ষণ।

শাহেনশা তাঁর কথায় কানও দিলেন না। মুঘল দরবারে সভাকবির সঙ্গে সঙ্গে শাহী গণতকার থাকাও বনেদিয়ানারই চলন। কিন্তু এই নজুমীরের কথা বিশেষ মেলে না। দেওয়ান-ই খাসে ফৌজের বড় বড় মনসবদার, নগদি-জায়গিরদার কয়েকজন, গেঁহুর কারবারি বনজারা চৌধুরীরা তিনভাই, মির্জাপুরের রেশম কারবারিরা—আরও অনেকে বসে। শাহেনশা একবার আড়চোখে সবাইকে দেখে নিলেন। ওরা বাদশার মবারকে নজর নিয়ে এসেছে। তা নিয়ে কাউকে খেলাত দেওয়া হবে। কারও মনসবির ঘোড়সওয়ার বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

কিন্তু তার আগে বাদশার তুলাপুরুষ হবে। শাহজাহান বিশেষভাবে ঝোলানো পাল্লায় গিয়ে একটি দীবানে বসলেন। অন্য পাল্লায় রুপো চাপানো শুরু হলো। গত ওজন-ই-শামসীতে বাদশাকে সোনা, পারদ, রেশমি কাপড়, মৃগনাভি, ঈঙ্গুদী মূল, ঘি, লোহা, তুঁতে, লবণ—এইসব দিয়ে ওজন করা হয়েছিল। এবার রুপোর ওপর দেওয়া হলো লবঙ্গ, বেনারসি, সীসা, আঙুর, সর্ষের তেল। দাঁড়িপাল্লার এক তৌলে বাদশা। অন্য তৌলে ওসব। দু'টি তৌল সমান সমান হতেই শাহজাহান নেমে পড়লেন। এবার ওই বেনারসি, সীসা, আঙুর-টাঙুর নেবার জন্যে কয়েকজন দরবেশ, আলেম, হেকিম এগিয়ে এলেন। ওসব ওঁরাই পেয়ে থাকেন।

ওজন-ই-ক্বমরী শেষ হতেই একটা লম্বা রেশমি ডোরির দিকে দেওয়ান-ই-খাসের সবাই তাকালেন। ডোরিটা শাহী মসনদ থেকে দেওয়ান-ই-খাস পেরিয়ে সিধে অন্দরমহলে চলে গেছে। ভেতর থেকে একজন বাঁদি বেরিয়ে এসে মুঘল ধ্বজ তুলে ধরলো। সবাই হাফ ছেঁড়ে বাঁচলো। তার মানে—ডোরিতে আটত্রিশ নম্বর গিঁটটি দেওয়া সারা।

বাদশা তুলাপুরুষের তৌল থেকে নেমে মসনদের দিকে হেঁটে আসছেন। তাঁর কপালে তিনটি ভাঁজ। দু'একজন ওমরাহ তা দেখতে পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বাদশা কী নিয়ে ভাবছেন এত—যাতে কিনা এমন শুভ উৎসবের দিনেও কপালে ভাঁজ পড়ে? তাও তিনটে?

শাহজাহান সত্যিই চিন্তিত। খেলাত যাঁরা পাবেন তাঁদের ভেতর মীর-ই-ফিল সনাতন হাতিরও নাম রয়েছে। ওই পদে সনাতন আসার পর পিলখানা

রীতিমত ঝকঝকে। হাতিদের অসুখ বিসুখ কমে এসেছে। সংখ্যায়ও ওরা দিব্যি বাড়ছে। সনাতনকে ফৌজের সব হাতির বকসি পদে বসানো হচ্ছে। এখন থেকে কয়েক হাজার হাতি দেখবে একা সনাতন। লড়াইয়ে, শান্তিতে হাতি খুব জরুরি। কাজটা কি ঠিক হচ্ছে ?

।।সাঁইত্রিশ ।।

শীতের শেষে আগ্রা দুর্গের ভেতরকার লম্বাই চওড়াই চাতাল জুড়ে পড়ন্ত বেলায় অদ্ভুত এক ছায়া পড়ে। এই সময়টায় সেই ছায়ার ভেতর কেল্লার সামান বুরুজে পাহারা বদলায়। তারপরেই আসরের নামাজ শুরু হয়ে যায়।

আত্তা হেয়াতুলিল্লাহে সালায়েতু
অত্তে ইবায়তু ওয়ালেনায় আঁলায়-য়-য়

শাহজাদা দারাশুকো কেল্লার ভেতরকার চত্বরে বাংলা মহলের সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অস্ফুটে আসরের নামাজের এই সুরেলা ধ্বনির সঙ্গে নিজের গলা মেলালেন। নামাজের এই সুন্দর সুর তাঁর বড় ভালো লাগে। তিনি একা একাই পশ্চিমে তাকিয়ে বলতে লাগলেন—

এবাদুল্লাহে আসসালে আলেহিম
ওয়ালে আলেহিম কামায় বায়েত্তার
ওয়ালে ইব্রাহিম আলে ইব্রাহিম

খানিক বাদে ওদিকেই সূর্য টুপ করে খসে পড়বে। তখনই দেওয়ান-ই-আমের লাগোয়া সলিমগড়ে নহবতখানায় সানাই সন্ধ্যার ঘুম ভাঙবে। দেওয়ান-ই-আমে সাধারণ মানুষ-জনের জমায়েতে গান বাজনা শোনবার জন্যেই দাদাসাহেব এই নহবতখানা বানান। দারা দেখলেন, বাংলা মহল এখনো ঘুমন্ত। ওখানে আকবর বাদশার আমল থেকেই বিদেশিনীরা থাকেন। ওঁরা ইস্পাহান, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, সমরখন্দের বাজার হয়ে বাদশাদের খেয়াল-খুশিতে আগ্রা দুর্গে এসে ঢোকেন। স্রেফ এন্তেকালেই ওখান থেকে ওঁদের বিদায়।

আকবর বাদশার এন্তেকালের দশ বছর পরে আমি পয়দা হয়েছি। আচ্ছা, এখানে হয়তো বাংলা মহলে এমন কোনো আর্মানি কিংবা ইস্পাহানি সুন্দরী রয়ে গেছেন—যিনি হয়তো শীতের এমনই পড়ন্ত বেলায়—কুমকুম, আতর, সুর্মায় মনোহারী হয়ে আকবর মহলে ঢুকে সেদিনকার হিন্দুস্থানের বাদশাকে খানিকক্ষণের জন্যে বিস্মিত করে তুলতেন। বাদশা আনমনা হয়ে পড়তেন। আজ এই পড়ন্ত বেলায় সেই সুন্দরী কোন্ স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছেন ?

যদি তাঁর সামনে গিয়ে তাঁর মুখে তাকাতে পারতাম ! —কিন্তু শাহজাদা জানেন, বাংলা মহলের দুয়ারে যাওয়াও তাঁর পক্ষে শোভন হবে না। ঘুরতে ঘুরতে দারা হাউজ-ই-জাহাঙ্গীরির লাল পাথরের উঁচু পাটাতনের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশা আমি পয়দা হওয়ার ঠিক চার

বছর আগে হাউজ-ই-জাহাঙ্গীরি বানান। বড় হাউস তখন তাঁর মনে। বয়স বিয়াল্লিশ। এখানেই তিনি সে বছর নূরজাহান বেগমকে শাদি করেন। কী জুলুস, কী ধুমধাম হয়েছিল সেদিন এখানে—তা কল্পনায় নিজের চোখের সামনে ভেবে নেবার চেষ্টা করলেন শাহজাদা।

হাউজ-ই-জাহাঙ্গীরির পরেই ডানদিকে হামাম শাহী। শ্বেতপাথরের চত্বরের ওপর ষোলোটি ফোয়ারা একসঙ্গে জলের গুঁড়ো উঁচুতে তুলে নিচে ফেলে চলেছে। দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশা, পরদাদাসাহেব আকবর বাদশা—দু'জনই আতরে গুলালে ওখানে নাহান উৎসব করেছেন কত। বাদশার নিত্যদিনের স্নানও তো উৎসব বটে! একবার ভেতরে উঁকি দিলেন শাহজাদা। মনে হলো—যদি দেখি—আকবর আর জাহাঙ্গীর—বাবা আর ছেলে—হিন্দুস্থানের দুই বাদশাও বটে—দুই ভিন্ন সময়ের—একই সঙ্গে পাশাপাশি দুই ফোয়ারায় স্নান করছেন! দুই আমলের দুই রকমের বাঁদিরা তাদের নিজের নিজের বাদশার গায়ে মনপসন্দ সুগন্ধি পেটি উপুড় করে ঢেলে দিচ্ছে—তাহলে? হামাম শাহীর ভেতরে ফোয়ারাগুলোর ঠেলে ওঠা জলের তোড় খানিক উঠেই প্রায়-সন্ধ্যার নরম আলোকে ভিজিয়ে দিয়ে আবার নিচে পড়ে যাচ্ছে। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো শাহজাদার। তিনি কেঁপেও উঠলেন।

তখন যেন পরদাদা আকবর বাদশা ফোয়ারার পড়ন্ত জলে স্নান করতে করতে বলছেন, শেখু বাবা। মসনদ কেমন লেগেছে?

দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশা পাশের ফোয়ারার নিচে শোয়া অবস্থাতেই বললেন, আলা হজরত! আব্বা হুজুর আমায় ক্ষমা করবেন। এই অবস্থায় উঠে দাঁড়াতে পারছি না। দাঁড়িয়ে উঠে আপনাকে সিজদা জানানোই উচিত ছিল।

—না না শেখু বাবা। যেমন আছো—তেমন অবস্থাতেই বলো। শাহী আছে। আগ্রা দুর্গ আছে। হামামও আছে। মাঝখান থেকে আমরা দু'জনই তো আর নেই! এখন আর তসলিম, কুর্নিশ, সিজদায় কাজ কী?

—বন্দেগান! দু'জনই আর বাদশা না থাকি—আপনি যে আমার ওয়ালিদসাহেব—আব্বা হুজুর। আমি আপনার আওলাদ। মসনদে বসে এই কথাটাই কখনো ভুলতে পারিনি—যা কিনা একবার ভুলে গিয়ে, মাত্র একবার —ইলাহাবাদের সুবেদার থাকতে মসনদের লালচে এই আগ্রা দুর্গে হামলা করেছিলাম।

পরদাদা আকবর বাদশার গলা যেন গমগম করে উঠলো। তিনি ফোয়ারার জল পড়ার অবিরাম শব্দের ভেতর ভীষণ পুরুষালি গলায় হো হো করে হেসে উঠলেন। থেমে বললেন, শেখু বাবা। তখন তোমার কাঁচা উমর। তেজী সুবেদার তুমি। ওসব ভুলে যাও। আমি তো কবে ভুলে গেছি। ওজন্যে আমার এন্তেকালের সময় তুমি যখন কাঁদছিলে আমার পায়ের কাছে বসে— তখনই তো তোমায় ক্ষমা করে দিয়েছি।

দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশা ফোয়ারার জলের ভেতরেই শ্বেতপাথরের

পাটাতনে উঠে বসলেন। শাহজাদা দারা দেখলেন, বাদশা নুরুদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীরের মাথায় সেই বিখ্যাত উষ্ণীষ নেই। চওড়া গর্দানের ওপর কাঁচাপাকা চুল জলে ভিজে যাচ্ছে। তিনি মগ্ন গলায় বললেন, বাবা খুর্‌রম বাগী হয়ে নাসিকের কাছে আসিরগড়ের কেল্লায় বসে থাকলো। যত ডেকে পাঠাই—আসে না। শেষে তার দুই ছেলে সুলতান দারা, সুলতান আওরঙ্গজেবকে আমার কাছে রাওয়ালপিণ্ডি দুর্গে পাঠিয়ে দিয়ে বসে থাকলো। হুকুম পাঠালাম। সামনে এসে দাঁড়াও। তবু এলো না। এত দেরি করলো যে আমাদের আর দেখাই হয়নি—

দাদাসাহেবকে আগেকার মতোই লাগলো শাহজাদা দারার। এই ক'বছরে বিশেষ পালটাননি। কথা বলার সময় বাঁদিকে নিচের ঠোঁটটা একটু কুঁচকে যাচ্ছে। সে পিচফল মুখে দেওয়ার সময়েই হোক আর গোলা দেগে তোপের নিশানাদারি দেখার হুকুম দেবার সময়েই হোক—নিচের ঠোঁট বাঁদিকে অমন করেই কুঁচকে যেতো।

পরদাদা আকবর বাদশা বললেন, ক্ষমা করে দিয়েছো তো!

—কবেই আব্বা হুজুর! হাজার হোক বাবা খুর্‌রম আমারই তো আওলাদ। হিন্দুস্থানের সেরা লড়াকু। মসনদের লায়েক শাহজাদা।

—বাবা শেখু! ওসব বড় কথা নয়। বড় কথা হলো ক্ষমা। বড় কথা হলো দোস্তালি, পেয়ার, করুণা। এ-ই-হলো ইনসানের ধর্ম। রাগ, হিংসা থাকলে দেখবে নিজের খুনের ভেতর একটা তুর্কি ঘোড়া দৌড়চ্ছে। যখনই দোস্তালি আসবে—পেয়ার আসবে—দেখবে খুন শান্ত হয়ে এসেছে।

হামামশাহী পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল। যমুনার ওপারে এইমাত্র সূর্য ডুবলো। আচ্ছা! এসব যদি সত্যি সত্যিই ঘটতো। একই আগ্রায় বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান—সব শাহেনশাই একসঙ্গে যদি দরবার-ই-খাসে হাজির হতেন আজ এই সন্ধ্যায়। কেমন হতো? কোনো অলৌকিক জোরে আসলি কোনো ফকির কি মরহুম সব বাদশার সঙ্গে জিন্দা বাদশাকেও একই জায়গায় হাজির করতে পারেন না? তাহলে এক কালের তাগদদার সব বাদশার কাছ থেকে অনেক কিছু জেনে নিতে পারেন জিন্দা বাদশা। জেনে নিতে পারনে—কে গদ্দার? কে ইমানদার।

শাহজাদা দারা আর ভাবতে পারলেন না। তাঁর নিজের খুনের ভেতরেও কি একটা তুর্কি ঘোড়া দৌড়চ্ছে? নহবতখানা থেকে সানাই বেজে উঠেছে। দারা ডান হাত দিয়ে তাঁর বাঁ হাতের রগ টিপে ধরলেন। নিয়মিত তালে কী যেন একটা দৌড়চ্ছে। তবে ঘোড়ার পায়ের শব্দ নয়। এ শব্দটা এমন—ঢিপ, ঢিপ, ঢিপ।

পেছন ফিরলেন শাহজাদা। এখন তাঁর বাঁ দিকে খাসমহল। আলো জ্বালানো হয়নি। ওখানে বসে বাদশা শাহজাহান তাঁর আব্বা হুজুর জাহাঙ্গীর বাদশার মতোই সোনালি আঙুর, খোবানি খেতে খেতে অনেক নিচে বেহেদর হাতিদের লড়াই দেখেন।

ডানদিকে শ্বেতপাথরের মুথাম্মন বুরুজে আলো জেবলে দিয়ে গেছে। দারা জানেন, ওখানে দুটো গভীর ছাড়াও অল্প গভীর সব জোড়ের ফাঁক রয়েছে। পরদাদা আকবর বাদশা রোজ ভোরে একটি করে মোহর ওর কোনো একটা জোড়ের ফাঁকে ফেলে দিতেন। যে খুঁজে বের করতো—সে সেদিনকার মতো আকবর বাদশার সঙ্গী হতে পারতো।

শাহজাদা দারা নিজের চুনোটি আঙরাখার ভেতরে হাত গলিয়ে একটি মোহর বের করলেন। তারপর মুথাম্মন বুরুজের গভীর একটা জোড়ের ফাঁকে তা ফেলে দিয়ে দাঁড়ালেন।

অমনি বুরুজের ওপাশ থেকে একখানি ভারি হাত যেন সেই মোহরটাই এইমাত্র খুঁজে বের করে শাহজাদার চোখের সামনে বুরুজের ওপর রাখলো। হাতের মালিককে দেখা যাচ্ছে না। তাঁর উষ্ণীষটি সামান্য দেখা যাচ্ছে। তিনি যেন বুরুজের ওপাশেই থাকতে চান। উষ্ণীষের সরতাজ পালকটি হিন্দুস্থানে কে না চেনে! দারা চমকে উঠলেন। এও কি সত্যি হতে পারে? স্বয়ং পরদাদা আকবর বাদশা যে তাঁর সামনে। বুরুজের ওপিঠে। হ্যাঁ। মোহরটি বাড়িয়ে দেওয়া হাতের আঙুলের দস্তবন্দে সেই হিরে। ঝিকমিক করে উঠলো। আজ সন্ধ্যায় কী হয়েছে? আমার দুপুরের নাস্তায় আবদারখানা থেকেই কিছু মিশিয়ে দেয়নি তো? যা মনে মনে ভাবি—তাইই ঘটে যাচ্ছে কী করে? একদম ছবির মতো। এ কি দ্রব্যগুণ?

বুরুজের ওপাশ থেকে ভারি গলা ভেসে এলো।—হ্যাঁ দারা। আমি আকবর বাদশা। তোমার পরদাদা। মোহর খুঁজে বের করেছি। এখন থেকে কাল সন্ধে অব্দি আমি তোমার সঙ্গী। তোমার সঙ্গে একই দস্তরখানা পেতে নাস্তায় বসবো। পিলখানায় গিয়ে তোমার পেয়ারের হাতি ফতে-জংয়ের শুঁড়ে হাত বোলাবো—

শাহজাদা দারার আনন্দ ধরে না। তিনি এখন থেকে কাল সন্ধে অব্দি আকবর বাদশার সঙ্গে থাকতে পারবেন। এ তো বিশ্বাস হয় না। তিনি বলে উঠলেন, আমিও আপনার ফিল-ই-ইলাহির গায়ে হাত দিয়ে দেখবো একবার।

—সে তো আর নেই দারা। আমার সঙ্গে সঙ্গে বড় হয়েছে। আমরা প্রায় একবয়সী ছিলাম।

—ওঃ! বলে দারা আর কিছু বলতে পারলেন না।

তাঁর পরদাদা বললেন, চাই কি ঘোড়ায় চড়ে আমরা দু'জনে কাল ভোরে একবার ফতেপুর সিক্রি ঘুরে আসতে পারি। সেখানে ইবাদতখানায় কতদিন যাইনি। ভালো ভালো পুঁথি ইস্পাহান, গজনি, কাভাইরো থেকে যোগাড় করে ওখানে এনে রেখেছিলাম।

শাহজাদা কৃতিত্বের হাসি হেসে বললেন, হজরত। আপনার সেসব পুঁথি এখন এখানে!

—কোথায়?

—এই আগ্রা দুর্গে। শাহী মক্তবের পাশে গুছিয়ে যত্ন করে রেখেছি। আমরা দু'জনে—আমি আর মক্তবের দৈলেমি সাহেব।

—যাক্ ! বাঁচালে। আমার খুব চিন্তা ছিল। আমি জানি যোগ্য হাতেই পুঁথিগুলো পড়েছে। কবিতা, দর্শন, ইতিহাস—যেখানে যা ভালো মনে হয়েছে —তাই একসময় যোগাড় করতাম। এজন্যে শাহী কাসীদ লাগিয়ে রাখতাম দেশে দেশে। ইস্পাহানে, তুর্কিস্তানে। কোথায় নয়। তারা পুঁথির খবর আনতো দারা। জীবনী, অঙ্কশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র—সব—সব

—জানি। আপনি বাদশাদের বাদশা। ফতেপুর সিক্রি থেকেই মালফুজাত-ই-তৈমুরা পেয়েছি। বলা যায় জিন্দানামা-ই-তৈমুর।

বুরুজের ওপাশ থেকে আগ্রহভরা সেই কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।—পেয়েছো ? দেখেছো ?

—হ্যাঁ পরদাদা। ওই পুঁথি তৈমুর বাদশার শুধু জিন্দানামাই নয়—ওখানে শাহী চালানোর দস্তুরও তিনি আঁটঘাট বেঁধে বলে গেছেন ?

—মালফুজাত-ই-তৈমুরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছো ?

—হ্যাঁ। আলা হজরত।

—তাহলে তো কামাল করে দিয়েছো। তুজুক-ই-বাবরির ছবিগুলোর রং দেখেছো ? হিন্দুস্থানের জমিন, গাছপালা, আশমান, দরিয়ায় যত রং আছে সব রং ওইসব ছবিতে ঢেলে দেওয়া হয়েছে।

দূরে হাতিপোল দরওয়াজার কাছাকাছি শাহেনশা শাহজাহানের হুকুমে কারিগররা দিনরাত কাজ করে শিশমহল গড়ে তুলছে। ভেতরে আরশিতে আরশিতে ছয়লাপ। সেগুলো পাথরের দেওয়ালে বসানো হচ্ছে।

হঠাৎ শাহজাদা বলে বসলেন, আমার ওয়ালিদসাহেব বাদশা শাহজাহান সমসময় কিছু না কিছু বানাচ্ছেন। হয় লড়াই করো—না হয় মসজিদ বানাও —না পারলে নিদেনপক্ষে একটা মহল তোলো। চলছেই—

আকবর বাদশা বললেন, খুররম তো। ওর ভেতরে কী করবো—কী করবো —এমন একটা অস্থিরভাব সবসময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে—

—দিল্লি আগ্রা দু'জায়গাতেই শাহেনশা একই সঙ্গে বিশাল মসজিদ গড়ে তুলছেন।

—জানি দারা। দিল্লিতে রিয়াসত নিয়ে যাবে বলে সেখানে শাহজাহানাবাদ গড়ে উঠছে। নয়া রাজধানী তৈরি হয়ে এলো বলে। তখন আমাদের শও সনের রিয়াসত আগ্রার মুখে ছায়া পড়বে।

—শাহেনশা। আমি আপনার আগ্রা ছেড়ে কোথাও কোনোদিন যাবো না।

—তা কি বলা যায় দারা ! আমিও তো একদিন আমার নিজের হাতে গড়া ফতেপুর সিক্রি ফেলে চলে এসেছি—

শাহজাদার মনে হলো, পরদাদার গলার স্বর কিছু আনমনা হয়ে পড়লো। এতক্ষণ আকবর বাদশার শুধুই হাতখানি আর সে হাতের আঙুলে পরানো স্রেফ দস্তবন্দটি দেখেই তাঁকে এই বিখ্যাত মানুষটিকে পুরোপুরি দেখার লোভ সামলাতে হয়েছে। পাছে অতি আগ্রহে মানুষটি হাওয়ায় বেমালুম গায়েব হয়ে যান—তাই শাহজাদা ইচ্ছে করেই মুথাম্মন বুরুজের ওদিকটায় যাননি।

নিজেকে সংযত রেখেছেন। হিন্দুস্থানের মসনদে সবচেয়ে বেশিদিন বসেছেন এই মানুষটি। তাঁর গলার বিষাদ যেন তাঁকেও আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। শাহজাদা বলে উঠলেন, হাফিজ তো আপনার ভালো লাগতো?

—কী করে জানলে?

—আপনার ইবাদতখানায় হাফিজ, সাদি—দুইই পাওয়া গেছে।

—আমার নয় দারা। ইবাদতখানা গড়েছিলাম তামাম হিন্দুস্থানের জন্যে। ইস্পাহানের সিরাজে থাকতেন হাফিজ। ভেবেছিলেন, হিন্দুস্থানে আসবেন। একবার নাকি বাদশা তৈমুরের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হয়। একটি দিওয়ানে তিনি হিন্দুস্থানের তোতাপাখির কথা বলেছেন।

—কই? এসব তো জানতাম না।

বুরুজের ওপাশের কণ্ঠস্বরে আগ্রহ জেগে উঠলো। আরও শুনবে? হাফিজ বলেছেন, নিয়তির চোখে ফকির বাদশা—দুইই সমান। দুনিয়ার লড়াই, লালচ, ওঠাপড়ার ঘূর্ণির ভেতর তিনি খুঁজেছেন স্থির নাভিপদ্ম। তাঁর জানকারি ছিল—এই দুনিয়ার আসল মানে কী? কিমতটাই বা কী?

গাঢ় গম্ভীর স্বরে দুর্গ চাতাল যেন এতক্ষণ কাঁপছিল। আকবর বাদশা যেন দম নিতেই থামলেন।

শাহজাদা পরিষ্কার তেজী গলায় বলে উঠলেন—

ব বু-এ-নাফা কি আখির
সবা য তুররা বকুশায়দ

সঙ্গে সঙ্গে বুরুজের ওপাশের গলায় তারিফদারি ফুটে উঠলো।—বাঃ! চমৎকার! খোঁপা থেকে মৃগনাভির সুরভি ভেসে এসেছিল ভোরের হাওয়ায়—আচমকা থেমে পড়লেন আকবর। ভালো জায়গাটি বেছেছো। কিন্তু কারিগরদের সারাক্ষণ ধরে এই খটাখট শব্দের ভেতর হাফিজের দম বন্ধ হয়ে উঠবে না?

—আলা হজরত! আমারও তাই মনে হচ্ছিল। চলুন দেওয়ান-ই-খাসে গিয়ে বসি দু'জনে। সেখানে আজ কোনো দরবার বসছে না নিশ্চয়—

—ফৌজিকে নিয়ে কতদিন ওখানে বসেছি। তার রুবায়-ই শুনতে শুনতে কখন মাঝরাতে পৌঁছে গেছি—খেয়ালই হয়নি। চলো।

শাহজাদা দারা নেমে পড়লেন। কিন্তু—দাদাসাহেব এই অবেলায় হামামশাহীতে একা পড়ে থাকবেন? ওঁকেও তো আমরা সঙ্গে করে দেওয়ান-ই-খাসে নিয়ে যেতে পারি। যদি আপনার কোনো—

দারাকে থেমে পড়তে দেখে আকবর বাদশা বললেন, কে? সেলিম? শেখুবাবা তো ফোয়ারার গরম পানিতে এই শীতের সন্ধ্যায় ইচ্ছে করেই নাহান জুড়েছে। চাঙ্গা হবে বলে—। থাক না। যার যাতে আনন্দ।

—তাহলে চলুন—বলে শাহজাদা আগে আগে পা ফেলে সিঁড়ি ভেঙে আঙুরিবাগের ঢাকাপথ ধরলেন। যাবেন দেওয়ান-ই-খাসে। এগিয়ে যেতে যেতে পেছনে একবার যেন আকবর বাদশার গলাও পেলেন। তিনি যেন

বললেন, চলো—

খানিক এগিয়ে শাহজাদা দারা তাঁর পরদাদাকে দেখার লোভ আর সামলাতে পারলেন না। সামনেই দেওয়ান-ই-খাস। ফাঁকা কিন্তু স্তম্ভে স্তম্ভে অভ্রের বাতিদান থেকে আলো ঠিকরে পড়ায় সারাটা চত্বর যেন ঝলমল করে উঠেছে। আসুন—বলে ফিরে তাকালেন দারা।

কোথায় কে! পেছনের ঢাকা পথে কেউ তো নেই। এতক্ষণ তাহলে কার সঙ্গে কথা বলেছি? শাহজাদা আবার আলো ঝলমলানো দেওয়ান-ই-খাসে তাকালেন। সেখানেও কেউ নেই। সারা চত্বর ফাঁকা। সব মিছে?

শাহজাদা মহম্মদ দারাশুকো দড়াম করে পড়ে গেলেন। দুর্গের সব জায়গাতেই পাহারা, হাজিরা, দাখিলা সব সময়ের জন্যে মজুত থাকে। দেওয়ান-ই-খাসের বাইরে খোলা চত্বরে তখন জাহাঙ্গীর বাদশার আমলের উজিরে আজম আসফ খাঁয়ের খাস গোলাম বেনারসি দাঁড়িয়েছিল। বেনারসি একজন খোজা। সে একই সঙ্গে হরিণ আবার বাঘেরও মতো বটে—ছুটে এসে শাহজাদার মাথাটি বসে পড়ে নিজের কোলে নিলো।

বাদশা-বেগম মমতাজমহলের শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। তিনি আবার মা হবেন। বিকেল থেকেই শরীরটা কেমন করছে মমতাজমহলের। তিনি অন্দরমহলের হাজিরা বাঁদিকে পাঠালেন তাঁর ছোটবোন মেহজবিনকে ডেকে আনতে। বোন আর তাঁর স্বামী খলিলুল্লা খাঁ দুর্গেরই আরেকদিকে থাকেন। খলিললুল্লা খাঁ বাদশা শাহজাহানের ভায়রাভাই, বন্ধু, আবার বয়স্যও বটে।

মেহজবিন মমতাজমহলের চেয়ে বয়সে ছ'বছরের ছোট। মমতাজ শুয়ে ছিলেন। সামনের সুখদোলাটি খালি। মাঝে মধ্যে ওখানেও বসেন তিনি। মেহজবিন দুয়ারে দাঁড়িয়েই কুর্নিশ করতে যাচ্ছিলেন।

মমতাজমহল শুয়ে শুয়েই বললেন, ওসব রাখ তো! কাছে আয়—বোস্।

সুখ পালঙ্কের কিনারায় দাঁড়িয়ে মেহজবিন বললেন, বাজি। তুমি তো আর সেই আরজুমন্দবানু নও! এখন তুমি মমতাজমহল—হিন্দুস্থানের বাদশা-বেগম।

—আমি আমিই বোন। তুই তো দেখতে আরও সুন্দরী হয়ে উঠেছিস—

—তুমি কম কিসে বাজি! হেকিম সাহেব কী বলছেন— ? কবে?

—বলছেন তো জিলকাদ মাসের মাঝামাঝি। বলতে বলতে মমতাজমহলের চোখ পড়লো দুয়ারে। সেখানে একটি হাতবাতি ডান হাতে ঝুলিয়ে যেন বা কোনো গোলাপি মর্মরের মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে।

—মেয়েটি কে? —বলতে বলতে মমতাজমহলের চোখ কিশোরী মেয়েটির দীঘল চেহারার আগাগোড়া ঘুরে এলো।

—আমার হাজিরা বাজি।

মমতাজ বুঝলেন, বাদশা শাহজাহানের হুকুমে শালীর জন্যে হাজিরার ব্যবস্থাও হয়েছে তাহলে! মুখে বললেন, আগ্রার মেয়ে? সারাদিন থাকে? না,

সন্ধ্যার পরেই দেহাতে ফিরে যায় ?

—হাসালে বাজি ! চিনলে না ? ও তো সেই না-লায়েক শাহজাদা পরভেজের মেয়ে—করিমউন্নিসা—দুর্গেই থাকে। বাড়ি যাবে কি ! আমার দিনরাতের হাজিরা যে—

সঙ্গে সঙ্গে মমতাজের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। এই মেয়েটিও তো হিন্দুস্থানের একজন শাহজাদী হতে পারতো। আমার জাহানারা, রোশনআরার মতোই। নসিবের ফের ! তিনি ছোটবোনের মুখে তাকিয়ে মনে মনে বললেন, আচ্ছা ! তোমায় উচিত শিক্ষা দেবো। আমি বিছানায় শুয়ে—আর তুমি বাদশার চোখে পড়ে আদুরে আদুরে গলায় যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াচ্ছো। যা চাইছো তাই বাদশা যোগাচ্ছেন—

অনেক রাতে বাদশা শাহজাহান অন্দরমহলে এলেন। মমতাজ তখনো জেগে। ভেবেছিলেন বাদশার সঙ্গে নিজের থেকে কোনো কথাই বলবেন না। কিন্তু শাহজাহান ঢুকলেন রীতিমত চিন্তিত মুখে। পেছনের দিকে একহাত আরেক হাতকে ধরে আছে ঃ কপালে ভাঁজ।

—কী হলো ? আমার সরতাজ ?

বাদশা মুখ তুলে তাকালেন। অন্যমনস্ক। মমতাজ ইদানীং তাঁকে মাথার মুকুট—সরতাজ বলেই ডাকেন। বাদশা বললেন দারার কথা। আজ সন্ধের ঝোঁকে হিন্দুস্থানের পহেলা শাহজাদা দুর্গের ঢাকাপথে দেওয়ান-ই-খাসের কাছে মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। শেষে বললেন, শাহী তো তাগদের ব্যাপার। এ কোন্ বেমারি ধরলো শাহজাদাকে ?

ছেলের জন্যে বাবা এত ভাবছে দেখে বাদশা-বেগমের মনের মেঘ কেটে গেল। তিনি বললেন, এই কথা ? তা আপনি এখন নিশ্চিন্তে ঘুমোন। কাল ভোরেই এ বেমারি ইলাজের দাওয়াই বাতলে দেবো।

বাদশা শাহজাহান অবাক হলেন। কিন্তু মমতাজমহলকে বিশ্বাসও করলেন। আগ্রহভরে বললেন, রুগীকে না দেখেই তার ইলাজের দাওয়াই ঠিক করে নিলে—

—আলা হজরত ! আমি জানি। আমরা জানি।

শাহজাহান ভাবলেন, আমরা মানে কী ? ইস্পাহানিরা ? না, আমরা জেনানারা ?

পরদিন খুব ভোরে অন্দরমহলের খোলা বিশাল অলিন্দে দাঁড়িয়ে মমতাজমহল বললেন, একবার এদিকে আসুন—

—কেন ?

—আসুন না—

—কী ?

—এসেই দেখুন না—

দিনের শুরুতেই কী দেখতে হবে কে জানে ! মমতাজমহল আজও সেদিনকার সেই আরজুমন্দ আছে। এখন থেকে মাস তিনেক বাদেই আমি

আবার বাবা হবো। বাদশার মন কী এক মমতায় ভরে গেল। তিনি বেগমকে খুশি করতে অলিন্দে এসে দাঁড়ালেন।

—নিচে তাকান—

বাদশা তাকালেন। দুর্গের কামারশাল, যন্ত্রঘর, পিলখানার লোকজন যে-যার কাজে যাচ্ছে। হায়াত বকস বাগের পাশ দিয়ে। হাজিরা মেয়েরাও একে একে কাজে আসছে।

তাদেরই ভেতর একটি মেয়েকে বেগম চোখ দিয়ে বাদশাকে দেখালেন। মেয়েটি সদ্য কিশোরী। কাজে আসার আগে হায়াত বাগের কেওয়াড়ি থেকে মেয়েটি একটি লাল বুনোফুল তুলে নিয়ে দু'হাত পেছনে পাঠিয়ে নিজের বেণীর শুরুতে বসিয়ে নিচ্ছে। মুখের একদিক দেখা যাচ্ছে ওপর থেকে। সেদিকটায় এইমাত্র ভোরের প্রথম রোদ এসে পড়লো। দীঘল লকলকে ভঙ্গি। চোখও টানা। নাকটি বাঁশি। বেশ সুন্দরী।

হিন্দুস্থানের বাদশার হাজারো হাজিরার ভেতর আলাদা করে কোনো কিশোরীকে চেনার কথা নয়। তিনি বললেন, কে বেগম ?

মমতাজ অলিন্দ থেকে সরে এলেন। হেসে বললেন, শাহজাদা দারার ইলাজ।

—কী ? —বলে চেঁচিয়ে উঠলেন বাদশা। একজন হাজিরা হবে শাহজাদা বেগম ? তোমার কি মাথা খারাপ হলো ?

—না। আমার তো দারার জন্যে অমন একটি মেয়েই পছন্দ ছিল। বেশ মানাবে দুটিতে—

—অ। তা কার মেয়ে ? থাকে কোথায় ? হিন্দুস্থানের পহেলা শাহজাদার সঙ্গে রিস্তেদারি কি এভাবে হয় বেগম !

—খুব হয় আলা হজরত। মেয়েটি এই দুর্গেই থাকে।

—অ। তাহলে দেহাতি মেয়ে। আগ্রায় বা কাছাকাছি অন্য কোথাও থাকার জায়গা নেই। এমন মেয়েকে একজন শাহজাদা বিয়ে করবে কী করে !

—খুব করা যায়। মেয়েটির আব্বা হুজুর মরহুম শাহজাদা পরভেজ।

মুহূর্তে বাদশার মুখ সহজ হয়ে এলো। তিনি খানিক পরে বললেন, তুমি পছন্দ করলে বেগম আবার কথা কি !

মমতাজমহলের মুখে আলো জ্বলে উঠলো। তিনি কাছে এগিয়ে এসে বাদশার বুকে মাথা রাখলেন। আজ বড় ভালো দিন। আপনি সায় দিলেন—

—মেয়েটি কোন্ মহলের হাজিরা ?

—মেহজ্‌বিনের—। নিজের ছোটবোনের নামটা বাদশার বুকের কাছে উচ্চারণ করলেন বেগম।

শাহেনশা শাহজাহানের বুকের ভেতরে গুরগুর করে উঠলো। যেন আশমানে কোনো বাজ গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। এখুনি বিদ্যুৎ চমকাবে। বাদশার হুকুমেই তাঁর শালী মেহজবিন দিনরাতের হাজিরার জন্যে পছন্দ করে মেয়েটিকে বেছে নিয়েছিলেন। ওই কিশোরীর মুখ বাদশা আগে কখনো দেখেননি।

হিন্দুস্থানের মতো এত বড় দেশের নসিব এক জায়গায় করে ছোট ঘরের ভেতর আলো ফেলে দেখতে পাওয়া যায় না। সে তার বিশাল দরিয়া চালে চলে। কিন্তু একজন মানুষের কররেখার আভাস—কিংবা সে কোনদিকে চলেছে—তা মন দিয়ে লক্ষ্য করলেই দেখা যায়।

এখন অল হিজরি ১০৪০ সন চলছে। জিলকাদ মাসের শুরু থেকে সারা হিন্দুস্থান জুড়েই যেন বর্ষা নেমেছে। আগ্রায় তো কথাই নেই। গণ্ডক, যমুনা, বিপাশা, গির্নার, ঘর্ঘরা—যেখানে যত নদী সেখানেই তত দুঃখ। নদী উথলে বান। মানুষজন, গরু ছাগল ভেসে যাচ্ছে। ওঝাদের খুব রমরমা। যেখানে সেখানে মানুষকে আচমকা সাপে কাটছে হামেশা। গর্তে জল ঢোকায় ওরা ডাঙা দেখে উঠে আসছে। তাই এই ভীষণ বিপত্তি।

এই দুর্যোগের ভেতর শাহী অন্দরমহলে বাদশা শাহজাহান খুবই চিন্তিত। কিছুদিন ধরেই মমতাজমহলের শরীরের হাল শুধুই খারাপের দিকে ঢাল বেয়ে নিচে নেমে চলেছে।

আজ ১৭ই জিলকাদ। সন্ধের পর রাত দুই প্রহর এগিয়ে গিয়েছে। বাইরে বৃষ্টি আর বিদ্যুৎ সব কিছু দখল করে নিলেও বুরহানপুর দুর্গের ভেতর তা বিশেষ কিছু মালুম হয় না। এইমাত্র হেকিম এসে দাঁড়ালেন। অতি বৃদ্ধ। মা হওয়ার শুরু থেকেই বাদশা-বেগমের ধাত তিনি জানেন। এই নিয়ে চোদ্দোবার তাঁর হাতে মমতাজমহল মা হতে চলেছেন। তাঁর গায়ের লম্বা খিরকাটি একজন দাখিলা এসে খুলে নিয়ে গেল। ভিজে চাপচুপ। হেকিম সাহেব ঘরের মাঝখানে আগেনগারের শিখার কাছাকাছি সরে এলেন।

বাদশা-শাহজাহান শুনেছেন, ঠিক উনচল্লিশ বছর আগে এই হেকিম-সাহেবের হাতেই তিনি জন্মেছিলেন। সেকথা মনে পড়লো শাহেনশার। সরাসরি ওঁর হাতে কেউ পয়দা হয় না। হেকিম থাকেন বনাতের আড়ালে। আগে থেকেই যোগাড়যন্ত্র করে সব রাখা থাকে। তুখোড় তাতারি দাইয়েরা মুহূর্তে কাজ সেরে ফেলে।

শাহেনশা এগিয়ে এলেন। আমার প্রাণ আপনার হাতে হেকিম সাহেব—

সামান্য হেসে বাদশাকে তসলিম জানালেন হেকিম। বললেন, আমি তাজাকি ইউনানি হেকিম আবদুল হাজি সিরাজি। তাজা বয়সে আপনার পরদাদা আকবর বাদশার ডাকে হিন্দুস্থানে চলে আসি। আলা হজরত! একদিন সত্যিই আপনার প্রাণ আমার হাতে ছিল!

শাহেনশা চুপ করে তাকিয়ে আছেন। বুঝলেন, তাঁকে পয়দা করার কথা বলছেন। বেশ কিছু আগে একবার তিনি শুনেছিলেন—অনেকদিন বিপত্নীক থাকার পর হেকিম সাহেব খুব সুন্দরী একটি হায়দরাবাদি কচি বিবি গ্রহণ করেছেন। তার জন্যে একবার দু'টি সেঁউতি চারা আগ্রা দুর্গের আঙুরিবাগ থেকে যেন চেয়ে নিয়েছিলেন সিরাজি সাহেব—তাই তো মনে পড়ছে শাহেনশার।

—ঘাবড়াবার কিছু নেই। তবে সব কিছুর ওপর আছেন খোদাতালা।

ঝড়বৃষ্টি বাইরে থেমে আসছিল। ক্ষীণ ক্ষয়াটে চাঁদ আকাশে দেখা দিলো। শাহেনশা একসময় দেখতে পেলেন, তাতারি দাইয়ের দল বনাতের ওপাশ থেকে ছুটে আসছে। হেকিমসাহেব তাদের কী বললেন। তারা আবার বনাতের ওপাশে চলে গেল। আবার তারা এপারে এলো। আবার গেল।

এতক্ষণ তবু বাদশা-বেগমের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। ব্যথায় যন্ত্রণায় কিছু জড়ানো। অন্যে না বুঝলেও বাদশা শুনেই বুঝতে পারছিলেন, আরজুমন্দ তাঁকেই ডেকে চলেছেন। মেরে সরতাজ! সরতাজ! আমার মাথার মুকুট—

শুধু নিভৃতেই এই নামে মমতাজ তাঁকে ডাকেন। কিন্তু সে শব্দও তো বন্ধ হয়ে গেল। বাদশা অস্থির হয়ে ভাবলেন, একবার যাই—! কিন্তু গেলেন না। তিনি বাদশা। তিনি হেকিম নন দাইও নন। বনাতের ওপাশে রয়েছেন হিন্দুস্থানের বাদশা-বেগম।

পরশু রাতেও মমতাজ শুয়ে শুয়ে বলছিলেন, পহেলা শাহজাদা দরাশুকোর সঙ্গে করিমউন্নিসার বিয়েতে হেনাবন্দীতে কোন কোন রং পাঠানো হবে। কনের হাতের দস্তবন্দে কোন জাতের বাদকশানি চুনী চাই। শাহেনশার বুকটা টনটন করে উঠলো। হায় বিসমিল্লা! এবারটা আমায় ঘাটে ভেড়াও।

বাদশা আবদুল হাজি সিরাজির মুখে তাকাতে পারছিলেন না। সেখানে শুধু চিন্তার মেঘ। উদ্বেগ।

হেকিম সাহেব ঘেমে উঠেছেন। আগ্রা দুর্গের বাইরে শাহী হেকিম হিসেবে যমুনার তীরে সবচেয়ে বড় হাভেলি, দুই ঘোড়ার জুড়িগাড়ি, চৌপর পাহারা—সবই শাহী দেওয়ানখানা থেকে তাঁকে দেওয়া হয়েছে। হায়দরাবাদি কচি বিবি সুরাইয়া বেগম বেশ কিছুদিন হলো একটি কাঁচাপাকা ইরানি মনসবদারের গলায় ঝুলে পড়ার পর তার ভাই ওয়াসিও সেখান থেকে হাওয়া। তার নতুন দুলাভাই বোনের সঙ্গে সঙ্গে ভাইকেও নিতে নিশ্চয় রাজি হয়নি! এই বয়সে আবদুল হাজি সিরাজি এখন একাই ওই অত বড় হাভেলিতে থাকেন। পয়লা শাদির ছেলেরা খোঁজও নেয় না।

ভেতর থেকে সদ্য পয়দা হওয়া বাচ্চার কান্না ছড়িয়ে পড়লো। শাহেনশার বুক থেকে যেন পাথর নেমে গেল। বনাতের ওপাশ থেকে দুই তাতারি দাই ছুটে আসছে।

মরদ? না, মরদানী? কী হলো?

শাহেনশা অবাক হলেন। দুই তাতারি তাঁর পায়ে পড়ে কেঁদে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

।। আটত্রিশ ।।

একশো বছর হয়ে গেছে মুঘলরা আগ্রায়। আকবর বাদশার বিধানে হিন্দুস্থানই এখন তাদের ঘরবাড়ি। বাদশা শাহজাহান চাঘতাই বন-জঙ্গলের কথা শুনেছেন মাত্র। সেখানে যাননি কোনোদিন। ফরঘনা থেকে হিন্দুস্থানে আসার সময় বাবরের সঙ্গী ছিল তাতাররাও। সেই থেকে ভাগ্য ফেরাবার জন্যে শ'খানেক বছর ধরে তাতার তাতারিনীরা আগ্রায় এসে জমা হচ্ছে তো হচ্ছেই! কেউ বাঁদি। কেউ গোলাম। কেউ বা খুব বিশ্বাসী অন্দরমহলের দাখিলা-হাজিরা। ফৌজেও কম তাতার নেই।

সেরকমই একজন তাতারিনী বুক খুলে মাস তিনেকের একটি শিশুকে দুধ দিচ্ছিল। জায়গাটা আগ্রা দুর্গের শাহী মহলের লাগোয়া। হঠাৎ সেখানে বাদশা শাহাজাহান হাজির হতে শিশুটিকে তুলে দিয়ে তাতার মেয়েটি পেছন দিকে হটতে হটতে কুর্নিশ জানিয়ে ভারি বনাতের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

মেহজবিন শিশু কোলে সামান্য ঝুঁকে তসলিম করলেন বাদশাকে।

শাহজাহান খুবই কৃতজ্ঞ চোখে তাকালেন।—না মেহজবিন। কুর্নিশ কোরো না। আমারই তোমাকে কুর্নিশ করা উচিত।

—একথা বলছেন কেন বন্দেগান—?

—মমতাজমহল আর নেই। সেই থেকে তুমি মা হারানো গওহরআরাকে কোলে তুলে না নিলে এই মাসুম বাচ্চাকে বাঁচানো যেতো না।

—আমারই তো দিদির মেয়ে। আমি কোলে তুলে নেবো না?

বাদশা কোনো কথা বলতে পারলেন না। এখানে দাঁড়িয়ে হেমন্তের রাতের তারা ফোটা পরিষ্কার আকাশ দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি। তাঁর সামনে দীবানের ওপর মেহজবিন। তাঁর কোলে গওহরআরা।

বাদশায় ভায়রাভাই খলিলুল্লা খাঁয়ের এই মহলটি খুব বড় না হলেও ঘরের সামনে খোলা চত্বরটি ভারি সুন্দর। ওখানে একসময় শীতের দুপুরে জাহাঙ্গীর বাদশা রোদ পোহাতেন।

শাহজাহান এগিয়ে এলেন। মেহজবিন দেখলেন, বাদশার গায়ে গুজরাতি মখমলের নাদিরী জামার তুকমার জায়গায় সমান দূরে দূরে একটি করে হীরে বসানো। একটু পরে তিনি টের পেলেন, সেরকমই একটি হীরে তাঁর নিজের নরম-কাঁধে বসে যাচ্ছে।

ব্যথা লাগছিল মেহজবিনের। কিন্তু তিনি নড়লেন না। তামাম হিন্দুস্থানের বাদশার গরম পুরুষালি নিঃশ্বাস তাঁর চোখে মুখে লাগলো। মেহজবিন বেগম চোখ বুজে সামান্য হাঁ করলেন। তমিজি বজার রেখে শাহজাহান শালীর ঠোঁট থেকে নিজের ঠোঁট তুলে নিলেন।

কোলে ঘুমন্ত শিশু গওহরআরা। মেহজবিনও যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন! খানিক পরে চোখ খুলে দেখলেন—কেউ নেই। একবার তাঁর সন্দেহ হলো,

সত্যিই কি বাদশা এসেছিলেন ? না সবটাই খোয়াব ?

তিনি সাবধানে বুকের দুধের নেশায় ঘুমন্ত গওহরআরাকে শুইয়ে দিয়ে ঘরের সামনের খোলা চত্বরে এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন, কে যেন দাঁড়িয়ে। আশমানে তাকিয়ে। না। বাদশা শাহজাহান তো নয়। তবে কে ?

ভালো করে দেখতে গিয়ে মেহজবিন বুঝলেন, বাদশা নন! তিনি যেমন এসেছিলেন—তেমনই চলে গেছেন। ওখানে শাহজাদা দারাশুকো দাঁড়িয়ে।

আগ্রা দুর্গের হাজিরা-দাখিলারা—গোলাম বাঁদিরা খোজা পাহারাদাররা প্রায়ই এ ছবি দেখতে পায়। বিশাল এই দুর্গের এখানে সেখানে আচমকা শাহজাদা দারার সঙ্গে তাদের দেখা হয়ে যাচ্ছে ইদানীং। কখনো তিনি তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কখনো বা তাঁর চোখের সামনে দুপুর বেলার রোদ ঝলমলানো যমুনার চর। কোনো কোনো সময় তিনি গোয়ালিয়র যাবার শাহী সড়কের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন। কেউ কেউ শাহজাদাকে পোড়ো রাজধানী ফতেপুর সিক্রির শূন্য এবাদতখানাতেও দেখতে পেয়েছে। সেখানে তিনি একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

অনেক রাত অব্দি আশমানের নিচে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে শাহজাদা দারা আজকাল একটা জিনিস টের পান। রাজধানীর সব আলো নিভে গেল। কোথা থেকে আরেক রকমের আলো ছড়িয়ে পড়ে। গোড়ায় গোড়ায় এ আলো তিনি দেখতে পেতেন না। এখন রাত পড়লে তিনি যেন অন্ধকার থেকে এক রকমের আলো বেরিয়ে আসা দেখতে পান। তাঁর এখন মনে হয়—অন্ধকারই এই দুনিয়ার নিজের ঘরানায় আলো।

রাতের আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে দারা এক অস্থির যন্ত্রণা টের পান। সে যন্ত্রণা কাউকে শুতে দেয় না। বসতে দেয় না। ঘুমোতে দেয় না। দাঁড়াতেও দেয় না। তবু শাহজাদা দাঁড়িয়ে থাকেন। না দাঁড়িয়ে কী করবেন ? কোথায় যাবেন।

ঠিক এই সময়েই তিনি দুনিয়ার বুক থেকে উঠে আসা এক অজানা শব্দ শুনতে পান। সে শব্দ শুরুতে অনেকটা মৌমাছির গুনগুনানির মতো। আস্তে আস্তে তা প্রবল হয়ে ওঠে। শেষে এই শব্দ থেকে নিজের কান বাঁচাবার জন্যে শাহজাদা দু'হাতে দুই কান চেপে ধরেন। কেননা এই আওয়াজের কোনো বিরাম নেই। এক এক সময় তাঁর মনে হয়—অন্ধকার দুনিয়ার আলো যেমন অন্ধকারই—ঠিক তেমনই সেই অন্ধকার আলোর মতোই শব্দহীন স্তব্ধ দুনিয়ার নিজের শব্দ ওই অজানা আওয়াজ। গুনগুনানি থেকে কান ফাটানো।

শাহজাদা আশমানের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন, তারার ভারে আশমান ভেঙে পড়োপড়ো। ব্যথায় টনটন করে উঠছে আকাশ। এরকমই এক যন্ত্রণায় শাহজাদা বসতে শুতে পারেন না। আমার আম্মিজান এই আশমানের কোথায় লুকিয়ে আছেন ? মুঘল শাহীর সঙ্গে আম্মিজানের কোনো মিল ছিল না। এখানে বেঁচে থাকাটাই যেন তিনি একটা যন্ত্রণা বলে মেনে নিয়েছিলেন। তাই মনে হয় শাহজাদা দারার। আম্মিজানের সঙ্গে আব্বা হুজুরের বাগী দিনগুলোতে

হিন্দুস্থানের মাঠে ঘাটে হাতির গাদেলায় চলতে চলতে—দুলতে দুলতে বালক দারাকে অনেক রাস্তা ভাঙতে হয়েছে। তখন থেকেই আম্মিজানের মুখের হাসিতে যন্ত্রণার, ব্যথার রেশ দেখেছেন দারা। আম্মিজান হিন্দুস্থানের বাদশা-বেগম হবার পরেও তাঁর মুখে ওই রেশ মিলিয়ে যায়নি। এই ব্যথাই কি জীবনের রহস্য? না, ওই রহস্যের নামই ব্যথা? মক্তবের দৈলেমি সাহেব একসময় আশমানের তারা চেনাতেন। ওই তো রোহিণী তারা গোঠের সবচেয়ে বড় তারাটি তাঁর দিকে চেয়ে আছে। শুধু শাহজাদা দারাশুকোর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার জন্যে ওই তারাটি আজ সন্ধ্যায় ফুটে উঠেছে।

দারা সব কিছু ভুলে সেই তারায় তাকালেন। ভালো করে। চোখের সামনে বাকি সব তারা মুছে গেল। স্তব্ধ চরাচর এবার কথা বলে উঠলো।

আল্লা তোমায় যা দিয়েছেন—

দুনিয়ার কোনো বাদশাকে তিনি তা দেননি।

দারার কান ভরে কথাগুলো তাঁর শরীরে ঢুকে গেল। তিনি এবার দেখলেন, সেই তারাটি যেন উঠে আসছে। বড় হয়ে। তখন আবারও তিনি শুনতে পেলেন—দুনিয়ার কোনো বাদশাকে তিনি তা দেননি—

এবার দারা দেখতে পেলেন, সেই তারা আর নেই। তার বদলে আশমান থেকে মাঝের আকাশে কে যেন নেমে এসেছেন। উজ্জ্বল দুই চোখ। চওড়া কাঁধ। মাথায় ঘন কালো চুল। ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি এখুনি বুঝি হো হো হাসি হয়ে ফেটে পড়বে।

শাহজাদা আবার শুনতে পেলেন—

আল্লা তোমাকে যা দিয়েছেন—

এবারের গলাটি যেন কোনো শাহী ফরমান জারি করলো।—ভালো করে শোনো—আল্লা তোমাকে যা দিয়েছেন—

দারা দেখলেন, সেই ভারি সুন্দর দেখতে মানুষটি মুখের হাসিটি চেপে রসিক চোখে তাঁরই দিকে তাকিয়ে বলে চলেছেন—

দুনিয়ার কোনো বাদশাকে তিনি তা দেননি—

এবার দারার দুই চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তিনি চোখ বুজে ফেললেন। তখনো তাঁর দুই কান ভরে দুনিয়ার মালিকের ফরমান ঢুকে যাচ্ছিল। শুধু সেই গলার স্বর। আর কোনো শব্দ নেই। আল্লা তোমাকে যা দিয়েছেন—দুনিয়ার কোনো বাদশাকে তা তিনি দেননি।

বারবার চারবার। শাহজাদার শরীর অবশ হয়ে এলো। তিনি অন্ধকার চত্বরে পড়ে যেতে যেতে নিজেকেই বললেন, একেই কি দৈববাণী বলে?

কাছে পিঠে এ-কথার জবাব দেবার মতো কেউ নেই। দুর্গের বাইরে নিচে প্রায় সব আলো নিভে গেছে। আগ্রা এখন গভীর ঘুমে।

ফিল-ই-বর্কাস সনাতন হাতি তখন রাজধানীর কাছাকাছি ফৌজে ছাউনি সাকেত থেকে ফিরছিল। এখন সে একটা পরিচয় খুঁজে পেয়েছে। বছর পনেরো ষোলো আগে ব্রহ্মপুত্রের তীরে জঙ্গলের ভেতর সনাতনদের ধুমধুমার গড়

মুঘল মনসবদার মীর্জা ইউসুফ বেগ হাতি দিয়ে গুঁড়িয়ে—গোলা দেগে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিলেন। এখন সে নিজে শাহী হাতিতে চড়ে এদিক ওদিক যায়। সবই শাহী কাজে। এবার ইজফা পেয়ে ফিল-ই-বকসি হবার পর থেকে সে শুধু শাহী হাতিতেই চড়ে না, শাহী হাতির দু'পাশে তার সফরের সময় একটি করে বালহস্তীও থাকে। ফিল-ই-বকসি হলে এটাই দস্তুর। শাহী উঁচু পদে বালহস্তী দুটি যেন শোভা।

রাত নিশুতি হয়ে উঠছিল। হাতির পিঠে বসে ঢিমে তালে সনাতন দিওয়ানখানার সামনে এসে থামলো। এখন জায়গাটা রীতিমত নির্জন। দিনের বেলা এই জায়গাতেই মনসবার থেকে দরবেশ—বিদেশী ইলচি থেকে সিপাহ-সালার কেউ না কেউ কোনো না কোনো আর্জি, নালিশ, গুপ্ত খবর নিয়ে আসেন। এটাই তামাম হিন্দুস্থানের সবচেয়ে বড় ফয়সালার জায়গা। অবশ্য এর পরেও আছে আরও বড় আদালত। তিনি খোদ বাদশা।

এখন সারাটা দিওয়ানখানা ভুতুড়ে জায়গা হয়ে আছে। অন্ধকারে কারুকাজ করা বড় বড় স্তম্ভের পাশে নিশ্চল স্তম্ভের মতোই দু'চারজন সেপাই কঠিন মুখ করে পাহারায় দাঁড়িয়ে।

হাতির পিঠে বসেই ফিল-ই-বকসি চেঁচিয়ে বলে উঠলো, কোনো কাফের যদি মুসলমান মেয়েকে নিকা করে তো শাহী হুকুম কী হবে?

পাহারায় দাঁড়িয়ে থাকা এক রাজপুত সেপাই তার পাশের সেপাইকে হেসে বললো, আজ হয়েছে!

অন্য সেপাই বললো, হাতি ঘেঁটে ঘেঁটে আজ আবার কাফের, ইনসান, শাদি—এসব নিয়ে পড়া কেন!

পয়লা সেপাই ফোড়ন কাটলো, একটা হাতির চারটি করে গাদী আলানসঙ্গী —তাদের তো কাফেরি, মুসলমানি নেই! তাদের চোগুণী করে ঘি, চিনি, আখের বরাত! এক এক হাতির জন্যে আধ মণ করে চালের কড়াপ্রসাদ! কে কতটা সত্যি সত্যি খেল—কতটা কেল্লার বাইরে বেরিয়ে গেল—কে দেখতে যাচ্ছে—

দিওয়ানখানা আসলে শাহী উজিরে আজমের কাছারি। হাতির পিঠে বসেই সনাতন অন্ধকার দিওয়ানখানার দিকে তাকিয়ে ঝুঁকে পড়ে কুর্নিশ করলো। তারপর চেঁচিয়ে বললো, কাফের খসমকে হয় মুসলমানি বিবি ছাড়তে হবে—নয়তো নিজের কাফেরি ছেড়ে ইসলাম নিতে হবে—তাই তো শাহী ফরমান—হ্যাঁ? কি না?

অন্ধকারের ভেতর দাঁড়ানো দুই সেপাই ফিল-ই-বকসির নিশুতি রাতে এমন ঢিলেঢালা ব্যবহারে মজাই পাচ্ছিল। শরাবি বলেই তো এত রাতে কেউ দিওয়ানখানায় আর্জি, নালিশ নিয়ে আসতে পারে।

পয়লা সেপাই অন্ধকারের ভেতর দাঁড়িয়ে ফিল-ই-বকসির কথায় সায় দিলে, হ্যাঁ। তাইতো—তাইতো—

নিজের কথায় সায় পেয়ে সনাতন তেড়ে ফুঁড়ে উঠলো। তাহলে

উজিরে আজম !

দুসরা সেপাই ফিল-ই-বর্কাসর গলায় এত রাতে উজিরে আজম কথাটি শুনে খুব মজা পেল। সে গম্ভীর গলায় চেঁচিয়ে বললো, বলে যাও—বলে যাও—

এতটা আশা করেনি সনাতন। উজিরে আজম কদাচিৎ নিজে আর্জি, নালিশ শুনে থাকেন। সব শোনাশুনির জন্যে ভার দেওয়া আমলা আছে। কিন্তু এখন যে খোদ উজিরে আজম জাফর খাঁ সব শুনছেন। এ তো তাঁরই গলা।

—তাহলে কাফের বেগমের মুসলমান খসমের বেলায় শাহী ফরমান কী হবে ?

মধ্য রাতে এমন কূট প্রশ্নের জন্যে সেপাইদের তৈরি থাকার কথা নয়। সরাবির সঙ্গে ঢিলেঢালা হাসি-মশকরা চলে। কিন্তু শাহী ফরমান নিয়ে এমন জটিল কথায় কে যেতে চায় ! তবু দুসরা সেপাই ভারি বিকানিরি গলায় বলে উঠলো, এখানেও খসমকে ছাড়তে হবে—নয়তো কাফেরি ছেড়ে বেগমকে মুসলমানি নিতে হবে—'

বেশি রাতের আগ্রায় শরাবে যেন তেজ বেড়ে যায়। মানুষের দেওয়া আলোর চেয়ে এখন আকাশের চাপা আলোই বেশি। ফিনফিনে বাতাস এসে সনাতনের কানের পাশে রগে লাগলেই ধাঁ ধাঁ করে ঠেলে উঠছিল নেশা। শাহী পিলখানায় যে বনজারা চৌধুরীর ঘি, চিনি, যব, চাল সরেস কি নীরেস দেখে নিতে হয় সনাতনকে—সেই চৌধুরীই ফৌজি ছাউনিতে তাম্বু থেকে বারুদ, গোস্ত থেকে শরাব—সবই যোগায়। তা সেখানে ফিল-ই-বর্কাসর জন্যে ঢেলে দেওয়া শরাব তো কিছু তেজী হবেই।

—তাহলে খোদাবন্দ আপনিই বিচার করুন—

এবার দুই সেপাই সত্যিই বিপদে পড়লো। সরাবি ফিল-ই-বর্কাস যে হাতি থেকে নেমে দিওয়ানখানা চত্বরের দিকে সিধে এগিয়ে আসছে। পয়লা সেপাই তার বর্শা দিয়ে তখনি কাছের বালহস্তীর দাবনায় ভীষণ এক খোঁচা দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চা হাতিটা ভীষণ জোরে চেঁচিয়ে উঠলো। তাতে ফিল-ই-বর্কাসর হাতিও শুঁড় তুলে গলা ছেড়ে ডাক দিলো। সনাতনের আর এগোনো হলো না। সে ব্যস্ত হয়ে নিজের হাতির কাছে ফিরে গেল। প্রায়ই নিশুতি রাতে সনাতনের এমন হয়। তার মনমেজাজ যে-পথে চলে—হাতিরা তার বিন্দুবিসর্গও বোঝে না। হাতি চলে হাতির মতে—হাতির পথে। বালহস্তীটাকে সামলাতে সামলাতে তাই মনে হচ্ছিল সনাতনের। উজিরে আজম যে এমন করে তার আর্জি শুনবেন তা ভাবতেই পারেনি সনাতন। নিজের মামলাটা এতদূর টেনে এনে এমন করে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। সে চেঁচিয়ে ওঠা বালহস্তীর শুঁড়ের ভেতর ডান হাতের মুঠো ভরে দিয়ে আংটি সমেত নিজের আঙুলগুলো ঘুরিয়ে দিলো, অমনি বালহস্তীটি ফের বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো।

ভোর ভোর অন্ধকার ফুঁড়ে আগ্রা দুর্গ জেগে উঠছিল। রোজ রাতে যেন কয়েক ঘড়ির জন্যে অন্ধকারে এ অতিকায় কেল্লাটা রাজধানীর মানুষজনের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে হারিয়ে যায়। দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে নিজের জায়গায় আবার ফিরে আসে। কয়েক ঘড়ির জন্যে হারিয়ে গেলেও এ কেল্লা তামাম হিন্দুস্থানের মানুষজনের ঘুমের ভেতরেও সবসময় সামানবুরুজ সিধে আশমানে তুলে জেগে থাকে।

আলো ফুটতে না ফুটতেই রানাদিল উঠে পড়লো। এখন আর সে যেখানে সেখানে শুয়ে থাকতে পারে না। আগে ব্যাপারীদের গোলার বস্তার গায়ে, বিয়ানার দিককার পোড়ো ছোটখাটো ভাঙা কেল্লার চত্বরে অন্ধকার হলেই একখানা দু'খানা রুটি চিবিয়ে শুয়ে পড়তে না পড়তেই ঘুম এসে তার দখল নিতো। চোখ চাইতেই আগ্রার সকালের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যেতো। কিন্তু এখন? দিনের বেলাতেই ফাজিল আগ্রা এখন তার ওড়না ধরে টান দেয়। রাজধানী ছাড়িয়ে দেহাতেও উঠতি রইস ব্যাপারিরা তাকে মুজরো করতে ডাকে। গত বছর হোলির দিন সাকেত ছাউনিতে সে সারারাত নেচেছিল। এক রসিক আহেদি তার মাথার সরবন্ধ খুলে রানাদিলের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তারিফ জানিয়েছিল। এইসব মুহূর্ত মনে পড়লে রানাদিলের বুকের ভেতরটা এই সেদিনও নেচে উঠতো।

কিছুদিন কী হয়েছে—এসবে আর কিছু হয় না রানাদিলের। সে এখন জায়গা বদলে এক একদিন এক জায়গায় ঘুমোয়। আজ রাতটা কেটেছে তার লাট্টু শাহ দারোগা বাবা চিসতির মাজার শরিফে যমুনার দিককার খোলা চত্বরে। আগরবাতির সুবাস, কাওয়ালির মিঠাজ তানকারি, যমুনার দিককার ঠাণ্ডা বাতাস কখন তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে—তা টেরও পায়নি রানাদিল।

যমুনায় একটা ডুব দিয়ে উঠে রানাদিল লাট্টু শাহ চিসতির মাজার শরিফে সাইপ্রেস গাছের দিককার গাছপালা ঘেরা আড়ালে চলে গেল। খানিকবাদে খোলা আরশি আর কাঙ্গি হাতে বেরিয়ে এলো। এখন তার গায়ে সাত সস্তার আকবরি ডোরিয়ার ওপর চুনোটি আঙরাখা কুর্তি। মাথাটি সিজিল মিছিল করে অনেকক্ষণ ধরে আরশির সামনে বসে একটি লাল বিন্দিয়া মুখের থুথু দিয়ে ভ্রূমধ্যে বসালো।

দিন শুরু হয়ে গেল রানাদিলের। জামা মসজিদ, লালচক, সন্ধ্যাবাজার, খয়রাতপুরা, যোগীপুরা, বিয়ানা, যোধাঘাট—কোথায় নয়? এমনকি এক হামাম থেকে আরেক হামামের দুয়ার। সব জায়গাতেই রানাদিলের অবাধ যাতায়াত। গলাটি সুরেলা। সরু কোমর থেকে রংদার ডোরিয়া বা ঘাগরার মাথা খারাপ করে দেওয়া ঘূর্ণি। সেই সঙ্গে ঠাট ঠমক চমক দমক—চোখের কোণে হাসি—কানের কাছে বাঁ হাত তুলে মিথ্যে লজ্জার আঙুল মটকানি। ব্যস—মানুষের এই রাজধানীতে এইটুকুই যথেষ্ট। পেতে রাখা রেশমি কাপড় দাম, দামড়ি, আধেলা, পওয়ায় ভরে যায়। কখনো সখনো দু'একখানা

আশরফিও যে পড়ে না তা নয়। দেনেওয়ালারা ভিড় ভাঙার পর দূরে দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করে। যদি রানাদিল সাড়া দেয়। ওসবে তাকাবার সময় নেই তার। কখনো কোনো একা মানুষকে সাড়া দিতে তার বড় ভয়। তার চেয়ে দল বেঁধে তাকে মুজরোয় চাইলে রানাদিল এক পায়ে খাড়া। তাও কি বিপদ আসে না। আসে। এই যেমন যমুনার চরে তরমুজ চাষীদের উঠোনে মুজরো নিয়ে সে কী বিপত্তি। শেষে খেপে গিয়ে ঢোলে বেদম চাঁটি। সেজন্যে দায়ী রানাদিলেরই কোমর, ঘাগরার ঘূর্ণি, পায়ের ঘুঙুরের বোল ফোটানো বোল। ছুটে পালিয়ে আরো বিপদ।

রানাদিল দেখলো, সেই কথা মনে পড়তে আরশিতেও তার গালে যেন টোল পড়লো। একজন শাহজাদার বুক কতখানি চওড়া হয়ে থাকে তা আগে জানতো না সে। হাতের মুঠোয় কেমন জোর, বুক ভারি হয়ে আসা দিওয়ানা আতরের খুশবু—আর সবার ওপরে বুকের নিচের ধড়কানি থামিয়ে দেয় এমন গলার স্বর। সেপাইকে হুকুম দেওয়া? না, যেন আগ্রা কেল্লার হাতিপোল দরওয়াজার টানা তক্তাপোল গম্ভীর শব্দ করে পাথরের চত্বরে পড়লো।

রাজধানীর যে কোনো জায়গা থেকেই আগ্রা দুর্গ দেখা যায়। রানাদিল যমুনার পাড়ে এসে মোরি দরওয়াজার দিকে তাকালো। ওই পথেই তিনি ছুটে এসেছিলেন। আমার চিৎকার শুনে। অন্ধকারে।

নিজে নিজেই হেসে ফেললো রানাদিল। আমি তখন শাহজাদার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে। দূরে সামনে সেপাইজি হাতের বাতিদানটা মুখের সামনে তুলে ধরে ভেতরের শিখাটি এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। ঘুটঘুটে অন্ধকার।

সামনের সেই আসল শাহজাদা দারাশুকোকে আমি সেদিন বলেছি, সন্ধের পর অন্ধকারে আগ্রায় সবাই নিজেকে দারাশুকো বলে! বলেছি, তুমি সেই ঢ্যাঙা মাতালটা—

আরশির ভেতরেই রানাদিল লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিলো। তিন চার বছর আগে আগ্রার সবচেয়ে বড় গন্ধেশ্বরী ভাণ্ডারের যবের গোলায় এক রাতে ঘুম ভেঙে যেতেই সে টের পেয়েছিল, কে যেন তাকে জড়িয়ে ধরেছে। ধড়মড় করে উঠে বসে রানাদিল চেঁচিয়ে উঠেছিল, কে? কে তুমি?

অন্ধকার থেকে চাপা গলা ভেসে এসেছিল, চুপ! চেঁচিও না—

—কে তুমি?

·চাপা গলা আরও চেপে বলেছিল, চুপ। আমি শাহজাদা দারাশুকো—

সে-রাতে রানাদিল খুবই অবাক হয়েছিল। সেই যবের গোলায় তার মতো নাচনেওয়ালি মেয়ের কাছে শাহজাদা? তিনি চেনেন আমায়? সারা গা ঘেমে উঠেছিল রানাদিলের। ভয়ে। আনন্দে। বাদশা শাহজাহানের বড় আওলাদ—ভারি সুন্দর দেখতে। কিন্তু তিনি কী করে যবের গোলায় আসবেন?

অন্ধকারেই সামান্য ঝুঁকে সেদিনকার রানাদিল জানতে চেয়েছিল, কিন্তু আপনি এখানে? এত রাতে? অন্ধকারে?

শাহজাদা দারাশুকো সামান্য চাপা হাসি হেসে বলেছিলেন, রাতেই তো ছদ্মবেশে ঘুরতে বেরোই। তখনই তো নিজের চোখে দেশের মানুষের দশা দেখতে পাই। তোমরা কেমন আছো!

এখানে শাহজাদা দারা কেশে উঠতে রানাদিলের কেমন সন্দেহ হয়। সে অন্ধকারে পা টিপে টিপে বেরিয়ে গিয়ে সদরের আগেনগারে রেড়ির শুকনো একটা ডাল ধরিয়ে নিয়ে ফিরে এসে দেখে, গোলায় মাল ওজনের কাঁটা দেখে যে ছোকরা সেই নটবরলাল বস্তার গাদিতে মুখ লুকোতে ব্যস্ত। সেই মাঝরাতে, রানাদিল ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাতের নখে আঁচড়ে দিয়েছিল নকল দারাকে।

সেই থেকে রানাদিল অন্ধকারে কেউ নিজেকে শাহজাদা দারাশুকো বললে —সে দোগুণী সাবধান হয়ে যায়।

আসল শাহজাদা সেদিন যমুনার চরে তাকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন, কোনো ভয় নেই। কার ভয়ে তুমি দৌড়চ্ছিলে? দাঁড়াও—। কোথায় যাবে? এই চরে থাকো?

কোনো কথা বলতে পারেনি রানাদিল। তার বুক কাঁপছিল। এই তাহলে শাহজাদা। শাহজাদারা এমন হয় তাহলে। চরের বুনো ঘাসের ভেতর দিওয়ানা করে তোলা আতরের সুবাস। হিন্দুস্থানের বাদশার পহেলা শাহজাদা। শাহী সড়কে দাঁড়িয়ে পড়ে রানাদিল এরপর অনেকবার শাহজাদা দারার তাবিন যেতে দেখেছে। শাহজাদার পেয়ারের হাতি ফতে-জংকে রোজকার স্নানে যেতে দেখলেও সে আজকাল দাঁড়িয়ে যায়। এই গাদেলায় শাহজাদা বসেন তাহলে। ফতে-জংয়ের গলঘণ্টের শব্দও কী মিষ্টি।

দুর্গের কোনো ফাঁক-ফোকরে শাহজাদার সরবন্ধের বাহারি পালকের ডগাও দখতে পেল না রানাদিল।

শাহজাদা বলেছিলেন, তুমিই তাহলে রানাদিল—। কোথায় গেলে? অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না—

খিলখিল করে হেসে উঠেছিল রানাদিল, হজরত। আপনিও আমায় চেনেন? কী খুশনসিব আমার—

—বাঃ! তুমিই তো বললে, আগ্রায় তোমায় কে না চেনে—।

রানাদিল এর জবাবে কিছু বলতে পারেনি সেদিন। বাদশা-বেগম মমতাজমহলের এন্তেকালের পর তার জানাজায়—কোরানখানিতে সারা আগ্রা ভেঙে পড়ে। সেখানে রানাদিলও আগাগোড়া হাজির ছিল।

।। উনচল্লিশ ।।

মরহুম বাদশা-বেগম মমতাজমহলের মেহজবিন ছাড়াও আরও একটি বোন সিতারা শাহেনশা শাহজাহানের আশকারা মস্করায় আগ্রা দুর্গের মোতিবাগের ঠিক গায়েই দক্ষিণমুখো ছোট মতো একটি অন্দরমহল নিজের জন্যে বাগিয়ে নিয়েছে। তার স্বামী জাফর খাঁ বাদশা শাহজাহানের চোখে তাঁর শালী

মেহজবিন সুবাদে ভায়রাভাই খলিলুল্লা খাঁয়ের চেয়ে যে কিছু উঁচু নজরে আছেন—তার প্রমাণ—আগ্রার মুঘল শাহীতে তিনি একজন পুরোদস্তুর উজির।

লোকে অবশ্য কানাঘুষো করে—বেয়াদব ফকিররাও নাকি বলে—শালীদের একজন বাদশাহি ছোট হাজিরি, অন্যজন দুপুরের বড় নাস্তা! সত্য মিথ্যে খোদাতালাই জানেন। দুর্জনের হাত থেকে কারও রেহাই নেই।

গুজরাতের কাছ ঘেঁষা কিছু জায়গা আর খান্দেশের তেলিঙ্গিনা বাদে এবার শীতে সারা হিন্দুস্থানের মাঠে মাঠে ধানের ফলন খুবই ভালো। দেহাতের রাস্তায় ধান সমেত কাটা বিচুলির বোঝা নিয়ে গো গাড়ির দিনরাত ক্যাঁচর ক্যাঁচর। যেন কী এক সম্পন্ন সুখের ইশারা। গেঁহুর মাঠে মাঠে ফুলও আসছে সময়মত। জায়গিরদার, কানুনগো, হেলে চাষা—সবাই আশা, এবার গেঁহুতে মাঠ ভরে যাবে।

দেওয়ান-ই-খাসে একা বসে বাদশা শাহজাহান ভাবছিলেন, যে তাঁকে সরতাজ বলে আদরের ডাক ডাকতো—সে-ই মমতাজই আর নেই। শাহজাদা দারার জন্যে করিমউন্নিসাকে বেগম ঠিক করে দিয়েই আরজুমন্দ তুমি চলে গেলে। বড় আওলাদের বিয়ে হবে—আর তুমিই নেই।

এমন সময় উজির জাফর খাঁ এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালেন। হজরত, আমায় ডেকেছেন—

উজির আবার ভায়রাভাইও বটে। শালী সিতারার খসম। শাহজাহান বললেন, বুন্দেলার ঝুঝর সিং বড় বাড় বেড়েছে। ওর পাখা দুটো ছেঁটে দেওয়া দরকার।

—বাদশা জাহাঙ্গীরের সঙ্গে ওর আব্বা হুজুরের দোস্তি ছিল। তাই ভাবটা এমন যেন—বুন্দেলখণ্ড হিন্দুস্থানের বাইরে!

—তখতের দাবিদার তো দেবী সিংহও আছে।

—আলমপনা! আমরা দেবী সিংহের পেছনে দাঁড়াতে পারি। কিন্তু—

উজির জাফর খাঁয়ের একথায় বাদশা চোখ তুলে তাঁর মুখে তাকালেন। সেখানে দ্বিধা দেখে তিনি জানতে চাইলেন, কী?

—হজরত! ঝুঝর সিং পাহাড়ী ইঁদুর। মুঘল ফৌজ হানা দিলে সে পাহাড়ের গর্তে গিয়ে মুখ লুকোবে। গোলা না দেগে তাকে বের করা যাবে না—

—দরকার হলে তাই করতে হবে।

—আলমপনা! আপনি সবই জানেন। শাহী তোপখানার মীর আতশ জানিয়েছেন—গোলার মুখে সীসার পাত না বসালে গোলা ঠিকমত ফাটছে না। সীসা আসে বাইরে থেকে। সীসা ছাড়া গোলা না ফেটে নিশানা হারাচ্ছে।

—দরকার হলে আনতে হবে।

—কিন্তু আনতে হলে সোনা চাই যে—হজরত।

অবাক হলেন শাহেনশা। হিন্দুস্থানে সোনার অভাব যাচ্ছে নাকি!—

একথা বলেও শাহেনশা জাফর খাঁয়ের মুখে তাকিয়ে রইলেন। জাফর খুব ঠিক ঠাক লোক। অন্দরমহলের খাস আড্ডায় তিনি ভুলেও শাহেনশাকে রিস্তেদারি মোতাবেক ভাই বলে ভুল করেন না। হোক না ভায়রাভাই। উজির যখন— বাদশাকে বাদশার মানটুকু তিনি কড়ায় গণ্ডায় দেন। ব্যবসা, বাণিজ্য, মোহরকাটাই, আশরফি—তনখা—সব হিসেবে তাঁর নখদর্পণে থাকে।

জাফর খাঁ বিনীত গলায় বললেন, হ্যাঁ হজরত। কয়েক বছর সোনা কম আসছে। যাও বা আসছে—তার অনেকটাই বন্দর আব্বাসে জমা দিয়ে তবে শাহী ফৌজের জন্যে আরবি ঘোড়া আমদানিতে বেরিয়ে যাচ্ছে।

—হিন্দুস্থানের নীল, চিনি, গন্ধক, মসলিন, মৃগনাভি, কাপড়, চাল— এসব কি বিদেশী বণিকরা কিনছে না জাফর খাঁ!

—হজরত! ইংলিশস্তানি, ফ্রানসিসি, ওলন্দাজরা কিনছে। সোনা দিয়েই কিনছে। সেসব জিনিস সুমাত্রায় বেচে দিয়ে সেখান থেকে নিজেদের দেশে মসল্লা নিয়ে যাচ্ছে—

—তাহলে?

—হিন্দুস্থানের নীল পাটনা থেকে বালেশ্বর হয়ে জলপথে যেমন যাচ্ছে বন্দর বসরায়—তেমনি ডাঙায় ডাঙায় হাওড়ার ঘুসুড়ি থেকে লাসা হয়ে সিং-কিয়াং-এ পেঁছুচ্ছে। আর্মানি ব্যাপারীরা বসে নেই বন্দেগান। কিন্তু সিন্ধুর নীল যে নিরেস। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাচ্ছে।

—কাপড়?

—কোনো কাপড়ই তাঁতিরা মাপসই বানায় না। ফলে রঙ্গনেকারদের ঘরে গিয়ে নতুন রং পেয়ে মাপসই হয়ে তবে বিদেশী বাজারে যাচ্ছে। তাতে খরচা বেড়ে লাভের গুড়টুকু ফুরিয়ে এসেছে। তবে এ বছর মালদার মসলিন আড়াই কোটি তনখার মতো সুরাটের বণিক আবদুল গফুর নিয়েছে—

—দরিয়া পেরোবে কিসে?

—হজরত! গফুরের নিজেরই ষোলো খানা জাহাজ রয়েছে। সুরাট থেকে হিন্দুস্থানের পসরা নিয়ে ফি সন শ-এর ওপর জাহাজ দরিয়া পাড়ি দিচ্ছে। হিন্দুস্থানের বণিকদের সঙ্গে দুনিয়ার বাজারে ওলন্দাজ, ফ্রানসিসি, ইংলিশস্তানি বণিকরা পাল্লা দিতে গিয়ে তাদের পসিনা ছুটছে!

এবার শাহেনশার মুখে হাসি ফুটলো।

জাফর খাঁ বললেন, গফুরের সবচেয়ে বড় জাহাজের নাম লক্ষ্মীনামা। চাল বোঝাই দিয়ে পেগু-পেনাং ছুটছে।

—লছমি?

—হ্যাঁ হজরত। কালিকটের চেট্টিয়ারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জাহাজ বানাচ্ছে। নামটা তাই অমন।

—দরিয়া ডাঙায় যা ব্যবসার খবর দিলেন তাতে তো সোনায় টান পড়ার কথা নয় জাফর খাঁ—

—আমাদের আসল রফতানি কাপড়। সেটাই তো মার খাচ্ছে আলমপনা।

যেটুকু সোনা আসে তা চলে যায় শাহীখানায়। তার বদলে দেশের ভেতর কাজকম্ম চালাতে বণিকদের আমরা রুপোর তন্‌খা দিয়ে থাকি শাহী খাজানাখানা থেকে। তাই দেখুন না—আকবর বাদশার আমলের শেষ দিকে সারা হিন্দুস্থানে রুপোর তন্‌খা ছিল তিন কোটির মতো—এই চল্লিশ বছরে বেড়ে বেড়ে তা দাঁড়িয়েছে নয় কোটিতে।

হঠাৎ শাহেনশার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। উজির জাফর খাঁ জানেন, এই হিসেবপত্তরের ছিটেফোঁটাও বাদশার মগজে ঢোকেনি। হিন্দুস্থানের সেরা লড়াকু বাদশা শাহজাহান এখনো পড়ে আছেন ভালো নিশানাদার গোলার সীসায়।

শাহজাহান বললেন, সীসা আমরা আরও দামি জিনিস দিয়ে বাইরে থেকে আনতে পারি।

জাফর খাঁ কিছু না বলে তাকিয়ে রইলেন।

—গোলকুণ্ডার হীরের খনিতে কত লোক কাজ করে?

—গোলকুণ্ডা এখনো হিন্দুস্থানের বাইরে আলমপনা—

—আহা! বলুন না—কত লোক কাজ করে?

—তা তিরিশ হাজারের তো কম নয়।

—আমাদের কারিগরদের দেখতে পাঠান। তারা ওখানে থাকুক।

—তারপর?

—শাহী ফৌজ নিয়ে গোলকুণ্ডার সীমানায় দাঁড়াবে। তখন চাপ দিতে হবে এই বলে—ওইসব কারিগর গোলকুণ্ডারই। ওদের খনির কাজে নিতে হবে।

—না শুনলে?

—ফৌজ ঢুকবে। শান্তি চাইতে হলে ওদের কাজে নিতে হবে। কাজে নিলে মজুরি হীরেয় চাওয়া হবে! হীরে এলে শাহী খাজানাখানার তাগদ বাড়বে। ওদের হীরে রুপোর তন্‌খায় কিনে নেওয়া হবে!

—মতলবটা ভালো হজরত। কিন্তু তাতে যা খরচ খরচা—লড়াইয়ের ঝুঁকি —তার চেয়ে কম খরচায় সীসা আমদানি করা যায়।

এসব কথায় অন্য উজির হলে সায় দিয়ে যেতেন। জাফর খাঁ উচিত বক্তা। তিনি যেন জেদ করেই শাহী খেয়াল খুশিতে কান পাতেন না। যদিও তিনি জানেন—বাদশা শাহজাহান মণি মুক্তা হীরে চুনি পান্না বলতে বেসামাল হয়ে পড়েন। চোখ দিয়ে লোভ ঝরে। চুনির জায়গা বলেই বদকশান আজ হিন্দুস্থানের ভেতরে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। বদকশান এখন তাই সুবে কাশ্মীরের ভেতর। সেখানে শাহী ফৌজ আজ তাই মোতায়েন।

আগ্রার শীতের বিকেলের আলাদা একটা গন্ধ আছে। এ বিকেলের ছায়া করে আসা সন্ধ্যাও কিছু অন্যরকম। রাজধানীর ছ'লাখ মানুষের কলরোল সেই ছায়ার সঙ্গে মিশে যায়। তাতে থাকে হিন্দুস্থানের হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকি! লোভ, কামনা, ঘৃণা, ভালোবাসা। পাটনা বা মসুলিপত্তনে দু'লাখ করে বাসিন্দা। সেইসব বড় শহর লোভে, কামনায় এখানো আগ্রাকে ছুঁতে পারেনি।

পাটনার ধানের গোলাদাররা কিংবা মসুলিপত্তনের সুতোর দাদনদারিরা বড় জোর তওয়াইফ—তরফাওয়ানি নিয়ে আসর জাঁকাতে পারে। কিন্তু আগ্রা? আগ্রার ক্রিয়াকাণ্ডই আলাদা। জাফর খাঁ জানেন, সন্ধ্যা আসতেই আগ্রার গায়ে জ্বর উঠে আসে।

বাদশা শাহজাহান উসখুস করছিলেন। জাফর খাঁ জানেন—আলমপনা এখুনি উঠে অন্দরমহলে যাবেন। সেখানে তার জন্যে শাহী সন্ধ্যা তৈরি হচ্ছে। আশমানে আলো মুছে যেতে ষোলোজন নাচিয়ে মেয়ে ষোলোটি সোনার প্রদীপ হাতে নাচতে শুরু করবে। হায়দরাবাদি চারটি মেয়ে তখন কিঙ্গিনা বাজাবে। আগেনগারের গুগ্গুল থেকে সুবাস ছড়াবে। সাজিয়ে রাখা সোনালি আঙুরে আলো ঠিকরে উঠবে।

ঠিক তখনই। তখনই ঠিক মরহুম বাদশা-বেগমের ছোট বোন সিতারা বানু সেখানে এসে দাঁড়াবেন। মনে মনে অনেকবার ভেবে দেখেছেন জাফর খাঁ। উজির হলেও সেখানে তাঁর যাবার উপায় নেই। উপায় থাকলেও সেখানে কখনো যাবেন না জাফর খাঁ। ওই সময়টা শাহেনশা সিতারা বানুর সুখস্পর্শে কাটান। শাহী অন্দরমহল তখন ফাঁকা হয়ে যায়।

হঠাৎ বাদশা জানতে চাইলেন, আবদুল গফুরের কোন জাহাজ যেন চাল নিয়ে দরিয়া পাড়ি দেয়?

—গফুরের ষোলোখানা জাহাজই দরিয়া চষে বেড়ায়।

—না না—সবচেয়ে বড় জাহাজ—কী নাম বললেন?

—লক্ষ্মীনামা। চাল বোঝাই করে হুগলিতে—বালেশ্বরে—তারপর পেগু-পেনাং-সুমাত্রা অব্দি যায়।

—ফিরে এলে খবর দেবেন আবদুল গফুরকে।

—আলা হজরত। কী বলা হবে তাকে?

—বলবেন, লক্ষ্মীনামা এখন থেকে অন্য দরিয়ায় ভাসবে।

কিছু অবাক হলেন উজির জাফর খাঁ। মুঘল শাহীর ফৌজ আছে। জঙ্গী হাতি আছে। হিন্দুস্থানের নদীতে নদীতে হামলা চালাতে নৌবারা আছে। আছে গজনলের মতো শাহী সব তোপ। লাখো লাখো ঘোড়সওয়ার। বন্দুকচী, ধানুকী, বেলদার।

কিন্তু নেই কোনো জাহাজ। দরিয়া চষে বেড়াবার জাহাজ বণিকরা তৈরি করে নেয় মসুলিপত্তন, হুগলি আর সুরাটে। দরিয়া দাপানো জলদস্যুরা যাতে হিন্দুস্থানের ব্যবসা-বাণিজ্যে থাবা না বসাতে পারে সেজন্যে হুগলি, সুরাট, কালিকটের বণিকরা পাহারাদার জাহাজও বানিয়ে নিয়েছে। সেই পাহারায় হিন্দুস্থানের নীল, মসলিন, চিনি, মৃগনাভি, গন্ধক দুনিয়ার বন্দরে বন্দরে পেঁৗছে যাচ্ছে।

জাফর খাঁয়ের অবাক মুখের দিকে গম্ভীর হয়ে তাকালেন শাহেনশা। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, বাদশা-বেগম অসময়ে চলে গেলেন। ভেবে দেখলাম, তাঁর সমাধি এমন জায়গায় হওয়া দরকার—যা কিনা সারা আগ্রা

ভেঙে পড়লেও একই সঙ্গে দেখতে পাবে।

—কোথায় আলা হজরত ?

—যমুনার ওপারে—। বসরা, সিরাজ, জেন্দা—দরকারে আরও বড় দরিয়া পেরিয়ে লক্ষ্মীনামা বয়ে আনবে নানান দেশের বাহারি পাথর। চাই কি সিরাজ থেকে কারিগরের দলও আসতে পারে পাথরের সঙ্গে সঙ্গে।

উজির জাফর খাঁ চুপ করে তাকিয়ে থাকলেন হিন্দুস্থানের বাদশার মুখে। মনে মনে দু'বার বললেন, মমতাজমহল। মমতাজমহল! তাঁর মন বললো, দেখতে তুমি কত নরম ছিলে। মরে গিয়ে তোমার যেন শক্তি বেড়ে গেছে বাজি! হিন্দুস্থানের বাদশাও তাতে টলোমলো।

আগ্রা দুর্গের অনেক নিচে তখন শীতের পাখিরা যমুনার চরে পাতি ঘাসের ভেতর দুনিয়ার চিরকালের পাখিদের মতোই সামান্য ধূলিকণা, ঘাসের বীজ কি কোনো অন্ধ পোকা নিয়ে ঠোঁটে ঠোঁটে ডানা ঝাপটে মারামারি করছিল। মানুষ এই মারামারি দেখে—ওদের কিচিরমিচির শুনে চিরকালই ভাবে—এই বুঝি কলকাকলি।

শীতের আগ্রায় মীর সফি বেরিয়ে পড়েছে। এখনো ফেরেনি। রোজ দুপুরে বড় নাস্তা সেরে সফি রাজধানীর কোথায় কোথায় যে যায় কে জানে! ফুলের গোছা সাজিয়ে মীনা বাঈ তৈরি। সফি ফিরলেই সে লালচক যাবে। গিয়ে ফুল সাজিয়ে বসবে। কিন্তু এখনো ফিরলো না মানুষটা। দূরে তাকাতেই আগ্রা দুর্গের মোরি দরওয়াজা চোখে পড়ে। তার পরেই আশমান ফুঁড়ে ওঠা দুর্গের সামান বুরুজ।

এক এক সময় মীনাক্ষীর মনে সন্দেহ হয়—শাহী ফৌজের আহেদিয়ানা, শান সৌকত হারিয়ে হেলমন্দের তীরের চাষীবাড়ির ছেলে সফি কি অনুতাপে ভোগে! হয়তো তার মনে হতে পারে—কী ছিলাম—কী হয়েছি! দিন দিন মশাল জ্বালানোর চর্বি, কুপি ধরাবার রেড়ি, গেঁহু আর খান্দেশি শর্করার দাম যা চড়ছে—তাতে পেটে ভাতায় একজন ফৌজি আহেদির তো যমুনার চরে এ জীবন অসহ্য হয়েই উঠতে পারে।

আমিই বা এ ক'বছরে কী দিতে পেরেছি সফিকে। আমার চেয়ে সফি ছোট। রাজধানীর লালচক থেকে কেনাবেচার পর ফিরে এক প্রস্থ সময় যায় দাম দামড়ি, আধেলা পওয়ার কানাকড়ি হিসেবে।

খেতে বসে সফি এক একদিন এমন করেই আশমানে তাকিয়ে রুটি চিবোয় —যেন বা এজন্যেই সে দুনিয়ায় এসেছে। চিবোনো আর শেষ হয় না। গিলতে সুবিধের জন্যে মীনাক্ষী তখন নাখদ ডাল এগিয়ে দেয়।

আমি আর কতদিনই বা মা হতে পারি!

চিন্তাটা যেন চরের মাছির মতোই তার মনের ভেতর ভনভন করছিল। মীনাক্ষী লালচক যাবার সময়—এক বেণী বেঁধে তাতে ফুলেল গরবা ঝুলিয়ে নিয়েছিল। গরবা সমেত বেণীটা এ-ঘাড় থেকে অন্য ঘাড়ে নিলো সে। তাতে

যদি ও চিন্তার মাছিটা দূরে উড়ে যায়। বিকেল বিকেল ঠোঁট রাঙাতে একটা বিলকুলি পান দিয়েছিল মুখে। এসবই একজন সফল ফুলওয়ালির সাজিস! পানের পিক কেটে মীনাক্ষী দেখলো, মাছিটা যায়নি।

তার মনের ভেতর সফির গলা গমগম করে উঠলো। কেন মীনা বানু? আমার কি বাবা হতে নেই?

—আমি দু'দুবার মা হয়ে তো দেখলাম। কোথায় বিষ্ণু গোলাম হয়ে ভাঙছে জানি না। কোথায় বা লক্ষ্মী বাঁদি হয়ে দিন কাটাচ্ছে জানি না। আবারও মা হবো? না। তা হয় না সফি।

—ওদের একদিন আমরা খুঁজে পাবোই মীনা বাঈ।

অন্ধকারে কাল রাতেও শুয়ে শুয়ে এসব কথার সময় কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। এসব কথা শুধু এক রাতের নয়। বরং বলা ভালো—অনেক—অনেক রাতই শুধু এই কথাগুলোর।

মীনা বানু রোজকার মতোই কাল রাতেও বলেছিল, পেলে এতদিনে পেতাম সফি। হিন্দুস্থানে আমাদের মতো আম আতরাফ ইনসানের জীবনের কানাকড়িও দাম নেই। দ্যাখোগে লক্ষ্মী এতদিনে সাত হাত ঘুরে তিন আশরফির বাঁদি!

—তোমার কোলে বাচ্চা এলে আবার সব ভালো লাগবে মীনা বাঈ।

নিজের বাসি শরীরটা মীনাক্ষীর রোজ সন্ধ্যায় ফুটিয়ে তোলা বেলিচারার গাঁট বোঝাই কান্ডের মতো লাগছিল। সে ব্যস্ত সফিকে কোনো বাধা দেয়নি। আবার সফির সঙ্গে যোগও দেয়নি। অন্ধকারকে শুনিয়েই যেন বলেছিল, তোমার নসিব এই পুবদেশি মেয়েমানুষের সঙ্গে জুড়তে গেলে কেন? না হয় ধুমধুমার গড়ের সামনেই আমার লাশ পড়ে থাকতো!

এসব কথায় সফি যা করে থাকে—তাই-ই করেছিল সে কাল রাতে। পুরুষালি ঠোঁটে মীনাক্ষীর ঠোঁট, হাঁ মুখ সে আগাগোড়া বুজিয়ে দিয়েছিল। তারপরেই সফির শরীরে ভীষণ জোর আসে খানিকক্ষণ। মীনাক্ষী যেন পুরোপুরি সামাল দিতে পারে না। একথা মনে পড়তে মীনাক্ষীর সারা মুখে লজ্জা নেমে এলো। সে যেন কোনো গুপ্ত জাদু আরশিতে নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছে!

রোজকার মতোই ঝিমিয়ে পড়তে পড়তে মীর সফি বলেছিল, পয়লা দিন তোমায় যখন আহেদি তাম্বুতে দেখলাম—তখন ভাবিইনি একজন আওরত এত তেজী হয়।

—কেন? হিন্দুস্থানের আওরত কি নিজের খসমকে বাঁচাতে হাতির পিঠে বসে বর্শা হাতে দুশমনকে তাড়া করেনি?

—কে মীনাক্ষী?

—ভুলে গেলে! বাদশা-বেগম নূরজাহান মহব্বত খাঁয়ের হাতে বন্দী জাহাঙ্গীর বাদশাকে ছাড়িয়ে আনতে হাতির পিঠে উঠে জং-কি-ময়দানে বর্শা হাতে লড়াই করেননি?

—ওঃ ! ভুলে যেও না মীনা বাঈ—তিনি ছিলেন হিন্দুস্থানের বাদশার চোখের নূর—

—বলো—দুনিয়ার চোখের আলো। আমিও কি ঘরদুয়ারি পাইক সনাতনের চোখের নূর ছিলাম না একদিন !

—ওকথা বোলো না মীনা বানু। আমার কষ্ট বাড়ে। বুকের ভেতর মড়মড় করে ওঠে। বুঝিবা হাড় ভাঙছে—

কোনো কথা বলতে পারলো না মীনাক্ষী। নিজের মনের ভেতর তার যে-কথা বুড়বুড়ি কাটছিল—তা সাজালে এমন হয়—সেই মানুষটাই বা কোথায় গেল ?

সফি বললো—খুব আস্তে আস্তে। তাম্বুর ভেতর সেই সন্ধে থেকেই তুমি আমার চোখে লেগে আছো। চোখে লেগে আছো সেই সময় থেকেই—যখন তুমি আমারই ইয়ারদোস্ত শাহী আহেদি বাজারঘানির ঘোড়ার পেটের নিচে পাগলের মতো বিরছা কুড়ুল দিয়ে দড়ি দড়া কাটছো—কোনো দিকে নজর নেই—মরে যাচ্ছিলে—

—ধুমধুমার গড তখন তোমরা গুঁড়িয়ে দিচ্ছো। সেদিন মরে গেলেই ভালো ছিল।

—তাহলেও তুমি আমার চোখে লেগেই থাকতে মীনা বাঈ।

মীনাক্ষী কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে তার চেয়ে বয়সে ছোট এই তেজী আফগানকে তখন হাত, পা, বুক দিয়ে সব দিক থেকে জড়িয়ে ধরেছিল। সফি যাতে আর কথা না বলতে পারে এমনভাবেই।

গোলাপ তোড়াগুলো সামলে বাকি ফুল, মালা, গোড় গুছিয়ে মীনাক্ষী একা একাই রওনা দিলো। হয়তো সফি সিধে লালচকে এসে হাজির হবে—একেবারে ফেরার সময়। কোনো কোনোদিন তাই করে।

রাজধানী আগ্রায় শীতের সন্ধ্যা তখন ফুলে ফুলে রঙিন হয়ে উঠেছে। মীনাক্ষী এসে ফুল গুছিয়ে বসতে বসতে দেখলো, চকের উল্টোদিকে গন্ধেশ্বরী ব্যাপারীর গোলার সামনে একটা হাতি দাঁড়িয়ে। রাস্তা দিয়ে আগ্রা বয়ে চলেছে। গোলা থেকে সামনের রাস্তায় অভ্রের বাতিদানের তেজী আলোর ছটা। ডোরাকাটা ঢিলে ডোরিয়া সামলে মীনাক্ষী ফুলের পসরার সামনে থেবড়ে বসলো। দু'জন তুর্কি ঘোড়সওয়ার ঘোড়া থেকে নেমেই চামেলির মালা চাইলো এক জোড়া করে।

এগিয়ে দিতে দিতে মীনাক্ষী ভাবলো, দূর দেশের এইসব ছোকরা সওয়ারের মাথাগুলো চিবিয়ে খাচ্ছে শয়তানপুরার ছলাকলাভরা তওয়াইফ মেয়েগুলো। সন্ধ্যার আগ্রায় মেয়েদের মন পাওয়ার চলতি রেওয়াজ চামেলির মালা উপহার।

হাতি থেকে নেমে শাহী ফিল-ই-বর্কাস সনাতন হাতি তখন গন্ধেশ্বরী গোলায়। আগের গোলা বদলে এ মাসে এখান থেকেই হাতির বরাদ্দ ঘি চিনি খাবার ব্যাপারে সে কথা বলতে এসে দেখছে—তার জন্যে বিরাট খাতির

আয়োজন। যেন সে বা কোন মনসবদার। শুরুতেই আশরফি ভর্তি একটা ভারি খেরিয়া তার সামনে থালায় রাখলো গন্ধেশ্বরী ব্যাপারি। পাশে পান।

সনাতন কড়া হবার চেষ্টা করতেই ব্যাপারী প্রায় গলবস্ত্র হয়ে বললো, এ কিছু নয়। সামান্য তোফা। এটাই দস্তুরি। হুজুর পান কবুল ফরমাইয়ে—

কবেই সনাতন ব্রহ্মপুত্রের তীর ছেড়ে হিন্দুস্থানের পশ্চিমে—উত্তরে ঘোরাঘুরি করে আজ কয়েক বছর হলো আগ্রায় থিতু হয়েছে। কিন্তু একটা অভ্যেস এখনো তার যায়নি। সে এদিককার পান তেমন সুবিধে করতে পারে না। দিশি গুয়া-পানের জন্যে তার মুখের ভেতরটা আজও সুলসুল করে। মাটির নিচে পুঁতে রাখা সুপুরি তুলে নিয়ে সাজা পান কতদিন খায়নি। তবু সহবত মতো সে একটি পান তুলে দাঁতে কাটলো শুধু। তারপর রাস্তায় বেরিয়ে এসে তার মনটা ফুরফুর করে উঠলো। শাহী কাজকারবারে এত মজা? খেরিয়া ভর্তি আশরফি। এখন সে রাজধানীর দোকান পসরায় গিয়ে যে কোনো জিনিস কিনতে পারে।

এই হাতিটি সনাতনের খুবই বাধুক। সে উঠতে যাবে। এমন সময় চোখ পড়লো লালচকে। এক গোছা তাজা গোলাপের তোড়া নিয়ে মীনা বানুর সঙ্গে এক রইস বণিকের দর কষাকষি চলছে। লোকটি আর্মানি হবে। গোলাপ নিয়ে সে চলে যেতেই একটু ফাঁকা দেখে সনাতন ফিল-ই-বর্কাসর মান মেজাজ বজায় রেখে মীনাক্ষীর হাতার ভেতর এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। আর সেই সঙ্গে শুনিয়ে শুনিয়ে সে বলতে লাগলো, এই হিন্দুস্থানে ভিখারি মিশকিনরাই সবচেয়ে নিরাপদ। একবার ভিখারি হতে পারলে তার আর কোনো বিপদ নেই—। তখন তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না।

এ কথাগুলো সনাতনের নিজের মনেই গেঁথে আছে। বহুদিন ধরে। ধুমধুমার গড় হাতির পায়ে গুঁড়িয়ে দিতে দিতে মনসবদার মির্জা ইউসুফ বেগের হুকুমে ফৌজের কয়েকজন তাকে জিন্দা ধরবে বলে তাড়া করেছিল। তখন প্রাণ নিয়ে ছুটতে ছুটতে সনাতন সব হারানো এক ভিখারির কুঠিতে লুকিয়ে থেকে প্রাণে বেঁচেছিল। ওই কথাটা সেই ভিখারির মুখে শোনা। একবার ভিখারি হতে পারলে তার আর কোনো বিপদ নেই—

চুল দাড়ির বোঝার ভেতর সনাতনের চোখ দুটি দেখা যায় কি যায় না। কিন্তু তার গলার স্বর যেন এই মাণ্ডি এলাকার হাজারো কথাবার্তা, দরাদরির ভেতর আলাদা করে বেজে উঠলো।

অত ভিড়ে—দর কষাকষি, ঘোড়ার পা বদলানোর খটাখট, ঝামা পাথরের রাস্তায় হরেক জুতোর আওয়াজ ছাপিয়ে সনাতনের কথাগুলো যেন মীনাক্ষীর কানে দেববাণী হয়ে ফুটে উঠলো। সে খদ্দেব সামলে সনাতনের মুখে তাকালো। একটু অবাকই হল, আপনি?

—কেন! ফিল-ই-বর্কাস রাজধানীর রাস্তায় ঘুরতে বেরাতে পারে না মীনা বানু?

লজ্জাই পেল মীনাক্ষী। না না—তা বলিনি।—নিজেকে সামলে নিতে সে

এবার গোলাপের বড় দুটো তোড়া এগিয়ে দিলো। একদম তাজা। নিন্ না—

—ফুল দিয়ে আমি কী করবো ? কোথায় রাখবো ?

এক বাঁদি—কোনো বুড়ি তওয়াইফের বাঁদি হবে—সস্তায় কিছু খুচরো ঝরাফুল কিনতে এসেছে। হয়তো মানরক্ষার জন্যে সুজনিতে বিছিয়ে খদ্দেরের আশায় রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে হবে তাকে। তার কোঁচড়ে দশ দামে তিন ধুনুচি ফুল দিয়ে মীনাক্ষী বললো, কেন ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখবেন। খুশবুতে ঘর গেরস্থি সুন্দর হয়ে উঠবে। নিন—ভয় পাচ্ছেন কেন ! আপনাকে কিছুই দিতে হবে না !

সনাতন নিলো না। একটু হাসলো। লম্বা করে। চুল দাড়ির ভেতর থেকে মীনাক্ষীকে ভালো করে দেখতে দেখতে।

একটু ফাঁকা দেখে মীনাক্ষী মীর-ই-ফিলের দিকে কৃতজ্ঞ চোখে তাকালো। এই মানুষটির জন্যে কোড়া খাওয়া সফি রক্ষা পেয়েছিল। ফিল-ই-বকসির মতো মানুষ হয়েও তাদের ঝুপড়িতে ইনি গেছেন। উঠোনে পেতে দেওয়া খোলপেতে বসেছেন। কিছু বুঝতে না পেরে মীনাক্ষী বললো, কী ?

—ঘরই নেই, তো গেরস্থি !

জীবনে নানা ঘাটে ঘুরতে ঘুরতে তবে না মীনাক্ষী ভাসতে ভাসতে আজ সন্ধ্যায় রাজধানীর এই লালচকে। সে কেন যে ঘর-গেরস্থির কথা তুলতে গেল ? কী দরকার ছিল ! তাগদ, ফৌজি, রইসি পুরুষের সামনে হিসেব করেই কথা বলা উচিত। সবাই তো আর তার জন্যে দিওয়ানা সফি নয়, যে যা ইচ্ছে বলে দেওয়া যায়।

এখনো অনেক ফুল বেচতে হবে। মীনাক্ষী সাবধান হয়ে গেল। গম্ভীর হয়ে ওঠা পুরুষ মানুষকে ঘর-গেরস্থির কথা বলতে যাওয়াও অনেক খেদমতের ব্যাপার। ফুলগুলো গোছাতে গোছাতে মীনাক্ষী বললো, কী যেন বলছিলেন—

সেই ভিখারির লাখ কথার এক কথা মনে পড়লো সনাতনের। এই হিন্দুস্থানে ভিখারি-মিশকিনরাই সবচেয়ে নিরাপদ। কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না। একবার ভিখারি হতে পারলে তার আর কোনো বিপদ নেই !

এসব কথার কিছুই সে এবার বলতে পারলো না। মীনাক্ষী তার মুখে তাকিয়ে আছে। মুখের সেই ভঙ্গি। গায়ের রং চর জায়গায় রোদ বৃষ্টিতে ভিজে পুড়ে কিছু চাপা পড়ে গেছে। ভিখারির কথাগুলো এবার বলতে লজ্জা হলো সনাতনের—ভিখারিরও তো বিপদ আছে। খিদে, শীত, বৃষ্টি। এসব যাবে কোথায় ?

আবারও জানতে চাইলো মীনাক্ষী। কী বলছিলেন যেন—

—শুনবে ?

কাঁচাপাকা চুলদাড়ির ভেতর মানুষটার গলা একদম গুমগুম করে বাজে। মীনাক্ষী সামান্য ঘাড় নেড়ে সায় দিলো।

—তবে শোনো মীনা বানু !

মীনাক্ষী তাকিয়ে দেখলো, শীত পড়ায় আগ্রার রাস্তায় বেশির ভাগ মানুষ-

জনের গায়ে মাথায় সস্তার মোটা পশমের বুক মাথা ঢাকা আঙরাখা ধরনের সুফি খিরকা। রাত বাড়তে ভিড় কিছু পাতলা। ফিল-ই-বকসির হাতিটি রাস্তায় ছড়িয়ে পড়া আলোয় স্থির চোখে তাকিয়ে।

সনাতন বললো, একজন লোকের সব ছিল—

মীনাক্ষী অবাক হলো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি কেউ কখনো কাহানি শুরু করে?

সনাতন বললো, এখন তার কিছুই নেই—

মীনাক্ষী ঠিক বুঝতে পারলো না। এটা কাহানি? না, কারও কথা? সে বলে উঠলো, কার কথা বলছেন?

—ধরো তোমার কথা। আমার কথা—

ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলো মীনাক্ষী। আমার কথা?

—হ্যাঁ মীনা বানু। বলতে পারো লক্ষ্মী কোথায়?

—কে? বলে একই সঙ্গে দাঁড়িয়ে—চেঁচিয়ে উঠলো মীনাক্ষী। বেশির ভাগ ফুলওয়ালিই চলে গেছে। যা দু'একজন তখনো বসে—তারা ফিরে তাকালো। বাকি আগ্রার এসব দিকে ফিরে তাকাবার ফুরসত কোথায়?

হাতি তার সওয়ারের তাড়া বোঝে। ভালো ব্যবহার—খারাপ ব্যবহার মনে রাখার মতো বুদ্ধি এই জানোয়ারের আছে। সনাতন লাফিয়ে পিঠে বসতেই শুঁড় দুলিয়ে হাতি প্রায় দৌড়তে শুরু করলো।

—কে? কে আপনি? দাঁড়ান—বলে মীনাক্ষী চকের চাতাল থেকে দৌড়ে রাস্তায় পড়লো।

সনাতন পেছন ফিরে চেঁচিয়ে উঠলো। হ্যাঁ। লক্ষ্মী? বিষ্ণু? তারা কোথায়?

ভিড়ের রাস্তায় মানুষজনের গায়ে পড়ে ধাক্কা খেতে খেতেও মীনাক্ষী চেঁচিয়ে উঠলো, আমিও খুঁজছি। কোথায় তারা? কোথায়?

অত বড় জানোয়ার দেখে লোকে রাস্তা দেয়। কিন্তু মীনাক্ষীকে রাস্তা দিতে কারও কোনো মাথাব্যথা নেই। সে ধাক্কা খাচ্ছিল—তবু এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সনাতনকে পিঠে নিয়ে হাতি লম্বা লম্বা চার পায়ে দিব্যি ছুটছে। সনাতন তখনো জানে না—কেন সে মীনা বানুর কাছ থেকে এভাবে পালাচ্ছে। ঘর গেরস্থি কথা দুটোকে সে বড় ডরায়। ও-কথায় বিষ আছে।

সন্ধে রাতের আগ্রা দেখলো, চুল দাড়িওয়ালা একটু পাগল পাগল লোক ছুটন্ত হাতির পিঠে উঠেছে আর পড়ছে। আর সেই হাতিকে প্রায় ধরে ধরে একজন জেনানা পড়িমরি করে পেছন পেছন দৌড়চ্ছে।

কোনো উপায় না দেখে সনাতন কোমর থেকে গন্ধেশ্বরী গোলাদারের দেওয়া খেরিয়া গেঁজেটার মুখ খুলে রাস্তার দিকি উপুড় করে ধরলো। আর অমনি ভেলকি ঘটে গেল।

ভিড়ের রাস্তায় আশরফির টুংটাং। কুড়োতে গিয়ে কিছু মানুষজনের ওপর তাদের পেছনে হেঁটে আসা অন্য লোকদের হুমড়ি খেয়ে পড়া। আশরফি! আশরফি! বলে চিৎকার। দু'ধারের ব্যাপারীদের গোলায় বসে দাঁড়িয়ে থাকা

মানুষজনের ছুটে আসা। রাস্তার ধুলোয় হাতড়ানো। এই ভিড় হই হট্টগোলে বেদম ধাক্কা খেয়ে মীনাক্ষী পড়ে গেল। নিজেরই পায়ে পা জড়িয়ে।

বার বার হারানো সুতো খুঁজে পেয়ে তা আবার ছিঁড়ে যাচ্ছে মীনাক্ষীর। পা টেনে টেনে শীতের রাতে সে যখন যমুনার চরে এসে নামলো—তখন হিমেল কুয়াশায় একটি আবছা মতো চাঁদ নিচের ঝুপড়ি, তরমুজ খেত, জলা জায়গায় মাছ মারাদের টাঙিয়ে রাখা জালের দিকে তাকিয়ে। মীনাক্ষীর মনেও পড়লো না—তার ফুলের ডুংরিটা লালচকে পড়ে আছে।

কেওয়াড়ি সরিয়ে উঠোনে পা দিতে না দিতে মীনাক্ষী শুনতে পেল, এত দেরি?

সফি ফিরেছে। অন্যদিন চকে দেখা না হলে মীনাক্ষী চরে ফিরে সফির জন্যে বসে থাকে। আজই প্রথম অন্যরকম হলো।

কোনো কথা না বলে মীনাক্ষী উঠোন পেরিয়ে ঝুপড়িতে ঢুকতে যাচ্ছিল।

সফি থামালো। ফুলের ডুংরিটা ফেলে এলে কোন চুলোয়?

এবারও কোনো কথা বললো না মীনাক্ষী।

—এত রাত অব্দি কোথায় ছিলে?

সফির গলা এবার চিরে গেল। মীনাক্ষী বুঝলো, সফি ভেতরে ভেতরে ছিঁড়ে খুঁড়ে যাচ্ছে। ফেলে আসা জীবনের এক ঝলক দেখা দিয়েই মুছে যায়। যেতে না যেতেই এ-জীবন এসে চেপে বসে।

মীনাক্ষী ঝুপড়ির ভেতরে না গিয়ে ফিরে দাঁড়ালে। নিচে বসে থাকা সফির মাথায় হাত রাখলো। কী হয়েছে তোমার?

সফি কোনো কথা বলতে পারলো না তখনই। সারা চর ঘুমিয়ে পড়েছে। সে আস্তে আস্তে ফের জানতে চাইলো, এখন কোত্থেকে এলে?

মীনাক্ষী সে কথায় না গিয়ে শান্ত গলায় বললো, তোমার কী হয়েছে বলবে তো?

কোনো কথা নেই। কোনো শব্দ নেই। নিজের সঙ্গে আলাপ করার মতো গলায় মীর সফি বললো, একসময় হেলমন্দের তীরে খেল-কুদ করেছি। এখন এই যমুনা ছাড়া ভাবতে পারি না মীনা বাঈ। একসময় কেতাদুরস্ত শাহী আহেদি ছিলাম। বাতাসের সঙ্গে ঘোড়া দাবড়াতাম। এখন লাট্টু শাহ চিসতির মাজার শরিফে কাওয়ালি সুরে আগেনগারের খুশবুতে ভেসে যাই। যা-ই করি—তুমি আছো—তুমি আমার আছো জেনে আমি ঘোরাঘুরি করি মীনা বানু। কিন্তু—

—আমাকে দিয়ে তোমার কী হবে?

থতমত খেয়ে গেল সফি। তারপর বললো, তা তো জানি না—

—বাঃ! বেশ। এই তোমার গেরস্থি মগজ!

—বেগম দিয়ে কী হয় ইনসানের? একসঙ্গে থাকে। শুধু ঘরে আছে জেনেই তো মানুষ ঘর করে। এর চেয়ে বেশি কী আর মীনা বাঈ!

এবার মীনাক্ষী আস্তে আস্তে বললো, চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই।

—কোথায় যাবো ?

—তোমার হেলমন্দে। হেলমন্দের তীরে খেতিবাড়ি করবো দু'জনে।

—সেখানে ভীষণ শীত। সেখানে গরমে ভীষণ গরম। তোমার সহ্য হবে না মীনা—

—তুমি পাশে থাকলে সব সইতে পারবো। চলো—

—ফুলের এই চাষ ফেলে ? জুঁইগুলো ফুটবে সামনের পূর্ণিমায়—

—ফুটুকগে ! ভারি জুঁই—

।। চল্লিশ ।।

হিন্দুস্থানের বাদশা শাহজাহানের ভায়রাভাই খলিলুল্লা খাঁয়ের বেগম মেহজাবিন উঁচু দীবানে বসে ডান পা এগিয়ে দিয়েছেন। তাঁর পায়ের চটিতে দুটি করে চুনি বসাচ্ছিল কারিগর এতক্ষণ। বর্বরি ছাগলের নরম উজ্জ্বল কালো চামড়ার জমিতে নীল আভা ছড়ানো চুনি। নীল রংয়ের সুতো দিয়ে তাই গেঁথে দিলো কারিগর। মেহজাবিনের পা যেটুকু বেরিয়ে তা খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

পায়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মেহজাবিন। চোখ নামিয়ে দেখলেন, চটির ডগায় বসানো চুনি পোশাকের ঝুলে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে কিনা। নাঃ। ঠিক আছে। এবার তিনি একটু হেঁটে দেখবেন। তাঁর পায়ের এই চটিগুলোর তলা একদম সমান সমান। পাছে এ-ঘর ও-ঘর করার সময় চটির খোঁচায় কারপেটের বনাত ছিঁড়ে যায়—তাই।

মরহুম বাদশা-বেগম মমতাজমহলের আপন ছোটবোন মেহজাবিন বেগম তাঁর নিজের মহল থেকে দেওয়ান-ই-খাসের দিকে চললেন। যতক্ষণ না শাহেনশার সামনে হেলেদুলে গিয়ে হাজির হতে পারছেন—ততক্ষণ তিনি সুস্থির হতে পারছিলেন না।

সকাল থেকে প্রায় এক ঘড়ি ধরে দু'পাটি চটিতে মোট চারটি চুনি বসিয়ে কারিগর নগদ ত্রিশ আশরফি পেয়েছে। তার নাম আশরাফ আমেদ। সে এই আগ্রা দুর্গে কামারশালে চাচার সুবাদে থাকলেও পাকা কোনো কাজ এখনো তার কপালে জোটেনি। টুকটাক এটা ওটা করে আশরাফ চালায়।

তবে আগ্রায় কাজের কোনো খামতি নেই। হিন্দুস্থানের মতো এত বড় দেশের যোগ্য রাজধানী। একটা না একটা কাজ লেগেই আছে এখানে। যে-দেশের বাদশা-শাহেনশা শাহজাহান—সেখানে কাজের অভাব হয় না।

হিন্দুস্হানে সবাই জানে এই বাদশা বসে থাকার পাত্র নন। হয় তিনি লড়াই করবেন—নয়তো লম্বা লম্বা সড়ক বানাবার হুকুম দেবেন। ইনি জাহাঙ্গীর নন। শাহজাহান। দিল্লিতে—আগ্রায় একই সঙ্গে সমান তালে মসজিদ গড়ে উঠছে। আগ্রা দুর্গের ভেতরে মোতি মসজিদে কী সুন্দর পাথরের কাজ চলছে। ভেতরে যাবার কী বিশাল দরওয়াজা। দেওয়ান-ই-খাস বাদশার মনোমত করে ফের তৈরি হচ্ছে। সেখানেই তো অঢেল কাজ। গড়ে উঠছে

শিশমহল। আরশি বসানোর কারিগর এসেছে ইস্পাহান থেকে।

আর সবার ওপরে যমুনার দক্ষিণ পাড় জুড়ে তো এলাহি কাজকর্ম শুরু হয়ে গেছে। এপারে রাজধানীর শাহী সড়ক থেকেই আশরাফ দেখে—উট, মানুষ, গো-গাড়িতে চলেছে নানান জাতের পাথর। বিদেশী কারিগররা এসে তাঁবু ফেলেছে ওপারে। মরহুম বাদশা-বেগম মমতাজমহলের সমাধি তৈরি হবে। কিছু না হোক ওখানে তো পাথর কাটাইয়ের কাজ জুটবে।

সে শুনেছে—দিল্লির কাছাকাছি নতুন রাজধানী শাহজাহানাবাদ গড়ে তুলতে সেখানেও এমন দিশী-বিদেশী কারিগর-ওস্তাদদের ভিড় হয়েছে। তাঁবুর পর তাঁবু। আগ্রা দুর্গের কিছু কিছু কারিগরকেও ওখানে পাঠানো হয়েছে। আশরাফ সেখানে গেলেই পাকা কাজ পেয়ে যায়। কিন্তু হীরে চুনির কারিগর হয়ে সে কী করে পাথরে কর্নিক ধরে? আশরাফের বয়স অল্প। সে দেহাত থেকে সিধে আগ্রা দুর্গে এসে তার কাকার কাছে উঠেছে। বয়স অল্প। কম কথা বলে। সুশ্রী। কাজও করে মন্দ না। তাই মাঝে মাঝেই তার অন্দরমহলে ডাক পড়ে। আগ্রার বাইরে দেহাতে সে এখানকার মতো এত খুবসুরতি দেখেনি কখনো। মেহজুবিন বেগমের মতো সুন্দরী তো আম্মি-দাদি-নানির মুখের রূপকথায় পাওয়া যায়। চটিতে চুনি লাগিয়ে আশরাফ যখন মেহজুবিন বেগমের পায়ের কাছে তা এগিয়ে দিয়েছে—তখন ওই সুন্দরী আওরতের পা দেখতে পেয়েছে শেষে। দেখার কথা নয়। চটিতে বেগম যখন পা বের করে গলাবেন—তখন আশরাফের চোখ বুজে থাকার কথা—নয়তো দূরে আড়ালে সরে থাকার কথা।

কিন্তু মেহজুবিন বেগম তাকে মানুষের ভেতর ধরেননি বলেই আশরাফ সেই সুন্দর দু'খানি পা দেখতে পেয়েছে। মানুষের পা বলে মনেই হয়নি তার। যেন বা বেহেস্ত থেকে নেমে আসা কারও পা ওই দু'খানি এত সুন্দর। এত নাজুক। রঙ্গিলা।

সেই রঙ্গিলা পা দু'খানি চুনি বসানো চটিতে গলিয়ে পায়ের মালিক এখন সুখে হেলে দুলে দেওয়ান-ই-খাসের দিকে চলেছেন। খোদ শাহেনশা তাঁকে এই চুনিগুলো দিয়েছেন। চটিতে সেগুলো লাগিয়ে মেহজুবিন বাদশাকে তাক লাগিয়ে দিতে চান। শাহেনশা গোপনে মেহজুবিনকে যা দেন—তা খোলাখুলি বাদশাকে দেখিয়ে মেহজুবিনের আলাদা এক রকমের আনন্দ হয়।

শীতের কাঁচা বেলা। আহ্লাদী ঢং-এ কী ভাবে বাদশার সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন—মনে মনে তারই মহড়া দিচ্ছিলেন মেহজুবিন বেগম। ডান দিকে মাথাটা একটু হেলিয়ে দিয়ে দাঁড়ালেই—মেহজুবিন দেখেছেন—বাদশা অস্থির হয়ে পড়েন। তখন সারা হিন্দুস্থান যেন টলমল করে ওঠে। আর গর্বে মেহজুবিনের বুকের ভেতরটা এক মধুর ব্যথায় ভরে যায়। তবে এসবের জন্যে বাদশাকে একা পাওয়া চাই।

দেওয়ান-ই-খাস ঢেলে সাজানো চলছে। আলা হজরত হয়তো সেখানে

খানিকক্ষণ একা দাঁড়িয়ে দূর থেকে পাথরের ওপর আলোর ঝিলিক যাচাই করতে পারেন। তখনই মাকরানা মর্মরের এলোমেলো স্তূপের মাঝখানে গিয়ে মেহজ়বিন বেগম দাঁড়াতে চান। বাদশা দেখুন—প্রাণভরে, চোখ ভরে তাঁর মেহজ়বিনকে দেখুন।

বাদশা নয়। দেখা হয়ে গেল শাহজাদা দারার সঙ্গে। ছিপছিপে সফেদ শরীরে নাদিরি জামা—মুখখানি ঢল ঢল—মাসিকে দেখে শাহজাদার মুখে হাসি ভেসে উঠলো।

মেহজ়বিন খুব সোহাগ মিশিয়ে শাহজাদাকে কী বলতে যাবেন ঠিক এমন সময় কেল্লার জবাবি ঢাকা পথের মুখে ভেসে উঠলো করিমউন্নিসার মুখখানি। আগে হলে এসব সময় মেহজ়বিনের চোখের ইশারায় করিমউন্নিসা সেখান থেকে সাত তাড়াতাড়ি সরে যেতো। কেননা—সে তো ছিল মেহজ়বিন বেগমের দিনরাতের হাজিরা।

এখন সময় অন্যরকম। সেই হাজিরা আজ হিন্দুস্থানের বাদশার পয়লা শাহজাদার ভাবী বেগম। চাই কি কোনোদিন হিন্দুস্থানের বাদশা-বেগমও হতে পারে সে। মেহজ়বিন খুব সাবধান হয়ে গেলেন। তাঁর এককালের বাঁদির সামনে পাছে মুখের ভাবটা কঠিন হয়ে ওঠে তাই তিনি যতটা পারেন মোলায়েম করে তাকালেন। তারপর হেসে স্নেহ মাখিয়ে বললেন, ভালো! ভালো! দু'জন তো দু'জনকে জানবে—বেশ করেছো—

দু'জনের আরেকজন শাহজাদা দারা। তিনি অবাক হলেন কিছুটা। এই তাহলে করিমউন্নিসা। ভাবী বেগম করিমউন্নিসার সঙ্গে আগে তার কখনোই দেখা হয়নি। কথা তো দূরের কথা। কিন্তু মাসি ভেবে নিলেন, আগে থেকে ঠিক করে দু'জনে দুর্গের ভেতরে আড়ালে কোথাও কথা বলবো বলে বেরিয়ে পড়েছি।

শাহজাদা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। পারলেন না। করিমউন্নিসা পুরনো অভ্যেসে খাঁটি বাঁদির আদবে তার সাবেক মালিকনকে ঝুঁকে কুর্নিশ করতে শুরু করেছে সবে। মেহজ়বিন বেগম ফস্ করে তার দু'খানা হাত ধরেই বুঝলেন, করিমউন্নিসা তাঁর হাতের ভেতর থরথর করে কাঁপছে।

—কী হচ্ছে? তুমি হিন্দুস্থানের পয়লা শাহজাদার ভাবী বেগম। তুমি কাকে কুর্নিশ করবে।

মেহজ়বিনের হাতের ভেতর কাঁপতে কাঁপতে করিমউন্নিসা বললো একদম অন্য কথা। আমি জানতামই না—শাহজাদা এ-পথ দিয়ে আসবেন। জানলে—

মেহজ়বিন বেগম কলকল করে উঠলেন। জানলে কী করতে! অন্য পথ দিয়ে যেতে?

এ কথাতেও করিমউন্নিসা রীতিমত ভয় পেল। একজন খাঁটি বাঁদির ভঙ্গিতেই ফের কুর্নিশ করার জন্যে কোমর থেকে ভাঁজ হলো। হাত তুলে ফেলেছিল প্রায়। এবারও মেহজ়বিন বেগম বাধা দিলেন। ভুলে যেও না—তুমি শাহজাদা-বেগম হতে চলেছো—

করিমউন্নিসা বললো, শাহজাদা আসছেন জানলে আমি অন্য পথ দিয়েই যেতাম। আমায় মাফ করবেন—

নরম শান্ত গলায় ভয় পাওয়া পায়রার মতোই এমন মাফ চাওয়া দেখে শাহজাদার বুকের ভেতরটা টন টন করে উঠলো।

মেহজ্‌বিন বেগম বললেন, মাফ চাইবার হয় তো শাহজাদার কাছে চাইবে। হিন্দুস্থানের শাহীর পয়লা আওলাদ শাহজাদা মহম্মদ দারাশুকো। কুর্নিশ করতে হয় করবে শাহজাদাকে। আমি কে!

এ কথাতেও দারাশুকো চাপা দুঃখের রেশটুকু চিনলেন। আম্মিজান নেই। তাঁর ছোট বোন মেহজ্‌বিন। হয়তো কোথাও অনাদর, অবহেলা বড় বেশি করে বেজেছে মায়ের এই বোনের বুকে। তাই এমন কথা উঠে এলো মুখে। কেঁপে উঠে নরম শান্ত গলায় করিমউন্নিসার মাফ চাওয়ায় যেমন—ঠিক তেমনই মাসি মেহজ্‌বিনের অভিমানে শাহজাদা দারার ইচ্ছে হলো—নিজের হাতে নরম কথার প্রলেপ মাখিয়ে দেন।

—কেন মাসি? মাসিকে তো কুর্নিশ করবেই। তসলিমও জানাবে—

মেহজ্‌বিন বেগম যাচ্ছিলেন শাহেনশাহর আদর কুড়োতে। মাঝপথে অচেমকা এই দেখাশুনো। অগত্যা—

নিজের মুখখানায় হাসি মাখিয়ে রাস্তা পাল্টালেন মেহজ্‌বিন।

তখন করিমউন্নিসার সামনে শুধু শাহজাদা দারাশুকো' দু'পাশে সাক্ষী পাথরেব নিরেট দেওয়াল। দারা বুঝলেন, করিমউন্নিসা বুঝতে পারছে না—কী করবে? কিছু না বলে তার চলে যাওয়া রীতিমত বে-সহবত।

শাহজাদা দারা মিথ্যে মিথ্যে গম্ভীর গলায় বললেন, আমায় তো কুর্নিশ করলে না—

সঙ্গে সঙ্গে করিমউন্নিসার মুখে দু'চোখের পাতা কেঁপে উঠলো। সে কোমর থেকে ভাঁজ হয়ে ফের কুর্নিশ করতে গেল।

এবার শাহজাদা তার দু'হাত ধরে ফেললেন। তুমিও তো শাহজাদী হতে পারতে!

করিমউন্নিসা কোনো কথা বললো না। চোখ নামিয়ে নিলো।

—তোমার আমার—দু'জনেরই দাদাসাহের বাদশা জাহাঙ্গীর।

এবারও কোনো কথা বললো না করিমউন্নিসা।

—জাহাঙ্গীর বাদশাকে দেখেছো?

—হুঁ।

—তুমি নিজের থেকে একটাও কথা বলবে না?

করিমউন্নিসা কোনো কথা বললো না।

—আমি তোমায় অত বড় নামে ডাকতে পারি না—অত বড় নাম মুখে আসতে চায় না।

—আপনার যে-নাম পছন্দ—সে-নামেই ডাকবেন।

পাথরের দেওয়ালে দেওয়ালে ওর গলার স্বর কিঙ্গিনার গড়িয়ে যাওয়া সুরের

মতোই ছড়িয়ে পড়ছিল। শাহজাদা দেখলেন, কথা বলার সময় করিমউন্নিসার দাঁতের পাটি সাদা সাদা ফুলের সারি যেন। কোনো ফুলের বুক থেকেই যেন ওর গলা উঠে আসছে।

শাহজাদা বললেন, আজ থেকে তোমায় আমি নাদিরা বলে ডাকবো।

করিমউন্নিসা ডানদিকে মাথা কাত করে সায় দিলো।

—নামটা পছন্দ হয়েছে তোমার ?

এবার করিমউন্নিসা বাঁ দিকে মাথা কাত করে সায় জানালো।

দুটো ভঙ্গিই যুবক হয়ে ওঠা শাহজাদা দারাশুকোর মনের গভীরে পাকা-পাকি ছায়া ফেললো।

এরকমই শীতের বেলায় ফিল-ই-বকসি সনাতন হাতি শাহী পিলখানা থেকেই হাতির পিঠে বসে মোরি দরওয়াজায় এসে থামলো। জায়গাটায় সারা আগ্রা দুর্গের জন্তু-জানোয়ারদের পায়খানা-পেচ্ছাপের গন্ধ। এই পথ দিয়েই দুর্গ সাফাই হয়ে ময়লা জলটা নিচে যমুনার চর দিয়ে দূরে ভেসে যায়।

হাতির পিঠে বসেই সনাতন পেছনে তাকালো। ঘাড় ঘোরাতে গেলে লাগে। মাথাটা পাথর হয়ে আছে। রাত হলে হাতির শরাব—ইনসানের নেশা—সব একাকার করে ফেলে সনাতন।

পেছনে তাকিয়ে দেখলো, গরাদের কাছাকাছি আফিম-খোর বুড়ো সিংহ রুস্তম ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে চেয়ে আছে। ঘোড়াদের পা ঠোকার আওয়াজ। জাহাঙ্গীর বাদশার পেয়ারের ময়ূর খাতুন তার এক পা তুলে ডানার নিচের ঘা চুলকোচ্ছে প্রাণপণে। সারবানের হাতের লাঠির খোঁচায় একটা অল্পবয়সী উট কেঁদে উঠলো। ওটারই কান্নায় কাল রাতে বারবার সনাতনের ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল।

সনাতন পরিষ্কার বুঝলো, ফিল-ই-বকসি হলেও সে এখানে পুরোদস্তুর বাইরের লোক। সে এই কেল্লায় হাতির সঙ্গে হাতি হতে পারেনি। দুর্গের সঙ্গে দুর্গ বনে যেতে পারেনি।

কালও সন্ধে রাতে সনাতন রাজধানীর ফুলওয়ালি চকের আশপাশে ঘোরাঘুরি করেছে। যদি আসে। যদি আসে।

নাঃ! মীনাক্ষী আসেনি। সনাতনের চোখের সামনে এখন যমুনার বিরাট চর। অনেকদূরে জেলে পাড়ায় শুকোতে দেওয়া জালে অলস রোদ্দুর। তরমুজ চাষীরা কী ঘুমিয়ে পড়লো ? সফিদের ঝোপড়ির মাথা ঘন গাছপালার ভেতর আবছা দেখা যায়।

এ-বছর উজানে চাষীরা চরের বুক কেটে বাঁধ দেওয়ায় যমুনার বাঁ পাড় ঘেঁষে বেশ চওড়া করে জল বয়ে যাচ্ছিল। সনাতন বুঝলো, হাতিতে বসেই জলটা পার হতে হবে। তারপর বুনো ঘাস মাড়িয়ে হাতিই তাকে নিয়ে তুলবে সফিদের উঠোনে।

কেন আসছে না মীনাক্ষী ? সফিকেও তো রাজধানীর রাস্তায় অনেকদিন

চোখে পড়েনি সনাতনের। তবে কি দ্'জনেই অস্খে পড়লো? সাপে কাটেনি তো সফিকে? যা চর জায়গা! ছেলে মেয়ে কোথায় গেল ঠিক নেই। ভাসতে ভাসতে সফির ঘর-গেরস্থি করে ভেসে আছে মীনাক্ষী। কথাটা মনে আসতেই সনাতনের ভেতরে ভেতরে সব কিছ্ মুচড়ে উঠলো। হাতির পিঠে বসে অনেক নিচে যম্নার জলে নিজের ম্খ দেখা যায় না। চুল দাড়িতে, নেশায় অবহেলায় আজ সে নিজেই একটা ভাঙা ঘর। এ-ঘরে কে আসবে!

ঢাল বেয়ে হাতি দিব্যি জলে নেমে এলো। এবার জলের কিনারা দিয়ে যেতে যেতে সনাতন নিশ্চিত হলো—বিষ্ণু আর লক্ষ্মীকে মনসবদার মির্জা ইউস্ফ বেগ বেচে দিয়েছে। নয়তো মীনাক্ষী কোনো খবর রাখতো। সে এভাবে যম্নার চরে ঘর-গেরস্থি করতো না।

শীতের চরে দ্রের হাঁসের দল হাতিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। ঘাসবন, জোলো ডাঙা পেরিয়ে হাতি যখন সফির বেড়ার ধারে দাঁড়ালো—তখন সনাতন দেখলো চারদিক হা হা করছে। শীতের বাতাসে কয়েকটা না-তোলা গোলাপের পাপড়ি খসে খসে উড়ে দ্রে দ্রে গিয়ে পড়ছে। কী ব্যাপার? কেউ নেই নাকি? ঢ্কতে যাবে—এমন সময় সনাতন দেখলো, একটা লাল চোখো কালো উজবেক কুকুর ঝ্পড়ির ভেতর থেকে পাকা বাসিন্দার মতোই বেরিয়ে আসছে।

হাতি দেখে কুকুরটা বিশেষ উচ্চবাচ্য করলো না। মানে মানে করে বেরিয়ে যাবার সময় চোখ ভরে হাতিটাকে দেখতে দেখতে বেড়ার ওধারে চলে গেল।

সনাতন হাতি থেকে নেমে ঝ্পড়িতে ঢাকলো। এখানে থাকতো কী করে? সারা ঘরে কিছ্ই নেই। চুলোটা যাবার সময় ভেঙে দিয়ে গেছে ওরা। পাতি ঘাস আর মাটি মেশানো দেওয়ালে সস্তার একখানা আরশি পেল সনাতন। গোঁজা ছিল। আরশিখানায় নিজের ম্খ দেখলো। বিশেষ কিছ্ই দেখা যায় না। কেমন ঘষা ঘষা ঘোলাটে।

সনাতন আরশি হাতে বেরিয়ে এলো। বিশাল তরম্জ মাঠে মাত্র একটা লোক দাঁড়িয়ে। ওরাই বা গেল কোথায়? এবার মীনাক্ষীদের ফ্লচারার মাদায় চোখ পড়লো। মাদা বলতে কিছ্ আর নেই। খরগোশ, বেজিতে সব খ্ঁটে খেয়ে ফেলেছে।

সনাতন যত জোরে পারে হাতের আরশিখানা ছ্ঁড়ে দিলো। ছোঁড়ার সময় দেখলো—আরেকটা হাতি যাচ্ছে। চরের ডাঙামাঠ ভেঙে।

আরশি কোথায় পড়লো তা দেখার মেজাজ রইলো না। সনাতন চেঁচিয়ে উঠলো, কে যায়?

তার গলায় হ্কুম ছিল। কে যায়? —মানে যে-ই যাও—দাঁড়াও।

কিন্তু তার এই হ্কুমে কোনোই কাজ হলো না। সনাতন অবাক হলো। ঘাসবনের ভেতর দিয়ে সওয়ারি নিয়ে হাতিটা যেমন যাচ্ছিল তেমনই এগতে লাগলো। সনাতন শাহী ফিল-ই-বর্কাস। তাকে ডিঙিয়ে কান না দিয়ে হাতি

চলে যাবে—তা কী করে হয় ?

সনাতন নিজের হাতিতে উঠে হাতির পেটে পায়ের ডগায় খোঁচা দিলো। আদতে ঘরদুয়োরি হাতি-ধরা পাইকান ঘরের মানুষ হয়েও সনাতন অবাক হয়ে দেখলো—যে তার হাতিকে কিছুতেই এমন করে ছোটাতে পারছে না—যাতে কিনা হুকুমে কান না দিয়ে এগিয়ে যাওয়া হাতিটাকে সে ছুটে এগিয়ে গিয়ে ধরতে পারে।

ঘাসবন, তরমুজ খেত, জোলো ডাঙা, চর জায়গা দাপিয়ে দাপিয়ে পেরিয়ে এসে খোলা জায়গায় উঠে সনাতন দেখলো, ভারি সুন্দর করে সাজানো বিশাল উঁচু এক হাতি লম্বা লম্বা চার পায়ে নিমেষে জেলেদের ডাঙা পেরিয়ে যাচ্ছে। এমত হাতি তো বড় একটা চোখে পড়েনি তার। যেমনি উঁচু—তেমনি বড়। ছুটছে যেন ঘোড়া। শাহী পিলখানায় এমন হাতি তো একটিও সে দেখেনি। হাতির পিঠের গাদেলাটিও মনোহারী করে সাজানো। তাতে বসা মানুষটি কেউ কেটা হবে। আগ্রায় কে এমন মানুষ আছে—যে এরকম হাতি পোষে ? যার মাথার পেছনে ফেজ থেকে অমন রঙিন ফিতে ঝোলে ? সনাতন ভেবে ভেবে কিছুই বের করতে পারলো না।

হাতির পেছন পেছন পায়দল যারা চলেছে—তাদের মুখগুলোও কিছু অন্যরকম। আগ্রায় তো এমন মুখ চোখে পড়েনি সনাতনের। ফর্সা লালচে। কিন্তু পোড়া পোড়া। হাঁটু অব্দি পটি। পায়ের জুতো এখানকার বিনামা ধাঁচের নয়। চোখ নীলচে—

সনাতন এবার ওদের কাছে শান্ত গলায় জানতে চাইলো, কে যায় ?

হাতির পেছন পেছন কুচ করে এগিয়ে যেতে যেতে ওদের একজন বললো. উস্তাদ ইশা—

সনাতন মনে মনে বললো, সে কে রে বাবা ! হয়তো কোনো পীর বাবা হবে। নয়তো এত জুলুস ?

সনাতনের চোখের সামনে উস্তাদ ইশার পেল্লায় সেই হাতি যমুনা পেরিয়ে ওপারের ডাঙায় উঠলো। পেছন পেছন কুচ করে এগিয়ে যাওয়া নীল চোখো মানুষগুলোও ডাঙায় উঠেছে।

ওপারে তখন পিলপিল করছে মানুষের মাথা। সারি সারি তাঁবুর পর তাঁবু। আশমানের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো কাঠের সব কপিকল। রশির পর রশির গাদি। আরও দূরে দেখা যায়—বিশাল বিশাল গাছ মড়মড় করে ভেঙে পড়ছে। কাঠুরিয়ার দল সেই বর্ষার ভেতরেই ওপারে গিয়ে থানা গেড়েছে। জঙ্গল উড়িয়ে দিয়ে জায়গা সাফ হচ্ছে। বাদশা-বেগম মরহুম মমতাজমহলের সমাধি হবে।

হঠাৎ কী খুঁজে পেয়ে নিজে নিজেই ডান হাতে তুড়ি দিয়ে উঠলো সনাতন। সেই তুর্কিটা—এই তুর্কিটাই তাহলে সমাধি বানাবে ? আগ্রা দুর্গে মাণ্ডিতে বসে কানে এসেছে তার—এই ওস্তাদ মানুষটিই মরহুম বাদশা-বেগমের সমাধি বানাতে এদেশে এসেছে। দেশ থেকে এখানে আসার সময় নিজের হাবসি

হাতিটাও সঙ্গে করে এনেছে। বেগম হারিয়ে বাদশা কী পেল্লাই কাণ্ডই না বাধিয়ে বসে আছেন। ইস্পাহানি, তুর্কি, হিন্দুস্থানি সব মাথা এক জায়গায় করে সমাধির নকশা তৈরি শেষ। এবার সেই নকশার ছবি গেঁথে তুলবে ওই তুর্কি ওস্তাদ।

একা একা চরে হাতির পিঠে বসে সনাতনের মনে হলো—আবার মীনাক্ষীকে খোয়ালাম। যাও বা চোখের দেখা দেখা যাচ্ছিল—তাও নসিবে সইলো না তার। মরহুম বাদশা-বেগমের সমাধি তৈরি হয়ে গেলে সে কি একবার ওই তুর্কি উস্তাদকে বলে দেখবে?

কী বলবে তাই মনে মনে মুসাবিদা করতে লাগলো সনাতন। শীতের দুপুরের ফাঁকা চর। ভিনদেশী উড়ে আসা সব ঠাণ্ডার হাঁস বেপরোয়া হয়ে ধুলো মাখছে। হিন্দুস্থানের ধুলো এখন ওদের কাছে বেহেস্তের গুঁড়ো। ঘাসের গোড়ায় জ্যান্ত পোকার মাংস খুঁটে তুলছে ঠোঁটে। তাই নিয়ে ঝগড়া করে নিজেদের ভেতরেই ধুলোর খুচরো সব কুয়াশাও বানিয়ে তুলছে।

তার ভেতর বিড় বিড় করে বলে উঠলো সনাতন, মরহুম মীনা বানুর সমাধির ভার যদি আপনি নেন উস্তাদ!

—নকশা এনেছো?

—এই যে ইশা সাহেব—বলে নকশাটি এগিয়ে দিলো সনাতন।

—এ তো দেখছি মীর আবদুল করিমের তৈরি। আগাগোড়া যোধপুরি মাকরানা মর্মরে বানাতে হবে।

—মাকরানা পাথর মীর আবদুল করিমের খুব পছন্দ উস্তাদ—

উস্তাদ ইশা চোখ তুলে চাইলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, জানি। মমতাজমহলের সমাধিও আসলে ওরই নকশায় গড়ে উঠছে। ওখানে মীর সাহেব সিকরি লাল পাথরের সঙ্গে মাকরানা মর্মর খাপসই করে বসাতে বলেছেন।

—আমি বাদশা নই উস্তাদ। আমি মীনাক্ষী বানুর সামান্য খসম! সাধারণ ঘরদুয়ারি পাইকান ঘরের হাতিধরা মানুষ। অনেক কষ্ট করে—অনেক কিছু হারিয়ে তবে না আজ শাহী ফিল-ই-বর্কাস। কোথায় পাবো যোধপুরি মাকরানা! কোথায় পাবো সিকরি লাল পাথর!! আপনি যদি ক্ষমা ঘেন্না করে কিছু অল্পের ভেতর করে দেন তো সারাজীবন আপনার গোলাম হয়ে থাকি। আপনার হাবসি হাতির কিছু হলে আমায় ডাকবেন। ঠিক চাঙ্গা করে দেবো ফের। দেখবেন আপনি—

উস্তাদ ইশা হাঃ! হাঃ! করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, বাদশাও একজন সামান্য খসম মাত্র! আমার হাতির বৈদ ইস্তাম্বুল থেকে আমার সঙ্গে এসেছে। কিন্তু তুমি যে বললে—তুমি ঘরদুয়ারি পাইকান ঘরের মানুষ? তুমি হিন্দু?

—হ্যাঁ উস্তাদ।

—কাফের হয়ে নিজের বেগমকে বলছো—বানু! কাফের হয়ে নিজের

বেগমের জন্যে সমাধি বানাবে ? তাজ্জব !

—তাজ্জবের কিছু নেই উস্তাদ। আমার বউ মীনা বাঈ এখন মীনা বানু। সব গুলিয়ে গেল উস্তাদের। তিনি অবাক হয়ে বললেন, তার মানে ?

—তার এখনকার খসম তো আর কাফের নয় উস্তাদ।

—তাহলে ?

—মীনা বাঈ মীনা বানু হলো তো মুসলমানের বেগম হয়ে !

—ওঃ। বুঝেছি। খুব ভালোবাসতে তাকে ! তা মীনা বানুর এন্তেকাল হয়েছে কতদিন ?

—এন্তেকাল তো হয়নি উস্তাদ—

—কী ?—বলে চেঁচিয়ে উঠে দাঁড়ালেন উস্তাজ ইশা। খাড়াই শা জওয়ান তুর্কি। রাগে তিনি কাঁপছেন। চেঁচিয়ে বললেন, কাফের হয়ে বেগমের জন্যে গোড়ায় সমাধি বানাতে চাইলে ! তারপর বললে—তোমার বাঈ এখন মুসলমানের বানু !! এখন বলছো সেই বানুর এখনো এন্তেকালই হয়নি। জিন্দা ইনসানের জন্যে সমাধি বানানো মুলহেদী কাজ ইসলামে। ইয়ার্কির জায়গা পাওনি বেতমিজ ? তোমার জন্যে কি আমার ধর্ম খোয়াবো ?

—একটা কথাও ইয়ার্কি করে বলিনি উস্তাদ। সব সত্যি।

সনাতনের মুখে কী এক সরল আন্তরিক ভাব দেখে থতমত খেয়ে বসে পড়লেন উস্তাদ ইশা। লম্বাই চওড়াই মানুষ। ধপ করে বসে পড়েই হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, সব যদি সত্যি—তবে সেই মীনা বাঈ—না, না—মীনা বানু এখন কোথায় ? তাকে আমার সামনে হাজির করতে পারবে ?

—তা পারবো না উস্তাদ—

—কেন ?

—আমি নিজেই জানি না সে কোথায় ? হারিয়ে গেল ? না, পালিয়ে গেল ?

বিড়বিড় করতে করতে সনাতনের খেয়াল হলো, তার হাতি চেনা অভ্যেসে আগ্রা দুর্গের দিকে অনেকটা চলে এসেছে। এবার জল ভেঙে ওপরে উঠলেই দুর্গের মোরি দরওয়াজা। পেছনে পড়ে রয়েছে সফির মীনা বানুর ফুলের চাষ—যার অনেকটাই খরগোশ আর বেজিতে উপড়ে ফেলেছে। ওদের ঝুপড়ির দখল নিয়েছে একটি লালচোখো উজবেক কুকুর। বাকি চর বিদেশী হাঁস, পাখ-পাখালিতে ভরপুর।

বুরহানপুর দুর্গে আজ থেকে দশ বারো বছর আগে জাহাঙ্গীর বাদশার বড় আওলাদ শাহজাদা খসরুর এন্তেকাল ঘটে। মারাত্মক পিত্তশুলের ব্যথায় তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তাই তো তখন বলা হয়েছিল জাহাঙ্গীর বাদশাকে। আজকের বাদশা শাহজাহান—সেদিনকার শাহজাদা খুর্রম তাঁর বড়ভাই অন্ধ শাহজাদা খসরুর জানাজার সামিল হয়েছিলেন।

চোখ বুজেও বাদশা শাহজাহান তাঁর মন থেকে বুরহানপুর দুর্গ, বুরহান-পুরের বিবি-কা-মকবরার দুই উঁচু বুরুজ, রাস্তাঘাট কিছুই মুছতে পারলেন

না। অনেকদিন আগে আজকের মতো এমনই এক বৃষ্টির রাতে ওই বুরহানপুর দুর্গেই দুই শাহজাদার দেখা হয়েছিল। একজন বাদশার হুকুমে অন্ধ। অন্যজন বাদশার চোখে হিন্দুস্থানের সেরা লড়াকু—লায়েকদার ইনসান। বাদশার আদরের প্রশ্রয়ের 'বাবা খুর্রম'। সে-রাতে লায়েক ভাই না-লায়েক ভাইকে গোড়ায় বুঝতেই দেয়নি—সে কী জন্যে এসেছে। শীতের রাতে ঝোড়ো হাওয়ায় মশালের আলোও যেমন থেঁতলে যাচ্ছিল—ঠিক তেমনই খুর্রমের হাতের ভেতরেই খসরুর দম ফুরিয়ে আসছিল।

—আলা হজরত। আপনার ঘুম পেয়েছে! তাহলে ওসব এখন থাক—

শাহেনশা শাহজাহান নড়ে চড়ে বসলেন। আগ্রা দুর্গের মেহজ্‌বিন মহলের সামনের খোলা ঢাকা পথের বাইরেই অন্ধকারে অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। কোনো দুলাভাইই চায় না—তার শালীর সামনে ঘুম এসে তাকে কাবু করুক। বিশেষ করে সেই দুলাভাই যদি হন হিন্দুস্থানের বাদশা।

শাহজাহান ঘুমোচ্ছিলেন না। চোখ বুজে তিনি জেগে ওঠা একটা ছবির হাত থেকে রেহাই চাইছিলেন। বুরহানপুর! বুরহানপুর!! বুরহানপুরের হাত থেকে কি রেহাই নেই?

বাদশা দেখলেন—সুখদোলায় শিশু গওহরআরা ঘুমোচ্ছে। বুরহানপুরে ওকে জন্ম দিতে গিয়েই বাদশা-বেগম মমতাজমহল আর চোখ খোলেননি। বুরহান-পুরেই রৌশনআরার জন্ম। এখন সে এই আগ্রা দুর্গের আঙুরিবাগে দিনের বেলায় বাদলকিনারি ওড়নায় মুখ ঢেকে নেচে বেড়ায়। শবেবরাতের রাতে প্রদীপ হাতে দুর্গের সামানবুরুজের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো এখন সে এক কিশোরী।

—তোমাকেই তো সব দেখতে হবে এখন মেহজ্‌বিন। তোমার বাজির হয়ে ওদের আম্মিজানের কাজ তোমাকেই তো করতে হবে।

রোজকার মতো মেহজ্‌বিন শাহেনশার গলা পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলেন। শালীর এই ভঙ্গির আদর বাদশার বড় প্রিয়—তা এই কয়েক মাসে মেহজ্‌বিন বুঝে নিয়েছেন।

শাহজাহান বাদশা কিন্তু শালীর দু'হাতের বাঁধন থেকে নিজের মাথাটি সরিয়ে নিলেন। এমন তো হয় না। অবাক হয়ে মেহজ্‌বিন বাদশার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

—শোনো মেহজ্‌বিন। তুমি আমার পূর্ণিমার চাঁদ! কিন্তু এখন আমরা দুজনে বসেছি যে-কাজে—সেখানে সবার আগে তুমি শাহজাদা দারার আম্মিজান। আমি হিন্দুস্থানের বাদশা হলেও—এখানে আমি সবার আগে শাহজাদা দারাশুকোর আব্বা হুজুর।

—আমায় কী করতে হবে বলুন আলমপনা—

—তুমিই আমার গওহরআরার জন্মানোর দিন থেকে তার আম্মিজান। তুমি তোমার বাজির হয়ে শাহজাদা দারার বিয়েতে—তারও আম্মিজন—তোমায় ঠিক করতে হবে—নাদিরার জন্যে কোন রঙের সোঁদা মেহেদি যাবে—যাবে কোন্ হিরণ—

—নাদিরা ?

—হ্যাঁ। হিন্দুস্থানের ভাবী শাহজাদা—বেগম—

—ওঃ ! আমাদের করিম। করিমউন্নিসা— ?

—না। করিমউন্নিসা নয়। এখন থেকে নাদিরা।

বাদশার গলা চড়তে দেখে মেহজ্‌বিনেরও জেদ বাড়লো। তিনি হাসিতে ভেঙে পড়তে পড়তে বললেন, আমাদের করিম কবে থেকে নাদিরা হলো আলমপনা ! কিছুই তো জানতে পারিনি !!

শাহেনশা শাহজাহান দোটানার ভেতরেও আস্তে আস্তে তেতে উঠছিলেন। একদিকে এই শালীর মিঠে হাতের বাঁধন, হাসি, ঠোঁটের চুম্বক তাঁকে টানে। আরেকদিকে হিন্দুস্থানের পয়লা শাহজাদার বিয়ে নিয়ে—শাহজাদার বেগমকে নিয়ে—কথায় চুল-পরিমাণ এদিক ওদিকও তাঁর সহ্যের বাইরে।

বাদশা চাপা গলায় বললেন, আমাদের করিম আর নয় মেহজ্‌বিন। শাহজাদা দারা তার বেগমকে আদর করে ওই নাম দিয়েছে। এখন থেকে সে শুধুই নাদিরা।

—শাহজাদার পছন্দ আছে বলতে হবে !—বলেই চুপ করলেন মেহজ্‌বিন। তিনি সাবধান হলেন। হিন্দুস্থানের বাদশার চোখে এই মাত্র তিনি যা খেলতে দেখেছেন—তা তিনি চেনেন। হাজার হোক আলা হজরত একজন মুঘল। আদতে ইস্পাহানি হয়ে মেহজ্‌বিনরা জানেন—মুঘল কী জিনিস। ভালোবাসার হাতের বাঁধনকে মুঘলরা পলকে মৃত্যুর পাঞ্জা করে তুলতে পারে। খুব মিষ্টি করে মেহজ্‌বিন বললেন, নাদিরা নামটিও বেশ সুন্দর।

শাহেনশা শাহজাহান কোনো কথা বললেন না।

—কাশ্মীর থেকে আসুক সোঁদা মেহেদি। হিরণ আনা হোক গুর্জর থেকে।

—মসলিন মেহজ্‌বিন ?

—মসলিন তো। ঢাকার দিতে পারেন। মালদারও দেওয়া যায়—

—কোন্‌টা বেশি ভালো ?

—ঢাকাই ভালো। রানীপসন্দ মসলিন—নাদিরাকে মানাবেও খুব।

—না মেহজ্‌বিন। যে রঙের মসলিন কেউ কোনোদিন গায়ে দেয়নি—

—আলা হজরত ! তা কী করে হবে ? দুনিয়ার রঙ দিয়েই তো মসলিনের রঙ হয়। সব রঙই তো তাহলে খরচ হয়ে গেছে।

—এমন কোনো রঙের মসলিন হয় না—যা কিনা আজও খরচ হয়নি মেহজ্‌বিন ?

মেহজ্‌বিন বুঝলেন, পয়লা আওলাদের বিয়ে নিয়ে মশগুল বাদশা এবার ধাতে ফিরে এসেছেন।

॥ একচল্লিশ ॥

শীতের শেষদিকে আগ্রার ছ'লাখ বাসিন্দাই আজ সকাল থেকে মেতে উঠেছে। রাজধানীর হামামগ‍ুলোয় সবসময় গরম জল মজ‍ুত। সেই সঙ্গে ইস্পাহানি আতর। হিন্দ‍ুস্থানের বাইরের ব্যাপারী, কারোবারিরা আগ্রায় এসে যাতে স্বস্তিই পান—সেজন্যেই এসব ব্যবস্থা। সড়কে সড়কে পাহারাও বেড়েছে। এমনকি যম‍ুনার ব‍ুক খ‍ুঁড়ে গত বর্ষার আগে থেকেই নদীর জলধারাটি বজায় করে রাখতে শাহী খাজানাখানা থেকে অঢেল খরচা হয়েছে। কেননা, রাজধানীর গায়ে একটা নদী থাকা দরকার। সে নদীতে রাজধানীর ছায়া পড়া চাই। এ কথাগ‍ুলো বাদশার কানে তুলেছেন খলিল‍ুল্লা খাঁ।

যে যা বলছেন—সব কিছ‍ুতেই বাদশা শাহজাহান কান দিচ্ছেন। যে-কথায় কিছ‍ু থাকছে—তা তিনি মাথায় নিচ্ছেন। খোলা মন, উপ‍ুড় হাত হয়ে তিনি বসেছেন। সারা হিন্দ‍ুস্থানকেই তিনি মাতিয়ে তুলতে চান। অবশ্য তিনি নিজেও মেতে উঠেছেন।

কারণ, আজ শাহজাদা মহম্মদ দারাশ‍ুকোর বিয়ে।

ভোর থেমে জামা মসজিদের সামনে মিশকিনদের বিশাল ভিড়। যেদিকে তাকাও মান‍ুষ থই থই করছে। শাহী ছাপ লাগানো দাম, দামড়ি, আধেলা, পওয়া ম‍ুঠো ম‍ুঠো করে তুলে দেওয়া হচ্ছে। আর মিশকিনরা কোঁচড়ে করে নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

রাজধানী অপেক্ষা করছে সন্ধের জন্যে। তখন আগ্রা দ‍ুর্গের সামান ব‍ুর‍ুজ থেকে অন্ধকার আকাশে নানা রঙের বাজি পোড়ানো হবে। দ‍ুর্গের অন্দরমহলে বাদশা শাহজাহান খোলা অলিন্দে দাঁড়িয়ে। চোখের সামনে যম‍ুনা। তার দক্ষিণ পাড়ে ময়দানবী কাণ্ডকারখানা চলছে দিন রাত। বিশ হাজারের মতো মান‍ুষ নিয়ে উস্তাদ ইশার ওঠাবসা। বাদশার মনে হলো—প্রায় দ‍ু'বছর হতে চললো, এখনো লাল সিকরি পাথরের ভিতই মাথা তোলেনি। ওই সমাধিমহলের কাজ শেষ হতে তাহলে কতদিন লাগবে? মমতাজ! আজ তোমার পয়লা আওলাদের বিয়ে—

হিন্দ‍ুস্থানের বাদশার মন আজ সবদিক থেকে কানায় কানায় ভরে উঠেছে। শীতের শেষদিকে আগ্রা বড় স‍ুন্দর হয়ে ওঠে। রাজধানীর বাতাসে শাহী সব চক থেকে সানাই বাজছে। সেই সঙ্গে দিগর ঢোলের বন্দেশি চাঁটি। শ‍ুনলে কার না মন ফ‍ুরফ‍ুরে হয়ে ওঠে! যোগীপ‍ুরার দিক থেকে শাহজাদা দারা খানিক বাদে, মিছিল করে বিয়ে করতে আসবে। খোদাতলার কর‍ুণার কোনো শেষ নেই। নয়তো দারার মতো ছেলে হয় ক'জনের? আল্লা! সবই তেরি রেজা!!

বাদশার হঠাৎ চোখে পড়লো, শাহজাদী জাহানারা দেওয়ান-ই-খাসের দিকে চলেছেন। বিয়ের পর আজ সন্ধ্যায় ওখানে আমি ইংলিশস্তানি, ফ্রানসিসি, পর্তুগিজ ইস্পাহানি ইলচিদের সঙ্গে ভোজসভায় বসবো। সেখানে থাকবেন মির্জা রাজা জয়সিংহ, বলক-এর আমির নজবত খাঁ, উজিরে আজম সাদ‍ুল্লা খাঁ, শাহী ফৌজের সিপাহ-সালার, সরকার হিসাবের ফৌজদার, কয়েকজন ওমরাহ

আর বাছা বাছা কিছু মনসবদার। সবাই মুবারকবাদ জানাবেন শাহজাদা দারা আর তাঁর বেগম নাদিরাকে। সেসব ব্যবস্থার সব ভারই জাহানারার ওপর। তাই বোধহয় দেখতে চলেছে শাহজাদী। ফুল গুলাল, আগেনগার—কোথায় কী থাকবে—বাতিদানগুলোই বা কী ভাবে সাজানো হবে—তারও খুঁটিনাটি জাহানারার দেখা চাই। মেয়ের চলাফেরায় খুশির ঝিলিক ছড়িয়ে পড়ছে। খুবই আদর করে বাদশা ডাকলেন, জাহানারা—

চমকে ফিরে তাকালেন শাহজাদী। আব্বা হুজুর—আপনি এখানে ? একা ?

বাদশা দেখলেন, শাহজাদীর কবরীতে নীল অতসীর গরবা ঝুলছে। হাতে রক্তকরবীর মালা।

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমায় দেখছিলাম—

জাহানারা চোখ নামালেন।

—তিন মাস আগে নাদিরাকে রঙের সঙ্গে যে দু'লাখ টাকা পাঠানো হলো—তাও তুমিই দিতে গেলে কেন ! হিন্দুস্থানের বাদশা কি না-লায়েক ?

—আলা হজরত ! আমার ভাইয়ের মতো ভাই শাহজাদা দারা—

—তাই বলে তোমার হাত খরচের টাকা তুমি এভাবে ভাইয়ের বিয়েতে খরচ করে দেবে ? তোমার চলবে কিসে—

—আলমপনা ! সুরাট বন্দরের সারা বছরের শুল্কের সবটাই আমাকে আপনি দেবার ব্যবস্থা করেছেন। এই অঢেল টাকা থেকে যদি দু'লাখ টাকাই ভাইয়ের বেগমকে উপহার পাঠিয়ে থাকি—

বাদশা মাঝখানে বলে উঠলেন, অঢেল কোথায় ! হিন্দুস্থানের শাহজাদীর পক্ষে একটা বন্দরের সম্বচ্ছরের শুল্ক তো তার তাম্বুল খরচ !

শাহজাদী জাহানারা অবাক হয়ে বাদশার মুখে তাকালেন। আত্মিজান নেই। মুঘল শাহীর সব ভাবনা ভেবেও আমাদের জন্যে আব্বা হুজুর ভাবার—নজর রাখবার মতো সময় করে উঠতে পারেন। যিনি হিন্দুস্থানের বাদশা হন—সবার ভার বইবার জন্যে তাঁর কাঁধও বড় হয়। আব্বা হুজুর একজন জবরদস্ত ইনসান।

—সেখানেই তুমি থেমে থাকোনি জাহানারা।

বাদশার একথায় চোখ তুলে সেই বিখ্যাত মুখখানিতে তাকালেন জাহানারা—তিনি কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না।

বাদশা জাহানারার চোখে তাকিয়ে বললেন, বিয়ের এই বিশাল উৎসবে—উজিরে আজম বলছিলেন—যে বত্রিশ লাখ টাকা খরচ হচ্ছে—তারও অর্ধেক নাকি তুমি দিয়েছো ?

—দারাকে আমার না-দেবার মতো কিছু নেই আলা হজরত ! আমি তার বাজি।

—তুমি তো দারার চেয়ে মাত্র এক বছরের বড়।

—এক ঘড়ির বড় হলেও আমি তো তার দিদি। তাকে দেবো না তো কাকে দেবো বন্দেগান ?

বাদশা খানিক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না। মমতাজমহলের এন্তেকালের পর এই বড় বোনই তার ভাইদের দেখাশুনো করে থাকে। ওকে দেখার কেউ নেই।—এই রক্তকরবীর মালা কোথায় নিয়ে চলেছো?

—ভাইয়ের বাসর সাজাবো আব্বা হুজুর।

—সেই মুকুট কোথায়?

—দেওয়ান-ই-খাসে সাজিয়ে রাখা আছে।

জাহানারা চলে যাচ্ছিলেন। বাদশা ডাকলেন, শোনো। ওই মুকুট পরে তোমার আম্মিজানকে বিয়ে করতে গিয়েছিলাম—

—তাই?

—হ্যাঁ জাহানারা। বিয়ে করতে যাবার সময় খোদ জাহাঙ্গীর বাদশা ওই মুকুট আমার মাথায় পরিয়ে দিয়েছিলেন।

—আজ আপনিও শাহজাদা দারার মাথায় ওই মুকুট পরিয়ে দেবেন আলমপনা।

—তোমার তাই ইচ্ছে?

—এ ইচ্ছে শুধু আমার একার ইচ্ছে নয় আব্বা হুজুর। এ ইচ্ছে আপনারও।

—তাই বলছো!

—আমি বলছি না হজরত। এ ইচ্ছে ইতিহাসের ইচ্ছে। নিয়তির ইচ্ছে। আপনিই শাহজাদার মাথায় নিজের হাতে ওই মুকুট পরিয়ে দেবেন।

বাদশা শাহজাহান শাহজাদীর মুখে তাকালেন। এ মুখ যৌবনে যোগিনীর মুখ। ওই চোখ দুনিয়ার রং দেখে। ওই চাঁপাকলি আঙুল দিয়ে জাহানারা কলম ধরে। কবিতা লেখে সময়ে সময়ে। আমি আকবর বাদশার বিধান মানবো না। মুঘলকুমারী জাহানারার বেলায় ও বিধান আমি ভাঙবো। মমতাজমহলের এই মেয়ের আমি বিয়ে দেবো। বলক-এর আমির নজবত খাঁ আজ সন্ধ্যার ভোজসভায় আসছে তো?

—দাওয়াত পাঠানো হয়েছে সবাইকে?

—হ্যাঁ আব্বা হুজুর। আপনার লেখা কবিতা দিয়েই সবাইকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে।

—তাই? বলক্—বদকশানকে বলা হয়েছে? নজরত খাঁকে?

—হ্যাঁ হজরত। সবাইকে। শাহজাদার বিয়েতে আপনি কবিতাটি লিখেছেন খুবই সুন্দর।

—জাহানারা! আজ আমি শাহজাদাকে বিয়ের আসরে পাঠাবার আগে তার মাথায় আমার বিয়ের মুকুটই শুধু পরাবো না, জামদারখানা থেকে শাহী চুনোটি আঙরাখা বের করে রাখতে বলেছি। মুক্তোগুলো তাতে কারিগররা এ ক'দিনে ফের বসিয়েছে। তাই গায়ে দিয়ে দারা বিয়ের আসরে বসবে—

—ওঃ! কী সুন্দর যে দেখাবে ভাইকে—

—মুকুটের ওপর সরবন্ধ আমি নিজের হাতে বেঁধে দেবো জাহানারা। আজ

আমারও জীবনে একটা দিন। দারার গলায় পরিয়ে দেবো দুই লহরের মুক্তোর মালা। তোমাদের মরহুম আম্মিজানের তাই-ই ইচ্ছে ছিল জাহানারা।

শাহজাদী হিন্দুস্থানের বাদশার চোখে, মুখে তাকিয়ে রইলেন। আব্বা হুজুরের হাতে তিনি ছোটবেলায় আপেলের গন্ধ পেতেন। চোখ নীলচে ঘেঁষা। মুঘল খুনের সঙ্গে ওই শরীরে রয়েছে রাজপুতের খুন। মোতিরাজা জয়সিংহের মেয়ে জগৎ গোঁসাইনি আলা হজরতের আম্মিজান। বাদশার মুখের রংয়ে হিন্দুস্থানের গোধূলির আলো ভাসে। ওখানে ফরঘনা, গজনি, সমরখন্দের আভাস খোঁজার কোনো মানে হয় না। একবার শাহজাদীর মনে খচ্ করে একটা ভাবনা ভেসে এলো। তবে যে শুনি আম্মিজানের বোন মেহজুবিন ইদানীং বাদশার খুব কাছাকাছির মানুষ? ওসবই তাহলে মিথ্যে?

বিয়ের পর শাহজাদা দারা ইচ্ছেমত যাঁতে আগ্রা দুর্গের বাইরেও স্বাধীন ভাবে শাহজাদা-চালে সময় কাটাতে পারেন—সেজন্যে যমুনার গা ঘেঁষে একটি আলাদা প্রাসাদ সাজানো হয়েছে। সেখানেই নাদিরা রয়েছেন। ওখানে আজ সকালে জাহানারা পাঠিয়েছেন ওড়না, মসলিনের জোড়ি ঘাগরা, মৃগনাভি, মিষ্টি, সোনালি আঙুর, পান আর সোঁদা মেহেদি।

রোদ একটু বাড়তেই সেই সোঁদা মেহেদি বেটে নাদিরা বেগমের গায়ে মাখানো হলো। সেখানেও রোশনচৌকিতে সকাল থেকেই সানাই। সেই সঙ্গে বাঁশি আর পণবের লচকদার বন্দিশ। এর ভেতরেই বিয়ে দেবার জন্যে কাজি মহম্মদ ইসলাম এসে দুই ঘোড়ার জুড়ি থেকে নামলেন।

যোগীপুরার মুখে শাহজাদা দারাশুকো ঘোড়ার পিঠে রাজধানীতে ঢুকলেন। তাঁর বিয়ের বারাতের একেবারে সামনে শাহজাদা সুজাঙ্গীর আর শাহজাদা মুরাদ বকস। বাদশা শাহজাহান আগ্রা দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে গোয়ালিয়র যাবার শাহী সড়কের ওপর হাতি থেকে নামলেন। বারাত সেখানে আসতেই শাহজাদা দারা ঘোড়া থেকে নেমে এসে বাদশাকে সিজদা জানিয়ে কদমবোসি করলেন।

কদমবোসির মাঝপথেই দারাকে দু'হাতে তুলে ধরলেন বাদশা। আজ ছেলের মুখ থেকে চোখ সরাতে পারছেন না শাহজাহান। গোড়াতেই শাহজাদাকে দিলেন একখানি তুর্কি সমশের। বিয়ের আসরে বসবার সময় দারা ওখানা কোমরবন্ধে ভরে নেবেন। তারপর বাদশা দিলেন একজোড়া ইয়াবু ঘোড়া। গলায় পরিয়ে দিলেন দুই লহরের মুক্তোর মালা। হাতে দিলেন জামদারখানা থেকে বের করে আনা চুনোটি আঙরাখা। নীল মসলিনের।

দেওয়ান-ই-খাসে বিয়ের পর্ব মিটতে না মিটতেই ভোজসভা বসে গেল। সিধে আবদারখানা থেকে ধোঁয়া ওড়ানো শীতের হাঁসের মালখোবা বিদেশী ইলচিদের দস্তুরখানায় নামিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। ফ্রানসিসি ইলচি মালখোবার চেয়ে সুণ্ডিয়ানা বেশি বেশি পছন্দ করছিলেন। আর মাঝে মাঝেই দইয়ের বুরহানি খেয়ে নিচ্ছিলেন। পাছে বেশি রাতের এই মোগলাই খানার পর

বদহজমের পাল্লায় না পড়েন। বয়স হয়েছে ইলচিমশায়ের!

বলক আর বদকশানের আমিররা শুকনো মাংসই বেশি নিচ্ছেন। তার ভেতর কিছু অন্যরকম নজরত খাঁ। তিনি আগ্রায় অনেকদিন। শুখা মাংসের সঙ্গে পিচ, খোবানি ছাড়াও একটা দুটো কাবাবও খাচ্ছেন তিনি।

প্রায় শেষরাতে ভোজসভায় অনেকেরই খেয়াল হলো—বাদশা তো ভোজসভায় নেই। কখন উঠে গেছেন।

শাহজাহান তখন যমুনার বুকে। শাহী নৌবারায়। যাবেন যমুনা ঘেঁষে সাজানো মেয়ের বাড়ি। ছ'লাখ টাকার দেনমোহরের চুক্তি সই হবে। শীতের যমুনা। সব জায়গায় সমান গভীর নয় যমুনা। তাই লশকর থাকলেও একদল লোক তীর ঘেঁষে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে চলেছে। দরকার মতো তারা গুণ টানবে। শাহী নৌবারা যাতে কোথাও না আটকায়।

বাদশা দেখলেন, বেশি রাতে ওঠা চাঁদ যমুনার ওপারে ঢল নিয়েছে। দিগন্তের গাছের মাথা থেকে সামান্য ওপরে। গাছতলাগুলো মশালে মশালে পরিষ্কার দেখা যায়। উস্তাদ ইশার কাজ বন্ধ নেই। মমতাজের সমাধি মহল—তাকে ঘিরে আস্তাবল, নফরখানা, পাহারা চৌকি একদিন গড়ে উঠবে। এ জীবনের পর আমি ওখানে মমতাজমহলের পাশেই ঘুমিয়ে থাকবো। মীর আবদুল রহিমের নকশাখানা সবসময় বাদশার চোখে ভাসে। শীত জাঁকিয়ে পড়েছে। শাহী খিরকা গলা অব্দি টেনে দিলেন বাদশা। তাঁর দুই ভায়রাভাই খলিলুল্লা খাঁ আর জাফর খাঁ চুপচাপ তাকিয়ে। আমি কথা বললেই খলিলুল্লার মুখে কথার ফোয়ারা খুলে যাবে। তার চেয়ে—বাদশা ভাবলেন—চুপ করে শাহজাদা দারার বিয়ের রাতটা মনে—শরীরে মেখে নেওয়া যাক। আর মাস-খানেক পরেই শাহজাদার বয়স আঠারো পূর্ণ হবে।

শীত ফুরিয়ে কয়েক মাসের ভেতরেই আগ্রা ফি-বছরের মতোই গরম হয়ে উঠলো। সন্ধের দিকে প্রায়ই রাজধানীর আকাশ অন্ধকার করে আঁধি ওঠার যোগাড় হয়। তারপর একদিন বর্ষা নামলো হিন্দুস্থানের দিক দিগন্তে। যমুনা ফুলে ফেঁপে দু'কূল ভাসায়। আগ্রার মাণ্ডিতে মাণ্ডিতে তখন এসে হাজির হলো শতেক নামের আমের টুকরি। চৌসা, দশেরি, বেনারসি, মির্জাপুরি, বুরহানপুরি।

বিয়ের পর শাহজাদা দারা বড় একটা চোখে পড়েন না। বিয়ের জন্যে সাজানো শাহী প্রাসাদে দাবার মহল প্রায়ই তাঁর দিলখোলা হাসিতে ফেটে পড়ে। তিনি কী এক আনন্দে সবসময় ভাসছেন। চোখে হাসি। মুখে হাসি। রোজার সময় এসে পড়লো।

নাদিরা বেগম অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, জুম্মাবার ছাড়া আপনি তো নমাজ আদায় করেন না। রোজাও কি রাখেন না?

—না। রাখি না নাদিরা। আল্লাতালাকে সাফ আনন্দের ভেতরেই আমি খুঁজে পাই। আল্লা সহজের কাছে সহজভাবেই আসেন।

নাদিরা বেগম কিছু বলতে পারলেন না। শাহজাদার উজ্জ্বল মুখে দুটি চোখ বিশ্বাসের আলোয় ভরপুর। নাদিরা এই ক'মাসেই দেখছেন, তাঁর স্বামীর কাছে সকাল সন্ধে দরবেশ, ফকির, সাধু, সন্ন্যাসী আসছেন তো আসছেনই। শাহজাদার মজলিশে তিনি একদিন শুধু লেংটি পরা এক যোগী মতো মানুষকেও ঢুকতে দেখেছেন।

নাদিরা বড় হয়েছেন সম্পূর্ণ উল্টো আবহাওয়ায়। আব্বা হুজুর শাহজাদা পরভেজের ঘর-গেরস্থিই ছিল অনিশ্চিত। দাদাসাহের জাহাঙ্গীর বাদশার সুনজরে না থাকায় হতাশ পরভেজ নেশায়, কল্পনার কুহেলিতে ডুবে থাকায় মেয়ে হিসেবে নাদিরা কোনোদিনই শাহজাদী হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখেননি। কেননা, মুঘল শাহীতে শাহজাদা পরভেজ অবহেলার ভেতর কখনোই বাদশা হবার স্বপ্ন সেভাবে দেখেননি।

তাই শাহজাদা দারার এই গা-ভাসানো দিলখোলা জীবন দেখে নাদিরা বেগম মনে মনে ভয়ই পেলেন। কিন্তু এর ভেতরেও তিনি শাহজাদার কাচের মতো পরিষ্কার দিলকে দেখতে পান। দেখে ভালো লাগে। ভালোবাসেন।

এসব কথার সময় মজলিশের ভেতর থেকে নর্মদার ওপারের সুরেলা কর্ণাটকি গলা ভেসে আসছিল! নাদিরা দেখলেন, তাঁর তাজা শাহজাদা সেই সুরে খুব আস্তে মাথা নাড়ছেন।

নাদিরা বেগম সামান্য হেসে বললেন, আপনার মজলিশে দরবেশ-সন্ন্যাসীরা না বলে কয়ে ঢুকে পড়েন। শায়ের, গাইয়ে, আঁকিয়েরা দিব্যি চলে যান আপনার কাছে। কিন্তু সেদিন উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁকে অমন বসিয়ে রাখলেন কেন?

—উজিরে আজম বলেই!

—তার মানে?

—সাধু-দরবেশরা সহজ করেই আল্লাতালার কাছে এগিয়ে চলেছেন। ও'রা সিধে বলেই সিধে আমার কাছে চলে আসেন। উজিরে আজম কি তাই। শাহী জটের ভেতর উনিও যে জট পাকিয়ে আছেন নাদিরা।

—জুম্মা নমাজ আপনি খেলাফ করেন না। ওইদিন দরাজ হাতে দান খয়রাতও করেন।

—সুফিরা বলেন, দান—ক্ষমাই হলো খোদাতালার আসল ইবাদত। ওই পথেই আমি খোদার ভজনা করতে চাই। ওই পথই আমার প্রার্থনা—আমার উপাসনা।

নাদিরা বেগম হেসে ফেললেন। আপনি কি সুফি হয়ে যাবেন।

—অত বড় আশা করি কী করে? তবে আল্লার করুণায় ইনসান-ই-কামিল তো হতে পারি। পুরো মানুষ হয়ে উঠতে তো পারি।

নাদিরা বেগম নিজের মনে মনে দু'বার বললেন, পুরো মানুষ। পুরো মানুষ। তুমি পুরো মানুষ কিনা জানি না। তবে ভালোমানুষ। ভীষণ ভালো-মানুষ। আগ্রা দুর্গের ভেতরেও যে এমন দরবেশ-দশার মানুষ পাওয়া যায়—তা নাদিরা কোনোদিন ভাবতে পারেননি। শিশুবয়স থেকে তিনি দেখে আসছেন—

দণ্ডমুণ্ডের কর্তা একজন বাদশা আছেন। তাঁর দরবারে হয় অবহেলা—নয় পাশটানা আছে। সবটাই তাঁর খেয়ালখুশি মতো। সেই দরবারে নজরানা আছে। খেলাত আছে। শাস্তি আছে। নিষ্ঠুর নৃশংস পরিণাম নয়তো—কপাল খুলে যাওয়া নসিব।

তাঁর নিজের স্বামী এমন সহজ সরল রাস্তার খোঁজ কোত্থেকে পেলেন? যে-পথে আনন্দে ভাসতে ভাসতে—প্রায় হাসতে হাসতেই একটু একটু করে খোদাতালার কাছে এগিয়ে যাওয়া যায়।

রোজা রাখলে মুখ শুকিয়ে আসে। বিকেল পড়লে খুব থু থু আসে মুখে। এলেই ফেলে দিতে হবে। একবার গিলে ফেললে রোজা গেল।

হাতির যুদ্ধ দেখার আয়োজন, সিংহের যুদ্ধ দেখানোর হুকুম করতে পারেন শুধু বাদশা। আর কেউ নয়। এটাই হলো আকবর বাদশার সময় থেকে নিয়ম। ব্যাপারটাকে শাহী কেতায় তুলে এনেছেন বাদশা শাহজাহান। তিনি শাহজাহান মহলেই এমন ব্যবস্থা করেছেন—যেখানে অনেক উঁচুতে বসে বেশ কয়েকজন মিলে নিরাপদে অনেক নিচে লড়াকু হাতি বা সিংহের যুদ্ধ দেখা যায়।

তবু বাদশা এসব খেলা আজকাল দুর্গের বাইরেই দেখতে ভালোবাসেন। কারণ, তিনি যে তামাম হিন্দুস্থানের বাদশা। রাজধানী আগ্রার আম আতরাফ মানুষজনও যাতে বাদশার আনন্দ আহ্লাদের ভাগীদার হতে পারে—সে জন্যেই শাহজাহান ফিল-ই-বকসি সনাতনকে হুকুম দিলেন—দুর্গের গায়েই যমুনার ঢালাও বালুচরে দুর্গেরই ছায়ায় হাতি-সাজাও।

বেশ ক'বছর হলো চলন্ত পাহাড়-প্রমাণ দুই বেহেদর হাতি—সুধাকর আর সুরতসুন্দর শাহী পিলখানায় আলো করে আছে। হোসেঙ্গাবাদের জঙ্গলে ওরা ধরা পড়েছিল। এখনো পুরোপুরি পোষ মানেনি বলে ওদের জন্যে একজন করে আলাদা দারোগাও মোতায়েন থাকে। বছর তিরিশ বয়সের কেলরা জাতের এই হাতি দু'টিকে বড় একটা বের করা হয় না। হলদে চোখ—কানের ওপর দু'টি সাদা আঁচিল, গায়ে গজঝম্প, মেঘডম্বুর—সুধাকর আর সুরতসুন্দর যখন দুর্গের ছায়ায় এসে দাঁড়ালো সারা আগ্রা তখন শাহী খেলা দেখতে ভেঙে পড়েছে।

এতক্ষণ যে ভিড় হই হই করছিল—তা এই দুই হাতিকে দেখে একদম চুপ করে গেল। যাবারই কথা। যেন বা ওরা খুদে খুদে দুই আগ্রা দুর্গ—দিব্যি চলে ফিরে বেড়াচ্ছে।

ফিল-ই-বকসি সনাতন গতকাল হাতি সাজানোর শাহী হুকুম পাবার পর থেকে একটুও ঘুমোয়নি। ধুমধুমার গড় গুঁড়িয়ে দেবার পর থেকেই সে হিন্দুস্থানের মাঠে ঘাটে মুসাফির হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। যাও বা আগ্রা দুর্গে জায়গা হলো—যমুনার চর থেকে মীনাক্ষী একদম উধাও। কোথায় লক্ষ্মী! কোথায় বা বিষ্ণু!! এই হিন্দুস্থানে সবই তার হারিয়ে গেছে। এই শাহীর শেকড় আগ্রা দুর্গের ভিতের মতোই হিন্দুস্থানের মাটির অনেক গভীরে চলে

গেছে। কী করে যে তা ওপড়ানো যায় ? কে যে তা উপড়ে ফেলবে একদিন—তা জানে না সনাতন।

দু বছর আগে সনাতন একবার ঝুঁকি নিয়েছিল। তখনো সে ফিল-ই-বকসি হয়নি। বাগী পাঠান মনসবদার খানজাহান লোদিকে শায়েস্তা করতে বাদশা দক্ষিণে লড়াইয়ে যান। তখন পুরো দস্তুর জংয়ের ভেতর সনাতন মানুষের তাজা লাশের সুরুয়াখোর জঙ্গী হাতি জটাজুটের আগুপিছু পায়ের শেকল খুলে দিয়েছিল। শরাবের সঙ্গে সুরুয়া খেয়ে জটাজুট তখন চলন্ত মৃত্যু। আশা করেছিল—হিন্দুস্থান জুড়ে হামলা, মৃত্যু, হয়রানির বীজ তো ওই বাদশা—লড়াইয়ের ডামাডোলে শেকল খোলা জটাজুটই তাকে পেড়ে ফেলে পায়ের নিচে পিষে শেষ করে দেবে।

কপাল মন্দ। তা ঘটেনি সেদিন। বাদশা শাহজাহান বড় সেয়ানা লড়াকু।

গতকাল দুর্গের ছায়ায় হাতি সাজানোর হুকুম পাবার পর থেকেই সনাতন একরকম জেগেই আছে। কী করবে—কিংবা কী করবে না—তাই-ই সে ঠিক করে উঠতে পারছে না। সুধাকরের রগ ফেটে মদস্রাব চলছে। পাটকিলে রংয়ের। উৎকট গন্ধ। তার মানে বাদশার কাছাকাছি হওয়া যাবে না। দূর থেকে এ-গন্ধ অবশ্য কস্তুরীর মতো। কী খেয়াল হলো সনাতনের। সে ঘি, চিনি, যব, লঙ্কা, গোলমরিচের সঙ্গে যমুনার চর থেকে তুলে এনে ধুতুরার বিচি খানিকটা বেটে মিশিয়ে দিয়েছে। সেই খাবার খেয়ে সুরতসুন্দরের পাশাপাশি সুধাকর বালুচরে পা দিয়েই চনমন করে উঠলো। দূর থেকে দেখে সনাতনের মনে হলো—সুধাকর বুঝি বা টলছে। আবার ওই ভিড়ের ভেতর এ কথাও একবার তার মনে খেলে গেল—মসত হাতি তো কিছুটা টলমল করবেই। সবটাই ধুতুরার কেরামতি নয়। যমুনার এই বিশাল বালিয়াড়ির জায়গায় জায়গায় ভিজে—আর ফুলে ওঠা। তার মানে সেখানে সেখানে বালির নিচে জল আছে। অমন পাহাড়-প্রমাণ বেহেদর জাতের কেলরা হাতি সুধাকরের তো ভিজে বালিতে একদিককার পা খানিক ডেবে যেতেই পারে। তাতে তাকে টালমাটাল করে তুলতেই পারে।

সুধাকর আর সুরতসুন্দরকে এক সঙ্গে বালিয়াড়িতে এসে দাঁড়াতে দেখে মানুষজন গোড়ায় বিস্ময়ে একদম চুপ করে গিয়েছিল। এবার সেই ভিড় থেকে চাপা ভয়, প্রশংসা আহ্লাদ সব একসঙ্গে মিশে গিয়ে গুনগুনানির মতো একটা আওয়াজ চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

ঠিক এমন সময় ঘোড়ার পিঠে বাদশা শাহজাহান এলেন। তাঁর পেছনে ঘোড়া থেকে একে একে নামলেন তিন শাহজাদা—দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব। মীর্জা রাজা জয়সিংহ আর কয়েকজন মনসবদার।

ওঁরা দুর্গের দিকে পিঠ দিয়ে ছায়ায় বসলেন। পেছনে অনেক উঁচুতে আগ্রা দুর্গের ঝরোকায় তখন দুই শাহজাদী—জাহানারা আর রোশনআরা। মেহজ়বিন বেগমের পাশে হাজিরার কোলে গওহরআরা। পাশেই নাদিরা বেগম। তাঁর পাশে সিতারা বেগম। সবার চোখ নিচে—যমুনার বালিয়াড়িতে।

বাদশাকে দেখে জনতা উল্লাসে ফেটে পড়লো। সে চিৎকারে যেন কী ছিল!

সুরতসুন্দর শুঁড় দিয়ে সুধাকরের শুঁড় টেনে ধরলো। সুধাকর তাকে দাবনার ধাক্কায় সরিয়ে দিলো দূরে। তাতে ভিড়ের ভেতর মানুষের মাথাগুলো যেন দুলে উঠলো।

দাড়িই গজায়নি—বেশ ফর্সা, বছর পনেরোও হয়নি—শাহজাদা আওরঙ্গজেব হাতির লড়াই ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলেন না। ভালো করে দেখার জন্যে তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে একদম সুধাকরের কাছাকাছি এসে পড়লেন।

সুধাকর সুরতসুন্দরকে কাছাকাছি না পেয়ে শাহজাদা আওরঙ্গজেবের দিকে ধেয়ে এলো। সনাতন লম্বা অঙ্কুশ নিয়ে ছুটে এলো। কিন্তু ততক্ষণে বেশ দেরি হয়ে গেছে। রাগে অন্ধ—টালমাটাল মসত সুধাকর শাহজাদার ওপর হামলা করলো।

চারদিকে হায় হায় পড়ে গেল। শোরগোল, চিৎকার, আতশবাজির আগুনের পরোয়া না করে সুধাকর আওরঙ্গজেবের ঘোড়াকে প্রায় ধরে ফেলে ফেলে। এই বয়সেই শাহজাদা পাকা ঘোড়-সওয়ার। তিনি ঘোড়া সামলে সুধাকরকে বর্শা ছুঁড়ে মারলেন। হাতি হারবার নয়। সে শাহজাদার ঘোড়াকে শুঁড়ে জড়িয়ে নিতেই আওরঙ্গজেব মাটিতে লাফিয়ে পড়ে তলোয়ার হাতে রুখে দাঁড়ালেন।

সুধাকরও যেন এক মুহূর্তের জন্যে রুখে দাঁড়ালো। মানুষজন ভয়ে পালাচ্ছে। তাদের ভিড় ঠেলে বাদশা কিংবা অন্য কেউ এগোতে পারলেন না।

ঠিক এই সময় শাহজাদা সুজা আর মির্জা রাজা জয় সিংহ ঘোড়া ছুটিয়ে এসে দু'দিক থেকে সুধাকরের গায়ে বর্শা ছুঁড়লেন। বাদশা শাহজাহানের বুকের ভেতরটা থেমে গেছে।

সুরতসুন্দর ছুটে এসে আবার সুধাকরকে শুঁড়ে জড়িয়ে পেড়ে ফেলতে গেল। শুধু সনাতন জানে—সুধাকর এখনো কেন টলছে। অত বড় জানোয়ার বলেই দাঁড়িয়ে আছে এখনো। বাটা ধুতুরার বিষ এতক্ষণে মাথায় উঠেছে। সুধাকর শুঁড় তুলে বালিয়াড়ি দিয়ে ছুটে পালাতে লাগলো। এই ছোটাছুটিতে ভিড় একদম ফর্সা।

শূন্য বালিয়াড়িতে বাদশা শাহজাহান হেঁটে শাহজাদা আওরঙ্গদেবের সামনে এসে দাঁড়ালেন। শাহজাদার ঘেমে ওঠা কপালে মাথায় চুল লেপটে গেছে। বাদশা ছেলের কাঁধে হাত রাখতেই আওরঙ্গজেবের হাত থেকে তলোয়ার খসে বালিতে পড়ে গেল। বাদশা তা কুড়িয়ে শাহজাদার হাত দিয়ে বললেন, তুমি বাহাদুর! সত্যিকারের বাহাদুর!

আওরঙ্গজেব দেখলেন—দূরে দাঁড়িয়ে শাহজাদা দারা। তাঁর পাশেই শাহজাদা সুজা। আওরঙ্গজেব আস্তে আস্তে বললেন, খোদাতালার হাতে মানুষের জান্। আমি শুধু ভাই সাহেবের ব্যবহারে লজ্জা পেলাম—ব্যথা পেলাম—

বাদশার কপালে তিনটে ভাঁজ পড়লো। তিনি শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে কাছে টেনে নিলেন। আজ সারাক্ষণ তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। সবই খোদার করুণা। আজ তোমায় আমি কাছ ছাড়া করছিনে কিছুতেই—। বলতে বলতে শাহজাদা থামলেন, তারপর হেসে বললেন, যদি সুধাকরের কাছে হেরে যেতে—?

—যদি মারাও যেতাম—তাও ভাইসাহেবের মতো লজ্জার কাজ হতো না হজরত। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা চাঘতাই বংশের অপমান। বাদশার জীবনেও মৃত্যু পর্দা টেনে দেয় একদিন। আলমপনা! সে মৃত্যু অপমানের নয়। ভাইসাহেব যা করলেন—তাতেই অপমান।

—তুমি বাহাদুর বটে! বলতে বলতে বাদশা শাহজাহান শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে আবারও বুকে টেনে নিলেন। আওরঙ্গজেব এই প্রথম হিন্দুস্থানের বাদশার বুকে মাথা রেখে নিজের কানে বাদশার বুকের ধুকধুকি শুনতে পেলেন। শুনতেই থাকলেন।

বাদশা শাহজাহানের কপালে আরও এক থাক ভাঁজ পড়লো।

॥ বিয়াল্লিশ ॥

বাইরে রোদে আগ্রা জ্বলে যাচ্ছিল। ভেতরে দেওয়ান-ই-খাসে ঠাণ্ডা ছায়ায় বাদশা শাহজাহান আজ শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে তাঁর বাহাদুরির ইনাম দেবেন। শাহী ওপর মহল তো মজুতই আছেন দরবার-ই-খাসে—এ ছাড়াও হাজির হয়েছেন হিন্দুস্থানের বড় বড় ব্যাপারী। মনসবদার, ওমরাহ, মির্জা রাজা জয়সিংহ, মরহুম বাদশা-বেগমের ভাই শায়েস্তা খাঁ, উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁ, উজির জাফর খাঁ। কোনো পদে নেই—কিন্তু বাদশার ভায়রাভাই—সেই সুবাদে খলিলুল্লা খাঁ এমনসব দরবারি ব্যাপারে কখনোই গরহাজির থাকেন না। তিনিও আছেন।

বর্শা ছুঁড়ে জঙ্গী হাতি সুধাকরের সঙ্গে শাহজাদা আওরঙ্গজেবের মহড়া নেওয়ার সাহসী কাণ্ডের কথা এখন রাজধানী আগ্রার চকে চকে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। কেউ বলছে, কিশোর শাহজাদা এগিয়ে গিয়ে সময়মত বর্শা না ছুঁড়লে বহু গরিব সাবাড় হয়ে যেতো।

কেউ বা বলছে—শুধু গরিব কেন? খোদ বাদশাই ঘায়েল হতে পারতেন।

দরবারে বসে বাদশা শাহজাহান ভাবছিলেন অন্য কথা। অনেকদিন আগে একজন শাহী নজুমীর ইউনানি মতে জন্ম ছক যাচাই করে বলেছিলেন, শাহজাদাদের ভেতর সবচেয়ে সফেদ রংয়ের ছেলের দিক থেকেই বাদশার শাহী ধ্বংস হবার—চৌপট হবার বিপদ ঘনিয়ে আসবে একদিন। বাদশা এখন বোঝেন, সেদিন শাহী নজুমীর একেবারে সোজাসুজি কারও দিকে আঙুল তুলতে চাননি। কারণ, কে চায় বিপদ ডেকে আনতে! সরাসরি বলে যদি শাহী কোপে পড়তে হয়।

বাদশা জানেন, শাহজাদাদের ভেতর কে সবচেয়ে সফেদ। বাদশাকে ঘিরেই দরবার। সেই দরবারের দিকে তাকিয়ে তিনি অস্ফুটে দু'বার বললেন, সাদা সাপ! সাদা সাপ!

উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁ সবে বাদশার মবারকে শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে পড়তে করতে যাবেন—ঠিক এই সময় সবরকম দরবারি কানুন, রীতরিসালা

ভেঙে শাহজাদা দারা ঢুকলেন। তাঁর কোমরবন্ধের মখমল বাঁধুনি লোটাচ্ছে। তিনি একা নন। সঙ্গে এক অতি বৃদ্ধ। সে বুড়ো কোনো রকমে দাঁড়িয়ে আছে। এই বুঝি পড়ে যায় যায়।

দরবারে সবারই ভ্রূ কুঁচকে গেল। শুধু বাদশা শাহজাহান সামান্য হেসে তাকালেন। তিনি তাঁর বড় ছেলেটিকে জানেন। হিন্দুস্থানের পয়লা শাহজাদা আদব কায়দা, মান সম্মান—কোনো দিকেই দৃকপাত করেন না।

শাহজাদা দারা সামনের দিকে ঝুঁকে বাদশাকে কুর্নিশ করলেন। তারপর পিছিয়ে গিয়ে অতি বৃদ্ধকে কুর্নিশ করতে বললেন। বুড়ো ঝুঁকে কুর্নিশ করতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল। শাহজাদা তাকে ধরে ফেললেন।

বাদশার মবারকে পেশ হওয়ার জন্যে দরবারি পোশাকে শাহজাদা আওরঙ্গজেব তৈরি ছিলেন। বুড়োটি পড়তে পড়তে টাল সামলে উঠে দাঁড়াতে তাঁর গলার তুলসী কাঠিও দুলে উঠলো। তা দেখে আওরঙ্গজেব দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, যত্ত সব না-পাক কাণ্ডকারখানা বড়ে ভাইয়ের। রাফিজি! মুলহেদ কারবার !!

আশপাশের দু'একজন ওমরাহের কানে কথাগুলো গেলেও তাঁরা না-শোনার ভান করলেন। কারণ, সবাই জানেন, হিন্দুস্থানের পয়লা শাহজাদাই বাদশার চোখের মণি।

মহম্মদ দারাশুকো তখন বাদশার সামনে বলে চলেছেন, এই অতি বৃদ্ধ মানুষটি এমন নিষ্ঠুর গরমের দিনে আগ্রায় শাহী দিওয়ানখানায় এসে তাঁর আর্জি জানাতে সাত সাতদিন ঘুরে গেছেন। তাও পারেননি। আজ দেখি শাহী সড়কের পাশে বসে একা একা ছাতি ফাটা গরমে ধুঁকছেন—পিপুল গাছতলায়—

বাদশা জানতে চাইলেন, এই বুড়োটি কে?

এমনিতে বাদশা শাহজাহান শাহজাদার আব্বা হুজুর। কিন্তু ওই মসনদে বসলে তাঁর চোখে শাহজাদা থেকে একজন মিশকিন—সবাই বিচারের কাঠগড়ায় সমান।

—ইনি গোকুলের বড় গোঁসাই—

বাদশার ভ্রূ কুঁচকে গেল। কে?

অবস্থা সামাল দিতে উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁ এগিয়ে এলেন। বললেন, ইনি গোকুলের বড় গোঁসাই। বল্লভাচার্যের আশ্রমের—আলমপনা।

বাদশা জানতে চাইলেন, বয়স কত?

সারা দরবার চমকে গেল। বাদশা তো দরবারে এমন আচমকা ঢুকে পড়াকে বেয়াদবি বলেই ধরে থাকেন। কিন্তু আজ কী হয়েছে বাদশার? কিছু তো বললেনই না—তার ওপর বেশ খোসমেজাজে তত্ত্বতাবাস করছেন।

উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁ তো বিপদে পড়েছেন। দিওয়ানখানার কাছারিতে আর্জি জানাতে না পেরে বড় গোঁসাই গাছতলায় রোদের ভেতর ধুঁকছিলেন। এটাই তো সাদুল্লা খাঁয়ের পক্ষে বিপদের। কেন না, দিওয়ানখানা সরাসরি সাদুল্লা খাঁয়ের অধীনে।

বড় গোঁসাই কোনোদিন দরবারে আসেননি। দেখেনওনি। বাদশা বা উজিরে আজম তো তাঁর কাছে গল্প কথার মানুষ। অমন সুন্দর দেখতে মানুষটি তাঁকে ধুঁকতে দেখে কাছে এগিয়ে আসায় একবারও বড় গোঁসাই বুঝতে পারেননি—ইনি একজন শাহজাদা।

ভরাট গলায় বাদশা শাহজাহানের প্রশ্ন শুনে তিনি ঘাবড়ে গেলেন। ভয়ে তাঁর অশক্ত ঠোঁট থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

শাহজাদা দারা বললেন, বলুন। জোরে বলুন বাদশা যাতে শুনতে পান—

বুড়োটির দিকে শাহজাদার এতটা মনোযোগ দেখে বাদশা কিছু নরম হয়ে পড়লেন। তিনিও বুড়োর দিকে তাকিয়ে বললেন, কবেকার পয়দায়িস?

শাহজাদা দারা গুছিয়ে দিলেন প্রশ্নটি। কবে জন্মেছেন?

বড় গোঁসাই কাঁপতে কাঁপতে বললেন, শ'সন হয়ে গেছে আলা হজরত।

শাহজাহান এ কথায় মজা পেলেন। একশো বছর পার!

বড় গোঁসাই এবার সাহস করে বললেন, শুনেছি বাবর বাদশা যে-বছর রাজা হলেন—সে বছর আমি দুনিয়ার আলো দেখি—

বলে কি?—বলে বাদশা প্রায় লাফিয়ে উঠলেন।

এতক্ষণে বড় গোঁসাই ধাতে এলেন। তিনিও বলে উঠলেন, আলমপনা। ওই বছরই আমার জন্ম।

সারা দেওয়ান-ই-খাসের দরবার চমকে উঠলো। শাহজাহান বলে উঠলেন, মুঘল শাহীর বয়সী?

—হ্যাঁ হজরত। অতি বৃদ্ধ অদ্বৈত মহাপ্রভুর হাত ধরে নেহাত বালক বয়সে আমি গোকুলে আসি। চৈতন্য মহাপ্রভুর তখন অন্তঃলীলা চলছে। আমার এখন একশো সাত বছর বয়স।

বাদশা শাহজাহান শুধু বয়সের হিসেবটা কানে নিয়ে খোশমেজাজে জানতে চাইলেন, আর্জিটা কী?

—সুবে আগ্রার ভেতর গোকুল। সেখানকার সাহার পরগনা আর গোবর্ধন পরগনায় আমরা হাভেলি কেনাবেচার অনুমতি পাই।

—কোনো গাওহাই আছে?

শাহজাদা বুঝলেন, বাদশা সাক্ষ্য প্রমাণ চাইছেন।

বড় গোঁসাই তাঁর কোমর থেকে একখানি শাহী কাগজ বের করলেন। করে বললেন, সাহার পরগনা, গোবর্ধন পরগনায় আমরা অবাধে গরু চরানোর ফরমান নাই। ওখানে হরিণ মারা—কোনোরকম শিকার করা—ময়ূর মারা নিষেধ হয়ে যায়।

বাদশা জানতে চাইলেন, কোনো নিশান আছে?

আরেকখানা কাগজ বের করে বড় গোঁসাই বললেন, এই যে আলা হজরত।

দু'খানা কাগজই বাদশা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বললেন, এবার আর্জিটা শোনা যাক।

—বন্দেগান। আমরা শাহী খাজনা, মাসুল, খরচ-ই-দে, মালবা থেকেও

রেহাই পাই। কিন্তু দুঃখের কথা কী বলবো—গত এক সন হলো সবই আমাদের ওপর আবার চাপানো হয়েছে। হাভেলি কেনা বেচা বন্ধ। গরু নিয়ে চরাতে বেরোবার জো নেই। এলোপাথাড়ি শিকার চলছে। ময়ূর মারছে। হরিণ মারছে।

একটানা বলে বড় গোঁসাই হাঁফাতে লাগলেন। সারা দরবার দেখলো, বাদশা তাঁর পয়লা শাহজাদার মুখে হাসি হাসি চোখে তাকিয়ে আছেন। সারা দেওয়ান-ই-খাস একদম চুপ। বাদশা এবার উজিরে আজম সাদুল্লা খাঁয়ের দিকে তাকালেন। ওখানে ফৌজদার কে?

—আলমপনা। ওখানকার ফৌজদার মুর্শিদকুলি খাঁ।

—তাঁকে তলব করা হোক।

—হজরত। ফৌজদার এখন ঘোড়সওয়ারদের নিয়ে বুন্দেলখণ্ডে গেছেন। খবর করি?

—না থাক। ওসব রদ করে ফের ফরমান জারি হোক। যা যা নিষেধ ছিল ওখানে—ফের তা বহাল থাকবে। অবাধে গরু চরানো যাবে। সবরকম শিকার বারণ।

—তাই হবে আলমপনা।

বড় গোঁসাই কাঁপতে কাঁপতে এবার কেতা মাফিক কুর্নিশ করলেন। বাদশার দিকে মুখ করে তিনি পিছিয়ে যেতে যেতে বেরিয়ে গেলেন।

শাহজাদা দারা নিজের মনেই বললেন, আকবর বাদশার আমল থেকেই খরচ-ই-দে, মালবার মতো বে-আইনি বেদরদি খাজনা নিংড়ে নেওয়া রদ হয়ে আসছে। কিন্তু আসলে তো দেখছি রদ হয় না! হিন্দুস্থানের আদি বাসিন্দাদের ওপর খাজনার এই জুলুম কবে বন্ধ হবে—

এসব কথা উঁচু গলায় বলবার জায়গা এটা নয়। শাহজাদা নিজের ভেতরই চুপ করে গেলেন।

অন্য শাহজাদা—আওরঙ্গজেব শুনলেন—উজিরে আজম তাঁরই নাম উঁচু গলায় বলছেন। আওরঙ্গজেব ভাবলেন একবার বড়ে ভাইয়ের দিকে তাকাই। তারপর কী মনে হতে সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তিনি কুর্নিশ করে গিয়ে বাদশার সামনে দাঁড়ালেন।

বাদশা স্থির চোখে তাঁর এই সবচেয়ে গোরাপানা ছেলেকে দেখলেন। তুলনায় দারা বা সুজার চেয়ে কিছু রোগা। সাহসী। সারা মুখে একটা গম্ভীরভাব থম থম করছে। তিনি এই ছেলের মুখে তাকিয়ে কোনো থই পেলেন না।

বিশাল রুপোর থালায় দুই লাখ তংকার এক বিরাট স্তূপ বয়ে নিয়ে চার জন হাবসি এসে দাঁড়ালো। বাদশা যেন ঘুমঘোর কাটিয়ে উঠে বললেন, সেদিনকার বাহাদুরির জন্যে শাহী তোফা—

আওরঙ্গজের মাথা নিচু করে তসলিম জানালেন। আপনার এই তোফার মর্যাদা যেন রাখতে পারি।

—আরও আছে। আজ থেকে সেদিনকার সুধাকর হাতি স্রেফ তোমারই।

শাহজাদাকে মুবারকবাদ জানাতে সারা দরবার দাঁড়িয়ে উঠলো। তাতে

আওরঙ্গজেবের মুখে কোনো হেরফের হলো না।

বাদশা শাহজাহান সুধাকর হাতির গায়ের মেঘডম্বরের ডোরি এগিয়ে দিলেন। সেটি হাতে নিয়ে শাহজাদা আবারও তসলিম করলেন। সারা দেওয়ান-ই-খাসে জায়গায় জায়গায় পাথর বদলানো হয়েছে। এ-পাথরগুলো এমনই যে বাইরের আলো পড়তেই সে পাথর থেকে তা দৌগুনি হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই আলোতে বাছা বাছা ওমরাহ, মনসবদার, সিপাহসালার, উঁচু মাপের ফৌজদারদের গায়ের দামি পোশাক আশাক ঝিকমিক করে উঠলো। তার ভেতর কিশোর শাহজাদার মুখখানি জেদ, সাহস, লাবণ্যে ঘন হয়ে বুঝি বা বড় এক চাঁই হিরে হয়ে এইমাত্র ভেসে উঠেছে।

দেওয়ান-ই-খাসে এমন সব শাহী ব্যাপারে আকবর বাদশার মতোই বাদশা শাহজাহানের ইচ্ছায় দরবারি গাইয়ে লাল খাঁ তাঁর দুই ছেলে খুশহাল আর বিশ্রাম খাঁ বসেছিলেন। আর ছিলেন দরাঙ্গ খাঁ। ওঁরা লম্বা বত্রিশ তালের ধ্রুপদ ধরতেই শাহজাদা দারা হাসি চাপতে পারলেন না। যার জন্যে গান সে কি শুনবে! বড়ে ভাই হিসেবে শাহজাদা দারার জানতে বাকি নেই—তার ওই ছোটে ভাই শাহজাদা আওরঙ্গজেব ভোরের সানাই শুনলেই নাকি কানে আঙুল দেয়। এর মাঝে একদিন আসরের নমাজে বসে কানে দূরের বাঁশি এসে ঢুকতেই ছোটে ভাই কানে মসলিন গুঁজে নিয়েছে—এ-খবরও শাহজাদা দারার কানে এসেছে। মনে মনে তিনি বললেন, পাকা নমাজি!

শাহজাদাদের মেসো হন খলিলুল্লা খাঁ। তিনি এখন আওরঙ্গজেবকে নিয়ে তৌলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। এক পাল্লায় শুধুই মোহর। গুজন-ই-কমরির জন্যে কিশোর শাহজাদা অন্য পাল্লায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

মোহর কাটাইয়ের শাহী তেপকচি গুনতে শুরু করলেন। চার হাজার নশো নব্বই, একানব্বই, বিরানব্বই,—

দেখতে দেখতে একদিকে শাহজাদা আওরঙ্গজেব—আরেক দিকে শুধুই মোহর নিয়ে দুই পাল্লা সমান সমান হয়ে এলো। মাঝের কাঁটার দিকে তাকিয়ে তেপকচি রীতিমত ঘোষণার গলায় বলে উঠলেন, পুরো পাঁচ হাজার—

শাহজাদা আওরঙ্গজেব বাহাদুর এখন পুরো পাঁচ হাজার মোহর। এমনি সব কথা বলতে বলতে ওমরাহরা ভাঙা দরবার থেকে উঠতে লাগলেন। এই ওমরাহদের ভেতর যাঁরা ইরানি তাঁদের গুমর কিছু বেশি। তাঁরা প্রায়ই কথাবার্তায় জানিয়ে দিয়ে থাকেন—হিন্দুস্থানের শাহজাদাদের মা কিন্তু ইরানি।

সারা হিন্দুস্থানটা বড় মজাদার জায়গা হয়ে উঠেছে। আগ্রা, সুবে দিল্লি, সুবে ইলাহাবাদ ঘিরে বিরাট দেহাতে খালি গায়ে মানুষগুলো খাড়িবোলিতে কথা বলে, গান গায়। হাল চষতে চষতে অবধি, জৌনপুরি বা ফতেপুরি টানে টানে গরুর লেজ মোচড়ায়। নতুন গেঁহু উঠলে জ্যোৎস্নারাতে টিয়ার ঝাঁকের জন্যে সোনালি পুষ্ট দানা উঠোনে ছড়িয়ে রাখে। আর এই লাখো লাখো মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের হাতে গোনা যায়। তাঁরা সারা দেশের হৃৎপিন্ড

আগ্রা দুর্গে বসে ফারসিতে কথা বলেন। সেটাই শাহী ভাষা। আগ্রাই দস্তুরি। ওদের কেউ ইরানি, কেউ তুর্কি, কেউ আফগান—অল্প কয়েকজন আছেন হায়দরাবাদি। নৈবেদ্যের ওপর মণ্ডের মতো এইসব কর্তা যে-যার দিশী পোশাক, ঘোড়া, সেপাই, আতর, খাবার অভ্যেস, তারের বাজনা, ফলমূল, গানের সুরে আর কথা সঙ্গে করে এনেছেন।

মুঘল শাহী শ'সন হয়ে গেল হিন্দুস্থানের জমিতে শেকড় নামিয়ে দিয়েছে। তাই ওখসব ওপরতলার মানুষের কথা, সান, সুর, খাবার, আঙরাখা, ফুল, ফল হিন্দুস্থানের বিশাল স্রোতে ঢল হয়ে নেমেছে। সেই বহতা গা-ভাসানো স্রোতের তীরে দাঁড়িয়ে ওঁরা এদেশী বিবি নিকা করে বসে আছেন। দেখাদেখি শাহী ফৌজের সেপাইরাও অনেকেই আর নিজের নিজের দেশে ফিরে যায়নি। হিন্দুস্থানকেই নিজের ঘরবাড়ি করে নিয়েছে। ফলে হিন্দুস্থানের ভেতর আরেক হিন্দুস্থান পয়দা হয়েছে। গানে, ফলে, ফুলে, খাবারদাবারে সে এক আশ্চর্য মজাদার দুনিয়া জন্ম নিয়েছে।

এই দুনিয়ার মধ্যমণি খোদ বাদশা চাঘতাই হয়েও শুধু পতাকা আর ধ্বজে এখন চাঘতাই। বাকি সব কিছুতে তিনি এখন হিন্দুস্থানি।

সময় তার নিস্পৃহ হাসিতে সবই দেখে। কথাটি বলে না। তাই আফগান রাখালিয়া সুরে কথা বসিয়ে জ্বালামুখীর উগ্রসাধনার সাধক ভবানীর গান গায়। ফতেহাবাদি কি ফুলপুরি বিয়ে বাড়িতে কনে রওনা হয়ে যাবার সময় ইস্পাহানি তবক মোড় লাড্ডুর থালি যায় সঙ্গে। সে-থালির ওপরকার ঢাকনায় হায়দরাবাদি সুতোর কাজ। নানান জিনিস একসঙ্গে মিশে গিয়ে একদম নতুন এক জিনিস হয়ে উঠেছে সবসময়। এর নাম হিন্দুস্থান। খোটান, কাশগড়ে কাপড় বেচে ফেরার পথে ব্যাপারীরা মৃগনাভি নিয়ে ফিরছে। ওদের ওখানে কেনা-বেচার পরিবর্ত কোনো মুদ্রা বা সোনাদানা নেই বলেই সে-দেশের মোহর আশরফি হলো গিয়ে—মৃগনাভি, চুনি, ইয়াকের চামড়া। চিত্রল, গিলগিট, স্কার্দুর মোটা পশমের খির্কা গা থেকে খসিয়ে সঙ্গমের মকরস্নানে তরুণ সাধু শীত কাটাতে হিমজলে ঝাঁপ দিচ্ছে।

লাহোর দুর্গ থেকে শাহজাদা দারা নাদিরা বেগমকে নিয়ে কাবুল পাড়ি দিয়েছেন শীতের মুখে মুখে। রাওয়ালপিণ্ডি পেরিয়েই নাদিরার গলা বুজে এলো। চোখ লাল। গা পুড়ে যাচ্ছে। ঠিক ছিল কাবুলের সুবেদারের অতিথি হয়ে শীতটা ওখানেই কাটাবেন শাহাজাদা। কিন্তু মাঝপথেই না ফিরতে হয়। সামনে পেশাওয়ার।

শীতের ভেতর জল গরম করে চামড়ার পেটিতে ভরে নাদিরা বেগমের পায়ের কাছে রেখে যাচ্ছে বাঁদিরা। ইয়াবু ঘোড়ায় টানা জুড়ি গাড়ির ভেতরটাই এখন নাদিরা বেগমের শোবার জায়গা। শাহজাদা দারা দু'পেটি গরম জল দুই পায়ের পাতার নিচে ঠেসে দিয়ে ঢাকাটা কোমর অব্দি টেনে দিলেন। কী কষ্ট হচ্ছে নাদিরা?

নাদিরা খানিকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না। মাথার ভেতরটা ভার।

দুই চোখের কোণে আপনাআপনি জল এসে পড়ছে। হাত তুলে মুছতেও পারছেন না। খুব আস্তে বললেন, সরতাজ ! আপনি আমার মাথার মুকুট। আমার কদম ছুঁয়ে আমাকে কেন গুনাহগারিতে ফেলেছেন ?

—বিমারির ভেতর ওসব কেন ? কোথায় কষ্ট হচ্ছে বলো ?

কষ্ট তো সব জায়গায়। সে কথা না বলে নাদিরা খুব নরম গলায় বললেন, আমি তো কখনো এমন পাহাড়ী রাস্তায়—শীতের ভেতর বেড়াতে বেরোইনি শাহজাদা—

—কোথায় বেড়াতে গেছো তাহলে ?

—কোথাও না।

—কোথাও না ?

—না শাহজাদা। আমরা কোনো সফরের কথা ভাবতে পারিনি কোনোদিন। আব্বা হুজুর আপনারই মতো একজন শাহজাদা হলেও কেমন শাহজাদা ছিলেন তা তো আপনি জানেনই !

—ও কথা বলতে নেই নাদিরা—বলে তাঁর কপালে হাত দিয়ে দারা ভেতরে ভেতরে চমকে উঠলেন। নাদিরার কপালে হাত রাখা যাচ্ছে না। জুড়ি গাড়ির বাইরের এখন থল চোটিয়াল পাহাড়ের গাঁ-ঘেঁষা এই পাহাড়ী রাস্তায় গাছের ঝরা পাতার মতোই তুষার পড়ছে। পুরো দুপুর মেঘলা আকাশের জন্যে এখন একদম ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যা এখানে। গাড়ির দু'পাশে বাছা বাছা সওয়ার মাথা থেকে পা অব্দি ঢেকে খুব সাবধানে ঘোড়া নিয়ে এগোচ্ছে। পেছল পাহাড়ী পথ। শাহজাদা দারা পর্দার ফাঁকে বাইরে হাত পেতে খানিকটা তুষার নিলেন। তারপর সেই হাত নাদিরার কপালে আলতো করে চেপে ধরলেন।

নাদিরা একই সঙ্গে আরামে, কষ্টে, আর তৃপ্তিতে বলে উঠলেন, আঃ !

দারা ঠোঁট নামিয়ে বেগমের কপালে আলতো করে ছোঁয়ালেন।

—আমরা তো কখনো আগ্রার বাইরে যাইনি।

—কখনো নয় ?

—না। একবার শুধু দিল্লির পথে সাকেত অব্দি নিয়ে যান আব্বা হুজুর। আমরা ছোট ছিলাম। দাদাসাহের জাহাঙ্গীর বাদশা বেঁচে। সাকেত ছাউনিতে ফৌজ কুচকাওয়াজ দেখেছিলাম।

শাহজদা দারার খুব কষ্ট হলো। বাইরে মেঘ করে আসা আশমান। অবিরাম তুষার ঝরছে। ওই বাইরেটার মতোই নাদিরার বালিকা জীবন কেটেছে কোনো আলো নেই। আনন্দ নেই। সামনেই বড় কিছু ঘটছে না। তিনি আবারও বেগমের পুড়ে যাওয়া কপালে ঠোঁট রাখলেন। রেখে বললেন, সেরে ওঠো ! আমরা দু'জনে একসঙ্গে তামাম হিন্দুস্থান চষে বেড়াবো।

—সরতাজ ! শীত আমার সয় না। আগ্রা দুর্গে জন্ম আমার। আগ্রা দুর্গেই বড় হয়েছি শাহজাদা—

—আর কখনো তোমায় আমি শীতে—এমন পাহাড়ি রাস্তায় আনবো না।

—আমার সারাজীবন—আপনি যেখানে যাবেন—আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাবো।

—কথা বোলো না নাদিরা। আরেকটা গরম জলের পেটি চাই যে—

—থাক। কোনো পেটি লাগবে না। আপনি শুধু আমার সঙ্গে থাকুন শাহজাদা।

—জানো নাদিরা! এই রকম রাস্তা দিয়েই আমি প্রথম লাহোর হয়ে রাওয়ালপিণ্ডি এসেছিলাম। সঙ্গে ছিল শাহজাদা আওরঙ্গজেব।

—কবে? কত বড় ছিলেন তখন আপনারা?

—তুমি আগ্রা দুর্গে ছিলে—তুমি কিছু শোনোনি তখন?

—ঠিক কখন বলুন তো?

—আমার তখন দশ। আওরঙ্গজেবের মোটে সাত বছর বয়স। আমরা তখন নেহাত নাবালক!

—ওঃ! আমি তখন খুবই ছোট। শুনে থাকলেও বেবাক ভুলে গেছি শাহজাদা। কিছু মনে থাকার কথা নয় সে বয়সে—

—রাওয়ালপিণ্ডি দুর্গে তখন দাদাসাহেব জাহাঙ্গীর বাদশা। আব্বা হুজুর তখন বাগী শাহজাদা খুর্রম। হিন্দুস্থানের মাঠে-ঘাটে শাহী ফৌজের তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। শেষে পালাতে পালাতে নাসিকে এসে তাঁবু ফেলেছেন—

—ঠিক তখন আমার আব্বা হুজুর শাহজাদা পরভেজ শাহী ফৌজ নিয়ে বাগী শাহজাদা খুর্রমকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছেন; খবর যা আসতো আগ্রা দুর্গে—তা থেকেই হয়তো শুনেছিলাম। আচ্ছা আসিরগড় বলে কোনো জায়গা আছে?

—হ্যাঁ নাদিরা। পালাতে পালাতে ওখানে এসে আব্বা হুজুর একবার ঘাঁটি করেন।

—আম্মিজানের মুখে তখন প্রায়ই জায়গাটার নাম শুনতাম। আসিরগড়ে যদি আব্বা হুজুর জিততে পারেন তো কেল্লা ফতে। তাই তো বলতেন আম্মিজান।

—আসিরগড়ে আমাদের বড় খারাপ কেটেছে নাদিরা। শাহী ফৌজ এসে কেল্লার জলের রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল।

—হয়তো আমারই আব্বা হুজুরের হুকুমে সেপাইরা ও-কাজ করে।

—হয়তো তাই।—বলে শাহজাদা দারা চুপ করে গেলেন।

খানিক চুপ থেকে নাদিরা বললেন, দেখুন তো নসিব! তখন কি জানতাম আমি একদিন আপনার বেগম হবো?

—জানলে কী করতে?

—সিধে আসিরগড়ে চলে যেতাম!

—তখন তো তুমি খুব ছোট নাদিরা!

—নসিবের চাকায় একজন ওপরে উঠলে আরেকজনকে নিচে নেমে যেতেই হয়। তাই নয় শাহজাদা?

—দারা কোনো কথা বলতে পারলেন না তখন তখনই। বাইরে পেছন

পাহাড়ী পথে ঘোড়ার পায়ের ঠোকাঠুকি। একঘেয়ে তুষার পড়ছে। সেই সঙ্গে বৃষ্টির মিহিগুঁড়ো। ভেতরে নাদিরা বেগম। ইংলিশস্থানের ভেট দেওয়া গাড়ির আদলে এই জুড়ি গাড়ি বানানো। ঝাঁকুনি কম লাগে। নাদিরার কপালে হাত রাখা যাচ্ছে না। পাছে পায়ের দিকে ঠাণ্ডা লাগে—তাই দারা আবার গরম জলের পেটি দুটো ভালো করে চেপে দিলেন। দিয়ে বললেন, জানো নাদিরা। দুনিয়ার কোনো ক্ষমতাই বিশুদ্ধ ক্ষমতা নয়। বিশুদ্ধ ক্ষমতায় ক্ষমা থাকে। যেমন ছিল পরদাদাসাহেব আকবর বাদশার ক্ষমতায়। তাঁর যেমন ছিল ক্ষমতা —তেমনি ছিল ক্ষমা করারও ক্ষমতা। তারপর থেকে—!

নাদিরার দুই চোখের কোণে জল। কোনো কথা নেই মুখে। সে মুখে সামান্য আলো ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। শাহজাদার ভয় হলো। পাহাড়ী পথে এ যাত্রা কি শেষ হবার নয়? কোনোদিন কি পেশাওয়ার পেঁছিতে পারবো? পেঁছেই পেশাওয়ার দুর্গের হেকিমসাহেবকে তলব করতে হবে।

নাদিরা শান্ত গলায় জানতে চাইলেন, তারপর থেকে?

চমকে উঠলেন দারা। তারপর থেকে? শুধু দয়ামায়া শূন্য তাগদ। হয় তুমি থাকবে—না হয় আমি। দু'জনের থাকার কথা মুঘল ইতিহাসে নেই নাদিরা।

—একজন যদি সরে দাঁড়ায় শাহজাদা? কোনো কিছুতে না জড়িয়ে একজন যদি সাধারণের ভেতর মিলে মিশে যায়? যদি সে সাধারণ হয়েই থাকে?

—তাতেও নিস্তার নেই নাদিরা! সন্দেহ? সন্দেহ কোথায় যাবে? যদি সাধারণ থেকে তুমি কোনোদিন ফের অসাধারণ হয়ে উঠতে চাও? কে বিপদের ঝুঁকি নেবে! তুমি কিছু হতে চাওয়া মানেই তো—আমি যা আছি—তা আর নাও থাকতে পারি। তাই! সবাইকে মুছে ফেলে শুধু একজনের জেগে ওঠা। সে-ই সব। যা-কিছু আছে—সবই আমার। এই কথাটাই বড় হয়ে উঠছে।

নাদিরা বেগম কোন কথা বলতে পারলেন না। আগের মতোই তাঁর দু'চোখ জলে ভরে এলো। শাহজাদা দারা ভেবেছিলেন, কাবুলে পেঁছে আরামের শীতে নাদিরা বেগমকে নিয়ে ক'টা দিন দুর্গে কাটাবেন। হাতে কোনো কাজ রাখবেন না। সকাল সন্ধে শুধু নাদিরা। আর কিছু নয়। লাহোরে থাকতেই ঠাণ্ডাটা লেগেছে নাদিরার।

—সেবারে সুধাকর খেপে গেলে বাদশাকে শাহজাদা আওরঙ্গজেব অমন কথা বললেন কেন?

—কী কথা নাদিরা? আমি সব ভুলে গেছি।

—আপনি ভুললেও আমি ভুলতে পারিনি। খ্যাপা হাতি দেখে কে না ভয় পায়! তাই আপনি আওরঙ্গজেবের মতো ছুটে গিয়ে বর্শা ছুঁড়তে পারেননি।

—সত্যিই তো আমি পারিনি নাদিরা। আমার বুদ্ধি কাজ করেনি। বিকল হয়ে গিয়েছিল বলতে পারো।

—তাই বলে শাহজাদা আওরঙ্গজেব ও-কথা বলবেন? অমন সময়ে দাঁড়িয়ে

থাকাটা নির্লজ্জের কাজ ? চাঘতাই বংশের অপমান ?

—বলেছে নাকি ?

—বাঃ ! আপনিই তো সব পরে বললেন আমাকে। এর ভেতর ভুলে গেলেন ?

—ভুলিনি নাদিরা। আমি ছোটে ভাইকে ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। ও যে কী চায় ? কী যে ওর লক্ষ্য—তা ঠিক ধরতে পারি না। আমার চেয়েও তিন বছরের ছোট। এই বয়সেই ও গান ভেসে এলে কানে আঙুল দেয়—

—সত্যি ? গান তো মানুষের শান্তি।

—মানুষের স্মৃতিও বটে। এই তো সেদিন দেওয়ান-ই-খাসে আব্বাহুজুর ছোটে ভাই আওরঙ্গজেবকে জঙ্গী হাতি সুধাকর ইনাম দিলেন। সঙ্গে নগঙ্গে দু'লাখ তনখা। তারপর লাল খাঁ আর তাঁর দুই ছেলে ধ্রুপদ ধরলেন। সঙ্গে দরাঙ্গ খাঁ। আমি তো ছোটে ভাইয়ের অবস্থা বুঝেছি। ভয় পাচ্ছিলাম—বাদশার সামনে না কানে আঙুল দিয়ে ফেলে। আমি অনেক কষ্টে মনের হাসি মনেই চেপে গেলাম নাদিরা।

—সত্যি। মানুষ কেন এমন হয়।

—আরও শুনবে ! ও যেন দুনিয়ায় এসেছে—এ দুনিয়াকে শুধরে শুদ্ধ করবে বলে। ক'দিন আগে দিওয়ানখানায় শুনলাম—শাহজাদা নাকি বলেছেন—শয়তানপুরায় যত তওয়াইফ মেয়ে আছে—সবাইকে বিয়ে দিয়ে দেবে। বলো তো কথা !

—তাহলে তো আপনার ছোটেভাইকে সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে। তওয়াইফদের কে বিয়ে করবে ?

—বোঝো কথা ! ভয়ংকর নীতিবাগীশ হয়ে উঠেছে। কে পাক—কে না-পাক—এইসব নিয়ে সারাদিন মাথা ঘামায়।

—কবিতা পড়লে পারেন শাহজাদা আওরঙ্গজেব।

—হাফিজে ছোটে ভাইয়ের মন—আমি জানি নাদিরা—বলতে বলতে চমকে থেমে গেলেন শাহজাদা দারা। নাদিরা কথা বলতে বলতে ঘুমে চোখ বুজে ফেলেছে। বোজা চোখের ঢাকনির শেষে এক ফোঁটা জল শুকিয়ে নেমে গেছে। ভালো করে তিনি ঘুমন্ত বেগমের মুখ দেখলেন। এই মুখের মানুষটি কখনো আগ্রার বাইরে কোনো সফরে যায়নি। নেশায় নেশায় শাহজাদা পরভেজ না-লায়েক হয়ে পড়েছিলেন তাঁর আব্বাহুজুর বাদশা জাহাঙ্গীরের চোখে। বাগী অন্য ছেলেকে শায়েস্তা করতে মাত্র কিছুদিনের জন্যে শাহী দরবারে এই না-লায়েককে জাগিয়ে তোলা হয়। তাগদের লোভ দেখিয়ে। ইজ্জার টুকরো ছুঁড়ে দিয়ে। তখন শাহজাদা পরভেজের ঘর-গেরস্থিতে মাত্র কিছুদিনের জন্যে আশার আলো জেগে উঠেছিল। সেই আলোয় বালিকা করিমউন্নিসা খুব কয়েকদিন আসিরগড় দুর্গের নামটা শুনেছিল। সে-নামটা আজও ভুলতে পারেনি নাদিরা।

সেদিনকার বাগী শাহজাদা খুর্রম যদি হেরে যেতেন ? মুঘল শাহীর

তাগদের ছকে কোথাও কোনো ক্ষমা নেই। গোয়ালিয়র দুর্গের পাথুরে কয়েদে গরাদের ওধারে তাঁর জন্যে পপির শরবত তৈরি থাকতো। শাহজাদা পরভেজ হয়ে উঠতেন বাদশা পরভেজ। করিমউন্নিসা হতেন শাহজাদী করিমউন্নিসা। তাঁকে বেগম মেহজাবিনের দিনরাতের হাজিরা খাটতে হতো না। বরং গরমের আগ্রা ছেড়ে শাহজাদী কাশ্মীর সফরে বেরিয়ে পড়তেন। তাঁর তাম্বুল খরচ হিসেবে সুরাট বন্দরের সম্বচ্ছরের শুল্ক বেঁধে দেওয়া হতো।

সবই নসিব। তাগদেরও বড়ো ভাই নসিব। বাদশা দুনিয়াদারের দুই শাহজাদা। পহেলা শাহজাদা নসিব। আখেরি শাহজাদা তাগদ। একজন সব দেখে হাসে। আরেকজন ক্ষমা ছাড়াই ক্ষমতায় শক্তিতে দুনিয়াকে কব্জা করতে চায়। তাই এই দুনিয়ায় শুদ্ধ তাগদ বলতে কিছু নেই। সবটাই দস্তুর। একজন বাদশা থাকবেন বলে আরেকজন পাশেও থাকতে পারেন না। সাধারণের ভেতর সাধারণ হয়ে।

শাহজাদা দারা জুড়ি গাড়ির পর্দা সামান্য সরিয়েই টেনে দিতে বাধ্য হলেন। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে তুষার ফালি ফালি হয়ে ঝরে পড়ছে। ঘোড়ার ভিজে দাবনাতেই তুষার ফালি। ওদের পায়ের নিচে পেছল পাথর।

শাহজাদা বেগম নাদিয়ার পায়ে গরম জলের পোঁটি ভালো করে চেপে দিলেন।

॥ তেতাল্লিশ ॥

১০৪২ অল হিজরির বর্ষার পর সফর মাসে হিন্দুস্থানের মাঠেঘাটে এক হাঁটু জল। গোকুলের গোবর্ধন আশ্রমের বড় গোঁসাই দেখলেন, পিপুল গাছের তলায় হরিণের দল কচি ছানাদের নিয়ে সরকার সাহারের জঙ্গলের দিকে চলেছে। ওখানেই আমাদের দুসরি আখড়া। তিনি মনে মনে হিসেব কষে দেখলেন, ঠিক একশো বছর আগে চৈতন্য মহাপ্রভু এমন বর্ষার পরেই দেহ রেখেছিলেন। ছেলেবেলায় অন্য গোঁসাইদের মুখে গল্পগাছায় তাই তো শুনেছিলাম। তার মানে এখন আমার একশো আট বছর বয়স হলো। আর কতদিন এখানে থাকবো প্রভু! আর কতদিন? এখনো কি সময় হয়নি আমার!

আগ্রা দুর্গের হৃৎপিণ্ড, প্রাণ যা-ই বলা যাক না কেন—বাদশা শাহজাহান ঠিক এর উল্টো ছবি। সারা হিন্দুস্থানে তাবত জায়গা জমির ফসলের একটা ভাগ সরাসরি নগদে নয়তো ফসলে শাহী খাজানাখানার নামে জমা পড়বে মাস দুই তিনের ভেতর। ফি বছর এটা শাহী হাসিলের সময়।

তার মানে যমুনার ওপারে মমতাজ মহলের সমাধিমহল গড়ে তুলতে খরচ-খরচার কথা ভাবতে হবে না বাদশাকে অন্তত পুরো একটা সন। ভাবতে হবে না দিল্লির কাছাকাছি নয়া রাজধানী শাহজাহানাবাদ তৈরির এলাহি খরচখরচা

নিয়েও—অন্তত কিছুদিনের জন্যে এছাড়া তৈরি হচ্ছে বিশাল মোতি মসজিদ ঃ আগ্রা দুর্গে। শুধু তাই নয়। দুর্গে বানানো চলছে শাহজাহানি মহল, শিশমহল, শাহী হামাম। সবে চল্লিশ পেরনো টগবগে একজন মানুষ এখন হিন্দুস্থানের বাদশা। নীল চোখ, লালচে গাল, হাতে আপেলের খুশবু। হয় তিনি নিজেই লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন—নয়তো নতুন নতুন সমাধি, রাজধানী, মসজিদ, মহল, সড়ক বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এর জন্যে তো চাই অঢেল দাম, দামড়ি, আধেলা, পওয়া। দেওয়ান-ই-খাস ভেঙে তৈরি হলো। সবই আসছে হিন্দুস্থানের চাষীদের মেহনতের ফসল থেকে। শাহী খরচখরচা চালাতে চাষীরা ফি-বছর তাদের ফসলের একটা ভাগ তুলে রাখে সেই আকবর বাদশার আমল থেকেই। সেটাই শাহী হিসসা। বাদশার পাওনা। এই পাওনাগণ্ডা ভালো-ভাবেই বুঝে নিতে জানেন শাহজাহান। তিনি দখলে আছেন। ভোগেও আছেন। গড়ে তোলায় আছেন। ভেঙে ফেলাতেও পিছপাও নন্। শাহী ইচ্ছা-অনিচ্ছা—দুইই খুব প্রবল।

ইরানি মনসবদাররা তুর্কি আমিরদের বিরুদ্ধে জোট বাঁধার তালে আছে। তুর্কি ঘোড়ার কারবারিরা তাদের দেশোয়ালি আমির ওমরাহদের মদতে শাহী ফৌজে দেদার তুর্কি ঘোড়া বিক্রি করে দিয়ে হিন্দুস্থান থেকে অঢেল আশরফি নিয়ে যাচ্ছে—এটাই ইরানি মনসবদারদের একজোট হবার কারণ। বাদশার নজর কিছুই এড়ায় না। তিনি মনে মনে মিটি মিটি হাসেন। তিনি চান, ওরা এভাবে ব্যস্ত থাকুক। তাহলেই তিনি নিশ্চিন্ত। ঠিক একইভাবে ব্যস্ত রাজপুত, আফগান, হায়দরাবাদি মনসবদাররাও। সবাই নিজের দিকে ঝোল টানতে ব্যস্ত। সবাই সবাইকে ঠেলে ওপরে উঠতে চায়।

অবশ্য পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই বাদশার।

দক্ষিণে খান্দেশ, বেরার, তেলিঙ্গানা, দৌলতাবাদ মিলিয়ে বছরে শাহী খাজনা আসে পাঁচ কোটি তন্খার মতো। কিন্তু তা হাসিল করতে শতেক খেজমত। এখনো দশটির মতো কেল্লা আগ্রার কাছে মাথা নোয়ায়নি।

শাহজাদারা বড় হয়ে উঠছেন। দারা, সুজা পিঠোপিঠি। অল্প ফারাকে আওরঙ্গজেব। এঁরা সব এতদিন রোজিনাদার ছিলেন। শুধু মুরাদ এখনো বালক। মুঘল শাহীতে মরদরা কৈশোর পেরতে না পেরতে একলাফে লায়েক হয়ে ওঠে। আকবর বাদশা তো বেশিদিন বালক থাকারই সময় পাননি। মসনদের দায় এসে ঘাড়ে চাপতেই তিনি বালক-বয়স, কৈশোর থেকে একলাফে মরদ হয়ে উঠেছেন। শাহী কাউকে রেয়াত করে না। শাহী তার পাওনাগণ্ডা ঠিক শুষে নেয়।

মাথার ভেতর নানান্ ভাবনা চিন্তার এমন অবিরাম গতায়াতের ভার নিয়ে ফাঁকা দৃষ্টিতে বাদশা শাহজাহান যমুনার ওপারে তাকিয়ে ছিলেন। আকাশ নির্মেঘ। বর্ষার পর উস্তাদ ইশা আবার মেতে উঠেছেন। এখনকার রোদে দিন-কে দিন তাত কমে যাবে।

মেহজ্‌বিন বেগম নিজের অধিকারে আজকাল আগ্রা দুর্গের সব জায়গায় চলে যান। তাঁকে ঠেকাবে কে! তাঁর আঢাকা পা বাদশার নজর কাড়ে—এটা জানার পর থেকে মেহজ্‌বিন বাদশার কাছাকাছি হওয়ার খানিক আগেই মেঝের বনাতে চটি খুলে নেন।

শাহজাহান যে-দীবানে বসে তা খুব উঁচু নয়। তাই বসে থাকা বাদশার বাঁ উরুকে আসন জ্ঞানে তার ওপরেই বসলেন মেহজ্‌বিন।

বাদশার কোনো উনিশ-বিশ হলো না। তিনি যমুনার ওপারে যেমন তাকিয়ে ছিলেন তেমনই রইলেন। চোখের পলকও পড়লো না। মেহ্‌জবিনের খেয়াল আছে—তিনি কোথায় বসে আছেন। হিন্দুস্থানের শেষ আদালত—বাদশা শাহজাহানের বাঁ উরুতে। একবার ভেতরে ভেতরে কেঁপেও উঠলেন। তারপর চিরকালের আওরতের মতোই তাঁর ইস্পাহ্যানি খুনে রাঙানো ঠোঁট ফোলালেন মেহজ্‌বিন। তাতে শাহজাহানের চোখের পলক পড়লো না। তখন বিপদ গুনে মেহজ্‌বিন বেগম বাদশার প্রিয় বিষয়ে নাড়া দিলেন।—এ তো বুঝলাম না হজরত—আপনি পহেলা শাহজাদাকে না দিয়ে একেবারে গোড়াতেই কেন দুসরি শাহজাদা সুজাকে মসনদ দিলেন? তাও একলাফে দশহাজারি মনসব?

বাদশা তাঁর শালীর চোখে তাকালেন। কিন্তু কোনো কথা বললেন না। শাহজাহান জানেন, শাহীর চারদিক ঘিরে শুধু মধু। কিন্তু কোন্‌ মধু—বিষ মধু সেদিকে সব সময় খেয়াল রাখতে হয়।

—রোজিনাদার থেকে শাহজাদা সুজা মনসবদার হয়ে গেল—আর শাহজাদা দারা যে রোজিনাদার সেই রোজিনাদার হয়েই থাকলো!

—সুজা অস্থির। সুজা জানে না কী করবে। তাকে সবচেয়ে আগে কাজে জুড়ে দেওয়া দরকার। তাই তাকে মনসবদার করে—

—একেবারে দশহাজারি?

—তার নিচে মনসবদার করে খান্দেশ বা দৌলতাবাদে পাঠানোর কোনো মানেই হয় না। ওখানে এখনো দশটা কেল্লা আগ্রাকে কোনো নজরই দেয়নি মেহজ্‌বিন। তেলিঙ্গানায় শাহজাদা সুজা কতটা এগোলো তা জানা দরকার—বলতে বলতে বাদশার কপালে ভাঁজ পড়লো।

—শাহজাদা সুজা একজন বাহাদুর। তাকে নিয়ে আপনার কোনো চিন্তার কারণ নেই আলমপনা।

—তাহলে কাকে নিয়ে তোমার চিন্তা!—বলতে বলতে বাদশা তাঁর শালীর চিবুকে আলতো করে হাত রাখলেন।

এই মুহূর্তটি তৈরি করে তোলাই ছিল মেহজ্‌বিন বেগমের লক্ষ্য। হিন্দুস্থানের বাদশা তাঁর শালীতে মনোযোগী হয়ে উঠবেন—এই তো চান মেহজ্‌বিন বেগম। তিনি সেই পলকে সহজ, স্বাভাবিক, আহ্লাদি, আদুরে ঢঙে বাদশার বুকে ভেঙে পড়তে যাবেন—আর ঠিক এই সময়—

মেহজ্‌বিন দেখলেন, বাদশার পেছনে দূরে অলিন্দের মাঝখানে ছবি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরই খসম খলিলুল্লা খাঁ—যাঁর চোখে পলক পড়ছে

না—দাঁড়ানো বা দাঁড় করানো কোনো কোনো মূর্তি। চোখ—মেহজ্বিনের চোখে।

বেগম মেহজ্বিন তক্ষুণি তাঁর রাস্তা ঠিক করে নিলেন। বাদশার বুকে আদুরে ঢঙে ভেঙে পড়তে পড়তে বাদশার আদর খেতে খেতে আচমকা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ানো যায় না! তা করলে—তা হবে—বেদম বে-তমিজি। বাদশাকে ডেকে ফিরিয়ে দেওয়ার সমান। আর সে অবস্থা থেকেও নিজের খসমের কাছে আগের সমান—পুরোপুরি ফিরে যাওয়াও যায় না।

তাই মেহজ্বিন বাদশা শাহজাহানের আদরে পুরোপুরি ডুবে গেলেন। যদিও তিনি জানেন, খসম খলিলুল্লা খাঁ পেছনে দাঁড়িয়ে সবই দেখছেন—একদম ছবি হয়ে।

বাদশার ভেতরের মানুষটাকে উসকে দিতেই মেহজ্বিন বললেন, হজরত! আপনি কি শুধু বানিয়েই যাবেন? একটার পর একটা? কোনো মাথা নেই এই বানানোর।

—কী রকম?

—বাজির জন্যে যমুনার ওপরের ওই যে সমাধিমহল গড়ে তুলছেন—গড়ছেন মোতি মসজিদ, হামাম শাহী—দিল্লির গায়ে নয়া রাজধানী শাহজাহানাবাদ—একসঙ্গে এত বিরাট বিরাট কাজ সব আপনার একার শাহী খোয়াবে থাকে! খোয়াব একদিন কারুকাজ করা পাথরের চেহারা দিয়ে দুনিয়ার ওপর মাথা তুলে দাঁড়াবে—আপনি কত কী বানিয়ে তুলতে পারেন—

—আমার সবচেয়ে বড় খোয়াব কী জানো মেহজ্বিন?

মেহজ্বিন বেগম কোনো কথা বললেন না। তিনি এক পলকে দেখলেন, নাঃ! খলিলুল্লা খাঁ এ দৃশ্য আর সহ্য করতে পারেননি। ইনসানের শরীর তো। তিনি সরে গেছেন। নিঃশব্দে। পেছন থেকে একখানা ছোরা তো তিনি বাদশার পিঠে হাতল অব্দি বসিয়ে দিতে পারতেন। তাহলে সারা হিন্দুস্থান টলমল করে উঠতো। প্রায় তিন বছর আগে গওহরআরা বাজির পেটে আসতেই বাজি কেমন অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই থেকে হিন্দুস্থানের বাদশা তাঁর দিকে ঝুঁকেছেন। সেই ঝোঁক এখন আগ্রা দুর্গে বাদশার নির্জন, নিভৃত আহ্লাদ, আদরে এমন করেই ভরে ওঠে।

—আমার সবচেয়ে বড় খোয়াবের নাম শাহজাদা মহম্মদ দারাশুকো।

মেহজ্বিন বেগম তা জানেন। তবু বাদশাকে তাঁর পেয়ারা ছেলের কথায় ডুবিয়ে রাখতে বললেন, তাই বুঝি!

—হ্যাঁ মেহজ্বিন, আল্লার করুণা না থাকলে অমন ছেলে হয় না। দারা হিন্দুস্থানের শুধু একজন শাহজাদা নয়। দারাশুকো আল্লার দয়ায় পাওয়া একটি হিরে। তাকে বড় করে বানিয়ে তোলাই আমার সবচেয়ে বড় কাজ এখন।

—আর তাকেই আপনি এখনো হাজার তনখার রোজিনাদার করে রেখেছেন।

—মেহজ্বিন। তাকে আমার না-দেবার কিছুই নেই। দারার মুখে তাকালে

আমার বুক ভরে যায়। একটা কথা মনে রেখো মেহজ়বিন—,

মেহজ়বিন বেগম টের পেলেন, তাঁকে জড়িয়ে ধরা বাদশার ডানহাতখানি মুঠো পাকিয়ে ফেলেছে।

—একটা কথা মনে রেখো। বাবর বাদশা হুমায়ুনকে মসনদ দিয়ে গিয়েছিলেন। হুমায়ুন বাদশাও আকবরকে মসনদ দিয়ে যান। অকবর বাদশা তো বলতে গেলে নুরুদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীরকে মসনদে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভুলে যেও না—জাহাঙ্গীর বাদশা তাঁর মসনদ আমাকে দিয়ে যাননি—সেখানে আমাকে বসিয়েও দিয়ে যাননি।

বলতে বলতে বাদশা শাহজাহান মেহজ়বিন বেগমকে একরকম হাতের কাছের কোনো জিনিসের মতোই ছেড়ে দিয়ে তাঁর দু'খানা হাত মুঠো করে তুলে ধরলেন। এই দুই হাত দিয়ে আমি হিন্দুস্থানের মসনদ আদায় করেছি মেহজ়বিন। আজ আমাকে যেখানে দেখছো—এখানে আসার পথে আমাকে অনেকবার ডুবতে হয়েছে—আবার ভেসেও উঠেছি। আমি যা যা করেছি—তা যেন দারাকে না করতে হয়।

—আপনি চান শাহজাদা দারা সময় হলে আপনার মসনদে বসুন।

বাদশা মেহজ়বিনের চোখে স্থির হয়ে তাকালেন। পরিষ্কার জবাবে না গিয়ে বললেন, মসনদ আমার নয়—শাহজাদা দারারও নয়। মসনদ তাগদের। মসনদ নসিবের! মসনদ মগজের!

—শাহজাদা দারা কাফি মগজদার ইনসান।

বাদশা কোনো কথা না বলে তাকিয়ে রইলেন।

মেহজ়বিন বেগম ও চোখে বেশিক্ষণ তাকাতে পারেন না। চোখ নামিয়ে বললেন, মসনদ নসিবের! তাহলে আমি কার?

দু'হাতে ফের মেহজ়বিনকে জড়িয়ে ধরলেন বাদশা। তুমি আমার নসিব—

নিজেকে আরও দুর্লভ করে তুলতেই মেহজ়বিন বেগম খানিক সরে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। গিয়ে বললেন, তাহলে সিতারা বেগম কার আলমপনা?

—কে? তোমার বোন? বলেই শাহজাহান কিছু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। তারপর বললেন, তোমরা বোনেরা মিলে আমার খাক হয়ে আসা জীবনটায় সেচ দিয়ে—খুশবু দিয়ে ভরিয়ে তুলেছো। আমার এ-জীবনে এখন তোমরা—চার শাহজাদা—তিন শাহজাদীর এক সুনহেরা বাগিচা।

—বাজি! আমি! সিতারাও?

এবার কোনো কথাই বলতে পারলেন না বাদশা।

দেখতে দেখতে রবিউল আওয়াল মাস এসে পড়লো। সারা হিন্দুস্থান জুড়ে মাঠে মাঠে এবার ধানে রং ধরেছে। ডাঙা জায়গায় জলদি জাতের দানা এবার পুষ্ট হয়ে এলো। চাঁদের সঙ্গে মিলিয়ে বাদশার জন্মতিথিতে দরবার বসলো। ইজফা, খেলাত, খেতাব দেবার জন্যে বছরে আরও দু'বার দরবার বসে। সূর্যের সঙ্গে মিলিয়ে বাদশার জন্মতিথিতে একবার। আর একবার বসে নওরোজ দরবার।

শাহজাদা দারা দেওয়ান-ই-খাসের দরবারে যখন ঢুকলেন—তখন আগ্রার তামাম দরবারিরা দাঁড়িয়ে পড়লেন। শাহজাদার একপাশে সিপাহসালার। আরেক পাশে উজিরে আজম।

শাহজাদা অনেকটা এগিয়ে এসে বাদশা শাহজাহানের সামনে কুর্নিশ করলেন। তখন বাদশা মসনদ থেকে নেমে এসে দারার দুই কাঁধে হাত রাখলেন। পাশেই একজন হাবসি গোলাম বিশাল এক রুপোর থালায় বারোটি নানা রঙের ছোট ছোট রঙিন ফিতে নিয়ে দাঁড়িয়ে।

এই মুহূর্তটির জন্যে সারা হিন্দুস্থান যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়ানো। শাহজাদা দারারও দম আটকে আসছিল এই দিনটির জন্যে। দুই এক রিসালা ঘোড়সওয়ার নিয়ে এখান থেকে ওখানে যাওয়া—আর শাহী মনসবদার হয়ে কয়েক হাজার ঘোড়সওয়ার, শ-এর ওপর হাতি, কয়েক হাজার বন্দুকচী, ধানুকী, পদাতীর মাথায় বসে হুকুম, ফরমান জারি করা একদম আলাদা।

শাহজাদা দারা সামান্য ঝুঁকলেন। বাদশা তাঁর দুই কাঁধে ছ'টি করে রঙিন ফিতে লটকে দিলেন নিজের হাতে। সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ান-ই-খাস চাপা গুনগুনানিতে ভরে উঠলো। মনসবদারির ধাপে শাহজাদা বারো হাজারি 'জাত' পেলেন। এখন থেকে শাহজাদা দারা আর রোজিনাদার নন্। এবার থেকে তিনি নগদি মনসবদার। মাস গেলে মাইনে। শাহজাদার ঘোড়সওয়ারও বেঁধে দেওয়া হলো। এখন থেকে তিনি ছয় হাজার ঘোড়সওয়ারের মাথায়।

দারা তাঁর আব্বা হুজুরের মুখে তাকালেন। সেখানে তাঁর জন্যে সব দেবার ইচ্ছে শাহী নিয়মকানুনে বাঁধা পড়ে স্থির হয়ে আছে। সে মুখে ক্ষমতার ছটা। ভালোবাসা। স্নেহ। ক্ষমা সব একই সঙ্গে লেখা করছে ওখানে।

বাদশা সবার সামনে চেঁচিয়ে বললেন, এবার শাহজাদা তাঁর ঘোড়সওয়ারদের ভার নিতে সাকেত ছাউনিতে যাবেন। কিন্তু তার আগে হিন্দুস্থানের বাদশা হিসেবে আমার আরও একটি জরুরি কাজ বাকি আছে।

এ কথায় সারা দেওয়ান-ই-খাসে আমির, ওমরাহ, মনসবদার, বড় বড় ব্যাপারী, জাহাজি, গেহুঁর কারবারি, ঘি-চিনির শেঠ, শায়ের, তসবিরওয়ালা, গায়ক দরাঙ্গ খাঁ, বিশ্রাম খাঁ ওঁদের চাপা গুনগুনানি একদম থেমে গেল।

বাদশা বলে উঠলেন, হুমায়ুন বাদশা থেকে আমি অব্দি—মুঘল শাহীতে যারাই পরে হিন্দুস্থানের বাদশা হয়েছি—সবাই আমরা যে যার আব্বা হুজুরের কাথ থেকে সরকার হিসার জায়গির পেয়ে আসছি। আজ থেকে শাহজাদা দারা ফৌজদার-ই-হিসার—

সঙ্গে সঙ্গে সারা দরবার আনন্দে ফেটে পড়লো। বাদশা এই নামি দামি মানুষের জমায়েতের দিকে সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে তাকিয়ে থাকলেন। একজন কৃতী বাবা যেভাবে ছেলের কৃতিত্বে নিজের মুখে আনন্দ ছড়িয়ে পড়া আটকাতে না পেরে তাকিয়ে থাকেন—ঠিক সেইভাবে।

সরকার হিসার সুবে দিল্লির ভেতর। মোট মহল সতেরো। পরিমাণ ফল ৩১১৪৪৯ বিঘা। জমা—৫৫০০৪৯০৫ দাম। শাহী তেপকাঁচ মনে মনে হিসেবটা

ঝালিয়ে নিলেন।

দরবার ভাঙার সময় বিহারের সুবেদার কাবুলের সুবেদারকে বললেন, এ তো অনেক আগেই বোঝা যাচ্ছিল।

কাবুলের সুবেদারের অনেকদিন রাজধানী আগ্রা আসা হয় না। রাজধানীর হাল-হকিকত কিছুরই খবর রাখেন না। তিনি ভাঙা দরবারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, কী বোঝা গিয়েছিল?

ভাঙা দরবার পেছনে রেখে বাদশা উঠে গেছেন অনেকক্ষণ। নয়া মনসবদার শাহজাদা দারাকে নিয়ে সিপাহ-সালার এতক্ষণে ফৌজি ছাউনি সাকেত রওনা হয়ে গেছেন। দারা সেখানে ছ'হাজার ঘোড়সওয়ার বুঝে নেবেন। ভাঙা ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে বিহারের সুবেদার হেসে বললেন, চলুন। যেতে যেতে বলছি।

বিহারের সুবেদার হায়দরাবাদি মনসবদার ছিলেন আগে। তিনি আগ্রার নাড়ী বোঝেন। যেতে যেতে কাবুলের সুবেদারকে তিনি বললেন, শাহজাদা দারাই পরে হিন্দুস্থানের বাদশা হবেন—

—কী করে বুঝলেন?

—এতে বোঝার কিছু নেই। বাদশা চান—তাঁর পরে শাহজাদা দারা হিন্দুস্থানের মসনদে বসবেন।

—এত আগে তা কি বলা যায়! আরও তো তিনজন শাহজাদা আছেন। তাছাড়া—।

বিহারের সুবেদার একটু তেতেই জানতে চাইলেন, তাছাড়া?

—তাছাড়া শাহাজাদা দারা তো শাহজাদা আকবর কিংবা শাহজাদা সেলিমের মতো তাঁদের আব্বা হুজুরদের একমাত্র শাহজাদা নন্! বরং বলা যায়—শাহজাদা হুমায়ুন কিংবা শাহজাদা খুর্রমের মতোই শাহজাদা দারারও আরও তিনটি করে ভাই শাহজাদা!

কাবুলের সুবেদারকে বিহারের সুবেদারের যা মনে হয়েছিল—তা তিনি নন দেখে বিহার রীতিমত বিরক্ত হলেন। তিনি বললেন, বাদশা মনে মনে দারাকে হিন্দুস্থানের বাদশা ভেবে রেখেছেন বলেই তাঁকে আজ ফৌজদার-ই-হিসার করলেন।

দুই সুবেদার হাঁটতে হাঁটতে হাতিপোল দরওয়াজার কাছে এসে গেছেন। দু'জনই শাহী কেতায় মানী মানুষ। পায়ে হেঁটে বেশিদূর যেতে পারেন না। এবার যে-যার ঘোড়ায় উঠে বসবেন।

কাবুল দাঁড়িয়ে পড়লেন। তিনি খুব খাতির,সম্মান দেখিয়ে বললেন, দেখুন বিহার। বাদশার মনে যা-ই থাকুক—বাদশাহী স্থির হয় তাগদে—দাপটে—মগজদারিতে। মনে মনে বাদশাহী কখনো ঠিক হয় না। তাকান হুমায়ুন বাদশার দিকে—তাকান শাহজাহান বাদশার দিকে। মুঘল শাহীতে কথা একটাই! তখত-ইয়া-তাবুদ!! বিশেষ করে শাহজাদা যেখানে একজন নন—চার চারজন।

বিহারের সুবেদার কথা বাড়ালেন না। ভাঙা দরবারি ভিড় থেকে বেরিয়ে তিনি তাঁর ঘোড়ায় গিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের পরিখার ওপর টানা তক্তাপোল খুলে গেল। এ পোল খোলা হয়—সুবেদার বা তার ওপরের শাহী মনসবদার, সিপাহ্-সালার, উজিরে আজম, বিদেশি ইলচি, মির্জা রাজা জয়সিংহ বা ওরকম কেউ এলে—বা গেলে।

এখন দেওয়ান-ই-খাসে কেউ নেই। শুধু একজন এতক্ষণ বসেছিলেন। শীত আসবে আসবে। তার নরম রোদ সামান্য যে ক'টি আলোর রেখা দেওয়ান-ই-খাসে পাঠাতে পেরেছে—তার সবগুলোই দরবারের নতুন বদলানো মর্মরে পড়ে হাজারগুণ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই আলোয় দেখা গেল—শাহজাদা আওরঙ্গজেব উঠে আসছেন। তাঁর উষ্ণীষের সরবন্ধে একটি চুনি এইমাত্র ঝিকমিক করে উঠলো। তিনি এগোবার সময় অস্ফুটে বললেন, মৌজদার-ই-হিসার।

সন্ধের মুখে মুখে শাহজাদা দারাশুকো সাকেত ছাউনি থেকে আগ্রা দুর্গে ফিরলেন। নয়া ছ'হাজারি মনসবদারকে উপযুক্ত সম্মান দিয়ে দুর্গ অব্দি এগিয়ে দিতে দুই রিসালা ঘোড়সওয়ার সাকেত থেকে আগ্রা দুর্গ অব্দি এসেছিল। তারা টগাবগ্ শব্দ তুলে আবার সাকেত ফিরে গেল।

শাহজাদার তর সইছিল না। তিনি আঙুরিবাগ, শিশমহল, হামাম শাহী পাশে ফেলে একরকম ছুটতে ছুটতে দেওয়ান-ই-আম পার হলেন। একজন বাঁদি তো ধাক্কা খেয়ে পড়েই যেতো। সময়মত সরে দাঁড়ানোতে সে কাণ্ড ঘটলো না। অভ্যেসবশে বাঁদি সরে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করে মাথা তুলেই দেখে—কোথায় শাহজাদা। দারা ততক্ষণে আগ্রা দুর্গের কোন্ না কোন্ মহলে পোঁছে গেছেন। বাঁদি ফিক করে হেসে নিজের রাস্তা নিলো। মনে মনে বললো, ফের যদি এ-দুনিয়ায় আসা হয় তো এমন শাহজাদার সঙ্গেই যেন আমার বিয়ে হয়।

শাহজাদা দারা নিজের মহলে ঢুকতে ঢুকতে রেশম ডোরিতে টান দিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, কে এসেছি দ্যাখো নাদিরা—

ওই ডোরিতে টান দিলে বাঁদিরা ছুটে আসে। ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে। কিংবা মহলের ভেতরে পা দেবার আগে বাইরে থেকে ওই ডোরিতে টান দিয়ে নিত্য-কাজের হাজিরা জানান দেয়। আমি আসছি।

নাদিরা হবার আগে করিমউন্নিসা এই দুর্গেই কতবার রেশম ডোরিতে টান দিয়েছে। কতবার ওই ডোরির টানে ঘণ্টা বেজে উঠতে করিমউন্নিসা ছুটে গিয়েছে। খলিলুল্লা খাঁকে কুর্নিশ করে বলেছে, জি সরকার—

যেন সেই পুরনো অভ্যেসেই নাদিরা বেগম পালঙ্ক থেকে উঠে বসতে যাচ্ছিলেন। পারলেন না। শরীরটা ভারি হয়ে এসেছে।

শাহজাদা দারা· সামনে এসে দাঁড়ালেন। তোমায় এসে সব জানাবো বলে সাকেত থেকে হাওয়ার সঙ্গে ছুটে এসেছি বেগম। তোমাকে সব না বলতে

পারলে আমার সুখ হয় না নাদিরা—

—সরতাজ ! আপনি আমার মাথার মুকুট । চোখের আলো । এতটা পথ এমন রেপরোয়া ঘোড়া দাবড়াবেন না ।

—ভুলে যেও না—একজন শাহী মনসবদারের জীবন তো বেপরোয়াই হবে । পাছে তুমি সন্ধে হতেই রোজকার মতো ঘুমিয়ে পড়ো—তাই ছুটে এসেছি ।

—আজ যত রাতই হোক আমি জেগে বসে থাকতাম আপনার জন্যে ।

—জানি নাদিরা । বলে দারা থামলেন । তারপর বললেন, আমাদের সন্তান খুব নসিবওয়ালা হবে ।

নাদিরা দারার মুখে হেসে তাকিয়ে রইলেন । সাকেত থেকে এই মানুষটি ঘোড়া ছুটিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরেছেন—শুধু তাকে জেগে থাকতে থাকতে পাবেন এই আশায়—এও কি কম নসিবের কথা ! .

দারা বললেন, শুধু মনসবদার নয়—আজ থেকে আমি ফৌজদার-ই-হিসার ।

নাদিরা খুব আস্তে ভীষণ মিষ্টি গলায় বললেন, একবার কথা হয়েছিল—শাহজাদা পরভেজকে সরকার হিসারের ফৌজদার করা হবে । আমি তখন ছোট । আম্মিজান বলতেন—

শাহজাদা দারা কী বলতে যাচ্ছিলেন । বেগমের ওই কথায় একদম চুপ করে গেলেন । মানুষের জয় কত পলকা । মানুষের হেরে যাওয়া কত ভারি হয়ে মনের ভেতরে চেপে বসে থাকে ।

নাদিরা আবারও মুখ খুললেন । আব্বা হুজুর চল্লিশ হাজারি মনসবদার হয়েছিলেন—

দারা বেগম নাদিরার সুখদোলার ঝুলনের ফাঁক দিয়ে দেখলেন, যমুনার আকাশের এক জায়গায় ঝাঁক বেঁধে কুচি কুচি অনেক তারা ঝুলে আছে । গুনলে কি ওরা চল্লিশ হাজারের বেশিই হবে ? কমবেশি যা-ই হোক—মুঘল শাহীতে তাই ঘিরেই মানুষের কাছে মান, কুর্নিশ, তসলিম ! তা নাহলে আজ আমি ছ'হাজারি ঘোড়সওয়ারের মনসবদার হতেই সাকেত অমন পাল্টে গেল কেন ? ফৌজি ছাউনিতে ঢোকার মুখে সে কি সালামির বহর । তোপ দেগে খাতিরের বাহার ! সবটাই তো শাহী কেতা । মানুষের চোখে কী না কী বিরাট ।

—জানো বেগম—আম সাকেত থেকে ফিরছি—আগ্রায় ঢোকার মুখে দেখি মশাল জেলে সড়ক বানানোর মজুররা জলসা দিয়েছে । কিসের জলসা ? এক সেপাই জেনে এসে যা বললো—তা শুনে আমি তো অবাক ।

নাদিরা বেগম মুখ তুলে শাহজাদার মুখে তাকালেন ।

দারা বললেন, আমার মনসবদারি পাওয়ার আনন্দে জলসা বসেছে । ওরা মজুরির আয় থেকে মুজরো করে নাচনেওয়ালি এনেছে—কাওয়ালি এনেছে । আমার তখন ফেরার তাড়া । দূর থেকে আমায় কুর্নিশ করে রানাদিল তখন নাচতে শুরু করলো । আমি আর কী করি ? ছোট এক থেরিয়া আশরফি নাচের আসরে ছুঁড়ে দিয়েই দু'পায়ে ঘোড়ার পেটে খোঁচা দিলাম—

নাদিরা বেগম তাঁর কাঁচ মনসবদার স্বামীর মুখে চুপ করে তাকিয়ে থাকলেন। শাহজাদা মুখ নামিয়ে এনে সেই দুই খোলা চোখের পাতা নিজের ঠোঁট দিয়ে বুজিয়ে দিলেন।

মহতব বাগ, হায়াত-বকস্ বাগ আর আঙুরিবাগের ভেতর মহতবই শাহজাদী জাহানারার ইদানীং বেশি পছন্দ। ওখানে সব ফুলই সাদা। তাতে চাঁদের আলো পড়ে সত্যিই সারাটি বাগ বুঝি বা এক এক দিন চাঁদ হয়ে ওঠে। আজ শ্বেত স্থলপদ্মের ঝাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন শাহজাদী জাহানারা। এইমাত্র সূর্য ডুবলো! প্রথম সন্ধ্যাতারা আকাশে ফুটি ফুটি। এমন সময় কার পায়ের শব্দ পেয়ে শাহজাদী প্রায় হাঁটু ভেঙে ঝুঁকলেন। ঝুঁকে সালাম জানালেন। জানাতে জানাতে পুরুষালি গলার স্বরে জাহানারার বুকের ভেতর কেঁপে উঠলো।

—বাদশাজাদী কি আমায় সুক্রিয়াবাদ দিচ্ছেন?

বুন্দিরাজ ছত্রশালের একথায় সরাসরি তাঁর মুখে তাকালেন জাহানারা। সন্ধ্যার জ্যোৎস্নার ভেতর ছত্রশালের চোখে সূর্যের রোদের ঝাঁজ। মাথায় উষ্ণীষ সাদা। বহু লড়াই জেতা লড়াকু। ছত্রশাল বলতে লাগলেন, শাহজাদী! আপনার আব্বা হুজুর একদিন তাঁর খারাপ সময়ে উদয়পুরে এসে ওঠেন। তাঁর সম্মানে তোরণ বানানো হলো। সেই তোরণে আজও নিশিদিন দীপশিখা জ্বলছে। যতদিন একজন রাজপুত বেঁচে থাকবে—যতদিন আমার এই হাতে জোর থাকবে—ততদিন ওই দীপশিখা জ্বলবে—আপনার সম্মানে শাহজাদী এই তলোয়ার খোলা থাকবে—

ঝরোকার ওপর শাহজাদী তাঁর ঠোঁট চেপে ধরে বলে উঠলেন, কিন্তু রাজপুতের সম্মান!

ছত্রশালের মুখে সঙ্গে সঙ্গে হাসি মিলিয়ে গেল। দুর্ভাগ্য হিন্দুস্থান! হিন্দুস্থানের ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণরাই তো দেশের দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছে। আপনার খুনেও তো মিশে আছে রাজপুত খুন। তা কি মনে পড়ে আপনার? মহম্মদ ঘোরির হামলা এলো। দিল্লি, আজমির রক্ষা করতে রানা সংগ্রাম সিং রুখে দাঁড়ালেন। কিন্তু দিল্লির পতন হলো। আজও দিল্লির গৌরব ধুলোয় গড়াচ্ছে। রাজপুতদের ওপর হিন্দুস্থানের নদী, পাহাড় রক্ষার ভার। অথচ আজও আমরা ঝগড়ায় ডুবে আছি।

—বীর মৃত্যুর ভেতর দিয়ে অমর হন। পৃথ্বীরাজকে লড়াইয়ে রওনা করিয়ে দেবার সময় সংযুক্তা বলেছিলেন, আমার জন্যে চিন্তা কোরো না। অমরত্বের কথা চিন্তা করো। দুশমনকে দু-ভাগ করো। মৃত্যুর ওপারে আবার আমি তোমার হবো। পৃথ্বীরাজ মারা গেলেন। সহমরণে যাবার সময় সংযুক্তা বলেছিলেন—আবার স্বর্গে আমাদের মিলন হবে। আমার রাজা! আপনি কি বিশ্বাস করেন—এখানে যাদের মিলন হলো না—পরপারে তাদের মিলন হবে?

ছত্রশালের মুখে হাসি খেলে গেল। শুধু চিতায় আমরা শুদ্ধ হই না।

এখানে বা পরপারে—যেখানেই হোক একটি হৃদয় আরেকটি হৃদয়কে ছুঁয়ে গেলেই সব বাঁধন খুলে যায়—

আশমানে এখন তারার মালা। দেওয়ান-ই-আমে গান থেমেছে। যমুনায় অবিরাম জল ভাঙার শব্দ। শাহজাদী নিজের বুকের ভেতরকার ওঠাপড়া শুনতে পেলেন। তিনি খুবই চাপা গলায় ছত্রশালাকে বললেন, আপনি সারা জীবন বাদশা শাহজাহান—শাহজাদা দারার সঙ্গে থাকবেন ?

—সারা হিন্দুস্থান জয় করে তাকে এক করার খোয়াব দেখেছিলেন আকবর বাদশা। আর মেবারের রানা প্রতাপ ঠিক করলেন, বাদশার হামলার মুখে তিনি মেবারকে রক্ষা করবেন। ভাবুন তো শাহজাদী।

সন্ধ্যার বাতাসে গোলাপের গন্ধ। জাহানারার মনে তাঁর শিশুবেলা ভেসে উঠলো। এমনি এক সন্ধ্যায় রাজপুতানি বুড়ির মুখে মেবার, বুন্দি, অম্বরের কীর্তিগাথা গানেগল্পে শুনেছিল সে।' তখন তার মনে হয়েছিল—সেও হিন্দুস্থানের রাজবংশের মেয়ে—

ছত্রশাল ঝরোকার ভেতর দিয়ে শাহজাদীর চোখে তাকালেন। আমরা অদৃষ্টে বিশ্বাসী। আমার মনে হয়—রানা সংগ্রাম সিং-ই শেষবারের মতো স্বাধীন হিন্দুস্থানের স্বপ্ন দেখেন। বিশ্বাসঘাতক তাঁকে ছলনা করেছিল।

শাহজাদী জাহানারা এমন করেই তাঁর চোখ ঝরোকার শেষদিকে রাখলেন —যাতে কিনা তা দিয়ে ছত্রশালের চোখ ছোঁয়া যায়।

ছত্রশাল বললেন, আকবর চিতোর ধ্বংস করলেন। চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে আজ আর সন্ধ্যাদীপ জ্বলে না। তবে আজও রাজপুতানীরা চিতোর দুর্গে ফুল দিয়ে যায়। হিরামন ভাঙা মন্দিরের চূড়ায় বসে গান গায়—রানা প্রতাপের সঙ্গে রাজপুত-আজাদিও শেষ। যতদিন আকবর বাদশার স্বপ্ন দেখবে তৈমুর বংশ— ততদিন আমরাও সঙ্গে আছি। এই তলোয়ার হাতে নিয়ে বলছি—যতদিন বাঁচবো শাহজাদী জাহানারার জন্যে—শাহজাদা দারার জন্যে—বাদশা শাহজাহানের জন্যে জীবন দেবো।

শাহজাদী জাহানারা চোখ বুজে ফেললেন। খানিকবাদে চোখ খুলে দেখেন ছত্রশাল নেই। দুর্গের অনেক আলো নিভে গেছে। অনেক তারা তখনো আকাশে। মহতব বাগের গায়েই বিরাট এক তেঁতুলগাছের শেকড় ছুঁয়ে যমুনার জল পাক খাচ্ছে। অনেকগুলো সাদা ফুল তুলে নিলেন জাহানারা। তারপর নিজেই মালা গাঁথতে থাকলেন। তাঁর মনে হলো, জ্যোৎস্নায় আশমান এখন হলুদ কাচ হয়ে আছে। সারা দুনিয়া আমার আনন্দের জন্য সেজেছে। আশমান জুড়ে আমারই জন্যে তারার প্রদীপ। যমুনার জল ভাঙার আওয়াজ জুড়ে জুড়ে ঠিক কোন রাগিণী হয়ে উঠলো। আজ কি আমি স্বয়ংবরা হবো ? ছত্রশালের চোখ কী গভীর! কী উজ্জ্বল। চওড়া কাঁধ। বিশাল বুক। সরু কোমর। যেমন একজন লড়াকুর হয়ে থাকে। অথচ এই মানুষটি হাসলে তার ভেতর আমি সরল শিশুকে দেখতে পাই।

শাহজাদী বুকের ভেতর থেকে অনেকদিন আগের একখানি চিরকুট বের

করলেন। তাতে আলতো করে নিজের ঠোঁট রেখে তুলে নিলেন। মনে মনে বললেন, আগের এই চিঠিতে তুমি বলেছো—আমি তোমায় আনন্দ দিয়েছি। তুমি আমাকে 'দেবী' বলেছো। লিখেছো—আমি সংযুক্তা হলে—তুমি পৃথ্বীরাজ। আমার সমস্ত দুনিয়া আজ গোলাপ হয়ে ফুটে উঠলো। রাজা! তুমিই মনে করিয়ে দিলে—আমরা আওরত—আমরা দীঘির মতো। তোমরা মরদ। রাজহাঁসের মতো সাঁতরে চলেছো। আমার হৃদয়ই সেই দীঘি। সেখান থেকে দূরে সরে গেলে তোমার আর কী থাকবে? তোমার চিঠিতে আমি ভেসে গেছি।

মনে পড়ে? একদিন আমরা চাঁদনিচকের ভেতর দিয়ে আসছিলাম। তখন দরবারের সময় হয়ে এসেছে। হাতি আর ষাঁড়কে জোড়ায় জোড়ায় সাজিয়ে নিয়ে একদল লোক চলেছে কোন উৎসবে। তাদের গায়েও উৎসবের সাজ। বাতাসে কস্তুরী, জাফরান, অগুরু-চন্দনের সুবাস। আকাশে নানা রঙের ঘুড়ি।

চাঁদনিচকে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ আসে। জাঞ্জিবার, সিরিয়া, ইংলিশস্তান, তুর্কিস্তান, খোরাসান, কাবুলিস্তান, চীন—কোত্থেকে নয়! ডালিম, কুল, তরমুজ, আঙুরে বাজার ভরে গেছে। সেদিন রাস্তায় ছক সাজিয়ে বসে থাকা নক্ষত্রের নবীন ভাষাবিদকে মনে মনে বলেছিলাম—বলো তো আমার ভাগ্যে কী আছে? আমার জন্যে কি আনন্দের মুহূর্ত আসবে না।

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥